আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা

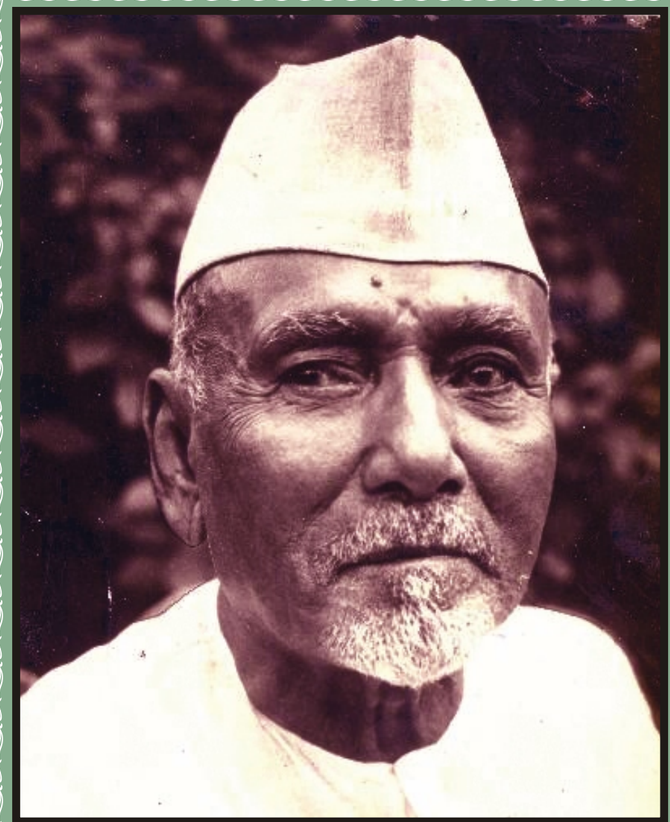

পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য

আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা ১ পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য

দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বারাণসীর পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য সরোদবাদন শিক্ষার সংগীতাচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মৈহারের বাড়ীতে সুদীর্ঘ সাত বছর থেকে তার কাছে তালিম নেন। খাঁ সাহেব তাঁর সচিব ও সন্তানতুল্য শিষ্যকে তাঁর বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে মনোনীত করেন। খাঁ সাহেবের প্রতিভাময়ী কন্যা অন্নপূর্ণাদেবীও যতীনবাবুকে সম্পূর্ণ শিল্পী করে গড়ে তোলবার জন্য সযত্ন প্রয়াস করেছেন। গুরু ও গুরুকন্যার এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং গুরুগৃহে কঠোর একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য আজ ভারতবিখ্যাত প্রখ্যাত সরোদিয়াদের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। ইংরাজী ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থ **Allauddin Khan And His Music** সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ভারত ও বিদেশে উস্তাদজীর শিক্ষাকে অবিকৃত রেখে প্রচার ও প্রসারে আজও তিনি যত্নবান।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
ও
আমরা

পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য

প্রকাশক / পরিবেশক
অমিত ভট্টাচার্য

২০১৮

ALLAUDDIN KHAN O AMRA
by Jotin Bhattacharyya

প্রকাশক
অমিত ভট্টাচার্য

পুণঃ প্রকাশক
ড. প্রণব সেন

প্রথম প্রকাশ : ১২ই আশ্বিন (মহালয়া) ১৩৮০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫ (১৬ই পৌষ, ১৪০১)
তৃতীয় প্রকাশ : ১৪ জুলাই, ২০১৮ (রথযাত্রা, ২৯ আষাঢ়, ১৪২৫)

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষরবিন্যাস
দি ডিকমলেসার
৬০, সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রণ
আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৫, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পত্নী
শ্রদ্ধেয়া মা মদনমঞ্জরী দেবী, সংগীতের অনন্তরত্নগর্ভা দেবী অন্নপূর্ণা
এবং বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের
তৃতীয় প্রজন্মকে

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

Ustad Allauddin Khan and His Music
উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা (২য় খণ্ড)

প্রকাশনার নেপথ্যে

পুণঃ প্রকাশক : ড. প্রণব সেন (Violinist)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (রসায়ন বিভাগ)
স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথমেই জানাই কোন ব্যবসায়িক স্বার্থে পুস্তকটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে না। কপি রাইটের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বিনা অনুমতিতে কোন পুস্তক প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপকর্ম। আমার গুরুর ঐকান্তিক ইচ্ছাই আমার পাথেয়। তাঁর চোখে আমার প্রয়াস অপত্যকর্ম বলেই বিবেচিত হতো বলে আমি বিশ্বাস করি। গুরুজী বারবার বলতেন বাবার জীবনী সকলের জানা উচিত।

নবকলেবরে মুদ্রণকল্পে খণ্ডপ্রতি সাতশত পঁচিশ টাকার ব্যয়ভার বহন করেও বইটির বৈষয়িক মূল্য নির্দ্ধারণ করা থেকে বিরত রইলাম। কারণ সাহিত্যরসিকের চোখে বইটি অমূল্য হবে বলেই আমি মনে করি। এই বই ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য ও রসিক পাঠকের জ্ঞান স্পৃহা নিরসন করতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত হোক। এটাই আমার প্রার্থনা।

এক বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছিলেন "Abnormally normal, gorgeously simple and wisely foolish"। আমার পূজনীয় গুরুজী পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পড়ে মনে হয়েছিল উপরোক্ত অভিধা মাত্র আর একজনের সম্পর্কে সুপ্রযোজ্য হতে পারে। তিনি হলেন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ।

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত বাংলা কথাসাহিত্য যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনই কোন অতি নিপুণ যন্ত্রশিল্পীও চেষ্টাকৃত উদাসীনতা ও অনাসক্তি দিয়ে তাঁর চেতনাকে সেনিয়া মাইহার (মৈহার) ঘরানার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন না। শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রবহমান ধারায় আচার্য আলাউদ্দিনের উপস্থিতি এতটাই ওতপ্রোত। অথচ উস্তাদ বাবা আমাদের কাছে প্রায় অজানা।

এখানে উল্লেখনীয় বাবার একান্ত প্রিয় শিষ্য ও সচিব পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য লিখিত "Ustad Alauddin Khan and His Music" (১৯৭৯) একটি সত্যানুসারী প্রামাণিক দলিল হলেও মূলত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় হওয়ায় তা সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবার ইংরাজিতে লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণবোধ্য হয়ে ওঠেনি।

১৯৯৬ সালে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের কাছে আমার ঈপ্সিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়ার অনতিবিলম্বে পণ্ডিতজীর লেখা 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' হাতে এসেছিল। এক নিশ্বাসে প্রথম খণ্ডটি শেষ করলাম। মনে হল ঘন তমিস্রার বুক চিরে বর্ণাঢ্য উদ্ভাসে অরুণোদয় দেখলাম। আমার সমুখে সঙ্গীতাচার্য মহামহিম রূপে প্রতিভাত হলেন। লেখক ছিলেন উস্তাদ বাবার একমাত্র শিষ্য, যাঁকে তিনি নিজ বাসভবনে আশ্রয় দিয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলত প্রতিনিয়ত খুব কাছ থেকে বাবাকে দেখার সুযোগ হওয়ায় লেখকের পক্ষে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সঙ্গে বাবার অন্তর্জীবনের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বইটি ঐতিহাসিক উপাদানে সম্পৃক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে যার সাহিত্যমূল্য অসীম। বইটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আর একটি দিনপঞ্জীর, শ্রীম কথিত "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ ক'টি বছরের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যা না পেলে পরমপুরুষ আমাদের কাছে অধরা থেকে যেতেন। শুধু জীবনী নয়, উস্তাদ বাবার সার্বিক মূল্যায়নে পণ্ডিতজীর প্রয়াস একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার (আশার ছলনে ভুলি) শ্রদ্ধেয় গোলাম মুরশিদের অনন্য অবদানের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

গভীর পরিতাপ ও হতাশায় বিষয় এই যে উস্তাদ বাবার মতো ক্ষণজন্মা সঙ্গীতসাধকের স্মৃতিরক্ষার কোন সার্বিক প্রচেষ্টা আজও করা হয়নি। তিনি এতটাই অজ্ঞাত যে তাঁর জন্ম সময়ও বিতর্কিত। তবে একট সুগভীর তৃপ্তির দিকও আছে। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মিলনের স্বার্থান্বেষী উদগাতাদের বিষাক্ত কুনজর এড়িয়ে ব্রহ্ম আজও অনুচ্ছিষ্ট। প্রার্থনা করি কালপুরুষের আশীর্বাদে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের "আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পুস্তকটির মাধ্যমে তাঁকে বাঙালি চিনুক জানুক স্মরণ করুক। একটি মহতী উপেক্ষার অবসান হোক।

"তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে"। সেই সুরের ধারায় অবগাহন করতে, তাঁর সত্তাকে স্পর্শ করতে, তাঁর মহত্ত্বকে আত্মস্থ করতে, তাঁর অবদানকে উপলব্ধি করতে, তাঁকে মননে চিন্তনে চৈতন্যে ধরে রাখার আকুতি নিয়ে পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে প্রয়াসী হলাম। গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় কেটে যাওয়া চন্দন মৃগনাভি সৌরভাকীর্ণ আমার শিক্ষা জীবনের শেষ কুড়ি বছরের স্মৃতির আবিলতায় আজও জারিত হই। এই স্মৃতিমেদুরতাই আমার অনুঘটক হয়ে আমায় উৎপিপাসু করেছে। উদ্যমী করেছে। উৎসাহিত করেছে। মৈহারে উস্তাদ বাবার নির্জন অনাড়ম্বর সমাধিভূমি দেখে চোখে জল আসে। হয়তো বা কেবলমাত্র "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষাকল্পে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের একক প্রচেষ্টার এক প্রকীর্ণ প্রতিফলন হয়ে ভবিষ্যতেও জাগরুক থাকবে।

আমার পূর্ববর্তী গুরুবর্গের অসীম কৃপায় আমি যেন একটু একটু করে বেনারসে গুরুজীর কাছে আমার সঙ্গীত শিক্ষাজীবনের (শিক্ষাকাল ১৯৯৬-২০১৬) শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ

অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। এক সামান্য তুচ্ছ অকিঞ্চনের আজীবনের মাধুকরী যাঁদের করুণা মমতা দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিল আমার সেই গুরুবর্গের স্মৃতিচারণ করে তাঁদের প্রতি আমার অপরিশোধ্য ঋণের বিনম্র স্বীকৃতি রেখে গেলাম। মূল পুস্তকের শেষে স্মৃতিকথাটি সংযোজিত হল। উপসংহারে জানাই, আমার স্বপ্নের বাস্তবায়নের তিন রূপকার হলেন পুত্রপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণগোপাল অনুজপ্রতিম অধ্যাপক ড. শতদল ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী জয়া সেন।

জন্মাষ্টমী, ১৬ই ভাদ্র, ১৪২৫
এসি ৪৫, স্ট্রিট নং ৪৩
নিউ টাউন
কলকাতা ৭০০১৫৬
Mobile : 98742-88158

ড. প্রণব সেন (Violinist)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
(রসায়ন বিভাগ)
স্কটিশ চার্চ কলেজ
কলকাতা ৭০০০০৬

ভূমিকা

বর্তমান হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে সরোদ বাদন শিল্পী শ্রী যতীন ভট্টাচার্য্য এম.এ. একজন প্রতিথনামা সঙ্গীতযোগী হিসাবে বরেণ্যপুরুষ।

আজ থেকে প্রায় চার শতক আগে সুরঋষি বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মাধ্যমে যতীন ভট্টাচার্যের পরিচয় জানতে পারি। বাবা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে কাশীর এক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান যতীন ভট্টাচার্য নামে একটি উচ্চশিক্ষিত তরুণ যুবা মাইহারে থেকে তাঁর কাছে সরোদ বাদন শিক্ষা করছে এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করছে।

সেই দিন সেই তরুণ যতীন বাবুর পক্ষে বাবার মতন একজন ঋষি প্রবরের সান্নিধ্য তথা সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব লাভ এবং সেই সঙ্গে তাঁর মত মহান তাপসের ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করার পরম সৌভাগ্য লাভ করা, যতীন ভট্টাচার্যের জীবনে নিঃসন্দেহে বিধাতার পরম আশীর্বাদ বলেই মনে করি।

কোলকাতায় যতীন বাবুর সাধনালব্ধ জীবনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে, বেশ কয়েক বৎসর আগে অনুষ্ঠিত 'তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন' কর্তৃক আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালে 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনী' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আমি নিজে সর্বপ্রথম যতীনবাবুর পরিবেশিত সরোদ বাদনের সঙ্গে তবলায় সাহচর্য করেছি বলে মনে পড়ছে। সেই অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে তবলায় সাহচর্য করে আমি খুবই আনন্দ লাভ করি এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দও পরম তৃপ্তি লাভ করেছিল। এর পরেও তার সঙ্গে আমি বেশ কয়েকবার তবলায় সাহচর্য করেছি।

সঙ্গীত বিষয়ক লেখক হিসাবে যতীন ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ওপর ইংরেজীতে একটি তথ্যনির্ভর আলেখ্য রচনা করেছিলেন, যতীন বাবুর বইটির নাম "Ustad Allaudding Khan and His Music"।

বাবার জীবন ইতিহাস সত্যভাসিত হয়ে সুধীজনের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন রয়েছে মনে করে যতীনবাবু তার প্রণীত উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের বেশ কিছুকাল আগে কলকাতায় আমার বাড়ীতে এসে একটি সাক্ষাৎকারে বাবার বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন। যেহেতু বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের দুজনেরই মত বিনিময় হয়। পরে যতীনবাবু প্রণীত উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং আমাকে উক্ত একখানা পুস্তক উপহার স্বরূপ যতীনবাবু দিয়েছিলেন।

ঐ একই উদ্দেশ্যে বাবার সম্বন্ধে আরেকখানি পুস্তক প্রণয়ণের জন্য যতীনবাবু প্রয়াসী

হয়ে উঠেন এবং বর্তমান এই গ্রন্থটি রচনার প্রাক্‌কালে যতীন বাবু আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার মনের অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করেন, এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান।

বাবার সম্বন্ধে আমি যা জানতে পেরেছিলাম, তার বাইরেও অনেক কিছু জানার ছিল। সে অজানা অনেক কিছু লোক পরম্পরায় জেনেছিলাম। যতীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বুঝতে পারলাম, অতবড় ধ্যানীপুরুষের জীবন ইতিহাস সঠিক মূল্যরূপে রচিত হওয়া জাতীয় কর্তব্য পালন স্বরূপ। বাবা আমার পরম শ্রদ্ধেয় জন, আর যতীনবাবুও আমার সবিশেষ স্নেহধন্য। যতীনবাবু এই কর্তব্যভার গ্রহণ করে এক পুণ্যধর্ম পালন করে চলেছেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি। গ্রন্থটির ভাষা, যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণিক তথ্যের সদ্ব্যবহার গ্রন্থটি বাংলা পাঠকের দরবারে যেমন সমাদৃত হবে তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে বলে বিশ্বাস করি।

হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২৩-০২-১৯৯২

ছেড়

সঙ্গীতে 'ছেড়' শব্দের অর্থ যে রাগকে পরিবেশন করা হবে, তন্ত্রীতে কয়েকটি স্বরকে আঘাত করে সেই রাগের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমার ছেড়, কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটি লিখলাম আমার সঙ্গীতগুরু বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের অদৃশ্য বা দেহাতীত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলবার জন্য।

সূর্যাস্তের পরে মানুষের গতিপথ নির্দেশ করে ধ্রুবতারা। আমার সঙ্গীতজীবনের ধ্রুবনক্ষত্র আমার উস্তাদ-কন্যা দেবী অন্নপূর্ণা। তাঁর আশীর্বাদই একটা স্বতঃপ্রেরণা। তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

বিমলদা অর্থাৎ বরণীয় সাহিত্যিক, অগ্রজপ্রতিম শ্রী বিমল মিত্র অসীম ধৈর্য নিয়ে আমার এই ভগীরথী প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ওঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া আভা বৌদিকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কারণ সর্বংসহা ধরিত্রীর মত দিনের পর দিন আমার অপটু সাহিত্য চর্চাকে তিনি স্নেহচ্ছায়া দিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে আমার মরুভূমি যাত্রায় এই পরিবারটা আমার কাছে মরূদ্যান স্বরূপ। অন্তরমুখী বিমলদা আর বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আমি কিভাবে কাছাকাছি এলাম সেটা আজ আর মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে করতে পারি যে সেই আশি সন্ থেকে এই প্রকাশনার দিন পর্যন্ত বিমলদা ছিলেন ধ্রুবতারার মতো আমার জীবনে।

আমার মনটা কোনকালেই খুব নীরেট পাথরে বাঁধান শক্ত ছিলো না। তাই মাঝে মাঝে বিশ্বাস আর আস্থার মৃতসঞ্জীবনীর দরকার হোতো। কাশীর সংকটমোচনের মহন্ত এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তু-বিজ্ঞানের বিভাগাধ্যক্ষ ডক্টর বীরভদ্র মিশ্র, আমার অগ্রজ শ্রী হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিপ্লবী সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ঘোষ, বিশ্বজিৎ দত্ত, কল্পনা পাণ্ডা, জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি হিতৈষীরা সকলে ক্রমাগত আমার কানের কাছে চরৈবেতির মন্ত্র পাঠ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ।

কথায় বলে, পরিবেশ না থাকলে কিছুই হয় না। সেটা বই লেখবার সময় বুঝেছি। আমার আপনজনেরা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের আনন্দোচ্ছল মুখরতাকে বছর দুয়েকের জন্য বনবাস দিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারি যে তাদের এই নীরব আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে আমার এই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হয়তো কিছুটা অগ্রসর হবার পরই গতিরুদ্ধ হত। তারাই এই মহাযজ্ঞের হবি প্রদান করেছেন।

আরো শতাধিক নাম উল্লেখ করতে পারলে খুবই আনন্দ হোতো কারণ এই সুকঠিন যজ্ঞে তাদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান আছে বলেই আমার পক্ষে এই দুরূহ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরিসরের অভাব মাঝে মাঝে বিড়ম্বনা ঘটায়। এখানেও তাই। সেজন্য

আমি অকপটে ক্ষমা চাইছি। এই যজ্ঞের পুরোহিত অজস্র সংগীত গ্রন্থ এবং ভ্রমণ কাহিনী প্রণেতা আমার শিষ্য শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী অনিন্দিতার আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতায়, এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এখানেই কথা শেষ করি, কারণ এর পরেই তো সুরু হবে সাধক গুরুর দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্নার অকথিত কাহিনী। অলমিতি।

যতীন ভট্টাচার্য

১২ই আশ্বিন, ১৪০১
ব্লক নং-৪, ফ্ল্যাট নং-১
মানস মন্দির কলোনী
বারাণসী-২২১০০৫

আমার কৈফিয়ৎ

ঠিক কৈফিয়ৎ কথাটা বলতে লোকে সাধারণতঃ বোঝে কোনো অপরাধজনিত ক্রিয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানর জন্য জোড়াতালি দেওয়া জবাব।

আমার কৈফিয়ৎ কবি নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ'-এর মতো। না চাইলেও যেন হুবহু আমার মনের সব কথা নজরুলের ওই কবিতায় পাই। আমার তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচাকে অনেকে ব্যঙ্গ করেছে। কিন্তু আমি স্বভাবসুলভ ভব্যতা বাঁচাতে, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার ধমক দিইনি।

যেহেতু এই বইটা একটি মহাজীবনী রচনার প্রচেষ্টা, তাই প্রচুর নাম এসেছে। সংজ্ঞায় আর সর্বনামে। এই নামগুলো কোনো না কোনোওভাবে আমার সাথে জড়িত। তাই সম্বন্ধের বন্ধনীটাকে তুলে তাদের সোজাসুজি নামেই লিখলাম। এটা কিন্তু কোনো অনাদর নয়। শুধু এই কাজটা করতে পারলাম না উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এবং তার স্ত্রী মদনমঞ্জরী দেবীর সাথে। কারণ ওঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কালাতীত। তাই তাঁরা আমার বাবা এবং মা।

আশা করি এই রচনার কুশীলবেরা জীবনের কক্ষপথে যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। হয়ত একটা দুটো কক্ষচ্যুত হতে পারে, কিন্তু আমি অপারগ। অনেক বাধা বিপত্তি উৎরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই গ্রন্থোক্ত কুশীলবের মধ্যে কিছু চরিত্রের অন্তর্ধান ঘটেছে যাদের মধ্যে রয়েছেন বিমান ঘোষ, শ্যাম গাঙ্গুলী, নিখিল ব্যানার্জী, হীরু গাঙ্গুলী, বাহাদুর খাঁ এবং আমার স্নেহাস্পদ ধ্যানেশ ও রবিশঙ্করের পুত্র শুভ শঙ্কর। এদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

জীবনতরঙ্গের কালসিন্ধু যাত্রা, মানবীয় ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয় কি?

গ্রন্থকার

ফোন : ৪৫-৫৭৫৯
২৯/১/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড
কলি-২৭

স্বামীর প্রতিনিধি হয়ে স্ত্রী কি কি করার অধিকারী এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধি আছে কিনা জানি না। তবুও কোথায় যেন শুনেছিলাম, স্বামীর যে কোন অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণতা দেওয়াই নাকি স্ত্রীর কর্তব্য। সেই নৈতিক কর্ত্তব্যের তাগিদায় আমাকে কলম ধরতে হল।

আমার স্বামী বিমল মিত্র সাহিত্যিক হিসাবে যদি পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের বই 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা'র ভূমিকা লেখার জন্য অঙ্গীকৃত হয়ে না থাকতেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর এ ব্যাপারে আমার খুব একটা দায় দায়িত্ব থাকতো না। কিন্তু এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যতীনবাবুকে তাঁর বিমলদা কথা দিয়েছিলেন "ভূমিকা লিখব"। নিছক মুখের কথা নয় "কাগজে লিখে দিলাম"। দাতা গ্রহীতার মাঝে আমাকে করা হলো সাক্ষী গণেশ। এক যুগেরও বেশি কাল ধরে যতীনবাবু, আমরা কাশী গেলে আমাদের সুহৃদ। আর উনি কলকাতায় আসলে আমরা স্বজন। বহুবার দেখেছি দাদা আর ভাই গভীর আলোচনায় মগ্ন। ৮৬ সাল নাগাদ আড়ি পেতে শুনলাম শিল্পী ভাই সাহিত্যের শরিক হয়েছেন।

৯০ সাল থেকে এক যোগে সম্পূর্ণ বইটাই যতীনবাবু তাঁর দাদাকে শোনালেন। আমিও পেলাম শ্রোতার স্বীকৃতি। সত্যিই বোঝানো যাবে না। যা ওঁর ইতিহাসে ছিল না কারো রচনার ত্রুটি সংশোধন। যতীনবাবু তাঁর ব্যাতিরেক।

তাই বলতে পারি নিজের সাহিত্য জগতের বাইরে, একমাত্র যতীনবাবু ও আমার স্বামীকে যুক্ত হতে আকর্ষণ করে, এবং সেইজন্যই মনে হলো কলম ধরি। উনি কি ভাবে বা কতটা লিখতেন জানি না, শুধু এইটুকুই জানি যে ওঁর এ বইটা সম্পর্কে অকৃপণ প্রীতি ও শুভেচ্ছা ছিল। আমার স্বামী আপাত সাফল্যকে মূল্য দিতেন না। বলতেন আগে এক শতাব্দী লোকে পড়ুক তো। তাই আমিও কামনা করি এ বই যেন লোকে এক শতাব্দী পড়ে। আর তার পর হয়ে ওঠে প্রামান্য ইতিহাস।

বিনীতা

১৩.৭.৯২ আভা মিত্র

২৪.৮.৮৮ তারিখে বিমল মিত্র মহাশয় ভূমিকা লিখে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে লিখেছিলেন, "প্রিয় যতীনবাবু, আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার লিখিত বই-এর ভূমিকা আমি লিখে দেবই।" কিন্তু তিনি অকস্মাৎ চলে গেলেন বলে আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। এই কারণেই তার হয়ে বৌদি লেখনী ধারণ করেছেন।

গ্রন্থকার

ফোন : ৪৫-৫৭৫৯
২৯/১/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড
কলি-২৭

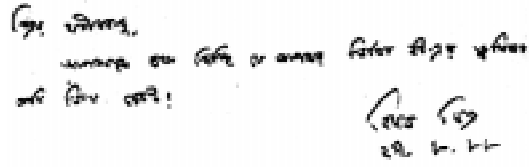

উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও আমরা

স্থায়ী

আমি লেখক নই। লেখা আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়। কোনদিন যে আমি বই লিখব, এ বাসনা আমার ছিলো না। গান বাজনা শিখতে গেলে যেমন অনুশীলন করতে হয়, লেখক হতে গেলেও ঠিক তেমনিই। কোনদিন কল্পনাও করিনি যে জীবনে আবার আমাকে বই লিখতে হবে।

১৯৭৯ সালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আমার প্রথম বই 'Ustad Allauddin Khan and His Music' লিখেছিলাম এবারেও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' বইটা লিখছি। উদ্দেশ্য হল উস্তাদ বাবা আলাউদ্দিন খাঁ-কে সাধারণ মানুষের কাছে অমর করে রাখা। উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে নানা মানুষের এবং নানা সঙ্গীত প্রেমীদের অনেক ভুল ধারণা আছে। তাঁর নাম সকলের জানা। কিন্তু সেই ব্যক্তিমানুষের আসল রূপটি বলতে গেলে অনেকেরই জানা নেই। এই বইটিতে আমি সেইটি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। ১৯৭৯ সালে যখন আমার ইংরাজি বইটা প্রকাশিত হয় তখন তিনি সেটি দেখে যেতে পারেন নি। অথচ তাঁরই আদেশ শিরোধার্য করেই আমি সেই বইটি লিখেছিলাম। বইটি ইংরাজিতে লেখার কারণ ছিল যে তা সকল ভাষাভাষির বোধগম্য হবে। এবার বইটি লিখছি বাংলা ভাষাতে। বাবা নিজে ছিলেন বাঙ্গালী তাই বাবার বাঙ্গালী ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে এ বই আরোও সমাদৃত হবে বলে আমি আশা করি। তবু বলি, এ বই আত্মপ্রচারের জন্য লিখছি না, বাবার চরিত্র এবং সঙ্গীত অনুরাগের আসল পরিচয় প্রদান করবার জন্যই এ বই লেখা। এর রচনাকাল ১৯৮৬ হতে ৮৮ সাল।

এ বই লেখার আরো একটা কারণ আছে। কারণটি হল, যে বাবার মত্যুর পর থেকেই বাবার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা জনসমাজে প্রচারিত হয়ে চলেছে। তার কিছু ইচ্ছাকৃত, কিছু অনিচ্ছাকৃত। বাবাকে মূলধন করে অনেকে অনেক রকমের ভুল তথ্য প্রচার করে চলেছেন।

আমি বাবার সঙ্গে একাদিক্রমে সাত বৎসর তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে একই বাড়ীতে বসবাস করেছি, আর কোনো শিষ্যই তেমনভাবে সে সুযোগ পাননি। তাঁর শিষ্য অনেকে আছেন, যাঁরা এখন দেশে বিদেশে সম্মানিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বাবা শুধু অসাধারণ সঙ্গীতশিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন এক প্রকৃত জীবনশিল্পীও। অনেকে বলে থাকেন যে মহাপুরুষদের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে নেই কারণ তাদের গুণাবলীর পাশাপাশি তাদের ক্ষুদ্রতাও নজরে আসে। কিন্তু বাবার অতি সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েও কখনও কোনোদিন তার মনের ক্ষুদ্রতার কোনো লক্ষণ পাইনি। তাই আগে বলেছি যে আমার মতো এত ঘনিষ্টভাবে তাঁকে দেখবার বা জানবার সুযোগ আর কারোরই ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর সন্তান এবং পরিবারজনের চেয়েও আমি ছিলাম একেবারে তাঁর ঘনিষ্ঠতম মানুষ। এর কারণ, তাঁরা সব সময়েই বাবার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতেন। বাবাও ছিলেন অত্যন্ত মিতবাক্ মানুষ। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন একেবারে কাছের মানুষ।

তিনি নিজেই আমাকে অনেকবার বলেছেন, 'তুমি আমার 'বুড়ো বয়সের ছেলে'। আমি মনে করি, এ আমার পক্ষে একটা বিরল সম্মান। তাই জনসাধারণের মন থেকে বাবার সম্বন্ধে যে সব ভুল ধারণা প্রচারিত এবং প্রসারিত হয়ে এসেছে, তা দূর করার জন্যই আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টা এবং প্রত্যক্ষভাবে বাবার আদেশ পালন করার প্রয়াস।

এ বইটি আমার আগেকার ইংরাজি ভাষায় লেখা বইটির পুনরাবৃত্তি নয়। সে বইটিতে আমি বিশেষ করে লিখেছিলাম তাঁর সঙ্গীতে অবদান সম্বন্ধে। এই বইটিতে আমি তাঁর ব্যক্তিমানুষের প্রতিফলনের বিশেষ চেষ্টা করেছি। মানুষ মাত্ররই সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা থাকে কিন্তু শিল্পী মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনাগুলো অন্যরকমের। আমার জীবনে সবচেয়ে দুর্লভ সৌভাগ্য যে আমি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ পেয়েছিলাম। শিল্পকে জানতে হলে শিল্পীকে জানতে হয়। শিল্পী মানুষ যদি ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে অন্যরকম হয় তাহলে তাতে কিছু ফাঁকি থাকে, কিন্তু বাবার মধ্যে কোনো ফাঁকির কারবারের অস্তিত্ব ছিলো না। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে তাঁর যদি একটুও অহংকার থাকতো কিংবা তিনি যদি একটু স্বার্থপর হতেন, তাহলে হয়তো তিনি জীবনে অত কষ্ট পেতেন না।

আমি ঘটনাচক্রে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। আমার জন্ম বারাণসীতে এবং তিনি থাকতেন মধ্যপ্রদেশের মৈহারে। এ সংযোগ কি করে ঘটল তা এখানে বলা দরকার। এও এক দৈব ঘটনা, নইলে তাঁর মত দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসা সম্ভব হোতো না।

বাবার অনেক বিষয় আগে আমার মনে হয়েছে 'অন্ধ সংস্কার'। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি অন্ধ দিকটাই সব নয়, কোনোটা 'সংযম' শেখায়, কোনোটা 'ধৈয', কোনোটা 'সহিষ্ণুতা' আনে, কোনোটা 'প্রশান্তি' কোনোটা 'ত্যাগ' শেখায়, কোনোটা 'মোহনাশ' করে, কোনোটা বা 'বিশ্বাসের মহিমা' বাড়ায়। অনেক কিছু মূল্য দিয়ে এ উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু শেষ মূল্য এখনও দেওয়া হয়নি বোধহয়, তাই কলম ধরতে হয়েছে। যদি এক পয়সাও বাবার গুণের মূল্য বুঝে সকলের কাছে তার কথায়—শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষার আদেশ পালন করতে পারি তা হলে নিজের জীবন সার্থক বলেই মনে করব।

এ একটা মহাভারত। আমি কেবল গণেশের কাজ করেছি। যেখানে দেবতা গণেশ সব বুঝে লিখেছিলেন, সেখানে বাবার অনেক কিছু ব্যাসকূট আমার কাছে অবোধ্য রয়ে গেছে। তাই ব্যাসদেবের মহাভারতের গণেশ প্রাজ্ঞ, আর বাবার জীবনের মহাভারতের আমি অনুলেখক মাত্র।

বাবা ছিলেন এক অনন্য মানুষ। তাই বাবার বিষয়ে লেখা বড় কঠিন। বাবা শেখাবার সময় বলতেন, 'চুম্বকের মত গ্রহণ করতে হবে। এক জিনিষ দুবার আর হাত দিয়ে বেরোবে না। চুম্বকের মত গ্রহণ করতে না পারলেও প্রথম ও শেষটা যেন ঠিক হয়। তাহলে শেখাবার সময় ফ্লোটা নষ্ট হয় না।' তার মানে কিন্তু এ নয়, মাঝে থাকবে শুধুই জোড়াতালি। বাবা একথাও বলতেন, 'যখন পরে একা বাজাবে তখনও মনে রাখবে প্রথম ও শেষ যেন খুব ভাল হয়। বাজাতে বসে প্রথমেই যদি বেসুরো হয়ে যায় তাহলে যতই ভাল বাজাও নিজের এবং শ্রোতাদেরও মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠবে। সেই রকম শেষটাও যেন সুন্দরভাবে শেষ হয়। সব

ভাল বাজিয়ে শেষ করার আগে যদি বেসুরো হয়ে যায়, তাহলে ভালো বাজনাও পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। নিজেরও মন খারাপ হয়ে যাবে, এবং শ্রোতাদেরও মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। উদাহরণ দিয়ে বলতেন, 'যেমন অনেক রকম উপাদেয় রান্না করে লোককে খাওয়াতে বসেছ। প্রথমেই শাকটায় যদি নুন না থাকে, তাহলে পরে যতই ভাল রান্না পরিবেশন কর না কেন তা সমালোচিত হবে। আবার সব ভাল খাবার খাইয়ে শেষকালে যদি দই ও মিষ্টিতে টক এবং দুর্গন্ধ ছাড়ে, তাহলেও সব ভাল খাবার চাপা পড়ে যাবে এবং শেষটাই চর্চার বিষয় হয়ে পড়বে।'

সঙ্গীতের মত কোনো বই লেখার ব্যাপারেও আমার মনে হয় এই কথাই প্রযোজ্য। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে বইয়ের প্রথমটা পড়লেই চুম্বকের মত টানে,গল্পটা শেষ না করে পারা যায় না এবং তার প্রথম ও শেষটা ভাল হলে বইটা স্মরণীয় হয়ে থাকে।

আমি এই বই লিখছি কর্তব্যবোধের তাগিদে। যাঁরা সঙ্গীত বোঝেন তাদের কাছে আমার সঙ্গীত চিন্তার পালা বদলের কথা জানানো কর্তব্যবোধের মধ্যে পড়ে, আর যাঁরা সঙ্গীত না বুঝে কলমের জোরে একজন সঙ্গীতজ্ঞর কাছে কিছু কথা শুনে ফলাও করে, কোনো কোনো শিল্পীকে নিয়ে নর্তন-কুর্দন করেন তাঁদের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই। নিপাত যান তাঁরা।

আমার নিজের লোকেরা আমার সম্বন্ধে সব জায়গায় প্রচার করেছে যে আমি খুব দেমাকী, দুর্মুখ। তবে সবিনয়ে একটা কথা বলতে পারি, নিজের প্রশংসা শুনে যারা খুশী হয় এবং নিজের নিন্দা যারা সহ্য করতে পারে না, আমি তাদের মধ্যে নই। আমার এই ব্যতিক্রমের জন্যই আমি নিজের লোকের কাছে অপ্রিয়। তার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই।

'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' লিখতে বসে বইটির শেষটাই আগে মনে আসছে। শেষটা মনে না এলে শুরু করাই বিপদ হয়ে ওঠে। তাই শেষ থেকে যখন ভাবতে ভাবতে শুরুতে এসে পৌঁছুই তখন লিখবার জন্য মনে প্রেরণা আসে।

কয়েক বছরের ইতিহাসকে চিত্রিত করতে গেলে বড় মাপের ক্যানভাস নেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীর বটগাছের অস্তিত্ব যেমন সত্য তেমনি টবের ফুলের গাছের অস্তিত্বটাকেও তো অস্বীকার করা যায় না।

তাই লিখতে গিয়ে ভাবছি শুরু করব কোথা থেকে। কাকে নিয়ে? কার কথা দিয়ে এ কাহিনী আরম্ভ করব। এই বইটির অনেক চরিত্রের অনেক ঘটনা দিয়ে শুরু করা যায়। যখন উস্তাদ বাবার বিষয়ে বই লিখছি, বাবাকে দিয়েই শুরু করা যায়। শুধু বাবা কেন, মাকে নিয়েও তো গল্প আরম্ভ করা যায়। বাবা মাকে বলতেন রত্নগর্ভা অর্থাৎ আলি আকবরের মত পুত্র এবং অন্নপূর্ণার মত কন্যা প্রসব করেছেন বলে। আলি আকবর এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়েও তো শুরু করা যায়। কিংবা যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অনেকের বারণ সত্ত্বেও বাবা নিয়েছিলেন অর্থাৎ নিজের কন্যা অন্নপূর্ণার বিয়ে দিয়েছিলেন রবিশঙ্করের সঙ্গে, সেই বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়েও তো শুরু করা যায়। এ ছাড়া বাবার পুত্রবধূ জুবেদা খাতুন এবং তার ছেলেমেয়ে কিংবা বাবার নাতি অন্নপূর্ণা দেবীর ছেলে শুভেন্দ্রশঙ্করকে নিয়েও তো শুরু করা যায়। মৈহার ছাড়ার আগে বাবা বরাবর বলতেন, 'এতদিন তো নির্জনে বাস করলে, কিন্তু

বাইরে যাবার পর দেখবে সঙ্গীতের মধ্যে কতবড় পার্টিবাজী। সঙ্গীতটা এখন গৌণ, যে দিকে দেখবে কেবল পার্টি পার্টি।' বাবার এই কথাটা মৈহার ছাড়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই বাবার ভাষায় 'পার্টি পার্টি' সেই নিয়েও তো গল্পের শুরু করা যেতে পারে।

কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশ্য বাবার গুরু উজীর খাঁকে নিয়েও আরম্ভ করা চলে। কিংবা বাবা বই লিখবার দিব্যি কেন দিয়েছিলেন তা নিয়ে আরম্ভ করলেও মন্দ হয় না। তা না করে সারা ভারতের যে কৌতূহল রবিশঙ্কর আর অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে, সেখান থেকেও এ গল্প তো আরম্ভ করতে পারি। আরো একটা উপায় আছে আরম্ভ করবার, সেটা হল বাবা কাকে 'কাফের' বলেছিলেন এবং যার জন্য সে সারাজীবন মনে প্রাণে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সেই ঘটনা নিয়েই শুরু করতে পারি। দেখাতে পারি এই একটা কথা কেমন করে এই বই এর একটা অসামান্য উপাদান হয়ে উঠলো।

এছাড়া ১৯৬২ সালে ভুলক্রমে বাবার যে শতবার্ষিকী ভূপালে এবং মৈহারে পালিত হয়েছিল, তার জের এখনও চলছে। এই ভুল শতবার্ষিকী সম্বন্ধে বাবাকে বোঝাবার কেউ ছিলো না, সেই সব ঘটনা নিয়েও গল্পের শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। পরের কথা পরে বলাই তো নিয়ম। তাহলে আগে বলছি কেন? পরের কথা আগে বলে রসভঙ্গ করব না। তাই তার আগেকার কথাই আগে বলি।

পারি তো সবই। কিন্তু আসলে হয়েছে কি, এটা গতি এবং ব্যস্ততার যুগ। আমরা সেই ব্যস্ততার যুগের অভিশপ্ত প্রাণী। কেউ আমরা বিশ্রাম নেবার বা অবসর গ্রহণের কথা ভাবতেই পারি না। যদিও সমস্ত মানুষের জীবনে একটা সময় আসে তখন তাকে অবসর নিতে হয়। কর্মক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। আর সেটাই সুখকর এবং স্বাস্থ্যকর। কিন্তু তা আমরা পারি না। পৃথিবী ছেড়ে আমরা যেতেই চাই না, অত সহজে কারোর জন্য একটা জায়গাও ছেড়েও দিতে চাই না। আমরা চলতে জানি থামতে জানি না।

কিন্তু আরম্ভ যখন করতেই হবে তখন আর এত ভূমিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। মানুষ চেনা আর মানুষ চেনানোর দায় দায়িত্ব সাধ করে কেন নিজের ঘাড়ে তুলে নিলাম? কে আমাকে এই দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? না শেষপর্যন্ত এদের কাউকে দিয়েই শুরু করব না। শুরু করি নিজেকে দিয়েই। কবে, কখন, কেমনভাবে প্রথমে বাবার সঙ্গে, মার সঙ্গে, বাবার ছেলে মেয়ে, ভূতপূর্ব জামাই রবিশঙ্করের সঙ্গে আলাপ হোলো, সে সব নিয়েই লেখা ভালো। না, এটাও ঠিক হবে না। এই আলাপের যোগসূত্রের পিছনে আমার সঙ্গীতের ব্যাকগ্রাউণ্ড কি ছিলো তা না লিখলে ঠিক ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না।

তাই তো ভাবি সারাজীবন কত লোক দেখলাম, কত মানুষের সঙ্গে মিশলাম, তবু মনে হয় কিছুই বোধহয় জানি না। কাউকেই যেন চিনি না। মানুষ চিনি বলে আমার যে এত অহংকার ছিলো তা কি এমনি করেই ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে? চারপাশের এই মানুষের সমাজ যেন হঠাৎ একদিন নূতন চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসে উদয় হয়। দেখে আমি অবাক হই, দেখে আমি চমকে উঠি, দেখে নিজেকেই আমি আবার নূতন করে চিনতে পারি।

আমার আঠারো বছর বয়স থেকে একটা বদঅভ্যাস চলে এসেছে। এই অভ্যাসটা আজও আমার অব্যাহত আছে। সেই অভ্যাসটা হ'ল এই যে যখনই কোনো ভাল বই পড়ি, তা থেকে কোন চিরস্মরণীয় সত্যের সন্ধান পেলেই তা আমি আমার নোটবুকে তুলে রাখি। কবে কোন বই থেকে কি কি অংশ আমার নোটবুকে তুলেছি, কোন লেখকের কোন বইয়ের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি আমার ভালোলাগার রসদ জুগিয়েছে তা আমার সবসময় খেয়াল থাকে না। আমার এই বইতে বাবার কথা বলতে গিয়ে সেগুলি যায়গায় যায়গায় হুবহু তুলে ধরেছি। তাই আজ সেই সব লেখকদের কাছে আজ আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চেয়ে ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি। আশা করি, তারা আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমাকে মার্জনা করবেন।

২

জীবনের সঙ্গে বোধহয় একটা অদৃশ্য আয়না বাঁধা থাকে, সেই দর্পণে কত লোকেরই মুখ না ভেসে ওঠে। একবার দেখা দিলেই তা স্থায়ী হয় না। তা কালস্রোতে মুছেও যায়। ফের হঠাৎ কখনও স্পষ্ট দেখায়। শেষ অবধি দু'চারজন ছাড়া বাকী সকলেরই প্রতিবিম্ব আয়না থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। কিন্তু সত্যই কি সব হারিয়ে যায়? হারিয়ে যে যায় না তার প্রমাণ আমার সেই ছোটবেলার কথা যা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। পুরানো দিনের ভাবনা চিন্তাগুলো বইয়ের পাতার মতো পর পর সাজানো আছে আমার মাথায়। কিন্তু সে সব লেখা কি সম্ভব হবে? কী জানি।

ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত নিজের ফুটবল খেলার সময়, বা অন্যের ফুটবল খেলা দেখার ফাঁকে অসংখ্যবার একটা শব্দ কানের ফাঁকে এসেছে। যার মানেও বুঝি। সেম সাইড। এই সেমসাইডটা আজকে বুঝি আমার জীবনে বোধহয় দিশারী তত্ত্ব। সম্পূর্ণ জীবনটাকে আধাআধি দুভাগ করলে আমার একত্রিশ বছরটাকে পাই হাফ টাইম। ফার্স্ট হাফটায় আমি প্রতিপক্ষের সাথে সাথে বিপক্ষের গোলপোস্টটাকেও শত্রু ভেবে নিয়েছিলাম। তাই সেটাকে গোল করাই ছিলো 'গোল'। সেকেণ্ড হাফেতে সকলে গোল পাল্টালো, কিন্তু আমার গোলটা আমার অজান্তেই অপরিবর্তিত রয়ে গেল। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকলেই যখন 'গোল' বদলে ফেলেছিলো, আমি কিন্তু প্রথম দিকের স্থির করা গোলটাকে তখনও শত্রু ভেবে চলেছি। লোকে বলবে 'সেমসাইড'। হয়ত তাই, কিন্তু সেম (shame) সাইড তো নয়, বাঁচোয়া। লোকে আমাকে বোঝায় পৃথিবীটা নাকি আপেক্ষিক। আমি ভাবি সত্যি তাই। কিন্তু ধ্রুবতারা? যাক এ কাঠবাদামের খোলা, ধীরে ধীরে ছাড়ানোই ভাল।

তখন আমার কতই বা বয়স হবে। সবে মাত্র পাঁচ বছরে পড়েছি। গায়ক বা বাদকের ছেলেরা যেমন পাঁচ বছরের আগেই গানবাজনা শুরু করে আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। প্রায়ই দেখা যায় সঙ্গীতজ্ঞর ছেলেরা জন্মাবার পরই সঙ্গীত শোনে। অবচেতন মনে সঙ্গীতের দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। তারপর যখন সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করে, খুব শীঘ্রই তারা পারদর্শী হয়।

আমি চারভাই এক বোনের মধ্যে ছোট ছিলাম। বাবা ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত। বেদান্ত

শুধু তার পাঠ্যই ছিলো না, ছিল আমাদের বাড়ীর জীবনদর্শন। কিন্তু পিতৃরূপী মহীরুহকে অবলম্বন করে আমার শৈশবের গুল্ম জীবন গড়ে উঠবার সুযোগ পায় নি, কারণ, আমার যখন এক বছর বয়স তখন তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। এক থেকে দশের মধ্যে পাঁচটি সন্তানকে নিয়ে আমার মা তখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

বাবা যে যশ বা অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাতে আমাদের সাধারণ ভরণপোষণ সম্ভব ছিলো। মার জীবনের মাত্র অবলম্বন ছিলো কথকথা ও কীর্তন শোনা। ছোটবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে যাবার ফলে কীর্তন আমাকে আকর্ষিত করত। ভালো লাগত খোলের বোল। প্রতিবেশী বাড়ীতে থাকতেন পিতৃবন্ধু পণ্ডিত বীরু মহারাজ, বাবাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তা ছাড়া ওঁর এক ছেলে ছিল আমার বন্ধু। সেই সুবাদে ওঁদের বাড়ী ছিলো আমার কাছে অবারিত দ্বার।

বীরু মহারাজ মজার মানুষ। প্রচুর জমিজমা ছিল। সাধারণ পড়াশোনার সাথে সাথে তিনি সঙ্গীত চর্চাও করেছিলেন। ভাল হারমোনিয়াম বাজাতেন, আর সে যুগের খ্যাতনামা হারমোনিয়াম বাদক মুনীমজী এবং সরোদী আমির খাঁ সাহেবের কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজজীর ঘরে একটা অদ্ভুত বাজনা ছিলো। সেটা আজকের পরিভাষায় ঠিক সরোদ নয়। ওটা অনেকটা হাঁসঝাড়ু ব্যাপার। একটু, রবাবের মত, একটু সরোদের মত আর আকারে অনেকটা সেতারের মত। রসিক লোক ছিলেন তিনি, বলতেন 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ'। তার বসার ঘরে ছিলো একগাদা বাদ্যযন্ত্র। বেহালা, এস্রাজ, হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার আর সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি। মহারাজজীর কিছু লোক চাই, যারা খাবে মহারাজজীর, সেবা করবে সঙ্গীতের, তাই মাঝে মাঝেই মহারাজজীর নূতন কম্পোজিসানের অর্কেস্ট্রা তৈরি হত।

আমরা সব ভাই ও বোনই ওঁর বাড়ী যেতাম। দিদির ছিলো খুব সেতার শেখার শখ। আমি যে হেতু পিঠোপিঠি, তাই আমাকেও কিছু শিখতে হবে মাথায় ঢুকলো। দিদি না শিখলে আমার হয়ত শেখার জেদ জাগতো না। কারণ যতদিন বড়দা মেজদা এবং সেজদা হারমোনিয়াম, গান এবং ভায়োলিন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আমার মাথায় শেখার পোকা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। যেই দিদি শুরু করল, সেই শুরু হোল আমার ঝোঁক। বড়দা মানুষটা বেসিক্যালি ঠাণ্ডা ছিল তাই ওর হারমোনিয়ামটার উপরই আমার ঝোঁক চাপল। একদিন ওরা যখন সব স্কুলে, শুরু করলাম হারমোনিয়াম বাজানো। তিন দশকের সিনেমার বিখ্যাত গান 'পিয়া মিলন কো জানা', সে সময় আমার বয়স দশ বছর মাত্র। একে শরীর খারাপ বলে স্কুলে যাই নি। তায় আবার হারমোনিয়াম বাজিয়েছি, অচিরাৎ অভিযোগ উঠল বড়দার কানে। ভাবলাম আজ কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু ঘটল উল্টো। বড়দা আমাকে হারমোনিয়াম বাজাতে বলল। আমি সিনেমার গানটা বাজালাম। বড়দা অবাক। আমি বড়দাকে বাজাতে দেখি রোজ। আমার বাজনা শুনে বড়দা দারুন খুশি। সন্ধ্যেবেলায় এ কথা বড়দা জানালো বীরু মহারাজজীকে।

লাভ হলো, বীরু মহারাজের সঙ্গীতের আসরে কল্কে পেলাম। বিকেলে একঘণ্টা বসতে

পারব। মহারাজজী বললেন, 'ভালো ভাবে হাইস্কুল পাশ করলে বাজনা শেখাবো'। স্কুল ছুটি। একদিন দুপুরে সকলের চোখ এড়িয়ে মহারাজজীর ঘরে ঢুকলাম। খুঁজে খুঁজে সেই যন্ত্রটিকে বাজালাম, যেটা সরোদের মত। জিদ চাপল, শিখি যদি এই রকমই একটা শিখব। যদিও মহারাজজীর কথামত আরও ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ঘটনাক্রমে কাশীর সংগীত পাড়া বলতে যে এলাকাটা বোঝায় সেটা আমার কৈশোরে, কবির চৌরা এবং ডালমণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীটা ছিল প্রচলিত ভাষায় নিষিদ্ধ পল্লী। কিন্তু এই পরিসীমানার বাইরেও একটা সাত্বিক 'মার্গ-সংগীতের' ধারা কাশীতে প্রবাহিত হোতো। সেটা ঘটনাক্রমে আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঙ্গালীটোলা এলাকায়। এ এলাকাটা অনেকগুলো ছোট ছোট পাড়া দিয়ে সম্বলিত, এর বিস্তার দশাশ্বমেধ থেকে সোনারপুরা পর্যন্ত। যদি খ্যাত এবং প্রতিষ্ঠালব্ধ শিল্পী যাঁরা এই এলাকার, তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে সংখ্যা কিছু কম হবে না। ধ্রুপদ শিল্পী শিবপ্রসাদ ত্রিপাঠী, বেণীমাধবজী, প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে রাম গাঙ্গুলি, সেতার শিল্পী মুস্তাক আলী খাঁ, রবিশঙ্কর এ রকমই প্রভূত শিল্পী জন্মসূত্রে এই পাড়ার প্রতিনিধি।

কিন্তু আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখব পারিপার্শ্বিক এবং সমকালীন শিল্পীদের ভেতরে। ঘটনাক্রমে আমার বাড়ীর কিছু দূরে ছিলেন দুজন অগ্রজ শিক্ষানবীশ, ভোলানাথ ভট্টাচার্য (সরোদবাদক) আর গুল্লুজী সেতারবাদক (জগন্নাথ দুবে)। ঘটনাক্রমে এঁদের আচরণে ছিল একটা বিচিত্র কন্ট্রাস্ট। একজনের কাছে কিছু জানতে চাইলেই উটপাখীর চাতুর্যের আশ্রয় নিতেন আর অপর জন ছিলেন সরল, সহৃদয়। হয়ত রাগের নাম জিজ্ঞেস করেছি, বিজ্ঞের মত, একজন উত্তর দিয়েছেন এটার নাম কল্যাণ বলে। অপরজন আড়ালে ডেকে বলেছেন না হে এটাকে ইমন বলে। ব্যাপারটা ছিল, তখন আমার বোঝার স্তরটা শুন্য পর্যায়ে। তাই একটা রাগ শুনলেই খাতায় লিখে রাখতাম আজ এই রাগটা শিখলাম।

সে সময় কাশীতে সাধারণ সংগীত পিপাসুদের জন্য বাৎসরিক বারো টাকা খরচায় থিওসফিকল সোসাইটিতে সঙ্গীত শোনার সুযোগ ছিলো। আমি সেই সুযোগটা হারাইনি। মাসে দুটো প্রোগাম, তার ফলে বছরে কয়েক ডজন ভারতবিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গীত শুনতে পেতাম। আমার পাড়ার সেই সরোদবাদক 'কৃপাসিন্ধু' ভট্টাচার্য একবার আলি আকবরকে কাশীতে নিয়ে এলেন। সোসাইটিতে বাজনা ছিল। ভদ্রলোক বড়দার বন্ধু। স্বাভাবিকভাবে তার শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। গিয়ে বললাম, দাদা, একবার আলি আকবরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন? কিন্তু তিনি সেই সময় আলি আকবর সম্বন্ধে এমন কিছু অশালীন মন্তব্য করেন যা আমার কিশোর মনকে খুবই বিচলিত করে এবং বাজনা শেখবার উৎসাহের আগুনে জল ঢেলে দেয়।

৩

এর ফাঁকে হাইস্কুল পাশ করেছি। বীরু মহারাজ তাঁর কথা মতো সরোদ দিয়েছেন। শুধু সরোদ দিলে তো হবে না, তার সাথে যে আমায় সময় দিতে হবে, সেটা বীরুজীর মনে থাকলেও ফরমাইসি মেজাজের আনন্দোচ্ছল বীরুজীর জন্য গুছিয়ে উঠতে অসুবিধা

হোতো। এই টানাপোড়নের ফাঁকে, শুনে শুনে নারকোল মালার টুকড়ো দিয়ে ডাডা আর ডিরি করে সবকিছুই নকল করার চেষ্টা করি। নকলে রপ্ত হলো ইমন আর কাফি। যদিও কোমল রে এবং কোমল গা আমার কাছে তখন হিব্রু। নোখ দিয়ে তার টিপলেই তো সুর বেরোয়, এর আবার আলাদা কী? প্রথম দিকে আমার সখটাকে হুজুগ ভেবে, মহারাজজী গা করেন নি, আর যখন গা করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

এর ফাঁকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। তখন আমার দাদাদের ইচ্ছে আমি যেন শিক্ষাটাকেই প্রাধান্য দিই। তাই মহারাজজীর বাজনাটা পাওয়া, পড়ে পাওয়া চোদ্দআনার মতো। তিন দাদারই বাইরে চাকরি হয়ে গিয়েছে আর দিদির শ্বশুরবাড়ী কলকাতায়। বাড়ীতে কূল্যে আমি আর মা। আর ছিলেন মায়ের মাতৃস্থানীয়া এক বিধবা ভদ্রমহিলা। পশ্চিমবাংলার বনেদী ঘরের বাল্য বিধবা। তাঁর উপরে আমার খানিকটা জোর ওজরের অধিকার ছিলো। তাই বেশী সাধনা না করেই তাঁর কাছ থেকে পেলাম দেড়শো টাকা। কেনা হোলো নতুন সরোদ। নেশার ঝোঁকের মত যে কোন জায়গা থেকে ডাক পেলে বাজাবার জন্য পাত পাড়ি। ইত্যবসরে বেনারস শহরে এসেছেন উস্তাদ হাফিজ আলী, মাথায় ঢুকলো উনিই আমার জীবনের ব্রেক থ্রু। একটা গোটা নারকোল নিয়ে হাজির হলাম। ভাবলাম উনি দীক্ষিত করবেন। মোহ ভাঙ্গতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না। বাস্তব আর আকাঙ্খার মধ্যে যে খাঁইটা ছিল, তার ভরতুকি করার ক্ষমতা আমার ছিলো না। যে যুগে পাঁচশো টাকায় একটা গোটা পরিবার এক বছর নিশ্চিন্তে দু বেলা খেতে পারতো, সে যুগে সমমাতৃক অর্থব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষাটা ছিল আমার মতো সাধারণ কিশোরের কাছে অলীক কল্পনা। তাই অচিরাৎ ব্যাপারটা 'খুদা হাফিজে' গিয়ে দাঁড়ালো। এর ফাঁকে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কাশীতে এসেছেন। খুব উৎসাহ নিয়ে গেলাম শুনতে। গ্রীনরুমে সামান্য কথা হল। কিন্তু পরিচয়ই সার। কাজ কিছুই এগুলো না। এর ফাঁকে বি. এ. পাশ করেছি।

তখন আমার তিনটিই শখ। বেতার জগৎ খুঁজে খুঁজে যাবতীয় শিল্পীর প্রোগাম শোনা, সরোদ হলে তো কথাই নেই। বিকেলে ঘন্টা দুয়েকের ফুটবল খেলা আর বন্ধু শংকর সিং এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘরোয়া জলসায় ইমন আর কাফির গৎ কুড়ি মিনিট, কুড়ি মিনিট বাজানো। এইরকম ছেলেমানুষির দিনে পরম বান্ধব গুল্লুজী আবার এগিয়ে এসেছিলেন। পরিচয় করিয়েছিলেন সৌখিন তবলা বাদক আশু ভট্টাচার্যর সাথে। গুল্লুজীর সাহায্যে, সান্নিধ্যে এলাম মহত্তম হৃদয়ের মানুষ, মিষ্টি হাতের পাখোয়াজ বাদক কাশীর প্রসিদ্ধ মন্দির সংকটমোচনের মহন্ত পণ্ডিত অমরনাথ মিশ্রের।

তখন আমি এম. এ. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। গুল্লুজী বললেন, 'যতই নারকোল নিয়ে হাফিজ আলী খাঁ-এর কাছে যাও, শিক্ষা বন্ধ করে গণ্ডা বেঁধে সরোদ শিক্ষার ম্যাও, সামলাতে পারবে না।' কিন্তু আমি তো গিয়েছিলাম ওর বাজনা শুনে। সেই সময় আবার সুযোগ ঘটলো আলাউদ্দিন খাঁর বাজান শোনার। মতি ঘুরতে মুহূর্ত সময় লাগলো না। মাথায় ঢুকলো এটাই আসল কাঠবাদাম। সকলেরই কিছু না কিছু নকল করতে পেরেছি, কিন্তু এঁর কিছুতেই দন্তস্ফুট করতে পারি নি। গুল্লুজীও সায় দিলেন। বললেন, কঠিন ঠাঁই।

’৪৯ সালের বেতারজগতে দেখলাম খাঁ সাহেবের প্রোগাম এলাহাবাদে। গুল্লুজী বললেন বারো আনাতো টিকিট, চলো না এলাহাবাদ ঘুরে আসি। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কিরকম ঠাঁই সে সম্পর্কে আশুতোষ অনেক আঁটঘাট বলে দিলেন। এ তত্ত্বের জ্ঞানটা রবিশঙ্করের বন্ধু হিসাবে এবং কয়েকবার খাঁ সাহেবের সঙ্গে বসার সুযোগটা পেয়ে উঁনি জানতেন। আমাদের ভালই হলো। কারণ ভোলা ভট্টাচার্য আমাদের কাছে যা বর্ণনা করে রেখেছিলেন তা শুধু ভীতিরই উদ্রেক করে। অবশ্য তার আগেরও কিছু ঘটনা আছে।

এর ফাঁকে একটা ঘটনা যা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য কিন্তু আমার কাছে অসামান্য তা উল্লেখ করতে চাই। তা হলো আটচল্লিশ সনের শেষাশেষি যখন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে দেখি বা কবিরাজ আশুতোষের মাধ্যমে পরিচিত হই। খাঁ সাহেব, আমি কী বাজাই জানতে আগ্রহ করেন। খুব স্পষ্ট মনে আছে আমি মুর্খের মতে শুধু বাজনাই বাজালাম না, তাঁর আপাত প্রশংসায় বিগলিত হয়ে আব্দার করে বসলাম গত রাতের সেই গৎখানা শেখাতে, যে গৎটা দিয়ে তিনি কণ্ঠে মহারাজকে ঠেকাবলে দিয়ে শ্রোতাদের মন দুলিয়ে দিয়েছিলেন। গা দোলানো, মধ্য লয়ের একটা আদ্ধা তালে গৎ। এই আদ্ধা বা সিতারখানি তালের বৈশিষ্ট হল বাঁয়ার কাজ অন্যরকম অর্থাৎ একটা গদগদ ভাব এবং এর মধ্যে শৃঙ্গাররস প্রধান। তখন যদিও ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। পরবর্তীকালে একমাত্র কণ্ঠে মহারাজই বাবাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন এই ঠেকাতে। অন্যথা প্রভূত রথী মহারথীকেও ল্যাজেগোবরে হতে দেখেছি। যাক্ সে প্রসঙ্গ পরে। আবদারের উত্তরে বললেন ‘শেখো’। মাত্রার আকারে ব্যাপারটাকে তো একটু রূপ দিতে পারছিলাম কিন্তু যে বোল বাজাচ্ছিলেন সেটা কেবল ছিল ‘ডা’ দিয়েই। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য খাঁ সাহেব বললেন যে এটা শুধু ‘ডা’ দিয়েই বাজায় না। উনি যখন ডা-রডা বললেন তখন আমার চমক লাগার পালা কারণ এ তাবৎ যাদের শুনেছি তাদের সকলেরই নকল করতে পারতাম, কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের এবং আলি আকবরের নকল করতে পারতাম না। তাই নিজেকে পণ্ডিতস্মন্য ভাবাটা আহাম্মকিই ছাড়া আর কি। খাঁ সাাহেবের এক রডার ঠেলাতেই হয়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ। যেন কঠিন পাথরে কেউ আছাড় দিলো আমাকে।

কামরায় উপস্থিত ছিলেন মতিলাল পরিবারের ননীগোপাল মতিলাল। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের অত্যন্ত প্রীতিভাজন। তিনি আমাকে অগ্রজ শিল্পীসুলভ মূল্যবান উপদেশ দিলেন। বললেন, ‘বোলের অভ্যাস না করলে বা পাল্টার সাধনা না করলে গম্ভীর সংগীত শিক্ষা সম্ভবই নয়। খাঁ সাহেবও উল্লসিত হয়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন। যাই হোক বেশ কিছু মাত্রায় পাল্টা খাঁ সাহেবের কৃপায় পেলাম। আমার সাথে ছিলেন গুল্লুজী। তাঁর মগজে তো ব্যাপারটা ঢুকল। আমার কোনো গুরুত্ব উপলব্ধি হোল না, বিপরীতটাই বুঝলাম, বোধ হয় শেখাতে চান না। তাই এ সব ঝামেলা বাড়াচ্ছেন। হতাশ হলাম। যদিও খাঁ সাহেব-এর কাছে শিক্ষা করতে পারি যখন সুযোগ পাই এবং এমন কি সুযোগ পেলে তাঁর মৈহারের বাড়ীতে গিয়েও শিখতে পারি এমন আশ্বাসও দিলেন।

গুল্লুজীর সাথে আলোচনা করে স্থির হলো, যাই যদি, তাহলে পড়াশোনাটা শেষ করে

যাওয়াই ভালো। যদিও এম. এ. পড়ার ফাঁকে ফাঁকে গুল্লুজীর প্রেরণায় ওঁনার প্রোগাম হিসাব মতো তারিখ দেখে আমরা যেতাম এলাহাবাদে। শিক্ষা করতে প্রতি মাসেই সান্নিধ্যের সুযোগ ঘটত। প্রতি বারেই খাঁ সাহেব দিতেন কিছু পাল্টা এবং বোল অভ্যাস করার জন্য। কিন্তু আমার কাছে তা ছিলো মাত্র পণ্ডশ্রম। তাই একদিকে উনি দিতেন আর আমি অপরদিকে বেমালুম ভুলে যেতাম, অর্থাৎ বাজাতাম না, কারণ মনে মনে ধারণা ছিল এ সব না শেখানোর বাহানা। এর আবার প্রয়োজন কী?

যাক, এখন থেকে শুধুমাত্র স্মৃতির উপর ভরসা না করে আমি ডায়েরীর পাতার উপর নির্ভর করতে পারি কারণ কৈশোরোত্তীর্ণ হওয়ার পরই আমার একাকীত্বের অন্যতম সাথী ছিল ডায়েরী লেখা।

চল্লিশ বছরের অর্বাচীন প্রৌঢ় আমার এই দিন পঞ্জিকাগুলো অনেকই ঘটনার সাক্ষী। কেমন করে কে, কবে, কখন আমার জীবনে এসেছেন বা আমি তাঁদের জীবনে স্থান পেয়েছি তার তামামির ইতিহাস এই পাতাগুলো।

আবার ওয়ান স্টেপ্ ফরওয়ার্ড থেকে টু স্টেপ্ ব্যাক হই। যদিও ব্যাপারটা ক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক অথবা সহজ সরল রসিকতা হোতো কিংবা এর কোনো সুদূরপ্রসারি পরিণাম না হোতো, তাহলে হয়ত মনে রাখার কোন ব্যাপারই থাকত না। কিন্তু ক্ষণিকের একটা কথা নিজের স্বার্থে বা দায় বাঁচাবার জন্য কোনো সুহৃদের কোনো অ-সুহৃদ আচরণ, যা জুতো মেরে গরুদানের পর্যায়ে পড়ে, না চাইলেও মনে রাখতেই হয়। ব্যাপারটা হলো যাঁদের মাধ্যমে আমি খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম তাঁদেরই একজন কাল্পনিক ঝামেলা এড়াবার জন্য, যেমন আমার খাঁ সাহেবের সাথে পরিচয়ের সময়, আমার পিতৃপরিচয় এবং আমার গুণবত্তা সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিলেন, সঙ্গে তেমনি আবার প্রশংসার সঙ্গে এক বালতি দুধেতে সামান্য গোচনা ছাড়তেও ক্ষান্ত হন নি। বাক্যে পূর্ণ বিরাম না করেই বলেছিলেন, ‘সবই ভালো কিন্তু চঞ্চল।’ ভেবেছিলেন যদি শিখতে গিয়ে কোনো ঝামেলা বাঁধাই তাহলে পিষ্ঠ এবং মুখ দুইই বাঁচবে কারণ আগেই বলে রেখেছেন চঞ্চল।

পরিচয়ের আনন্দের আতিশয্যে বুঝতেই পারিনি ছোট্ট কামড়ের বিষের তীব্রতা কতটা হতে পারে। পরে বুঝলাম জল অনেক দূর গড়াবে।

আলাপে রাগের রূপ দাঁড় করানো কঠিন। তাই একটা স্মৃতির প্রদীপ জ্বাললাম। আমি মাত্র ডায়েরির সে কটা পাতাকেই গণ্য করব যারা আমার জীবনের সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত দিনগুলিকে ধরে রেখেছে। বাকী কটা পাতাতো কথার কথা। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী বলতেন, ‘শিক্ষাটা শিশুর শরীরে তেল মালিশের মত। শুধু চ্যাবড়া চ্যাবড়া তেল লাগালেই মালিশ হয় না। শিক্ষক আর সংস্কারের কোমল হাতেতে, সারা গায়েতে প্রলেপ ছড়িয়ে দেওয়াতেই হল যথার্থ শিক্ষানিবেশ। মেরুদণ্ড শক্ত হয়। শিশু সোজা হয়ে দাঁড়ায় আর মাথাটা নীচু করে। বিদ্যাঃ দদাতি বিনয়ং।’ মালব্যজীর এই বক্তৃতাটা ছিল সহজ ভাষায় কিন্তু তত্ত্বটা ছিল দুর্গম, কারণ কাগুজে জ্ঞান নিয়ে যখন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোই তখন জানতাম না ফলিত জীবনটা কত দুরুহ। এই প্রসঙ্গে এক পাঠানের গল্প মনে পড়ে। মা হারা

ছোট্ট মেয়েটাকে পাঠানটা বলত, সবুজ কাঁটার মেহেদী যত যত্ন করে পিষবে তত লাল রঙ্গ দেবে। অর্থাৎ অবুঝ মনের সবুজ রং কঠিন বাস্তবের নিষ্পেষণে যত পিষ্ট হবে, তত লাল রং বেরোবে।

১৯৪৯ থেকে শুরু হল আমার মেহেদী পেশার দিন। পিষে চলেছি লালিত্যের আশায়। হয়ত দৈনিক একটা পাথর তুলে লোহায় ছুঁইয়ে চলেছি, আগে দেখতাম, এখন দেখি না লোহাটা সোনা হয়ে গিয়েছে কী না। হয়ত বা সোনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার জীবনে কোনো সনাতন এখনও আসেন নি যিনি আমাকে ব্যর্থ পরশ থেকে, খোঁজা থেকে নিবৃত্ত করবেন এবং বলবেন, মণি মণি করিস কারে, এমন কত শত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

যাক, চিন্তার এলোমেলো হাওয়ায় কথার আঁচল উড়িয়ে লাভ নেই। যৌবনের চঞ্চল স্মৃতিকে লিখে রেখেছি সেটা তিথিগত অধ্যায়ে ভাগ করব আর প্রৌঢ়ত্বের বিদগ্ধ অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিচারণ করব। সংক্রান্তির কোন তিথি হয় না কারণ আমার উপসংহার অনেকেরই শিরেসংক্রান্তি হবে।

১৯৪৯ সাল। বাড়ীর বাইরে পরিচিত এবং অপরিচিত বাড়ীর অনেক অমনিবাস দেখলাম। কিছু গ্রুপ ছবি এবং কিছু একক। তখন ভাবতে পারিনি ছবিগুলো মূর্ত হয়ে পরিচিত হবে। এ যেন হঠাৎ একতারায় বাঁধা গান নিয়ে রাজসভায় প্রবেশের মতো, যেখানে আগে থেকে বাজছিল শততন্ত্রী। আমার সুর ক্ষুদ্র হলেও হারিয়ে যাবে এ কথাটার সঙ্গে, আপোষ করতে পারিনি তাই ১৯৪৯ থেকেই শুরু হয়েছিল স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স। আজকে মোহানার কাছে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারি, হয়ত ছাপিয়ে উঠিনি কিন্তু ধামাচাপা পড়েও থাকিনি। প্রতি অক্টেভে ঘটনার থেকে একপর্দা ওপরেই আমার সুর বাঁধা ছিল। একটু বলগাবিহীন অসত্য হলেই ছাপিয়ে উঠতে পারতাম কিন্তু হারমনি ভেঙ্গে যাবে, ওটাই ছিল ভয়। যাক্, ভাঙার এই জোড়ের অঙ্গ দু'একজন গুণীকে তৃপ্ত করলেও সাধারণের কাছে জগদ্দল, তাই এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

যেমন মনের ক্যাসেটে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, আলি আকবর, রবিশঙ্কর, এদের সঙ্গীতকে ধরে রাখতাম, তেমন পাদপ্রদীপে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে এদের ছবিটা মনের ক্যাসেটে ভিডিও করে রাখতাম। বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মনেতে একটা দৃশ্যশ্রাব্য সুখ পেতাম, হঠাৎ কোনো পূণ্যের ফলে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সাদা চোখেই ধরা পড়লেন। ভেবেছিলাম, মেকআপের পরের সিনেমার হিরোর আর স্নানের পরের হিরোর রং-এর বোধহয় তফাৎ হবে কিন্তু ব্যাপারটা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে আদৌ ঘটেনি। মঞ্চের গান্ধীটুপি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, জোববা, পায়জামা, কাপড়ের পামশু, এবং তার সাথে সাথে অমায়িক বিরক্তি প্রকাশ। (যদিও সেটা স্পষ্ট ও প্রকট হ'ত স্থান কাল পাত্র বিশেষে।) ঠিক তাই দেখলাম এলাহাবাদের কৈলাশ হোটেলে।

আগেই লিখেছি '৪৯ সালের বেতার জগতে দেখলাম খাঁ সাহেবের প্রোগাম এলাহাবাদে। পয়লা ফেব্রুয়ারীতে গুল্লুজীর সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছলাম। গুল্লুজীর পরিচিত

একজনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। স্নানাদি সেরে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম কৈলাশ হোটেলে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু কবিরাজ আশুতোষ খাঁ সাহেবকে দাদু বলে সম্বোধন করতেন তাই সে সময়ে গুল্লুজী এবং আমিও দাদু বলেই তাঁকে সম্বোধন করতাম। আমাদের দেখে খাঁ সাহেব খুব খুশী। বললেন, 'আজ আমার রেডিওতে প্রোগাম আছে, তোমরা চলো আমার সঙ্গে।' সানন্দে গেলাম রেডিও স্টেশনে। খাঁ সাহেব বাজালেন রাগ 'নট'। মনে মনে গুনগুনিয়ে রাগটি ভাবলাম শিক্ষা হয়ে গেল।

পরের দিন আবার হোটেলে দেখা করলাম। খাঁ সাহেব সম্বন্ধে বরাবর শুনে এসেছি, খুব রাগী লোক, কিন্তু এমনভাবে অভ্যর্থনা করলেন যে অবাক হলাম। কত সহজ এবং সরল ব্যবহার। খাঁ সাহেব এবারেও কিছু অলঙ্কার অর্থাৎ পাল্টা এবং বোল দিলেন সাধনা করার জন্য। মনটা তৃপ্ত হোল না। ভাবলাম কি এ সব বাজে জিনিষ দিচ্ছেন, গৎ, আলাপ এ সব কিছুই তো শেখাচ্ছেন না। গুল্লুজী পরিণত ছিলেন বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'এই সব রিয়াজ করলে, পরে খুব সুবিধা হবে।' কিন্তু মন থেকে তখনও আসল না নকল গ্রহণ করতে পারিনি। রেডিওতে সেদিন শুনলাম পুরিয়া ধ্যানেশ্রী, খাম্বাবতী কাম্বাড়া এবং গারা। এরপর এলাহাবাদ থেকে কাশী ফিরে এলাম।

কাশীতে এসেই শুনলাম পরের দিন রবিশঙ্কর কাশীতে আসছে। রবিশঙ্করের অনেক গল্প শুনেছি কবিরাজ আশুতোষের কাছে। আশুতোষ ও রবিশঙ্কর কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে ক্লাস টু অবধি একসঙ্গে পড়েছে এবং তারপরই রবিশঙ্কর কাশী থেকে চলে গেছে। আশুতোষের কাছে বহু গল্প শুনেছি রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবী সম্বন্ধে। কবিরাজী পড়বার সময়ে দিল্লীতে থাকাকালীন রোজ রবিশঙ্করের সঙ্গে আশুতোষ তবলা বাজাত। রবিশঙ্কর মারফত আলি আকবর এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয় তার, এবং সেইজন্য এঁদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন আশুতোষ। যাক, যে কথা বলছিলাম, রবিশঙ্কর আসছে শুনে আশুতোষকে বললাম, 'স্টেশনে আমিও যাব, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

পরের দিন আশুতোষের সঙ্গে স্টেশনে গেলাম। সকাল সাতটায় ট্রেন এলো। চুড়িদার পায়জামা, পাঞ্জাবী, চোখে গগল্স, লম্বা চুল, ধবধবে গায়ের রঙ দেখে প্রথম দর্শনেই খুব ভাল লাগলো রবিশঙ্করকে। মনে হোল নাচিয়েদের মত চেহারা। আশুতোষের সঙ্গে কোলাকুলি করল রবিশঙ্কর। সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতেই, আশুতোষ আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'দাদুর অর্থাৎ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে শিখছে এবং এ বছরেই এম. এ. পরীক্ষা দেবে। রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'এম. এ. পরীক্ষার পর কী করবে?' উত্তরে বললাম, দিল্লী রেডিওতে একটা চাকরির জন্য খবরের কাগজে এ্যাডভাটাইজমেন্ট দেখে দরখাস্ত করেছি, সেই চাকরিটা যদি পাই তাহলে চাকরি করব এবং সরোদ বাজাব। লেখাপড়ার সঙ্গে বাজনাও বাজাচ্ছি জেনে সে খুব খুশী হল। রবিশঙ্কর আশুতোষের বাড়ীতে গিয়ে উঠল।

সন্ধ্যের সময় রবিশঙ্করের বাজনা হল আশুতোষের বাড়ীতেই। বাড়ীর বৈঠকখানায় গুল্লুজী, আমি এবং বহু গাইয়ে বাজিয়েতে ভরে গেল। রবিশঙ্কর বাজাবার আগেই বলল 'কর্ণাটক' রাগ 'বাচস্পতি' বাজাবে। এ নাম তো কখনও শুনিনি। আশুতোষ সঙ্গত করল।

এ যাবৎ যত সেতার শুনেছি তার থেকে একেবারে আলাদা মনে হলো। বাজনার পর যাঁরা গুণীজন ছিলেন, নানা বিরূপ মন্তব্য করলেন অবশ্যই আড়ালে। গুল্লুজী কিন্তু খুব প্রশংসা করলেন।

পরের দিন সকালে আশুতোষের বাড়ী গিয়ে দেখলাম রবিশঙ্কর বাজাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম 'কী রাগ?' উত্তরে সে বলল, 'রাগ ভৈরব।' তারপরে বাজালো তিলকমাঝ। ঠিক হল রাত্রে বাজনা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গত করবেন কণ্ঠে মহারাজ। যথারীতি রাত্রেও গেলাম বাজনা শুনতে। রাত্রে রবিশঙ্কর বাজালো তিলকমাঝ এবং কাফি। বাজনা খুব জমে উঠল কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে।

পরেরদিন রামকৃষ্ণ মিশনে বিকেলবেলায় বাজনা হল। রবিশঙ্কর বাজালো মূলতানি এবং পিলু। সঙ্গে আশুতোষ সঙ্গত করল। রাগের নাম জিজ্ঞেস করি আর আমার রোজনামচার খাতায় লিখে রাখি। মনে মনে গুন গুন করি এবং বাড়ীতে গিয়ে বাজাবার চেষ্টা করি।

রাত্রে কাশীর টাউন হলে তখন এগ্‌জিবিশন চলছিল। রবিশঙ্কর, আশুতোষ, গুল্লুজী, মহন্ত অমরনাথ মিশ্র এবং আমি গেলাম টাউন হলে। রবিশঙ্কর কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলল, যেমন আমার কে কে আছেন, কি বিষয়ে পড়ছি, কতদিন হল শিখছি ইত্যাদি। কথায় কথায় রবিশঙ্কর বয়স জিজ্ঞেস করল। আলোচনায় বোঝা গেল আমার থেকে ছয় বছরের বড় এবং আলি আকবর আমার থেকে চার বছরের বড়। বোঝা গেল সবচেয়ে বড় অমরনাথ মিশ্র, তারপরে ক্রমানুসারে গুল্লুজী, কবিরাজ আশুতোষ, রবিশংকর, আলি আকবর এবং সর্বকনিষ্ঠ আমি। রবিশঙ্করের ব্যবহারে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম কবে এরকম বাজিয়ে হতে পারব।

চতুর্থ দিনে রবিশঙ্করের সঙ্গে মোগলসরাই গেলাম এবং রবিশঙ্কর দিল্লী চলে গেল।

রবিশঙ্করের যাবার কিছুদিন পর, রেডিওর চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন দেখে যে দরখাস্ত করেছিলাম তার ফর্ম এলো। সঙ্গে সঙ্গেই ফর্মভরে পাঠিয়ে দিলাম অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দিল্লীতে।

কয়েকদিন পর দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে টেলিগ্রাম এলো, অফারিং ইট ওয়ান ইয়ারস্ কনট্রাক্ট উইথ রবিশঙ্কর সারভিসেস অল ইণ্ডিয়া মান্থলি স্যালারি রূপিস্ থ্রি হানড্রেড টুয়েন্টি অল ফাউন্ড। পরেরদিন এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এডমিট কার্ড পাব। তাই রেডিওতে লিখে দিলাম তেরো দিনে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সুতরাং আমার জয়েনিং ডেটটা দয়া করে এক্সটেণ্ড করে দেওয়া হোক। ২৭ এ মার্চ আমার পেপার হয়ে গেল।

রেডিওতে আমার আবেদন স্বীকৃতি পাবে কী না, এর জন্য চিন্তায় রইলাম। পাঁচ দিনের মাথায় রেডিও থেকে টেলিগ্রাম পেলাম, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই যেন রেডিওতে জয়েন করি। মনে মনে খুশী হলাম। কিন্তু আমার দুইজন শুভচিন্তকের একজন গুল্লুজী বললেন, 'রেডিওর চাকরি না করে মৈহারে গিয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা করতে।' অপর শুভচিন্তক আশুতোষ বললেন, 'এত ভাল চাকরি ছেড়ো না, চাকরি করো এবং দিল্লীতে রবিশঙ্করের কাছেই সরোদ শেখো।

বহু চিন্তা করে স্থির করলাম রেডিওর চাকরিই করব। এবং সেখানেই শিক্ষাও হবে। খাঁ সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দিলাম রেডিওর চাকরি নিয়ে দিল্লী যাচ্ছি। খাঁ সাহেব দিল্লীতে এলে তাঁর কাছে শিক্ষা করব। দিল্লীতে গিয়ে রেডিওর চাকরি নিলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম রবিশঙ্কর খুব বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট স্যার শ্রীরাম-এর বাড়ীতে গেস্ট হয়ে আছেন। একস্টারন্যাল সারভিসে ডাইরেক্টরে তিনশো কুড়ি থেকে একহাজার এর গ্রেডএ, প্রথমেই রবিশঙ্কর এক হাজার টাকা পাচ্ছে। রবিশঙ্কর অরকেস্ট্রা তৈরি করছে। দোটানায় পড়লাম, এ কোন চাকরিতে এলাম। রবিশঙ্করের কাছে শুনলাম স্যার শ্রীরাম এই চাকরি করে দিয়েছেন রবিশঙ্করের জন্য। আগে বম্বেতে রবিশঙ্করের যে অর্কেস্ট্রা ছিল সেই সব শিল্পীকেই চাকরিতে নিযুক্ত করেছে। এ ছাড়া কিছু আরও নতুন শিল্পী এতে নিযুক্ত হবে।

রবিশঙ্করের কাছে শুনলাম তার বর্তমানে অনেক দেনা হয়ে পড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে চাকরি নিয়েছে। আমারও ডিসিশন নিতে দেরী হলো না। সাত দিন চাকরি করে রেজিগনেশন দিয়ে কাশীতে চলে এলাম। কারণ যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পাওয়া থেকে শিক্ষা করাই শ্রেয়স্কর।

কাশীতে এসেই শুনলাম দেরাদুনে মিউজিক কন্‌ফারেন্সে আশুতোষ, গুল্লুজী, এবং সঙ্কটমোচনের মহন্ত অমরনাথ মিশ্রজী যাচ্ছেন। ইচ্ছা হল কন্‌ফারেন্স শুনে আসি।

দেরাদুন কনফারেন্সে গিয়ে দেখলাম আলি আকবর এসেছে যোধপুর থেকে। কবিরাজ আশুতোষ আমার পরিচয় করিয়ে দিলো আলি আকবরের সঙ্গে। আলি আকবর আমাকে বললেন যোধপুরে গেলে আমাকে রেডিওর চাকরি করিয়ে দেবেন। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে সে চাকরি মনঃপুত হলো না। স্থির করলাম, এসব চাকরি, করলে সঙ্গীত শেখা হবে না। কারণ আমরা বিশ্বাস যে আলাউদ্দিন খাঁর কাছে গিয়ে শিখলেই আমি উস্তাদ হবে যাব।

প্রায় প্রত্যেক মাসেই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা করতে যাই, যে সময়ে তিনি রেডিওতে বাজাতে আসেন। সেই সময়ে আমার পরীক্ষার পাশের খবর শুনে আলাউদ্দিন খাঁ খুশী হলেন। খাঁ সাহেবের খুশীভাব দেখে হঠাৎ একদিন সাহস করে বললাম 'যদি' আমি মৈহারে গিয়ে শিক্ষা করি, তাহলে আপনি আমাকে শেখাবেন কী না? খাঁ সাহেব খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'নিজের বাড়ী ভেবে যদি আসো তাহলে খুব আনন্দের সঙ্গে শেখাবো। আমার নাতিরা মৈহারে আছে। তোমার মতো লেখাপড়া করা ছেলে গেলে নাতিরাও উপযুক্ত একজন গারজেন পাবে এবং তোমার কাছে কিছু লেখাপড়াও শিখবে। মৈহারে আমি নাতিদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিনি। ছাত্র রেবতীরঞ্জন দেবনাথ চলে গেছে। আমার দেশের লোক। মৈহারে আশিসকে যৎসামান্য পড়িয়েছে। তুমি গেলে তাদের লেখাপড়া বাড়ীতেই হবে। তবে মৈহারে গেলে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে, মতি স্থির করে এসো।' মনে উৎসাহ পেলাম।

দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। পূজার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে মৈহারে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-কে একটা চিঠি দিলাম। চিঠিতে নিজের মনের কথা জানালাম, কি করে স্থায়ীভাবে শিক্ষা হতে পারে। উত্তর পেলাম সে চিঠির। এই চিঠিই আমার গতি ঘুরিয়ে দিল।

আগেই লিখেছি, যে হেতু আশুতোষ আলাউদ্দিন খাঁকে দাদু বলে সম্বোধন করত, তাই আমিও তাঁকে দাদুই বলতাম।

অত্যন্ত স্নেহময় চিঠিটা যেমন পেয়েছিলাম সেটা ছাপাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। আগেই লিখেছি এই চিঠিটা আমার গতি ঘুরিয়ে দিল। এই চিঠিটা পড়লেই পাঠক-পাঠিকার কাছে স্পষ্ট হবে কেন আমি মৈহারে যাওয়ার সঙ্কল্প নিলাম। সাতই অক্টোবর এ চিঠিটা পেলাম। খাঁ সাহেবের হাতের লেখা খুব টানা। পাঠক পাঠিকাদের পড়তে যদি অসুবিধা হবে তাই হুবহু চিঠিটা লিখে দিচ্ছি।

মাইহার স্টেট
৫-১০-৪৯
সি আই

কল্যাণবর

স্নেহের দাদু, তুমার শ্রী শ্রী বিজয়ার প্রণাম স্নেহ আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেম, তুমার দিদিমার আশীর্ব্বাদ ও আমার, বিজয়ার স্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও। শ্রী শ্রী জগৎ জননী মাতা ভগবতির শ্রী চরণে প্রার্থনা করি তুমায় চিরজিবি, তুমার মন কামনা পূর্ণ করে জগতে তুমায় শ্রেষ্ঠ পদ দান করেন। আমি তুমায় বলে এসেছি তুমার ভক্তী বিশ্বাস যদি অচল হয় ও মনপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস হয় আমার কাছে তুমার মন কামনা পূর্ণ হবে। বিশ্বাস করিতে পার তবে নির্চ্চয় আসিবে, যে সময়ে ইচ্ছা অধিক বলিবার আমার কিছু নেই। ঐ দিন মাইহারে মঙ্গল মতে পৌঁছিয়াছি। কুন রূপ কষ্ট হয় নাই, রেল যাত্রায় আমরা দুইজনই ছিলেম ঐন্য যাতৃ উঠে নাই বেশ আনন্দে এসেছি। এক প্রকার আছি তুমাদের কুশল কামনা করি।

শ্রীমান যোতীন্দ্রনাথ ইতি
স্বরদিয়া কাশী নিবাসী দাদু

অতঃপর আমার পরম শুভচিন্তক গুল্লুজী নিজের স্ত্রীকে বললেন একটা ভাল দিন দেখে দিতে আমার যাত্রার জন্য। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। গুল্লুজীর শ্বশুর মহাশয় বড় তান্ত্রিক ছিলেন। এবং জ্যোতিষের চর্চাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। গুল্লুজী তাঁর স্ত্রীর নিকট জ্যোতিষ চর্চাও করেন। গুল্লুজী ও তাঁর স্ত্রী বহু বিচার করে বললেন ষোলই অক্টোবর যাত্রার জন্য উত্তম দিন। এই দিন যাত্রা করলে খাঁ সাহেব যতই রাগী হোন, আমার প্রতি প্রসন্ন থাকবেন এবং শেখাবেনও।

আর দেরী না করে খাঁ সাহেবকে চিঠি লিখে দিলাম মৈহারে যাচ্ছি। কাশীর একটা ছোট্ট গলির মধ্যে কিছু চেনা মানুষ যেন অত্যন্ত আপনার হয়ে গিয়েছিল। তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমারও সুখ দুঃখ মিশে গিয়েছিল। তবু এরই মাঝখানে আমার জীবনে ছন্দপতন ঘটল। এই শহরের সব মোহ ত্যগ করে একদিন যে আমাকে অন্যত্র পাড়ি দিতে হবে তা কে জানত? নাবালক, বালক আর তেইসের একটা কিছু করে বসবার ঝোঁক তখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমি মৈহারে চলেছি। তখন কি জানতাম, মৈহার যাওয়াটা আমার কাছে

আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত? এতক্ষণ চলছিলো পটভূমিকা। এবার গল্প শুরু। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে আর নয়। ষোলই অক্টোবরে মার কাছ থেকে আশি টাকা নিয়ে অতি প্রত্যুষে এলাহাবাদে যাত্রা করলাম। একটু পরে দরজা খুললেন খাঁ সাহেব এবং আমাকে দেখেই বললেন 'আরে! এসেই গেছ সাহস করে?' পাশের ঘরে দুটো খাট দেখলাম পাতা আছে। খাঁ সাহেব আমার জন্য মশারি টাঙ্গিয়ে দিলেন। এত রাত্রে এই জুলুমটা যেন আমার নিজের চোখেই ঠেকল। দুটো ডাণ্ডা দিয়ে একদিকের এইরকম মশারি টাঙ্গানো আমি দেখি নি। আমি বললাম, 'মশারি টাঙ্গাবার দরকার নাই।' উত্তরে খাঁ সাহেব বললেন, 'এই মৈহার জায়গাটা শহর নয়, গ্রাম, সুতরাং মশারির প্রয়োজনীয়তা আছে।' খাঁ সাহেব চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম মশারির প্রয়োজনীয়তা। মশা তো নয়, যেন বাদুড়, যাক নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৪

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল সরোদের আওয়াজে। চোখ খুলে দেখলাম একটা ছোট ছেলে সরোদ বাজাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম নাম কি? ছেলেটি উত্তর দিল আশিস খাঁ। অবাক হলাম নামটি শুনে। একদিকে বাংলা নাম অপরদিকে উপাধি খাঁ! বুঝলাম আলি আকবরের ছেলে। অবাক হয়ে বাজনা শুনতে লাগলাম।

যেসব পাল্টা এবং বোল খাঁ সাহেব আমাকে শিখিয়েছেন সেগুলো কত দ্রুত বাজিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। এক ঘণ্টায়, পরের পর পালটা, বোল, কৃন্তন, মীড়, গমক বাজিয়ে গৎ বাজিয়ে শেষ করল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম। বাজনা শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত বয়স তোমার?' উত্তরে বলল, 'দশ বছর।' আবার আমার চমকাবার পালা। খাঁ সাহেব আমাকে পালটা, বোল যা শিখিয়েছেন কিছুই বাজাইনি অথচ প্রথম প্রথম আশিস সেইগুলোই বাজালো। আশিসের এক ঘণ্টা বাজনা শুনে মনে হলো আমি কোন অন্ধকারে এতদিন ছিলাম। নিজেকে ভাবতাম খুব বড় বাজিয়ে, কিন্তু বাজনা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। ভাবলাম খাঁ সাহেব আমকে যা দিয়েছেন তা বৃথা নয়। নিজের নাতিকে যা শিখিয়েছেন তার অনেক কিছুই আমাকেও শিখিয়েছেন। আগে মনে হতো খাঁ সাহেব আমাকে আবোল তাবোল শেখাচ্ছেন। আলাপ, গৎ এ সব শেখাচ্ছেন না। কিন্তু, এখন আমার চোখ খুলে গেল। এই প্রথম খাঁ সাহেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আস্থা জাগল।

সবে সকাল হয়েছে। আশিসের বাজনা শেষ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম কী রাগ? আশিস বলল, বিলাবল। ইতিমধ্যেই দেখি খাঁ সাহেব একটা থলিতে মাংস এবং অপর হাতে জিলিপির ঠোঙ্গা এনেছেন। আমাকে দেখেই খুব হাসিমুখে বললেন, 'এ হলো গ্রাম, এখানে কিছু পাওয়া যায় না। শহরে তো তোমরা কত ভাল মন্দ খাও। এখানে গরম গরম জিলিপি পাওয়া যায় তাই এনেছি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই খাঁ সাহেব বললেন, 'চল নাস্তা করবে।' খাঁ সাহেবের কথায় বাংলা এবং হিন্দির মিশ্রণ এবং একটা পূর্ববঙ্গীয় টান, আমার কাছে বিস্ময়কর।

হঠাৎ খাঁ সাহেব জোরে ডাকলেন, 'আরে এ দিকে এসো, দেখো তোমার এক নাতি

এসেছে।' বুঝলাম খাঁ সাহেবের স্ত্রী অর্থাৎ দিদিমা। অত্যন্ত সাধাসিধে, দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। প্রণাম করলাম। দিদিমা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। খাঁ সাহেব বললেন, 'এখানে আর কী পাওয়া যায়, যা আছে নাতিকে তাই খাওয়াও।'

কাঠের দুটো খাট ছিল। একটিতে আমাকে বসতে বললেন এবং অপরটিতে খাঁ সাহেব নিজে বসলেন। জল খাবার পেলাম দুটো মোটা পরোটা এবং গরম জিলিপি। দুটো মোটা পরোটা দেখে আমি বললাম একটা পরোটাই খাব। খাঁ সাহেব বললেন, 'এখনই তো খাবার বয়স, কিছু ফেলতে নাই, খেয়ে নাও।' অগত্যা খেতেই হলো। পরোটা ছিড়তেই বুঝলাম ভেতরে ডিম আছে। ঘি এর অদ্ভুত গন্ধ। এত সুস্বাদু পরোটা আমি আগে কখনও খাই নি। খাঁ সাহেব বললেন, 'বোধহয় ভালো লাগছে না?' উত্তরে বললাম, 'এ ধরনের পরোটা জীবনে খাই নি।' খাঁ সাহেবের সেই এক কথা, 'তোমরা কত ভাল খাবার খাও, এইসব বাজে খাবার হয়ত ভাল লাগছে না।' খাঁ সাহেবের সেই এক কথা, আবার সেই এক কথার উত্তর কিছুক্ষণ চলবার পর চা এল। জলখাবার খেয়ে বাবা খুব শীঘ্র চা শেষ করলেন। তখন আমার খাওয়া শেষ হয়নি। খাঁ সাহেব বসে রইলেন, বললেন, 'ধীরে ধীরে খাও।' আমার জন্যই বসে আছেন দেখে আমার সঙ্কোচ হল এবং শীঘ্র খাওয়া শেষ করলাম।

খাবার শেষ হবার পর হঠাৎ খাঁ সাহেব আমাকে বললেন, 'বাড়ীর ভিতর খাটা পায়খানা এবং স্নানের জন্য ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া বাড়ীর বাইরে একটা খাটা পায়খানা অছে। স্নানের জন্য বাইরে বিরাট কুঁয়ো আছে এবং স্নানের জায়গা আছে।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'বাইরের খাটা পায়খানা এবং কুয়োর কাছেই স্নান করব।' এরপর খঁ সাহেব আমাকে বাড়ীর বাইরেটা সব দেখালেন। আম গাছ, আতা গাছ, কমলালেবু, মৌসম্বী, কাশীর নারকুলি কুল এবং ছোট ছোট টককুলের গাছ এবং নানা ধরনের ফুলের গাছ দেখে মুগ্ধ হলাম। এরপর গোশালা দেখে মুগ্ধ হলাম। এত পরিষ্কার গোশালা, গরু এবং মোষ ভুষো খাচ্ছে। একজন লোককে দেখলাম গরুর দুধ দুইছে। খাঁ সাহেবকে দেখলাম গরু এবং মোষগুলিকে আদর করছেন। কাশীতে আমাদের গলিতেই গয়লাদের খাটাল দেখেছি কিন্তু এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে নিজের অজান্তে 'বাঃ' বেরিয়ে গেল। খাঁ সাহেব বোধহয় বুঝলেন, বললেন, 'এই গরু মহিষ হল মায়ের জাত। যে মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে আছি সেই মাকে ভাল ভাবে না রাখলে পাপ হবে।' এও যেন নূতন কথা শুনলাম গরু মহিষকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করতে দেখে। তারপর দেখলাম মুরগীরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুরগীর আলাদা ঘর দেখলাম। হঠাৎ খাঁ সাহেব একজনকে দেখে বললেন, 'এই বুদ্ধা, মুরগীদের খাবার দেওয়া হয়েছে?' বুঝলাম বুদ্ধা হলো চাকর। খাঁ সাহেব আমাকে দেখিয়ে বললেন, আমার যা যা দরকার সব যেন ব্যবস্থা করে দেয়।

বাড়ীর বাইরের সব দেখার পর পশ্চিম দিকে 'মা, মা' বলে প্রণাম করলেন। বাড়ীর কমপাউণ্ডের পর খোলা মাঠ। দূরে দেখালেন মা সারদা দেবীর মন্দির। বুঝলাম মা সারদা দেবীকেই 'মা, মা' বলে প্রণাম করলেন। যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

এরপর বাড়ীর ভিতর খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঢুকলাম। খাঁ সাহেব-এর ঘরে গানের আওয়াজ পেলাম। খাঁ সাহেবের ঘর আমার ঘরটির পাশেই। সেখানে চেয়ার রয়েছে। হঠাৎ দেখি

তিনটি ছোট ছোট ছেলে এবং একটি মেয়ে বসে আছে, গাইছে। আগেই আশিসকে দেখেছি। খাঁ সাহেব বললেন, 'এরা আমার নাতি এবং একটি নাতনি। আলি আকবরের ছেলে আশিস, ধ্যানেশ এবং মেয়ে বেবী, পোষাকী নাম শ্রী।' অন্য একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, 'এ আমার মেয়ে অন্নপূর্ণার ছেলে অর্থাৎ জামাই রবুর ছেলে শুভ।' হঠাৎ খটকা লাগল 'জামাই রবিশঙ্কর' বললেন কি? পরমুহূর্তেই খাঁ সাহেব বললেন, আলি আকবর বাইরে আনন্দে আছে এবং নাতিদের এখানে রেখে গেছে। জামাই রবুও তার ছেলেকে এখানে রেখে গেছে। রবু দিল্লীতে রেডিওতে চাকরি করছে এবং মা অন্নপূর্ণা আমার কাছে রয়েছে এখন। এই অন্নপূর্ণা মা আমার অতি আদরের, পরে তাকে দেখতে পাবে। এখন বুঝতে পারলাম রবিশঙ্করকে খাঁ সাহেব রবু বলে সম্বোধন করেন। শুভকে দেখেই মনে হয়েছিল রবিশঙ্করের চেহারার সাথে খুব মিল আছে।

তারপর দেখলাম আশিস সরোদে পালটা বাজাচ্ছে এবং সকলে গাইছে। পরে শুনলাম শুভর বয়স সাত বৎসর, আশিসের বয়স দশ বৎসর এবং ধ্যানেশের বয়স আট, এবং বেবীর ছয় বৎসর। চুপচাপ বসে তাদের গান শুনলাম। বুঝলাম রাগ বিলাবলের পালটা সকলে গাইছে। এরপর সকলে চলে গেল। আশিস যেমন সকালে আমার ঘরে বাজাচ্ছিল, সেইসময়ও এক ঘণ্টা ধরে বিলাবলের পাল্টা থেকে শুরু করে গৎ বাজিয়ে উঠে চলে গেল। আমার কাছে এ যেন এক বিস্ময়। খাঁ সাহেব আমাকে বললেন, 'আজ এখানকার সবকিছু দেখো। কাল তুমি সকালে সারদা দেবীর দর্শন করে আসবে, তোমার গণ্ডা বাঁধব এবং কাল থেকে তোমায় শিক্ষা দেব। সারারাত কষ্ট করে এসেছ, এখন আরাম করো। দুপুরে বারোটার সময় চান সেরে খাবার খাবে এবং বিশ্রাম করবে।'

বিশ্রাম না করে আমি আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি পড়?' উত্তরে বলল, 'দাদু তাদের বলেছে আমার কাছে তারা পড়াশুনা করবে।' আশিসের কাছে শুনলাম তার মা এবং দুইটি ছোট ভাই প্রাণেশ এবং অমরেশ বম্বেতে তার বাবার কাছে আছে। কথায় কথয় বুঝলাম যদিও আশিস কিছুটা এ বি সি ডি এবং অজ আম পড়েছে কিন্তু বাকীরা কিছুই পড়েনি। শুভর বিদ্যাও যৎসামান্য অক্ষর পরিচয়। ভাল লাগার আর একটা কারণ এই বয়সেই তারা গান গাইছে, নিজের থেকে বললাম, 'তোমাদের জন্য কিছু প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এনেছি, পরশু থেকে তোমাদের পড়াব।'

হঠাৎ দেখলাম খাঁ সাহেব দুটো থলি নিয়ে বাইরে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে দেখি থলিতে বাজার নিয়ে এসেছেন। আমার লজ্জা লাগল। এই বয়সে উনি বাজার গেছেন, সুতরাং ওঁর সাথে আমারও বাজার যাওয়া উচিত ছিলো। আমি বললম, 'কাল থেকে আপনার সঙ্গে বাজার যাব।' খাঁ সাহেব বললেন, 'লেখা পড়া করেছো, এসব বাজার কখনও করেছ? এসব কুলি কাবাড়িদের কাজ।' উত্তরে বললাম, 'কাশীতে আমিই বাজার করতাম কেননা কাশীতে আমি এবং আমার মা থাকতাম। দাদারা সব কার্যক্ষেত্রে কাশীর বাইরে।' সঙ্গে সঙ্গে খাঁ সাহেব বললেন, 'তুমি কি এখানে বাজার করতে এসেছ? মনপ্রাণ দিয়ে বাজাও, তোমায় কিছুই করতে হবে না।' এরপর আমার আর কোনো কথা চলে না। এই

সময় আমার সঙ্গে দাদু নাতির সম্পর্ক। কত সহজ এবং সরল ব্যবহার। অবাক হই এতদিন কি ভ্রান্ত ধারণা ছিল, যে খাঁ সাহেব ভীষণ রাগী। কিন্তু তখন কি জানতাম আমার ধারণা কত ভুল। এ ধারণা আমার পাল্টে গেল, একদিন পরেই।

দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। ঠিক বারটার সময় খাঁ সাহেব চান করে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং খাঁ সাহেব খেতে বসলাম। নাতিরা বুঝলাম তাদের দিদিমার রান্না ঘরে বসে খাবার খাচ্ছে।

দুপুরে খাবার সময় দেখলাম ডাল, ভাত, আলু বেগুনের ভরতা এবং মাংস হয়েছে। আগের দিন দুপুরবেলা খাওয়া জোটেনি। জুটেছিল তার আগের দিন। আমার মা মৈহার যাবার আগে বলেছেন, 'মাইহার যাচ্ছ, দেবী দর্শন না করে অন্নগ্রহণ কোরোনা।' তাই খেতে বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সত্যই তো মন্দিরে যাওয়া হয় নি, খেতে বসেছি কিন্তু কে পরিবেশন করছিলেন খেয়াল করিনি। খাঁ সাহেবের কথায় চমক ভাঙ্গল। সম্মুখে দেখলাম এক অদ্ভুত আভিজাত্যপূর্ণ মহিলা। খাঁ সাহেব তখন বলছিলেন, একাধারে ও আমার মা এবং মেয়ে। ওর নাম অন্নপূর্ণা আর আমার পরিচয় দিলেন কাশী থেকে আসা এক পড়াশোনা জানা ব্রাহ্মণ ছাত্র। আর সাথে সাথে এও জানালেন আমিই প্রথম অনাত্মীয় যাকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন। সম্পূর্ণ বার্তালাপের কোন প্রভাবই ভাবগম্ভীর অন্নপূর্ণা দেবীর উপর উচ্ছ্বাস বা প্রভাব বিস্তার করলো না। কিন্তু আমার অবস্থা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে ওকে প্রণাম করলাম। এ যাবৎ রবিশঙ্করকে যে কদিন দেখেছি তাতে তার চাকচিক্যপ্রিয়তা যে প্রবল সেটা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার জীবনসঙ্গিনী এরকম সরল এবং নিরাভরণ এটা কল্পনা করতে পারি নি। একটু আগে যে 'কিন্তু' বোধ ছিল মনেতে যে দেবীদর্শন না করে অন্নগ্রহণ করছি, অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে সেই কুণ্ঠা মুহূর্তেই কেটে গেল। মনে মনে মায়ের কাছে টেলিপ্যাথি করলাম। 'মা, পাথর থেকে এ জীবন্ত মূর্ত্তিখানি আমাকে বেশী আকর্ষিত করেছে। তাই অর্ঘ্যটা এইখানেই দিলাম। লোকের মুখে কারো কথা শুনলে কিছুটা কল্পনা করা যায়। না দেখলেও কল্পনা করা যায়। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী কল্পনার বাইরে। তাকে না দেখলে কল্পনা করা শক্ত। দেখবার আগে আমারও সেই ধারণা ছিল কিন্তু দেখবার পর সব কল্পনা পাল্টে গেল। তাই বলি অন্নপূর্ণা দেবীকে না দেখলে কল্পনা করা শক্ত। অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে মনে হলো সরল অথচ অভিজাত। তীক্ষ্ণ মেজাজ, উন্নাসিকতার ছবি নাই সে মুখে।

খাঁ সাহেবের খাবার দেখে অবাক হলাম। যৎসামান্য ভাত, ডাল, দেখলাম মাংস খান না, কিন্তু মাংসের ঝোলটা খান। খাবারের আগে কিছু ভাত বারান্দায় ছড়িয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি এসে ভাত খেতে লাগল। ছেলেমানুষের মত বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'আজকের দিন খুব ভাল। চড়ুই পাখিরা না এলে বুঝি, সময় ভাল নয়। সময় ত ভাল হবেই কারণ তুমি কাশীর ব্রাহ্মণ এসেছ, তাই চড়ুই পাখীরা ঠিক এসেছে।' দেখলাম চড়ুই পাখীর জন্য অনেকগুলো বাসা করে রেখেছেন।

এরপর খাঁ সাহেব আমাকে বললেন, 'নাও শুরু কর খাওয়া।' আমার সঙ্কোচ হল।

উত্তরে বললাম, 'আপনি শুরু করুন।' খাঁ সাহেব বললেন, 'বল কী? তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি শুরু করলে আমি শুরু করব।' তারপরই খাঁ সাহেব আবার বললেন, 'তোমরা কত ভাল জিনিষ খাও, এসব কি তোমার ভাল লাগবে? যাই হোক কি করবে? তোমার দিদিমা যা রেঁধেছে তাই খেয়ে পেট ভরাও।' আমি তো অবাক। ভাতের এত সুগন্ধ, তারপর যখন ডাল দিয়ে ভাত মাখলাম এবং আলুবেগুনের ভরতা খেলাম, এ যেন আর এক বিস্ময়। এ ধরনের ডাল আমার জীবনে কখনও খাইনি। এবং সেই প্রথম নয়, আজ পর্যন্ত ওঁর হাতের ডাল, মাংস বা যে কোন জিনিষই যে এত উপাদেয়, তা যে না খেয়েছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। খাঁ সাহেবের খাওয়া এত কম যে অতি অল্প সময়ে তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেল এবং আমাকে বললেন, 'ধীরে ধীরে খাও।' আমার খাওয়া তখনও মাঝপথে। সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'আপনি উঠে যান।' খাঁ সাহেব বললেন, 'বল কি? তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার খাওয়া না হলে কি আমি উঠতে পারি?' কলেজ থেকে পাশ করেই আমি মৈহারে গিয়েছি। আমার বরাবরই খুব তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস, কিন্তু দেখলাম আমার থেকেও তাড়াতাড়ি খাঁ সাহেব খেয়ে নেন এবং আমার জন্য বসে থাকেন। স্থির করলাম আমাকে আরও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে। কারণ, গুরু তিনি, আমার জন্য খাবার খেয়ে বসে থাকবেন, তার চেয়ে লজ্জার আর কি আছে?

খাবার পর হঠাৎ খাঁ সাহেব বললেন, 'আমার ভাগ্য ভাল নয়, তোমার ভাগ্যে 'খুদা' খুব খাওয়ালো।' এ কথা শুনে তো আমি অবাক। আমি বললাম, 'আপনার মত ভাগ্যবান কতজনে হয়?' খাঁ সাহেব বললেন, 'আরে না না আমার ভাগ্য ভাল নয়।' বারবার ওই এক কথা। এরপর আর কোন কথা চলে না।

যাক, খাওয়ার পর আমি শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সরোদের আওয়াজ শুনে। আমার ঘরের দরজায় একটা বড় ফুটো ছিলো। সেই ফুটোতে দেখলাম বৈঠকখানায় আশিস সরোদ নিয়ে বসেছে। দূর থেকে খাঁ সাহেবের এ্যালার্ম ঘড়িতে দেখলাম দুপুর আড়াইটে বাজে। খাঁ সাহেব শুয়েছিলেন, উঠলেন এবং বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরে এলাম।

তারপর দেখি খাঁ সাহেব কলঘর থেকে এসে বাইরের বারান্দায় নামাজ পড়তে গেলেন। নমাজ যে মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল, আশিস গিয়ে প্রণাম করল এবং আবার বাজাতে বসল। সকালের মত সব নাতিরা রাগ কাফিতে পাল্টা গাইল।

এর কিছুক্ষণ পর ঠিক তিনটের সময় খাঁ সাহেব আমাকে ডাকলেন চা খাবার জন্য। চায়ের সঙ্গে আলুর চপের মতো কিছু জলখাবার দেওয়া হল। খাঁ সাহেব গরম চা এত তাড়াতাড়ি খেতে লাগলেন যে আমার চা খাওয়াই শেষ হলো না। আমি তখন ডিসে ঢেলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ পর, খাঁ সাহেব সাড়ে তিনটের সময় আমাকে বললেন, 'আমি অরকেষ্ট্রায় যাবো। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে অরকেষ্ট্রা তৈরি করেছিলাম, এখন তারা বয়স্ক হয়ে অরকেষ্ট্রাতে গিয়েছে। মৈহারে মহারাজের কথায় এই অরকেষ্ট্রা তৈরি করেছিলাম। রাজা

মহারাজাদের রাজত্ব চলে যাওয়ার পর বর্তমানে ভারত সরকার অরকেষ্ট্রার ভার নিয়েছেন। যেহেতু ভারত সরকার টাকা দেয় তাই কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। সাড়ে তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সব ছেলেদের নিয়ে অরকেষ্ট্রাতে বাজাই।' খাঁ সাহেব চলে গেলেন। তিনি আমাকে বলে গেলেন নাতিদের নিয়ে বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসতে। আশিস তিনটার পর সাড়ে চারটা অবধি কাফি রাগে পালটা, বোল ইত্যাদি বাজিয়ে একটা বাঁধা গৎ বাজিয়ে শেষ করল। তার বাজনা শেষ হবার পর এক ঘণ্টা ওদের নিয়ে একটু বের হলাম।

খাঁ সাহেবের বাড়ীর কাছে কোন বাড়ী নেই, কিছুটা দূরে মৈহারের স্কুল এবং তার সামনেই জেল, মৈহারের যে দিকে তাকাই কেবল সবুজের সমারোহ। এ দৃশ্য শহরে দেখা যায় না। মনে হলো সাধনার জন্য এই জায়গার মতো জায়গা আর হয় না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরেই শুনি খাঁ সাহেব মাছ নিয়ে এসেছেন। এবং তারপর সরষের তেল কিনতে বেরিয়েছেন। যদিও এখানের কিছুই জানি না, তবুও মনে হলো এই বয়সে খাঁ সাহেব কত কাজ করেন। দিদিমার কাছে শুনলাম, মৈহারে বিকেলে যেখানে অরকেষ্ট্রা হয় সেখানে পুকুরের মাছ নিয়ে মেছুনিরা প্রায় আসে। মাছ পেলেই খাঁ সাহেব নিয়ে আসেন। কালবোস মাছই বেশী পাওয়া যায়। একমাত্র তখনই বাড়ীতে সরষের তেল আসে আর নইলে যা রান্না হয় তা ঘি দিয়েই হয়। এমন কি করলা ভাজা হলেও ঘি দিয়েই হয়।

নাতিদের নিয়ে বেড়িয়ে এসেছি শুনে খাঁ সাহেব খুব খুশী হলেন। এর পরই খাঁ সাহেব নমাজ পড়লেন। নমাজ পড়া শেষ হতেই দেখি একে একে সকলে এসে খাঁ সাহেবকে প্রণাম করছে। দেখাদেখি আমি গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'আরে আরে, করো কী? তুমি হলে ব্রাহ্মণ আর আমি হলাম ম্লেচ্ছ। আমার পাপ হবে।' এ কথা আমার কাছে নতুন নয়। আগেও যখনই প্রণাম করেছি এই কথাই শুনেছি।

সন্ধ্যার সময়ও ঠিক সকালের মত আশিস এবং সব নাতিরা ইমন রাগে পাল্টা গাইতে লাগল। এরপর একক আশিস ইমনরাগে গৎ বাজাল। হাত তৈরি তবে গৎটি খুব সহজ মনে হোলো আমার কাছে। আশিসের বাজনা যখন শেষ হল হঠাৎ দেখি অন্নপূর্ণা দেবী যন্ত্র নিয়ে খাঁ সাহেবের ঘরে ঢুকে প্রণাম করলেন এবং যন্ত্রটি নিয়ে বসলেন। যন্ত্রটি আমার কাছে অপরিচিত নয়, কেননা এ যন্ত্র কাশীতে জ্যোতিষ রায় চৌধুরীর কাছে দেখেছি এবং শুনেছি। যন্ত্রটি হলো 'সুরবাহার'।

৫

মৈহারে আসার তিন চার মাস আগে গুল্লুজী আমাকে জ্যোতিষ চৌধুরীর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। কোলকাতানিবাসী গৌরীপুরের স্বনামধন্য স্বর্গীয় এনায়েত খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছিলেন। জ্যোতিষ রায় চৌধুরীর কাছে খাঁ সাহেব সম্বন্ধে বহু গল্প শুনেছিলাম। কয়েকটা বইও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর কাছে একটা বই দেখেছিলাম 'মিউজিসিয়ান অফ ইণ্ডিয়া', যার মধ্যে খাঁ সাহেব ও সাত আটজন গুণীর জীবনী লেখা। সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু পেলেই সেই সময় আমার অভ্যাস ছিল লিখে রাখার। সবিনয় নিবেদন করেছিলাম, বইটা যদি একদিনের জন্যে দেন তাহলে আমি লিখে ফেরৎ দিয়ে দেব। তিনি বইটা আমাকে দিয়েছিলেন। বইটিতে

প্রথমেই খাঁ সাহেবের জীবনী ছিল। যেহেতু মনে মনে বাসনা ছিল খাঁ সাহেবের কাছে শিখতে যাব, সেইজন্য এই জীবনীটা আমার জানা অতি প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল। জ্যোতিষ রায় চৌধুরী এরপর সুরবাহার সেই প্রথম দেখি এবং শুনি। কেবল আলাপ শুনেছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম গৎ শোনাতে। উত্তরে বলেছিলেন, 'এই যন্ত্রে গৎ বাজে না।'

অন্নপূর্ণা দেবী সুরবাহার নিয়ে বসলেন, এবং খাঁ সাহেব সরোদের বদলে একটা যন্ত্র নিয়ে বসলেন। যে যন্ত্রটি নিয়ে তিনি বসলেন, সেরূপ যন্ত্র আমি আগে কখনও দেখি নি। খাঁ সাহেব নিজেই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যন্ত্রটির নাম কী জানো?' উত্তরে বললাম, 'এ বাজনা কখনও দেখিনি।' খাঁ সাহেব বললেন, 'এর নাম সুরশৃঙ্গার।' এরপরে অন্নপূর্ণা দেবীর যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন, 'এর নাম জানো?' উত্তরে বললাম, 'সুরবাহার।' খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় শুনেছ?' বললাম, 'মৈহারে আসার আগে কাশীতে জ্যোতিষবাবুর কাছে সুরবাহার শুনেছি এবং খাঁ সাহেবের জীবনীর উপর একটা বইও পড়েছি।' খাঁ সাহেব বললেন, 'উনি কি কাশীতে আছেন? ওঁরা হলেন জমিদার।' খাঁ সাহেবের জীবনী কোথায় পড়েছি জিজ্ঞাসা করাতে বললাম, 'সেই লেখা বইটি আমার খাতায় লেখা আছে, সেটি আমি মৈহারে নিয়ে এসেছি।' খাঁ সাহেব বললেন, 'সংগীতের আমি কিছুই জানি না, আমার বিষয়ে আবার কী বেরিয়েছে বইতে?' খাঁ সাহেবের বিনয় আমার কাছে বিস্ময়। এ যাবৎ যত সঙ্গীতজ্ঞকে দেখেছি সকলের ভেতর হামবড়াই ভাব, অথচ এত নাম সত্ত্বেও খাঁ সাহেব কি করে বলেন, 'সঙ্গীতের আমি কিছুই জানি না!'

যাক, এরপর বাজনা শুরু হলো।

সুরশৃঙ্গার কখনও শুনি নি, অদ্ভুত মিষ্টি আওয়াজ মনে হলো। দেখতে অনেকটা সরোদের মত, অথচ সরোদ নয়। সুরবাহার একবারই শুনেছি, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর সুরবাহার শুনে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোথা দিয়ে যে দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। আলাপ, জোড় এবং ঝালা দিয়ে যখন শেষ হল দেখলাম সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। সংগীতের কিছু না বুঝলেও বাজনা তো অনেক শুনেছি। এ বাজনা যেন একেবারেই আলাদা। সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই রাগটির নাম কি?' উত্তরে খাঁ সাহেব বললেন, 'শুদ্ধকল্যাণ'। অতি কঠিন রাগ। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে, তবেই কল্যাণ হবে। শেষ জীবনে এই সব রাগের উপলব্ধি হয়।' এইসব কথাও আমার কাছে বিস্ময়। আমার মনে সংশয় জাগল। অন্নপূর্ণা দেবীর বয়স তো বেশী নয়, তবে এই বয়সে কি করে 'শুদ্ধকল্যাণ' বাজাচ্ছেন! জ্যোতিষবাবুর কাছে সুরবাহার শুনেছি, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর সুরবাহার শুনে আমার মনে হলো আকাশ পাতাল তফাৎ।

গানে এই রাগ শুনেছি, কিন্তু যন্ত্রে এই রাগ কখনও শুনি নি। যদিও কি সুর লাগছে কিছুই বুঝিনি, তবুও সেই প্রথম দিনের বাজনা শুনে বুঝলাম, অন্নপূর্ণা দেবী কত বড় শিল্পী। অন্নপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে কবিরাজ আশুতোষের কাছে বহু কথা শুনেছি। আজ মনে হলো এ বাজনার তুলনাই হয় না। তাঁর বাজনা শুনে একটা কথা মনে এল। কথায় আছে 'মেয়েদের রূপ সাজে, পুরুষের রূপ কাজে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলাম অন্নপূর্ণা দেবীকে। তাঁর নিরাভরণ,

অতি সাধারণ সাজ। তাঁর রূপই হলো বাজনা অর্থাৎ সঙ্গীত। এই রূপের কাছে কোন অলংকার কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ দাঁড়াতেই পারে না। অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

সুরশৃঙ্গার বাজনাও যে এত মধুর, এও আমার কাছে এক নতুনতরো অভিজ্ঞতা। খাঁ সাহেবের প্রতি নতুন শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল।

বাজনা শেষ হল। এবার খাঁ সাহেব অমাকে বললেন, 'কাল সকালে স্নান করে সারদা দেবীর দর্শন করতে যেও। অরকেষ্ট্রা পার্টীর একজন ছাত্র, বৃত্তিতে পাণ্ডাকে বলে দিয়েছি, সকালে সে আসবে। সকালে দর্শন করে পূজা দিয়ে লাল ধাগা নিয়ে আসবে, কাল তোমার গণ্ডা বাঁধব এবং শিক্ষা দেব।' বললেন, 'এখন চলো, খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।' খাঁ সাহেবের সব কথা শুনছি, কিন্তু মনে এখন সঙ্গীতের রেশ, মাথার মধ্যে তা গুঞ্জন করছে। আমার ধারণা ছিল ছয় মাসে 'উস্তাদ' হয়ে কাশী ফিরে যাব। কিন্তু এখন মনে হলো, সঙ্গীতের কিছুই জানিনা। তবে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম, সকলেই যখন বাজাতে পারে আমি কেন পারব না? দেখা যাক কি হয়। এরপর রাত্রে রুটি, মাছ, মাংস খেয়ে শুয়ে পড়ার অগে, ক্লান্তি সত্ত্বেও দিনপঞ্জিকা লিখলাম। সবই নতুন, কিন্তু বিস্ময়কর হোল নামের ধর্ম সমন্বয়। খাঁ সাহেব নাতি নাতনিদের নামকরণ করার সময় তুচ্ছ ধর্মীয় (সংস্কার) বন্ধনের ঊর্ধ্বে।

১৯৪৯এর ইংরেজীর ১৮ই অক্টোবর, আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। সকালেই আমি স্নান করে তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই, মা সারদা দেবীর মন্দিরের এক পাণ্ডা বিন্দাদীন, যে খাঁ সাহেবের অর্কেষ্ট্রা বাজাতো, বাড়ীতে এসে হাজির। খাঁ সাহেব বিন্দাদীনকে, আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হল কাশীর ব্রাহ্মণ। এর কাছ থেকে বেশী পয়সা নেবে না। নামমাত্র পূজা দিয়ে গণ্ডা বাঁধবার জন্য দেবীর চরণে লাল ধাগা চড়িয়ে নিয়ে আসবে।' এত বয়স্ক বিন্দাদীন, খাঁ সাহেবের কাছ থেকে হাত জোড় করে মাথা নীচু করে বললেন, 'আপনার আদেশ মতই পুজো দেওয়া হবে।'

সারদা দেবীর মন্দিরে, পাঁচশো সাতান্ন সিঁড়ি চড়ে তবে দর্শন করতে হয়। পুজো হিসেবে, প্রধান হলো নারকোল ভেঙে সেই জল দেবীর চরণে দিতে হয়। এ ছাড়া পেড়া, বাতাসা এবং নকুল দানা (হিন্দিতে যাকে এলাইচি দানা বলে) দিয়ে, পুজোর পর লাল ধাগা সারদা দেবীর চরণে ছুঁইয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। মোট খরচা হল ছ টাকা।

বাড়ীতে এসে খাঁ সাহেবকে প্রণাম করলাম। খাঁ সাহেব বললেন, 'তোমার দিদিমাকে প্রণাম করো।' প্রণাম সারার পর খাঁ সাহেব বললেন, 'আমার গুরু উজির খাঁকে, (যাঁর ফটো টাঙ্গান ছিল,) প্রণাম কর।' এরপর খাঁ সাহেবের ঘরে সারদা দেবী, পরমহংসদেব এবং নানা দেবদেবীর ফটোতে প্রণাম করে খাঁ সাহেবের কাছে বসলাম।

হঠাৎ খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'ত্রিতালের ঠেকা কি বলো তো?' এর উত্তরে বললাম, 'না ধিন্ ধিন্ না, না ধিন্ ধিন্ না, না তিন্ তিন্ না, না ধিন্ ধিন্ না।' আমার কথা শুনে খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ষোল মাত্রার ঠেকায় এক, পাঁচ, নয় ও তেরোতে 'না'-র কি অর্থ বলো তো?' এবার আমার চমকাবার পালা। বুঝতে একটু সময় লাগল, বললাম, 'জানি না।'

হেসে খাঁ সাহেব বললেন, 'পারলে না তো বলতে? এই চার 'না'-র অর্থ হল বৈঠনা, বোলনা, করনা এবং জাননা। সংগীত হলো ভগবানের পুজো করা। সুতরাং সরোদ বাজাবার আগে জানতে হবে কি করে বৈঠনা অর্থাৎ কেমনভাবে বসতে হবে। তারপর বোলনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে কেমন ভাবে কথা বলতে হবে। অতঃপর করনা অর্থাৎ উপযুক্ত দুইটি জানবার পরই গান বাজনা করার অধিকার হবে। সর্বশেষ সাধনা ঠিক ভাবে করলে জানতে পারবে নিজেকে। যে কেবল সবসময় নিজেকে দেখে, সে আর কাউকে দেখতে পায় না। আর যে সবসময় অন্য সবাইকে দেখে সে নিজেকে দেখতে পায় না। নিজেকে দেখতে পাওয়া মানেই সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা, ভগবানের করুণা পাওয়া। সুতরাং প্রথমে নিজেকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যেমন তিলের মধ্যে তেল, দইয়ের মধ্যে ঘি, স্রোতের মধ্যে জল, আর কাঠের মধ্যে আগুন। তেমনি নিজেকে যে জানতে পারে সেই হলো সত্য এবং সেই সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সবসময় যে সঙ্গীতের চিন্তা করতে পারে, সেই প্রকৃত শিল্পী হতে পারে। যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তার ভালো হয় আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে বরণ করে, সে আসল জিনিস থেকে ভ্রষ্ট হয়। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে, যে কোন বিষয়েই কামনা, অত্যধিক আকাঙক্ষা ও আসক্তিই হলো মানুষের বন্ধন। সঙ্গীত ছাড়া কোন বন্ধনের মধ্যে জড়াবে না। নিজেকে জানতে হলে আগে করো শেষের আয়োজন।'

'গুরু যে জ্ঞান দেয়, তার জন্য পাত্র চাই। পাত্র না হলে জ্ঞান ব্যর্থ হয়। যেমন গরুর দুধ নেবার জন্য পাত্র চাই, পাত্র না হলে দুধ মাটিতে পড়ে যাবে। জ্ঞানের সঙ্গে বৈরাগ্য হলে তবে গুরুর জ্ঞান গ্রহণযোগ্য হবে।'

'বাতি জ্বালালে চোখে দেখা যাবে, তবেই গাঁটখোলা যাবে। নইলে অন্ধকারে গাঁঠ খোলা সম্ভব নয়। প্রদীপ স্বরূপ জ্ঞান হলেই তবে গাঁঠ খোলা সম্ভব। জ্ঞানের জন্য ঘি, বাতি না হলে আলো জ্বলবে না। প্রথমেই জ্ঞান চাও, তো আগে কর শেষের আয়োজন। প্রদীপ ঘষে মেজে, তেল ঘির ব্যবস্থা করে তবে দেশলাই কাঠি দিয়ে জ্বালাবে। প্রদীপ জ্বললে অন্ধকার দূর হবে।

'সাধনার মধ্যে সন্দেহ যদি হয়, সাধনার মধ্যে ক্লান্তি যদি আসে, তাহলে সাধক কখনও আগে বাড়তে পারে না। একাগ্র মন না হলে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না।'

'ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে নিরন্তন সাধনা করবে। সুনাম হলে, নিজের যোগ্যতা বলে অহংকার না করে, প্রভুর কৃপা বলেই ভাববে। সফলতার পরই অহংকার আসে। যে, সেই অহংকার প্রভুর পায়ে বিসর্জন করতে পারে, সেই অমর হয়ে থাকে। নিজেকে নিমিত্ত মাত্র বলে সর্বদাই স্মরণ রাখবে'।

'সঙ্গীত শিক্ষা করে মনন করতে হবে। মনন করার পর নিজের জীবনের অঙ্গ, যে করে নিতে পারে সে ধন্য। আজকাল সকলেই একটু বাজিয়ে উস্তাদ হতে চায়, তা কি সম্ভব? প্রথমেই ঘি খেতে চাও? তাই বারবার বলি, আগে করো শেষের আয়োজন। ঘিয়ের জন্য প্রথমে গরু দরকার। গরুকে চারা খাওয়াতে হবে। তারপর তাকে বাছুর দিয়ে স্তন্যপান করাতে হবে। তারপর পাত্র জোগাড় করে দুধ নিতে হবে। দুধ তারপর আগুনে চড়াতে হবে।

দুধ জ্বাল হলে, ঠাণ্ডা করতে হবে, তারপর তাকে মালাই করতে হবে। তারপর তাকে মন্থন করতে হবে, তখন মাখন বেরোবে। তারপর ঘি হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা, যে দুধ দুইবে, তার হাত ভাল করে ধুতে হবে এবং পাত্র পরিস্কার করে নিতে হবে। তবে খাঁটী দুধ এবং খাঁটি ঘি পাবে। শ্রদ্ধা, সৎকর্ম, ভাবনা, বিশ্বাস, অহিংসা, বিচার এই সব গুণ হলে তবে প্রকৃত সঙ্গীতের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে। এইসব করার পর বৈরাগ্য হয়, তবেই ভেতর থেকে সুর বেরোবে। আসলে কর্মযোগী হতে হবে। কর্ম করতে করতে অনুরাগ কমে গেলে বৈরাগ্য হবে। তবেই ভেতর থেকে সুর বেরোবে। আজ যে কথাগুলো বলছি, সে গুলো সর্বদা মনে রাখবে। এগুলো মনে রাখলে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।'

'সবই দৈবের বশে ঘটে। এ কথা মনে রেখো। ধর্ম অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই। নিজের লোক যদি হীন কার্য করে কখনই তা হতে দিও না। বিজয়ী ভাব নিয়ে কখনও বাজাবে না। যারা প্রথমে বিজয়ী হয়, শেষে তারা হেরে যায়। মিলেমিশে বাজালেই সব চেয়ে ভাল বাজনা হয়। লোকে কান ভরিয়ে লড়াই বাধিয়ে দেয়, এবং অপারগের সঙ্গে লড়াই করলে বাজনা খারাপ হয়ে যায়। 'কুকুরেরা খাবার দেখলেই কাড়াকাড়ি করে, সেরকম কখনও কোরো না।'

'অধর্ম, লোভ ত্যাগ করে, নিরহংকার হয়ে সাধনা করলেই রাস্তা দেখতে পাবে। সংকটকালে মোহগ্রস্ত হয়ো না। কর্মাধীন ভগবান, কর্মহীন পশু। নিষ্কর্ম হয়ো না। করতে যাও, করলে ফল পাবেই। যে আশা নিয়ে এখানে এসেছ, খুদার কৃপায় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক প্রার্থনা করি।'

'অর্থের দাস হবে না। সঙ্গীতের দাস হবে। সঙ্গীতের দাস হলে খাওয়া পরার অভাব হবে না।'

'কারো প্রতি বৈরীভাব, আক্রোশ রাখবে না। সদাচার নিরহংকারী হলে সঙ্গীতে প্রবেশ করা যায়। সঙ্গীতের মধ্যে ঠিক মত প্রবেশ করতে পারলে দেখবে, মোহ, কষ্ট, খাবারের লোভ কিছুই থাকবে না।'

'সরলভাবে নিজের কাজ করবে। নিজের ছিদ্র দেখবে, পরের ছিদ্র দেখবে না। শিক্ষা শেষ হলে, যে অনুগত এবং সহজ স্বভাব, তাদের নিশ্চয়ই শিক্ষা দেবে।'

'পিতা, মাতা এবং গুরুর সেবাই পরম ধর্ম। পিতা মাতা থেকেও গুরু বড়। পিতা মাতার থেকে জন্ম হয়, কিন্তু গুরুর উপদেশে যে জন্ম হয় তাই অমর হয়। যে কটু কথা বলে, যে আত্মপ্রশংসা করে, তাকে উপেক্ষা করবে। দুষ্টের সঙ্গে কথা না বলাই ভাল।'

'যে লোক মোহের বশে নিজের বিপদ বুঝতে পারে না, সেই অলস লোকের কষ্ট হয়। বিচার ও যুক্তি দিয়ে কাজ করলে তার ফল পাওয়া যায়। অবস্থাভেদে, শত্রুও মিত্র হয় আবার মিত্রও শত্রু হয়। নিজেকে বিচার করতে হবে, কে বিশ্বাসের যোগ্য? যারা শত্রুতা করে বন্ধুর ভাব দেখায়, মনে রাখবে ঠকানোই তাদের উদ্দেশ্য। এরা অন্যকে ঠকায়, কিন্তু তারা বোঝে না, যে শেষে তারাই ঠকে।'

'যারা লোভী, নির্লজ্জ, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, যে পরের অপযশ করে, এমন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। এই সব দুরাচারের সুখ এবং আশ্রয় থাকলেও তারা শেষ জীবনে নিষ্কৃতি পায় না।'

'বড়দের কখনও তুমি বলবে না। সকলকেই আপনি বলবে। যে নিজেকে সংযত না করে অন্যকে সংযত হবার কথা বলে, তারা বোঝে না, লোকে তাদের উপহাস করে।'

'বেশী চাওয়াই দুঃখের কারণ। বেশী টাকার স্বপ্ন দেখলে বিষয়তৃষ্ণা বাড়ে। সেইজন্য কামনা ত্যাগ করবে। শুদ্ধ চিত্ত হয়ে সব জিনিষ ত্যাগ করতে হবে। সব জয় করলেও কর্মদোষে আবার সব নষ্ট হয়ে যায়। ধৈর্য ধরলে সব দুঃখ নষ্ট হয়।'

'বিদ্যার মত চক্ষু নাই। সত্যের মত তপস্যা নাই। আসক্তি তুল্য দুঃখ নাই। ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। বিদ্যাকে সর্বদা রক্ষা করবে মায়ের মতো। বৃথা চিন্তা কোরো না। চিন্তা করলে দুঃখ কমে না, উপরন্তু বেড়ে যায়। দিন রাত সঙ্গীতের চিন্তা করবে।'

'যার যা ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই হলো তার জন্য মন্ত্র। কৃষক যেমন বীজ বপন করে সেইরূপ ফল পায়। মানুষ সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম অনুসারে, বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ছাড়া যেমন ফল হয় না সেইরকম পুরুষাকার অর্থাৎ কর্ম ছাড়া, দৈব সিদ্ধ হয় না। কর্ম করলে দৈব সিদ্ধও সহায় হয়।'

'কখনও ভয় পাবে না, ভয় পেলেই ভয় তোমায় পেয়ে বসবে। কখনও কাউকে অপদস্থ করবে না।' এক নাগাড়ে এইসব কথা বলার পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বুঝলে?' আমি নীরব শ্রোতা।

খাঁ সাহেব নিজেই আবার বললেন, 'আমি তো লেখাপড়া করিনি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছি তাই বলছি। বৃহৎ একটা রাজপ্রাসাদ বানাতে চাও। তার জন্য সর্বাগ্রে কী প্রয়োজন? বাড়ীর জন্য ভিত করতে হবে। ভিত যদি মজবুত না হয়, তাহলে একতলর পর দুই তলা করতে গিয়েই ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু যদি ভিতটা মজবুত হয়, তাহলে একশো তলা বাড়ী করলেও ভয়ের কিছু নাই। বাড়ীর জন্য যেমন ভিত মজবুত করতে হয়, সেই রকম সঙ্গীতের জন্যও ভিত মজবুত করতে হবে। বাড়ীর ভিতের জন্য যেমন পাথর, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদি আগে যোগাড় করতে হবে, তবে বাড়ীর নির্মানের কাজে এগোতে পারবে; সেইরকম সঙ্গীতের জন্য ভিত তৈরী করতে হলে পাল্‌টা, বোল, কৃন্তন, মীড় ইত্যাদি সব তৈরী করতে হবে, তবেই গৎ, আলাপ, শ্রুতি ইত্যাদি সব শিখলে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।'

'কাশীতে তুমি তো আমায় আলাপ, গৎ, ঝালা, সব শুনিয়েছিলে। যে আলাপ শুনিয়েছিলে সেটা আলাপ নয়, সেটা প্রলাপ। যেমন বাড়ী তৈরী না করেই রেডিও, সোফাসেট ইত্যাদি কিনলে, কিন্তু সেটা রাখবে কোথায়? আগে বাড়ী তৈরী করো, তারপর মনের মত করে তাকে নানা জিনিষ দিয়ে সাজাও। সেই প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে ঢুকতে গেলে, যে সব অলংকার, বোল দিয়েছিলাম তা তৈরী করেছ কি না?'

মৈহারে একটা দিনের মধ্যে, সকাল বিকেল এবং সন্ধ্যায়, বাজনা শুনেই আমার নিজের প্রতি যে ভুল ধারণা ছিল, তা বদলে গিয়েছে। বুঝেছি সঙ্গীতের কিছুই জানি না। সুতরাং হাত জোড় করে বললাম, 'আমাকে কিছু দিন সময় দিন, আমি ঠিক করব। যে অলঙ্কার, বোল আমাকে দিয়েছিলেন, তা কিছুই বাজাই নি।'

খাঁ সাহেব হেসে বললেন, 'আরে তুমি তো আমাকে গৎ শুনিয়েছিলে? আজ তোমার

গণ্ডা বেঁধে আমার গুরুর উজিরখানি বিলম্বিত গৎ দিয়েই তোমার শিক্ষা শুরু করাব, রাগ ভৈরবে। কিন্তু যন্ত্র শুরু করার আগে তোমাকে বুঝতে হবে এই পবিত্র গণ্ডা বন্ধন সম্বন্ধে।'

'এই গণ্ডা বন্ধন প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। সঙ্গীতে গুরুবাদ অতি পবিত্র প্রথা। কঠোর সাধনে নিমগ্ন থেকে যিনি অভিষ্ট লাভে সমর্থ হতেন, তাঁরাই জ্ঞানের আলোক দিয়ে শিষ্যকে সত্যপথে চালিত করতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হতো পিতা পুত্রের। এই সম্বন্ধ মজবুত করার জন্য, গুরু শিষ্যকে গণ্ডা বন্ধন করতেন, দেবীর চরণে লাল সুতো স্পর্শ করিয়ে। এই পবিত্র সম্বন্ধ টাকা দিয়ে হয় না, ভক্তি দিয়ে হয়। পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। এই পবিত্র গণ্ডা বন্ধন বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে হয়। কিন্তু যারা গরীব, তারা কোথা থেকে অর্থ পাবে? আমার ভাগ্য ভালো তাই মুক্তাগাছার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরী অর্থ দিয়ে আমায় গণ্ডা বাঁধিয়েছিলেন উস্তাদ আহমদ আলীর কাছে। এর জন্য আমি ধর্ম-পিতা বলে জ্ঞান করি রাজা জগৎ কিশোরকে।' খাঁ সাহেব টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, 'ওই হলেন আমার ধর্ম-পিতা।' এ ছাড়া রামপুরের মহারাজাও অর্থ দিয়ে আমার গণ্ডা বন্ধন করিয়েছিলেন, সেনী ঘরাণার উজির খাঁ সাহেবের কাছে। সেই কারণে আলি আকবরের গণ্ডা আমি নিজে না বেঁধে কলকাতায় উজির খাঁ নাতি দবির খাঁর নিকট বাঁধিয়েছিলাম গুরু ঘরাণা বলে।'

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে খাঁ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'দিল্লীতে চাকরি করলে না কেন?' সব কথা খুলে বলবার পর, খাঁ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর তোমার থেকে বয়সে কত বড়?" বললাম, 'আলি আকবর আমার থেকে চার এবং রবিশঙ্কর ছয় বছরের বড়।'

এবার খাঁ সাহেব বললেন, 'তাহলে তো তুমি আমার ধর্মপুত্র হলে। আমার নাতিদের তুমি লেখাপড়ার গুরু সুতরাং তুমি তাদের কাকা হলে। আজ থেকে তুমি আমার 'বুড়ো বয়সের ছেলে' হলে। আমার বাড়ী পর্দানশীন, আজ পর্যন্ত বাড়ীতে রেখে কাউকে শিক্ষা দিই নি, একমাত্র তুমিই হলে 'ব্যতিক্রম'।

খাঁ সাহেবের কথাগুলি আমার কাছে সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করছিল, সুতরাং বললাম 'আজ থেকে আপনাকে বাবাই বলব। আমার নিজের বাবাকে হারিয়েছি যখন আমার বয়স এক বৎসর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষক হচ্ছে অতীত। সেই অতীত যদি না থাকতো তাহলে কোথায় কার কাছে এইসব কথা শুনতাম এবং সান্ত্বনা পেতাম।' এই কথাগুলি বলেই আমি আবার প্রণাম করলাম।

হঠাৎ বাবা বললেন, 'আরে কি কর? ব্রাহ্মণ হয়ে আমাকে প্রণাম করছ?' এ কথা আমার কাছে নতুন নয়। বাবাকে যখনই প্রণাম করেছি তখনই 'আরে কি কর, আরে কি কর' বলে আপত্তি করেছেন। আজই প্রথম বললাম, 'পৈতে পরলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? যে ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ।' হঠাৎ বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রহ্ম কী?' উত্তরে বললাম, 'যাঁর থেকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হয় তিনিই ব্রহ্ম। সে যে কত মহান, কত বিরাট তা বলা যায় না।, এবং বর্ণনাও করা যায় না। সুতরাং আমার কাছে আপনিই হলেন সবচেয়ে বড়

ব্রাহ্মণ।' এ কথা শুনবার পরও বাবার সেই এক কথা, 'আরে কি বলো। আমি ম্লেচ্ছ। আমি হিন্দুও হতে পারলাম না, মুসলমানও হতে পারলাম না। পূজাও করি আবার নমাজও পড়ি।'

অতঃপর বাবা চুপ করে গেলেন। তারপর বাবা বললেন, 'গণ্ডা বাঁধবার আগে কয়েকটা কথা বলি মনে রাখবে। বিবেকের কাছে খাঁটী থাকবে এবং মেয়ে মানুষের লোভ ত্যাগ করবে। রমণীর মধ্যে দুই ভাব থাকে। এক জ্ঞান অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং অপরটি হল ক্রিয়া, পুরুষরা এই ক্রিয়ারই আসক্ত হয়। রমণীর থেকে দূরে থাকবে, এবং খারাপ রমণীদের কখনও বাজনা শেখাবে না। রমণীদের প্রলোভনে ঋষিমুনিদেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাই শিক্ষাকালীন, এবং শিক্ষার পরেও, রমণীদের প্রলোভন থেকে দূরে থাকবে। সাধনার জন্য এই দুইটি জিনিষ হলো অমোঘ অস্ত্র।'

'জীবনে নানা প্রলোভন আসবে, তার মধ্যে যদি নিজের ভাসিয়ে দাও, তাহলে সঙ্গীত অনেক দূরে চলে যাবে। মা সারদা বড় অভিমানি মনে রেখো। চাষের পক্ষে যেমন লাঙ্গল, বাগানের পক্ষে যেমন মালী, পানের পক্ষে যেমন চুণ, সঙ্গীতের পক্ষেও তেমনি একাগ্রচিত্তে সাধনা অপরিহার্য। সঙ্গীতের আদর্শ, স্বপ্ন ও সত্যের মূল্য কী জান?'

বাবার সব কথাগুলোই আমার, দার্শনিক তথ্যে ভরা মনে হচ্ছিল। নিজের থেকেই বাবা বললেন, 'সঙ্গীতের আদর্শ হলো, কম কথা বলবে এবং সাধনা করবে বেশী। কোন ভালো কাজ সঙ্কল্প ছাড়া হয় না। সঙ্কল্পই পুরুষের জীবন। পবিত্র কাজের জন্য সঙ্কল্পই হচ্ছে ধ্রুবতারা। এখনও তুমি অন্ধকারের মধ্যে আছ। সঙ্গীতের মধ্যে নিরন্তর সাধনা করার পর বুঝতে পারবে, সঙ্গীতের রসটাই হলো চিরস্থায়ী সম্পদ। রাজা বদলায়, রাজত্ব বদলায়, যুগ পাল্টায়, রুচিও বদলায় কিন্তু সঙ্গীতের রস অবিনশ্বর।'

এক নাগাড়ে এত কথা বলার পর বাবা আমার হাতে গণ্ডা বাঁধলেন। গণ্ডা বেঁধে বাবা বললেন, 'তুমি তো পণ্ডিত ঘরের পুত্র। তুমি নিশ্চই জানো ধর্মীয় গুরুরা শিষ্যদের কানে বীজমন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দেন। সঙ্গীতেও তেমনিই বীজমন্ত্র দিয়েই সঙ্গীত শুরু হয়, এই বীজমন্ত্র নিজের ছাত্র কিংবা পুত্রকে ছাড়া কাউকে বলবে না। সঙ্গীতের এই বীজমন্ত্র যে সাধনা করতে পারবে, সে প্রকৃত সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। এর জন্য, প্রথমে সংযম, সাত্ত্বিক আচার বিচার হলে, বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। তারপর একাগ্রচিত্তে দুই চক্ষের উর্দ্ধে দুই ভুরুর মাঝখানে 'ওঁ' শব্দ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। চিত্তকে স্থির করে এই অভ্যাস করলে বড় একটা হীরকখণ্ড জ্বলছে দেখা যায়। অত্যন্ত কঠিন। জীবনে দুই চারবারই দেখা যায়।' এই কথা বলার পর তিনটি স্বর বারবার গলায় নিজে করে, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে করতে বললেন, এবং সর্বশেষে তারসপ্তকে একটি স্বর কয়েকবার করিয়ে, যন্ত্রের মধ্যে দুইটি বিশেষ স্বর সারাজীবন সাধনা করতে বললেন। তারপর বললেন, 'এইটীই হল সঙ্গীতের বীজমন্ত্র।'

বাবা বললেন, 'সকালে ভৈরব, দুপুরে ভীমপলাশী এবং রাত্রে ইমন বাজাবে। আজ সকালে ভৈরব রাগে প্রথমেই তোমাকে আমার গুরু উজিরখানির বিলম্বিত গৎ শেখাব। দেখি কী রকম বাজাতে পারো!' এই কথা বলার পরই ভৈরবের আরোহী অবরোহী

বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাজালাম। বাবা খুশী হলেন। এইস্থানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। রেডিও শুনে শুনে বহু রাগই আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তখনও কোমল ঋষভ কিংবা কোমল ধৈবত আমার বোধগম্যের বাইরে। কিন্তু যে মুহূর্তে, বাবা ভৈরব-এর মধ্যে, বোল দিয়ে দুই মাত্রার মুখড়া দিয়ে সমে এলেন, আমার অবস্থা খারাপ। বোল কিছুতেই হাত দিয়ে বেরোয় না। কারণ, এসব বাবা আমাকে শেখালেও রিয়াজ তো করি নি। বাবা বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। হতাশ হয়ে বললেন, 'আরে আরে আমি তো তোমাকে আমার গুরুর গৎ ভাবলাম শেখাবো, কিন্তু দেখছি কিছুই রিয়াজ করো নি।' সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'না, বাবা আমি কিছুই করিনি, কিছুদিন আমায় সময় দিন।'

বাবা সরোদ রেখে দিয়ে বললেন, 'এতদিন ছাতার কি বাজিয়েছো, নিজেকে উস্তাদ ভেবেছো এবং সকলে মিথ্যা প্রশংসা করেছে। এই মিথ্যা প্রশংসায় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। চাটুকার, নিজের লোকেরা যখন প্রশংসা করে, তখন অভিমান হয়। আর অভিমান হলেই নীচে গড়িয়ে পড়তে, অর্থাৎ পতন কেউ রোধ করতে পারে না। আসলে কি জানো, প্রশংসা শুনলে সকলেরই অভিমান বাড়ে। সেইজন্য প্রশংসা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেবে। এটা করতে পারলে তবেই সঙ্গীতের মধ্যে রাস্তা দেখতে পাবে।'

'অহংকার হলেই মা সারদা দেবীর চরণে মাথা নত করবে। তাহলেই আবার উপরে উঠতে পারবে। এখন তুমি অন্ধকারের মধ্যে আছো। সাধনা করে যাও। তারপর হঠাৎ একদিন দেখবে, একঘর অন্ধকারের মধ্যে একরাশ আলো ঢুকে পড়বে। তখন অন্ধকার আর অন্ধকার থাকবে না। তবে এই আলো আসতে বহু সাধনা দরকার। তাই বৃথা চিন্তা না করে লেগে যাও। করতে গেলে পাবেই পাবে।'

দেখতে দেখতে কখন যে আড়াই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারিনি, হঠাৎ বাবা বললেন, 'আজ থাক।' বাবা বাড়ীর বাইরে চলে গেলেন। আশিসকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম, বাবা বাজার করতে গেলেন। কি জানি কেন, নিজেকে অপরাধী মনে হলো। এই বৃদ্ধ বয়সে দুটো থলি নিয়ে বাবা বাজার করতে গেলেন। আমি স্থির করেছিলাম, আজ বাজারে যাব বাবার সঙ্গে, কিন্তু তা আর হলো না। আশিসের কাছে শুনলাম আজ দেরী হয়ে গিয়েছে বাজার যাবার। রোজ নটার সময়ে বাবা বাজারে যান। মনে মনে ভাবলাম, আগামী কাল নিশ্চই যাব বাজার করতে।

৬

সকাল দশটা নাগাদ বাজার থেকে ফিরেই, বাবা আমাকে বললেন, 'বাড়ীর থেকে সোজা গিয়ে বাঁদিকে বেঁকলেই পোস্টঅফিস। পোষ্টমাস্টারকে তোমার কথা আমি বলে এসেছি। সকাল দশটার সময় রোজ চিঠি বাছা হয়ে যায়। পোষ্টম্যান অসময়ে বাড়ীতে আসে, সুতরাং সকাল দশটায় একবার গিয়ে, চিঠি থাকলে নিয়ে এসো। আসলে পিয়নরা কাজ করতেই চায় না, নিজে গেলে চিঠি মার যাবে না। পোষ্টমাষ্টার খুব ভাল লোক। আমার কাছে তোমার কথা শুনে আলাপ করতে চান।' তারপর বাবা বললেন, 'মৈহার জায়গা ভাল নয়, কেবল পরনিন্দা এবং পরচর্চা এখানে হয়। মৈহারে থাকলে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, তবে

কাউর বাড়ী যাবে না। লোকে ভাল চায় না, সকলেই চাইবে যাতে তুমি এখান থেকে বিদায় হও, সুতরাং তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি, সর্বদা সঙ্গীতের চিন্তা করবে, সর্বদা সত্য কথা বলবে, পরনিন্দা পরচর্চার মধ্যে থাকবে না, তাহলেই যে আশা নিয়ে মৈহারে, সকল প্রিয়জনকে ছেড়ে এসেছ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যাক এবার পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করে এস।' সুতরাং আমাকে পোষ্টঅফিসে যেতে হলো। সকালে পশ্চিম দিকে খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে সারদা দেবীর দর্শন করেছি। দুপুর বেলা পূর্বদিকে গিয়ে উত্তর দিকে পোষ্টঅফিসে গেলাম। তখন কি জানতাম যাত্রাটা উত্তরে হাওয়ার মুখে পড়েছে। ভাগ্যটা খড়কুটোর মত উড়ছে বুঝতেই পারি নি।

পোষ্টঅফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম পোষ্টমাষ্টারকে। পোষ্টমাষ্টারের বয়স হয়েছে। প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে অবাক হয়ে দেখে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। বললেন, 'বাবার কাছে আপনার কথা সব শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না এম. এ. পাশ করে, চাকরি না করে কেন গান বাজনা শিখতে এসেছেন?' এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে অনেক হতে হয়েছে, সেইজন্য আশ্চর্য হলাম না। আসলে মৈহার একটি ছোট রাজার স্টেট। একটিই পোষ্টঅফিস আছে, 'রাজকীয় হাসপাতাল' আছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল আছে, এছাড়া ওষুধের একটি দোকান, সোনার দোকান এবং নামেই আছে একটি ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউস। দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা আলো জ্বলে সন্ধ্যার সময়। ব্যবসার মধ্যে, পানের বরজ এবং চুনের ভাট্টা আছে, যার মধ্যে কিছু লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে বিড়ির তামাকের ব্যবসা। আছে একটি পুলিশ-থানা এবং জেল। পোষ্টমাষ্টার এক নাগাড়ে মৈহারের সব কথা বলে বললেন, 'এ ছাড়া দুটি জিনিষ যা মৈহারের সম্পদ। এক হল মৈহারের সারদা দেবী এবং দ্বিতীয় হলো উস্তাদ 'বাবা।' যেহেতু মৈহারের রাজার গুরু ছিলেন এই উস্তাদ বাবা, তাই তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সঙ্গীতের তত্ত্বজ্ঞান কারোরই জানা নাই।'

পোষ্টমাষ্টার এবার সরাসরি বললেন, 'সঙ্গীত শিখে কিই বা হবে? এত লেখাপড়া করে একটা চাকরি করলে কত লাভ হত? এখন রাজার রাজত্ব নাই, রাজা চলে গেছেন জব্বলপুরে। রাজার ছেলেরা মৈহারে আছে। তারা কিছুই করে না, রাজার টাকায় দিন চলে। মহারাজার সময় অর্কেস্ট্রা ছিল, উপস্থিত এখনও আছে, নাম মাত্র টাকা পায়। সুতরাং সঙ্গীত শিখে এখানে কি করবেন?'

পোষ্টমাস্টারের কথা শুনে মনে হলো কত সরল লোক। তিনি আমাকে সাবধান করে বললেন, 'মৈহারে ম্যালেরিয়া রোগে সকলেই ভোগে সুতরাং খুব সাবধানে থাকবেন।' তার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'আপনার কথা মনে থাকবে। তবে আপনি এখানে থেকে বোধ হয় জানেন না, যে ভারতবর্ষে উস্তাদ বাবার মতো এত বড় সঙ্গীতজ্ঞ আর নাই। মৈহারে কোন চাকরির জন্য আমি আসি নি। মৈহারে এসেছি সঙ্গীত শিক্ষা করতে। এই মৈহারে সঙ্গীত শিক্ষা করেই তিমির বরণ ভট্টাচার্য, রাম গাঙ্গুলি, পান্নালাল ঘোষ, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর সারা ভারতে নাম করেছে।'

সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ, বোধ হলো পোষ্টমাষ্টার বুঝলেন এবং বললেন, 'খুব আনন্দের কথা, আপনার মত লোক লেখাপড়া করে সঙ্গীত শিক্ষা করতে এসেছেন, মৈহারের এতে গৌরবই বাড়বে।' পোষ্টমাষ্টার পিয়নকে বললেন চা এবং পান আনতে। আমি বারণ করলাম। পোষ্টমাষ্টার বললেন, 'সে কী কথা? আমার কাছে আজ এসেছেন এটুকু আতিথ্য না করলে যে আমার অপরাধ হবে।'

চা পানের সময় পোষ্টমাষ্টার বললেন, 'সারা দিন একবারই চিঠি বিলি হয় সকাল দশটার পর। তবে পোষ্টঅফিসে এলে চিঠি সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। বিকেল পাঁচটার পর চিঠি স্টেশনে চলে যায় এবং রাত্রের গাড়ীতে সব জায়গায় চিঠি যায়। বিকেল পাঁচটার পর যদি জরুরী কিছু থাকে, তাহলে লেট ফি পেড দিয়ে স্টেশনে ডাকবাক্সে ফেলে দিলেও রাত্রের ট্রেনে চিঠি চলে যায়।'

হঠাৎ দেখি বাবার চাকর বুদ্ধা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলুন। বাবার স্নান করার সময় হয়ে এসেছে।' আমি তৎক্ষণাৎ বুদ্ধার সঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় বুদ্ধাকে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি বাবা স্নান করেন।' উত্তরে বুদ্ধা বলল,'ঠিক বারোটার সময়ে বাবা স্নান করেই খেতে বসে যান। আপনার দেরী দেখে বাবা খুব চটে গেছেন। আমাকে মা পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে।' আমি তো অবাক, এ আবার কি হলো? বাবাই তো আমাকে পাঠিয়েছেন পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করতে। দৌড়তে দৌড়তে বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলাম। বাড়ী গিয়ে দেখি বাবা স্নান করে পায়চারি করছেন।

যখন গিয়েছিলাম তখন বুঝি নি আমার পোষ্টঅফিস যাত্রা, কালাপানির যাত্রার মতো। শরৎ এর আকাশ বেশ ফুটফুটে ছিল। মনটায়, বাবার সকালে ভাল ব্যবহারে, তুলতুলে পেঁজা তুলোর মত কয়েকটা আদুরে মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ফেরত এসে দেখলাম বেমক্কা উত্তুরে হাওয়ায় আদুরে, মিষ্টি স্ফুর্তির মেঘগুলো কোথায় বা উড়ে পালিয়ে গিয়েছে এবং তার জায়গায় স্থান নিয়েছে প্রাক্ বর্ষণের জলদ গম্ভীর মেঘ। বাবার কথায় প্রথম বজ্রপাত হলো। বললেন, 'পোষ্টঅফিসে গিয়ে কি ডাকটিকিট হয়ে গিয়েছিল?' বুঝলাম ওখানকার অবস্থানটাকে উনি বেশী ভেবে, আঠার মতো আটকে গিয়েছি এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। আমতা আমতা করে বললাম, 'না, মানে আপনিই তো যেতে বলেছিলেন পরিচয় করতে, তাই কথা বলতে যা একটু দেরী হয়ে গিয়েছে।' আর সেইটাই বোধহয় ভুল করলাম। বাবার সওয়ালের জবাব হয় না, এটা জানতাম না তো! আবার হোলো বজ্রপাত। সেই বিদ্যুৎ ছটায় ছোট্ট নদীতে বন্যা দেখলাম। যেখানে বাবার সম্বন্ধে ধারণা ছিল, 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে' সেখানে হঠাৎ রাখালের চোখে দেখলাম কৃষ্ণকুটীল জল, তুলি লক্ষ ফনা বজ্রহুঙ্কারে বেরোলো, 'চোপ্ শুয়ারকে বচ্চে'।

'বরাহ' অবতার হিসাবে নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু সম্বোধনে যে ভাল নয়, সেটা ছোটবেলা থেকেই জানতাম। তাই প্রমাদ গুণলাম। কোন রকমে কাক স্নান করে খেতে বসলাম। খাবো কী? কানে তো সেইকথাগুলোই বাজছে। 'সময়ের জ্ঞান নাই, শহুরে ছেলে, কবিরাজ

আশুদাদু তো ঠিকই বলেছিলো চঞ্চল, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আর আমার চোয়াল হচ্ছিল বারবার শক্ত। বারবার মনে হচ্ছিল, ভরত জননী মহিলাটি বোধহয় ভালই ছিলেন। খেলাটা দেখিয়েছিলেন দুর্মতি মন্থরা। সিনেমার ডায়লগের মত ইকো হচ্ছিল কবিরাজ, কবিরাজ, কবিরাজ; আশুদাদু, আশুদাদু, আশুদাদু; চঞ্চল, চঞ্চল, চঞ্চল।

অপরাধী জানল না অপরাধ কি বা, প্রাণদণ্ড হল তার অকস্মাৎ যেথা। কিন্তু এত ভাববার সময় কোথায়? খেতে বসেও তো বাবার গ্রাস পোরা এবং গেলার ফাঁকে যতক্ষণ সময়, তাতেও গর্জন আর বর্ষণ বন্ধ ছিল না। বকুনি খাবার ব্যাপারে আমি মরুভূমির দেশের লোক ছিলাম। গর্জন আর বর্ষণ দুইই দেখিনি। তাই এঁড়ে বাছুড়ের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে প্রত্যুত্তরও করছিলাম। যাইহোক, বাবার কাছে খাওয়াটা ছিল ইপি ডিস্কের মতো, তাই ঝড়ের বেগে শেষ হয়ে গেল। তার সাথে শেষ হলো ভৎর্সনার পালা।

যাক, ভাবলাম এ বেলার মতো মুক্তি। আর বোধহয় পরের বেলা আসবে না। কারণ বিদায়বেলায় বাঁশীর সুর তখন শুনতে আরম্ভ করেছি। মাথায় ঢুকলো, না শেখাবার এও হয়ত এক আজব ফন্দী। সোজা কথায়, না বললেই তো হতো, গুষ্টির তুষ্টি করার কি দরকার ছিলো?

মনোভাবটা প্রকাশ করে ফেললাম মার সামনে। চেরাপুঞ্জির মানুষ মা। রাতদিন বর্ষণ দেখতে অভ্যস্ত। আর পূর্ণিমার রাতে সৃষ্ট অন্নপূর্ণাদেবী। দুজনেই দুর্যোগ দেখতে অভ্যস্ত। আমার অসহায় মুহ্যমান অবস্থা দেখে, ওঁরা ব্যাপারটা খোলসা করে বোঝালেন। এতোদিন তো জলের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এভারেস্ট থেকেও বড় পর্বতের শীর্ষটা কেবল দেখছিলাম। ওঁরা একদিনেই, হাত ধরে বিশাল উত্তাল জলরাশিকে পার করে দূরের জল মগ্ন পাহাড়টার কাছে পৌঁছে দিলেন। বোঝালেন, এই পাহাড়টার দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরে, প্রচেষ্টার বায়ুকে যদি বুকভরে নিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে পারি, অতলে আর গভীরে, তাহলে অরূপ রতনের জন্য ডুব দেওয়া সফল হবে।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'বাবা শিব এবং রুদ্র। অল্প রুষ্ট, অল্পেই তুষ্ট। ওনার তালে তাল দেওয়াটা একটু অভ্যাস করলেই সড়গড় হবে। সময়ের ব্যাপারে উনি মহাকাল। পান থেকে চুন খসলে ঝামেলা।' একটা কথা বুঝলাম, বাবা নিজের জীবনটা অঙ্কের নিয়মে পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে এতটুকু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। এরপর তিনি বাবার পছন্দ অপছন্দের কথা বিস্তারপূর্বক আমাকে বোঝালেন। অন্নপূর্ণা দেবীর কথা শুনে মনে হল, কিছু পেতে হলে সামান্য কিছু ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং মতি স্থির করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় পথটাই মেনে নিলাম। আজ এতদিন পরে সব নতুন করে মনে পড়ছে। সে দিন যদি অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বাবার পছন্দ অপছন্দের কথা না বলতেন, তাহলে বোধহয় মৈহারে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না।

ঘড়ি দেখে আড়াইটের সময় আশিসরা গান শুরু করে দিল। আমি আমার ঘরে বসে বাজাতে লাগলাম। ঠিক সাড়ে তিনটের সময় চা খাবার সময় হল। চা জল খাবার খেয়ে বাবা ব্যাণ্ড পার্টিতে যাবার সময় আমাকে বললেন, সঙ্গে যেতে। তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে বাবার সঙ্গে

বেরোলাম। রাস্তায় যেতে যেতে যার সঙ্গে দেখা হয়, সকলেই বাবা ব'লে হাত জোড় করে, উত্তরে বাবা আদাব আদাব করেন। এ এক অন্য মূর্তি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে আবার সেই উত্তরের রাস্তায় বাবা চলতে লাগলেন। সেই পোষ্টঅফিস। বাবা হঠাৎ পোষ্টঅফিসের ভিতর ঢুকলেন। আমার তো অবস্থা খারাপ, কি না কী বলবেন। বাবাকে দেখে পোষ্টমাষ্টার দাঁড়িয়ে উঠে আমার খুব প্রশংসা করলেন। বাবা বললেন, 'ইয়ে হামারা বুড়াপা কা বেটা (অর্থাৎ এ আমার বুড়ো বয়সের ছেলে,) কাল থেকে সকালে এসে চিঠি পত্র নিয়ে যাবে। আজ ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি ব্যাণ্ড শোনাবার জন্য।' একদিকে যেমন অবাক হলাম, অন্যদিকে সেই রকম আনন্দ হলো। পোষ্টমাষ্টারের কাছে দেরী করেছি বলে আমাকে বকেছিলেন। এই কথা ভেবে অবাক হলাম এবং আনন্দ হলো এই ভেবে যে, বহুদিন থেকে যে অর্কেষ্ট্রার কথা শুনেছি সেই বাজনা আজ শুনতে পাব। পোষ্টঅফিস থেকে কিছুটা গিয়েই একটা বড় বাড়ীর ভিতর ঢুকলাম। বাবা ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, দশ বারোজন সব দাঁড়িয়ে বাবাকে প্রণাম করছে। ঘরে দেখলাম বহু বাজনা। বাবা বসবার পরে সকলে নিজের বাজনা নিয়ে বসল। কাশীতে বীরু মহারাজ এর অর্কেষ্ট্রাতে বেহালা, হারমোনিয়াম, সেতার, তবলা এবং জলতরঙ্গ দেখেছি।

কিন্তু এখানে কয়েকটা নতুন যন্ত্রও দেখলাম যা আগে দেখিনি। তবলার বদলে দেখলাম ঢোলক। ঢোলক যে বাজায় দেখলাম অন্ধ। দুজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে, দুজন ভায়োলিন। একটা দেখলাম বিরাট বড় ভায়োলিনের মতো যন্ত্র বাজাচ্ছে টুলের উপর বসে। এ ছাড়া একটি নতুন যন্ত্র দেখলাম, নীচের দিকটা সেতারের মত এবং উপরের দিকটা সরোদের মত চামড়া দেওয়া। এ ছাড়া বিরাট জায়গা নিয়ে একজন বসেছে ছোট বড় লোহার রড নিয়ে, আমি অবাক হয়ে দেখছি। হঠাৎ সকলের দিকে তাকিয়ে বাবা আমার পরিচয় করিয়ে বললেন। 'কাশী থেকে আমার বুড়ো বয়সের ছেলে এসেছে, জাতে ব্রাহ্মণ।' ব্রাহ্মণ বলে, আমাকে বললেন পৈতে দেখাতে আমি তো অবাক। জামার বোতাম খুলে পৈতে বার করে একটু দেখালাম। বাবা বললেন, 'খুব লেখাপড়া জানা ছেলে এম.এ. ডবল এম.এ. ল, জজিয়াতি।' আমি তো অবাক, এ আবার কি উপাধি। এসব উপাধি তো আমি বাবাকে কখনও বলি নি। কেবল এম. এ. পাশ করে মৈহারে এসেছি।

হঠাৎ বাবা আমাকে লোহার রডগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এ বাজনা কখনো দেখেছ?' কী না। উত্তরে বললাম, না'। বাবা হেসে বললেন, 'বন্দুকের নল কেটে এ যন্ত্র তৈরী করেছি। নাম দিয়েছি 'নলতরঙ্গ'। সেতার এবং সরোদ এর মতো বাজনাটা দেখিয়ে বাবা বললেন, 'এ যন্ত্রটিও আমি তৈরী করেছি। নাম দিয়েছি 'সেতারব্যঞ্জো'। এর নাম 'তার সরোদ'ও হতে পারে। সেতারের 'সে' নামটা হঠিয়ে দিয়ে 'তারসরোদ'ও বলা চলে। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এরা হচ্ছে কুঢ়।' এ আবার কি ভাষা? কুঢ় মানে বুঝলাম না। বাবা বললেন, 'মৈহারের মহারাজের কথায় সব ছোট ছোট ছেলেদের ধরে এই ব্যাণ্ড পার্টি তৈরী করেছি, মাথা নাই, মাথায় গোবর পোরা।' দশবারজন যারা ব্যাণ্ড বাজায়, দেখলাম মাথা নীচু করে বসে আছে। বয়স সকলের ছত্রিশের কম তো নয়ই, এক এক জন এর বেশীও হতে পারে।

এরপরই শুরু হলো বাজনা। প্রথমেই হুংকার দিলেন বাবা, আরে জলদি মিলাও অর্থাৎ যন্ত্র তাড়াতাড়ি মেলাও। যে সেতার বাজাচ্ছিল তাকে বললেন, 'আরে মল, মল'। এও এক নতুন কথা আমার কাছে। মল বলতে তো মলমূত্রই জানি। কিন্তু সেতার বাজনার মধ্যে মল শব্দের সম্বন্ধ কী? চুপ করে রইলাম। এরপর বাজনা শুরু হল। রাগটা জানা মনে হলো, কারণ এ গৎটা শুনেছি।

রাগটা ইমন, কিন্তু অদ্ভুত কমবিনেশন। নলতরঙ্গ বাজনাটা একটা বিশেষ সম্পদ। মনে হোলো জলতরঙ্গের বদলে এই নলতরঙ্গ। মাঝে মাঝেই বাবার হুংকার, এবং একজনের প্রতি মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাচ্ছেন, যে তাদের অবস্থা আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাজনার শেষে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রাগ বলো তো?' নিঃসঙ্কোচে বললাম 'ইমন।' বাবা খুশী হলেন। এরপর আবার শুরু হলো। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একের পর একটা বাজনা হলো। মনে হাজারো ইচ্ছা থাকলেও, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না কি রাগ। একটা রাগও বুঝতে পারলাম না। অর্কেস্ট্রা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাজনার শেষে একটা চুরুট ধরালেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'রোজ এই খাটছি দীর্ঘদিন ধরে। কেননা এর জন্য টাকা পাই। সুতরাং ফাঁকি দিলে তো চলবে না। তবে এই বেগার খেটে, মূর্খদের সঙ্গে থেকে থেকে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল।'

এরপরই বাবা উঠলেন। অর্কেষ্ট্রার সকলেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং প্রণাম করল। বাবা সকলকেই সেই এক কথা, জীতে রহো, 'অর্থাৎ বেঁচে থাকো। দুটো কথা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রইল, কুঢ় এবং মল, এর অর্থ কী? এ দুটো কথার অর্থ পরে বুঝেছি।

ব্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে দেখি, একজন বাবাকে বলছে, বহুত আচ্ছা মছলি হায় বাবা। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ মাছ কাশীর গঙ্গার নয়' বাবা একটা বড় মাছ কিনলেন, থলেতে মাছ ভরলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি থলেটা নিয়ে নিলাম। বাবা বললেন, 'আরে কি কর? কি কর?' কিন্তু আমি থাকতে বাবা থলিটা নেবেন, এটা কি কথা? যাই হোক বাবা খুশীই হলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'ঠিক আছে মাছটা নিয়ে তুমি বরং বাড়ী যাও, আমি বাজার থেকে তইল নিয়ে আসছি।' তইল কথাটা বুঝলাম না, বললাম 'আপনি একা কেন যাবেন? চলুন আপনার সঙ্গে আমিও যাব।' বাবা বললেন,'ঠিক আছে জায়গাটা চিনে রাখো, আমার অবর্তমানে এই জায়গা থেকে মাছ কিনবে এবং বাজার থেকে তইল কিনবে।' বাবার সঙ্গে গেলাম। বাবা বললেন, 'এইটা হচ্ছে বাজার।' বাজারের কোণের দিক দেখিয়ে বললেন, 'ওই দোকানগুলো হলো চাল, ডাল, গম এবং ঘি এর আড়ৎ।' কিছুটা দূর যাওয়ার পর একটা দোকানের সামনে এসে বাবা দাঁড়ালেন। দোকানের সামনে হিন্দিতে লেখা আছে, 'খাটী ঘানির সরষের তৈল এখানে পাওয়া যায়'। দেখলাম, একটা বলদ ঘুরছে এবং একটা লোক, মাঝে মাঝেই সরষে ফেলছে একটা জায়গায়। কাশীতে এ জিনিষ দেখা ছিল বলেই বুঝতে পারলাম বাবা তইল বলতে তেল বোঝাতে চেয়েছিলেন। বাবাকে দেখেই দোকানদার নমস্কার করল। বাবা বললেন, 'আজ অমি বোতল আনি নি, একটু পরে বোতল এনে তইল নিয়ে যাবো।'

দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'নতুন বোতলে তেল দিয়ে দেবো'। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে তইল দিয়ে দাও, বাড়ী গিয়ে আবার বোতল ফেরৎ দিয়ে যাব।' দোকানদার বলল, 'বোতল ফেরৎ দেওয়ার দরকার নাই।' বাবা বললেন, 'এইসা না, এইসা না। তোমাকে বোতল কিনতে হয়েছে।' আমি বললাম, 'বাড়ীতে গিয়েই আমি বোতল ফেরৎ দিয়ে যাব।' বাবা বললেন, 'আরে তুমি কেন কষ্ট করবে?' আমি অবাক হলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে, এত কাজ করে বাবা বোতল ফেরৎ দিতে আসবেন, আর আমি বাড়ীতে থাকব! যাই হোক, তেল নিয়ে বাড়ীতে আসবার সময় যার সঙ্গে দেখা হয়, সকলেই দেখি বাবাকে 'বাবা' বলে নমস্কার করে, আর উত্তরে বাবা কাউকে বলেন, 'জিতে রহো' আবার কাউকে বলেন 'আদাব'।

ফেরার পথে বাবা বললেন, 'মৈহার ছোট্ট জায়গা, মৈহারের প্রায় অর্ধেক দেখলে, বাকী অর্ধেক উত্তর দিকে রাজার কিলা এবং কিছু বস্তি আছে।' যাই হোক বাড়ীতে ফিরেই আমি তেলটা মায়ের হাতে দিয়ে বললাম, 'এই তেলটা ঢেলে রাখুন, এক্ষুনি বোতলটা ফেরৎ দিয়ে আসব।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আরে, তুমি কি এই সব করতে এসেছ? তুমি এখন বাজাও আমি গিয়ে বোতল ফেরৎ দিয়ে আসব।' আমি কোন কথা না বলে বোতলটা ফেরৎ দিতে গেলাম। তখন বাবা আর আপত্তি করলেন না। যথাশীঘ্র বোতল ফেরৎ দিয়ে ফিরে এসেই দেখি, বাবা নমাজ পড়া শেষ করেছেন।

সকলেই একে একে বাবাকে প্রণাম করল এবং আমিও প্রণাম করলাম। বাবার মুখে কথা নাই, কেবল একজন যেই প্রণাম করছে, বাবা হাতটা উঠিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছেন। বাড়ীর বাইরে লোকেদের সঙ্গে কত কথা বললেন, অথচ বাড়ীতে ঢুকেই যেন বাবার মুখে কথা নাই। এর মধ্যেই দেখলাম, মা ধুনুচী নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। ধুনো এবং গুগগুলের গন্ধ পেলাম। বাবা নিজের থেকে বললেন, 'মশার জন্য রোজ ধুনো দিতে হয়।'

বাবা বললেন, 'একটু পরে ঘরে যাব, মশাগুলো একটু মরুক তারপর আজ আশিসকে শেখাব। তুমি বসে শোন, কাল তোমাকে শেখাব।' কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানার ঘরে বাবা আশিসকে নিয়ে বসলেন। মৈহারে বেশ শীত পড়েছে। আশিস একটা কোট এবং পায়জামা পরে বাজাতে বসল বৈঠকখানার ঘরে, ঢুকবার জায়গায় আমি বসলাম। মা হঠাৎ দেখলাম কল্কেতে তামাক নিয়ে এসে দিলেন। গড়গড়ায় বাবা তামাক টানতে লাগলেন। সব নাতিরা এসে যেমন গান গায়, গান শুরু হল। একের পর এক পাল্টা, আশিস সরোদে বাজাচ্ছে এবং গাইছেও। যখন পাল্টা শেষ হয়ে গেল তখন একটা গান শুরু হল।

স্থায়ী

সুর সাধো গুনী, সুরকে পহচানো
সুরকো জো নঁহী পহচানে, সো হোতো নির্গুনী।

অন্তরা

বেসুরা গায়ক বাদক, সো হি গু খাওয়ত
সুর জ্ঞান জো করে, করত অমৃত পান।

গানটা ইমনে শুরু করার আগে বাবা বললেন, 'নাতিদের জন্য এই গানটা রচনা করেছি তেওড়া

তালে।' নাতিদের গান গাইতে বললেন। পুরো গানটা একবার হয়ে যাবার পর যখন স্থায়ীর শেষটা হচ্ছে, সো হোতো নির্গুনী, এতটা শেষ করে বাবা হঠাৎ গলায় একটা সুর লাগিয়ে একজনকে সুরে জিজ্ঞেস করছেন, 'কি সুর বল। বাবা গলায় 'প' বলছেন, কেউ যদি বলল, 'ধ', সঙ্গে সঙ্গে বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'দাদু তুমি গু খেলে'। তারপর সেই এক সুর লাগিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন। আর একজন যেমনি 'প' বলল বাবা খুসী হয়ে বললেন, 'দাদু তুমি অমৃত খেলে'। এইরকম চলল কিছুক্ষণ একবার মধ্য সপ্তকের, একবার মন্দ্র সপ্তকের, তো একবার তার সপ্তকের। আমার কাছে এও এক বিস্ময়। গলায় আমি সুর ঠিক করতে পারছি, কিন্তু মনে মনে যে সুর ভাবছি, তা দেখছি ভুল। ভাগ্য ভাল বাবা আমায় জিজ্ঞেস করেন নি, নইলে ওই ছোট ছেলেদের সামনে বারবার আমকে গু খেতে হোত। এ রকমই বাবা প্রথমে ধ্যানেশ, বেবী, শুভ এবং আশিসকে ক্রমানুসারে জিজ্ঞেস করতেন। কেউ ঠিক বললেও, আবার একজনকে সেই সুর জিজ্ঞেস করতেন। ফলে অন্য জন ভাবতো ভুল করেছে, ভেবে অন্য সুর বলতো, সঙ্গে সঙ্গে বাবা হেসে বলতেন, 'দাদু তুমি গু খেলে।' আগে যে ঠিক বলেছে, তাকে বলতেন, 'অমৃত খেলে।' একটা জিনিস দেখে অবাক লাগতো, যে আশিস ও শুভ প্রায় বেশীর ভাগই ঠিক বলতে পারে। এত অল্প বয়সে কি করে সুর চিনতে পারে, জানার আমার খুব আগ্রহ হলেও, জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

খেলাচ্ছলে এই সুর চেনবার কায়দা আজও যখন ভাবি, আমার কাছে বিস্ময় লাগে। গান শেষ হবার পর বাবা বললেন, 'এই নাতিদের নিয়েই বেঁচে আছি। টাকার থেকে টাকার সুদ বড় মিঠে। পুত্রকে মূত্র জ্ঞান করবে, পুত্রের কাছে কিছু আশা করবে না।' আমার কাছে এ আরও এক বিস্ময়, যে লোক এত গম্ভীর, একেক সময়ে ছেলেমানুষের মত কথা, হাসি, এবং পরমুহূর্তেই সেই গম্ভীর (মুদ্রা) রূপ।

যা হোক ওদের গান শেষ হবার পর বাবা সরোদ নিয়ে বসলেন। তিনি বাজাতে লাগলেন, আশিসও সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগলো। আশিস যেমন পাল্টা বোল ইত্যাদি বাজিয়ে গৎ বাজায়, বাবাও সেইগুলোই বাজাতে লাগলেন। অত ছোট ছেলে এরকম বাবার সঙ্গে বাজাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে শুনছি। হঠাৎ বাবা চিৎকার করে বললেন, 'আরে জোর সে বজাও শুয়ার কে বচ্চে। হাতে জোর নাই? অসুরদের খাবার, 'মাংসের নলি' আলাদা করে এনে দি শক্তির জন্য, কিন্তু হাতে জোর নেই কেন?' এখন বুঝলাম, শুয়ার কে বচ্চে কথাটা বাবার মুদ্রাদোষ। আশিস মাথা নীচু করে বাজাতে লাগল। বাজনা শেষ হল। হঠাৎ বাবা বললেন, 'ইমনের দ্রুত গৎ আর একটা শিখিয়েছিলাম, সেটা বাজা' এই কথা বলে বাবা নিজের সরোদটা রেখে তামাক খেতে লাগলেন। আশিস বাজনা বন্ধ করে চুপটি করে বসে রইল। বাবা বললেন, 'কিরে শুয়ার কে বচ্চে ভুলে গেছস?' আশিস চুপটি করে বসে রইল। এবার বাবার গলার আওয়াজ একটু জোর হল, গলায় গৎ-এর প্রথমটা একটু বলবার সঙ্গে ই আশিস বাজাল, তারপরেই আবার চুপ, এইবারে বাবার গলার আওয়াজ সপ্তমে চড়ল, বললেন, 'আরে শুয়ার কে বচ্চে, তোর বাবার চাকর আমি? তোর বাবা তো, আমার কথা ছেড়ে দে, তোর দিদিমার কথাও একবার ভাবে না, আসেও না, এই বুড়া বয়সে এতো কষ্ট

করে শেখাই, আর সব ভুলে যাস?' এই কথা বলেই তিনি দাঁড়ালেন এবং নিজের ঘরে গেলেন। হঠাৎ দেখলাম, একটা লাঠি নিয়ে এসে কী অমানুষিক মার মারলেন, কল্পনা করা যায় না। মা ঘরে এসে বললেন, 'আরে কী করো? নাতিটা যে মরে যাবে।' মাকেও বাবা বলে উঠলেন, 'চুপ, শুয়ার কে বচ্চে, তোমাদের আদরেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' মার মুখ দিয়ে আর কথা নাই, কিন্তু বাবা কি ভেবে আর মারলেন না।

আমার অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। মৈহারে আসবার আগে শুনেছিলাম বাবা রাগী, ছাত্রদের মারেন, আরো কত কথাই শুনেছিলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ যা দেখলাম, আমার মনে হোল, আমাকেও না মেরে বসেন। ভয়ে আমি একটু একটু করে পেছনে সরছি, ভাবছি নিজের ঘরে চলে যাই। বাবার নজরে পড়ে গেছি। বাবা আমাকে বললেন, 'তুমি ভয় পেও না, তোমাকে মারব না, কারণ তুমি এম. এ. পাশ করেছ, তবে না বাজাতে পারলে বকব। আমি সকলের চুল ছোট করে দি। কিন্তু তোমার কোঁকড়ান চুল খুব ভাল, তাই কাটতে বলি নি।' আশিসকে দেখিয়ে বললেন, 'এই শুয়োরের বাচ্চা খুব ভুলো, যা শেখাই সব ভুলে যায়। তুমি ওকে পড়িয়ে একটু মানুষ করো।' এই কথা বলার পরই বাবা গৎটি বাজালেন, আশিসও সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে গেল। অবাক হলাম, এত মার খেল কিন্তু আশিসের চোখে জল নেই, যেন কিছুই হয় নি। এরপর বাবা আশিসকে বললেন, 'যাও এবার গিয়ে ভরো'। এই 'ভরো' কথাটিও আমার কাছে নতুন। ভরো বলতে বাবা কি বোঝালেন, আমি বুঝলাম না। পরে বুঝেছি, গোগ্রাসে খাবার খাওয়াকে বাবা প্রায়ই বলতেন, 'দিনরাত ভরো, কিন্তু বাজাবার বেলায় কিছুই নয়।'

রাত্রি দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই খাবারের ডাক এল। বাড়ী নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোন কথা নেই, খাবার খেয়ে বাবা নিজের ঘরে গেলেন এবং আমিও নিজের ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনে বাবার ঘরে গিয়ে দেখি, বাবা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। আমি স্তম্ভিত। এ কি হলো। কাঁদতে কাঁদতে বাবা বললেন, 'ওই শুয়ার কে বচ্চের কি হোল। ও তো এখন পড়ে পড়ে ঘুমোবে। শুয়ার কে বচ্চের গণ্ডারের চামড়া। ওই লাঠিগুলো আমার গায়েই পড়েছে। আমি নরাধাম। শেখাবার সময় আমার রাগ চণ্ডালের মত হয়ে যায়।' এই কটি কথা বলে বাবা বোধহয় একটু সঙ্কুচিত হলেন আমার কাছে, বাবার দুর্বলতা আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে বলে। আমি স্তব্ধ। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, অথচ নিজের ঘরে চলেও আসতে পারছি না। বাবা নিজেকে সামলে নিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক খেতে লাগলেন। আমার মনে হলো ছাত্রদের কাছে বাবার বাইরেটা ইস্পাতের মত কঠিন, কিন্তু তার মনটা ছিল তুলোর মত নরম। ছাত্রদের যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, আবার নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে, সেই রকম কঠোর এবং তৎপরও ছিলেন। কঠোরতা ও করুণার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

তাঁর বাইরেটা যত কঠিন, ভেতরটা ততই কোমল। সত্যিই, মানুষের ভিতর চিনতে অনেক বাকী এখনও। বাবার বাড়ীর আবহাওয়া আর পাহাড়ের আবহাওয়া দুইই সমান অনিশ্চিত। এই রৌদ্র এই বৃষ্টি, কখন কী হবে টের পাওয়া যায় না। বুঝলাম বাবার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। ওয়ার অফ নার্ভস্।

বাবার কথাতেই সম্বিত ফিরে পেলাম। বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন, 'বস, বস!' বাবার শোওয়ার খাটের সামনে সোফাসেট, তাতেই আমাকে বসতে বললেন। দ্বিধাবশতঃ আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবা আবার যখন বললেন বসতে, তখন সঙ্কুচিত হয়ে বসলাম।

বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি নিয়ে এম. এ. পাশ করেছ?' উত্তরে বললাম, 'দর্শন'। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতে কী আছে?' বিনীতভাবে বললাম, 'দর্শনের একটাই উদ্দেশ্য, মানুষ কী উপায়ে দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে, এই বিষয়ে পথ নির্দেশ করা।' বললাম, 'দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্যই এই। এই দর্শনের মধ্যে ন্যায়, তর্কশাস্ত্র ছাড়াও আরো বহু কিছু আছে।' বাবা বললেন, 'ন্যায় কাকে বলে?' উত্তরে বললাম, 'সংশয় দূর করার উপায়কে ন্যায় বলে। যুক্তির দ্বারা বোঝানোকেও ন্যায় বলে। গৌতম বুদ্ধের যুক্তিকেও ন্যায় বলে। বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে কোন জিনিসের প্রমাণ করাকেও ন্যায় বলে। এর নামই ন্যায় শাস্ত্র।' বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করলে মুক্তি পাওয়া যায়?' উত্তরে বললাম, 'ষোলটি পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হলে মুক্তি পাওয়া যায়। এই ষোলটি পদার্থ হলো, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাষ, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ। মুক্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বা উদ্দেশ্যে, ন্যায়দর্শন রচিত হয়েছে।'

এ কথা শুনে হঠাৎ বাবা বললেন, 'আরে আরে, তুমি তো খুব পণ্ডিত, কিন্তু বাজাতে পারনা কেন?' এ কথা বলেই হেসে বললেন, 'তুমি হলে মহামূর্খ পণ্ডিত। লেখাপড়ায় পণ্ডিত, কিন্তু সঙ্গীতে মহামূর্খ।' এই কথা বলবার পরই বাবার খাটের কাছে যেখানে রেডিও ছিলো, বহু বই এবং খাতার ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে আমাকে পাঁচটি বই দিলেন। বললেন, 'তুমি তো লেখাপড়া করেছ। প্রত্যেকমাসে আমার কাছে এই বইগুলি আসে, পোড়ো।' বইগুলো নিয়ে দেখলাম, মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' এবং 'বসুমতী'। এই দুইটি পত্রিকা আমার দেখা ছিল কাশী থাকাকালীন, পড়তামও। পত্রিকা দুটি পেয়ে খুব আনন্দ হোল, যা হোক পড়বার কিছু খোরাক পেলাম। এ ছাড়াও, দুইটী সঙ্গীতের মাসিক পত্রিকা দেখলাম একটি বাংলায় অপরটি হিন্দিতে। বাংলায় সঙ্গীত মাসিক পত্রিকাটির নাম হোল 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' এবং হিন্দি পত্রিকাটির নাম হল 'সঙ্গীত'। সঙ্গীতের এই দুইটি মাসিক পত্রিকা আমার দেখা ছিলো না। এ ছাড়াও বাবা আরো একটি বই দিলেন, 'ভারতীয় সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', লেখক বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

বইগুলি দিয়ে বাবা আমাকে বললেন, 'এই বইগুলি কি পড়া?' উত্তরে বললাম, 'ভারতবর্ষ' এবং 'বসুমতী' কাশীতে পড়তাম। কিন্তু সঙ্গীত মাসিক পত্রিকাদুটি আগে কখনও দেখিনি।' বাবা বললেন, 'সঙ্গীতের মাসিক পত্রিকাগুলি পোড়ো। এগুলি পড়লে সঙ্গীতের কিছু জ্ঞান হবে। তুমি তো লেখাপড়া করেছ, সুতরাং আমার নাতিদের তুমি একটু মানুষ করো লেখাপড়া শিখিয়ে।'

এবার আমার চমকাবার পালা। হঠাৎ মাকে দেখি, তামাকের কল্‌কে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন গম্ভীর হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বাবা এবং মাকে প্রণাম করে বইগুলো নিয়ে ঘরের

বাইরে চলে এলাম। বাইরে বেরিয়েই দেখি আশিস। মনে হলো, সিঁড়ি দিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী উপরে উঠছেন।

আশিসকে দেখে বললাম, 'কি রে কি করছিস?' আশিস সরলভাবে বলল, 'আপনি দাদুর কাছে কী বলছিলেন, তাই দিদা, (অর্থাৎ ঠাকুমা) পিসিমা, (অর্থাৎ অন্নপূর্ণা দেবী) ও আমি শুনছিলাম। দাদুর মেজাজ ভাল দেখে, দিদা তামক নিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকেছে।' আশিসকে দেখে, মনেই হল না এত মার খেয়েছে। আশিসকে দেখে দুঃখ হলো, বললাম, 'তোকে দাদুর মত বড় হতে হবে এবং আমার কাছে কাল থেকে লেখাপড়া করবি।'

আগেই বলেছি বাবার বৈঠকখানার লাগোয়া আমার ঘর। বৈঠকখানার পাশেই বাবার ঘর। কানে এল মা রুদ্ধ গলায় বলছেন কিছু, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাবার জোর আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'আরে কি বলস্, শুয়ারকে বচ্চে? ফুসুর ফুসুর করে কি কথা বলস? এবার শুনতে পেলাম মার গলা, খুব ধীরে হলেও বুঝলাম, মা বলছেন, 'আরে ধীরে কও ও ঘরে যতীন আছে' আবার বাবার সেই গলা, 'কি বলস?' নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল, বাবা মায়ের কথা শোনা! তারপর শুনলাম, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি,' এই কথা বলেই বাবার ঘরের দরজা বন্ধ করে মা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

প্রথম দিন মৈহারে গিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনেও নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো। তৃতীয় দিনেই মেজ আর ছোট জামাইয়ের পরিণতি দেখা হয়ে গেল। পাঠক, হঠাৎ জামাইয়ের অবতরণ দেখে চমকাবেন না। আমার পিতৃবন্ধু (স্বর্গতঃ নরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ) নরেনকাকার কাছে ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রিত চার জামাইয়ের ভবিতব্য সম্পর্কে। 'হবির্বিনা হরির্জাতি; বিনা পীঠেন মাধবঃ, কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।' তাই বিছানাতে এসে শোওয়ার পরও এপাশ ওপাশই সার হলো। এ যেন জীবনের প্রথম সিনেমা দেখা, তাও আবার হোল নাইট। একটা বইয়ের ঘটনাই মনে রাখা কঠিন, আর দেখলাম তিনটে। কিন্তু, এই সব কটারই নায়ক 'মহানায়ক উস্তাদ বাবা'। আমারও দেখা হলো 'জগদীশের দশটি রূপ'। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কেশব আমার জীবনে কোন রূপে আসবেন। হঠাৎ প্রফেসর অরবিন্দ বোসের কথা মনে পড়তে লাগল। উনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে এসেছ, তাও আবার দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান। আর মানুষ চিনবে না। মানুষ না চিনলে কিছুই শেখা হয় না। মানুষ সেই, যার ভিতরে 'ত্ব'-টা আছে। ওটা থাকলেই মনুষ্যত্ব। না হলে অদৃষ্টে লাঙ্গুল আছে বলে ধরে নিতে হবে। শুধু তফাৎ হতে পারে চিনেবাদাম আর কাঠবাদামে। কিছু লোক নরম খোলার চিনেবাদাম, কিছুলোক শক্ত খোলার কাঠবাদাম। এই কাঠবাদামেই 'ত্ব'-র পারসেন্টেজটা না কি বেশী।" বাবাকে দেখে মনে হলো উনি কাঠবাদাম।

আত্মপ্রত্যয় বা আত্মতুষ্ঠির স্বদন্তের দ্বারা এতে দন্তস্ফুট করা সম্ভব নয়। কচ্ছপের এই বাহ্য আবরণটা যদি কঠিন নাই হোতো, তাহলে অন্দর মহলের নমনীয়তাটাকে রক্ষা করতো কে? এই সব চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

৭

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল আশিসের সরোদের আওয়াজে। তাড়াতাড়ি উঠেই আশিসকে বললাম, 'রোজ সকালে এবং দুপুরে আমাকে আগেই জাগিয়ে দিতে। আমাকে আগে উঠিয়ে দিলে আমি তৈরী হয়ে বাজাতে পারব, অন্যথা আবার কোন দিক দিয়ে বর্ষণ হবে ভগবানই জানেন।'

মুখহাত ধুয়ে, এসেই দেখি আশিস বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বাজাচ্ছে। ঘরে ঢুকবার আগেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোমার ঘরেই আলি আকবর রিয়াজ করত। আশিসও এত দিন রিয়াজ করেছে। এখন তুমি এসে গেছ সুতরাং আজ থেকে আশিস আমার বৈঠকখানায় রিয়াজ করবে এবং তুমি নিজের ঘরে রিয়াজ করবে। আশিস ছেলেমানুষ, তাই এত দেরীতে উঠে বাজায়। তুমি ভোরে উঠে রিয়াজ করবে। তুমি অনেক দেরীতে শুরু করেছ, সুতরাং সব ছেড়ে যখন এখানে এসেছ, তোমার দিনরাত বাজানো ছাড়া আর কি থাকতে পারে? তুমি কী জানো, আমি ভোর চারটের সময় উঠে দুই মাইল হেঁটে আসি? তোমার মা যখন আমাকে লেবু দিয়ে চা খাওয়ায়, তখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে। ঠিক আছে এখন এত সকালে উঠতে হবে না, তবে ধীরে ধীরে যেমন শিক্ষা পাবে সেইরকম সাধনার সময়ও বাড়াতে হবে। যদি না বাজাতে পার তাহলে তোমারও বদনাম এবং আমারও বদনাম। তুমি না বাজাতে পারলে লোকে বলবে আমি তোমাকে শেখাইনি, আর তুমি যদি বাজাতে পার তাহলে তোমারও সুনাম হবে এবং আমারও সুনাম হবে। যাও এখন গিয়ে বাজাও। সময় হলে নাস্তার সময় তোমাকে ডাকবে। নাস্তার পর বাজিয়ে, পোষ্টঅফিস যাবে। যদি তোমার চিঠি কিংবা আমার চিঠি থাকে নিয়ে আসবে।'

দিনটি ছিল বুধবার, ১৯শে অক্টোবর। আজ প্রথম বাবার সব নাতি এবং একমাত্র নাতনিকে সকাল দশটার সময় পড়ালাম এক ঘন্টা। বাজার থেকে এসেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোন চিঠি এসেছে?' উত্তরে বললাম, 'কোন চিঠি আসে নি।' এ কথা শুনে বাবা খুশিই হলেন বলে মনে হলো।

বাবার কথা অনুযায়ী সকালে ভৈরব, দুপুরে ভীমপলাশী এবং সন্ধ্যা বেলায় ইমন রাগে কেবল পাল্টা এবং বোল রিয়াজ করলাম। বাড়ীর পরিবেশ শান্ত। কোন আওয়াজ নাই। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, বাবা সর্বদা কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ একবার বাবার গলার আওয়াজ পেলাম। আমার ঘরের, সামনের বাগানে দেখি বাবা ফুলের গাছে নিজে জল দিচ্ছেন। তাঁর আওয়াজ পেয়ে দেখলাম, বুদ্ধা চাকর এসে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধাকে দেখেই বাবা বললেন, 'আরে কামচোর পানী না দেনে সে ফুল বঢ়েগা?' বাবার হিন্দি এবং বাংলা দুইই বুঝতে একটু সময় লাগে। বুদ্ধাকে তিনি চারবার 'কামচোর' বললেন। পরে বুদ্ধা চাকরটিকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কেন তোমাকে কামচোর বলেছিলেন।' উত্তরে সে বলল, 'রোজই গাছে জল দিই, আজ দেরী হয়ে গিয়েছে বলে, কামে অর্থাৎ কাজে ফাঁকি দিয়েছি বলে, কামচোর বলছিলেন।'

হেমন্তের হিমেল হাওয়া, বিন্ধ্যপর্বতের গা বেয়ে মৈহারের উপর তার প্রভাব বিস্তার

করছে। গিয়েছিলাম লোটা সাথে নিয়ে, কম্বল সাথে ছিল না, তাই হেমন্তটাকেই শীত মনে হতে লাগল। আমি পাল্টা সাধি বা না সাধি, আমার শরীর যন্ত্রে তখন হেমন্ত পাল্টা সাধছে। বাবার ভানুমতির পেটরা থেকে আর একটা রূপ বেরোল। তা হোল সব দিকে চোখ রাখা গৃহিনীর রূপ। হঠাৎ দেখি, তেসরা নভেম্বর সকালে, বাবা নিজের হাতে তৈরী করে, আমাকে একটা লেপ উপহার দিলেন। বললেন, 'তুমি নতুন তাই তোমাকে প্রথমে দিলাম, তারপর সকলকে একে একে দেব।'

আশ্চর্য মানুষ। অদ্ভুত প্রাণ শক্তি। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম গত দশ দিন ধরে মুহরমের পুণ্যস্মৃতিতে কঠিন সদাচারী দিনযাপন করেছেন। তার আগে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দিওয়ালির আনন্দ উৎসবে যোগদান করেছেন। এই দিওয়ালির দিনটা ছিল শুক্রবার, শুনলাম, সপ্তাহে এই একটা দিন ওঁর বাজনা বন্দ। বাবার গুরু, শুক্রবারে অর্থাৎ জুম্মার দিন বাজাতেন না। সারা সপ্তাহ বাজালে একদিন হাতের বা গলার বিশ্রাম দেওয়া দরকার। গায়ক বা বাদকেরা জুম্মার দিন বাজনা বাজানো বন্ধ রাখত, কিন্তু কোন জায়গায় যদি গান বা বাজনা থাকত, তাহলে গাওয়া কিংবা বাজনায় নিষেধ ছিল না। বাবাও এটা পালন করতেন। মনে মনে খুশীই হলাম, যাক একদিন ছুটি পাওয়া গেছে। কিন্তু বাবা আমাকে বললেন, নাতিদের একটা দিন ছুটি দি। এবং আমিও নিজের নানা কাজ করি। তাবলে তোমাকে বাজনা বন্ধ করতে হবে না। 'তুমি বাজাও।' উত্তরে বললাম, 'যখন কেউ বাজায় না, আমিও বাজাব না।' বাবা আর কিছুই বল্লেন না।

প্রাচীনকালে মুসলমান উস্তাদরা জুম্মার দিন, (শুক্রবার) জলসায় প্রথম বাজনার প্রথা শুরু করেন। শুক্রবারে গুরু নিজের শিষ্যকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার পর, প্রথম জলসাতে বাজাবার জন্য নিয়ে যেতেন। বাঈজীরাও শ্রোতাদের মধ্যে থাকতো। এই জলসাতে টিকিট হতো না, কিন্তু শ্রোতারা কিছু টাকা দিলে তা ভাগ করে নিতেন উস্তাদরা। এই জুম্মার দিনেই ছাত্রের এক ধরণের পরীক্ষা হতো। কেননা, এই প্রথম গুণীদের সামনে নিজের গান বা বাজনা প্রদর্শন হতো। কিছু কিছু হিন্দু পেশাদার গায়ক বাদককেও, শিবরাত্রির দিন এই প্রথা পালন করতে আগে দেখা যেতো।

কিন্তু এর বিপরীত ছিলেন বাবা। উপরের যে প্রথা লিখেছি, বাবা কখনও জীবনে পালন করেন নি। শুক্রবারকে, বাবা বরাবরই নিষ্ফলা বার বলতেন। শুক্রবারের পরের দিন, হাজারো কাজের ফাঁকে ভীমপলাশি এবং উজিরখানি আদলে বিলম্বিত ইমনে একটা গৎ শিখিয়েছেন, এবং সব কাজের ফাঁকে, সবার চোখ বাঁচিয়ে তৈরী করেছেন আশ্রিতের জন্য কবোষ্ণ আবরণ। সত্যিই বিচিত্র। ঠিকমত গুছিয়ে একটা পারসেল করে এসেছি, পেলাম বিশ্বজয়ীর প্রশংসা, আসল ব্যাপারটা বুঝেছি। ওনার একটা বাঁধাধরা জীবনযাপন পদ্ধতি আছে। তাতে দেরী আর জোড়াতালির স্থান নেই। মূল কথা ব্যস্ত থাকো। এই ব্যস্ত থাকো, ব্যাপারটা মুহর্‌রমের দশদিন যে হেতু বাজনা বন্ধ ছিল, আমি প্রয়োগ করলাম। অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে সঙ্গীত ছিল সাধনা আর বই ছিল অবসর বিনোদন। আশিসকে দিয়ে গোটা দশেক বই আনালাম। পড়তে দেখলে বাবার রাগ হয় না। কিন্তু ঘুমোতে দেখলে? তার সপ্তকের সপাটের তান, শুয়ার কে বচ্চে, অলস, কামচোর।

এর মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাবার কাছে একটা চিঠি এল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের জন্য নতুন একটা বিভাগ খোলা হবে। সঙ্গীত ভবনের জন্য বাবাকে প্রিন্সিপাল করবার জন্য সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সুতরাং বাবার স্বীকৃতি পেলে ভাইসচ্যান্সেলর বাধিত হবেন।

চিঠি পেয়ে বাবা বললেন, 'সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ভুল পদ্ধতিতে চলছে, তাতে একটি ছাত্রও কোনোদিনই সঙ্গীতের সেবক হতে পারবে না। কেবল সারটিফিকেটই সার। দীর্ঘদিন ধরে এই দেখে আসছি। তবে আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত যদি যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে যেতে প্রস্তুত আছি। তবে কিছু সর্ত থাকবে, সেগুলো সাক্ষাতে সব কথা হবে।'

সব চিঠিতেই বাবা সই করেন বাংলা হরফে। আমি হাত জোড় করে বললাম, 'আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে একটা কথা বলি।' বাবা বললেন, 'বল বল, কি বলতে চাও?' এ কথা বলেই বললেন, 'আরে আমি যদি কাশী যাই, তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে কাশীতে যাবে। বছরে ছয় মাস কাশীতে থাকব এবং ছয় মাস মৈহারে থাকব। এ ছাড়া আরও কিছু কথাবার্তা বলার আছে, তাই তো আগেই বলেছি সর্ত কিছু থাকবে। তোমার শিক্ষা ঠিকই হবে, কোন চিন্তা করো না।' উত্তরে আমি বললাম, 'এ কথা আমি আপনাকে বলতে চাই নি।' বাবা বললেন, 'তাহলে কি কথা বলতে চাও?' এবার বললাম, 'প্রত্যেক বিষয়ে যাঁরা বড়, তাঁদের চিঠি লেখে সেক্রেটারি। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি আপনার সেক্রিটারি হয়ে চিঠির জবাব দিতে পারি।' কথাটা বোধহয় বাবার মনঃপুত হলো। কিন্তু বাবা সেদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, 'আরে আরে, আমি কি বড়র পর্যায়ে পড়ি? আমি তো সঙ্গীতের কিছুই জানি না।' বললাম, 'আপনি না ভাবতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যখন আপনাকে ডাকছে, তখন কি আপনি সাধারণ বলে ডাকছে? এছাড়া ইংরেজীতে যখন চিঠি দেব এবং আপনি বাংলাতে সই করবেন, সেটা ভাল দেখায় না। এ ছাড়া ভারতে সব জায়গায় সেক্রেটারিই চিঠি দেয়। আপনি যে চিঠি পেয়েছেন, সেটা কি ভাইসচ্যান্সেলর চিঠি দিয়েছেন? ভাইসচ্যান্সেলর-এর তরফ থেকে রেজিস্ট্রার দিয়েছেন। বাবা বললেন, 'তাহলে তো তোমাকে মাইনে দিতে হবে, যেহেতু তুমি আমার সেক্রেটারি।' উত্তরে বললাম, 'আপনার কাছে যে সঙ্গীত শিখছি তা কি টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যায়?' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে যা ভালো বোঝো, তাই করো, তবে, তোমার নামের সঙ্গে এম.এ. পাশও লিখবে।'

পাঁচই নভেম্বর থেকে, দীর্ঘ সাত বছর আমি বাবার যত চিঠি লিখেছি, প্রাইভেট সেক্রেটারি বলেই লিখেছি। সেই সময়েই বাবার স্বীকৃতি জানিয়ে চিঠি লিখলাম। চিঠি লিখে, ভাবার্থ যখন বাবাকে বললাম, বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় বললেন, 'আরে আরে, আমি তো ছাতার লোক, কিছুই জানি না তার উপর আবার সেক্রেটারি।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে খাম দিলেন ঠিকানা লিখবার জন্য। ঠিকানাটি লিখেই আমি পোষ্ট অফিসে ফেলে এলাম।

এই কয়েকদিন থাকার ফলে বুঝেছি, চিঠি লিখে সঙ্গে সঙ্গে পোষ্ট অফিসে ফেলে দিলেই, বাবা ভাবেন চিঠি যথাস্থানে চলে গেল। যে কোন কাজ, মুখে বলার সঙ্গে সঙ্গে না করলেই বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে এবং তার ফল অচিরাৎ পেতে হবে। এ বিষয়ে নানা ঘটনা যথাস্থানে ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

মৈহারে যাবার সময়ে দুটো পায়জামা এবং একটা লুঙ্গী নিয়ে গিয়েছিলাম। রাত্রে লুঙ্গী পরে শুতাম, সকালে কেচে শুকিয়ে, তারপর আবার দুপুরবেলা লুঙ্গী পরতাম। বাবার চোখ এড়ায় নি। হঠাৎ দেখি, বাজার থেকে একটা লুঙ্গী কিনে এনে, নিজের হাতে সেলাই করে, আমাকে দিয়ে বল্লেন, 'বাড়ীতে সব সময় লুঙ্গী পরবে, বাইরে পোষ্টঅফিস কিংবা অন্য জায়গায় গেলে পায়জামা পরবে।' আমি বললাম, 'লুঙ্গী তো আমার আছে।' বললেন, 'রোজ লুঙ্গী কেচে তো পায়জামা পর, একটা লুঙ্গীতে কি চলে?' আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। সর্বদিকে বাবার দৃষ্টি দেখে অভিভূত হলাম। একদিকে লজ্জাও যেমন পেলাম, অন্যদিকে শ্রদ্ধায় মাথা নত হল।

দুপুরে খাবার সময়ে, হঠাৎ মায়ের গলা পেলাম। বেশ জোরে বোধহয় কোন নাতিকে বলছেন, 'ওরে, তাড়াতাড়ি খায়া ল।' ওরে বলে দুই অক্ষরের, এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করলেন, যে আমার পক্ষে অকল্পনীয়। দুই অক্ষরের শব্দটি বাংলা, এবং হিন্দি ভাষায়, ওটা অশ্লীল শব্দ। অথচ রান্নাঘরে অন্নপূর্ণা দেবী আছেন। এ দিকে বাবা এবং আমি আছি। আমি মাথা নীচু করে ভাবছি, এ কি কথা? বাবাও শুনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে আরে, একটা শব্দের অর্থ একভাষায় খারাপ, আবার অন্য ভাষায় সেই শব্দের অর্থ ভিন্ন। লাহোল বিলাকুবত।' বাবার কথায় বুঝলাম, বাঙ্গাল ভাষায় যে দুটী শব্দ মা বলেছেন, তার অর্থ নিশ্চয়ই অন্য, যা আমার কাছে অশ্লীল মনে হয়েছে। মনের মধ্যে কৌতূহল, এই অশ্লীল শব্দটির অর্থটা কি? ঠিক করলাম রবিশঙ্কর মৈহারে এলে জিজ্ঞাসা করব। এ ছাড়া দ্বিতীয় শব্দটা যা বাবা বললেন, 'লাহোল বিলা কুবত', এর অর্থই বা কী?

পরের দিন বাবা দিল্লী গেলেন। মৈহার থেকে বাবা যাবেন দুপুর একটার ট্রেনে। দেখি দশটার মধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছেন। মৈহারে একটাই টাঙ্গা বা ঘোড়ার গাড়ী, বাবার বাড়ীর কাছেই থাকে। টাঙ্গা ডেকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্টেশনে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশী লাগে না, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে গিয়ে কি করবেন? এছাড়া এলাহাবাদে যাবার ইটারসি প্যাসেঞ্জার, বরাবরই এক ঘন্টার বেশী লেট থাকে। কখনও দুই থেকে তিন ঘন্টাও। বাবা নিজেও জানেন এ কথা, তবুও বাবা তিন ঘন্টা আগেই তৈরী হলেন স্টেশনে যাওয়ার জন্য। সুদীর্ঘ সাতবছর এর ব্যতিক্রম কখনও দেখি নি। বাবার বাড়ী থেকে হেঁটে গেলে, পাঁচ মিনিট স্টেশনে যেতে। টাঙ্গা ডাকতে গিয়ে স্টেশনে যখন খবর পেয়েছি, ট্রেন এক ঘন্টা লেট এবং বাড়ীতে এসে বাবাকে বলেছি, বাবার এক উত্তর, 'গাড়ীর কোন ঠিক আছে, যদি আগে চলে আসে?' বাবাকে বোঝানো অসম্ভব। বেশী বোঝালে বাবা তখন বলতেন 'বাড়ীতে বসে কি করব? চল, স্টেশনে গিয়ে গল্প করব।' হায় ভগবান! বাবা করবেন গল্প? যতই বোঝাই দু'ঘন্টা আগেই যাবেন।

বাবার স্বভাবটা এখন বুঝতে পেরেছি। বাবার যখন যে খেয়াল হবে তখনই সেটা করা চাই। দেরী হলেই মহাভারত অশুদ্ধ। বাবার ধারণা, আমিও যে জিনিষটা ছোটবেলায় পড়েছি, যখনকার কাজ যে নাহি করে, বাল্যকালে যারে আলস্যে ধরে, সে জন কখনও সুখ না পায়।'

বাড়ীতে সবসময় বাবা তামাক খেতেন। কখনও সিগার খেতেন, কিন্তু বাইরে গেলে সিগারেরই বাকস্ নিয়ে যেতেন। বাবা ছিলেন এক কথায় চেনস্মোকার। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে, টাঙ্গায় চড়ার সময়ে সিগার খেতেন না। সঙ্গে থাকত বাবার এবং ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ। তার মধ্যেই যাবতীয় জিনিষ। টাঙ্গায় চড়েই বরাবর বাবা বলতেন 'মা, মা'। বাড়ীর থেকে বোরোলেই পশ্চিমদিকে সারদা দেবীর মন্দির দেখা যেত। যতক্ষণ সারদা দেবীর মন্দির দেখা যেত, পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কেবল 'মা-মা' বলতেন। কিছুক্ষণ যাবার পরই যখন রাস্তার বাঁক ঘুরত এবং মন্দির দেখা যেতো না, তখন সঙ্গে সঙ্গে চুরুট ধরাতেন। স্টেশনে পৌঁছলেই, স্টেশনমাস্টার থেকে সকলে বাবার কাছে এসে জড়ো হতো। ওয়েটিং রুমে বসে সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ 'আদাব' চলত। আমার কাজ ছিল টিকিট কেটে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনমাস্টার বলত, গাড়ী এক ঘন্টা কিংবা দেড় ঘন্টা লেট। বাবা বলতেন, 'আমার ভাগ্য ভাল নয়, যখনই আসি তখনই লেট, লক্ষণ ভাল নয়। কি জানি ভাগ্যে কী আছে? আমার ভাগ্য ভাল নয়, দেখ তোমাদের ভাগ্যে যদি ভালভাবে ফিরে আসতে পারি?' যতই বলি, 'এ কি কথা বলছেন?' বাবার সেই এক উত্তর, 'আরে না না সচ্চি (সত্যি) বলছি।' ওয়েটিং রুম লোকেতে ভরে যেত বাবাকে দেখতে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, 'বাবা কোথায় যাচ্ছেন?' সঙ্গে সঙ্গে বাবার উত্তর, 'ভিখ (ভিক্ষা) মাঁগনে যাতা হায়। কি করব, এই বুড়ো বয়সে তোমাদের ভাই আলি আকবর, তার ছেলেদের আমার কাছে রেখে গেছে, আলি আকবর একটা পয়সাও পাঠায় না। ভিক্ষা করতে যাচ্ছি নাতিদের ভরণ পোষণ করতে। ভগবানের দয়ায় যা আছে, বুঢ়া বুঢ়ির চলে যাবে, (অর্থাৎ মার জন্য কোন চিন্তা নাই।) কিন্তু যে সব আশ্রিত আছে তাদের জন্যই এই বুড়া বয়সে বাজাতে যেতে হয়। যদিও আলি আকবরের একটাও পয়সা আমি চাই না, কিন্তু আমার অবর্তমানে এই নাতিদের কী হবে, ভেবে ভিক্ষায় বের হতে হয়। খুব দুর্ভাগা আমি, ভাগ্য মোটেই ভাল নয়। বাবার এই কথা শুনে অনেকে বলে, 'এ সব কি বলছেন বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলতেন, 'না না, সচ্চি সচ্চি বলছি।' এই কথাগুলো এইজন্য লিখলাম, যে দীর্ঘ সাতটি বছর এই কথা শুনতে শুনতে আমার গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কখনও এই কথার ব্যতিক্রম হয় নি।

এ ছাড়া আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। সে সময় থার্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস এবং ফার্স্ট ক্লাস ছিল। টিকিটের টাকা দিলে, বাবার কাছে আরো টাকা চাইতাম। বাবা বলতেন, 'আরো টাকার কি দরকার?' আমি বলাতম, 'ফার্স্টক্লাসের ভাড়া আরো বেশী।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলতেন, 'আমি কুলি কাবাড়ি, সকলেই থার্ড ক্লাসে যায় সুতরাং আমি কেন ফার্স্ট ক্লাসে যাবো? আমি কি সাহেব?' বাবাকে বোঝাতাম সঙ্গে সরোদ আছে, থার্ড ক্লাসে খুব ভীড়, তা ছাড়া সম্মান আছে, লোকে কি বলবে?' বাবা বলতেন, 'লোকে কি বলবে। গান্ধীজী থার্ড ক্লাসে চড়তে পারেন, আর আমি থার্ড ক্লাসে চড়তে পারি না?' বাবাকে বোঝাতাম, গান্ধীজীর থার্ড ক্লাস রিজার্ভ থাকতো এবং সঙ্গে সরোদও থাকতো না। বহু কষ্টে বাবাকে সেকেণ্ড ক্লাসে টিকিট কিনে বসিয়ে দিতাম। বাবা চটতেন কিন্তু পরে আর কিছু বলতেন না।

মৈহারে আমার থাকাকালীন বাবা বারবার এলাহাবাদে সেকেণ্ড ক্লাসেই যেতেন। তখন অবশ্য সেকেণ্ড ক্লাস, প্রায় ফার্স্ট ক্লাসের মতই হোতো। তবে বম্বে, দিল্লী, কোলকাতা যাবার সময় জোর করে ফার্স্ট ক্লাসেই বাবার টিকিট করে দিতাম। বাবা বাইরে রাগ দেখালেও বম্বে, দিল্লী, কলকাতাতে ফার্স্ট ক্লাসেই যেতেন।

বাবা এবার প্রায় তেরো দিনের জন্য দিল্লী গেলেন। যাবার আগে বললেন, 'মৈহার ফেরার আগে, টেলি (অর্থাৎ টেলিগ্রাম) করে জানাবো। খুব মন প্রাণ দিয়ে, সারাদিন বাজিও এবং নাতিদের দেখো। তারা রোজ যেন বাজনা বাজায় এবং লেখাপড়াও করে। তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে যাচ্ছি। যখনই বাবা মৈহার থেকে বাইরে গিয়েছেন, এই এক ব্যাপার বরাবরই দেখেছি। এর ব্যতিক্রম কখনও হয়নি।

বাবা চলে যাবার পরদিনই একটি ছেলে এসে হাজির সেতার নিয়ে। ছেলেটির নাম শুনলাম নিখিল ব্যানার্জী। ছেলেটি এসেই দেখি মাকে দিদিমা, এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে, দিদি বলে প্রণাম করল। বুঝতে পারলাম অন্নপূর্ণা দেবী এবং মা ছেলেটিকে আগের থেকে চেনেন। ছেলেটিকে খুব সহজ সরল মনে হল। শুনলাম যোধপুরে আলি আকবরের কাছে কিছুদিন থেকে, এখানে এসেছে। অন্নপূর্ণা দেবী আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার ঘরের একটি খাটের মধ্যেই সে বিছানা পেতে বসল। নিখিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হল। বুঝলাম আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। তার কাছে শুনলাম সে ছোটবেলায় নিজের বাবার কাছে সেতার শুরু করেছে। তার বাবা সৌখিন বাজিয়ে, যৎসামান্য বাজান। এক লাইনের সিন্ধুর একটা গৎ মুখে বলল, এই গৎটা প্রথম বাজাত। এই গৎটা জিলা বলে আমি কাশীতে বীরু মহারাজের অর্কেষ্ট্রাতে বাজাতে শুনেছি এবং আমিও মহারাজজীর অর্কেষ্ট্রাতে বাজাতাম। নিখিল তারপর মুস্তাক আলী খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিল। তারপর রাধিকা মোহন মৈত্র, বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, গোমেশ এবং অনেকের কাছে কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু তাতে মন ভরে নি। উস্তাদ বাবার বাজনা শুনে মনে হয়েছে, এইখানে শিখলে তবেই আসল শিক্ষা হবে। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর মাধ্যমে আলাপ হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা পায় নি। তারপর আলি আকবর, রবিশঙ্করের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নানা সুযোগ করে আলি আকবর এর কাছে যোধপুরে গিয়ে কিছু শিক্ষা করেছে।

কথায় কথায় বুঝলাম, নিখিল চারদিন থেকে কলকাতা চলে যাবে এবং কিছুদিন পর বাবার অনুমতি পেলে মৈহারে এসে শিখবে। মা তার কাছে আলি আকবর এবং পুত্রবধুর খবরাখবর নিলেন। এ ছাড়া, আর দুই নাতি আছে আলি আকবরের কাছে, তাদের কথাও জিজ্ঞাসা করলেন। নিখিল রাত্রে আমার বাজনা শুনল এবং নিজেও সেতার বাজালো। ছেলেটির বাজনা শুনে আমার মনে হলো রবিশঙ্করের ঢঙে বাজাচ্ছে। খুব ভাল লাগল। যতই হোক, ছোট থেকে বাজাচ্ছে, হাতটা তৈরী। দেখে মনে হলো খুব সরল ছেলে, শিখলে ভালই বাজাবে। বাজনার টেকনিক আমি কিছুই জানি না, কিন্তু শুনেছি তো বাজনা ছোট থেকে।

পরের দিন আর একটি ছেলে এসে পৌঁছল। মার কাছে শুনলাম, সম্পর্কে বাবার এক ধর্ম মেয়ের ছেলে, বাবাকে দাদু বলে। ছেলেটির নাম সনৎ। ছেলেটি আগে সেতার শিখত

এবং বর্তমানে সরোদ বাজায়। এই ছেলেটির বাবা সাতনায় থাকেন। এককালে বাবার কাছে ভায়োলিন শিখতেন, বর্তমানে হোমিওপ্যাথি প্রাক্‌টিস করেন। সনৎ এসে আমার ঘরেই বসল এবং কিছুক্ষণ কথা হল। তার মুখে শুনলাম এম. এ. পড়ছে। কিছুক্ষণ কথার পর নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, লেখাপড়া কত অবধি করেছেন? উত্তরে বলল, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। চারদিন মৈহারে থেকে সে কলকাতায় চলে গেল।

মাঝে মাঝেই মনে হয়, আজ পর্যন্ত যারাই গায়ক বাদক হয়েছেন, সকলেই ছোটবেলা থেকে শুরু করেছেন তবেই পরিণত বয়সে সঙ্গীতে প্রবেশ করতে পেরেছেন, কিন্তু আমি তো ব্যতিক্রম। চমক ভাঙল অন্নপূর্ণা দেবীর কথায়। বললেন, 'বাজনা না বাজিয়ে চুপটি করে বসে আছেন কেন?' অন্নপূর্ণা দেবীকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলবেন? স্পষ্ট বললে, আমি কোন কষ্ট পাব না, ভবিষ্যৎ-এর কথা কিছু চিন্তা করব?' অন্নপূর্ণা দেবীকে যা ভাবছিলাম বললাম। উত্তর দিলেন গম্ভীর ভাবে, 'লেখাপড়া করেছেন, এটা জানেন না, যদি কোন বিষয়ে জিদ থাকে, মানুষ সব করতে পারে। মনের মধ্যে জিদ আনুন! সাধনা করুন! সঙ্গীতের মধ্যে প্রাণ দিন! তাহলেই দেখবেন সঙ্গীতের মধ্যে ঢুকতে পারবেন। বসে বসে বাজে চিন্তা না করে, যা শিখিয়েছি বাজান।' চুপচাপ ঘরে এসে বাজাতে লাগলাম। মনের মধ্যে একটু ভরসা পেলাম।

বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীর এত স্নেহ পেয়েছি, যা দেখে কয়েকজন এমন সব কথা বলেছে বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে, যে আমার শিক্ষাই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। মা, বাবা এবং পুত্রবধূ জুবেদা খাতুনের এর কাছেও একজন এমন কান ভাঙানি দিয়েছিল, যার পরিণাম চরম সীমায় উঠেছিল, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। আলি আকবরের কাছেও দুজন আমার নামে এমন কান ভরেছিল, কিন্তু কানপাতলা হলেও আলি আকবর আমাকে অবিশ্বাস করে নি। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম অন্নপূর্ণা দেবী। তিনি কানপাতলা নন। নিজের থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তারপর আমার কাছে সবকথা শুনে খুব সহজভাবেই নিজের সংশয় দূর করেছিলেন। অথচ বাবা এবং বাড়ীর আর সকলেই অত্যন্ত কান পাতলা। আমাকে তাই বহু ঝঞ্ঝা পোয়াতে হয়েছে। অবশ্য বাবাও আমাকে নিজের থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু বাবাকে বিশ্বাস করাতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাবা আমার কথাই বিশ্বাস করেছিলেন এবং মনে কোনরকম সংশয় রাখেন নি।

কিন্তু অন্যের প্ররোচনায় বাবার পুত্রবধূ এবং মায়ের সঙ্গে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তা ঠিক হতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল, কারণ তাঁরা যা শুনেছিলেন আমাকে তা বলেন নি। সুতরাং আমি কি করে জানতে পারব যে কি কারণে তাঁদের মনে আমার সম্বন্ধে কেউ বিষ ঢেলে দিয়েছে, যেহেতু বাড়ীর আমি অতি প্রিয় পাত্র। যাক, এসব কথা যথাস্থানে এই জন্য লিখব, যাতে মানুষ স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে নিজের সংশয় দূর করতে পারে। তাহলে, আর অযথা মনোমালিন্য থাকে না।

প্রথমে একটা ঘটনা, অন্নপূর্ণা দেবী সম্বন্ধেই বলি। কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইচ্ছা করেই কারুরই নাম বলবো না। কিন্তু যাদের সম্বন্ধে বলব তারা বুঝতে পারবে

এবং যাদের কাছে কান ভরেছিল, তারাও বুঝতে পারবে। কথাটা তাহলে খুলেই বলি।

একদিন, অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'একটা কথা সত্যি করে বলুন তো? আমার বিষয়ে যদি কাউকে কিছু বলে থাকেন, তাহলে আমি কিছু মনে করবো না। আর যদি না বলে থাকেন তাহলে একজনকে আমি একটু চিনে রাখবো।' কথাটি শুনে আমি একটু চমকালাম। অন্নপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে আমি আবার কাকে কি বলব? বললাম, 'আপনি এ কথা কি করে ভাবতে পারলেন যে আপনার বিষয়ে অন্য কাউকে আমি কিছু বলব? এছাড়া আপনার বিষয়ে বলবার মত এমন কি আছে? উপরন্তু আমার কোন সুহৃদ নেই, যাকে আপনার বিষয়ে বলব।'

অন্নপূর্ণা দেবী ভনিতা না করেই বললেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি কাউকে বলেছেন আমি অত্যন্ত বাজে বাজাই? অবশ্য, বললে আমি মোটেই রাগ করবো না, কারণ আমি জানি, আমি মোটেই বাজাতে পারি না।' আমিও ক্ষণিকের জন্য বোবা হয়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। তখন, আমার মাথায় এমন কোন দুষ্ট মিথ্যাবাদীর নাম মনে এলো না কারণ আমি তো পারতপক্ষে বাড়ীর বাইরে বেরোই না। তাহলে, বাড়ীরই কোন লোক নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু কে? অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে ওই কথা শোনার পর হঠাৎ ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললাম, 'কোন শুয়োরের বাচ্চা এ কথা বলেছে বলুন? তাকে জ্যান্ত আপনার সামনে পুঁতবো।' কথাটি বলেই আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ হল। আসলে, বাবার কাছে শুয়ার কে বচ্চে কথাটা এত বার শুনেছি যে নিজের অবচেতন মনে, কখন কথাটা মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে বুঝতে পারিনি। এই অশ্লীল শব্দটা বলার জন্য মার্জনা চেয়ে আবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বলুন কে বলেছে?' আমার এ মূর্তি অন্নপূর্ণা দেবী বোধহয় কল্পনা করতে পারেন নি, শান্ত হন বলে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি, এ কথা আপনি বলেন নি কিন্তু আপনার এই রাগের মূর্তি দেখে তার নাম আমি বলব না, কারণ আপনি একটা অনর্থ বাঁধিয়ে দেবেন। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, আমি এ সব চাই না। যে মিথ্যা বলছে, তাকে আমি চিনি, সে বরাবরই মিথ্যা বলে। তবুও একবার যাচিয়ে নিলাম। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আমি চাই না অযথা একজনের সঙ্গে আপনার শত্রুতা বাড়ুক। লোকের কথায় কান দেবেন না। নিজের কাছে খাঁটী থাকবেন তাহলেই যথেষ্ট।'

যেহেতু অন্নপূর্ণা দেবী বারণ করলেন তাই অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'দেখুন, মিথ্যা কথা না বলা খুবই প্রশংসার কথা, কিন্তু সত্য কথা গোপন করায় কোন পূণ্য নাই। যেহেতু আপনি বারণ করেছেন, তাই কিছু বললাম না, কিন্তু এ আমার কুষ্ঠিবিরুদ্ধ কাজ। যা হোক, আপনি যে আমায় বিশ্বাস করেছেন এইটাই আমার সান্ত্বনা।' এই কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'আচ্ছা আপনি এত রাগী কেন?' উত্তরে বললাম, 'আপনি আমার রাগই দেখলেন? জানেন কি, যারা কানপাতলা তাদের কি অনর্থ ঘটে যায় পরের কথা শুনে?

আমার জীবনে একটা ব্রত করে নিয়েছি। যাকে আমি চিনি, তার সম্বন্ধে আমার যত আপনই কেউ হোক না কেন, যদি কিছু বলে, তা হলে আমি যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাকে

জিজ্ঞাসা করি। সত্যি যদি সে আমার বিষয়ে কিছু বলে থাকে, তাহলে তার চোখে একটা ভাব হবে। আর যদি সে না বলে থাকে, তাহলেও তার চোখে একটা ভাব প্রকট হবে। যদি আমার বিষয়ে বলেও আমাকে বলে, বলি নি, তাহলে তার চোখ দেখে আমি ঠিক ধরে নিতে পারব। এটা আমি বেশ আস্থা নিয়েই বলতে পারি। আমার ভেতর থেকে যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট বুঝি। যেমন মধ্য সপ্তকের 'সা' এবং তার সপ্তকের 'সা' শুনলেই বোঝা যায়, সেইরকম চোখ দেখলেই বুঝতে পারি। বহু লোককে দেখেছি কানপাতলা কিন্তু আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমি কানপাতলা নই।'

অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'থাক আর অহংকার করতে হবে না। সরোদ নিয়ে আসুন।' উত্তরে বললাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি কিছু বলব না, কে এ কথা বলেছে দয়া করে আমাকে বলুন।' অন্নপূর্ণা দেবী তখন বাবার এক পাতানো নাতির নাম করলেন। আমি শুনে স্তম্ভিত। আসল কথা এই তথাকথিত নাতিটি ছোট থেকে বাবার কাছে আসছে। বাড়ীর সকলেই তাকে স্নেহ করত। ছেলেটি নিজেও বাজনা বাজাত এবং মাঝে মাঝে এসে বাবার কাছে শিখত। সে যখন দেখল বাবার অবর্তমানে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিখছি, অথচ তাকে কখনও অন্নপূর্ণা দেবী শেখান নি, মনে মনে ঈর্ষায় ভুগেছে। সে অনেকবার শিখতেও চেয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি বরাবরই বলেছেন দাদুর কাছে শিখতে। অনেকবার বলার পর অন্নপূর্ণা দেবী বলেছেন, যে তিনি সঙ্গীতের কতটুকুই বা জানেন যে শেখাবেন। ছেলেটি খুব ভাল ভাবেই জানতো যে অন্নপূর্ণা দেবী অত্যন্ত বিদুষী এবং এ কথা সে বহুবার শুনেছে বাবার কাছে। তাই ছেলেটির মনে হয়েছে সে ছোট থেকে এ বাড়ীতে আসছে, সে যা পেল না, সেই জিনিষ আমি পাচ্ছি। এটা সহ্য করা তার কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে। আজ পর্যন্ত বাবা কাউকে বাড়ীতে রেখে শেখান নি, অথচ আমি তার ব্যতিক্রম। এছাড়া বাড়ীর সকলেই আমার অনুগত। তাই সহ্য করতে না পেরে কেমন মিথ্যা করে অন্নপূর্ণা দেবীকে আমার বিষয়ে কান ভারী করেছে। যদি অন্নপূর্ণা দেবী কান পাতলা হতেন এবং জিজ্ঞাসা না করতেন, তা হলে তো আমি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতাম। যাক্ এ ঘটনার এখানেই ইতি করলাম।

এরপর সরোদ নিয়ে শিখতে বসলাম। বাজাবার আগেই বললাম, 'দেখুন, আপনি আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী। দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না।' উত্তরে বললেন, 'এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি কাউকে ছোট ভাবিনা।' এ কথা বলেই বললেন, 'তাড়াতাড়ি বাজনা মেলান। বাজাবার সময়ে, অন্নপূর্ণা দেবীর গম্ভীর মূর্তি দেখে অনুরোধ করার আর সাহস হলো না যে, কেন তুমি না বলা ছোট থেকে অভ্যাস? কাউকে ছোট না ভাবা বুঝতে পারি মহান, আদর্শবিদরা এই কথাই শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যে শিক্ষক, সে কেন শিক্ষার্থীকে আপনি বলবে? শিক্ষককে তো সর্বদাই তুমি বলতেই দেখেছি।

যাক, সে কথা আর বাড়ালাম না, গম্ভীর মূর্তি দেখে। আসলে, শেখাবার সময় বাবার মতই রুদ্রমূর্তি, আর অন্য সময়ে একেবারে মাটির মানুষ।

৮

এই পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক লোক আছেন, যারা কষ্টের সময় কারো কাছে বিশেষ বেকায়দায় না পড়লে 'অবলিগেশন' নিতে চান না। কিন্তু যদি বাধ্য হয়ে কোন 'অবলিগেশন' নেন তাহলে যে কোন প্রকারে তার একশো গুণ অন্যভাবে পূরণ করে দেন। এই কমসংখ্যক লোকের মধ্যে বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবী পড়েন। হয়ত বাবার কিছু কাজে আমি সাহায্য করেছি, যার জন্য বাবার যে অপার স্নেহ আমি পেয়েছি, তাতে অনেকের কাছে চক্ষুশূল হয়ে পড়েছি। বাবা আমাকে যত বিশ্বাস করেছেন, সে বিশ্বাস আলি আকবর কিংবা রবিশঙ্করকে করেন নি। অবশ্য এ কথাটা অকপটে রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরও স্বীকার করেছে।

যেহেতু, বাবার সব কাজ এবং তাঁর নাতিদের পড়াচ্ছি, এই কারণেই অন্নপূর্ণা দেবী আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, এবং যার জন্য পাছে বাবার কাছে বকুনি খাই, তার জন্যই আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে মৈহার থাকাকালীন প্রভূত সাহায্য করেছেন। যা কি না এ যাবৎ কারুর বেলাই করেন নি। অবশ্য করবার প্রশ্নও আসেনি। এ ছাড়া রবিশঙ্করের সঙ্গে যখন বম্বে বা দিল্লীতে থেকেছেন, সেখানে রবিশঙ্করের বাড়ীতে সর্বদাই রবিশঙ্করের শিষ্যরা থেকেছে। রবিশঙ্কর নিজে তাদের শিক্ষা দিয়েছে, এক বাড়ীতে থেকেও রবিশঙ্করের শিষ্যরা কখনও অন্নপূর্ণা দেবীর বাজনা শুনতে পায় নি। অন্নপূর্ণা দেবী গভীর রাত্রে কখন যে রিয়াজ করতেন তা ছিল তাদের অজ্ঞাত। যদিও রবিশঙ্করের শিষ্যরা জানত অন্নপূর্ণা দেবীর বাজনা অতুলনীয়।

মৈহারে থাকাকালীন, বাবার অবর্তমানে, বাবার নির্দেশে একমাত্র বাবার নাতিদের দেখতেন ঠিক রিয়াজ করছে কি না। আমিই হলাম একমাত্র ব্যতিক্রম। বাবার অবর্তমানে আমার শিক্ষা চলতে লাগল।

মৈহারে আসার আগে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডাইরেক্টর জানতেন যে আমি বাবার কাছে শিখি। তাঁর ধারণা ছিল আমি কাশীতেই আছি। হঠাৎ কাশী থেকে একটা চিঠি পেলাম। দেখলাম এলাহাবাদ রেডিওতে আমার প্রোগাম দিয়েছে, চব্বিশ ডিসেম্বর। পাঠকরা আমার সঙ্গীতে কতটা জ্ঞান নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু কেউ কি ধারণা করতে পারবেন রেডিওর নিয়ম অনুযায়ী কাশী থেকেই আমি আমার মনের মত পনেরটা রাগ লিখে দিয়েছিলাম। তার থেকে তিনটে রাগ, তোড়ি, পুরিয়া ধ্যানেশ্রী এবং আড়ানা বাজাবার জন্য রেডিও চিঠি দিয়েছে।

আগেই লিখেছি আমার যতটা বিদ্যা, শুনে শুনে। রাগগুলো বাজাতে হবে, কি করে বাবাকে বলব এ ভেবেই আমার পিলে চমকে উঠল। যদিও মনে মনে খুবই আনন্দ হল রেডিওতে বাজাব। এতদিন কেবল বাজনা শুনেছি, এবার নিজে বাজাব এবং সকলে শুনবে। সময় আর হাতে বেশী নেই। মাত্র কুড়িদিন আছে। এই বাজনার জন্য চল্লিশ টাকা পাব। আমার কাছে তখন ওই টাকা অনেক। সুতরাং অন্নপূর্ণা দেবীকে সব কথা বলে বললাম, 'জানি আমার কোনই যোগ্যতা নাই, তাহলেও এই তিনটে রাগ একটু ঠিক করে দিন। একটু আলাপের ঢং এবং একটা দ্রুত গৎ।

অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে নিরাশ করলেন না। আলাপের অঙ্গ শেখাতে শেখাতে গলায়

একটু গেয়ে শোনালেন। কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর। আমার ধারণা ছিল বাজনাই অদ্ভুত বাজান। কিন্তু গানের গলাও যে এত মিষ্ট, এক মস্ত গায়িকাও তো হতে পারতেন। আশিসদের সকালে গাইতে দেখি, সুতরাং ভাবলাম, অন্নপূর্ণা দেবীও নিশ্চয়ই ছোট থেকে গানও শিখেছেন। কিন্তু শিক্ষাকালীন তাঁর মূর্তিটা অনেকটা বাবার মত, রাগী রাগী ভাব। মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না। যাই হোক, একঘন্টা ধরে রাগ তোড়ীটা হল কিছুটা। হাত জোড় করে বললাম, 'বাবার আসার আগেই দয়া করে পুরিয়া ধানেশ্রী এবং আড়ানাটা একটু শিখিয়ে দেবেন।' গম্ভীরভাবে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'ঠিক আছে, আজ সকালে যতটা বললাম খুব বাজান। রাত্রে পুরিয়া ধ্যানেশ্রী এবং আড়ানা কয়েকদিনে কিছুটা করিয়ে দেব।' এই কথা শুনে যেন গা থেকে জ্বর ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই নিজের ঘরে এসে বাজাতে লাগলাম। সন্ধেবেলায় পুরিয়া ধানেশ্রী এবং আড়ানা একটু শিখলাম।

আজ লিখতে বসে অবাক হয়ে ভাবছি যার হাতে কৃন্তন, ডারাডারা, মীড় কিছুই আসে না, তাকে কি করে অন্নপূর্ণা দেবী বাজাবার মত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য বাবার কাছেও একটু শিখেছিলাম।

হঠাৎ রাত্রে রবিশঙ্করের একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে জানতে পারলাম, বাবা এলাহাবাদে কৈলাশ হোটেলে আছেন। আমি যেন এলাহাবাদে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করি কেননা বাবা কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। রাত্রের ট্রেনেই এলাহাবাদ রওনা হলাম। সকালে এলাহাবাদে গিয়ে কৈলাশ হোটেলে গিয়ে দেখলাম বাবা একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হলো। বাবা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন কাশী থেকেই আমি এম.এ., ল. জজিয়াতি পাশ করে এখন মৈহারে বাবার কাছে শিখছি। এছাড়া বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাবা সেক্রেটারি কথাটাকে ছেকরেটারি বলতেন। আমার পরিচয় শুনে মাথা নীচু করে রইলাম। তখন আমি বুঝলাম কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রির প্রফেসার, কাশী থেকে এলাহাবাদে এসেছেন। দিল্লীতে বাবার যাবার পর, দশবারো দিনে সব ঠিক করে এলাহাবাদে এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। বাবা কাশীতে আজই গাড়ী করে চলে যাবেন। বাবা আমাকে বললেন, দশবারো দিনের মধ্যেই মৈহারে ফিরে আসবেন, আর বললেন খুব বাজাতে। সঙ্কোচের সঙ্গে রেডিওর বাজনার কথা বললাম, তিনটে রাগ সম্বন্ধেও বললাম যা বাজাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমায় তিনটে রাগের আরোহী অবরোহী লিখিয়ে দিয়ে বললেন খুব রিয়াজ করতে, মৈহারে ফিরে বাবা গৎ ঠিক করে দেবেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দুপুরের ট্রেন ধরেই রাত্রে মৈহার ফিরে এলাম।

পরের দিন সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যায় অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিক্ষা করলাম। রেডিওতে বাজাতে হবে বলে খুব রিয়াজ করলাম। সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যায় রুটিন মাফিক বাজাতেই হয়। কিন্তু রাত্রে বাজনার সময়টা বাড়িয়ে দিলাম। কারণ পাশের ঘরে বাবা তো নাই।

কথা ছিলো দশবারোদিন পরে বাবা আসবেন মৈহারে। কিন্তু পাঁচ দিনের মধ্যেই হঠাৎ বাবা এসে হাজির হয়ে গেলেন রাত্রি বারোটার সময়। বাবা যখন এলেন তখন আমি

বাজাচ্ছিলাম। বাবা আসবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলাম। আমি এত রাত্রেও বাজাচ্ছিলাম দেখে বাবা খুশীই হলেন। মা তখুনি চা করে দিয়ে তামাক দিলেন। বাবার কাছে শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মতের মিল হয় নি। এখন বাবা যা বলে এসেছেন তাই নিয়ে মিটিং হবে এবং পরে বাবাকে আবার ডাকবে। যাক, বাঁচা গেল। কাশীতে বাবা গেলে যদিও আমাকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাহলে আমার শিক্ষা হবে না। দুই মাসের মধ্যে মৈহারের নিস্তব্ধ বাতাবরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বাবা আসার একদিন পরেই, বাবার অতি প্রিয় একটা বাছুর মারা গেল। বাছুরটা ছিল দেখতে খুব ভাল। পুত্র শোকে লোকে যেমন ভেঙ্গে পড়ে, বাবাকে দেখেও তাই মনে হলো। বাবা জ্বরে পড়ে গেলেন। ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের ওষুধে সন্ধ্যার পরেই বাবার জ্বর ঠিক হয়ে গেল। দেখি রাত্রে বাবা নিজের ঘরে বসে বাজাচ্ছেন। শোক না পেলে বোধহয় বাজনার মধ্যে করুণভাব ফোটে না। আজকের বাজনা শুনে আমার তাই মনে হলো। একটা রাগ বাজিয়ে আবার আর একটি রাগের আলাপ বাজালেন।

পরের দিন সকালে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে কি রাগ বাজাচ্ছিলেন।' বাবা বললেন, 'চিত্রগৌরী ও সাঁঝগিরি।'

সকালে মৈহারের স্কুলের হেডমাস্টার এসে বাবাকে অনুরোধ করলেন, স্কুলের তরফ থেকে বাবাকে তাঁরা একটা সম্বর্ধনা দেবেন। সম্বর্ধনা দেওয়াটার অর্থ বাবা ঠিক বুঝতে পারলেন না। ব্যাপারটা বাবাকে বোঝানতে, বিনয়ের সঙ্গে যেমন বলে থাকেন, বললেন, 'আমি তো কুলি কাবারী লোক, আমাকে আবার সম্মান দেখানো কেন?'

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাবা অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। এই বিনয়ের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিলো না। বাবার ওই কথা শুনে হেডমাষ্টার বললেন, 'আপনি হলেন ভারতের গৌরব এবং মৈহারের আদর্শ পুরুষ। আপনি গেলে স্কুলের ছেলেরা আপনার দুটো কথা শুনবে, তারা মনের জোর পাবে।' বাবা বললেন, 'আমি তো কোন ভাষণ দিতে পারি না। লেখাপড়া তো কিছু করি নি। সারাজীবন সঙ্গীতে যৎ সামান্য খুঁদ কুঁড়ো যা সংগ্রহ করেছি, তাই আমি শোনাতে পারি।' বাবার কথাটা আমি হেডমাষ্টারকে বুঝিয়ে দিলাম। হেডমাষ্টার তো আকাশের চাঁদ পেলেন। তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি যে বাবা বাজাবেন। বাবাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'এ তো চরম সৌভাগ্য।' বাবা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার ছাত্র ছেলেদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলবে।' খুশী মনে হেডমাষ্টার চলে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বাবা আশিস এবং আমাকে নিয়ে গেলেন। স্কুলে দেখলাম মৈহারের দশবারোজন বিশিষ্ট সম্মানীয় এবং ধনী লোকও এসেছেন। স্কুল ইন্‌সপেক্‌টারও এসেছেন। হেডমাস্টার বাবার সম্বন্ধে নানা কথা বলে মালা পরিয়ে একটি মানপত্র দিলেন। বাবাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করাতে, বাবা আমাকে দেখিয়ে দিলেন বলার জন্য। বাবা আমাকে বললেন, 'এ হল বিদ্যালয়। তুমি লেখাপড়া করেছ, ইংরাজীতে ছাত্রদের বল যে বিদ্যা হল তপস্যা। সময় একটুও নষ্ট না করে, গুরুর কথা মতো শিক্ষালাভ করে মানুষ হয়ে, মৈহারের

নাম বাড়াক।' বাবার কথামতো ইংরেজীতে আমি বাবার জীবনী সংক্ষেপে বললাম। বাবা যা বলতে বলেছিলেন, তা বলে শেষে বললাম, 'যার জন্য বাবার এত সম্মান, সেই বাজনা আপনারা শুনুন'। এরপর বাবা বাজালেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গত করলেন ব্যাণ্ড পার্টির অন্ধ সুরদাস। এখানে কিন্তু সুরদাস ঢোলকের বদলে তবলাতেই কেবল ঠেকা দিয়ে গেলেন। হঠাৎ বাজাবার পর বাবা সংগীত সম্বন্ধে ভাবাবেগে আধঘণ্টা বলে গেলেন।

বাবার হিন্দিটা ছিল আধা বাংলা এবং আধা হিন্দি। বাবা লেখাপড়া করতে পারেন নি, তার জন্য বাবার দুঃখের অন্ত ছিল না। লেখাপড়া না করলে পৃথিবীকে, নিজের দেশকে জানব কি করে? বাবা সঙ্গীত শিখবার জন্য ছোটবেলা থেকে যে কষ্ট করেছেন, নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা লোকের সংস্পর্শে এসে, যা কিছু শিখেছেন, বলে গেলেন। স্কুলের ছাত্র এবং শ্রোতারা বাবার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল। হাততালিতে জায়গাটা ভরে গেল।

এরপর চা জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। বাবা কিছু খেলেন না। বাবা আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা খাবে'। বাড়ীর কাছেই স্কুল। তা সত্ত্বেও চোপড়া সাহেব নিজের মোটরে বাবাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। এই চোপড়া সাহেব সাণ্ডারসান লাইম কম্পানির ম্যানেজার। বাবার অতি প্রিয়ভাজন। চোপড়া সাহেবের স্ত্রী বাবার কাছে কিছুদিন হারমোনিয়াম এবং সেতার শিখেছিলেন। ওদের বিষয়ে যথাস্থানে লিখব।

বাড়ীতে এসে, সন্ধ্যার পর বাবা দেখলেন একটা গরু আসেনি। রোজ বিকেলে গরু মোষ বাইরে যেত, মাঠে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেত। মাঝে মাঝেই কখনও গরু বা মোষ না এলেই বাবার মেজাজ সপ্তমে চড়ত। তার জের সকলের উপর পড়ত। বাবা গেটের দরজা খুলে রাখতেন, যদি রাত্রে ফিরে আসে। রাত্রে কয়েকবার গোশালাতে দেখে আসতেন গরু ফিরেছে কি না। না ফিরলেই সেই এক কথা 'লক্ষণ ভাল নয়, খারাপ সময় আসছে।'

পরের দিন সকালে গরুটা আসতে বাবার আনন্দটা দেখবার মতো। ঠিক ছোট ছেলেকে একটা লজেন্স দিলে যেমন খুশী হয়, বাবারও সেই খুশী খুশী ভাব।

৯

কাশীতে থাকাকালীন, একটা অভ্যাস ছিলো রোজ কাগজ পড়া, আর পনেরো দিন অন্তর একবার বেতার জগৎ পড়ার। কলম আর নোট বই নিয়ে নোট করতাম, কার কোথায় কি বাজনা? এই অভ্যাসটা মৈহারে গিয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু পোষ্ট অফিসে গিয়ে পোষ্টমাষ্টারের সৌজন্যে একবার চোখ বুলোতাম, অমৃত বাজার পত্রিকায়। দ্রষ্টব্য সামনের পাতা, খেলার পাতা আর আকাশবাণীর বিবরণী। এই বিবরণীতেই একদিন দেখলাম, লক্ষ্ণৌ রেডিও থেকে সন্ধ্যা বেলায় আলি আকবরের প্রোগ্রাম আছে। বাবার ঘরে ফিলিপস্ কোম্পানীর খুব ভালো রেডিও ছিলো। বাবা মাঝে মাঝে নাতিদের নিয়ে বসে রেডিও শুনতেন। যদি কিছু ভালো গানবাজনা হতো, কিছুক্ষণ শুনে জিজ্ঞাসা করতেন, কি সুর লাগছে। সেটাও ছিল খেলাচ্ছলে সুর চেনানো। তারপরই বন্ধ করে দিয়ে নাতিদের বলতেন, যাও শুয়ে পড়। রাত্রে প্রায় বাবা আফগানিস্তানের প্রোগ্রাম লাগাতেন। আমি গিয়ে চুপ করে শুনতাম। বাবা বলতেন, এই গানে আজানের ভাব থাকে।

ঠিক সময়ে রেডিও খুললাম। ঘোষণা হল যোধপুর দরবারের সরোদ নওয়াজ উস্তাদ আলি আকবর খাঁ রাগ শ্রী বাজাবেন।

রেডিওতে ঘোষণা শুনেই বাবা বলে বসলেন, 'আরে বাবা, যোধপুর দরবারের সরোদ নওয়াজ। আবার উস্তাদ! আমি তো কিছুই হতে পারলাম না। যোধপুর বড় স্টেট, তার কথাই আলাদা। এই কথা বলে চুপ করে তামাক খেতে খেতে আধঘন্টা বাজনা শুনলেন। বাজনা শেষ হবার পর, বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগলো বাজনা?' আমি উচ্ছসিত হয়ে বললাম, 'অদ্ভুত ভালো।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'ছাতার কি বোঝ তুমি? এটা শ্রী হল না, বিশ্রী হল। শ্রী রাগের কোমল 'রে' কি জিনিষ, যখন শিখবে তখন বুঝবে। এই কোমল 'রে' এর শ্রুতি অত্যন্ত কঠিন।' আমার কাছে বাবার কথাটা ল্যাটিন মনে হলো। বাবা বিশ্রী বললেও, আমার মনে হলো বাবাও খুশী হয়েছেন। বাবা বললেন, 'দুই প্রকারের প্রশংসা হয়, এক প্রশংসা হয় গুণীজনদের, আর এক প্রশংসা হয় মূর্খদের। তুমি হলে মূর্খ। খুব সাধনা করো, খুব ভালো করে শেখো, তখন অন্তর থেকে যদি ভালো লাগে তাহলে বুঝবে ভালো। সঙ্গীত হল, নাদ বিদ্যা, অপরম্পার। এত খারাপ জিনিষ, সারা জীবন সাধনা করেও কিছু করতে পারলাম না। সর্বদাই অতৃপ্তি মনে। মনে হয় অনেক কিছুই বাজাই, কিন্তু হয় না। সারা জীবনে তিন চারবার 'সা' লেগেছে,—এবার আমার অবাক হবার পালা। এটা কি বিনয়? বিনয় যদি না হয়, তাহলে আমায় নিরাশ করছেন কেন? যাতে বাজনা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। জীবনে তিন চারবার 'সা' লেগেছে)এ আবার কি কথা? বাবা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝলেন। হঠাৎ বললেন, 'খুব মন দিয়ে সাধনা করো তখন আমার কথা বুঝতে পারবে।' আজ যখন এই বই লিখছি পুরোনো সব কথা একের পর এক মনের মধ্যে আসছে। আজ বুঝতে পারি কত দামী কথা বাবা বলতেন। বাবার এই কথার অর্থ অনেক পরে বুঝেছি।

পরের দিন জব্বলপুর থেকে বাজাবার জন্য বাবার কাছে একটি আমন্ত্রণ পত্র এলো। স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে বাজাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, স্কুলের হেডমাষ্টার লিখেছেন, পারিশ্রমিক দিতে তাঁরা অপারগ, তবে সাধারণ পত্র-পুষ্প উপহার দেবেন। অনুরোধ করেছেন বাবার একটা ফটো এবং সংক্ষেপে জীবন-চরিত লিখে পাঠাতে। বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পত্র-পুষ্প মানে কী?' উত্তরে বললাম, 'মাল্যার্পণ করে সম্মান করবে এবং জব্বলপুরে আসা যাওয়ার খরচ ছাড়া কিছু টাকা দেবে, যেহেতু স্কুলের ব্যাপার।' বাবা আবার বললেন, 'কি করব যাওয়া উচিত কি না?' আমার হলো বিপদ। আমি কি বলব? এই কয়দিন মৈহারে এসে বুঝেছি, বাবাকে কিছু বলা বিপদ। এ হল এমন করাত, দুদিকেই কাটে। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলা যেতে পারে, কিন্তু বাবা কি ভাবে নেবেন, তা বোঝা বড় কঠিন। সুতরাং বললাম, 'আপনি যা ভালো বোঝেন সেইরকম চিঠি লিখে দেব।'

হঠাৎ বাবা বললেন, 'ছবি এবং জীবন-চরিত চেয়েছে কেন?' উত্তরে বললাম, 'আপনার ছবি ছাপিয়ে জীবন-চরিত লিখবে।' বাবা বললেন, 'আমার জীবনী তো দুঃখে ভরা, চিরকালই তো শিক্ষা করিয়েই কাটিয়েছি।' আমি বললাম, 'আপনার জীবনী আমার কাছে লেখা আছে,' যে কথা মৈহারে এসে বলেছিলাম, যে দিন অন্নপূর্ণা দেবীর সুরবাহার শুনি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আমার জীবন-চরিত লিখেছে? আমার ঘর থেকে খাতাটা নিয়ে এসে বললাম, 'আপনার জীবন চরিত লিখেছেন রামগোপালপুর, মৈমন সিং-এর জমিদার হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।' বাবা বললেন, 'আরে আরে হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিরাট জমিদার ছিলেন। খুব মিষ্টি তবলা বাজাতেন। সে তো বহুদিনের কথা।' আমি বললাম, 'বইটি লিখেছেন ৩.১০.১৯২৯ সনে।' বাবা বললেন, 'কি লিখেছে পড়তো।' পড়লাম। খুব মনোযোগ দিয়ে বাবা শুনে বললেন, 'আরে আরে এ তো সব ঠিক লিখেছে।' একটা ব্যাপারে আমার খট্‌কা লাগল। বাবার জন্মসন লেখা ছিলো ইংরেজী ১৮৮১ সনে, সেই হিসাবে বাবার বয়স হওয়া উচিত, আটষট্টি। কিন্তু মৈহারে এসে কয়েকদিন ধরে শুনেছি 'আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার বয়স হলো বিরাশী।

যাক, এ বিষয়ে আমি বাবাকে কিছু বললাম না। কিন্তু মাথায় একটা বিরাট খট্‌কা লাগল। বইটার ঘটনা শুনে যখন বলছেন সবই ঠিক, তাহলে বয়সে চৌদ্দ বছর কি করে বেড়ে গেল?

বাবা একটা এনভেলপ এবং চিঠির প্যাড আমাকে দিয়ে বললেন, 'যেহেতু বিদ্যালয়ের ব্যাপার সেইজন্য যাওয়াই উচিত কি বল?' আমি বললাম, 'আপনার লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরে যাবার কথা আছে, হাতে সময়ও আছে। জব্বলপুর থেকে বাজিয়ে আপনি সোজা এলাহাবাদে গিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যাবেন। লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর বাজিয়ে আপনি মৈহারে, দশ দিনের মাথায় ফিরে আসতে পারবেন।' বাবার গ্রীন সিগনাল পেয়ে, সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখলাম। ফটো এবং জীবন চরিত সংক্ষেপে লিখে পাঠালাম।

বাবা আমাকে দুদিন সকাল, বিকেল এবং রাত্রে রেডিওতে বাজাবার জন্য গৎ শেখালেন। এ ছাড়া নতুন কিছু পাল্টা দিলেন।

দু'দিন পর বাবা জব্বলপুর চলে গেলেন। যাবার আগে একটা বড় মনিব্যাগে টাকা রেখে আমাকে বললেন, 'রোজ বাজার এবং যা কিছু লাগে, খরচা করবে এবং এই টাকাটা তোমার কাছে রেখে দাও।' উত্তরে আমি বললাম, 'আমি কেন টাকা রাখব? মায়ের কাছে টাকা রেখে যান, আমি নিয়ে নেব।' বাবা বললেন, 'আরে না না, তোমারা মায়ের কাছে টাকা দিলে, তার থেকে টাকা সরিয়ে রাখবে, সুতরাং তোমার কাছেই রাখো।' আমি তো অবাক। এ কোন পরীক্ষা? কেননা বাবার সম্বন্ধে অনেক কিছুই অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বলে দিয়েছেন। যতই কিছু না শুনে থাকি, কিন্তু সর্বদাই তো আমার পক্ষে সমস্যা! তাই জোর করে বাবাকে বললাম, 'আপনার ড্রয়ারে টাকার মনিব্যাগ রেখে দিন, আমি রোজ মার থেকে চেয়ে নেব।' বাবা আর জোর করলেন না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, বুঝলাম এও এক পরীক্ষা।

যাক, রাত্রের ট্রেনে বাবাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এলাম। পরের দিন হঠাৎ আমার পেটে খুব ব্যথা হল। বারবার কলে যেতে হলো। হঠাৎ দেখি, বুদ্ধা চাকরকে দিয়ে আমার জন্য অন্নপূর্ণা দেবী ঔষধ আনিয়েছেন। আমার বলার কোন ভাষা নাই। অভিভূত হলাম। মা বারবার এসে আমার খবরাখবর করতে লাগলেন। আমার মনে হোল না বাইরে আছি, মনে হলো যেন নিজের বাড়ীতেই আছি।

দুপুরে দেখি মা রোগীর পথ্য করে দিয়েছেন। গ্যাদাল পাতার ঝোল এবং ভাত। মার কাছে শুনলাম বুদ্ধাকে দিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী গ্যাদাল পাতা আনিয়েছেন। মনে পড়ে গেল কাশীর কথা।

পেট খারাপ হলেই, আমার মা গ্যাদাল পাতার ঝোল খাওয়াতেন। মৈহারে এই পাতা পাওয়া যায় জেনে অবাক হলাম। অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গেল। আশ্চর্য মহীয়সী মহিলা। সঙ্গীতে এত পারদর্শিনী হয়েও সব দিকে খেয়াল আছে তাঁর। আমার কি জানি কেন লজ্জা হোল। গুরুগৃহে এসেছি, কোথায় আমি সেবা করব, অথচ তার বদলে আমার জন্য উদ্বিগ্ন করেছি মাকে এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে। যাক দুদিনের মধ্যেই আমি ঠিক হয়ে গেলাম।

আমার দুইদিন শরীর খারাপ হওয়ার ফলে বাজনা বন্ধ ছিল। এ ছাড়া বাবার দশদিন মৈহারে অনুপস্থিত থাকার ফলে কয়েকটা জিনিষ আমার চোখে পড়ল, যে জিনিষটা আগে পড়েনি। প্রথমে মায়ের কথা বলি। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত মায়ের বিশ্রাম নেই। যন্ত্রের মত, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মাকে দেখলেই বোঝা যাবে, মা কি করছেন? মা বাবার মত ঠিক পাঁচবার নমাজ পড়েন। এ ছাড়া দুপুরে, খাবার পর রোজ হারমোনিয়াম বাজান। এক মনে হারমোনিয়াম বাজান। দুপুরে কখনও ঘুমোন না। মাকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারি, নিজের মনেই হারমোনিয়াম বাজান, কারুর কাছে শেখেন নি। এ ছাড়া মার ঘড়ি দেখতে হয় না, ঠিক সময়ে সব কাজ করে যাবেন। রৌদ্রের ছায়া দেখে, সকালে বুঝতে পারেন কটা বাজল। বিশ্রাম বলে কোনো জিনিষ মার অভিধানে লেখা নাই। বিশ্রাম একেবারে রাত্রি এগারোটা নাগাদ। খাওয়ার পাট শেষ হলে বাবাকে তামাক দেবেন, বাবাকে ম্যাসাজ করে দেবেন, তারপরই বিশ্রাম।

দুপুরে খাবার পর, আশিস ও ছোটরা আড়াইটের আগে পর্যন্ত খেলা করবে, বাড়ীর বাইরে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করবে। আমি এই জিনিষটা বন্ধ করলাম। খাবার পর আশিসদের বললাম, 'লেখা পড়া করবে। সকালে যেটা আমি পড়াই, সেইগুলো ঠিক করবে।'

অন্নপূর্ণা দেবীর দৈনন্দিন জীবন ঘড়ির কাঁটার মত। সকালে উঠে বাজান, তারপর নাস্তা, আবার বাজান, তারপর স্নান, খাওয়া। খাওয়ার পর গল্পের বই পড়া, কখনও ঘুমোন না। শুভোকে একটি খাতা কিনে দিয়েছেন। প্যাস্টেল বক্স আছে। নিজের মনে আড়াইটা বাজবার আগে পর্যন্ত ছবি আঁকবে। শুভকেও ঠিক করে দিলাম, ছবিও আঁকবে এবং সকালে যা পড়াই, সেই পড়াগুলো ঠিক করবে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা যেমন করি, অন্নপূর্ণা দেবীও তার ব্যতিক্রম নন। ব্যতিক্রমের মধ্যে তিনটে জিনিষ আমার চোখে পড়ল। নিজের জামা শাড়ী নিজে কাঁচেন, দুপুরে এবং রাত্রে খাবার পর বই পড়েন।

এখন বাবা নেই। যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড পার্টিতে গিয়ে দেখে আসবে, সকলে ঠিক মতো আসে কি না? ঠিক পাঁচটা অবধি বাজায় কি না? সুতরাং শরীরটা ঠিক হওয়ায় মাকে বলে, গেলাম ব্যান্ড পার্টিতে। আমার যাওয়ার কারণ কিন্তু ছিল নিজের তাগিদে। বলতে গেলে ব্যাণ্ড পার্টিতে গেলে রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই হবে।

আমাকে দেখে ব্যাণ্ড পার্টির সকলেই খুব খুশী হল। বাবার সম্বন্ধে বহু গল্প শুনলাম। গল্পগুলি শুনে বুঝলাম বাবা আগে ভীষণ রাগী ছিলেন। যে রাগ এই দুই মাসের মধ্যেই দেখেছি তাতেই আমার আক্কেল গুড়ুম। ভগবান জানেন আগে তাহলে কি ছিলেন? যদিও রাগের কথা কাশীতেই শুনেছিলাম কবিরাজ আশুতোষের কাছে, কিন্তু কয়েকটা ঘটনা শুনে অবাক হলাম।

বাবার কাছে সকলেই এরা খুব ছোট থেকে মার খেয়ে বড় হয়েছে। শুনে অবাক হলাম আলি আকবরকেও বাবা এত মেরেছেন যে কল্পনা করা যায় না। বাবার মার খেয়েই আলি আকবরের আজ এত নাম হয়েছে। এই পার্টির মধ্যে বাবা যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করেন, তার নাম গুলগুলজী। গুলগুলজী আগে গান গাইত। পরে ব্যাণ্ড পার্টিতে ঢুকেছে। গুলগুলজীর বাবা ছিলেন খুবই পণ্ডিত লোক। বাবার অবর্তমানে, গুলগুলজীই ব্যাণ্ড পরিচালনা করে। এর মধ্যে কয়েকদিন বাবার বাড়ীতে একমাত্র তাকেই আসতে দেখেছি, যদিও নমস্কার ছাড়া কোন কথাই হয় নি।

যেহেতু আমি লেখাপড়া করেছি, তাই আমাকে সকলেই খুব সমীহ করে কথা বলতে লাগল। বুঝলাম, বলতে গেলে সবাই নিরক্ষর, একমাত্র গুলগুলজী ছাড়া। একমাত্র গুলগুলজীই একটু লিখতে পড়তে পারে এবং সাধারণ হিসাব পত্তর অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করতে পারে। কিন্তু আমার কাছে সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র।

সকলেই বাজাতে এসেছে। আমাদের কথার মাঝে একজন এলো। যে এলো, সেও আমাকে নমস্কার করে বসল। গুলগুলজী বলল, 'এত দেরীতে কেন এলে?' উত্তরে সে বলল, 'বাড়ীতে কয়েকজন এসে গেছে বলে দেরী হলো। উপরন্তু একজনের নাম করে বলল, যেহেতু তার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে তার জন্য সে আসতে পারে নি।' আমি এবার আমার আসার কারণ বললাম। আমার কথাশুনে মনে হলো যেন সাপ কামড়েছে। সকলেই বলল, বাবাকে যেন আমি না বলি, যে একজন দেরীতে এসেছে এবং একজন আসেনি। আমি যখন গিয়েছি তখন বাজনার দলে সকলে বসে গল্প করছিল। তবে ওদের আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই আমি কিছুই বলব না। আসলে, আমি এসেছি নিজের গরজে বাজনা শুনতে।' এই কথা শোনার পরই সকলে বাজনা মিলিয়েই বাজাতে আরম্ভ করল। তিনটে রাগ শুনলাম, শ্যাম কল্যাণ, খাম্বাজ এবং তিলককামোদ। তবলায় ঠেকা বুঝতে পারি কিন্তু ঢোলকে বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। ছোটবেলায় কাশীতে হিন্দুস্থানীদের বিয়েতে মেয়েদের ঢোলক বাজাতে দেখেছি, গানের সঙ্গে। বিয়েতে ঢোলক বাজানোটা মেয়েদের ভিতরেই হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাণ্ডে এই ঢোলক বাজনা খুব ভাল লাগল। এদের কাছেই শুনলাম, আলি আকবর, রবিশঙ্করের বাড়ীতে গিয়ে ঢোলক বাদক অন্ধ সুরদাস তবলায় ঠেকা লাগাত।

বাড়ীতে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। একটু স্বাধীনতা পেয়েছি। বাজনারা শেষে গুলগুলজী যখন বলল, তার বাড়ীতে যেতে শহরের বস্তীর মধ্যে, আনন্দে রাজী হয়ে গেলাম। মৈহারের যে দিকটা পুরোনো বস্তী এবং রাজার রাজপ্রাসাদ, সেই দিকেই

গুলগুলজী থাকেন। গুলগুলজীর বাড়ী যাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে বাবার বিষয়েই নানা গল্প হল। বাবা কি জিনিষ পছন্দ করেন এবং কি না করলে চটে যান, এ সব শুনে আমার উপকারই হোল। যদিও অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বাবার পছন্দ অপছন্দের কথা বলেছেন, কিন্তু তখন কী জানতাম কত কথাই অজানা ছিলো? যাই হোক গুলগুলজীর বাড়ী থেকে, তার সঙ্গেই বাড়ীতে ফিরে এলাম। তার কাছে শুনলাম, বাবার অবর্তমানে রোজ বাবার বাড়ীতে একবার হাজিরা দেওয়া তার একটা প্রধান কাজ। বাড়ীতে কোনো প্রয়োজন থাকলে গুলগুলজীই তার ব্যবস্থা করেন। আমাকে পৌঁছাতে গুলগুলজী বাড়ীতে এসে, মাকে প্রণাম করে খবরাখবর নিয়ে চলে গেলেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। দেখলাম আশিসরা বাজাতে বসেছে। হঠাৎ কানে এল সুরবাহারের আওয়াজ। উপরে অন্নপূর্ণা দেবী বাজাচ্ছেন।

হঠাৎ কি হল, নিজে না বাজিয়ে ধীরে ধীরে উপরতলায় কয়েকটা সিঁড়ি চড়ে চুপ করে বসে বাজনা শুনতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। দেখি অন্নপূর্ণা দেবী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামছেন। আমায় সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'এখানে কী করছেন? এত দেরীতে কেন বাড়ীতে ফিরেছেন? বাজনা বাজাচ্ছেন না কেন?'

আমি যেন চোরের দায়ে ধরা পড়ে গেছি। সংক্ষেপে সব এক নাগাড়ে বলে বললাম, 'আপনার বাজনাই আমাকে এই সিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছে।' প্রণাম করে বললাম, 'দয়া করে একটু বাজান, আমি শুনব।' বাইরে গম্ভীরভাব দেখালেও, আমার সত্য কথায় মনে হোল একটু নরম হয়েছেন। কিন্তু যা বললেন সে কথা শুনে মনে হোল না নরম হয়েছেন। বললেন, 'বাড়ীতে যে হেতু আপনি দেরীতে এসেছেন এর জন্যই বাজাতে বাজাতে আপনার জন্যই নীচে নামছিলাম।' তারপরই বললেন, 'এইরকম বাইরে ঘুরলে আর মৈহারে থাকা যাবে না। কাশীতে ফিরে যেতে হবে।' বললাম, 'বাবার নির্দেশেই গিয়েছিলাম।' তাঁর উত্তর, 'বাবা বলেছিলেন ব্যাণ্ডে কখনও কখনও যেতে, কিন্তু বাবা কি বলেছিলেন কারও বাড়ীতে যেতে? প্রথমদিনেই বাবা কি বলেছিলেন ভুলে গিয়েছেন?'

আমি নিজেকে বড় অসহায় মনে করলাম। হাত জোড় করে বললাম, 'যা হবার হয়ে গিয়েছে আর হবে না। ক্ষমা করে দিয়ে দয়া করে একটু বাজান।' উত্তর এলো, 'বাজানোটা হলো পূজোর মতো। পূজোর সময় বিঘ্ন হলে পূজোয় মন বসে না। ঠিক আছে চুপটি করে বসুন।' ঘরে দেখলাম ধূপবাতি জ্বলছে। এক ঘণ্টা বাজালেন। এ বাজনা যেন কল্পনাই করা যায় না। যদিও বাজনার কিছু বুঝি না, কিন্তু শুনেছি তো অনেক। রাগটা একটু জানা মনে হলো, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। এ বাজনা একেবারে আলাদা। সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাগটির নাম কী?' গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভবিষ্যতে কখনো এইরকম সময় নষ্ট না করে, দিনরাত বাজাবেন, যার জন্য মৈহারে এসেছেন।' এরপর বললেন, 'রাগটির নাম 'পুরিয়া ধানেশ্রী'। নিজের মনে হাসি পেলো, রেডিওতে বাজাব পুরিয়া ধানেশ্রী, অথচ বুঝতেই পারলাম না?

ছোটবেলা থেকে আমার একটি বদ অভ্যাস ছিলো, অভ্যাসটি হলো অকারণে হাসা। এর

জন্য আমাকে যে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা যথাস্থানেই লিখব। অন্নপূর্ণা দেবীর সামনে রাগের নামটি শুনে হেসে ফেলেছি, তাঁর নজর এড়ায় নি। হঠাৎ বললেন, 'এতে হাসির কী আছে'? স্পষ্ট বললাম 'কিছু মনে করবেন না, এটা আমার একটি রোগ' হাসির কারণটি যখন বললাম, তিনিও হেসে ফেললেন। বললেন, 'বাবার সামনে এরকম যদি অকারণে হাসেন, তাহলে অপার দুঃখ আছে।'

খাবারের সময় হয়ে গিয়েছিলো, খাবার খেয়ে রাত্রি বারোটা অবধি ঘরে বসে বাজালাম। ভাল বাজনা শুনলে প্রেরণা আসে।

পরের দিন রোজকার মত সকালে উঠে বাজালাম, পোষ্ট অফিসে গেলাম, বাবার কয়েকটা চিঠি ছিলো নিয়ে এলাম। তারপর ছেলেদের পড়িয়ে, স্নান করে খাবার খেলাম। খাবার খেয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কাছে কিছু গল্পের বই আছে? বললেন, 'এখানে কি গল্পের বই পড়তে এসেছেন?' উত্তরে বললাম, 'বই পড়াটা দীর্ঘ দিন ধরে আমার নেশা। বই না পড়লে আমার ঘুমই আসতে চায় না। সঙ্গে আমার অবশ্য দুটো বই আছে। একটা হলো 'গীতা' এবং অপরটি হলো 'এ্যাবনরমাল সাইকোলজি।' এই দুটো বই হোলো আমারা সাথী। বই পড়লে কিছুক্ষণের জন্য নানা চিন্তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, তার জন্যই আপনার কাছে বই চাইছিলাম।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'ওপরে আসুন! কিছু বই আছে, দেখুন আপনার পড়া কী না।' শুভ, আশিসের সঙ্গে উপরের ঘরে গেলাম। উপরে তিনটি ঘর।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটি ঘর, আলি আকবর ছোট বেলায় এই ঘরে শুতো। তার পাশে একটা বড় ঘর, সেই ঘরে অন্নপূর্ণা দেবী এবং শুভ থাকে। তার পাশে আর একটা ঘর আছে, সেখানে একটা বিরাট আলমারী দেখলাম। শুনলাম এটির মধ্যে বাবার যাবতীয় সঙ্গীতের খাতা আছে। যদিও গতকাল রাত্রে এসে মধ্যের ঘরে বাজনা শুনেছিলাম এবং বাজনা শুনবার পরই চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন কোনদিকে নজর দেবার সাহস ছিলো না। হাত জোড় করে মাটির দিকে চোখ বন্ধ করে বাজনা শুনেছিলাম।

বড় একটা ছবি দেখলাম। চেনা চেনা মনে হল, পরে বুঝলাম আলি আকবরের আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছবি। মাথা ভর্তি কোঁকড়ান চুল। কিন্তু কাশীতে এবং দেরাদুনে দেখেছি একেবারে টাক। এত অল্প বয়সে, কি করে সব চুল পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে এ এক বিস্ময়।

অন্নপূর্ণা, দেবী চারটে বড় বড় ট্রাঙ্ক দেখালেন। বললেন, 'দেখুন মনের মত কোন বই পান কী না? অবাক হলাম। প্রতিটি ট্র্যাঙ্কে নভেল ভর্তি। ইংরেজী কিছু গোয়েন্দা বইও আছে। অনেক বই পড়া থাকলেও বহু না পড়া বইও আছে। দশ বারোটা বই নিলাম। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'এই জিনিষটারই অভাব বোধ করছিলাম। এখন দেখছি বেশ কিছুদিনের মত খোরাক পাব। তবে, কাশীতে যেমন রোজ কম করেও দুটো বই পড়তাম, এখানে তা পড়ব না। বাবা থাকলে তো রাত্রে পড়তে পারব না। বাবার অবর্তমানে রাত্রে কিছুক্ষণ পড়ব।'

অন্নপূর্ণা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে তো গীতা আছে। আর একটা কি বই আছে বললেন?' মনে মনে অবাক হলাম। উপরে আসার আগে কথায় কথায় বলেছিলাম,

আমার কাছে গীতা আছে এবং এ্যাবনরমাল সাইকোলজি আছে। এ্যাবনরমাল সাইকোলজি না বোঝাটাই স্বাভাবিক। যারা সাইকোলজি পড়েছে কিংবা ডাক্তারি পড়েছে তাদের এই বিষয়টা জানা সম্ভব। বহু শিক্ষিত লোককে দেখেছি, যাদের কাছে এই এ্যাবনরমাল সাইকোলজিটা হিব্রু ভাষার মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?' তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, 'ছোটবেলায় কিছুদিন পড়েছিলাম, কিন্তু বাবা প্রাচীনপন্থী, তাই পড়াশুনা হয়ে ওঠে নি। নিজের চেষ্টায় পড়ে পড়ে যৎসামান্য বুঝতে পারি। তবে বইপড়া আমার একটা নেশা। ম্যাগাজিনে তো নূতন নূতন বইয়ের নাম বেরোয়। ম্যাগাজিন দেখে কিছু ভাল বইয়ের অর্ডার দিই।' আপনার কাছে গীতা ছাড়া কি বই আছে?' বললাম, 'এ্যাবনরমাল সাইকোলজির একটা বই আছে।'

তিনি আমার কথা শুনে বললেন, 'সাইকোলজি কথাটা শোনা আছে, কিন্তু ওই এ্যাবনরমাল সাইকোলজি কথাটা কি?' জানবার এই যে আগ্রহ, তা আমাকে মুগ্ধ করল। বললাম, 'এম. এ. ক্লাসে আমাদের পড়ানো হতো। এ্যাবনরমাল সাইকোলজি। এর লেখক ফিসার। এর মধ্যে নানা মানসিক রোগ, যেমন হীনমন্যতায় ভোগা, নানাপ্রকার ভয়ে, বা সন্দেহে ভোগা, বহু প্রকারের মানসিক রোগীর কেস হিস্ট্রি দেওয়া আছে। এবং এর নিরাময়ের বিধিও লেখা আছে। এই বইটি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এই বইটি আমার সাথী। এ ছাড়া একজনকে আমি কলকাতায় লিখেছি, তিনটি বই পাঠিয়ে দিতে। ওই তিনটে বই হলেই আমার সময় কেটে যাবে।'

অন্নপূর্ণা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি তিনটে বই?' উত্তরে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, কবি নরেন্দ্র দেবের ওমর খৈয়াম এবং চারখণ্ডে রামকৃষ্ণ দেবের কথামৃত।'

তিনি বললেন, 'দেখুন আমি তো লেখাপড়া বিশেষ করি নি, আপনি কি আমাকে সাইকোলজি এবং এ্যাবনরমাল সাইকোলজি পড়াবেন?' উত্তরে বললাম, 'এ্যাবনরমাল সাইকোলজি আপনাকে কাল থেকে পড়াব, কিন্তু সাইকোলজির জন্য একটা বই আনাতে হবে।'

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কাউকে যাকে জানেন লিখুন, যে ভি. পি. করে পাঠিয়ে দেবে।'

বলে তো দিলাম, কিন্তু পড়াব কখন? বাবা থাকলে তো পড়াতে পারব না। এ দিকটা তো চিন্তা করি নি। তাই সমস্যাটা বলে বললাম, 'এটা কি করে সম্ভব হবে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বাবা যখন থাকবেন না, তখন দুপুর বেলায় আমাকে আপনি এক ঘণ্টা করে পড়িয়ে, যেমন ঘুমোন, ঘুমিয়ে তারপর বাজাবেন। আমার জন্য এক ঘণ্টা কম ঘুমোবেন।' 'তথাস্তু' বলে নীচে চলে এলাম।

পরের দিন শুক্রবার। সুতরাং বাজনা বন্ধ। বৃহস্পতিবারের রাত্রে ছোট ছেলের মত আনন্দ হোতো। রোজ ঘড়ি দেখে চলার থেকে অব্যাহতি পাব। শুক্রবার সকালে দেরী করে উঠতাম। আশিস আমাকে জাগিয়ে দিত। মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা করতাম। বাজাবার তাড়া নেই। কিছুক্ষণ বই পড়ে নটার পর পোষ্টাপিসে যেতাম। বাবার রোজই প্রায় চিঠি আসত। চিঠি অনেক জমে গেছে। বাবা নেই বলে অনেককে লিখে দিয়েছি। বাবা এলে তাঁর নির্দেশ

অনুযায়ী চিঠি দেব। পোষ্টাপিস থেকে এসে আশিসদের পড়ালাম। আশিসদের পড়িয়ে আজ অন্নপূর্ণা দেবীকে এ্যাবনরমাল সাইকোলজি পড়ালাম। পড়াতে বসে বললাম, 'না বুঝলে জিজ্ঞাসা করবেন, সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।' একদিন পড়িয়েই বুঝলাম, অন্নপূর্ণা দেবীর মেধাশক্তি অকল্পনীয়। চুপচাপ মন দিয়ে শুনে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলে, বলছেন যে বুঝতে পারছেন। আমি ইংরাজিতে পড়ে যাচ্ছি, আবার বাংলায় তর্জমা করে বোঝাচ্ছি। কখনও বুঝতে পারছেন না ঠিকই, কিন্তু বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছেন। পড়ানো শেষ হয়ে গেলে বললেন, 'বাবার গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজনা কখনো শুনেছেন?' বললাম, 'কাশীতে গ্রামোফোনের রেকর্ডের একটা দোকান আমার বাড়ীর কাছেই ছিল। সেখানে সিনেমার গান হতো। কিন্তু সঙ্গীতের কোন রেকর্ড শুনি নি।' ঠিক হল, দুপুরে খাবার পর রেকর্ড শোনাবেন। রেকর্ডে বাবার বাজনা শুনব শুনে, কেবলই মনে হতে লাগল কখন দুপুর হবে।

দুপুরে খাবার পর, আশিস, ধ্যানেশ, শুভ, বেবী, সবাইকে নিয়ে উপরে গেলাম। অন্নপূর্ণা দেবী প্রথমে আলি আকবরের একটা ছোট ডিস্ক একটা বার করে বললেন, যোধপুরের মহারাজা এই রেকর্ডটি নিজে যোধপুরে তৈরী করেছেন।' ছোট ডিস্কের মধ্যে আলি আকবরের রাগ গুর্জরী তোড়ী এবং ভৈরবী শুনলাম। খুবই ভাল লাগল। তারপর বাবার রেকর্ড শুনলাম।

বাবার বাজানো গারা, জিলা, তিলক কামোদ, ভৈরবী এবং ললিত শুনলাম। এছাড়া ভায়োলিনে বাবার রেকর্ড, বিশেষ করে কীর্তন শুনে মুগ্ধ হলাম। আজকের দিনটা খুব ভাল লাগল। এতদিন রেডিওতে বাজনা শুনেছি, কিন্তু রেকর্ডে যে শাস্ত্রীয় সংগীতের বাজনা হয় এ কথা জানা ছিলো না। মনে হলো কবে এরকম বাজাতে পারব। এখনও আমার সেই অবস্থা আছে, মনে মনে গুন গুন করি কিন্তু সুর বুঝি না। আজ অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই সুর চেনার রাস্তা কী?' বললেন, 'যখন রিয়াজ করবেন ধীরে ধীরে গলায় গাইবেন, তাহলেই সুর চিনতে পারবেন। সকাল, বিকাল এবং সন্ধ্যায় দেখেন না, আশিস, শুভ, ধ্যানেশ, বেবী এরা প্রথমে গলায় পাল্টা সাধে? সুর চিনতে পারলে, যে কোন রাগ শুনবেন, বুঝতে পারবেন কি সুর লাগছে। এই শুনতে শুনতে তখন রাগ বুঝতে পারবেন।' এর পর থেকেই বাজাবার সময় গলায় গুন গুন করে গাইতাম। সঙ্গীতের একটা নতুন রাস্তা আমার জন্য খুলে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে, বাবা সকালে মৈহারে এসে পৌঁছলেন। বাবাকে দেখে যেমন খুশী হলাম, আবার পর মুহূর্তেই ভাবলাম, আর শিক্ষা হবে না অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। এখন ঘড়ির কাঁটার মত চলতে হবে। বাবা এসেই চা খেয়ে আমাকে ডাকলেন। বাবার টেবিলের ওপর সব চিঠি রেখে দিয়েছিলাম, এবং এ ছাড়া বাবা চলে যাবার পর দিন থেকেই, যা যা খরচা হয়েছে তার দৈনন্দিন হিসাব লিখে, একটা কাগজ রেখে দিয়েছিলাম টেবিলের উপর। বাবা ডেকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কোন অসুবিধা হয় নি তো?' উত্তরে বললাম, 'অসুবিধে হবে কেন?' বললেন, 'ব্যাণ্ডে গিয়েছিলে? সকলে আসে তো ঠিক সময়ে?' বললাম, 'ব্যাণ্ডে

দুইদিন গিয়েছিলাম, সকলেই ঠিক সময়ে আসে এবং বাজায়।' টেবিলের ওপর চিঠি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত চিঠি কোথা থেকে এসেছে?' প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনালাম। চিঠি শুনে কাকে কী লিখতে হবে বলেই, খাম এবং লেটার প্যাড দিলেন। হঠাৎ বাবা বললেন, 'কি রকম প্রাইভেট সেক্রেটারী? চিঠির উত্তর দাও নি কেন?' উত্তরে বললাম, 'সকলকে লিখে দিয়েছি যে আপনি বাইরে গেছেন। ফিরে এলে যেমন বলবেন তেমন উত্তর দেব।' মনে হলো বাবা খুশী হলেন। এরপর দৈনন্দিন খরচার কাগজটা দেখে বললেন, 'এটা কী?' উত্তরে পড়ে শোনালাম রোজকার খরচার হিসাব। বাবা কত টাকা দিয়েছিলেন, কত খরচ হয়েছে এবং কত বেঁচেছে তার হিসাব। সব কথা শুনলেন, কাগজটা দেখলেন, তারপরই কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তোমাকে কি আমি অবিশ্বাস করি? তুমি আমার বুড়ো বয়সের ছেলে। বাড়ীর ছেলের মত থাকবে। নিজের মত ভেবে থাকবে, নইলে কি করে এখানে থাকবে? তুমি কী আর সকলের মতো? বাড়ীর চাকর আর সকলকেই দেখেছি মতলববাজ। ভবিষ্যতে আর কখনও লিখবে না, মনে রেখো', এই কথা বলেই লাঠি এবং থলে নিয়ে বাড়ীর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এবার আমার অবাক হবার পালা। ট্রেন থেকে এসে চা খেয়েই সব খবরাখবর নিলেন এবং সকালেই বেরিয়ে গেলেন থলে হাতে। বোধহয় বাজারে গেলেন মাংস কিনতে। এই বয়সে এত মনের জোর পান কি করে? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত যে নিয়মে চলেন, তার কোন ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম হলো, রাত্রে খেয়ে ঘরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই। হঠাৎ বাবার একটা আওয়াজ পেলাম, কী হয়েছে? কী হয়েছে? তারপরই সব চুপচাপ। আশিস আমার ঘরে এসে বলল, 'পিসিমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। দাদু ও দিদিমা উপরে আছে, দাদু আপনাকে ডাকছে।' তখুনি আশিসের সাথে উপরে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি অন্নপূর্ণা দেবী অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। মার চোখে জল। বাবা এবং মা দুজনেই হায়, হায়! একি হলো বলে বিলাপ করছেন। মার মুখে শুনলাম, আজ সন্ধ্যা থেকে পেট ব্যথা হচ্ছিল, কিছু খায় নি। হঠাৎ অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছে। শুভর কাছে শুনে, উপরে এসে দেখছেন হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গিয়েছে। মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটু জলও খাওয়াতে পারছেন না, দু পাটি দাঁত খোলা যাচ্ছে না। বললাম, 'এ তো হিস্টিরিয়া হয়েছে।' বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা আবার কী?' উত্তরে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই ফিট হয়ে গিয়েছেন।' ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতে এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর এই রকম হতো। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঠিক হয়ে যেত। ছোটবেলায় দেখতাম তিনি ঘোরের মধ্যে হাত পা ছুঁড়তেন, কিন্তু এখানে হাত পা ছুঁড়ছেন না, কিন্তু বাকী সিম্পটমগুলি সেই ছোটবেলায় দেখার মতই। বাবাকে বললাম, 'মুখে চোখে জোরে জলের ঝাপটা দিতে।' আশিসকে বললাম, 'পায়ে এবং মাথায় একটু জল দে।' বাবাকে বললাম 'ঘাবড়াবেন না। আমি এখনই ডাক্তারকে ডেকে আনছি।' বাবা বললেন, 'তুমি তো ডাক্তারকে চেনো না, তুমি এখানে থাক, আমি গিয়ে ডেকে আনছি।' ডাক্তার, বাড়ীর খুব কাছেই থাকতেন। এখানে সরকারী হাসপাতালের একমাত্র ডাক্তার, খুবই বড় ডাক্তার।

বাবাকে বললাম, 'আলাপ না থাকলেও ক্ষতি নাই। আপনার নাম করে ডেকে আনব।' এই কথা বলেই দৌড়ে ডাক্তারবাবুর বাড়ী গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম। বাবার নাম করে, রুগীর অবস্থা জানিয়ে অনুরোধ করলাম বাড়ীতে যাবার জন্য। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে, কিছু ঔষধ ব্যাগের মধ্যে রেখে আমার সঙ্গে এলেন। কথায় বুঝলাম, ডাক্তারবাবু বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। ডাক্তারবাবু এসে জলের ঝাপটা দিলেন চোখের মধ্যে। সামান্য চোখটা একটু নড়ল। হাতের মুঠো খুলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, তখন একটা চামচের উল্টো দিক, মুখে দিয়ে, দাঁতের পাটির মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করলেন, মুখের ভেতরটা যদি খোলে, তাও যখন হলো না, ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসান দিলেন।

বাবা এতক্ষণ নীরব দর্শক ছিলেন। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, 'বাবা কী হয়েছে আমার মেয়ের? হাতের মুঠো, দাঁত কপাটি লেগেছে এ কি হলো? আমাকে এ কী দেখতে হচ্ছে, 'বলেই কাঁদতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাবা, একেবারে ঘাবড়াবেন না, হিষ্টিরিয়া হয়েছে।' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা আবার কী? যতীনও এই কথা বলেছিলো।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'একে মৃগী রোগ বলে।' বাবা বললেন, 'আমি তো কখনও দেখি নি, এই প্রথম দেখছি।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'মাথায় জল দিয়ে একটু ধুয়ে দিতে।' ডাক্তারবাবু চুপ করে বসে রইলেন। আধঘন্টা পর অন্নপূর্ণাদেবী চোখ খুলে তাকালেন, ধীরে ধীরে হাতের মুঠো খুলল। হঠাৎ সকলকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'কি হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'কিছু হয় নি, তুমি ঘুমোও।' ডাক্তার এবারে একটা ট্যাবলেট গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে খাইয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু চিন্তা করবেন না, এখনই ঘুমিয়ে পড়বে।' তিনি এও বললেন, 'পরের দিন সকালে হাসপাতালে যাবার আগে দেখে যাবো।' আমি ডাক্তারবাবুর ব্যাগ নিয়ে বাড়ীতে গেলাম। কথায় বুঝলাম, ডাক্তারবাবু খুব সঙ্গীত-প্রেমী লোক। বাবা ডাক্তারবাবুকে ছেলের মতো ভালবাসেন এবং ডাক্তারবাবুও বাবাকে, পিতার মতই শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, বাবার কাছে আমার কথা আগেই সব শুনেছেন।

বাড়ীতে এসে দেখলাম ঘরে সকলেই বসে আছে। বাবা আমাকে দেখেই বললেন, 'আরে আরে, তুমিও তো ডাক্তার। তুমি যা বললে ডাক্তারও সেই কথা বলল, হিসিরিয়া। তুমিও যেমন জল দিতে বলেছিলে, সেইরকম ডাক্তারও করল।' আমার তো হাসির রোগ আছে আগেই বলেছি। বাবার 'হিসিরিয়া' শুনে, হাসি পাচ্ছিল এই বিকট পরিস্থিতিতেও। কোন রকমে হাসি চেপে বললাম, 'আপনি নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। ঘুমের ঔষধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, এখনই ঘুমিয়ে পড়বেন।' বহু কষ্টে বাবাকে নীচে নিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন সকালেই ডাক্তার এলেন। সকালে একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছেন অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু রাত্রে আবার সেইরকম হলো। গতকাল থেকে আজ ঠিক হতে একটু বেশী সময়ই লাগল। বাবা খুবই ঘাবড়ালেন। বাবা বললেন, 'রবু অর্থাৎ রবিশঙ্করকে টেলি করে দাও।' এ কথায় ডাক্তারবাবু বললেন 'ঘাবড়াবার কিছু নাই, দেখবেন আগামী কাল একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।'

পরের দিন কিন্তু আর কিছু হল না। এর দুইদিন পরে চব্বিশে ডিসেম্বর আমার রেডিওতে

প্রথম বাজনা আছে। এই অবস্থায় যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাবাই আমাকে জোর করে পাঠালেন বাজাতে। বললেন, 'ডাক্তার তো বলেছে ভয়ের কিছু নাই। এখন তো একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

এলাহাবাদে যাওয়ার আগে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, 'হিষ্টিরিয়া ব্যাপারটা পড়বেন। এলাহাবাদ হয়ে এসে কয়েকটা প্রশ্ন করব। এই রোগটা মানসিক রোগ। হিস্টিরিয়ার অনেক কেস হিস্ট্রি আছে ওই এ্যাবনরমাল সাইকোলজিতে, পড়ে নিজেই যেন বোঝবার চেষ্টা করেন কেন এইরকম হয়েছে।'

এলাহাবাদে যাবার আগে বাবা বললেন, 'খুব ভাল করে বাজিও। না বাজাতে পারলে বকব।' সকাল বিকেল সন্ধ্যায় বাজিয়ে রাত্রে মৈহারে ফিরে এলাম। রাত্রে ফিরে মার কাছে শুনলাম, অন্নপূর্ণা দেবী ভাল আছেন। ডাক্তারবাবুর ওষুধ চলছে। আর কিছু হয় নি। তারপর মা বললেন, 'সকালে এবং বিকেলে লাইট ছিলো না বলে তোমার বাজনা শুনতে পাই নি, কিন্তু রাত্রের বাজনা বাড়ীর সকলেই শুনছে। বাজনা শুনে তোমার বাবা বলেছেন, নকল করে করে বেশ তো বাজিয়েছে।' মনে মনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, ভয়ে ভয়ে এসেছি, বাজনা শুনে বাবা কি বলবেন। সকাল এবং বিকেলে বাজনা শুনতে পান নি লাইটের অভাবে; এ আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ।

পরের দিন সকালে বাবাকে প্রণাম করতেই বললেন, 'খুব রিয়াজ করো। রেডিওতে বাজিয়েছ, সকলেই হয়ত খুব প্রশংসা করেছে। সর্বদা মনে রাখবে সামনে সকলেই প্রশংসা করে, পেছনে বলে, 'কি ছাতার বাজিয়েছে!' বাবার কথা এখন একটু একটু বুঝতে পারি। বাবা যে বললেন, কি ছাতার বাজিয়েছে, তার মানে হলো, কি জঘন্য বাজিয়েছে। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর মৈহারে যেমন নিয়মানুবর্তিতায় কাজ হয়, তার কোনও পরিবর্তন নেই।

সকালে বাবার ঘরে ঢুকে এই প্রথম দেখলাম, বাবা শুয়ে আছেন অসময়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর কি ভাল নাই?' উত্তরে বাবা বললেন, 'হাতে গায়ে কি রকম ব্যথা করছে।' বললাম, 'আপনার হাতটা একটু টিপে দিই।' বাবা বললেন, 'বল কি? তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে আমার হাত টিপে দেবে?' জোর করে বাবার হাতের পাঁচটা আঙুল টান টান করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ম্যাসাজ করতে লাগলাম।

বাবা বললেন, 'আরে আরে তুমি তো অনেক কিছু জানো। বেশ ভালই লাগছে। তারপর যখন প্রত্যেকটা আঙ্গুলে দুবার আওয়াজ করে মটকে দিলাম, সেই আওয়াজ শুনে বাবা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। কিছুক্ষণ পর বাবা বললেন, 'কত বড় পাপ হলো আমার, তোমার মত ব্রাহ্মণকে দিয়ে এই কাজ করালাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যে আনন্দ দিলে সেইরকম ভগবান যেন তোমার ইচ্ছা পূরণ করেন, যে আশা নিয়ে সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে এসেছ।' বললাম, 'রোজই এ রকম করে দেব।'

এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'কোলকাতায় জমিদাররা এরকম দলাই মালাই করে, কিন্তু আমি তো জমিদার নই।' উত্তরে বললাম, 'আমার চোখে আপনি জমিদার থেকেও অনেক বড়।' সেই যে ম্যাসাজ করলাম, দীর্ঘ কয়েকবছর রোজ দুপুরে এবং রাত্রে করে দিয়েছি।

মা রোজ দুবেলা দুপুর এবং রাত্রে টিপতেন। দীর্ঘ দিন এই ম্যাসাজ করেছি তারপর হঠাৎ বাবা আমার এই ম্যাসাজ করা বন্ধ করে দিলেন প্রায় পাঁচ বছর পর। কেন তা বন্ধ করে দিলেন, সে কথা যথাস্থানেই বলব।

এর পরের দিন, বাবা এলাহাবাদে বাজাতে গেলেন রেডিওতে। যাবার আগে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'মা আশিসদের একটু দেখো, আমি না থাকলে এরা ফাঁকি দেবে। এরা যেন রোজ ঠিকমতো রিয়াজ করে।'

বাবা চলে যাবার পর অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, 'আমার একটা প্রার্থনা রাখবেন? উত্তর পেলাম, 'ভনিতা না করে, কি কথা বলুন?' সাহস করে বললাম, 'একটা রাগ আমাকে শোনাবেন?' আগেই বলেছি অন্নপূর্ণা দেবী যদি কারও কাছ থেকে কোনও উপকার পেয়ে থাকেন, ঋণ ভেবে শোধ করে দেন। অসুখের সময় সব শুনেছেন, ডাক্তার ডেকেছি, এই সব ভেবেই বোধহয় হঠাৎ বাজাতে রাজী হয়ে গেলেন। আমারও আশ্চর্যের সীমা রইল না যে এত সহজে রাজী হয়ে যাবেন। বললেন, 'কি রাগ শুনবেন?' আমি বললাম, 'পীলু বাজাবেন?' তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'আমি ঠুংরী বাজাই না।' আমিও ছাড়বার পাত্র নয়। বললাম, 'আপনি যেমন বাজান তেমনই বাজান।'

মনে মনে যদিও আমার ইচ্ছা ছিল ঠুংরী শুনবার, কেননা পীলু রাগে ঠুংরীই শুনেছি। কিন্তু দীর্ঘ এক ঘন্টা ধরে যে পীলু শুনলাম তা আমার কাছে বিস্ময়, এ ধরণের আলাপ যে পীলুর মধ্যে হতে পারে, তা আমার কল্পনারও বাইরে। এক বাবা, এবং অন্নপূর্ণা দেবী ছাড়া, পীলুর এ ধরণের আলাপ আমি কখনও কারও কাছে শুনিনি। যদিও পরে আমি বাবার কাছে এই ঢংয়ে শিখেছি। বাবার কাছে বিলম্বিত উজিরখানি গৎও শিখেছি, কিন্তু অন্য কারুর কাছে আজ পর্যন্ত শুনিনি।

আজ অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শুনলাম, বাবা বলেছেন, 'আরে নকল করে রেডিওতে তো বেশ বাজিয়েছে। যদি শেখে তাহলে ভাল বাজাতে পারবে।' কথাটা শুনে মনে হল এই কয়েকদিন, অন্নপূর্ণা দেবী আমার মত সঙ্গীতের মহামূর্খকে কিভাবে একটা ছক করে দিয়েছেন। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'ভাববেন না, ভাল বাজিয়েছেন, এখন সঙ্গীতের অ আ পড়ছেন। তাহলেই বুঝতে পারছেন কত শিখতে হবে।' আমার এতদিনের অহঙ্কার এখন একেবারে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মৈহারে আসবার আগে ভেবেছিলাম ছয় মাসেই উস্তাদ হয়ে কাশী ফিরে যাব; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছয় বছরেও বোধ হয় কিছু হবে না।

বাবার রেডিও প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বাড়ীতে শুনলাম, বাবা প্রতি মাসেই রেডিওতে বাজাতে যান। দু'দিনের প্রোগ্রাম থাকে। একদিন বাজান, তার পরের দিন বিরতি। আবার তার পরের দিন বাজিয়ে মৈহারে চলে আসেন। প্রত্যেকমাসে পাঁচ দিনের জন্য এলাহাবাদ যান। ওখানে বাবার এক ছাত্র আছে, সুপ্রভাত পাল। তাকে বরাবর বাবা চিঠি লিখে দেন। স্টেশনে এসে বাবাকে নিয়ে কৈলাস হোটেলে যায়। বাবার সঙ্গে রেডিওতে যায়। হোটেলে বাবার কাছে সরোদ শেখে। এর পর, বাবার রেডিওর চেক ভাঙ্গিয়ে দিয়ে মৈহারের ট্রেনে বসিয়ে দেয়। আর আমার কাজ হলো,

এলাহাবাদ থেকে এলে, স্টেশনে গিয়ে বাবাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা এবং এলাহাবাদে যাবার সময়ে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

বাবার বাজনা সম্বন্ধে, মৈহারে আমার সাত বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বাবা মাঝে মাঝে যতনা প্রচলিত রাগ বাজাতেন, তার থেকে অপ্রচলিত রাগই বেশী বাজাতেন, যার নাম কখনো শুনিনি। বাড়ীতে কখনও হয়ত শুনেছি এক একটা রাগ বাজাতে, যা কি রেডিওতে গিয়ে বাজিয়েছেন। কিন্তু যে রাগটি কখনও বাড়ীতে বাজান নি, রেডিওতে গিয়ে সেই সব রাগ বাজাতেন। সকলে যা করে বাবা তা কখনও করতেন না। মৈহার ছাড়ার পর দেখেছি, সকলেই বাজাবার আগে দীর্ঘদিন একটি রাগ বাজিয়ে জলসা কিংবা রেডিওতে বাজায়, কিন্তু বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে মৈহার ছাড়ার পর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা যথাস্থানেই লিখব। তখন পাঠকরা বুঝতে পারবেন, বাবা সঙ্গীতের কতবড় সমুদ্র ছিলেন, যা কি না, কল্পনা করা যায় না।

দু'দিন রেডিওতে বাবার বাজনা শুনলাম, রাগ গৌরী এবং চন্দ্রকোষ। অন্যদিন শুনলাম সাহানা, জয়েৎ কল্যাণ এবং পুরিয়া। এই রাগগুলো কিন্তু মৈহারে শুনিনি। বাবার ঘরে রেডিওতে আমরা সকলেই বসে শুনলাম। মনে মনে রাগ গৌরি এবং সাহানা গুনগুন করতে লাগলাম। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'এ সব রাগ, না শিখে বাজান যায় না।' অন্য রাগগুলির নাম মাত্র জানা ছিল কিন্তু সাহানা নামটি না জানার জন্য আমি তা গুনগুন করে নকল করবার চেষ্টা করছিলাম।

আজ যখন এই সব ঘটনা লিখছি, মনে হচ্ছে কত মহামূর্খ ছিলাম। যে অ, আ, ক, খ চেনে না, সে যেন রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা পড়বার চেষ্টা করছে। বাবার অবর্তমানে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে রোজ শিক্ষা করতাম।

অন্নপূর্ণা দেবীর হিস্ট্রিরিয়া রোগ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো, এখানে সংক্ষেপে কেবল দুই একটা কথাই বলি। শরৎবাবুর 'নারীর মুল্যে' এক জায়গায় পড়েছিলাম, নারীই নারীর পরম শত্রু। এখানেও তাই-ই হয়েছে। যে নারী সবচেয়ে কৃতজ্ঞ অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে, সেই সুখের সংসারে আগুন লাগিয়েছে, এবং উপস্থিত এখনও দুইদিক বজায় রেখে বাইরে উদারতার ভান করে এঁদের সংসারে আগুন লাগিয়েছে। সেই নারীকেও খুব দোষ দিতে পারি নি। জীবনে যে নিজেই কিছুই পেলনা, অন্যকে সব কিছু পেতে দেখে হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। তবুও এত উপকৃত হয়েও কি করে কোনো স্ত্রীলোক এত নীচতার আশ্রয় নিতে পারে ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সাধারণ স্ত্রী কি চায়? মাথার উপর ছাদ, দুবেলার প্রয়োজনীয় আহার, পরবার জামাকাপড়, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, কিছু অলংকার, প্রসাধন দ্রব্য, এসব হলেই সে সুখী হয়। কিন্তু সে ধাতে তো গড়া নন অন্নপূর্ণা দেবী। সত্যের যে পুজারী, তার কাছে মিথ্যার বেসাতি, যে সব সময়ে করে, তার সঙ্গে বিবাদ বাঁধাই স্বাভাবিক।

এবং সর্বশেষে যা বুঝলাম,একবার একটা সন্দেহের বীজ রোপিত হলে, কালক্রমে সেটা শাখায় পল্লবে বিস্তার লাভ করে। এখানেও তাই হয়েছে। এ ছাড়া, ছোটবেলা থেকে নিজের

বোন জাহানারার অবস্থা দেখে পুরুষ জাতটার উপর ঘৃণা, তাঁর মনের মধ্যে জমে জমে মনটাকে পাথর করে দিয়েছে এই সব হল তাঁর হিস্ট্রিরিয়ার কারণ।

আমার কাছে বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবী দু'জনেই গুরুস্থানীয়। গুরুর জন্য যদি আমি কিছু করতে না পারি তাহলে আমার মত দুর্ভাগা এবং সুবিধাবাদী আর কে থাকতে পারে? সকলকেই তো দেখেছি নিজের মতলব সাধন করবার জন্য, বাইরে একপ্রকারে আবার ভেতরে অন্যপ্রকার।

কিন্তু আমি ছোট থেকে এমন শিক্ষা তো পাইনি। সুতরাং আমার একান্ত প্রচেষ্টা ছিল যাতে বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবী সুখে থাকেন। অন্নপূর্ণা দেবীর সংসার জীবন যেন সুখের হয় সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করলাম।

বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন। স্টেশনে গিয়ে বাবাকে নিয়ে এলাম যথারীতি। সেদিন বছরের শেষদিন। পরের দিন ইংরাজী নববর্ষ।

১০

মৈহারে এসেছি সবে আড়াইমাস হলো। ভেবেছিলাম ছয় মাসে উস্তাদ হয়ে কাশী ফিরে যাব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কী অন্ধকারে ছিলাম এতদিন। মৈহারে এসে আলো এবং অন্ধকার দুইই দেখলাম।

বাবার সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসভাজন হয়েছি, প্রভূত আশীর্বাদও পেয়েছি। মৈহারে বাবাকে সকলেই 'বাবা' বলে সম্বোধন করে এবং আমাকে সকলেই 'দাদা' বলে সম্বোধন করে।

বরাবরই লক্ষ করেছি, বাইরে থেকে ফিরে আসার পর, প্রথম দিনটা কি জানি কেন বাবার মেজাজ ভাল থাকে না, কিন্তু নিয়ম মত সকালে গিয়ে গরম গরম জিলিপি এবং মাংস কিনে নিয়ে এসেছেন। সকালেই এসে বাবা আজ ভৈরব রাগে একটা দুনী গৎ শেখালেন। গৎটা শিখিয়ে তামাক খাচ্ছেন হঠাৎ ডাক্তার গোবিন্দ সিং এসে বাবাকে প্রণাম করল। ডাক্তারের আসাতে বাবা একটু অবাক হয়েছেন। ডাক্তারবাবু বললেন 'বাবা ইংরাজী ১৯৫০ এর প্রথম দিন, তাই আপনার কাছে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। এখন সোজা হাসপাতাল যাব কিন্তু সন্ধ্যায় এসে আপনার বাজনা শুনব।' বাবা ইংরাজী নববর্ষ জানতেন না, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলেন এবং ডাক্তারবাবুকে অমলেট চা খাওয়ালেন এবং রাত্রে আসবার জন্য বারবার করে বললেন।

নতুন বছর বলেই বোধহয় সন্ধ্যায় বাবা আমাকে ইমন গৎ-এর নতুন বন্দিশ শিখিয়ে নানা প্রকারের তান তৈরি করবার রাস্তা শেখালেন। তারপরই ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। বাবা খুব খাতির করে ডাক্তারবাবুকে বসিয়ে বাজনা শোনালেন। বাজনার পর বাবা ডাক্তারবাবুকে বললেন। 'আপনি আমার এত উপকার করেছেন, আপনাকে আমি কি দিতে পারি।' ডাক্তার বললেন, 'আমি আপনার ছেলের মত, আমি তো কোন উপকার করিনি, আমি নিজের বোনের অসুখে যদি দেখতে আসি তাকে কি উপকার বলে?' বাবা এই কথা শুনে অভিভূত হয়ে বললেন, 'আমার এই সামান্য খুদকুড়োরূপ আছে, সংগীত দিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি।'

ডাক্তার গোবিন্দ সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা বছরের প্রথম দিনে, আপনার জীবনের

অভিজ্ঞতা থেকে কিছু উপদেশ দিন।' বাবা বললেন, 'আরে, আরে, আপনি কত বড় ডাক্তার, লেখাপড়া করেছেন, আমি মহামূর্খ, আমি কি উপদেশ দেব?' বারবার ডাক্তারবাবুর অনুরোধে বাবা বললেন, 'আমি আর কী বলব? তবে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি বেশী খাওয়া উচিত নয়, আবার অল্প খাওয়াও উচিত নয়। বেশী ঘুমোনোও উচিত নয়, আবার রাত্রি জাগরণও উচিত নয়।' এই কথা বলেই বাবা বললেন, 'আপনাদের ডাক্তারিতে শরীরের পক্ষে যে কথা বললাম তা কি ভুল?' ডাক্তারবাবু হাতজোড় করে বললেন, 'এ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।' বাবা হাসতে হাসতে আবার বললেন, 'আপনি তো ডাক্তার, মনের মধ্যে ক্রোধকে স্থান দেবেন না। রোগীর বেচাল কথায় রাগ করলে কঠিন অপারেশন কি করে করবেন? আসলে কাম, লোভ এবং ক্রোধকে যে দমন করতে পারে সেই হল প্রকৃত যোগী। আমি আর বিশেষ কি বলব, একটা কথাই বলতে পারি, পরের অহিত চিন্তা করা উচিত নয়, এবং এমন কাজও করা উচিত নয় যার জন্য লোক মনে কষ্ট পায়।' এ কথা শুনে ডাক্তারবাবু হঠাৎ বাবার পা ধরে প্রণাম করে বললেন, 'আজ আপনি যা বললেন এ হল সব ধর্মের সার।' বাবার সেই এক কথা, 'অমি কিছু জানি না, লেখাপড়া করিনি আপনি এত বড় হয়ে আমার মতো ম্লেচ্ছকে প্রণাম করছেন।' ডাক্তারবাবুর সেই এক কথা, 'তিনি তার নিজের বাবাকেই প্রণাম করছেন।'

বাবা রাত্রে খাবার পর নিজের ঘরে আজ অনেকক্ষণ বাজালেন। আমার ঘর থেকে চুপটি করে শুনতে লাগলাম।

বাবা যখনই বাজাতেন, পরের দিন হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করতাম, গত রাতে কি রাগ বাজাচ্ছিলেন। বাবা মনে মনে খুশী হতেন ঘুমোই নি বলে। বাবা বলতেন, 'না ঘুমিয়ে বাজনা শুনছিলে?' স্পষ্ট বলতাম, 'এ বাজনা শুনবার সৌভাগ্য কজনের হয়?' মৈহারে যতদিন ছিলাম বরাবরই এর ব্যতিক্রম হয় নি। বাবা বলতেন, 'শিক্ষাও করতে হবে। শুনলেও অর্ধেক শিক্ষা হয়ে যায়।' এই কথা বলে বাবা যে রাগ বাজাতেন বলে দিতেন।

বাবার কাছে একটা ছোট বাজনা ছিল। বাবার মুখে শুনেছিলাম বাজনাটির নাম 'রবাব'। বাবা একটা বড় কাঠ কিনে এনে, স্থানীয় একটা লোক যে চেয়ার, টেবিল এবং যাবতীয় কাঠের কাজ করত, তাকে দিয়ে একটা রবাব তৈরি করিয়েছিলেন। মৈহারে যাবার পরই দেখছি বাবার নির্দেশে একটা বড় কাঠ কি অদ্ভুত রূপ নিচ্ছে একটি বাজনাতে। আমার কাছে এটি একটা নতুন অভিজ্ঞতা। যন্ত্রটা তৈরী হল। বাবা একদিন ছাগলের চামড়া নিয়ে এসে চুন দিয়ে ঘষে ঘষে রৌদ্রে শুকোতে দিলেন। নানা প্রক্রিয়া করে কয়েকদিন পর রবাবে চামড়া লাগালেন। বাবার কাছে শুনলাম, সরোদ এবং রবাবে এইরকম ভাবে চামড়া লাগাতে হয়। চামড়া লাগাবার সময় বাবা আমাকে ধরতে বললেন। বাবা বললেন, যে বাজনা বাজাও তার বিষয়ে সব কিছু জানতে হবে। নিজেকে চামড়া লাগাতে হবে। আমার তো চক্ষু চড়ক গাছ, বাবা যেমন নিপুণভাবে সব করলেন তা তো আমি কল্পনাই করতে পারি নি। চামড়া লাগাবার পর বাবা লোহার তারের বদলে, একরকম তাঁতের তার লাগালেন। বাবা বললেন, 'রবাবে চৌতাল, ধামারে গৎ বাজে এবং তারপরনের কাজ হয়। সঙ্গতে তবলার বদলে মৃদঙ্গ

বাজে। এ অতি প্রাচীন বাদ্য। সরোদে যেমন 'জবা' দিয়ে বাজানো হয়, রবাবেও তেমনি জবা নিয়ে বাজান হয় তবে বসবার রীতি আলাদা।' বাবার নতুন বাজনা শুনে মনে হলো দীর্ঘদিন যেন বাজিয়েছেন।

চব্বিশ এবং পঁচিশ ফেব্রুয়ারীতে, রবাব এবং সুরশৃঙ্গার বাজাবার জন্য রেডিও থেকে কন্ট্রাক্ট এল। মা এই খবর শুনে বাবাকে বললেন, 'তোমার রবাব শুনে লোকে মারবে।' বাবা বললেন, 'আরে বলে কী?' বাবা এই প্রথম রবাব বাজাবেন।

কয়েকদিন পরেই কাশী থেকে গুল্লুজীর চিঠি পেলাম। চব্বিশ জানুয়ারী মহন্ত অমরনাথ মিশ্র বাবার সঙ্গে রবাবের সাথে বাজাবেন এবং ছাব্বিশ জানুয়ারীতে মুন্নুজী মৃদঙ্গ বাজাবেন বাবার সঙ্গে। সুতরাং বাবাকে যেন মহন্তজীর সম্বন্ধে একটু বলে দিই। চিঠি পেয়েই বাবাকে বললাম মহন্ত অমরনাথ মিশ্র সম্বন্ধে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি করে চিনলে?' বললাম, 'মৈহারে আসার আগে থেকেই চিনি। মহন্তজীর পরিচয় দিলাম। তুলসীদাস যেখানে বসে রামায়ণ লিখেছিলেন, সেই তুলসী মন্দিরের বংশপরম্পরা হিসেবে বর্তমানের মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কাকা। কাশীতে সঙ্কটমোচন মন্দির আছে' খুব জাগ্রত দেবতা। বাবাকে বললাম, 'মৈহারে আসার আগে দেরাদুনে অমরনাথ মিশ্র আলি আকবরের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন।' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হনুমানজীকে সঙ্কটমোচন কেন বলে?' উত্তরে বললাম, 'হনুমান জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের প্রতীক। রাম, লক্ষণ এবং সীতার সঙ্কট দূর করেছিলেন বলে হনুমানজীর আর এক নাম সঙ্কটমোচন।' বাবাকে আরও বললাম, 'আপনি এলাহাবাদে কৈলাশ হোটেলে যেখানে ওঠেন, ঢুকবার দ্বারেই হনুমানজীর মূর্তি আছে। কাশীতে যে হনুমানজীর মূর্তি সঙ্কট-মোচনে আছে, প্রবাদ আছে তুলসীদাস যে ভাবে হনুমানজীর দর্শন করেছিলেন সেই ভাবেই মূর্তির কল্পনা ও স্থাপনা হয়েছিল, এবং আজও কাশীতে সকলেই তাঁকে অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে।' বাবাকে বললাম, 'অমরনাথ মিশ্র এবং তার গুরু মুন্নুজী খুবই সাধু প্রকৃতির লোক সুতরাং আপনি তাদের বাজাবার সুযোগ দেবেন। বাবা হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'আমি কি সুযোগ দেবার মালিক, যখন সঙ্কটমোচনের মহন্ত, হনুমানজীর কৃপা পেয়েছেন।' বলেই চুপ করে গেলেন। যাক আমার বলার পালা শেষ।

বাবার মতিগতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। একবার বললেন, যেহেতু কথা দিয়ে এসেছেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাই বাধ্য হয়ে যেতে হবে। যদি কথা না দিতেন তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে যেতেন না। পরক্ষণেই আবার বলেন, বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকারের অনুমতি না পেলে কাশীতে যাবেন না। এ কথা বলার কারণ বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি চিঠি এসেছিল কিছুদিন আগে। সরকারের বিনা অনুমতিতে, মৈহারের ব্যাণ্ড পার্টি কোন জায়গায় যেন না বাজায়, এই নির্দেশ ছিল। ভারত সরকারের বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে যেমন পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি কিংবা বিশেষ কোন সম্মনিত ব্যক্তি যেমন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোন মন্ত্রী এলে বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজধানী রেওয়া গিয়ে বাজাতে হবে। কিন্তু কোন জায়গা থেকে যদি বাজাবার নিমন্ত্রণ আসে তাহলে বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

উপরোক্ত কারণটির জন্যই বাবা বলেছিলেন, বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকারের অনুমতি না পেলে কাশীতে যেতে পারবেন না। বাবার এই দোমনা ভাব দেখে বললাম, 'আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, আপনার কোন কাজে বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার না করবে না।' এই কথা শুনে বাবা কিছু বললেন না।

পরের দিনই বাবা বললেন, 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে চিঠি লিখে দাও। বিশ্ববিদ্যালয় যদি চায় তাহলে আমি কাশী গিয়ে সঙ্গীত ভবন পরিচালনার ভার নিতে পারি।' এই কথা লিখে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

বাবা রাত্রের টেনে কাশী গেলেন। স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে এলাম।

বাবা যাবার পরদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর একশো তিনি ডিগ্রি জ্বর এলো। ডাক্তার গোবিন্দ সিংহকে ডাকলাম। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। তিনটে ট্যাবলেট দিলেন। সন্ধ্যায়, রাত্রে এবং সকালে ওষুধ খেয়ে খবর দিতে বললেন।

সকালে শুনলাম জ্বর ঠিক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারকে কি বলতে হবে ভেবে উপরে গেলাম। দেখলাম, সন্ধ্যাবেলায় যে ট্যাবলেটটি খাওয়ান হয়েছিল, তারপর আর ওষুধ খান নি, দুটো ট্যাবলেটই পড়ে রয়েছে। বললাম, 'ট্যাবলেট খান নি কেন?'

উত্তরে বললেন, 'বৃথা ট্যাবলেট খেয়ে কী হবে?' বললাম, 'বাড়ীর মধ্যে কী ঝড় যে বয়ে গেল সেটা কী জানেন? মায়ের মনের অবস্থাটা কি দেখেছেন? বাবা আমার উপর এখন ভার দিয়ে গিয়েছেন। ভগবানের দয়ায় আর ফিট হন নি। জ্বর হয়েছে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, আর আপনার মতে বৃথা ট্যাবলেট খেয়ে কি হবে? আপনি ডাক্তার হয়ে গিয়েছেন?' আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী একটু চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, রাত্রে ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন, ওষুধ এনেছেন কিন্তু আসলে কি জানেন, আমার আর বেঁচে থাকবার কোন ইচ্ছা নেই। কেবল বাবা মায়ের কথা ভেবে বেঁচে আছি, নইলে হয়ত কবে আত্মহত্যাই করতাম।' চমকে উঠলাম এ কথা শুনে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কি হয়েছে যার জন্য আত্মহত্যা করবেন? জানেন কি, বিবেকানন্দ কি বলতেন? যারা ভীরু তারা বহুবার মরে এবং সাহসী লোকেরা একবারই মরে। আত্মহত্যা মনে করাও হল একটা মানসিক ব্যাধি। 'এ্যাবনরমাল সাইকোলজি' যখন পুরো পড়বেন তখন নিজেই বুঝতে পারবেন অনেক কিছু। আসলে কি জানেন, আমার মনে হয়, বহু জিনিষ নিজের মনে মনে চিন্তা করে, নিজেকে কিছু এ্যাবনরমাল করে ফেলেছেন। মনের কোন দুঃখ, ক্ষোভ, মানসিক যন্ত্রণা কাউকে বললে অনেকটা মন হাল্কা হয়ে যায়। আমি যতদূর আপনাকে চিনেছি, মনে হয় না তেমন কোন স্ত্রীলোক বন্ধু আছে আপনার। মনে সব ক্ষোভ পুষে রেখে এই হিস্টিরিয়া রোগটা হয়েছে। আমাকে নিজের একজন মঙ্গলাকাঙ্খী ভেবে কি কয়েকটা কথার জবাব দেবেন?'

উত্তরে অন্নপূর্ণা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা?'

মনে হলো আমার প্রতি একটু আস্থা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'একদিন আপনার কাছে আপনার জীবনের কিছু কথা শুনেছি। সে বিষয়ে কয়েকটা কথা জবাব দেবেন কি?'

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি জানবেন? যেখানে জানার ফল শূন্য সেখানে জানাটাই ব্যর্থ।' এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের একটি গান চোখের সামনে মূর্ত্ত হয়ে উঠল, আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। তখন উনি বললেন, 'বাবা, মা এবং ছেলের মুখ চেয়ে বেঁচে আছি নইলে মৃত্যুই আমার কাম্য। কোন জিনিষেরই প্রতি আমার মোহ নেই। স্বাভাবিক মেয়েরা যে ভাবে মানুষ হয় আমি সে ভাবে মানুষ হই নি। আমি এক অন্য পরিবেশে মানুষ হয়েছি। বিয়ের আগে পর্যন্ত নিজের বাবা, মা এবং দাদা ছাড়া কাউকে চিনতাম না। ছোট থেকে সঙ্গীতের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছি। আমার এক দিদি জাহানারার কাছে তার দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে পুরুষ জাতটার প্রতি অবিশ্বাস হয়েছে। দিদিও আমাকে বরাবর বলতেন, জীবনে কখনও বিয়ে করিস না। আমার দিদির মৃত্যুর পর বাবাও ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার বিয়ে দেব না। সঙ্গীতের সঙ্গেই তোমার বিবাহ দেব। তুমি চিরটাকাল যদি সত্যিকারের সঙ্গীত সাধনা কর তা হলে কখনও কারুর সঙ্গে অযথা গল্প, পরনিন্দা, পরচর্চা, সৌখিনতার কথা মনেই আসবে না। তবে জীবন কাটাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন আছে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব। এইসব চিন্তা আমার মনের মধ্যে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছিল, যার ফলে ছোট থেকেই আমি একা থাকতেই অভ্যস্ত হয়েছি। লোকের ভিড় দেখলেই আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।'

'এই অবস্থায় বড় হয়েও শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হোল, বিয়ের পর একটা বছর আমার মৈহারেই কেটেছে, মা বাবার কাছে থেকে। তারপরেই ছেলে হলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই পণ্ডিতজী সম্বন্ধে যা শুনলাম, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মনে পড়ে গেল দিদির কথা। পুরুষের চরিত্র এত কলুষিত হতে পারে?'

এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম, হঠাৎ বাধা দিয়ে বললাম, 'কারও কথা শুনেই রবিশঙ্করকে কেন বিচার করলেন? মিথ্যাও তো হতে পারে।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'দেখুন, আমার দাদা পণ্ডিতজীর বিষয়ে সব জানত। দাদাই আমার এক পরম আত্মীয়াকে এসব কথা বলেছিলেন, তাঁর কাছে আমি সব শুনে পণ্ডিতজীকে সব জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এবং পণ্ডিতজী সব স্বীকারও করেছিলেন।'

'সে সব কথা শুনে আমার আর বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা ছিলো না। যার জন্য বহুদিন আমি দাদার কাছে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে ছিলাম। বাবার এ জিনিস ভালো লাগে নি, আমি স্বামীর কাছে না থেকে দাদার কাছে রয়েছি। বোধহয় বাবা মনে কোনরূপ সন্দেহ করেছিলেন, কেননা বাবাও বিদেশ যাত্রার সময়ে পণ্ডিতজীর আচরণ দেখে কিছুটা বুঝে নিয়েছিলেন। যাই হোক দাদাই তখন জোর করে বাবার মনের অবস্থার দোহাই দিয়ে স্বামীর ঘর করতে পাঠিয়ে দিলো। প্রায় এক বছর মৈহারে থেকে চলে গেলাম বম্বে। সেখানে পণ্ডিতজীর ভীষণ শরীর খারাপ হলো।'

'তখন আর্থিক অবস্থাও খারাপ। বাজনা বাজিয়ে টাকা উপার্জন করতে তখন পায়ের চটি ক্ষয়ে যেত। শরীর খারাপের সময়ও আবার দেখলাম তার মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা। শরীর এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যে কিছুদিনের জন্য স্মরণশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। বহু

কষ্টে সেতার নিয়ে বসিয়ে তার স্মৃতিশক্তি এবং বাজানোর শক্তি ফিরিয়ে আনি।'

হঠাৎ চাপা আবেগে বাবার ছবি দেখিয়ে বললেন, 'ভগবান কেমন জানি না, এই বাবাই আমার কাছে ভগবান। তার ফটো নিয়ে বলছি, আমাকে নিয়ে আপনার কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। এই সময় কিছুদিন একরকম কেটেছে। আবার সামান্য উপলক্ষে অথবা বিনা উপলক্ষে, মতি বদলাতে দেখেছি, কারণ ছোটবেলার সাথী সারাজীবনই বিপথে টেনেছেন। সেই সব সাথীই একদিন তাকে শেষ করে ছেড়ে দিয়েছেন। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখন দেখলাম একের পর এক মেয়েদের প্রতি এত দুর্বলতা, ঘৃণায় বাবার কাছে চলে এলাম বম্বে থেকে। তখন থেকেই, সব থেকেও আমি একেবারে একলা। বাবাকে একটাও কথা বলিনি পাছে বাবা কষ্ট পান। আমার মানসিক অবস্থার কথা কোনোদিনই বলি নি এবং বলবও না, কেননা বাবা আমায় এত স্নেহ করেন, যদি এই সব কথা শোনেন তাহলে বাবার হয়ত হার্টফেল হয়ে যাবে।' হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবী চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'এ সব কখনও আপনাকেও বলতাম না, কিন্তু আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করে রাত্রে ডাক্তার ডেকেছিলেন, এবং ওষুধ খাইনি বলে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেই, হঠাৎ এত কথা বলে ফেললাম।' আমি অবাক হয়ে শুনলাম।

মনে হলো রবিশঙ্কর ও অন্নপূর্ণা দেবীর বৈবাহিক জীবন তো অত্যন্ত দুঃখের। বাইরে থেকে এতদিন তো বুঝিনি, মিলনে ফুল ফোটে, ফল ধরে কিন্তু অবজ্ঞা করলে তার ক্ষত ফলেও এসে লাগবে।

মনে মনে ভাবলাম রবিশঙ্করের এ কী চরিত্র। মানুষের বাইরেটা দেখে ভিতরটা চেনা খুব কঠিন। এ কথাও আমার কাছে নতুন লাগল। শরীর খারাপ হওয়ার ফলে, রবিশঙ্কর বাজনা ভুলে গেল। তার মানে শিক্ষা দিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী রবিশঙ্করের নতুন জন্ম দিলেন। এর ফলে রবিশঙ্করের মনে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স গ্রো করেনি তো? কি জানি? ভাবলাম, রবিশঙ্কর এলে এ নিয়ে আলোচনা করব।

একটা কথাই বলি, 'জীবনে এ সব হয়েই থাকে, ভগবানের দয়ায় কোনো কিছুরই অভাব নাই। সাধারণতঃ মেয়েরা যা চায় আপনি সবই পেয়েছেন। একটা কথাই শুধু বলতে পারি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে নেই। মানুষ হচ্ছে সমুদ্রের মতন। সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা জল যদি ময়লা হয়, তাতে সমুদ্র অপবিত্র হয় না। পারলে 'ফরগেট এ্যাণ্ড ফরগিভ' করুন। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।' বেশী কথা আর বাড়াতে চাইলাম না, বললাম, 'একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিন,' বলেই নীচে চলে এলাম।

নীচে ঘরে চলে এলাম বটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর কথাগুলো বারবার মনে পড়তে লাগল। রোগের কারণটা কী? হিস্টিরিয়া অনেক কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর রোগের কারণটা মনে হলো, ঘরের মানুষ অমানুষ হলে, মেয়েদের আসল পুঁজি ঝাঁঝরা। এর ফলে গোপনতা এবং রাগের প্রস্রবন দেখা যায়। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা।

আজ লিখতে বসে সেইসব দিনের কথা ভাবতে কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগছে। কিসের

রোমাঞ্চ? আনন্দের, না কি বেদনার? আনন্দ আর বেদনা কি আলাদা জিনিষ? আসলে ও দুটোই তো এক। আমাকে হতে হবে নির্বিকার। কারো মনোরঞ্জন করার দায় আমার নয়, এবং কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও চলবে না।

অবাক হয়ে ভাবি, যার মনের মধ্যে এত যন্ত্রণা সে এত ভাল বাজনা বাজায় কী করে? মনে হয়, যে যত দুঃখ পায়, সহ্য করবার ক্ষমতাও তার তত বেড়ে যায়। ক্ষমতা বেড়ে গেলেই সঙ্গীতে বেশী করে মন দেওয়া যায়।

সকালে পোষ্টঅফিস গিয়ে দেখলাম কয়েকটা চিঠি এসেছে বাবার। আমারও দুটো চিঠি এসেছে। একটা চিঠি পেয়ে আমার খুব আনন্দ হলো। আমার দাদা হীরেন ভট্টাচার্য, যে সর্বদাই আমাকে সঙ্গীতে উৎসাহ দিতো, দীর্ঘদিন রেঙ্গুনে থাকার পর রাজনীতির মারদাঙ্গার কারণে বাধ্য হয়ে ব্যবসা ছেড়ে কাশীতে চলে এসেছে। কাশীতে কিছু ব্যবসার চেষ্টা করছে। একটু ঠিক হলেই মৈহারে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দাদা মৈহার আসবে জেনে খুব আনন্দ হলো। দ্বিতীয় চিঠিটা পেয়েও খুব আনন্দ হলো। চৌঠা ফেব্রুয়ারী, এলাহাবাদে বাজাবার কন্ট্রাক্ট পেলাম। হাতে সময় আছে প্রায় কুড়ি দিন।

বাড়ী গিয়ে প্রথমে অন্নপূর্ণা দেবীকেই সংবাদ দিলাম। প্রথম আমার দাদার কথা, দ্বিতীয় আমার রেডিও প্রোগ্রামের কথা। এ কথা শুনে উনি খুশী হলেন। বললেন, 'দিনরাত বাজান।' মাঝে মাঝেই আমার সংশয় হয়, আমার দ্বারা বাজনা হবে না। এখন বুঝতে পারছি কত কিছু শেখবার আছে। আমার এই সংশয়ের কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'সংশয় থাকা ভালো। তবে সংশয় কখনও অকল্যাণকারী এবং কখনও কল্যাণকারীও হয়। মনের মধ্যে জেদ আনুন। কেন হবে না? সকলেই এক দুবছর বাজিয়ে বড় হতে পারে না। আপনি যেমনই বাজান সকলেরই একদিন সেইরকম ছিলো। কিন্তু সাধনা করতে করতে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। বাবার কাছে এসেও যদি বাজাতে না পারেন তাহলে নিজের লোকের কাছে কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন? যান, বেশী কথা না বলে বাজান।'

পরের দিন থেকে আবার অন্নপূর্ণা দেবীর নির্দেশে রিয়াজ শুরু হল। এবারে রেডিওতে বাজাবার জন্য সকালে ভৈরবী, বিকেলে কাফী এবং সন্ধ্যায় ইমন বাজাব বলে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম। আমার কথা শুনে কিছু বললেন না। তারপর একটা কথাই বললেন, 'যে জন্য মৈহারে এসেছেন তা ভুলবেন না। দিনরাত বাজান। ধৈর্য ধরে সাধনা করলে সাফল্য আসবেই। সাফল্য এলে তখন সাবধানে থাকতে হবে। এ বড় পরিশ্রমের কাজ এবং নিজের পরীক্ষার সময়। বাবার কাছে একটা কথা বরাবরই শুনে এসেছি। সঙ্গীতজ্ঞের জীবনই শুরু হয় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের পর থেকে। যত বয়স বাড়ে ততই জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু আজকাল সকলেই তিন চার বছরের মধ্যেই উস্তাদ হতে চায়।'

কথাটা শুনে বেশ আশ্চর্য হলাম। এ কী কথা। 'সঙ্গীতজ্ঞের জীবন, শুরু তিরিশ বছরের পর থেকে,' তাহলে তো এখন অনেক দেরী।

ঐ দিনই একটা পার্সেল এল। অন্নপূর্ণা দেবীর জন্য সাইকোলজি বইয়ের যে অর্ডার দিয়েছিলাম, সে বইয়ের সঙ্গে যে সব গল্পের বইয়ের কথা লিখেছিলাম, সেগুলোও এল।

এ ছাড়া আমার বইও এলো। সঞ্চয়িতা, ওমর খৈয়াম এবং রামকৃষ্ণ দেবের চার ভল্যুমে কথামৃত। বইগুলো অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখালাম। দেখে খুশীই হলেন, কিন্তু বললেন, 'বই পড়া খুব ভালো তবে বাজনাটাকেই প্রাধান্য দেবেন এবং অবসর সময়ে একটু আধটু বই পড়বেন।' হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবিতার বই কি খুব ভালবাসেন? আবৃত্তি করতে পারেন?' নিঃসঙ্কোচে বললাম, 'স্কুল লাইফে প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করে প্রাইজও পেয়েছি।' তিনি আমার বইগুলো একবার দেখলেন। সঞ্চয়িতা বইটা একটু নাড়া চাড়া করে বললেন, 'এই বইটা খুব ভাল শুনেছি।' উত্তরে বললাম, 'আমার মতে রবীন্দ্রনাথের এমনই এক সৃষ্টি, মানুষ যে পরিস্থিতিতেই থাকুক, দুঃখ, আনন্দ, শোক, সব বিষয়ই এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। মনে হয় আমার আশা, আকাঙ্খা, দুঃখ, শোক ইত্যাদি বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জানা ছিল। মনে হয় আমার জন্যই লিখেছেন। অবসর সময়ে পড়বেন। পড়লে বুঝতে পারবেন আমার কথাটা কতদূর সত্য।'

এখানে একটা কথা বলে রাখি, মৈহারে যত দিন অন্নপূর্ণা দেবী থেকেছেন, বরাবরই আমার কাছে সাইকোলজি পড়েছেন এবং আবৃত্তি শুনেছেন। স্কুলে শিক্ষা না করেও বই পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় যে করা যায়, অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে সেটা আমি বুঝেছি বা শিখেছি।

হঠাৎ খবর না দিয়েই দেখি কাশী থেকে রাত্রের ট্রেনে বাবা মৈহারে এসে পৌঁছলেন। গভীর রাত্রি অবধি বাজাচ্ছিলাম বলে, বাবার টাঙ্গা বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই বুঝতে পেরে দরজা খুলে দিলাম। আমার বাজনা বাবার কানে নিশ্চয়ই গিয়েছে, তার জন্য বাবাকে দেখে বুঝলাম খুবই খুশী হয়েছেন। মাকে বাবার আগমন সংবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঘুম থেকে উঠে বাবার জন্য চা এবং তামাক সেজে দিলেন। বাবা একটা কথাই বললেন, 'রাত্রি হয়ে গিয়েছে এবারে ঘুমিয়ে পড়। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করব না। তাই বলে এলাম। কাল সব কথা বলব।'

চুপচাপ চলে আসলেই ভাল হতো। কিন্তু যে হেতু প্রসঙ্গটা কাশীর, তাই ইতস্ততঃ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তামাক খেতে খেতে বাবার খেয়াল হলো। বললেন, 'কি, কাশীর ব্যাপারে কৌতুহল হচ্ছে শুনতে?' কি করে আর সোজাসুজি বলি তাই একটু দ্বিধা বোধ করলাম। বাবা বললেন, 'ওখানে তো বাবা পার্টির যাঁতাকল। আমি তো ইঁদুর। আর একটু হলেই সেই ফাঁদে পড়ে যেতাম।' গোয়েন্দা গল্পের মত বাবা রহস্য তো সৃষ্টি করলেন কিন্তু রাত্রের মত যবনিকা টানলেন। বললেন, 'বাকীটা পরে হবে।'

পরের দিন ঘড়ি ধরে যেমন দিনের কাজ চলে দুপুর পর্যন্ত সেইপ্রকার চললো। কাশী থেকে কেন চলে এলেন বাবা কিছুই বললেন না। মনে আমার কৌতুহল থাকা সত্বেও কিছুই নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। অবশেষে দুপুরে খাওয়ার পর যখন হাতের আঙ্গুল নিয়ে ম্যাসাজ করতে লাগলাম, তখনই হঠাৎ বললেন, 'এবারেও কাশীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে মৈহারে চলে এসেছি। কাশীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট মিটিং এ ঠিক হয়েছে মাসিক বেতন দেবে এক হাজার টাকা।' কিন্তু একবছর আমি প্রিন্সিপ্যালের পোষ্টে থাকবো এবং পরের এক বছর পণ্ডিত ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত হবেন।

গানের এবং যন্ত্রের আলাদা বিভাগ থাকবে। আমার এতেও কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু প্রতি এক বছর অন্তর একজন প্রিন্সিপ্যাল হবে সম্পূর্ণ সঙ্গীত বিভাগের, এখানেই আমার আপত্তি। আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হই নি। আমাকে বললো, কিছুদিন আরো থাকতে। সিণ্ডিকেটের আবার মিটিং হবে, তখন সব স্থির হবে। এ কথা শুনেই কাউকে কিছু না বলে আমি চলে এসেছি।' একসঙ্গে এত কথা বলার পরই বাবা বললেন, 'আল্লা যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেবেছিলাম সঙ্গীত হবে, কিন্তু সঙ্গীতের বদলে কেবল মিটিং, সরফরাজী এবং পার্টিবাজী। কামের কাম কিছুই নয়।'

বাবার চলে আসার কারণ কিন্তু আমার কাছে অন্য মনে হলো। বাবা মৈহারের নির্জন পরিবেশ থেকে কাশীর জনারণ্যের মধ্যে গিয়ে, সিণ্ডিকেট মিটিং ইত্যাদি বাবার মনকে বিষিয়ে দিয়েছেন। আসলে যাঁরা সত্যিকারের সাধক, কখনও তাঁরা লোকালয়ে থাকতে ভালোবাসেন না। তাই, হাজার প্রলোভন ত্যাগ করে বাবা সেই নির্জন মৈহারেই ফিরে এলেন।

বাবার অনেক কথা বুঝতে আমার কিছু সময় লেগেছে। আগেই লিখেছি বাবা প্রায়ই বলতেন, কামের কাম কিছু নয় খালি 'সরফবাজী।' এই কথাটির একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। ১৭৩৯ সালে সুজা খাঁর মৃত্যুর পর রেখে গেলেন অপদার্থ ছেলে সরফরাজ খাঁকে। সরফরাজ ছিলেন আয়েসী মানুষ, সুরাতে ডুবে থাকতেন। তাই বাবা বলতেন 'সরফরাজী'। আসলে বোকা লোক হলেই কিংবা কাজের সময় কাজ না করলেই, অলস ও বেকার শব্দ দুটির বদলে বাবা বলতেন, কামের কাম কিছু নয় কেবল সরফরাজী। বাবার মৈহারে ফেরার দু'দিন পর, বাবার কাছে যে পুরস্কারটি পেলাম, ওই দিনটাকে আমার জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ বলে মনে করি। তারিখটা ছিলো বিশে জানুয়ারী। স্মরণীয় দিন কেন, এ কথা বলতে হলে একটু পিছনের দিনের কথা বলতে হবে।

মৈহারে এসেছি প্রায় তিনমাস। আগেই লিখেছি, মৈহারে প্রথম দিন বাজাতে না পারার জন্য বাবা হতাশ হয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম আমায় কিছুদিন সময় দিন, এতদিন বাবা যা কিছু শিখিয়ে ছিলেন কিছুই বাজাই নি। এরপর কিছুদিন পরে পরেই বাবা বলতেন, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এখন চলে গেলে তোমারও মঙ্গল আমারও মঙ্গল। কাশীতে গিয়ে কোন চাকরি করো। বৃথা মৈহারে থেকে যখন কিছু শিখতে পারবে না, তখন তোমারও বদনাম হবে, আমারও বদনাম হবে। বাজাতে না পারলে লোকে বলবে আমি তোমায় কিছু শিক্ষা দিই নি। অনেকে আবার বলবে তুমি মহামুর্খ সুতরাং যাতে উভয়েরই বদনাম না হয় সেইজন্য ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।' বাবা যখনই এ কথা বলতেন, তখনই হাতজোড় করে বলতাম, 'আমাকে কিছুদিন আরো সময় দিন।' বাবা বলতেন, 'ঠিক আছে দুটো মাস দেখব, এর মধ্যে যদি বুঝি তোমার বাজনার কিছু উন্নতি হয়েছে, তাহলে এখানে থাকবে, নইলে কাশীতে চলে যাবে।'

বাবার এই কথা শুনে, শুধু মনে হোত কোন মুখ নিয়ে কাশীতে যাব। সকলেই আমাকে দেখে উপহাস করবে। সব পরিচিত লোকের সামনে মুখ দেখান, মৃত্যুর সমান হবে। বাবা যখনই এই ধরণের কথা বলতেন, তখন রিয়াজের সময়টা দ্বিগুণ হয়ে যেত।

এ ছাড়া রোজ এক পাতা লিখতাম, 'জয় বাবা সঙ্কটমোচন'। সঙ্কটমোচন লিখবার কারণ ছিলো। কাশীতে একমাত্র প্রতি মঙ্গলবার, সঙ্কটমোচন হনুমানজীর দর্শন করতাম। মৈহারে বাড়ীর কাছে একটা ছোট হনুমানজীর বিগ্রহ ছিল। মৈহারেও প্রতি মঙ্গলবার, বাড়ী থেকে ফুল নিয়ে হনুমানজীর বিগ্রহকে প্রণাম করে প্রার্থনা করতাম, বাবা যেন আমাকে তাড়িয়ে না দেন।

মৈহারে তিন মাসের মধ্যে, অন্ততঃ বাবা আমাকে সাত আট বার এই এক কথাই বলেছেন। কিন্তু জানি না। হনুমানজীর কি কৃপা হল, বাবা এই প্রথম আমার বাজনা শুনে খুব খুশী হলেন। দুদিন আগে অধিক রাতে যখন কাশী থেকে মৈহারে ফিরলেন, তখন আমি বাজাচ্ছিলাম দেখে বোধহয় খুশী হয়েছেন। এছাড়া বাবার অবর্তমানে অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা দিয়ে। আমার এই তিনমাস মৈহারে আসার পর বাজনায় এতটা উন্নতি বোধহয় বাবা আশাই করেনি নি।

হঠাৎ সেদিন বাবা যখন বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে তোমার কিছু হবে। সাধনা ঠিক মতো করে যাও, করতে যাও, করলে ফল কিছু নিশ্চয়ই পাবে। তবে এর জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আজ তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছো। তবে দীর্ঘদিন শিখতে হবে।' মৈহারে আসার পর, শিখবার সময় রোজই বাবার কাছে বকুনি খেয়েছি, এবং সর্বদাই শিক্ষাকালীন একটা কথাই শুনেছি, কুঢ়, কুঢ়, কুঢ়, অর্থাৎ মূর্খ। আজ এই প্রথম একবারও বাবা আমাকে শেখাবার সময় বকলেন না। সেইজন্য আগেই লিখেছি, ওই দিনটাকে আমার জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ বলে মনে করি।

পরের দিনেও আমার বাজনা শুনে বাবাকে দেখলাম খুশীর ভাব। বাবা বকলেন না। বাবার মেজাজটা এখন ভাল আছে দেখে সাহস করে বললাম, 'চৌঠা ফেব্রুয়ারীতে রেডিওতে বাজাবার জন্য আমার কাছে চিঠি এসেছে।' এ কথা শুনবার পর বাবা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। বাবা তামাক খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার তো খরচা কিছু লাগে। আমি তো কিছু দিই না। রেডিওতে বাজালে, কিছু টাকা পেলে তোমার কাজে লাগবে। কিন্তু রেডিওতে বাজালে নূতন রাগ বাজাতে হবে। সেটা হবে আতাইপানার বাজনা। আসলে এখন দুই তিন বছর কেবল সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যার জন্য তিনটে রাগই বাজাতে পারলে তবে সঙ্গীতের মধ্যে কিছুটা প্রবেশ করতে পারবে। এখনও তোমার হাতে ঠিকমত বোল পাল্টা কিছুই বেরোয় না, অথচ রেডিওতে বাজাতে চাও। প্রথম বার বাজিয়েছ কিছু বলি নি। কিন্তু এইরকম দুইমাস তিনমাস পরপর রেডিওতে বাজালে সঙ্গীত তোমার কিছুই হবে না। এখন যা ভাল বোঝ তাই কর।' বাবার কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কয়েকমিনিট চুপ করে থেকে বললাম, 'যে হেতু বাজাব বলে কন্ট্রাক্টে সই করে দিয়েছি, সেইজন্য এইবার বাজাবার অনুমতি দিন। আজ রেডিওতে লিখে দেব উপস্থিত যতদিন না শিক্ষা সমাপ্ত হয় ততদিন বাজাব না।' একথা শুনে বাবা খুশী হলেন।

আগেই লিখেছি, বাবার এক একটি কথার অর্থ বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। বাবা যে আমাকে বললেন, 'রেডিওতে নতুন নতুন রাগ বাজাতে হবে, সে বাজনা হবে 'আতাইপানার বাজনা'। আসলে যারা শিক্ষা না করেই আবোল তাবোল বাজায়, তাদের বাজনা শুনেই বাবা বলতেন, 'আতাই-পানার বাজনা'। মানুষের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে যেমন

সভ্যতা অসভ্যতা আছে, তেমনই সঙ্গীতের মধ্যেও সভ্যতা অসভ্যতা আছে। একটি বয়স্ক লোক যদি মাটিতে বসে থাকে, এবং সেই জায়গায় যদি অল্প বয়সের কোন ছেলে, চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে কথা বলে, তাকে বলা হবে, সে আদব অর্থাৎ সভ্যতা জানে না। ঠিক সেইরকম সঙ্গীতের ভেতর বেআদবী করলে তাকে 'আতাইপানা' বলে।

যে কথা বলছিলাম, রেডিওতে বাজানোর ব্যাপারে বাবা বললেন, 'এবার কি বাজাবে?' সসঙ্কোচে বললাম, 'সকালে ভৈরবী, বিকালে কাফী এবং রাত্রে ইমন বাজাব।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে।'

কিন্তু তারপরই আমার জীবনে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হোলো, সে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। সাল হিসাব গণনা করলে দীর্ঘ ছয় বছর আমি বাধ্য হয়ে একটি অন্যায় করে গেছি। পাঁচ বছরের পর, যে দুই বছর আরো ছিলাম তখন আর অন্যায় হয় নি। কথাটা তাহলে খুলেই বলি।

বাজনা শেখবার পর বাবা বললেন, 'তেইশ জানুয়ারী সরস্বতী পূজা। প্রতি বছর ব্যাণ্ডের, একটা লোক যে কিছুই জানে না, সেই ছাতার পূজা করে। তুমি হলে কাশীর পণ্ডিত। শুনেছি তোমার বাবা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং এইবার শুদ্ধভাবে তুমি সরস্বতী পূজো করবে। পূজোর যে সব জিনিস লাগে তার ব্যবস্থা আমি সব করে দেব।' বাবার এই কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ছোট বেলা থেকে সরস্বতী পূজোর দিন অঞ্জলি দিয়েছি বটে কিন্তু পূজোর বিধি তো কিছুই জানি না। সুতরাং বাবাকে সত্য কথাই বললাম, 'পূজোর আমি কিছুই জানি না। ব্যাণ্ডের যে পাণ্ডা পূজো করে সেই পূজো করবে।' কে শোনে কার কথা, যতবার আমি বলি আমি পূজোর কিছুই জানি না, বাবার সেই এক উত্তর, 'দুরু, দুরু, এ কি কথা বল? তোমার থেকে ভাল আর সৎ ব্রাহ্মণ কোথায় পাব? তুমিই পুজো করবে।' বাবার অনেক কথা আমার বুঝতে সময় লেগেছে। বাংলায় 'দূর দূর' কথাটা আমরা যে ভাবে প্রয়োগ করি, বাবা 'দুরু দুরু' কথাটা সেই ভাবে প্রয়োগ করতেন। বাবাকে বহু বুঝিয়েও যখন বোঝাতে পারলাম না তখন বাধ্য হয়ে আমাকে পুরোহিতের কাজ করতে হোলো।

পূজার এখনও একদিন বাকী আছে। সেকালে পোস্টঅফিস থেকে গুলগুলজীর বাড়ী গেলাম। গুলগুলজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সরস্বতী, পূজার অঞ্জলির মন্ত্র কী?' কাশীতে যেভাবে সরস্বতী পূজা হয়, সেই সব বিধি জানতে চাওয়ায় নিরাশ হলাম। গুলগুলজী বললেন, 'বাবার নির্দেশে আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাজল, কমণ্ডলু, শঙ্খ ইত্যাদি সব বাড়ীতে দিয়ে যাবো।' তাঁকে বললাম, 'গঙ্গাজল এখানে কোথায় পান।' গুলগুলজী বললেন, 'যে হেতু আমার বাবা রোজ পূজো করেন, তাই এলাহাবাদ থেকে একজনকে দিয়ে টিন ভরে গঙ্গাজল আনিয়ে রাখেন। অনেক দিন সেই জল চলে, শেষ হয়ে গেল আবার আনিয়ে নেন।' তাঁর কথায় জানতে পারলাম, এতদিন তিনিই বরাবর পূজো করতেন কিন্তু বাবা তাঁকে বারণ করে বলেছেন, যে এবারে আমিই পূজা করব। তিনি যে পদ্ধতিতে পূজা করেন তার সঙ্গে আমাদের পূজার পদ্ধতির কোন মিল নেই। আমি নিরাশ হয়ে তাঁকে আমার অবস্থা জানালাম। তিনি বললেন, 'কী আর করবেন? যে ভাবে ইচ্ছা পূজা করুন।' নিরাশ হয়ে বাড়ী

ফিরে এলাম। সন্ধ্যার সময় গুলগুলজী একটা থলে নিয়ে এসে বাবাকে দিলেন। বাবা থলেটি মার হাতে দিয়ে বললেন, 'সব ভাল করে ধুয়ে রাখো।'

পরের দিন। সকালে উঠে স্নান করেই দেখি, বাবার ঘরের পাশে দালানে পূজার সব সামগ্রী জোগাড় করে রাখা হয়েছে। পূজার আসন পর্যন্ত পাতা রয়েছে। আমি ধুতি পরে পূজায় বসলাম। আহ্নিকের মন্ত্রটি জানা ছিল, কারণ এক বছর নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ এবং আহ্নিক করতাম। কমণ্ডলুর মধ্যে গঙ্গাজল আছে। কোশা-কুশি সবই আছে। প্রথমে আহ্নিক, পরে কিছুক্ষণ একশো আটবার চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করে, সরস্বতী ছবির দিকে তাকিয়ে, বারবার মনে মনে ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'মা আমাকে ক্ষমা করো, বাবার নির্দেশে পূজো করছি, আমার যেন কোন পাপ না হয়।' তারপর এক-একটা ফুল নিয়ে রক্তচন্দন এবং শ্বেতচন্দনে ফুলটি ছুঁইয়ে, ওঁ সরস্বতৈ নমঃ বলে, সরস্বতীর ছবির সামনে ফেললাম। কুল, পেয়ারা এবং নানা ফল এবং মিষ্টি ছিল। এক একটি ফুল তার মধ্যেও দিলাম, তিনবার শঙ্খ বাজালাম। আধঘণ্টা ধরে এই সব মিথ্যা প্রক্রিয়া করবার পর, মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিয়ে, দুই গালে 'বম বম' করে আওয়াজ করলাম। বাড়ীর সকলেই দেখি হাত জোড় করে বসে আছেন। অঞ্জলীর বদলে একটা ফুল সকলকে দিয়ে, মনে মনে 'মা আমাকে ক্ষমা করো' বলে সকলকে বললাম, ফুলটি ধরে মার ছবিতে দিতে। পূজার পর চন্দনের ফোঁটা সকলকে দিলাম। বারান্দায় দেখি, সকলের বাজনা রাখা আছে। বুঝলাম বরাবরই বোধহয় এটা থাকে। প্রতিটি যন্ত্রের মধ্যেও একটা করে ফুল দিলাম। তারপর সকলকে প্রসাদ দিলাম।

ভাগ্য ভাল কোন পণ্ডিত ছিলো না সেখানে, নইলে দুই গালে 'বম্ বম্' আওয়াজ শুনে, তারা বলত, এটা তো শিবের পূজোর প্রক্রিয়া। পাঁচ বছরের পর এটা জেনেছিলাম। যা হোক, আমার পূজা দেখে বাবা এত প্রভাবিত হলেন, যে পূজার শেষে 'মা' 'মা' বলে প্রণাম করে বললেন, 'এতদিনে বাড়ী পবিত্র হোল, এ ধরণের সাত্ত্বিক পূজা দেখি নি।' নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। আজও প্রতিবছর সরস্বতী পূজোর দিন, আমার মৈহারের ঘটনা মনে পড়ে।

১১

পরের দিনই বাবা এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে গেলেন। তার পরের দিনই রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। সে আঠাশে জানুয়ারী মৈহারে আসছে বম্বে এক্সপ্রেসে। রবিশঙ্কর আসছে জেনে মনে খুব আনন্দ হোল। বাবাও এলাহাবাদ থেকে বাজিয়ে আঠাশে জানুয়ারীই বম্বে এক্সপ্রেসেই ফিরবেন।

রেডিওতে বাবার দুদিনের প্রোগ্রাম ছিল, একটাও শুনতে পেলাম না, কারণ বাজনার সময়েই বিদ্যুৎ চলে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে গেলাম। গাড়ীর একই কম্পার্টমেন্টেই বাবা এবং রবিশঙ্করকে দেখতে পেলাম। রবিশঙ্কর আমাকে দেখে একটু হাসল, কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই। বাড়ীতে আসবার আগে বাবা কেবল জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ীর খবরাখবর। সংক্ষেপে বললাম, 'বাড়ীর সকলেই ভালো।'

পরের দিন দেখলাম বাবার মেজাজ খুব ভাল। আসলে রবিশঙ্কর এসেছে বলেই বাবার মেজাজ ভালো। সকালে আমাকে বললেন, 'রবু তো তোমার খুব প্রশংসা করেছে।' বাবার

কথায় বুঝলাম যেহেতু নাতিদের পড়াই সেইজন্য সকলে নিশ্চিত হয়েছে। দুপুরে খাওয়ার পর রবিশঙ্কর আমাকে ঘরে ডাকল।

মৈহারে এসে আমার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তাকে বললাম। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে বলল, 'বাবার অবর্তমানে যতীনকে একটু শিখিয়ো। নইলে বাবার বকুনি খেয়ে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে গেলে বাবারও অসুবিধা হবে। ছেলেদেরও লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।' এরপর রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'বাবা ট্রেনে তোমার বিষয়ে খুব প্রশংসা করেছেন। বাবার প্রশংসা পাওয়া চারটিখানি কথা নয়।' কিছুক্ষণ কথা বলার পরই নীচে চলে এলাম। কেননা বাবা কিছুক্ষণ পরেই উঠে নমাজ পড়বেন এবং আমাকেও বাজাতে হবে।

রবিশঙ্কর মোট ছ'দিন মৈহারে ছিলো। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় রবিশঙ্করকে আর একবার নতুন করে চিনলাম। প্রথমে চিনতাম কবিরাজ আশুতোষের বন্ধু হিসেবে। আজ সকালে চিনলাম বাবার জামাই এবং অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী হিসাবে। আর রাত্রিবেলা চিনলাম যাকে, সেও রবিশঙ্কর কিন্তু বাধা-নিষেধের গণ্ডির বাইরের এক প্রগল্‌ভ রবিশঙ্কর।

কাশীতে নাম ছাড়া, ক্রিয়া, বিশেষণ বা সর্বনামের আগে বা পেছনে, গালাগালি প্রয়োগ করাটা এক বিশিষ্ট সামাজিকতা। গল্প আছে, কাশীতে এক বিদেশী পর্যটক যার মনে এ ধারণাই ছিলো, যে কাশীতে সবাই গালাগালি করে, স্টেশন থেকে এক রিক্সাওয়ালাকে তা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সত্যিই? প্রত্যুত্তরে রিক্সাওয়ালাটি একটি মারাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে বলল, এ কথা আপনাকে কে বলল? প্রশ্নকর্তা আর ঝামেলা বাড়ালো না কারণ যা পেয়েছেন তার হিসাব মিলাতে মন রাজী নয়। আমি সেই কাশীরই লোক। আর রবিশঙ্করও তাই।

যখন সন্ধ্যে হল, রবিশঙ্কর আর অন্নপূর্ণাদেবী বাবার কাছে গিয়েছিলেন যন্ত্র নিয়ে শিক্ষা করতে। বাবা সুরশৃঙ্গারের সাহায্যে তালিম দিচ্ছিলেন রাগ, 'শুদ্ধ কল্যাণ'। আমার ঘরের সেই অতি বিশ্বস্ত ফুটোর প্রতি ভরসা করলাম, যাকে আমি ভাবতাম 'থার্ড আই', কারণ চামড়ার চোখ যেটা দেখতে পারত না, সেটা আমি ওইটা দিয়েই দেখতাম। বাজনার ভিতর বার চারেক বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল, যন্ত্রে নয় শব্দে, 'আরে দুরু দুরু।' বুঝলাম এটা জামাই ষষ্ঠির থালা সাজান মিষ্টি নয়। এ ধনঞ্জয়কে আপ্যায়ন। মনে মনে ভাবলাম, এ রবিশঙ্কর না হয়ে অন্য কোন ছাত্র হলে, অচিরাৎ তৃতীয় অবতারের পুত্র হিসাবে সম্বোধিত হতো। যাই হোক, জামাই বলে কথা। আরো একটা তত্ত্ব বুঝলাম, যে অন্নপূর্ণা দেবী সঙ্গীতের দুর্গম গিরি শিখরে, যেখানে সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত হিমকিরিট।

খাওয়াটা রবিশঙ্কর ঝড়ের বেগে সারল। অত নামী লোক, বাজনার সময় যে কবার বকুনি খেয়েছে তাতে তো ভেবেই বসেছিলাম রাত্রে বোধ হয় খাবে না, কিন্তু দেখে বুঝলাম 'প্রফেসানালিজম' জিনিষটা কী। তারপরেই আমার ডাক এল তার ঘরে। গেলাম উপরে। শুরু হল চুটিয়ে আড্ডা। বিষয় রবিশঙ্করই স্থির করেছে, আদিরস। বুঝলাম, ভগবদ্ গীতার মলাটের ভিতর রবিশঙ্কর, রতি সুখ সারে। যাই হোক দুই ঘণ্টায়, একদিনেই আমাদের জীবনে ছয়বছরের ফারাকটা শূণ্যাঙ্কে এসে শেষে দাঁড়াল। এতদিন যে কথা আমার মনে দানা বেঁধে ছিল, মৈহারে এসেই মায়ের মুখে দুটো যে শব্দ শুনেছিলাম সেই ঘটনা রবিশঙ্করকে

বললাম। বাবার মন্তব্যটাও বললাম। রবিশঙ্কর হো হো করে হেসে বলল, পূর্ব বাংলায় ওই দুটো শব্দের অর্থ হলো বোকা। বুঝলাম, কেন বাবা বলেছিলেন, একই শব্দের অর্থ এক ভাষায় খারাপ, আবার অন্য ভাষায় সেই শব্দেরই অর্থ ভিন্ন। রবিশঙ্করকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা প্রায়ই বলেন, 'লাহোল বিলা কুবত,' এর মানে কী? সে বলল, আরে ছি ছি রাম রাম। বুঝলাম এটা পূর্ববঙ্গের কথা নয়, খাঁটী উর্দু কথা। দেখলাম তখন তারিখ বদল হচ্ছে। এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম লোকটা যখন বন্ধুই হলো তাহলে একবার বলেই দেখি না নিজেকে এবার বদলাক। তাহলেই তো অন্নপূর্ণা দেবী সুস্থ হবেন।

কিন্তু অনেক ভেবে স্থির করলাম, না, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হবে। তাই দুকূল বাঁচিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হবার যুক্তি দেব, স্থির করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন বাবা যখন অর্কেষ্ট্রায় গেলেন, নীচের থেকে শুনতে পেলাম সেতারের আওয়াজ। আমি ওপরে উঠে গেলাম রবিশঙ্করের বাজনা শুনবার লোভে। বুঝলাম, 'মূলতানি' রাগে রিয়াজ করছে। আমাকে দেখে বললো, 'বোস'। চুপচাপ বসে রিয়াজ শুনলাম। প্রায় আধ ঘন্টা। তারপরেই একটা গৎ একটু বাজিয়েই অন্নপূর্ণা দেবীকে ডেকে বললেন, 'প্লিজ একটু বাঁয়াতে ঠেকা দাও না।' প্রথমে সরাসরি নাকোচ করে দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু রবিশঙ্কর যখন সেতার রেখে খাটের তলা থেকে বাঁয়াটা বের করে আবার অনুরোধ করল বাজাবার জন্য, তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আমার ধারণা ছিলো না অন্নপূর্ণা দেবী তবলাও বাজান। যাই হোক বাজনা শুরু হলো, বাঁয়াতেই তিনি ঠেকা দিতে লাগলেন। গতকালই দুজনের বাজনা শুনেছি আর আজ দেখলাম যা, তাতে মনে হলো অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে রবিশঙ্কর যেন কিছুই নয়।

বিকেলে বাবা আসবার আগেই নীচে চলে এলাম। সন্ধ্যায় রবিশঙ্কর আলাদা শিখলো বাবার কাছে। বাবা সরোদ নিয়ে শেখালেন। বাবার সরোদের আওয়াজের সামনে, তার সেতারের আওয়াজ খুব ফিকে লাগল। রবিশঙ্করকে কাশীতে এবং দিল্লীতে সকলকেই দেখেছি প্রশংসা করতে। কিন্তু এখানে দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত।

রবিশঙ্করকে বললাম, 'অন্নপূর্ণা দেবীর হিস্টিরিয়ার কথা। কোন ভাল সাইকিয়াট্রিষ্টকে দেখালে ঠিক হয়ে যাবে।' সে বলল, 'কাকে দেখাতে বলছ? বাবার কাছেই ট্রেনে সব শুনেছি'। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে রবিশঙ্কর বললো, 'তুমি তো জানো না অন্নপূর্ণা কত বড় জেদী। আমার কথাই শোনে না, ডাক্তারও দেখাবে না এবং ওষুধ খেতে চাইবে না। এমনি তো ওর গুণের তুলনা নেই, কিন্তু বাবার মত মাঝে মাঝে এমন অবুঝ এবং রেগে যায় যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' বললাম, 'ডাক্তার বা ওষুধ খেতে চান না কেন? তার নিশ্চই কোন কারণ আছে। আপনার কাছে যা শুনলাম তাহলে তো মানসিক ডাক্তারকে দেখান অতি আবশ্যক।'

রবিশঙ্কর আবার করুণ মুখ করে বলল, 'কি বলব তোমায় আমার দুঃখের কথা। দেখো, কোন গয়না পরবে না। লোকে ভাবে আমার বুঝি স্ত্রীকে একটা গয়না দেবার সামর্থ্য নেই। এ ছাড়া আমি দেখো ছোট থেকে বিদেশে কাটিয়েছি, আমি চাই ভাল আলট্রা মর্ডান ড্রেস

পরে আমার সঙ্গে সব জায়গায় যাক, কিন্তু গয়না পরবে না, সাধারণ শাড়ী পরবে, কোথাও যাবেও না। বলো আমার কি ভালো লাগে? আমি চাই, আমার সঙ্গে সিনেমায় চলুক ইংরাজী বই দেখতে, কিন্তু আমার শুধু বলাই সার। সে সব অনেক কথা। আসলে ছোট থেকে মৈহারের বাইরে কোথাও যায় নি, বাবার আদর্শে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর যদিও বম্বে এবং দিল্লী গিয়েছে, কিন্তু চিরকালই হল ঘরকুনো।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে অন্নপূর্ণা দেবীর আওয়াজে চমক ভাঙ্গল। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি এত কথা চুপি চুপি হচ্ছে, যান গিয়ে শুয়ে পড়ুন, সকালে উঠে বাজাতে হবে না?' রবিশঙ্করের মুখে কোন আওয়াজ নেই। আমি নীচে চলে এলাম, নিজের ঘরে। শোবার আগে মনে হলো, আরো কিছুক্ষণ কথা হলে রবিশঙ্করের কাছে নতুন কিছু শুনতে পেতাম, যে কথাগুলো শুনলে আমার পক্ষে সহজ হত, যাতে ওদের সম্বন্ধটা সহজ এবং সরল হবার উপায় কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু তা হল না।

এমন একটা দম্পতি খুব কমই দেখেছি। ভেতরে যাই হোক বাইরের ভব্যতা এত সুন্দরভাবে রপ্ত হয়েছে যে সকলেই ভাববে আদর্শ দম্পতি। যে কদিন রবিশঙ্কর ছিল বাইরে থেকে দেখে কেউ ভাবতে পারবে না দুজনে এত কাছে থাকলেও, মানসিক দিক থেকে দুজনে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

কয়েকদিন রবিশঙ্করের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো, তাকে যখন বললাম অন্নপূর্ণা দেবীকে এ্যাবনরমাল সাইকোলজি এবং সাইকোলজি পড়াচ্ছি তখন রবিশঙ্কর খুশী হয়ে বলল, 'অন্নপূর্ণা তোমাকে খুব মানে। যেহেতু বাবার এত সেবা করছ এবং ছেলেদেরও পড়াচ্ছ তাই তোমাকে নিজের থেকে শেখাচ্ছে। যাই হোক অন্নপূর্ণাকে একটু বোঝাও তুমি, যদি মনোভাবটা একটু বদলাতে পারো তাহলে বৃথা চিন্তা করে কষ্ট পাবে না।' উত্তরে বললাম, 'একমাত্র ঠিক আপনিই করতে পারেন। দুজনে একটু এ্যাডজাষ্ট করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কয়েকটা দিন রবিশঙ্করের সান্নিধ্য খুব ভাল লাগল। তারপর একসঙ্গে দুজনে ট্রেনে এলাহাবাদে গেলাম। এলাহাবাদে যাবার আগে আমার জীবনে এই অভিজ্ঞতা হল যে মুখ দেখে মানুষ চেনা যেমন কঠিন সেই রকম কেবলমাত্র বাইরেটা দেখে কোনও ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনই দুঃসাধ্য।

ট্রেনে একসঙ্গে যাবার সময় জানতে চাইলাম, দিল্লীতে ভাল সরোদ পাওয়া যায় কি না? রবিশঙ্কর বলল, 'দিল্লীতে শর্মা বলে একটা লোক আছে যে সরোদ তৈরী করে এবং তার দোকানও আছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে সরোদের দাম কত?' সে জবাবে বলল, 'তিনশো টাকায় হয়ে যাবে।' রবিশঙ্করের কাছেই জানতে পারলাম, যদিও বাবার কাছে কয়েকটা সরোদ আছে, তবুও বাবার জন্য একটা সরোদের অর্ডার আবার দিল্লীতে সে দিয়েছে। 'সরোদ তৈরী হতে তো সময় লাগে, দেখ কবে হয়'? মনে মনে ভাবলাম, যেমন করে হোক একটা সরোদ তৈরী করতেই হবে। আমার দাদা মৈহারে কবে আসবে ভাবতে লাগলাম। আমার অন্যমনস্কতা দেখে রবিশঙ্কর বলল, 'কি ভাবছ?' স্পষ্ট বললাম, 'সময় হলে আপনাকে টাকা পাঠাব, আমার জন্য একটা সরোদ করাব।' রবিশঙ্কর বলল, 'ঠিক আছে,

তোমার জন্যও আমি অর্ডার দিয়ে দেব।' উত্তরে বললাম, 'আমার দাদা শীঘ্রই মৈহারে আসবে। দাদাকে বললেই আমাকে টাকা দেবে। দাদা এসে টাকা দিলেই জানাব।' এ বিষয়ে আর বেশী কথা হলো না। বাবার পছন্দ, অপছন্দ বহু জিনিষ রবিশঙ্কর আমাকে বলল। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও অনেক বললাম।

বললাম, 'বাবা যখন রবিশঙ্করকে শেখাচ্ছিলেন সুরশৃঙ্গার বাজিয়ে তা দেখে মনে হচ্ছিল কবে এরকম বাজাতে পারব।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি দেখলে কী করে? তুমি তো ঘরে ছিলে না।' উত্তরে বললাম, 'আমার ঘরের দরজায় একটা বড় ফুটো আছে সেটা দিয়ে দেখেছি।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর হেসে বলল, আরে তোমার তো দেখছি থার্ড আই আছে।' এরপর গল্প করতে করতে দেখি এলাহাবাদে প্রায় এসে গিয়েছি।

এলাহাবাদে গিয়ে রবিশঙ্কর ও আমি সুপ্রভাত পালের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। রবিশঙ্কর একটা রাত এখানে কাটিয়ে দিল্লী চলে যাবে। আমি পরের দিন বাজিয়েই মৈহারে চলে এলাম।

মৈহারে আসার পর অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'রেডিওতে বাজিয়ে ভাবছেন খুব বাজিয়েছেন। মাঝে মাঝেই বাবা একটা গৎ শেখাচ্ছেন, পাছে আপনি নিরাশ হোন বলে। এবার বাবাকে বলবেন, নানা ধরণের পাল্‌টা, বোল, কৃন্তন, মীড়, গমক এই সব শেখাতে। আসল হল এইসব। দেখেন না, প্রথমে বসে আশিস কেমন পরের পর পালটা, বোল বাজায়। আপনি তো লেখাপড়া করেছেন, বাংলার অক্ষর না চিনেই 'সঞ্চয়িতা' পড়তে চান?' অন্নপূর্ণা দেবীর কথাগুলো শুনে আমার সব অহঙ্কার দূর হয়ে গেল।

১২

প্রতিদিন একই কাজ করতে হলে মনের অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি মরে যায়। হারিয়ে যায়। মানুষ অভ্যাসের দাস হয়ে যায়। কিন্তু যদি কোন হঠাৎ পরিবর্তন হয় মানুষ বোধ করি আনন্দ পায়। আমারও তাই হলো। আমি নতুনত্বের স্বাদ পেলাম। এলাহাবাদে রাত্রের বাজনাটা বাবা শুনেছিলেন। এবারেও শুনলাম বাবা খুশী হয়েছেন। মৈহারে আসার একদিন পরেই হঠাৎই বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'চল গোশালাতে।' গোশালাতে একটা মাটির দেওয়ালের ঘর ছিল। উপরের ছাদটা ছিল টালির। ঘরটা বন্ধই থাকত, তাই কখনও দেখি নি ঘরের মধ্যে কি আছে। বাবা দরজাটা খুলে আমাকে বললেন, 'আজ থেকে সকালে এবং বিকেলে এই ঘরেই রিয়াজ করবে।' ঘরের মধ্যে দেখলাম একটা ছোট চৌকি এবং তারপর একটা মোটা তোষক। ঘরটা বেশ বড়ই। ঘরের এককোনে ভাঙ্গা সেতার এবং এসরাজ টাঙ্গান রয়েছে দেখলাম। ঘরের দুটো ছোট জানলাও রয়েছে। বাবা বললেন, 'যেহেতু তোমার ঘরের পাশেই আশিস বাজায়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা করে দিলাম, পাছে তোমার রিয়াজে অসুবিধা না হয়। তবে রাত্রে এখানে বাজাবে না, সাপ খোপের ভয় আছে।' এই কথা শোনার পরই বাবাকে প্রণাম করলাম। খুব প্রাণখুলে বাজাতে পারব। সত্যই এতদিন ঠিকমত বাজাতে পারতাম না। সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যায় ঘরের লাগোয়া ঘরে আশিস বাজাত, সুতরাং অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। বাবা আমার জন্য চিন্তা করে এই ব্যবস্থাটি করেছেন দেখে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল।

ভাবলাম এই হল প্রকৃত সময়। অন্নপূর্ণা দেবী যেমন বলেছিলেন ঠিক সেইরকম ভাবে বাবাকে বললাম শেখাতে। বাবা হেসে বললেন, 'এতদিনে জ্ঞান হয়েছে। তুমি তো রেডিওতে বাজিয়েছ। ভালই বাজিয়েছ।' বললাম, 'রেডিওতে লিখে দিয়ে এসেছি আর বাজাব না।' বাবা খুশী হলেন। বাবা বললেন, 'খুব মন দিয়ে যতটা সময় পাও খুব সাধনা করো। ঠিকমত সাধনা করলে ফল নিশ্চই পাবে। করতে যাও, করতে যাও, করলে পাবেই পাবে।' এই কথাটা বাবা প্রায়ই বলতেন। বাবা আবার স্মরণ করিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বুড়ো বয়সের ছেলে, আগে এলে খুব তাড়াতাড়ি হতো। তাহলেও যে কদিন বেঁচে আছি, যতটা পারো শিখে নাও।' বুঝলাম বাবার মেজাজটি এখন খুব ভালো আছে। পনেরো ষোল দিন একনাগাড়ে খুব রিয়াজ করলাম।

নিখিল ব্যানার্জীর চিঠি এল। তেইশ ফেব্রুয়ারী সকালে মৈহারে আসছে। অথচ তেইশ ফেব্রুয়ারী রাত্রে বাবার এলাহাবাদে রেডিওতে যাবার ঠিক হয়েছে। বাবা আমাকে বললেন, 'নিখিলের থাকবার জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে দাও। আমার বাড়ীতে পর্দানশীন, তুমি একমাত্র ব্যতিক্রম।' যথাশীঘ্র একটা বাড়ীর আমি কি করে ঠিক করব? আমার এ যাবৎ মৈহারে এসে বিশেষ কারো সঙ্গে পরিচয় হয় নি। চিন্তায় পড়লাম।

তেইশে ফেব্রুয়ারী নিখিল সকালে এসে পৌঁছল। সে আমার ঘরেই রইল। নিখিলের মুখে শুনলাম বহুদিন থেকে চেষ্টা করছে বাবার কাছে আসবার জন্য কিন্তু বাবা রাজীই হন নি বয়স হয়ে গিয়েছে বলে। এতদিনে রাজী হয়েছেন তাই এসেছেন। ওকে দেখলাম, বাবা এবং মাকে দাদু এবং দিদিমা বলে সম্বোধন করছে। বাবা বললেন, 'নিখিল খুব সরল ছেলে। পৃথিবীর কিছু জানে না, সঙ্গীত শিখবার জন্য পাগল।'

বাবা যাবেন রাত্রে এগারোটার ট্রেনে এলাহাবাদে রবাব এবং সুরশৃঙ্গার বাজাতে, তাই সন্ধেবেলাতেই আমাকে শেখালেন। শেখাবার পর বললেন, 'তাড়াতাড়ি নিখিলের থাকবার জায়গার কোন ব্যবস্থা করো।' আমার হয়েছে বিপদ। বাড়ীতে কেউ এলে বাবার একটিই কথা, অতিথি হল নারায়ণ। খুদা কোন বেশে এসেছে বুঝবার ক্ষমতা নাই। আমার দীর্ঘদিন থাকাকালীন কতজনকে যে বাবার নির্দেশে বাড়ীতে এক রাত্রি বা দু'রাত্রি বাসের পরই বাড়ী ছাড়া করতে হয়েছে, তাদের সংখ্যা কম নয়।

আসলে বাবা অজ্ঞাত কোন লোককে বাড়ীতে এনে খাওয়াতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু বাড়ীতে আশ্রয় দিতে ভয় করতেন, পাছে যদি কোন অঘটন বা বিপদ হয়। তখন কে সামলাবে? সুতরাং একদিন বা দু'দিনের জন্য যদি কাউকে আশ্রয়ও দিতেন, মনে মনে বাবা নার্ভাস হয়ে যেতেন। সুতরাং অতিথিকে দেবতা ভাবলেও তাকে বাড়ী থেকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থাটা করতে বাবা আমাকেই বলতেন। বলতেন, যেমন করে হোক ব্যবস্থা করতে। যার জন্য অনেকের অভিশাপ হয়ত বা পেয়েছি। যাদের বাড়ী থেকে হঠিয়ে দিয়েছি তারা ভেবেছে আমিই হঠালাম অথচ বাবা তো কিছু বললেন না।

মৈহারে গিয়ে, ব্যাণ্ডের গুলগুলজীর সঙ্গেই একমাত্র পরিচয় হয়েছে। পরের দিন তাঁকে বাড়ীর কথা বলতে তিনি একটি মন্দিরে ব্যবস্থা করে দিলেন। থাকা এবং খাওয়ার কোন

পয়সা লাগবে না। জলের জন্য একটি কুঁজো, লণ্ঠন, কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিখিলকে বললাম, 'বাবার নির্দেশেই এই ব্যবস্থা করলাম'। নিখিল অবাক হয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আমাকে বলল, 'দাদু তো আমাকে এ কথা বলেন নি'। উত্তরে বললাম, 'বাবা আমাকে না বললে, কি আমি এই ব্যবস্থা করতাম? বাবা এলে নিজেই বাবাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।' বুঝলাম নিখিলের মনে সন্দেহ হয়েছে কিন্তু আমি অপারগ।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারী এই প্রথম বাবা রেডিও থেকে সুরশৃঙ্গার এবং রবাব বাজালেন।

পাঁচদিন পরে যথারীতি রাত্রে বাবা মৈহারে এসে পৌঁছলেন। রাত্রে প্রতিবারের মত, গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে, চা খেয়ে তামাক খেতে লাগলেন। হঠাৎ বাবা বললেন, 'নিখিলের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ'? উত্তরে বললাম, 'আপনার যাবার পরদিনই একটি মন্দিরে বিনা খরচায় খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি গুলগুলজীর সাহায্যে'। এ কথা শুনে বাবা খুশী হলেন। অবাক হলাম বাবার সবদিক খেয়াল আছে।

নিজের থেকেই বললাম, 'রেডিওতে আপনার সুরশৃঙ্গার এবং রবাব-এর প্রোগ্রাম শুনেছি, খুব ভাল লেগেছে। সুরশৃঙ্গারের আওয়াজ খুব মিষ্টি।' বাবা চুপ করে শুনলেন। তারপর প্রথমে বললেন, 'বড় সুরশৃঙ্গারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে অনেক দিন, সেটা এলে দেখবে তার আওয়াজ আরো ভালো হবে। এই সুরশৃঙ্গারটি অতি ছোট।' হঠাৎ তামাক খাওয়া বন্ধ করেই বাবা বললেন, 'আরে, আরে, তোমার কাশীর মহন্তজী হনুমানজীর প্রসাদ দিয়েছেন, কাল হাত ধুয়ে খাবে এবং সকলকে দেবে। তোমার তো খুব প্রশংসা করল। তোমার মহন্তজীর হাতটা খুব মিষ্টি। তবে তোমার মহন্তজীর গুরু মুন্নুজী গুণী লোক, কিন্তু হাতে সেই মধুরতা নাই। যাক, খুব মন দিয়ে রিয়াজ করো। এখনও বহু দিন শিখতে হবে। তোমার মত মূর্খের প্রশংসা আর একটি গয়লার প্রশংসা একই। আগে শেখো তখন বুঝবে কি ভাল, কি খারাপ।' আমার মুখ বন্ধ। বাবাকে প্রণাম করেই তারপর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে নিখিল এলো। নিখিলকে দেখেই বাবা বললেন, 'আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। যতীন তো তোমার থাকবার ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়েছে।' নিখিল মাথা নাড়িয়ে তারা স্বীকৃতি জানাল। বাবা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, আমার বাড়ীতে পর্দানশীন, বাড়ীতে কাউকে রেখে শেখাই না। এ যাবৎ যাদের শিখিয়েছি সকলেই নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তবে যতীনের কথা আলাদা, ও হলো আমার বুড়ো বয়সের ছেলে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী। আমার কত কাজ করে। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসে এবং মৈহারে এলে রাত্রে নিয়ে আসে। এছাড়া আমার চিঠিপত্র লেখে, নাতিদের পড়ায়। ওর উপর ভরসা করে মৈহারের বাইরে যেতে পারি।' অতঃপর বাবা অনেক কথাই বলে গেলেন আমার বিষয়ে। আমার কাজ করার ফিরিস্তি শুনে মোটেই আনন্দিত হলাম না, তবে নিশ্চিন্ত হলাম, বাবা নিজেই নিখিলকে বললেন যে বাড়ীতে কাউকে রাখেন না। আমার প্রতি নিখিলের যে ভুল ধারণা হয়ত বা হয়েছিল, সেটার সমাধান হয়ে গেল। এ কথা বলার পরই নিখিলকে বললেন, 'এলাহাবাদে, তোমার সম্বন্ধে মুস্তাক আলী আমাকে অনুরোধ করেছে, তোমাকে

না শেখাতে। এককালে যে উস্তাদের কাছে কলকাতায় কয়েকদিন শিক্ষা করেছিলে, সেই উস্তাদ তোমার সম্বন্ধে কেন এই ধরণের কথা বলে? যেহেতু তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, তাই তোমাকে শেখাব। যাই হোক মন দিয়ে বাজাও, নিমকহারামী কোরো না। বেইমানী করলে জানবে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। তোমার যেমন ভাব, সেইরকম পাবে। মনে রেখো, 'দিয়ে ধন, বুঝি মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ?' আল্লা সবকিছু দিয়ে পরীক্ষা করেন, নীচতা দেখলেই আল্লার জিনিষ, আল্লার কাছেই চলে যায়। ঠিক আছে এখন যাও, সন্ধ্যা বেলায় যন্ত্র নিয়ে আসবে।'

সন্ধ্যায় নিখিল এল শিখতে। নিখিলকে বাবা বললেন, 'বাজাও তো'। নিখিল সবে দশ পনেরো মিনিট বাজিয়েছে। হঠাৎ বাবা জোরে, 'আরে শুয়োর কে বচ্চে, বাজনা হাত দিয়ে বেরোয় না, এখনি উস্তাদি, উস্তাদের মত মাথা নাড়ানও শিখেছ? বন্ধ করো। রবুর নকল করে বাজাচ্ছ। রবুর নকল করে রবুর মত বাজালেও সকলে বলবে নকল। রবুর নকল করবে না। তোমাকে অন্যরকমভাবে শেখাব।' পাল্টা কয়েকটা এবং মীড়ের কিছু জিনিষ বাবা শিখিয়ে বললেন, 'ইমন রাগে এক সপ্তাহ রিয়াজ করে আমাকে এসে শোনাবে। সামনে আয়না রেখে বাজাবে। মাথা নাড়লে, মাথা ভেঙ্গে দেব।' শেখাবার সময় বাবার রাগ দেখবার মতো। কিন্তু অন্য সময় নাতি বলে কত ইয়ার্কি করেন। আশ্চর্য লাগে। তিনমাস আগে নিখিলকে দেখেছিলাম। কয়েকদিন আগে যখন এসেছিল, তখনই দেখেছিলাম দাড়ি একটু বেড়েছে। ভেবেছিলাম কামাবার বুঝি সময় পায় নি। আজ জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাড়ি কামাবার জিনিষ নাই কী? দাড়ি কামান নি কেন?' উত্তরে নিখিল বলল, 'যেদিন বাজাতে পারব, সেইদিন দাড়ি কাটব স্থির করেছি।' আমি আর কিছু বললাম না।

পরের দিন যখন আশিসদের পড়াচ্ছি, দেখি একটি যুবক এল। বাবা নিজের ঘরেই ছিলেন। আশিসকে দেখে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দাদু কোথায়?' আশিস বলল, 'দাদু ঘরে আছেন?' ছেলেটি সোজা চলে গেল বাবার ঘরে। আশিসকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কে?' উত্তরে আশিস বলল, 'দাদুর ছেলে।'

হঠাৎ বাবার ঘরের থেকে আওয়াজ পেলাম, 'আরে আরে কবে এলে।' দেখলাম বাবা ওকে বাইরে নিয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবার কথায় জানতে পারলাম যুবকটির নাম জীতেন্দ্রপ্রতাপ। গোয়ালিয়রের রাজমাতার সম্পর্কে ভাই। বাবার কাছে আগে সেতার শিখেছে এবং আবার এসেছে সেতার শেখবার জন্য। বুঝলাম বাবার খুব প্রিয়।

বাবার কাছেই শুনলাম জীতেন্দ্রপ্রতাপ বাঙ্গালী বিয়ে করেছে। বাবা, মাকে ডেকে বললেন, 'দেখ, কে এসেছে!' বুঝলাম বাড়ীর সকলের সঙ্গেই পরিচয় আছে। বাবা তাকে খাবার জন্য বললেন। কিন্তু জীতেন্দ্রপ্রতাপ বলল বাড়ীতে তার স্ত্রী রান্না করেছে। কিছুক্ষণ পরেই জীতেন্দ্রপ্রতাপ চলে গেল।

জীতেন্দ্রপ্রতাপ চলে যাওয়ার পর মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনলাম তার সম্বন্ধে। রাজ পরিবারের ছেলে, কিছু বদভ্যাস থাকা স্বাভাবিক। মা আমাকে বললেন, 'এই সব রাজ পরিবারের ছেলেদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

'তোমার বাবারও জবাব নেই। রাগের সময় যা ঘটে রাগ কমলে আর কিছু মনে থাকে না। আজ জীতেন্দ্রপ্রতাপকে 'আরে আরে' করে আপ্যায়ন করছেন, আর এই জীতেন্দ্রপ্রতাপকেই গত দু'বছর বাজনা শেখাবার সময় তুলতে না পারার জন্য বেদম বকেছিলেন, ফলে এই রাজার বেটা সেতার আছড়ে ভেঙ্গে এ বাড়ী ছেড়ে পালায়। আর তোমার বাবাও একশো বার চিৎকার করলেন, নিকালো-নিকালো। আর আজ যেই বিলাইদণ্ডবত করল ওমনি তোমার বাবা সব ভুলে, আরে আরে এসো শুরু করলেন। এ নখড়ার মানে বুঝি না। যারা মন প্রাণ দিয়ে তোমার বাবার ভালো চায় তারা মন পায় না। আর যারা ভেক্‌ধারী তাদের মিষ্টি কথায় তোমার বাবা সব ভুলে যায়। যাই হোক্, এই সব ছাতার ভেকধারীদের সাথে কোন সম্বন্ধ রেখো না।' মার কথাগুলো শুনে গেলাম চুপচাপ। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, বাবার সামনে সেতার ভেঙ্গে যে রাগ দেখিয়ে বদতমিজী করে চলে গিয়েছিল, সে কি করে আবার বাবার কাছে এসেছে? আর বাবাই বা কি করে সব ভুলেছেন। রাজকুমার বলেই সাত খুন মাফ? আসলে যে তা নয়, তা বুঝতে সময় লেগেছিলো।

মৈহারে আসার পর প্রথমদিনই বাবা বলে দিয়েছিলেন, 'কাউর বাড়ী যাবে না। পরনিন্দা পরচর্চা করবে না। যে জন্য এসেছ, দিনরাত কেবল বাজাবে। মৈহারের আসার পর বাবাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কয়েকজনের সঙ্গে। মৈহারে একটি কাপড়ের দোকান ছিল। বাবা যাবতীয় পরিধানের জন্য একটি দোকান থেকেই কিনতেন। নাম ছিল পূরণ চন্দ্র জৈন। বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বাবাও খুব ভালবাসতেন। আমায় বাবা বলেছিলেন তাঁর অবর্তমানে ধুতি জামা, পায়জামা, সাড়ী কিনতে হলে যেন ওই দোকান থেকেই কিনি।

মৈহারের দিওয়ানলাইম কোম্পানির চেয়ারম্যান ফকিরচাঁদ চোপড়া এবং তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতা একদিন বাড়ীতে আসার পর বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী স্বর্ণলতা, বাবার কাছে আগে সেতার ও হারমনিয়াম শিখেছিলেন। বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। চোপড়া সাহেব আমাকে বলেছিলেন, যদি কোন জরুরী চিঠিপত্র টাইপ করানোর দরকার পড়ে, তাহলে যেন আমি তাঁর অফিসে চলে যাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরতন সিং সৈনী থাকবেন। সৈনী বাবার অত্যন্ত প্রিয় এবং অতীতেও বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। এ ছাড়া এক ধনী পারসি, আলাবিয়া সাহেবের সঙ্গেও বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবার কাছে যখন এরা মাঝে মাঝে এসেছেন, তখনই বাবা আমার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মৈহারে দুটি মাত্র বাঙ্গালী পরিবার ছিলো। বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বাগচী বাবু বলেই সকলে ডাকে। বাগচীবাবুর স্ত্রীকে বাবা মেয়ের মত স্নেহ করতেন বলে, বাগচীবাবুকে জামাইবাবা বলতেন। বাগচীবাবুর ম্যানেজারও বাঙ্গালী ছিলেন। মৈহারে চুনের ব্যবসাই হল প্রধান। এখানে রায় লাইম কোম্পানির মালিকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল।

বাবা যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এরা সকলেই মৈহারের অতি পুরানো বাসিন্দা এবং ভদ্র। মৈহারে আমার দীর্ঘ সাত বছর থাকাকালীন, বাবা একমাত্র শেঠ পুরণ চন্দ্র জৈনের দোকানে যেতেন কাপড় কিনবার জন্য, কিন্তু কারো বাড়ীতে কখনও যেতে

দেখি নি। উপরোক্ত যাদের কথা লিখেছি, বহু ঘটনা এদের সম্বন্ধে লিখবার আছে বলেই এই নামগুলি লিখলাম।

যদিও মৈহারে আরো বহু লোক ছিল কিন্তু বাবার এখানে আসতে কেউই সাহস পেতো না, কেননা মৈহারের মহারাজকে শিক্ষা দেওয়ার সময় একবার হাতুড়ি দিয়ে হাতে মেরেছিলেন, সে কথা মৈহারে দারুণভাবে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার আগে মহারাজেরা যে দাপটে ছিল, তা প্রায় সকলেরই জানা। মৈহারের মহারাজার দরবারে বিচার হতো এবং সাজাও হতো। সেই সময় মহারাজকে হাতুড়ি দিয়ে মারা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। রাগের চোটে মেরে বাবাও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মৈহারের মহারাজ যেহেতু বাবার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেন, তাই ব্যাপারটা খুব সহজভাবেই নিয়েছিলেন। এ গল্পটা এইজন্য লিখলাম, কারণ বাবা অত্যন্ত রাগী প্রচার হওয়ার ফলে তাঁর বাড়ীতে কেউ আসতে সাহস পেতো না। তবে বাড়ীতে যদি কেউ আসতেন, বাবা তাকে এবং সকলেই অতিথি নারায়ণ হিসাবে স্বাগত জানাতেন।

সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে বাজাচ্ছি, এমন সময় জীতেন্দ্রপ্রতাপ সিং এসে হাজির হলো। পাশের ঘরে তখন আশিস বাজাচ্ছে। জীতেন্দ্রপ্রতাপ আমার ঘরে বসেই একটা সিগারেট ধরাল। বললাম, 'এ কি করছেন?' যেন কিছুই হয় নি এমনভাব দেখিয়ে বলল, 'কি করছি? সিগারেট খাচ্ছি।' বাজনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বাইরে গিয়ে সিগারেট খান। সিগারেটের গন্ধ পেলে বাবা ভাববেন আমিই খাচ্ছি।' যতই হোক সে রাজকুমার, তাই, সেই মেজাজে বললে, 'বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে নিজেকে খুব বড় মনে করেন? জানেন বাবাকে বলে আপনাকে এখনই বাড়ী থেকে বার করে দিতে পারি?' আমার সাধারণ লুঙ্গি আর গেঞ্জি দেখে বোধহয় রাজকুমার আণ্ডার এস্টিমেট করেছিল। জীতেন্দ্রপ্রতাপকে বললাম, 'আমি পছন্দ করি না আমার বাজাবার সময় কেউ ঘরে আসে।' এই কথা বলেই জীতেন্দ্রপ্রতাপকে হাত ধরে ঘরের বাইরে করে দিলাম। সে আমার কাছ থেকে এটা কল্পনাও করতে পারে নি। সে হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'দাঁড়ান, আপনাকে মজা দেখাব।' উত্তর দিলাম, 'যা দেখাবার দেখাবেন, ভুলে যাবেন না, আপনি অন্যের কাছে রাজকুমার হতে পারেন, কিন্তু আমার চোখে আপনি বাবার এক ছাত্র মাত্র। এ ছাড়া কিছুই নয়।' জীতেন্দ্রপ্রতাপ চলে যাবার পরই মায়ের কথাগুলো মনে পড়লো। এই কয়েকমাস এসেই বুঝেছি, বাবা অত্যন্ত কানপাতলা, তাকে এদিক ওদিক বানিয়ে যদি কেউ কিছু বলে তাহলে বিপদ। তাই সঙ্গে সঙ্গে মাকে গিয়ে সব বললাম। যদিও জানি বাবাকে কিছু বলা মায়ের পক্ষেও অসম্ভব, তাহলেও মাকে বলে হালকা হলাম। তখন কি জানতাম এর জের চলবে অনেক দূর।

ছোটবেলায় আমার পাড়ার এক মাষ্টারমশাই বরাবর বলতেন, আয়নায় নিজের চোখ দিয়ে, নিজেকে দেখা যায়। মনের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখবে। সকলের কথা শুনবে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কখনও সঙ্কোচ করবে না, নিজের বিবেকের কাছে খাঁটি থাকবে।' স্পষ্ট কথা বলা, বর্তমানে গতির যুগের এক অবধারিত অভিশাপ জানা সত্ত্বেও, এ রকম অভিশাপের দায় আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু তারজন্য মনে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

কয়েকদিন কেটে গেল। বুঝলাম জীতেন্দ্রপ্রতাপ নিজের ভুল বুঝে, বাবাকে কিছু বলতে সাহস পায় নি।

গরম পড়েছে। বাবা, মা এবং নাতিরা বাড়ীর উঠোন জল দিয়ে ঠাণ্ডা করেছে। বাবার বাড়ীর চতুর্দিকে অনেক জায়গা। কিন্তু বাবার বাড়ীর সামনের কম্পাউণ্ডে বাবার অনুমতি নিয়ে আমি একটা খাটে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বাবার ঘরের সামনেই বুদ্ধা চাকরটি বারো মাস একটি লাঠি নিয়ে রাত্রে শুতো এবং রাত্রে কয়েকবার উঠে উঠে পাহারাও দিতো।

দেখতে দেখতে দোল এসে গেল। বাবা যখন বাজারে গেলেন সকলেই রং দিয়েছে। বাবারও খুব খুশী খুশী ভাব। ছোট ছেলেরা বাবাকে রং দিয়েছে। যেহেতু বাড়ীর বাইরে শুয়েছি সেইজন্য গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাজালাম।

দোলের কয়েকদিন পর, বাবা দিল্লীতে বাজাতে গেলেন। বাবার অবর্তমানে রাত্রি পর্যন্ত বাজাতাম এবং রেডিও শুনতাম। বরোদা, রাজকোট, ঔরঙ্গাবাদ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী থেকে প্রায়ই রেকর্ড বাজত। বাবা সর্বদাই অপ্রচলিত রাগ বেশী বাজাতেন, যা অন্য শিল্পীর কাছে শুনি নি। যেমন বরারী, ভীম, অর্জুন, সাঁঝগিরি, শুদ্ধ বসন্ত, ললিতাগৌরী, গৌরী ইত্যাদি।

মৈহারে যাবার আগে ভারতের প্রায় সব নামী গায়ক বাদকের গান বাজনা শুনেছি। এরপর মৈহারে গিয়েও, বাবার অবর্তমানে রাত্রে রেডিও শোনাটা ছিল একটা দৈনন্দিন কাজকর্মের মত।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই বাবা মৈহারে ফিরে এলেন। বাবা মৈহারে এসে আমাকে বললেন, 'এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার মাকে এত কাজ করতে হয়। তোমার মাকে সাহায্য করার জন্য যদি কাশীর থেকে কোন মহিলা, যার কেউ নেই এমন কাউকে চিঠি লিখে আনাতে পার তাহলে খুব ভাল হয়। মাইনের সঙ্গে থাকা, খাওয়া পাবে।' বাবাকে বললাম, 'চিঠি লিখছি, যদি সম্ভব হয় তাহলে কেউ এসে দিয়ে যাবে।' এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অন্নপূর্ণা দেবী বম্বে থাকাকালীন রোজ নিজে রান্না করতেন বলে, মৈহারে এলে বাবা এবং মা দুজনেই অন্নপূর্ণা দেবীকে রাঁধতে দিতেন না। বাবা মা বলতেন, 'বাপের বাড়ীতে এসে রাঁধতে হবে না, বাজনা বাজাও এবং বিশ্রাম করো।'

যখন কাজের লোকের জন্য চিঠি লিখতে বললেন, আমি বাবার কাছে প্যাডের কাগজ চাইতেই বললেন, 'এখন বাজাও এত তাড়াতাড়ি কি আছে?' কিন্তু আমি বাবাকে চিনেছি। যখন সকালেই বলেছেন চিঠি লিখতে, তখন দেরী হয়ে গেলেই বাবার মেজাজ খারাপ হবে। আর মেজাজ খারাপ হলেই ব্যাণ্ডে যাবার আগে যদি শেখান, তাহলে বকুনি খেতে হবে। আর যদি দুপুরে নাও শেখান, রাত্রে শেখাবার সময় বকুনি অনিবার্য। আসলে, বাবার মুখের কথা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটি করতে হবে। বাবা নিজেও যখন যে কাজটি মনে হবে, তখনই করবেন। সুতরাং সকলের কাছেই সেটা আশা করেন। আগেও এ কথা লিখেছি তবুও আবার লিখলাম। কারণ এই প্রথম বাজনা বাজিয়ে চিঠি লিখে পোষ্ট অফিসে গিয়ে শুনি, বাবা চিঠি নিয়ে চলে গেছেন। বাড়ীতে এসেই বাবার ঘরে ঢুকে দেখি, বাবা গুম মেরে বসে আছেন, তামাক খাচ্ছেন। বিছানার উপর কয়েকটি চিঠি। বাবা দুটি চিঠি খুলেছেন এবং সেই খোলা চিঠি বাবার বালিশের উপর রাখা আছে।

বুঝলাম, দুটো খুলে থাকলেও বাকীগুলো আমাকেই খুলতে হবে। নিজেকে অপরাধি মনে হচ্ছিল যেহেতু পোষ্ট অফিসে গিয়ে সময়মত আমি চিঠি আনতে পারি নি এবং বাবা তাই গেছেন। তাই কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ গুমট ভাব যে আমার অপরাধে নয়, সেটা বাবাই পরে খোলসা করলেন। ব্যাপারটা হোলো, বাবা নিজের চিঠি ভেবে খুলে ফেলেছেন, এবং সেই চিঠির বিষয়বস্তু মাথা গরমের কারণ। চোরের মন বোঁচকার দিকে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমার কোন চিঠি খুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমার কী চিঠি আসতে পারে যা বাবার উষ্মার কারণ হবে? আমায় যারা চিঠি লেখেন তারা অনধিক ছটি কথা লেখেন, কেমন আছ? ভাল আছি, ভাল থাকবে, আশীর্বাদ জেনো, নমস্কার জানাবে।

তাই হাবুডুবু খাবার পালা। হতভম্ব ভাব কাটার পরই বাবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বর্ষণ শুরু হলো। নিজের দু'গালে দুটো থাপ্পড় মেরে চিৎকার করে উঠলেন 'তোবা তোবা'। গৌরবে বহুবচন লাগিয়ে বললেন, 'তোমরা সব শুয়ার কে বাচ্চে। আর তোমাদের বাবা মায়ের জবাব নাই। যত না বুদ্ধি দেয়, তার বদবুদ্ধি দেয় বেশী। এহেসান ফরামোশ্, বেইমান।' মনে মনে ভাবলাম ছুটে পালাই, কিন্তু সাহসে কুলোলো না। হাতে জোড় করে বললাম, 'বাবা অপরাধ যদি না নেন, তা হলে ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি?' বাবা মুখে কিছু বললেন না, একটা চিঠি ছুঁড়ে ফেললেন মুখের উপরে আর আপনমনে বললেন, 'আল্লা মাফ করো, না জেনে খুলেছিলাম অন্যের চিঠি। কিন্তু আল্লা আমার অপরাধের শাস্তিও তো তুমি দিয়ে দিয়েছ। এই চিঠিতে তুমি এমন মানুষ চেনালে যে এর থেকে তো জঙ্গল ভালো। আপনও দেখালে, পরও দেখালে, জঙ্গলও দেখালে। জীবনের একতারাতে বিশ্বাসের একটিই তো তার, সেটাকেও কেন ছিঁড়তে চাও আল্লা? আমি তো পয়সা নিয়ে শেখাই না।'

চিঠি পড়বার আর আমার সাধ নেই। বুঝলাম আমার বন্দরের কাল শেষ হয়েছে। আমার নামে কোন ষড়যন্ত্রকারীর প্রেমপত্র এসেছে। এবার টর্পেডো লেগেছে বোধহয় জাহাজের মাঝখানে, আর বাবা-দরিয়ায় ভাসা বোধহয় সম্ভব নয়। চিঠিটা হাতে নিয়ে জড়ভরত হয়ে গেলাম। খুলে পড়বার সাহসই জোটাতে পারছি না। এবার আর স্বগতোক্তি নয়। বাবা বললেন, সোজাসুজিই প্রথম পুরুষ সম্বোধনে 'বাবা, আমরা বাঙ্গালী। চালাক জাতি। অতি চালাকি করে আমরা হাতিয়ে নিতে চাই। গাছে জল না দিয়ে আমরা কাঠাল ভাঙ্গতে অভ্যস্ত। হিসাব করে যে শ্রদ্ধা হয় না, নিকাশ করে আস্থা যে পাওয়া যায় না, একথা আমরা বুঝিনা। আমি তো বিবেকানন্দের কথা শুনেছি, চালাকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। একথাটা কি সন্তানের বাবা বোঝেন না, যে সন্তানকে কুশিক্ষা দেন।'

ছয় জ্বর হঠাৎ কালঘাম দিয়ে ছাড়ল যেন। ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমায় কেউ যেন নামিয়ে বলল রাজভোগ খাও, তোমার আর ফাঁসি হবে না। এত নিশ্চিন্ত হবার কারণ ওই শব্দটা 'বাবা'। যাক আমাদের দেশের ডাক ব্যবস্থা স্বর্গের থেকে চিঠি ডেলিভারি করতে সক্ষম হয়নি তাই বাবার চিঠি যখন, তা যার বাবারই হোক, আমার বাবার নয়। হঠাৎ অতি বিলম্বিত থেকে আটগুণে চিঠিটা পড়তে থাকলাম। সর্বনাশ, এ কি করেছেন ভদ্রলোক। ছেলেকে বুদ্ধি দিয়ে লিখেছেন, 'তোমার উস্তাদ, উস্তাদমা, অন্নপূর্ণা দিদি, আলিদা এবং রবিশঙ্করকে একটু

তেলাবে। একটু মন জুগিয়ে চললে তবেই কিছু শিখতে পারবে। যত তাড়াতাড়ি পার ব্যাপারটাকে গুছিয়ে চলে এসো,' ইত্যাদি।

অন্য কোন ছেলের ব্যাপারে বাপ লিখলে আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু এ ছেলেটা তো ভালো, আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হয়। মেধাবী, অনুধাবন শক্তি আছে, আচার ব্যবহারেতেও নম্র, তাহলে তার বাবা কেন তাকে এমন কুশিক্ষা দিচ্ছেন? আমার কাছে দুটো প্রবল প্রশ্ন উপস্থিত হলো, তাহলে কি অজ্ঞানতায় পিতাও পুত্রের ক্ষতি করতে পারেন? আর দ্বিতীয়তঃ এও মনে হলো, ছেলে এখন পর্যন্ত যে রূপ দেখিয়েছে সেই এহবাহ্যটি কি অভিনয় মাত্র?

এই নাটকে আমার ভূমিকাটা কি? ওর কৃতকর্মের ফল আমাকে কতটা ভোগ করতে হবে? আর বাবার আইনে দুটোই চলে। বিচারটা কিন্তু একটাই। সেটা হল ফাঁসি। হয়ত ওর বদলে আমাকে ফাঁসিতে চাপতে হবে, আর না হলে ওর ফাঁসির পরোয়ানা পৌঁছে দেওয়া হবে আমার কাজ। তৃতীয় পন্থা যেটা আছে সেটা সময় সাপেক্ষ। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ক্রোধের উপশম। দ্বিতীয় পন্থাটা ভেবে উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম হাতে চিঠিটা নিয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু বাবার ধমকের দাপট, 'চিঠিটা আমিই দেব নিখিলকে।'

অন্যান্য চিঠিগুলো তড়িৎ গতিতে খুললাম, চটপট কি উত্তর দিতে হবে জেনে নিলাম। বললেন, 'উত্তর লিখে রাখ কিন্তু আজকে চিঠি ফেলা হবে না অর্থাৎ বাইরে যাবে না।' বুঝতে একটুও দেরী লাগল না। বুঝলাম উনি চান না চিঠি ফেলার ফাঁকে আমি নিখিলকে কোনরূপ পূর্বাভাষ দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিই। মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে এলাম। মনের ভিতর স্বগতোক্তি চলছে এই বসন্তে আজ নিখিলের কপালে বর্ষা আছে। কিন্তু আমি তো অসহায়।

সারাদিন কাটল আমার আনমনা, আর বাবার কাটল স্বগতোক্তিতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেলের পাট শেষ হল সন্ধ্যার আজানে। বাবা আজ এই প্রথম ব্যাণ্ড পার্টিতে গেলেন না, বাবা এমনিতে তো পাহাড়ের শিখর। খুশী থাকলে পেঁজা বরফে ঢাকা হিমালয়ের মতো, আর মাথা গরম হলে ভারতের উষর কটিবন্ধ বিন্ধ্যাচলের মতো। আজ সকাল থেকে আমি দ্বিতীয় রূপটাই দেখছি। মৌনতা, ভাবকে রুখতে পারে না, পারে ভাষাকে মাত্র।

নিখিলকে দূর থেকে সেতার হাতে আসতে দেখলাম। মনের ভেতরটায় আলাপের বদলে তখন ঝালা চলছে। চটকরে বাবাকে প্রণাম করে ঘরে চলে এলাম। দরজা দিয়ে নিখিল ঢুকল। ঘরে আসার আগেই ঘড়ি দেখেছিলাম। সন্ধে ছ'টা বেজে গেছে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা। একে সকালের চিঠি তার ওপর দেরীতে আসা। এ হলো টেনিসের ডবল ফল্ট। বিশ্বস্ত ফুটোয় চোখ রাখলাম। আমার দুজন গুরুভাই ঠাট্টা করে বলতেন, 'যতীনের থার্ড আই'।

বাবা প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'দেরী কেন?' প্রশ্নটা বডিলাইনের বিমারের মত নিখিলের উপর পড়ল। আম্‌তা আম্‌তা করে নিখিল তখন 'ডাক' করার চেষ্টা করেছে। বাবা ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছেন, 'যে সময়ের বেতালা, সে লয়েও বেতালা। তুমি তো জানো, আমি

নমাজ পড়বার পরেই শেখাতে আরম্ভ করি, সেখানে কোথায় দশ মিনিট আগে এসে মিলিয়ে তৈরী হবে, তা না করে এলে দশমিনিট দেরীতে। এ করলে হয় না। আজ তোমাকে শেখাব না এই জন্য, যাতে ভবিষ্যতে তোমার এটা শিক্ষা হয়।'

আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম যা হোক চিঠি প্রসঙ্গটা বোধ হয় চাপা পড়ল, বা আসবে ছোট ফরমাইসি বন্দিসের মতো, কিন্তু আজ বাবা যন্ত্রে নয়, সুরে নয়, স্বরে দুটো রাগই, সিলসিলাবার অর্থাৎ ক্রমবদ্ধভাবে বাজালেন। প্রথমটা না শেখান পর্ব; দ্বিতীয়টা চিঠিপর্ব। প্রথমটা ছিল পূর্বাঙ্গে শুদ্ধ স্বর আর উত্তরাঙ্গে কোমল স্বর, আর দ্বিতীয় পর্বটা হল পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ উভয়েই শুধু শুদ্ধস্বর। কোমল স্বরের চিহ্নও নাই।

বাবা বললেন, 'আজকে আমি গিয়েছিলাম পোষ্টঅফিসে, আর অন্যমনস্কভাবে নিজের চিঠি ভেবেই তোমার চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলেছি। নাও পড়।' আমার তখন ভয় পাওয়ার পালা। ভাবলাম, এ কথাও যেন না বলে বসেন যতীনকেও পড়িয়েছি। যাক, বললেন না তা। ওদিকে চিঠি পড়তে পড়তে নিখিলের তখন চেহারার রং বদলাচ্ছে। লজ্জার লাল থেকে হতাশার সাদা পর্যন্ত? এ যেন সাত রং-এর পারমুটেশান। চকিতে চমকে রঙ্গ বদলাচ্ছে। নিরুত্তর নিখিল কি বলবে বুঝতে পারছে না। সকালের আক্ষেপের সব কথাই তখন বাবা ওকে শুনিয়ে ফেলেছেন। যা যা আমি পরশ্মৈপদী শুনেছিলাম। চোখের সামনে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ছবিটা ভেসে উঠল। গিলোটিনের খাঁজে একটা মানুষ, আর উপরে দোদুল্যমান খাঁড়া, কখন যে শুলে পড়বে জানে না। কিন্তু আজকে বাবাকে শঙ্করের শিবরূপে দেখলাম। রুদ্র রূপটা প্রকাশ হোল না।

বাবা বললেন, 'তোমার বাবার অপরাধে তোমাকে শাস্তি দেব না। কারণ উনি এরকম করতে অভ্যস্ত এটা আমি আগেই শুনেছি। কিন্তু মনে রাখবে, আমার কাছে যে সরলভাবে থাকে না, তাকে আমি শেখাই না। আজকের যুগে অনেকে মতলব হাসিল করবার সময় বিনয়ী হয় ভিজে বেড়ালের মত, কিন্তু সুযোগ এলেই ভিজে বেড়াল সব ভুলে যায়। এই ভেকধারীদের দেখলে আমি ত্রস্ত হই। আজকের যুগে ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না। তাই এত কৌশল। তোমাকে আমি অত্যন্ত সরল বলে জানতাম। এই ভেকটাও কি কোলকাতা থেকে শিখে এসেছ? একটা কথা মনে রাখবে, মন পরিস্কার না হলে আমি শেখালেও তুমি শিখতে পারবে না।' তারপরই নিষ্ক্রমনের আদেশ হল, 'এখন যাও।'

পাকাপাকি বিদায়ের থেকে ক্ষণিকের বিদায় যে কত আরামদায়ক, সেটা নিখিলের মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। উত্তাল সমুদ্রেতে যে নাবিক হাল ভেঙ্গে দিশেহারা হয়েছিল, তার চোখে যেন সবুজ ঘাসের দ্বীপ দেখা দিলো।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সারাদিনের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে মনে হোল ঘুমটা যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। মাথাটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। পরের দিন সকালে উঠেই মনে হোল জ্বর ভাব। কোনোরকমে সকালে যথারীতি সব কাজ করেছি, বাজিয়েছি, পোষ্ট অফিস থেকে চিঠি এনেছি, ছেলেদের পড়াবার সময় একটু পড়িয়েই বাবাকে লেখা চিঠির উত্তর লিখেছি, তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি আমার বিছানার

সামনে বাবা। চমকে উঠে বসেছি, হঠাৎ কপাল থেকে একটা ভেজা ন্যাকড়া আমার চোখের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে আরে কি করছ? শুয়ে থাক, তোমার অনেক জ্বর হয়েছে। অনেকক্ষণ তুমি বেহুঁস হয়েছিলে। তা তোমায় জলপট্টি দিচ্ছিলাম।' বাবাকে দেখেই আমার জ্বর পালিয়ে গিয়েছে। বাবাকে বললাম, 'আপনি আপনার ঘরে যান।' বাবা নিজের হাতে এতক্ষণ জলপট্টি দিয়েছেন, ভাবতেও নিজেকে অপরাধি মনে হল। বাবা বললেন, 'আরে তোমার জ্বর হয়েছে, আমি তোমায় না দেখলে কে দেখবে? তুমি চুপ করে শুয়ে থাক আমি জলপট্টি বদলে দেব।' বললাম, 'জলপট্টি দরকার হলে আমি নিজে দেব আপনি দয়া করে যান। আপনি না গেলে আমার জ্বর আরো বেড়ে যাবে। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, বুদ্ধা ঔষধ নিয়ে আসবে।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা ঝটতি থারমোমিটার এনে আমাকে বললেন, 'দেখো তো কত জ্বর?' থারমোমিটারে দেখলাম একশো চার ডিগ্রি জ্বর।

জ্বর হলে বাবা যে কত ঘাবড়িয়ে যান তা তো আমি জানি। তাই বাবাকে বললাম, 'বেশী জ্বর নয়, চিন্তার কিছু নাই।' এ কথা বলেই ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখতে লাগলাম। বাবা বললেন, 'তোমার বাড়ীর ঠিকানা দাও, একটা টেলি করে আসি।' বললাম, 'কি দরকার, ডাক্তারবাবু চিঠি পেয়েই আমাকে দেখতে আসবেন।' বাবা বললেন, 'তোমার এই অবস্থায় যদি কিছু হয়ে যায়, তোমার মা এবং দাদাদের কাছে কি জবাব দেব? চিঠি কতদিনে যাবে ভগবান জানেন, তাই ঠিকানা দাও টেলি করে আসি।' ডাক্তারবাবুকে লিখে দিলাম, এত যে জ্বর হয়েছে তা বাবাকে যেন না বলেন এবং বাবাকে বলতে যে ভয়ের কিছু নাই।

বাবার কাছেই শুনলাম, যখন স্নান করতে যাই নি একথা শুনেছেন, আমার ঘরে এসে দেখেছেন ঘুমিয়ে আছি। কপালে হাত দিয়ে বুঝেছেন জ্বর, তাই জলপট্টি দিয়েছেন। ঘড়ি দেখে বুঝলাম প্রায় আধঘন্টার উপরে আমার ঘরেই বাবা রয়েছেন, তার মানে বাবার খাওয়া এখনও হয়নি। তৎক্ষণাৎ বাবাকে অনুনয় করে বললাম, 'আপনি খেয়ে নিন। আমি নিজেই জলপট্টি দেব।' এরপর বাবা চলে গেলেন। তারপর আর কিছু মনে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে, দেখলাম আমার খাটের সামনে চেয়ারে বসে আছেন ডাক্তার গোবিন্দ সিং, এবং বাবা উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসান দিয়ে বাবাকে বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই, ম্যালেরিয়া হয়েছে। এক দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।' ডাক্তারবাবু অতঃপর বাবাকে বললেন নিজের ঘরে যেতে। তাঁর আশ্বাস পেয়ে বাবা চলে গেলেন।

যাই হোক, দুদিনেই ঠিক হয়ে গেলাম। নিজেকে খুব দুর্বল মনে হতে লাগল। কিন্তু পাছে বাবা ঘাবড়ে যান, তাই মনের জোরে সব কাজই করতে লাগলাম।

মৈহারে এসেছি প্রায় ছয় মাস। মৈহারে আসার কিছুদিন পরেই বিশেষ করে আশিস, ধ্যানেশ, বেবী এবং শুভর কয়েকবার ম্যালেরিয়া হয়েছে দেখেছি। মৈহারে মশার রাজত্ব। তাই এখানে একটাই রোগ ম্যালেরিয়া। যদিও মাসের মধ্যে দু'বার করে প্রত্যেক বাড়িতে হাসপাতাল থেকে ডিডিটি স্প্রে করা হোতো, তাহলেও মৈহারে এসে রোজ আমাকে

হাসপাতালে যেতে হয়েছে। বাবার নাতিদের নাড়ীর কি যোগ ছিলো জানি না, একজনের ম্যালেরিয়া হয়ে ভাল হলেই, পরের দিন আর একজনের হ'তো। আবার একজনের ভালো হলে আর একজনের হ'তো। মৈহারে রোজ আমাকে পোষ্ট অফিস গিয়ে একবার হাসপাতাল যেতে হ'তো। ঠিক সাইকিলিক অর্ডারে এক একজনের জ্বর হ'তো। আর আমাকেও রোজ হাসপাতালে যেতে হ'তো। ডাক্তার গোবিন্দ সিংকেও বাড়ীতে প্রায় নিত্য আসতো হ'তো।

বাড়ীতে নাতিদের ম্যালেরিয়া হলে বাবা যে কী ভীষণভাবে নার্ভাস হয়ে যেতেন তা আমার এই কয়েক মাসে জানা হয়ে গিয়েছে। কারুর জ্বর এলে এক ঘন্টা পরে পরে নাতিদের ঘরে যেতেন এবং রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'আরে কামচোর, জ্বরের বাহানা করে শুয়ে আছস যাতে বাজনা না বাজাতে হয়।' কিন্তু এই কথা বলার পর, আমার কাছে এসে বাবা বলতেন, 'লক্ষণ ভাল নয়। খুদা আমার ভাগ্যে কি লিখেছেন তিনিই জানেন। আশ্চর্য, শুয়ার কে বচ্চে আলি আকবর একবার আসে না, তুমি কি এইজন্য মৈহারে এসেছ? আমার নাতিদের জন্যে ডাক্তারের কাছে রোজ গিয়ে ঔষধ আনবার জন্য?' একথা শুনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিঘন্টায় একবার নাতিদের ঘরে গিয়ে বলতেন, 'কি রে এখনও ঠিক হোলো না, কামচোর।' পরক্ষণেই আমার কাছে এসে বিলাপ করতেন। এ কথা শুনলে সকলেই অবাক হবেন, আমার মৈহারে থাকাকালীন যতদিন বাবার নাতিরা ছিল, হাসপাতাল যাওয়াটা আমার কাছে দৈনন্দিন একটা কাজ ছিলো। যার জন্য এই ডাক্তার গোবিন্দ সিংহের কাছে বাবা খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন। এরজন্য ডাক্তারবাবু যখনই এসে বাবার কাছে বাজনা শুনতে চাইতেন, বাবা বাজনা বাজিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করতেন। বাবা কারুর কাছে কোন উপকার পেলে তার চতুর্গুণ কিছু দিয়ে নিজেকে ঋণমুক্ত হবার চেষ্টা করতেন।

যেহেতু আমি হাসপাতালে যেতাম, তার জন্য অসুখ হলেই আমাকে সেইসময়ে শিক্ষা দিতেন একটু বেশীই। বকুনি খেতাম তখন খুব কম। সুতরাং নাতিদের অসুখ হলে একদিক দিয়ে আমার কাছে তা আশীর্বাদস্বরূপ দাঁড়াত। এই অসুখ হলেই বাবার যে মনোভাবটা হতো, সে ব্যাপারটা মৈহারে আসার কিছু দিন পরই অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। মৈহারে যতদিন আশিসরা ছিল আমার থাকাকালীন, সেই একই রকম বাবার অস্থিরতা দেখেছি ভেতরে, কিন্তু বাইরে তাঁর অন্যরূপ।

মৈহারে যদিও সন্ধের সময় নিত্য ধুনো দেওয়া হ'তো, মশারিও ছিল তাহলেও ম্যালেরিয়াতে বাবার নাতিরা বরাবরই ভুগতো। সকালে উঠবার পরেই মা বলতেন, আশিসের শরীরটা রাত্রেই ভাল ছিল না, সকালে জ্বর জ্বর লাগছে। গায়ে হাত দিলেই বুঝতাম জ্বর এসেছে। তার একটু পরেই বাবা জানতে পারতেন, কেননা আশিস বাজাতে বসেনি। এরপরই ঘন ঘন একবার আশিস বাজাতে বসে নি বলে তার ঘরে, আর একবার আমার ঘরে, বাবার তখন দুটো মূর্তি দেখেছি। সকালে গিয়ে হাসপাতাল থেকে ঔষধ এনে দেব, আর হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ডাক্তার একবার দেখে যাবেন। এবং ডাক্তার এলেই বাবা ঘন ঘন পায়চারি করবেন। ডাক্তারবাবুর দেখা হয়ে গেলেই বাবা জিজ্ঞাসা

করবেন, 'কি হয়েছে?' তিনি উত্তরে হেসে বলতেন, 'কিছুই ঘাবড়াবার নাই। পায়খানা ঠিক নিয়মিত হয় না। ওষুধ দিয়ে পায়খানা করানো আমার নীতি বিরুদ্ধ। ডুস দিয়ে পায়খানা করাতে হবে।' তিনি আশ্বাস দিয়ে বলতেন, শীঘ্রই কম্পাউণ্ডার পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর চলে যাবার পরই বাবার গলার আওয়াজ বেরোবে, আরে শুয়ার কে বাচ্চে, দিনরাত ভরবে, অথচ পায়খানা হয় না। এত বড় বেশরম, যে কম্পাউণ্ডারের সামনে ডুস নিতে লজ্জাও করে না।' এই কথা চলবে কিছুক্ষণ। কম্পাউণ্ডার চলে গেলে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত থারমোমিটার দেখে বাবাকে বলতে হবে, কত জ্বর। আমাকে বারবার এসে বলবেন, 'ওষুধ খাবার পরই জ্বর কেন কমছে না। লক্ষণ ভাল নয়।' কিন্তু আশিসের ঘরে গিয়েই অন্য কথা বলবেন। তাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, 'আরে কামচোর, যাতে বাজাতে না হয় তার জন্য নখড়া করে জ্বরের ভান করে শুয়ে আছস' এরপরই আলি আকবরের গুষ্টির ষষ্ঠিপূজা হবে। আশিসকেই বলবেন, 'তোর বাবাও এতবড় শুয়ার কে বচ্চে, এখানে রেখে নিজে আনন্দে আছে। এত খরচা কোথা থেকে আসে, সে দিকে তোর বাবার খেয়াল নেই। যতীন কি তোর বাবার চাকর যে দিনরাত ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ওষুধ এই সব করবে? তোরাও কতবড় নিমকহারাম যে কাকার এই সেবা নিচ্ছিস?'

এই পর্বটা কিছুক্ষণ চলবে। তারপর আমাকে বলবেন, 'তুমি কি এসেছ এইসব করতে? শুয়ার কে বচ্চেকে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। হাসপাতালে গেলে জব্দ হবে।' তিন চারদিন পরে সব ঠিক হয়ে যেতো।

বাবার নাতিদের ছিলো একচেটিয়া রোগ। অন্নপূর্ণা দেবীর মাঝে মাঝেই হিস্টিরিয়া হোত। ডাক্তার আসতেন। বাবা ঘাবড়াতেন। কিন্তু একদিন পরেই অন্নপূর্ণা দেবী ঠিক হয়ে যেতেন। নীরবে রুগীদের ওষুধ আনা, পথ্যের ব্যবস্থা করা, এসব দেখে বাবা আমাকে রাত্রে খুব শেখাতেন। বকতেনও কম। এইভাবে দিন চলে যেত।

১৩

বইপড়াটা অন্নপূর্ণা দেবীর নেশা ছিল। ম্যাগাজিন দেখে ভাল বইয়ের নির্বাচন আমিই করতাম। তারপর বই পাঠাবার জন্য লিখতাম, ভি. পি. করে পাঠিয়ে দিতে। মৈহারে অন্নপূর্ণা দেবী থাকাকালীন নূতন নূতন নভেল পড়বার সুযোগ পেতাম।

আমার দাদা হীরেন ভট্টাচার্য 'দোসরা মে', সকালবেলায় আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে মৈহারে এসে হাজির। দাদার সঙ্গে সেই বন্ধুকে দেখে খুব আনন্দ হল। সঙ্গে এক বিধবা মহিলাকেও এনেছে বাড়ীর রান্না করার জন্য।

দাদা এবং বন্ধুকে বাবা আপ্যায়িত করলেন, তাতে দাদা ও বন্ধু সঙ্কুচিত হলো। কাজের বিধবা মহিলাটিকে দেখে বাবা খুব খুশী হলেন। মাথায় ঘোমটা দেখে বাবা বলে উঠলেন, আহা আমার মা জননী এসেছে। এবারে মায়ের হাতের ভাল রান্না খাব। মায়ের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কোথায় কি আছে সব বুঝে নিয়ে নিজের বাড়ী ভেবে থাকবে। আজ তোমার মা'র কাছে সব বুঝে নিক, পরের দিন থেকে মাকে সাহায্য করবে।' এই কথা বলার পরই বাবা গিয়ে মাংস এবং গরম জিলিপি নিয়ে এলেন। আমার দাদার সঙ্গে বাবা খুব গল্প করতে লাগলেন।

দুপুরের খাবার সময় একটা বেশ মজার ব্যাপার হলো। এই মজার ব্যাপারটা বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ব্যাপারটা হল এই যে মৈহারে আসা অবধি দেখেছি একটি চাকর সারাদিনরাত বাড়ীতেই থাকে। একটা ঠিকে চাকরও আছে। সকাল এবং বিকেলে আসে; গাছে জল দেয়, মাটি কোপায়, এককথায় বাগানের সব দেখাশুনা করে অর্থাৎ মালী। একটি গোয়ালা আছে, যে দুই বেলা আসে দুধ দোওয়ার জন্য এবং গরু মহিষকে বিকেলে চরাতে নিয়ে যায় এবং খাবার দেয়। এছাড়া একটি চাকরাণী আছে, যে দুইবেলা বাসন মাজে এবং বাড়ীতে ঝাঁট দেয় এবং মায়ের কাজে কিছু সাহায্যও করে।

এই মেয়েটা একদিন সকালে অনুপস্থিত। বাবার চোখ এড়াল না। বাবা নিজেই ঘর ঝাঁট দেবার পর, ভেজা কাপড় দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করলেন। বাবার দেখাদেখি আমিও আমার ঘরটি ঝাঁট দিলাম। তারপর ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করলাম। বাবা আমার এই কাজটি দেখে খুশী হয়ে বললেন, 'কর্মাধীন ভগবন আর কর্মহীন পশু।' (বাবা ভগবানকে ভগবন বলতেন।) অর্থাৎ যে সব সময় কর্মের মধ্যে থাকে, নিজের কাজ নিজে করে সেই ভগবানের কৃপা পায়; আর যে নিজের কাজ আলস্যভরে নিজে করে না, অন্যের প্রতি নির্ভর করে থাকে, সে পশুর সমান।

দুপুরে খেতে বসে হঠাৎ বাবা বললেন, 'আমরা বাঙ্গালীরা মেয়েদের ওপর বড়ই অত্যাচার করি। আমরা ডাঁটা চচ্চড়ি, মাছ খেয়ে চিবিয়ে মাটিতে ফেলি। বাড়ীর মা মেয়ে বা স্ত্রী এই সব ওঠায় এ হল মহাপাপ। কারুর মুখে চেবানো জিনিষ ওঠাতে কি ভাল লাগে? ঘেন্না লাগে না? কিন্তু মেয়েরা অম্লানবদনে এসব করে থাকে।' আমি নিজের মনে ভাবলাম কথাগুলি বাবা ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেক বাড়ীতেই এটা দেখে এসেছি। কিন্তু মৈহারে এসে বাবাকে দেখছি কিছু রাখতেন না। এছাড়া মাছের কাঁটা, ডাঁটা চচ্চড়ি চিবিয়ে খাবার শেষে, সেগুলি নিজের হাতে পাতের মধ্যে রেখে উঠবার সময় সঙ্গে সঙ্গেই চাকরানি থালা উঠিয়ে নিয়ে যেত। বাবার দেখাদেখি আমিও সেই প্রকার করতাম। কখনও খাবার ফেলতাম না। এ ছাড়া মাছের কাঁটা ইত্যাদি সব উঠিয়ে থালার উপর রাখতাম।

খাবার শেষে হঠাৎ দেখি বাবা থালাটি নিজের হাতে উঠিয়ে বাইরে থেকে মাটি নিয়ে বাসনটি ধুলেন। বাবার দেখাদেখি যখন আমিও বাসন ওঠাতে গেলাম তখন বাবা আমাকে বললেন, 'আরে আরে, তোমাকে বাসন মাজতে হবে না। ঠিক আছে বাসনটা যখন হাতে উঠিয়েছ দালানে রেখে দাও। বাসন তোমার মা মেজে দেবে, তুমি হলে ব্রাহ্মণ।'

বাবার পছন্দ কয়েক দিন থেকেই কিছু কিছু বুঝেছি সুতরাং কোন কথা না শুনে আমিও মাটি দিয়ে বাসন মাজলাম। বাবা যখন পুনরায় বারণ করতে যাচ্ছেন, তখন বললাম, 'এই বৃদ্ধ বয়সে মা আবার বাসন কেন মাজবেন?' বাবা না না করলেও বুঝলাম খুশীই হলেন। এখন বুঝলাম বাবা কেন এই গৌরচন্দ্রিকা এতক্ষণ ধরে করছিলেন। বাবা বলতে সঙ্কোচ করছিলেন, নিজের থালা নিজে ওঠাও ও মাজো। যাক, পরের দিন চাকরানি আসার ফলে, খাবার পর বাবা নিজের বাসনটি দালানে রেখে দিলেন। আমাকে বললেন, 'আজ বাসন মাজতে হবে না, চাকরানি বাসন মাজবে। খাবার খেয়ে নিজের থালা যথাস্থানে রেখে

দেওয়াই ভাল। যে কাজটা নিজে করা যায়, সেটা করাই ভালো, পরের উপর নির্ভর করলে মানুষ অলস হয়ে যায়। সেইদিন থেকে অভ্যাস হয়ে গেল। খাবার খেয়ে নিজের থালা বারান্দায় একস্থানে রাখায়, বাবা, আমি, আশিস এবং সকলেই এটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। দুপুর বেলায় আমার দাদা এবং বন্ধুর খাওয়ার সময় একটা বেশ মজার ব্যাপার হল। খাবার খাওয়ার পর থালাটা আমরা সকলেই উঠিয়ে দালানে রেখে দিই এ কথাটা আমার দাদা এবং বন্ধুকে বলে দিয়েছিলাম। একটা খাটে যেমন বাবা বসে খান সেইরকমই বসেছেন। অন্য খাটে আমার দাদা, বন্ধু এবং আমি বসেছি খেতে। খেতে বসে বারবার একটা কথাই বাবা ওঁদের বলতে লাগলেন, 'আপনারা কত ভাল ভাল জিনিষ খান, এ-খাবার ভাল লাগবে না, কি আর করবেন কষ্ট করে কোন রকমে পেট ভরান।' দাদা যতবার বলে খুব ভাল রান্না, বাবা ততবারই বলেন, এ খাবার মুখে দেবার মতো নয়।' আমার দিকে তাকিয়ে বাবা আমাকে ইশারায় কিছু বললেন। আমি বুঝতে পারলাম না, বাবা কি বোঝাতে চাইছেন। বাবা বললেন, 'বুঝতে পারলে না?' খাওয়া শেষ হতেই বাবা উঠলেন কিন্তু থালা ওঠালেন না। অথচ আমি, দাদা এবং বন্ধু যেই থালাটা উঠিয়েছি, বাবা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে এত করে বোঝালাম, তবু বুঝলে না। আজ আমার বাড়ীতে অতিথি নারায়ণ এসেছে তারা বাসন ওঠাবে?' আমার দাদা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, নিজের হাতে থালা ওঠানো তো ভালো।' বাবা বললেন, 'না, না, আপনাদের ওঠান উচিত নয়, যতীনকে শিখিয়েছি নিজের কাজ নিজে করা ভালো। আমি নিজেও ওঠাই, তাবলে কি আপনারাও ওঠাবেন?' এ কথা কয়েকবার চলল। খাবার শেষে বাবাকে যখন তামাক দিলাম, তখন বাবা বললেন, 'আরে তোমাকে এত করে বোঝালাম আজ থালা উঠিও না, তা সত্ত্বেও ওঠালে। তোমার দাদা কি ভাববেন?' উত্তরে বললাম, 'দাদা কিছুই ভাববেন না। খুব খুশীই হয়েছেন। আমার দাদা ছোট থেকে নিজের গেঞ্জি, রুমাল ইত্যাদি নিজে কাচে।' বাবা ইসারায় যে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, থালা না ওঠাতে, এতক্ষণে তা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পেরে হেসে ফেললাম।

বিকেলবেলায় বাবা, দাদা এবং বন্ধুটিকে নিয়ে ব্যাণ্ডে গেলেন শোনাতে। বাবা বাড়ীতে এসে নমাজ পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খের আওয়াজ শুনলাম, বুঝলাম আমার বন্ধু যে রাঁধুনি নিয়ে এসেছে সেই বাজিয়েছে। শঙ্খের আওয়াজ শুনে বাবা বললেন, 'দেশে মায়ের কথা মনে পড়ছে। এই শঙ্খধ্বনি শুনলে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এই আওয়াজ মঙ্গলের প্রতীকচিহ্ন। আজ থেকে আমার ভাল সময় এসেছে।'

ঠিক এই সময়ে নিখিল এল যন্ত্র নিয়ে। বাবা তাকে, আমার দাদা এবং বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, বাজাতে বললেন। নিখিল বাজাতে লাগল। বাবা বললেন, 'আরে শুয়ার কে বচ্চে, মল, মল।' এরপর বাবার বকুনি বাড়তেই লাগল এবং কিছুক্ষণ দেখানোর পর বললেন, 'এই মীড়গুলো সুরে ধীরে ধীরে ঠিক করে তারপর এসো।' এরপর আমাকে বললেন, 'বাজাও।' আমার তো অবস্থা খারাপ। দাদা এবং বন্ধুর সামনে বকুনি খাব ভেবে, ভয়ে ভয়েই বাজাতে লাগলাম। অবাক হলাম, বাবা আজ আমায় একটুও বকলেন না।

বুঝলাম দাদা এবং বন্ধু এসেছে বলে আমাকে আজ বকলেন না। এরপর আশিসকে নিয়ে বাবা বাজালেন। আমার দাদা এবং বন্ধু রাত্রের ট্রেনেই কাশী চলে যাবে, বাবাকে আগেই বলেছেন। বাবা বারবার বললেন কয়েকদিন থাকতে, কিন্তু দাদা বললেন, 'রাত্রেই যাবো।'

রাত্রে খাবার পর দাদাকে বললাম, 'আমার একটা নতুন সরোদ না হলে চলবে না। যে যন্ত্রটি বাজাই খুব খারাপ, তার অবস্থা। সরোদ করাতে তিনশো টাকা লাগবে, রবিশঙ্কর বলেছে। দাদা আমাকে তিনশো টাকা দিয়ে উপরন্তু হাত খরচের জন্য দুশো টাকা আরো দিল। দাদার ট্রেন রাত্রি বারোটায়। কিন্তু, খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই দাদা এবং আমার বন্ধুকে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। বাবার নিয়মানুবর্তিতা দেখে আমার দাদা মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার বন্ধু, শিক্ষাকালীন নিখিলকে বকা দেখে আশ্চর্য হয়েছে। আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিও কি এরকম বকুনি খাও।' দাদা এবং আমার বন্ধুকে আমার মৈহারে আসার পর থেকে সবরকম অভিজ্ঞতা বললাম। শেষে বললাম, বকুনি খাওয়া তো দৈনন্দিন ব্যাপার, কিন্তু একটা এমন জিনিষ দিনরাত খাওয়ান বা বলেন, শুনলে চমকাতে হবে। আসলে বাবার একটা মুদ্রা দোষ ছিল। রেগে গেলে হিন্দীতে একটি অশ্লীল শব্দ বলেই বলতেন, আমার ওইটা খাও, কিংবা ওই অশ্লীল শব্দটি বলে বলতেন, বাজাও? আমার বন্ধু শুনে হেসে বলল, এই শব্দ প্রয়োগ করেন? উত্তরে বললাম, বাড়ীর সকলকে বলেন বটে তবে বাইরের লোকের সামনে কখনও কথাটা প্রয়োগ করেন না। কাশীতে যে পরিবেশে আমরা মানুষ হয়েছি, সেই পরিবেশ থেকে মৈহারে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা শুনে বন্ধুটি অবাক হল। তবে মৈহারের গাছের সবুজ সমারোহ, ওই নিয়মানুবর্তিতা নির্জন পরিবেশ দাদা এবং বন্ধুকে মুগ্ধ করল।

মৈহারের কাছে সাত্‌না থেকে মাঝে মাঝে একদিনের জন্য সনৎ এবং রঞ্জিৎ আসে বাবার কাছে শিখতে। সনতের মুখে শুনেছি যে তার বাবা যতীন ব্যানার্জী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন সাতনাতে। বাবার কাছেই প্রথমে ভায়োলীন শিখেছেন। সনতের মাকে বাবা কন্যার মত স্নেহ করেন। সেই হিসাবে তার বাবাকে, বাবা জামাইবাবাজী বলে সম্বোধন করেন। হঠাৎ সনতের বাবা যতীন ব্যানার্জী এবং তাঁর স্ত্রী সকালে এসে হাজির। আসার কারণ সারদা দেবীর দর্শন, এছাড়া বাবাকে অনেকদিন দেখেন নি। বাবা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যদিও আমরা উভয়েই দুজনে দুজনের চেহারা দেখিনি কিন্তু উভয়ের কথা শুনেছি।

বাবা সনতের মাকে উপরে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং ডাক্তার যতীন ব্যানার্জীকে আমার ঘরেই নিয়ে এলেন। তাঁর কাছে বাবার বহু গল্প শুনলাম। সাতনা থেকে মৈহারে এসে সোজা সারদা দেবীর দর্শন করে এসেছেন। গল্প করে খুব আনন্দ পেলাম, যেহেতু গল্পের বিষয় বস্তু বাবা। যতীন ব্যানার্জী বাবাকে দুপুরে খাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা আপনার জীবনের অনেক কথা তো শুনেছি, আপনার জীবন তো মহাভারত, কিছু নতুন ঘটনা শোনান।' বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার আর কী জীবনী শুনবে?' এ কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কৌতূহল হলো, তাই বাবার চিঠি লেখার প্যাড থেকে, একটা কাগজ ছিঁড়ে নিলাম। বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাগজ ছিঁড়লে কেন?' উত্তরে বললাম, 'নতুন কথা আপনি কিছু বললে লিখে নেব।' আজ বাবার মেজাজটা খুব ভাল দেখলাম।

তামাক খাচ্ছেন আর বোধহয় ভাবছেন, আত্মজীবনী কোথা থেকে শুরু করবেন। যতীন ব্যানার্জিই প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আপনার বয়স কত হলো?' উত্তরে বাবা বললেন, 'এটুকু আমার মনে আছে বাংলা ১২৯৩ সনে কুমিল্লাতে ভীষণ ঝড় হয়। এরকম ঝড় আর কখনও হয়নি। তখন আমার বয়স ছিল ছয় বৎসর। তাহলেই হিসেব করে দেখো, আমার কত বয়স এখন চলছে?' হিসেব করে দেখলাম, বাবার বয়স তাহলে হওয়া উচিত একাত্তর। অথচ বাবার মুখে এসে অবধি শুনছি তিরাশি চলছে। ইংরেজী বই 'মিউজিসিয়ান অফ ইণ্ডিয়া' যা বাবাকে পড়ে শুনিয়েছি এবং বাবা সেই বইটিকে প্রমাণ্য বলে স্বীকার করেছেন, সেই বইটির হিসাব অনুযায়ী বাবার বর্তমান বয়স ১৯৫০ সালে হওয়া উচিত উনসত্তর বৎসর। আমার মনে তখন বিরাট প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্নটা মৈহারে এসে হয়েছিল যখন বাবা বলেছিলেন বিরাশী বৎসর।

যে মুহুর্তে বাবা বললেন বাংলা ১২৯৩ সালে বাবার বয়স ছিল ছয় বৎসর, হিসাব করে বাবাকে বললাম, তাহলে তো আপনার বয়স এখন একাত্তর চলছে, অথচ আপনি বলেন তিরাশী বৎসর। আমার কথা শুনেই বাবা রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'আরে আরে বলে কী? আমার তিরাশী বৎসর চলছে, আর তুমি কি না বলছ একাত্তর চলছে?' আমিও বললাম, 'এ তো সহজ গণিত, আপনার সন যেটা বলছেন সেটা যদি ঠিক হয়, তাহলে আপনার বর্তমান বয়স একাত্তরই চলছে।' বাবা রেগে বললেন, 'আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, ১২৯৩ সনে যখন কুমিল্লায় ঝড় হয়, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বৎসর। এই সাধারণ গণিতটাও করতে পার না? বুঝেছি নিশ্চয়ই টুকে পাস করেছ! কি করে এম.এ. পাশ করেছ? বাবার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা যে কী কঠিন ছাত্রদের পক্ষে সেটা বাবার অতি সাধারণ ছাত্রও জানে। কিন্তু স্পষ্ট কথা বলতে ছোটবেলা থেকেই আমি অভ্যস্ত। তাই বললাম, 'এই সাধারণ গণিতের জন্য এম.এ. পাশের দরকার হয় না। আশিসকে সাধারণ যতটুকু অঙ্ক শিখিয়েছি, সেই বলতে পারবে।'

এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কাগজটা যতীন ব্যানার্জিকে আমি দেখালাম। বললাম, 'আপনিই বলুন না, বয়সে বাবার হিসাবে গণিতটা ঠিক কী না।' যতীন ব্যানার্জি দেখলেন আমার কাগজটা, তারপর বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে আমাকে চোখ টিপে, বাবাকে বললেন, 'ছাড়ুন বয়সের কথা, অন্য কিছু বলুন।' বাবা একমিনিট আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। এই তাকানোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। যার প্রতি বাবা চটে যেতেন একবার ডান চোখটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিতেন। দশ সেকেণ্ডে অন্ততঃ ছয়বার এইপ্রকার আমার দিকে তাকিয়ে, যতীন ব্যানার্জিকে, বললেন, 'আর কী বলব? আমার বয়স কি না বলে একাত্তর।' যতীনবাবু দীর্ঘদিন বাবার সংস্পর্শে ছিলেন তাই বাবার মেজাজ জানতেন। কথা ঘুরিয়ে হঠাৎ যতীনবাবু বাবাকে বললেন, 'আপনার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কিছু বলুন না।'

বাবা সেই সময় যা বলেছিলেন, আমি কিছু লিখলাম।

যতীন ব্যানার্জি এবং তাঁর স্ত্রী বিকালবেলায় সাতনা চলে গেলেন। মৈহারে, দিনের থেকে

রাত্রি পর্যন্ত যেমন রুটিনমাফিক চলে, সেইরকমই চলে যায়। কয়েকদিন পর রবিশঙ্করের টেলিগ্রাম পেলাম। রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর মৈহারে আসছে। খুব আনন্দ হল। বাবার মেজাজটা কয়েকদিন ভাল থাকবে। বাবাকে যখন সংবাদটি দিলাম, বাইরে থেকে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলাম না। কিন্তু বুঝতে পারলাম, ভেতরে ভেতরে খুব খুশী হয়েছেন। বাবা অন্নপূর্ণা দেবীকে এই সংবাদটি দিলেন।

বাবা যে খুশী হয়েছেন পরের দিনই তা বুঝলাম। যার সঙ্গে দেখা হয়, তার মুখেই শুনতে পাই রবিশঙ্কর আর আলি আকবরের আগমনের সংবাদ। যখন জিজ্ঞেস করি, কি করে জানলেন? উত্তরে সকলের মুখে এক কথা, বাবার কাছেই শুনেছেন।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার গোবিন্দ সিং যখন এলেন, বাবার উচ্ছ্বাসটা আমার চোখে ধরা পড়ল। বাবা ডাক্তারবাবুকে বললেন, 'আপনার ভাই আলি আকবর এবং ভগ্নীপতি রবিশঙ্কর আসছে।' নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে আসতে বললেন। ডাক্তারবাবু যেহেতু খুব সংগীত প্রেমী, সুতরাং এই সংবাদ শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, নিশ্চই আসবেন।

বাবা এক বিচিত্র মানুষ। বাবা আসলে ভিভ্ রিচার্ডসের মতো। অফ এর দিকে বল অন এ, এবং অন এর বল অফ এ, মেরে আনন্দ পান। বহু জিনিষে চোখ থাকে না, আর বহু জিনিষে চোখ না থাকলে ভাল থাকতো, এ এক মহা ঝামেলা। পোষ্ট অফিস যাবার তাড়ায় প্রকৃতির ছোট হাতছানিতে সাড়া দিয়েছিলাম। 'পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে, সে ছিল গাছের আড়ে।' ফাটলো বোম। নতুন বারুদ 'খটাস'। বেদম চমকালাম, পেচ্ছাব বন্ধ হবার জোগাড়। মাথায় ঢুকলো না এই ক্রিয়াতে কোথায় যে পান থেকে চুন খসল? মেঘ কাটলো ঘণ্টাখানেক পর। বাবার তলব এলো।

ওঁকে নিয়ে এইটাই একটা মুশকিল। যখন কোন ব্যাপার বোঝান, তখন সহজভাবে বোঝবার জন্য এত ঝেড়ে কাশেন, যে ব্যাপারটা নান্দনিক ভাষায় একটু চেলী অনাবৃত হয়ে যায়। ভাবেন না আমার বয়স আর পদমর্যাদার কথা, কিন্তু কে কার কথা শোনে? 'ব্রাহ্মণের ছেলে, কানে পৈতেও দাও না, আর জল নিয়েও যাও না, না মানো স্বাস্থ্য, আর না মানো ধর্ম।' আর তারপর কি, কেন, কোথায়, কবে নানা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে করলেন সরলীকৃত। তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

চিঠির পাটি বগল দাবা করে বাড়িতে পা দিতেই, চাকরের কাছে শুনলাম বাবা আমার ঘরটি পরিষ্কার করছেন। তিন লাফে গিয়ে পৌঁছলাম ঘরে। প্রায় হাঁ হাঁ করে বললাম, ঘর তো আমি সকালেই পরিষ্কার করেছি। উনি বললেন, 'খাটের নীচে অনেক ময়লা জমে আছে।' ওর হাত থেকে ঝাঁটাটা নিতে বেশ বেগ পেতে হল। লোকে ঝি-কে মেরে বৌকে শেখায়, কিন্তু বাবার ঔষধটা একটু ভিন্ন। নিজেকেই মেরে পরকে শেখান। যাই হোক, সম্মার্জ্জনী পর্ব আমার ঘরেতে অতঃপর শেষ হোল, সারাবাড়ীতে চলল বিকেল পর্যন্ত। বুঝলাম এ সব 'লাল কারপেট' ছেলে আর জামাইয়ের আগমন বার্তা পেয়ে।

এলেন দুজনে। একজন পূর্ব-পরিচিত আর একজনের সঙ্গে হবে পরিচয়। যদিও দুবার ক্ষণিকের দেখা হয়েছে আলি আকবরের সঙ্গে। এবার হবে কাছ থেকে ভালভাবে।

গাড়ী থামতেই দুজনে নেমে এলেন। রবিশঙ্কর পরিচয় করাতেই সদাশয় উক্তি, 'ভাই তোমার কথা রবুর কাছে অনেক শুনেছি।' স্মৃতির খেই ধরালাম, 'আপনার সঙ্গে এর আগেও দুবার দেখা হয়েছে। একবার কাশীতে এবং একবার দেরাদুনে।' পরিচয়ের পাট্ সারলাম। ছেলে আর জামাই বাবার সামনে উপস্থিত হলো।

দূত হয়ে প্রথমে ঢুকলাম আমি, পেছনে বাবার ভাষায় 'মাণিকজোড়'। বাবার তিনটে বাঁধা সওয়াল আর ওদের তিনটে বাঁধা জবাব। কোথা থেকে এলে, কোথায় যাবে, আর সযন্ত্রী না বিযন্ত্রী? অর্থাৎ সাথে যন্ত্রটি নিয়ে এসেছ কী না? প্রথম দুটোর উত্তর তো দুজনের একই ছিলো দিল্লী এবং দিল্লী। আর যন্ত্রের ব্যাপারে? রবিশঙ্কর সঙ্গে যন্ত্র আনলেও আলি আকরবর ও ঝামেলার পথ মাড়ায়নি। যন্ত্র না আনার কারণটা যা দিলেন, সেটা বাবার কাছে একমিনিটেই পরিষ্কার। আসল কথা বাবা অজুহাত আর স্তোক দুটোই বোঝেন না। তাই আলাপ, শেষ হতে না হতেই ঠোকের ঝালা। পরে বললেন, 'যাও মায়ের সঙ্গে দেখা করো গিয়ে।' আসর, 'খাবার পাত'। বাবার উপজ অঙ্গের তেহাই উড়ে-উড়ে এসে পড়তে লাগল। একদিকে চলল খাওয়া আর ও দিকে চলল বাবার 'ধোলাই'। 'আরে আরে বেশরম! বুড়া মা সংসারে এই বুড়া বয়সেও কাজ করে যাচ্ছে, কেমন আছে খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করস না। একমাত্র বোন 'হিসিরিয়া' রোগে মাঝে মাঝেই ফিট হয়ে যায়, তার কথাও মনে হয় না, নাতিরা রয়েছে তাদের যাবতীয় খরচের কথা মনে হয় না? সব জায়গায় ঘুরে, খালি সরফরাজি করস আর বাড়ীর কথা মনে রাখবার সময় থাকে না। আমার কথা ছেড়ে দে! আমি কারও সেবা চাই না, তোর টাকাও আমার দরকার নাই, কিন্তু নাতিদের জন্যও একটু ভাবস না, আমি মরে গেলে কি করবি?'

আরও গোটা পঞ্চাশেক বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, যার কিছু তো মনে নেই, আর বেশীর ভাগটা যা মনেও আছে তা ভুলতে চাই আজ।

চাঁদমারির টারগেট আলি আকবর হলেও বেশ কয়েকটা চোখা চোখা বাণ রবিশঙ্করের দিকেও গোঁত মেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলাম। আমার অবস্থা তখন 'দেখুন্তির লজ্জা'। ভাবছি জগৎবরেণ্য উস্তাদ এবং পণ্ডিত চাঁদিতে অভ্যস্ত, বাঁশ হজম করতে পারবে কী? আমার ভয়, 'যদি পত্রপাঠ বিদায় হয়', তাহলে বাড়ীর শান্তিও 'দুর্গা শ্রীহরি' হবে। ফলে বাবার মাথা গরমের রোষে আমার বাজনার লতা গাছটা তো অচিরাৎ যাবে শুকিয়ে। আমি তখন অপটু তবলাবাদকের মতো যন্ত্রীর ধোঁকায় লয় বাড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কী হবে, ওরা তো ঢিমা তেতালায় লয় গেড়েছে। যেখানে আমি কোনোক্রমে পালাতে পারলে বাঁচি। সেখানে ওরা তখন আলাদা আলাদা পদের আস্বাদন করছে। যদিও রবিশঙ্করের মুখটা একটু কাঁচুমাচু, তাও খাওয়া শেষ হল। মুখ ধোওয়ার ফাঁকে আলি আকবরের সঙ্গে চোখাচুখি হল। নির্বিকল্প সমাধিস্থের মত মুখ করে আলি আকবর দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটাকে শান্ত করতে (নিজের বাজনার স্বার্থেই ছিলো বোধহয়) বললাম, 'আপনারা বহুদিন আসেন না তো, তাই দুঃখে আর অভিমানে বাবা একটু মুখর হয়েছিলেন। যেন অন্যথা না নেন।' আমার করুণ অবস্থাটা দেখে আলি আকবর সামান্য

থেকে যেন একটু বেশীই জোরে হেসে উঠলেন। জলের জন্য হাত পেতে, রবিশঙ্করকে ডেকে বললেন, 'রবু দেখ কি বলছে?' রবিশঙ্কর পেছন ফিরে তাকাতেই, আলি আকবর বলল, 'বাবার কথা আমরা শুনে অভ্যস্ত, আমরা এক কান দিয়ে শুনি এবং অন্য কান দিয়ে কথাগুলি বার করে দিই।' বুঝলাম, ভালো জাতের চামড়া একটু জল গেলে গাবে। না।

অনেক সাহস জড়ো করে, আড্ডা মারার ফাঁকে, একটু সহজ হয়ে বললাম, যে গতকাল রাত্রে আমি ওদের সম্বন্ধে কী ভেবেছি। রবিশঙ্কর খুব সোজা ভাবেই স্বীকার করলেন ব্যাপারটাকে। তিনি বললেন, 'ঠিকই ভেবেছো, চামড়া গাবে না। বাবার সঙ্গে তো প্রায় বছর খানেক ঘর করলে, লাখো খানেক বার তো শুয়ার কে বচ্চে শুনেছ, কবার কাশী পালিয়েছ? আমরা যদি ওরকম কথা শুনে এখন বাড়ী ছাড়তে আরম্ভ করি, তাহলে বলতে হয় আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার ঝুলি শূন্য। যাক, ওসব কথা ছাড়ো।'

অতঃপর শুরু হলো বাৎসায়ন বন্দনা। অনঙ্গ মূর্ত হয়ে দাঁড়ালো। এর আগে রবিশঙ্কর তো সুহৃদবর হয়েছে, কিন্তু আলি আকবরের কাছে তখনও একটা অবগুণ্ঠন বজায় রয়েছে। রবিশঙ্কর পাকা হাতের খেলাড়ি। শরমের শেষ আঁচলটা ও প্রায় একটানেই খুলতে অভ্যস্ত। হঠাৎ গুরুপুত্র বন্ধু হয়ে গেল।

এর ফাঁকে নিখিল এসে পৌঁছল। প্রণাম এবং সম্ভাষণের বাহার দেখে বুঝলাম এদের কাছে খুবই প্রিয়। দাদা এবং রবুদা বলে খুব সহজভাবে নিজের উপস্থিতি জাহির করল। নিখিল আসাতে আমাদের যে গল্প হচ্ছিল, সেটা চাপা পড়ে গেল। কথায় কথায় নিখিলকে যখন আমি আপনি করে সম্ভাষন করলাম, রবিশঙ্কর বলল, 'আরে যতীন, তুমি নিখিলকে আপনি করে বলছো কেন? ও তোমার থেকে বয়সে ও বিদ্যায় সর্ববিষয়েই ছোট।' আমি রসিকতা করে বললাম, 'সর্ববিষয়ে ছোট হলেও মৈহারে এসে বলেছিলো, কলকাতায় স্কুলে ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়ান ছিল এবং হাতের পাঞ্জাতে বহু লোকের ছক্কা হয়ে যেত ইত্যাদি।' কিন্তু মৈহারে এসে আমাকেই শ্রী মধুসূদন দর্প হরণের নিমিত্ত করলেন। যাক কিছুক্ষণ কথার পর নিখিল বাবার কাছে গেল। বাবা নিখিলকে বললেন, 'এখন যা দিয়েছি তাই রিয়াজ করে নির্দিষ্ট দিনে সকাল নয়টার সময় এসো।' আরো বললেন যে, যেসব অঙ্গ মীড়ে এবং পাল্টা বলেছেন ইমন রাগে সেইগুলো ভৈরব রাগে রিয়াজ করে আসতে। সকালে এবং বিকালে ভৈরব এবং ইমন দুটো রাগই কেবল যেন রিয়াজ করে। নিখিল বাড়ী চলে গেল।

বহুক্ষণ ধরে মনের ভেতর একটা কথা মুখর হবার চেষ্টা করছিল। না থাকতে পেরে রবিশঙ্করকে বললাম, 'আচ্ছা আপনারা থাকতে বাবার জন্মসালটা নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন? এটা তো আর বুদ্ধের জন্মতিথি নয় যে আড়াই হাজার বছর আগের এবং তা নিয়ে চারজন ঐতিহাসিকের পাঁচটি মত।' রবিশঙ্কর আকাশ থেকে পড়ল যেন, বুঝলাম এটা ওর কাছে ল্যাটিন।

সহজ সরল বুদ্ধি দিয়ে বলল, যা চলছে চালিয়ে যাও। বাবার বয়স যা বলেছেন তাই লিখো। সেক্রেটারির দায়িত্ব তাতেই সম্পন্ন হবে। বুঝলাম, রবিশঙ্কর তত্ত্বটা বুঝেছে, তাই মৌন ছিল। গুরুত্বটা বুঝেও মুখর হয় নি। কথাটা ভেবেছিলাম আলি আকবরের কাছেও

বলব, কিন্তু এক দিনেই বুঝেছি আলি আকবর বাজনা ছাড়া সব ব্যাপারেই রবিশঙ্করের তরফের তার। একটা দুঃখ রয়েই গেল যে, পড়াশোনা না করলে, লোকে যে ইতিহাসের গুরুত্ব বোঝে না, এই কথাটা আমাকে এদের কাছে শিখতে হলো। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় পিছু ডাক দিলাম। বয়সে বড়কে তো সাবধান করা যায় না তবুও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বললাম, 'ভবিষ্যতে এই ত্রুটির দায়দায়িত্ব আপনাদেরই ভোগ করতে হবে। কারণ বাবা গাছপালা, ঘরবাড়ী, সবুজ ধানের ক্ষেত বা ঘাসিরাম নন, যে তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত রচিত হবে না।' ভেবেছিলাম বিষবৃক্ষকে গোড়াতেই কাটা, কিন্তু হোলো না। শুধু গাছটা বড়ই হোলো, তাই নয়, পরবর্তীকালে সুফলা। বিশদ বর্ণনা 'মুষল পর্বে' করব। যাক রবিশঙ্করেরটা তো বুঝি। শ্বশুরবাড়ীতে তেরাত্রির বাস ভাল নয়। কিন্তু এখানে আলি আকবরের কোন বাধা? বুঝলাম নদীর অস্তিত্ব উদ্দামতা আর উচ্ছলতার স্বতন্ত্রেই প্রকাশ হওয়া সম্ভব। বারিধির মহাকল্লোলের কাছে এলে তারা তলিয়ে যায়। তাই পাততাড়ি গোটানোর জন্য ওরা আকুপাকু করছে। স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলাম। বাবা বিষণ্ণ হলেন।

১৪

বহুদিন ধরেই বহুকথার ফাঁকে মার যে একা সংসারে খাটতে হষ্ট হয় এ কথা বাবা বলেছেন। আগেও বেশ কিছু শিষ্যকে বলেছিলেন যদি তারা কেউ রান্নার লোক পাঠাতে পারেন, কিন্তু কেউই সুরাহা করতে পারেননি। বোধহয়, সেই যুগের লোক মৈহারকে কালাপানি ভাবত। যাক, অনেক চেষ্টার পর আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের আসার আগে, এক বিধবার আমদানি হয়েছে রাঁধবার জন্য, যা কিনা আগেই লিখেছি। ভেবেছিলাম এ চরিত্রটাকে কাব্যের উপেক্ষিতা হিসাবে রাখব। কিন্তু তা হোল না। মৈহারে যেই আসে সেই বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। এ এক মহা বিড়ম্বনা। কোথায় শাঁখ বাজিয়ে রান্না করে বহাল তবিয়তে মাসখানেক কাটানোর পর ভদ্রমহিলার টেম্পোরারি চাকরির কনফার্ম হবার বদলে, হোল কি না ডিসমিস!

ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। কর্মচারী হলেও বাবা মহিলাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাই পাচিকা ভদ্রমহিলাও বাড়ীর অন্দরমহলের স্নান, আহারের এবং শৌচাগারের অধিকার পেয়েছিলেন আর সেটাই হোলো কাল। পড়বি পড়, বাবার সামনেই। ভদ্রমহিলা, কি জানি কেন, বিনা জলপ্রয়োগে লঘুশংকা সারতে গিয়েছিলেন। সেখানেই হোল বিপর্যয়। উনি তো লঘুশংকা সারলেন কিন্তু আমার হলো গুরুশংকা উপস্থিত। বিনা মেঘে বাজ পড়লো। তারস্বরে আমার ডাক পড়লো, 'ও যতীন, ও যতীন!'

এক ছুটে বাবার সামনে উপস্থিত হলাম। তখন একাধিক্রমে তিনটে শব্দই শুনতে পাচ্ছি। 'তোবা, তোবা, খাটাস! আরে নিকালো শুয়ার কে বাচ্চে কো।' পরিচিত স্বর, কিন্তু রাগটা ঠিক বুঝতে বা ধরতে পারছিনা। এ দীপকের আলম্বনটা কে? যাক, চন্দন বনে থাকতে থাকতে বেলের গায়েও গন্ধ হয়েছে। উপলব্ধি করলাম, মাজরাটা কী? বাবা বলেই চলেছেন, 'এখনই এই রান্নার লোককে পিসাব করে বেরুতে দেখলাম। এত বড় খাটাস, পিসাব করে জল দেয় না! আর এই মেয়ের হাতে আমি এতদিন খাবার খাচ্ছি? আরে তোবা, তোবা,

দুপুরের ট্রেনেই একে এলাহাবাদে পৌঁছে দিয়ে এসো। সেখান থেকে কাশীর বাস এ উঠিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ এসো। এ লোকের আমার দরকাস নাই।'

দরকাস নাই মানেই যে দরকার নাই, এ কথাটা বুঝেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাত্রা করলাম। অত রাগের মাথাতেও বাবা কিন্তু না-খাইয়ে যেতে নিষেধ করলেন। হিসাব পত্র চুকিয়ে দেওয়া হল।

এর পরদিনই বাবা, আশিস ও ধ্যানেশ শয্যা নিল। ওষুধ ও পথ্যতেই সারাটা দিন গেল। মৈহারে থাকাকালীন বাবা-ই বাজারে যেতেন, কিন্তু তাঁর অসুখ হয়েছে সুতরাং বাজারেও যেতে হলো। বাবা আমাকে টাকা দিলেন বাজারের জন্য। বাজারে যাবার আগে কি আনতে হবে জিজ্ঞেস করলাম মাকে। ফর্দটা একটু বেশী করেই মা বললেন। বাজার ছাড়া, মশলা, চা প্রভৃতি বললেন। বাবা বাজারের জন্য কুড়িটাকা দিয়েছেন শুনেই, মা বেশী বেশী জিনিষ বললেন। সবই খরচা হয়ে গিয়েছে, বেঁচেছে মাত্র কয়েক আনা। বাবাকে সেই কয়েক আনা ফেরৎ দিতেই বাবা বললেন, 'সব খরচা করে ফেলেছ?' আমি সবসময়ে টাকা পয়সার ব্যাপারে কিছু কিনলেই দামটি লিখে রাখতাম। মনে দ্বিধা হলো, বাবা কি সন্দেহ করছেন? আমি কি কিছু টাকা রেখে দিয়েছি? বাবার বলার পরই, গড়গড় করে পড়ে গেলাম কি কি এনেছি, এবং দাম কত। বাবা বললেন, 'যাবার আগে কি তুমি মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলে কী কী আনতে হবে?' হ্যাঁ শুনে বললেন, 'বুঝেছি কেন এত খরচা হয়েছে? তোমাকে কি আমি অবিশ্বাস করি? তুমি কাগজে লেখ কেন? একটা কথা সারাজীবন মনে রাখবে, এখনও তো সংসার করোনি, তাই এ সব বোঝ না। বাজারে যাবার আগে কখনও তোমার মাকে জিজ্ঞেস করবে না, কি আনতে হবে। জিজ্ঞেস করলেই নানা ফরমাইস করবে। যা ভাল বুঝবে তাই কিনে আনবে। জিজ্ঞেস করেছ বলেই এত মশলা আনতে বলেছে। কি ছাতার রান্না, তাতে আবার মশলা?' আমি তো অবাক. সংসার ধর্মের এ এক বিচিত্র নীতি বাবার কাছে শিখলাম। বাবা যে কথাটা খুব মিথ্যে বলেননি, দীর্ঘ সাত বছর থাকার ফলে বাবার অবর্তমানে যখন বাজারে গিয়েছি বুঝতে পেরেছি।

ডাক্তারবাবু বাবার জ্বরের জন্য ইনজেকশান দেবার পরামর্শ দিয়ে কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দিলেন। সকালে এবং বিকালে একটা ইনজেকশান দিতে হবে। আশিস এবং ধ্যানেশকেও ইনজেকশান দিতে হবে। আমার মৈহার থাকাকালীন কয়েক বারই জ্বর হয়েছে বাবার। জ্বরটা কিন্তু বেশ বেশীই হতো। বাবা প্রলাপ বকতেন। কিন্তু মনের জোরে ভালোও হয়ে যেতেন তাড়াতাড়ি। সেই সময়ে একটু ঠিক হলেই, বিনা কারণে সকলের প্রতি সদা বর্ষণ হোতো।

কম্পাউণ্ডার এসে গরম জল করতে বলতেন। মা গরম জল করে দিতেই সিরিঞ্জ গরম জলের মধ্যে একমিনিটের মত পরিষ্কার করেই, ইনজেকশান যে মুহুর্তে কম্পাউণ্ডার দিতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে উঠলেন, 'কিতনা দিন ইনজেকশান দেতা হ্যায়?' কম্পাউণ্ডার বরাবরই আসে, বাবাকে ভয় এবং ভক্তি করে। সে কিছু বলবার আগেই বাবা বললেন,

'আরে জানতে হো, এক কহাবত হয়, নিম হাকিমী খতরা জান। এতনা জলদি পানী গরম হুয়া? তুম এক মিনট মে ডুবায়া ঔর ইনজেকশান দেতা হ্যয়, জান সে মারেগা?' কম্পাউণ্ডারের তো অবস্থা খারাপ, অর্ধেক বুঝল না। বাবাকে বললাম, 'মা অনেকক্ষণ জল গরম করেছেন।' কম্পাউণ্ডারকে বললাম, 'গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ সিরিঞ্জ রেখে দিয়ে ইনজেকশান দিন।' কম্পাউণ্ডার গরম জলে সিরিঞ্জটি আবার ডুবিয়ে রাখল। বাবা এবার চুপ রইলেন। কেবল একটা কথাই বললেন, 'এইসা না, এইসা না' অর্থাৎ এইরকমভাবে কাজ করবেন না। ইনজেকশান দেবার পরই বাবা কম্পাউণ্ডারকে বললেন, 'হম তো বিড়ি পিতা হ্যয়, ইহ পিয়ো।' একটা চারমিনার সিগারেট ধরালেন। বাবা কখনও বিড়ি খেতেন না। বরাবরই চুরুট এবং বাড়ীতে গড়গড়ায় তামাক খেতেন। কখনও কখনও চারমিনার সিগারেট খেতেন। কিন্তু কাউকে চারমিনার সিগারেট দেবার সময়ে সর্বদাই উপরিউক্ত কথাটি বলতেন, 'আমি তো বিড়ি খাই।' যাকে দেওয়া হোত, সে যখন বলত এটা বিড়ি কোথায়, এটা তো সিগারেট, বাবা বলতেন, বিড়ির মত কড়া বলেই একে বিড়ি বলেন।

কম্পাউণ্ডারকে বিড়ি দিয়ে আমাকে বললেন, 'গাছ থেকে কিছু ফল এনে একে দাও।' ফল নিয়ে এলাম। বাবা নিজের হাতে ফল দিয়ে বললেন, 'কথাটা আমার খারাপ ভাবে নিও না। আমার নাতিরা ছোট, ওদের ইনজেকশান খুব সাবধানে দেবে।' সে বাবার মেজাজ জানে সুতরাং বাবাকে আশ্বাস দিল কোন ভয় নাই, নাতিদের খুব ভালো ভাবে ইনজেকশান দেবে। মৈহারে নাতিদের ইনজেকশান দেবার সময়, বাবা বরাবর নিজে দাঁড়িয়ে দেখতেন এবং তাড়াতাড়ি করতে বারণ করতেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে সকলে ঠিক হয়ে গেল। ঠিক আট দিন পর নিখিল এলো শিখতে। নিখিলকে দেখেই বাবা কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই হলো আমাদের বাঙ্গালী চরিত্র। এতদিন আমার শরীর খারাপ এবং বাড়ীর সকলে অসুখে ভুগলো অথচ একবারও খোঁজ করলে না? তোমার বাবা কি চিঠি লিখেছিলো?' নিখিল লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো। বাবা আবার বললেন, 'ভক্তি দেখাচ্ছ মাথা নীচু করে? জানো না অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। আজকে যাও, কয়েকদিন পরে এসে শিক্ষা করে আমাকে উদ্ধার করে যেও।' নিখিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিছু আনতে হবে?' এবারে বাবার তারসপ্তকে গলার আওয়াজ পেলাম। 'আমার জন্য কিছু আনতে হবে না। দেখছ না দিনরাত যতীন একবার ডাক্তার, একবার ওষুধ, একবার কম্পাউণ্ডার, আবার আজ ইলেক্‌ট্রিক বিলও দিয়ে এসেছে, এই সব কাজ করার জন্য কি কাশী থেকে এসেছে?' বেগতিক অবস্থা দেখে আমি নিখিলকে ইসারা করে বললাম যেতে। বাবাকে বললাম, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না, নিখিল জানত না যে আপনার শরীর খারাপ হয়েছে, নইলে নিশ্চয় আসত ।'

দু'দিন খুব বৃষ্টি হল। জুন মাসে প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টির জন্য একটু কম মনে হলো। বাবা চাকর বুদ্ধাকে বললেন, জীতেন্দ্রপ্রতাপের বাড়ি গিয়ে বলে আসতে যে জীতেন্দ্রপ্রতাপ ও নিখিল যেন সন্ধ্যায় সেতার নিয়ে আসে শিখতে।

আজকে আবার জীতেন্দ্রপ্রতাপ আমার ঘরে ঢুকেই সিগারেট খেতে লাগলো। আজও

বললাম বাইরে গিয়ে সিগারেট খান। জীতেন্দ্রপ্রতাপকে যেহেতু বাবা কুমার সাহেব বলেন এবং আমার আগে থেকে পরিচয় এবং বয়সেও বড়, সেই জন্য আমার বলাটা সে গ্রাহ্য করে না। সে সিগারেট খেতে খেতেই বললো, 'জানেন আলি আকবর, রবিশঙ্করের কত প্রোগ্রাম আমি করিয়েছি। তারা দুজনে আমাকে সমীহ করেই কথা বলে, আর আপনি বাবার দুদিনের সেক্রেটারি হয়ে আমাকে এত বড় কথা বলেন?' সঙ্গে সঙ্গে জীতেন্দ্রপ্রতাপের হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে নিভিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, 'কার কী করেছেন তা আমার জানবার দরকার নেই, তবে দয়া করে আমার ঘরে এসে কখনও সিগারেট খাবেন না। একদিন এর আগেও বলেছিলাম, এবারে সিগারেট খেলে সোজা বাবাকে বলে দেব।' আমার কাছ থেকে বোধহয়, জীতেন্দ্রপ্রতাপ এ কথা আশা করে নি। নিখিলের উপস্থিতিতে তার প্রেস্টিজ পাংচার হয়েছে, আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলল, 'এর ফল আপনি পাবেন।' নিখিল নির্বিকার, চুপ করে আছে। কোন কথা বলছে না যেহেতু সে জীতেন্দ্রপ্রতাপের বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট হয়ে আছে। নিখিলকে বললাম, 'চলুন, বাবার নমাজ পড়া এবার শেষ হবে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।' জীতেন্দ্রপ্রতাপকে বললাম, 'একটা কথা মনে রাখবেন। আপনি রাজকুমার, আপনার বাড়ীতে। কিন্তু আমার কাছে এসে এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা ভবিষ্যতে আর বলবেন না। একটা কথা জেনে রাখবেন, আপনি আমার সহজ রূপটাই দেখেছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বললে আমার ঘরে ঢুকতেই দেব না। আমাকে ভয় দেখাবেন না।' এই বলে বাইরে চলে এলাম। কেননা, নমাজ পড়ার পরই প্রণাম করব বাবাকে।

বাবা দুজনকে শেখাবার পর আমাকে ডাকলেন। আমি বাবাকে বললাম, 'যা দিয়েছেন, তাই এখন বাজাচ্ছি, কাল শিখব।' আমার নিজেরও মেজাজ খারাপ এবং পরের পর দুজনকে শিখিয়ে বাবারও মেজাজ খারাপ। সুতরাং এই খারাপ মেজাজের সময়, শিখতে গেলে অযথা বকুনি খাব বলেই, শিখলাম না। বাবাও জোর করলেন না।

হঠাৎ পরেরদিন আবার অন্নপূর্ণা দেবীর হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। আশিসের মুখে শুনে উপরে গেলাম। দেখলাম বাবা এবং মা মাথায় জল দিচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'রবু আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে। বিয়ের আগে এসব 'হিসিরিয়া' রোগ তো ছিল না, এরকম কেন হয়? এর জন্য রবুই দায়ী, আমার মেয়ের কোন খেয়াল রাখে না।' আমি বাবাকে বললাম, 'চিন্তা করবেন না, এখুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।'

পরের দিন রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। রবিশঙ্কর আমাকে লিখেছে, সাতাশে আগস্ট মৈহারে এসে অন্নপূর্ণা দেবীকে দিল্লী নিয়ে যাবে। বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলতে। চিঠি পড়ে বুঝলাম দুইমাস ছদিন এখনও অন্নপূর্ণা দেবী মৈহারে থাকবেন। রবিশঙ্কর, বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীকেও চিঠি লিখেছে। বাবাকে সে লিখেছে, দিল্লীতে চিকিৎসা করাবার জন্য সে অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে যাবে। বাবার চিঠি আমিই পড়ে শোনালাম। বাবা কেবল একটা কথাই বললেন, 'যাক এতদিনে খেয়াল হয়েছে।' পরমুহূর্তেই বললেন, 'অন্নপূর্ণা আমার একাধারে মেয়ে এবং মা। প্রতিবছর আমাকে দেখবার জন্য এসে কিছুদিন থাকে। অন্নপূর্ণা

থাকলে আমার সময় ভালো যায়। কী করব? বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, চিরটা কাল তো নিজের কাছে রাখতে পারি না। কথাগুলি বলতে বলতে বাবার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে গেল।

অন্নপূর্ণা দেবী চলে যাবেন শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। মৈহারে এসেছি প্রায় আটমাস হলো। এত কম সময়ে, বাবার অবর্তমানে আমাকে তিনি কত কষ্ট করে শিখিয়েছেন, বাবার পছন্দ অপছন্দর কথা সব বুঝিয়েছেন। তিনি আর দুই মাস পরেই চলে যাবেন জেনে দুটি বিষয়ে চিন্তিত হলাম। বাবার কাছে বকুনি না খাই সেইজন্য আমাকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যে বাবার কাছে বাজনা শিখবার সময়, আমার অনেক সহজ হ'তো। এখন এই দুই মাস যতদিন অন্নপূর্ণা দেবী আছেন, বাবার অবর্তমান একটু বেশী শিখতে হবে। সাহস করে অন্নপূর্ণা দেবীকে মনের কথা বলে, বললাম, 'যদি কিছু রাগ আমার খাতায় লিখে দিয়ে যান, তাহলে সেগুলো দেখে বাবার অবর্তমানে বাজাব।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, লিখে দেবো, কিন্তু বাবার অবর্তমানেই দিনরাত সেগুলো বাজিয়ে হাতে উঠিয়ে নিতে হবে।' যাক একটা চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তাটা?

মৈহারে আসার পর দেখেছি, যে মাসে ইলেক্‌ট্রিক বিল বেশী হয়েছে, বাবা চটে গেছেন। প্রত্যেক মাসে যে বিল আসে বাবার মনে থাকে। অন্নপূর্ণা দেবী প্রতি মাসে, যেমনই ইলেক্‌ট্রিক বিলের টাকা বেশী হয়েছে সেটা আমাকে দিয়ে দিতেন। বাবার মেজাজ ঠিক থাকত। এ ছাড়া চা চিনি, মশলা এবং আরো অনেক জিনিষ আমাকে টাকা দিয়ে আনিয়ে নিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সহজে বোঝা যাবে যে কি রকমের ভরতুকি দিতেন।

যেমন, মা বললেন চা আনতে হবে। বাবা বড় এক প্যাকেট চা কিনে দিলেন। চা যখন শেষ হয়ে যেত, মা যে মুহূর্তে বলতেন চা আনতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথা গরম হয়ে যেত। বাবা বলতেন, 'এই তো কয়েকদিন হোল চা এনে দিয়েছি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? সকলে কি দিনরাত চা খায়?' মৈহারে গিয়ে প্রথম এটা দেখেছি। অন্নপূর্ণা দেবী চা শেষ হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে একটা বড় প্যাকেটের চা, পয়সা দিয়ে আনিয়ে নিতেন। সুতরাং বেশ কিছুদিন চলে যেত। তার পর মা যখন আবার পরে চায়ের কথা বলতেন, তখন বাবা আর রাগ করতেন না। বুঝতেন অনেকদিন চলেছে।

কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী চলে যাবার পর, প্রতি জিনিষে তিনি যে ভরতুকি করতেন, যার জন্য বাবার মেজাজটা ঠিক থাকত, তাঁর অবর্তমানে তো বাবারও মেজাজ খারাপ হবে। আর মেজাজ খারাপ হলেই, এর জের সকলের উপরেই পড়বে। সবচেয়ে বড় কথা শিখবার সময় বাবার গালি খেতে হবে। আমার আর্থিক পরিস্থিতি তো সেরকম নয় যে আমিই অতিরিক্ত খরচটা পুরো করব। আমার নিজের জন্য যে যৎসামান্য খরচা সেটা আমার দাদা প্রতি মাসে পাঠাতো। কিন্তু এ সংসারে যাবতীয় খরচার উপরিটার কি উপায় হবে? কথাটা ভাবলাম অন্নপূর্ণা দেবীকে বলব। কথাচ্ছলে বললামও, 'আপনি তো এখানকার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন উপরি খরচাটা করে, কিন্তু আপনি চলে গেলে তো মায়ের উপর বোঝা পড়বে, এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যায় কি করে? অবশ্য এই কথা জানিয়ে আলি আকবরকে চিঠি দিতে পারি কিছু টাকা পাঠাতে।' অন্নপূর্ণা দেবী আমার কথা শুনে বললেন,

'দাদাকে কিছু লিখবেন না। যাবার সময় আমি কিছু টাকা দিয়ে যাবো, সে টাকা শেষ হয়ে গেলে দিল্লী থেকে টাকা পাঠাবো প্রতি মাসে। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই।' এই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেও ভাবলাম, যে কাজ আলি আকবরের করা উচিৎ সে কাজ অন্নপূর্ণা দেবী কেন করবেন? এ ছাড়া মনে হোল, তিনি এ তো ভাবলেন না, যে টাকাটা পাঠাবেন তার থেকে আমিও আমার খরচা চালাব। কিন্তু সেই সময় অন্নপূর্ণা দেবী, আলি আকবর কিংবা রবিশঙ্করকে ঠিক চিনতে পারিনি। অনেক পরে যখন চিনেছি, তখন ভেবেছি, এক গাছে পৃথক ফল হয় কি করে? অবশ্য এক গাছে রবিশঙ্করকে ফেলা যায় না। কিন্তু অন্য গাছের হলেও সে ফলের মধ্যেও ব্যতিক্রম। সে কথা অনেক পরে বুঝেছি।

কয়েকদিন পর বাবা এলাহাবাদে গেলেন রেডিওতে বাজাবার জন্য। বাবা যাবার পরই দেখলাম অন্নপূর্ণা দেবী একটা খাতা আমাকে দিলেন। খাতা খুলে দেখি কয়েকটা রাগের চলন, আলাপ, জোড় লিখে দিয়েছেন। বাবার আসতে পাঁচদিন লাগবে। এই ছয়দিন অন্নপূর্ণা দেবী আমায় শেখালেন। বাবা থাকাকালীন, সকাল এগারোটা নাগাদ বাবার চিঠিগুলি লিখতাম। দুপুরে দেড়টা থেকে আড়াইটে অবধি ঘুমোতাম। বিকেলে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আশিস, ধ্যানেশ এবং শুভকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম। রাত্রি সাড়ে দশটার পর শীতকাল হলে ঘুমোতাম এবং গরমকালে বাইরে থাকার ফলে সিনেমা যেতাম। কিন্তু সকাল থেকে রাত্রি অবধি যে অবসরটুকু পেতাম, বাবার অবর্তমানে তা থেকে বঞ্চিত হলাম। কিন্তু যা পেলাম তা আমার কাছে অমূল্য। অন্নপূর্ণা দেবী এই অবসর সময়ে শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রে বারোটা অবধি শেখাবার পর ছুটি দিতেন।

শেখাবার সময় একেবারে বাবার মতোই কঠোর। যতক্ষণ না হাত দিয়ে বেরোয় ততক্ষণ নিষ্কৃতি নেই। মৈহারে এসে অবধি এই প্রথম সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সব কাজ বাদ দিয়ে প্রায় তেরো ঘণ্টারও বেশী বাজানো একটা ব্যতিক্রম। একদিন রাত্রে তো শেখাতে বসে যেহেতু আমার দ্বারা ঠিক হচ্ছিলো না বলে, বললেন, 'এইটা ঠিকমত না বাজানো পর্যন্ত যেন মুখ দেখাবেন না।' এই ছয়দিন শিক্ষাকালীন অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখলাম যেন বাবারই প্রতিমূর্তি। বাবার ভাষা 'শুয়ার কি বচ্চে' কথাটা প্রয়োগ করতেন না বটে, তবে তাঁর যে রুদ্রাণী রূপ, সেটাকে দ্বিতীয় বাবাই বলব। কিন্তু অন্য সময় একেবারে সহজ, সরল মাটির মানুষ।

দেখতে দেখতে পাঁচটি দিন কেটে গেল। রাত্রে শিক্ষার পরে স্টেশনে গেলাম বাবাকে আনতে। গাড়ী আসছে। দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখছি, কিন্তু লাইন ক্লিয়ার না হওয়ার ফলে দেখলাম গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় মত্ত অবস্থায় জীতেন্দ্রপ্রতাপকে দেখলাম। আমাকে দেখেই জীতেন্দ্রপ্রতাপ বলল, 'কি ব্যাপার?' বললাম, বাবা আসছেন এই গাড়িতে। জীতেন্দ্রপ্রতাপেরও পরিচিত একজন আসছে বলে সেও এসেছে স্টেশনে। হঠাৎ আমাকে সে বলল, 'এক প্যাকেট সিগারেট বাইরে থেকে কিনে আনুন।' বললাম, 'গাড়ীর দূরত্ব খুব কম। যদি সিগন্যাল দিয়ে দেয় তো দুই মিনিটেই স্টেশনে পৌঁছে যাবে। স্টেশনে পৌঁছে আমাকে বাবা না দেখলে পরিণাম কী হবে আপনার তো তা অজানা নয়।

জীতেন্দ্রপ্রতাপের কী দৃষ্টিতে পড়েছি জানি না সর্বদাই আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। মত্ত অবস্থায় ছিলো, তাই গলার আওয়াজটাও জোর হল। বলল, 'ঘণ্টা বাজলে তবে তো গাড়ী আসবে, তার মধ্যে আমার সিগারেট এনে দিন। নিজেকে কেউকেটা মনে করেন বাবার বাড়ীতে আছেন বলে?' আরো অনেক কথা বলল। উত্তরে একটা কথাই বললাম, 'আর যদি একটা কথা বলেন, তো ট্রেনের লাইনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।' আমার কাছে সে বোধ হয় এরকম কথা আশা করেনি। তাঁর তখন একশো চার ডিগ্রির মৌতাত, আটানব্বুইতে এসে গেছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'দুদিন আপনার ঔদ্ধত্য দেখেছি। কালকেই বাবাকে বলে আপনাকে মৈহার থেকে বিতাড়িত করব।' বললাম, 'দেখব কে বিতাড়িত হয়, আপনি না আমি।' গাড়ী স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

বাবাকে গাড়ীতে দেখে জিনিষ নামাতে যাচ্ছি, হঠাৎ বাবা বললেন, 'দেখ আমার পেছনে কে?' আশ্চর্য হলাম আমার বন্ধুকে দেখে, যার কথা আগেই লিখেছি। আমার দাদার সঙ্গে মৈহারে এসেছিল দেড়মাস আগে। কিন্তু আমার বন্ধুর আসার কারণ কী? প্রথমে মন্দটাই আগে মনে আসে। আমার মায়ের শরীর ঠিক আছে তো? বাবা নেমেই বললেন, 'তোমার বন্ধু এলাহাবাদে আমাকে দেখে চিনেছে, দেখ তোমার বন্ধু এসেছে, এর অভ্যর্থনা করো।' আমার এই বন্ধু গতবারে যখন এসেছিলো তখন বাবার আতিথ্য দেখেছে, সুতরাং সঙ্কোচে আমার সঙ্গে আগে আগেই চললো। টাঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা কেমন আছে? হঠাৎ আসার কারণ কি? বলল, 'খুব সুখবর আছে। বাড়ীতে গিয়ে বলব।' বাড়ী পৌঁছে বাবা বুদ্ধাকে বললেন, 'একটা নেওয়ারের খাটিয়া ব্যবস্থা করতে। বাবা মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে বললেন, 'তোমার যে দাদা এখানে এসেছিলো, তার বিয়ে হবে এক মাস পরে, তাই তোমার বন্ধু তোমাকে খবর দিতে এসেছে। তোমার বন্ধু বলছে কাল সকালেই চলে যাবে। আমি বলেছি, তিন চারদিন থাকতে হবে কিন্তু সে বলছে কাশীতে তার অনেক কাজ আছে। এখন তুমিই বোঝাও।'

বাবার কথা শুনে যেমন আনন্দ হলো, সেইরকম নানা প্রশ্নও মাথায় এলো। কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে? যাই হোক বাবাকে প্রণাম করে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ীর বাইরে চলে এলাম। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। বাড়ীর বাইরে এসে শুনলাম, তার সেজদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হবে আটই আগস্ট। সুতরাং আমি যেন সাতই আগস্ট বেনারস যাই। বাবার কাছে ট্রেনেই এই সংবাদ দিয়ে আমার যাবার জন্য অনুমতি চেয়েছে। বাবা সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ওর দাদার বিয়ে, তার জন্য অনুমতি কিসের? নিশ্চয়ই যাবে।'

প্রায় দেড়মাস আগে বন্ধু মৈহারে এসে আমার দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং বাবার বিষয়ে আমার কাছে সব শুনেছে। বুঝেছে যে বাবার অনুমতি নেওয়া দরকার, তাই আগেই এসেছে। দাদার বিবাহের সংবাদ শুনে খুব ভাল লাগল। প্রায় রাতভোর নানা গল্প হোলো। জিতেন্দ্রপ্রতাপের গল্পও সব বললাম। সে সমস্ত শুনে বেশ ভয় পেলো। আমি বললাম, 'সত্য কথা বললে বাবা প্রথমে চটে উঠলেও পরে ঠিক সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।'

সকালেই মাকে গতরাত্রের কথা বললাম, জীতেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে যা হয়েছে। মনে ভয়ও হচ্ছে বাবাকে না জানি কি ভাবে গতরাত্রের কথা বলবেন, যার ফলে আমাকে হয়ত বিপদে পড়তে হবে, কেননা বাবা যেমন কান পাতলা। মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমার ভয়ের কিছু নাই। তোমার বাবাকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো। তুমি এত কাজ করো, তবু শেখাবার সময়, তোমার বাবার মেজাজ গরম হয় অথচ এই সব মতলববাজদের মিষ্টি কথায়, তোমার বাবা সব ভুলে যায়। তোমার বাবা লোক চেনে না। যারা উপরিশ্রদ্ধা দেখায়, তোমার বাবা সে সব দেখে কোন অবগুণ দেখতে পায় না। আমি তো বাবা লেখাপড়া করি নি। কিন্তু আমি বুঝি যারা বেশি ভক্তি দেখায় এবং মিষ্টি কথা বলে তারা লোক হিসাবে ভালো নয়। জানো বাবা, এক মালি ছিলো। সকালে রোজ দেখিয়ে দেখিয়ে সব গাছে জল দিতো এবং রাত্রে গোড়া কেটে ফেলত। কিছুদিন পর, বাড়ীর মালিক দেখল সব গাছ পড়ে আছে। যারা দুষ্ট লোক তারা এইরকম অসাক্ষাতে গাছের গোড়া কাটে। এই সব লোক থেকে খুব সাবধানে থাকবে।'

মায়ের এই গল্প শুনে আমি অবাক হলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই গল্প কার কাছে শুনেছেন?' মা বললেন, 'আমি আর কার কাছে শুনব, আমি কী কোথাও যাই? আল্লাই আমাকে সব দেখিয়ে দেয় এবং শিখিয়ে দেয়।' এই ধরনের বহু কথা তাঁর কাছে শুনেছি।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আতিথ্য দেখে, আমার বন্ধু লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। হঠাৎ সন্ধ্যের সময় বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গতরাত্রে জিতেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে কী হয়েছিলো?' বুঝলাম মা সব বলেছেন। সাহস করে সব কথা তাঁকে বললাম। বাবাকে অনুরোধ করে বললাম, 'এ সব কথা বলবেন না কেননা তাতে সে ভাববে আমি আপনার কাছে সব বলেছি।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার ভয়ের কিছু নেই। তুমি যা করেছো, ঠিক করেছো। একটা কথা মনে রেখো, যার মধ্যে ভক্তি অথবা শক্তির বিশ্বাস আছে, সেই নির্ভীক হতে পারে। নির্ভীক হলে কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।'

সন্ধ্যার সময় জীতেন্দ্রপ্রতাপ এসে বাবাকে প্রণাম করলো। নানা কথার পর বাবা বললেন, 'তুমি শরাব খাও, কাল রাত্রে কী করেছ?' এই কথা বলে একবার আমার দিকে তাকান, আবার একবার জীতেন্দ্রপ্রতাপের দিকে তাকান। কেবল একটিই কথা, 'এইসা না, এইসা না।' ধীরে ধীরে গলার আওয়াজ পঞ্চমে উঠল, 'তোমরা এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে। আমি তোমাদের গুরু নয়, তোমরাই আমার গুরু। তোমাদের কেবল মতলব শিক্ষা করা, অথচ এই যতীনকে দেখো, এত লেখাপড়া করেও দিন রাত কত কাজ করে। এত রাত্রে যখনই বাইরে থেকে আসি, রাত্রে আমাকে নিয়ে আসে, মৈহার থেকে যাবার সময় স্টেশনে পৌঁছে দেয়, এ ছাড়া ওর উপর ভরসা করে আমি যাই। ভবিষ্যতে ওর প্রতি এ ধরনের কোন ব্যবহার করলে তোমাকে তাড়িয়ে দেবো।' এই প্রথম জীতেন্দ্রপ্রতাপ, যাকে তিনি সবসময় কুমার সাহেব বলে এত স্নেহ করতেন, তার প্রতি এই সম্ভাষণ আমার কাছে পরম বিস্ময়। বুঝলাম, বাবা কান পাতলা হলেও, বুঝিয়ে যদি বাবাকে কিছু বলা যায় তাহলে বাবা ঠিক সিদ্ধান্তই নেন। কিন্তু এর মধ্যে জীতেন্দ্রপ্রতাপের মুখে কোন কথা নাই। বাবা বললেন,

'যাও বাড়ী যাও, ঐ ধরনের কথা যেন এরপর কখনও না শুনি।' গুম হয়ে জীতেন্দ্রপ্রতাপ কিছুক্ষণ বসেই, প্রণাম করে চলে গেল। রাত্রে আমার বন্ধুকে স্টেশনে দিয়ে এলাম।

পরের দিন সাতনা থেকে সনৎ মৈহারে এলো। সকালে জীতেন্দ্রপ্রতাপ এসে বাবাকে বলল, 'তার বাড়ীতে বিশেষ উৎসব থাকাতে রাত্রে আমি যেন তার বাড়ীতে খাবার খাই।' জীতেন্দ্রপ্রতাপ আমার প্রতি এত সদয় কেন বুঝলাম না। হঠাৎ মায়ের সেই মালির গল্পটা মনে পড়ে গেল। আমি ভালভাবেই বললাম, 'নানা কারণে আমার খাওয়া সম্ভব নয়। তাই যেন কিছু মনে করবেন না, তবে সনৎ নিশ্চয়ই যাবে।' জীতেন্দ্রপ্রতাপ চলে যাবার পর বাবা আমাকে বললেন, 'ঠিকই করেছ, মৈহার বড় খারাপ জায়গা, কারুর বাড়ি যাবে না এবং কিছু খাবে না, কার মনে কি আছে ভগবানই জানেন।'

মৈহার থাকাকালীন, কত রাজ জ্যোতিষী এসেছে টাকার লোভে, রাজার কুষ্ঠি এবং হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলবার জন্য। দক্ষিণের কিছু জ্যোতিষীর, জ্যোতিষ বিষয়ে কিছু জ্ঞানও আছে দেখেছি। কিন্তু কারুর উপর আমার বিশ্বাস হয় নি কেবল একজন ছাড়া। বাবা এইসব জ্যোতিষীকে আপ্যায়িত করতেন, কিন্তু কাউকে হাত দেখাতেন না, কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন। যেহেতু রাজা মৈহারে থাকতেন না, তাই সব জ্যোতিষীরা কয়েকদিন থেকে মৈহার ছেড়ে চলে যেতো।

হঠাৎ একদিন আবার অন্নপূর্ণা দেবীর হিষ্টিরিয়া হোল, বাবা খুব ঘাবড়ালেন। বাবা বললেন, 'ছাতার ডাক্তার কি ওষুধ দেয় জানি না। একদিন পরে ঠিক হয়ে যায় বটে, তবে বরাবরের জন্য ভাল হয় না কেন?' বাবাকে আর কী বলব।

১৫

মৈহারে দীর্ঘদিন থাকাকালীন আমার কেবল দুবার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল। তবে গ্যাসট্রিক পেন এবং অ্যানিমিয়াতে বেশ কয়েকবার ভুগেছি। গ্যাসট্রিক পেন হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে কিছু বলতাম না পাছে ঘাবড়ান। এই না বলার ফলে একদিন বাবা আমাকে ভুল বুঝলেন।

কয়েকদিন ধরেই পেটে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। সব কাজও করে যাচ্ছি, নিয়মিত হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এসেও খাচ্ছি কিন্তু বাবাকে কিছু বলি না। বললেই ঘাবড়াবেন এবং বলবেন কাশীর থেকে কাউকে ডেকে পাঠাও কেননা 'লখছন' ভাল নয়। লক্ষণ কথাটাকে বাবা 'লখছন' বলতেন। মাকে আমার পেটের ব্যথার কথা বলতাম, কয়েকদিন খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কম খাই। মা বলতেন 'বেটা ঠিকমত ওষুধ খাও।'

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ আশিসের জ্বর হলো। ডাক্তার এল, ওষুধ দিলো, তিনচার দিনেও যখন জ্বর কমল না তখন ডাক্তার চিন্তিত হলেন। বললেন, টাইফয়েড হয়েছে। এখন যেমন টাইফয়েড শীঘ্র সেরে যায়, সে সময় তা ছিলো না। বাবা খুব ঘাবড়ালেন। ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়ে বললেন, ওষুধ এনে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে পরের দিন সকালে খবর দিতে। বাবা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে টাকা নিয়ে আমার হাতে দিলেন। সকাল এগারোটা বেজেছে, সেই সময় আমার পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছে। আমার চোখে এবং মুখে বোধহয় তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বাবার নজরে তা এড়ায় নি। বাবা আমার হাত

থেকে সেই প্রেসক্রিপশন নিয়ে বললেন, 'এই দুপুরে তোমার যেতে কষ্ট হবে সুতরাং আমিই যাচ্ছি।' উত্তরে বললাম, 'আপনি কেন যাবেন, আমিই যাচ্ছি।' বাবা বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হলো বিরক্তি ভাব, আমার নাতির এই কঠিন রোগ হয়েছে, সুতরাং আমিই যাব।' এই কথা শুনে বাবার হাত থেকে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, 'আশিস কেবল আপনার নাতি? আমার ভাইপো নয়?' গলার আওয়াজটা জোরের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছিল। বাবার হাত থেকে সেটা নিয়ে সোজা ওষুধ কিনতে চলে গেলাম। ওষুধ কিনে যখন বাড়ী এলাম, বাবাকে দেখলাম পায়চারি করছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, 'আরে আরে, তোমার মায়ের কাছে শুনলাম কয়েকদিন ধরে তোমার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে, খাবার কম খাও, অথচ আমাকে কেন বলো নি?' গম্ভীরভাবে বললাম, 'আপনি চিন্তা করবেন বলে বলি নি।' বুঝলাম আমার যাবার পর মা বলেছেন আমার পেটের ব্যথার কথা। বাবাও বুঝেছেন। তাই মনে মনে লজ্জিত হয়েছেন। অথচ ওষুধ আনতে যাবার সময়, আমি বাবার মুখের ওপর জোরে কথা বলেছি ভেবে মনে ভয় হচ্ছিল, বাড়ীতে গেলেই বাবা বোধহয় ফেটে পড়বেন। কিন্তু হলো না তা।

খেতে বসে নিজের মনেই বারবার বাবা বলতে লাগলেন, 'লোকে বলে আমি রাগী, আরে বাবা, এ তো হলো আমার বাবা রাগী। আরে পেটে কষ্ট হয় কেন? ভগবানের দয়ায় যতটা পারি ভাল খাবার আনি, তা সত্ত্বেও পেটে ব্যথা! পেটে যদি ব্যথাই হয় তালে আমাকে বলা উচিত। পেটে ব্যথা হওয়ার জন্য মুখের কোঁচকানো ভাব দেখে আমি ভুল বুঝেছিলাম। সেটা কি আমার দোষ?'

হয় ভগবান! বাবার চরিত্রের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। বাবার মুখের ওপরে এত জোরে কথা বলা কেউ ভাবতে পারবে না। মৈহারে থাকাকালীন এই রকম পরিস্থিতিতে কয়েকবার বেশ জোরেই বাবাকে বলেছি, যা কিনা বাবার কোনো ছাত্রের পক্ষে স্বপ্নাতীত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা বলতে আমি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত। বহুসময় বাবার ভয়ে নীরব থাকলেও কয়েকবার এইরকম জোরেই প্রতিবাদ করেছি। প্রত্যেকবার প্রথমে রেগে গেলেও, পরে নিজের মনে আমাকে শুনিয়ে বলেছেন, 'ওরে বাবা, এ তো আমার বাবা রাগী।'

পরের দিন আমার পেটের ব্যথাটা চরম অবস্থায় পৌঁছাল। অন্নপূর্ণা দেবী সবদিকে খবর রাখেন। বুদ্ধা চাকর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি কেমন আছেন।' বুদ্ধাকে বললাম, কয়েকটা ট্যাবলেট কিনে আনতে।' কিছুক্ষণ পর বুদ্ধা এসে আমাকে প্রেসক্রিপশান এবং টাকা ফেরৎ দিলো। বুদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিনা টাকায় কি করে ওষুধ নিয়ে এলে?' সে বলল, 'দিদিই টাকা দিয়েছেন।' যেহেতু বাবার এখানে সব কাজ করি, অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে যে কেবল শিক্ষাই দিয়েছেন তাই নয়, নানাভাবে আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। পরে বুঝছি, পরের বিপদে কত লোককে সাহায্য করেছেন এবং উপস্থিত এখনও করে থাকেন। স্বচক্ষে কিছু দেখেছি এবং অনেক কথা পরের কাছে শুনেছি।

আজকের যুগে কেউ কাউকে কোন উপকার করলে, সে সকলকে বলে বেড়ায় অমুকের জন্য এই সব করেছি। অবশ্য এর ব্যতিক্রম কিছু লোককেও দেখেছি, যারা কখনও বলেন না। সেই ব্যতিক্রমী মানুষদের মধ্যে অন্নপূর্ণা দেবী একজন।

বাবা এলাহাবাদ থেকে আসার প্রায় দশদিন পর, বাবার কাছে শিখতে গেলাম। আশিসের টাইফয়েড ঠিক হয়ে গিয়েছে, তবে সে খুবই দুর্বল অনুভব করছে। শেখবার সময় বাবা আমাকে এক অদ্ভুত বন্দিশের গৎ শেখালেন। আমার বাজনা শুনে বাবা আজ বকলেন না। বরং আজ প্রশংসা করে বললেন, 'এতদিনে তো বুঝতে পার, সাধনা করলে ঠিক রাস্তা দেখতে পাবে। এখন সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ওঠাতে পার। করতে যাও করতে গেলে পাবেই পাবে।' বাবার অবর্তমানে সেই যে শিক্ষা এবং সাধনা করেছি তারই পুরস্কার। বাজাবার পর বাবা বললেন, 'কয়েকদিন ঠিকমত বাজাতে পারোনি, আশিসের এবং নিজের শরীর খারাপ থাকার জন্য। তবে একটা কথা বলি, সর্বদা মনে রেখো, মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়, সময়ের দয়া মায়া নেই। সময় হল কাল। সময়ের সঙ্গে চলতে পারো ভালো, না পারলে সময়ই তোমায় ছেড়ে চলে যাবে। অসুখ করায় একটা দিন চলে গেল। যতই অসুখ করুক, যতই কাজ থাক, তার মধ্যেও অন্ততঃ পাঁচ মিনিটও যন্ত্র নিয়ে একটু বসতে হবে। সঙ্গীতে প্রবেশ করতে হবে। ইন্দ্রিয় দমন, দান এবং শিক্ষা করতে হবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করে, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে মাতেশ্বরীর আরাধনা করলেই, তবে তাকে পাওয়া যায়। এই তিনটে না থাকলে সাধন মার্গে প্রবেশ করা যায় না। সঙ্গীতে এখনও অনেক শিখতে হবে। শিক্ষা করলে শ্রুতি কী বুঝতে পারবে। এ তো চোখে দেখা যায় না। বিনা শিক্ষায় 'আন্দোলন' বুঝতে পারবে না। 'আন্দোলনের' জায়গায় অনেকে যা বাজায় তাকে ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। না শিক্ষা করে, অপরের যাতা বাজনা শুনে বাজালে, গুণীজনেরা আতাই বলবে। সুতরাং চোখবুজে ধ্যান করলে বিশ্বাস দৃঢ় হবে, তারপর চোখ খুললে বিবেকের সন্ধান পাবে। এ ছাড়া, যশের আকাঙ্ক্ষায় প্রেরিত না হয়ে, ব্যক্তি অনেক বড় কাজ করতে পারে। যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হলে, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রবৃত্তিই হবে না। কীর্তির কামনার নাম তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা অর্থাৎ যশের আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়।'

বাবা বলে চলেছেন, 'আশীর্বাদ করি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হও। তবে বড় হলে মনে অহঙ্কার আনবে না, মনে রাখবে, যতই বড় হও, উপরে একজন আছেন, তার কাছে তুমি তুচ্ছ। সুতরাং বড় যদি হতে চাও, ছোট হও আগে। ছোট হলেও যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারবে। মোহ থেকে দূরে থাকবে। মোহ থেকে কষ্ট হয় মনের মধ্যে। যখন মানুষের, মন ও বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন বুদ্ধি অন্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তখনই হয় বিপদ। দৃঢ় সংকল্প রাখা ভালো, কিন্তু তার সঙ্গে বুদ্ধি এবং ধৈর্য রাখবার ক্ষমতা যেন না হারায়। এ হলেই বিপদ। মনে রেখো, সাধনার সঙ্গে ধৈর্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই দুই হল টাঙ্গার চাকার মত। দুইটির একটি যদি না থাকে, তাহলে টাঙ্গা চলবে না। এইখানেই লোকের পরাজয় হয়। একটা কথা জীবনভোর ভুলো না, সঙ্গীতের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল সত্য এবং শীল। কোন পরিস্থিতিতেই পতাকা পড়তে দেয় না। যার পরিবর্তন নাই তাকে সত্যকেতু বলে, আর যা বদলায় তাকে কালকেতু বলে, অর্থাৎ এদেরই অবসরবাদী, মতলববাজ বলে। কিছু লোকের কাছে আদর্শের কোন মূল্য নাই, তারা অবসর এবং স্বার্থের অনুকূলে চলে। প্রকৃত সত্যের অর্থ হল পরম সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি। সমাজে অবসরবাদীর সংখ্যাই বেশী।

একেই বলে 'পারটি পারটি।' এখন মৈহারে আছো, এই অবসরবাদীদের দেখতে পাচ্ছ না, যখন ভাল বাজাতে পারবে এবং বাইরে গিয়ে বাজাবে, তখন দেখবে বেশীর ভাগ লোকই অবসরবাদী, এরা লোকের অহিত চিন্তা করে। নিজের দলকে ভারী করার জন্য চামচাদের ভরণপোষণ করে। একেই বলে 'পারটি পারটি'। এ সব থেকে দূরে থাকবে। সঙ্গীত হল সাধনার ধন।'

একনাগাড়ে বাবা বলে গেলেন আর আমি মনে মনে ভাবছি যেন কথামৃত শুনছি। আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বাবা বললেন, 'তুমি তো অনেক লেখাপড়া করেছ, অনেক কিছু জানো। আমি তো লেখাপড়া করিনি। আল্লা যা বলায় তাই বলি। আজ তোমার বাজনা শুনে খুশী হয়েছি। যদি দিনরাত সর্বদা চিন্তন, মনন, শিক্ষা এবং সাধনা করো তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হবে। আমার কথাগুলো চিন্তা করো। মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা হবে। যতক্ষণ এই জিজ্ঞাসা শ্রদ্ধাযুক্ত না হয়, ততক্ষণ সঙ্গীত অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ তামাক খাবার পর বললেন, 'খুশী হয়েছি বলে ভেবো না খুব ভাল বাজিয়েছ। এ বাজনা হলো ছাতার বাজনা। এখন সবে মাটির ভেতর গাছের শেকড় ঠিকমত লেগে গেছে। এখন রোজ জল দিতে হবে, তবেই গাছ বাড়বে এবং তবেই ফল ফলবে। তুমি তো কাশী থেকে এসেছ, কাশীর ল্যাংড়া কত বিখ্যাত। একদিনে কি ল্যাংড়া হয়? তার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ল্যাংড়া আম যখন ফলবে তখন নিজে খেয়েও আনন্দ পাবে এবং লোককে দিলেও লোকে ভাল বলবে। সঙ্গীত, কুমড়োর ডাঁটা বা নটে শাক নয়। ঋতু অনুযায়ী মাটিতে বীজ পুঁতে দিলেই লকলক করে কুমড়োর ডাঁটা এবং নটের শাকে ভরে যাবে। তুমি আমার কত কাজ করো, নাতিদের এত সেবা শুশ্রূষা করো, আমাকে ঋণী করে রেখেছ। আমি তোমায় কিছুই দিতে পারি না। সারা জীবন ধরে যে সঙ্গীতের খুঁদকুড়ো সংগ্রহ করছি, তাই অকাতরে দিতে পারি। এ ছাড়া তো আমার কাছে আর কিছু নাই।'

বাবার এই কথাগুলো বহুবার শুনেছি। শুনে শুনে মনের মধ্যে দানা বেঁধে আছে। আসলে বাবা যে কিছুদিন আগে বকেছিলেন, তার জন্যই এই অমূল্য উপদেশ দিয়ে আমার ঘায়ে প্রলেপ দিচ্ছেন। আজও যখন এই কথাগুলো ভাবি, মনে হয় বাবার ভেতর কত বড় ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিলো। সকলের মধ্যে থেকেও, একেবারে আলাদা জগতের লোক ছিলেন। তার জন্যই তো তিনি বরেণ্য, পূজনীয় এবং অনন্য।

এলো রমজান। অন্নপূর্ণা দেবী আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন রমজানে বাবার কিরকম মেজাজ থাকবে। একমাস রমজান চলবে। বাবা সুর্যোদয়ের আগে কিছু খেয়ে নেবেন। সূর্য উদয়ের পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও খাবেন না, তামাক খাবেন না। এক কথায় নির্জলা উপবাস। সূর্যাস্তের পর প্রথম সরবৎ খাবেন। তারপর খাবার খেয়ে শোবার আগে তামাক খাবেন। যার ঘন ঘন তামাক খাওয়া অভ্যাস, সেই তামাক না খেয়ে দিন কাটানো ভাবা যায় না। এর উপর, এই গরমে জল না খেয়ে থাকা কল্পনার বাইরে।

সন্ধ্যার পর সর্বপ্রথম মাটির সরায় ঠাণ্ডা জল, তারপর খাবার খেয়ে সর্বশেষে তামাক খাবার পর বাবার মেজাজ ঠিক হয়। সন্ধ্যার পর বাবা নিজে বাজান এবং শেখানও। অন্নপূর্ণা

দেবীর কাছে এই সব কথা শুনে বুঝলাম বাবার মেজাজ কী রূপ নেবে। তাই এই সময় রাত্রে আর শিখতে যাব না।

রমজানের প্রথম দিনে সকালে আমি সবে চিঠি এনে বাবাকে পড়ে শুনিয়েছি, কি উত্তর দিতে হবে জেনে নিয়ে ভেতর থেকে বেরোচ্ছি ইতিমধ্যে নিখিল এসে বাবাকে প্রণাম করে বলল, আগামীকাল সে এক মাসের জন্য কলকাতায় যাবে। কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে তার বাবার শরীর খারাপ। একথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম নিখিলের কপালে দুর্গতি লেখা আছে। এমনিই রমজানে সকাল থেকে তামাক না খেয়ে বাবার মেজাজ খারাপ।

মানুষের জঠরে আগুন জ্বললে কিংবা অতিশয় ক্রুদ্ধ হলে, আন শুনতে ধান শোনে। তাই হঠাৎ বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'ফুসুর ফুসুর করে কী বলছ? আরো জোরে বলো শুয়ার কে বচ্চে!' নিখিল এবার জোরেই কথাটা বলল। বাবা ব্যাপারটা বুঝে বললেন, 'তোমার বাবার যখন শরীর খারাপ, নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু গিয়ে রিয়াজ করবে। তবে এখানে আসবার আগে চিঠি লিখবে। আমি যদি কোন কারণে না থাকি তা হলে বৃথা এসে কি করবে? সুতরাং আমার বিনা অনুমতিতে কখনই আসবে না। যাও আজ রমজান। কাল তোমার সকালে গাড়ী।' নিখিল বলল, সকালে বাসে সে সাতনা চলে যাবে। বাবা বললেন, 'এখন রমজান। সারাদিন জল তামাক খাই না, তাই মেজাজ খারাপ থাকে, কখনও সকালে ঘুমিয়েও পড়ি। সুতরাং সকালে কাল যাবার আগে, আর আসবার দরকার নাই। ভালোয় ভালোয় বাড়ী গিয়ে বাবার সেবা করো। শীঘ্র ভাল হয়ে যান, প্রার্থনা করি, এখন যাও।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নিখিল বেরোতেই বললাম, 'রমজানের সময় সন্ধ্যায় এলে বাবার মেজাজটা ভালো থাকত। সকালে এসে খুব ভুল করেছেন।' রমজানের একটা মাসে আমার নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হলো।

বাবা অকারণেও ক্রুদ্ধ হন। কখন কার ঘাড়ে কোপ পড়ে সেই শংকা। এই কোপ অন্ধ, দয়ামায়া শূন্য। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে খান খান হয়ে ফেটে পড়তে দেখা যায় বাবাকে। দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এছাড়া ক্ষতি অবশ্য শেষ পর্যন্ত কারোরই হয় না যদি চুপ করে থাকা যায়। কিন্তু সারাক্ষণের এই উদ্বেগ ক্ষতিরও বাড়া। সেইজন্য বাড়ীর সবাই নীচু স্বরে কথা বলে। বাড়ীতে কোন আওয়াজ নেই। মৈহারের বাড়ীতে দিনও মনে হয় গভীর রাত্রি। এই কারণে সারাদিনের নীরব প্রতীক্ষা। সন্ধ্যার পর জল পান এবং খাবার খেয়ে তামাক খাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সারাটা দিনের ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যায়। তারপর কিছুক্ষণ আরাম করে শুয়ে পড়েন। বারবার তামাক খান। রাত্রে খেয়ে, ঠিক দশটার সময় আলো নিভিয়ে দেয় সকলে।

রমজানের দ্বিতীয় দিনেই আমার পেটে ব্যথা আবার শুরু হল। মনের জোরে দাবিয়ে রাখি কারণ বাবা ঘাবড়াবেন। বাবা সকালে এবং দুপুরে মাঝে মাঝেই শুয়ে থাকেন। ঘুমিয়েও পড়েন। যদিও স্নান করেন ঠিক ঘড়ি দেখে দুপুর বারোটায়, কিন্তু কয়েকটা ব্যতিক্রমও আছে। সকালে এবং দুপুরে মাঝে মাঝে বই পড়েন। বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন।

রাত্রে তামাক খাবার পর, শিখবার জন্য আমাকে ডাকলে, বলতাম, 'এখন রিয়াজ করছি, পরে শিখব।' বাবা আশিসকে নিয়ে বসতেন।

রমজানের পঞ্চম দিনে বাবার এলাহাবাদ যাবার কথা, রেডিওতে বাজানোর জন্য। মা বললেন, 'এবারে বাজাতে যাওয়ার দরকার নাই। গরমে কষ্ট হবে।' বাবা বললেন, 'যখন কথা দিয়েছি তখন মাথা দিয়েছি।'

বাবা সকালে এলাহাবাদে গেলেন। আমার পেটের ব্যথা খুব বাড়ল। তা সত্ত্বেও যেহেতু অন্নপূর্মা দেবী চলে যাবেন, তাই সকাল থেকে আগের বারের মতই রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমাকে তিনি শেখালেন। পাঁচ দিনে অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে যা শেখালেন তা অকল্পনীয়। খাতায় যা যা লিখে দিয়েছিলেন, সব আমার হাত দিয়ে উঠিয়েই তবে ছুটি। বাবার কাছে আলাপ শিখিনি। তাঁর কাছে তখনও গৎ, তান এবং তেহাই শিখছি। সকালে 'বিলাবল', 'ভৈরবীর' মধ্যে পালটা থেকে ঝালা পর্যন্ত ক্রমানুসারে বাজিয়ে, কেবল দুনী গৎ শিখেছি। দুপুরে 'ভীমপলাশী', 'কাফী', এবং রাত্রে 'ইমন' চলছে। অথচ অন্নপূর্ণা দেবী 'ইমনের' আলাপ, জোড়, ঝালা শিখিয়েছেন। এ ছাড়া পাল্টা, বোল, মীড়, গমকের কঠিন অঙ্গও শিখিয়েছেন। এ ছাড়া যা শিখিয়েছেন তাতে অন্নপূর্ণা দেবীর অবর্তমানে, বাবার কাছে শিখবার সময় আমাকে বকুনি কমই খেতে হয়েছে।

পাঁচদিন পরে বাবাকে স্টেশনে আনতে গেলাম। যদিও রমজান চলছে, এলাহাবাদ থেকে বিস্কুট এবং পাঁউরুটি এনেছেন। সকালে নাস্তার সময়, বাবা নাতিদের ডেকে বললেন, 'নাও, ইনজিরি খানা খাও।' টোস্ট খাও। সকালে টেলিগ্রাম এলো। টেলিগ্রামে আলি আকবর জানিয়েছে, পরের দিন দুপুরে লক্ষ্ণৌ থেকে মৈহারে এসে পৌঁছবে গাড়ী করে। এ খবর পেয়ে বাবার আনন্দটা বাইরে থেকে না বোঝা গেলেও ভেতরে যে খুশীই হয়েছেন তা বুঝললাম। আশ্চর্য এত পুত্র স্নেহ, কিন্তু বাইরে তার একটুও প্রকাশ নাই। সকালে নাস্তার সময় মা পাউরুটি ডিম দিয়ে এত সুন্দর করেছেন, যে আগে কখনও এরকম খাইনি। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি করেছেন?' মা বললেন, 'আল্লা যা দেখিয়ে দেয় তাই করি।'

রান্নার বিষয়ে একটা কথাই বলতে পারি, এমনিতে মা'র হাতের যে কোন রান্নারই তুলনা হয় না, কিন্তু ডাল এবং মাছের এক বিশেষ পদের কথা মনে পড়ে, যা এ যাবৎ আমি কোথাও খাইনি। যদিও এ তত্ত্বটা বোঝার ব্যাপারে আমার জ্ঞান শূন্যাঙ্কের নীচে, তবু বার কয়েক খাওয়ার পর, মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ব্যাপারটা কী? কি করে করেন? নামটাই বা কী?' মা বলেছিলেন, 'মাছের হালুয়া' মা এর নাম দিয়েছেন 'গাড্ডা'। প্রচলিত রান্নার বইয়ে এ নাম কেউ পড়েন নি, এ আমার স্থির বিশ্বাস। মাছকে সিদ্ধ করে সব কাঁটা বের করে দিয়ে, তারপর সবরকম মশলা দিয়ে ভাজা, হালুয়ার মতো। মার ছিলো নিত্য নতুন রান্নারই আনন্দ। আর এই সৃষ্টিধর্মিতার পেছনে কোন তালিম ছিলো না। বলতেন, 'আল্লা দেখিয়ে দেয়।'

পরের দিনে, ঠিক আড়াইটার সময় আলি আকবর মৈহারে পৌঁছালেন। বাবাকে প্রণাম করবার পর, প্রথম বারের মত এবারেও সেই তিনটে প্রশ্ন, 'কোথা থেকে এলি? কোথায়

যাবি? যন্ত্র এনেছিস কী না?' মাথা নীচু করে, হাত জোড় করে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর, লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে, এলাবাহাদে ফিরে যাবে এবং যন্ত্রটি ঠিক করবার জন্য এলাহাবাদে রেখে এসেছে। অতঃপর যন্ত্র নিজের কাছে না রেখে, এলাহাবাদে রেখে আসবার জন্য বাবার মৃদু ভর্ৎসনা। কেবল একটিই কথা, যাও মায়ের কাছে। আলি আকবর হাতজোড় করে যে ভাবে ঘরে ঢুকেছিলেন সেই ভাবেই পিছু হটে ঘরের বাইরে চলে এলেন। তাঁর মত পিতৃভক্তি আজকের যুগে কল্পনা করা যায় না। আলি আকবরকে রমজান পালন করতে দেখলাম না। বাবাও তার জন্য কিছু বললেন না তাঁকে। এতক্ষণ সে আসবে বলে ঘরের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। তাঁর আসার পর বই পড়তে লাগলেন। আজ আর ঘুমোলেন না।

অতঃপর আলি আকবর আমাকে ডেকে উপরে নিয়ে গেলেন। বাড়ীর সব খবরাখবর নিলেন। সন্ধ্যার সময় আমি যে সময় বাজাই হঠাৎ দেখি আলি আকবর আমার ঘরে এসে বসলেন। আমার বাজনা শুনে উৎসাহ দিলেন। এরপর নিজের থেকে বললেন, 'ছেলেদের পড়াশুনায় মন নেই, সুতরাং নিঃসঙ্কোচে ওদের শাসন করবে।' তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম।

পরের দিন বাবা আমায় বললেন, 'আলি আকবরকে ডাকো।' তাঁকে ডেকে আনলাম। দেখি বাবা নিজের ছোট সুরশৃঙ্গারটা তাঁর সামনে রেখে বললেন, 'সুর-শৃঙ্গার কী করে বাজাতে হয় জেনে রাখো।' তারপর উজির খাঁর ফটোকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রণাম কর।' আকি আকবর প্রণাম করলেন। বাবা এবার বললেন, 'যা তোর মাকে প্রণাম করে আয়।' আলি আকবর ও আমি দুজনেই মাকে প্রণাম করে এলাম। ঘরে ঢুকে বাবাকে আমরা প্রণাম করলাম। বাবা বললেন, 'সুরশৃঙ্গার যন্ত্রখানি বড় মধুর। বুঢ়া বয়সে সরোদ বাজাতে কষ্ট হলে, সুরশৃঙ্গার বাজাবি একান্ত মনে। বাজাবার কৌশল, কি রকম তার লাগাতে হয়, সব বোঝালেন। তারপরে বললেন, 'জীবনে আমি মস্ত বড় ভুল করেছি সব বাজনা বাজিয়ে। সে সময় ভাবতাম বেহালা শিখি, তবলা, মৃদঙ্গ, সুরশৃঙ্গার, রবাব, ক্লারিওনেট এবং বহু যন্ত্রও শিখি। যত সময় দিয়েছি প্রত্যেকটা বাদ্যযন্ত্রে, তা না দিয়ে যদি সরোদেই দিতাম, তাহলে আজ বাজনা অন্য রকম হোতো। তোমরা, তা কোরো না। তবে সুরশৃঙ্গার আমার গুরুর বড় প্রিয় যন্ত্র ছিলো এবং বাজনাটার আওয়াজও বড় মধুর। আমার পরে তো আর কেউ বাজাবার থাকবে না। তাই তোমাদের বলছি, বুঢ়া বয়সে সরোদ বাজাতে কষ্ট হলে, নিজের মনের শান্তির জন্য এই সুমধুর যন্ত্রটি বাজাবে।' এই কটি কথা বলে, সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি বাবা আলি আকবরকে দিলেন। আলি আকবর প্রণাম করে যন্ত্রটি নিয়ে উপরে চলে গেল।

বাবা ঘরে খাটে গিয়ে বই পড়তে লাগলেন। আলি আকবর আমাকে উপরে ডাকলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর সামনে নানা বিষয়ে কথা হল। ভাই বোনের ভালোবাসা, আমার চোখে পড়ল এখানে। আলি আকবর কত সমীহ করে অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, যা আমার কাছে বিস্ময়। ভাইবোনের এরকম ভালোবাসা আগে আমার চোখে পড়ে নি। দুই রাত্রি কাটিয়ে, তৃতীয় দিন সকালেই তিনি গাড়ী করে এলাহাবাদ চলে গেলেন।

সকাল, দুপুর এবং রাত্রে রোজ বাজাই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার দ্বারা কিছু

হবে না। কত মূর্খ ছিলাম আগে, ভেবেছিলাম ছয় মাস শিক্ষা গ্রহণ করেই কাশী চলে যাব। কিন্তু, রেডিওতে বাবা, আলি আকবর ও রবিশঙ্করের বাজনা শুনে মনে হয়, এখনও কতো শিখতে হবে। এখন তো সবে শুরু হয়েছে।

পরের দিন অন্নপূর্ণা দেবীকে নিজের মনের কথাটা জানালাম। অন্নপূর্ণা দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যে কোন জিনিষ এক দুই বছরে কী হয়? আপনি যে এম.এ. পাশ করেছেন তার জন্য কত বছর কলেজে পড়েছেন। পড়ারও কী শেষ আছে? লেখাপড়া করার পর গবেষণা করতে হয়। ঠিক সেইরকম সঙ্গীতেও। আপনার মত অবস্থা সকলেরই ছিলো। আপনি ছোট থেকে শিক্ষা পান নি। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাজিয়ে, এখন তো অন্ততঃ এতটুকু বুঝতে পারেন, যখন এসেছিলেন তার থেকে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সকলে জানে বাবার কাছে শিখছেন, অথচ ভালো বাজিয়ে কাশীতে না গেলে, তাদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে? নিজের দুর্বলতাকে সর্বদা ঘৃণা করবেন। মনের মধ্যে জিদ আনতে হবে। লেখাপড়া না করেও যখন সকলে বাজাতে পারে, তখন আপনি বা কেন বাজাতে পারবেন না। এটা ঠিক, বাজনা শুরু করেছেন একটু দেরীতে, কিন্তু আপনার লেখাপড়া, সংগীতে অনেক সাহায্য করবে। আপনার বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া করতে পেরেছেন, তাহলে বাজাতে পারবেন না কেন? আসলে সঙ্গীতকে ভালোবাসতে হবে, দিনরাত চিন্তা করতে হবে, গুন গুন করে নিজের মনে গাইতে হবে। আসলে আপনার একগুঁয়েমির অভাব। মানুষে যদি ভাবে, অন্যে যখন পারে তখন আমি কেন পারব না? ভালো কাজের জন্য একগুঁয়েমি করা ভাল, খারাপ কাজে এই একগুঁয়েমি ভাল নয়। এখানে এসেছেন বাজনা বাজাতে। জানি আপনাকে এখানে অনেক কাজ করতে হয়, তাহলেও রাত্রি তিনটে অবধি রিয়াজ করতে পারেন।'

'রাত্রেই তো সাধনা করবার সবচেয়ে ভালো সময়। আপনি কি জানেন না, বাবা সারা রাত্রি ধরে কত কষ্ট করে রামপুরে সাধনা করতেন? এক একটা সুরকে কত রকমে বিস্তার করা যায়, যেমন শিখিয়েছি, রাত্রে সেগুলো বাজাবেন। মন প্রাণ দিয়ে সাধনা করুন, তাহলেই দেখবেন আপনার মনের সংশয় দূর হয়ে যাবে। সঙ্গীতে এক দুই বছরে কিছুই হয় না। বাবার কাছে বরাবর শুনে এসেছি, অন্ততঃ তিরিশ বছর পর সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, ঠিকমত সাধনা করলে। বাজনা তো সকলেই বাজায়। আপনি তো মৈহারে আসার পরই রেডিওতে বাজিয়ে এলেন। ছয় বৎসর কঠিন পরিশ্রম করলে আপনিও বাজাতে পারবেন। এখন তো আপনার একবছরও হয়নি। এর মধ্যেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। লেখাপড়া করে এটা তো বোঝা উচিৎ যে, কোন বিদ্যা কয়েকবছরে হয় না। সিলসিলামত বাজালে মনের সংশয় দূর হয়ে যাবে। আলোর রাস্তা দেখতে পাবেন।'

অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে কথাগুলো শুনে মনের মধ্যে যেন জোর খুঁজে পেলাম। আমার রিয়াজ পরের দিন থেকেই বাড়িয়ে দিলাম। অনেক রাত্রি অবধি বাজাতে লাগলাম। আজ মনে হয়, অন্নপূর্ণা দেবীর উপদেশ আমার সাধনার মোড় ঘুরিয়ে দিলো। মৈহারে দীর্ঘ সাতবৎসর থাকাকালীন, অনেকবার মনে হয়েছে, আমার দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে, সেই সময় অন্নপূর্ণা দেবীর উপরিউক্ত কথাগুলি আমার মনে পড়েছে।

ঘরে যখন বাজাই, তখন অন্নপূর্ণা দেবীর উপরের ঘরে আলো জ্বলে দেখতে পাই। রাত্রে গল্পের বইও পড়েন এবং সাইকোলজি ও এ্যাবনরমাল সাইকোলজির যে বই আমি দিয়েছি নিয়মিত পড়েন। পরের দিন থেকে বহুরাত্রি অবধি বাজাতে লাগলাম একমাত্র শুক্রবার ছাড়া, যেহেতু সেদিন বাজনা বন্ধ এবং কেবলমাত্র ওইদিনই। কয়েকদিন পরে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'রাত্রে এইরকম বাজাবেন। আমি বলেছি বলে আমাকে শুনিয়ে বাজাচ্ছেন। আমি চলে গেলেই তারপর রোজ সিনেমায় যাবেন, জানি। নিজের ভালো যদি নিজে না বোঝেন, তাহলে নিজেরই ক্ষতি হবে। আপনি তো আশিস, শুভ নন যে জোর করে না বললে বাজাবেন না।' আমি তো অবাক, মিতভাষী হলেও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

১৬

কাশীতে দাদার বিয়ের জন্য যেতে হবে। বাবাকে সন্ধ্যার পর বললাম, পরের দিন কাশী যাব দাদার বিয়েতে। বাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। রমজানের মধ্যে তো তুমি একদিনও শিখলে না, যাও গিয়ে যন্ত্র নিয়ে এসো।'

মৈহারে এসে এতদিন বাবার শেখাবার ইচ্ছাটা বুঝেছি। বাবার যখন মেজাজ খারাপ থাকে তখন বলবেন 'শিখবে নাকি?' এই কথা বলায় যদি শিখতে যাই, তাহলে সেদিন খুব ধমক খাই। উপস্থিত রমজানের মধ্যেও রাত্রে যখন বলেছেন, 'শিখবে নাকি?' জবাবে বলেছি, এখন যা দিয়েছেন তাই রিয়াজ করছি, পরে শিখব। বাবাও বলেছেন, 'ঠিক আছে এখন রিয়াজ করো তারপর আসবে।' বাবার যেদিন শেখাবার ইচ্ছা থাকবে তখন বলবেন, 'আরে তুমি শিখতেই আসো না, তুমি কি আমার গুরু ঠাকুর যে তোমার পা ধরে বলতে হবে শিখতে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেদিন শিখতে যাই।

আজ যখন বললেন, 'যাও গিয়ে যন্ত্র নিয়ে এসো' বুঝলাম বাবা প্রসন্ন আছেন। যেহেতু আগামী কাল চলে যাব তাই বাবা শেখাতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র নিয়ে বসলাম। প্রায় এক ঘণ্টা শেখালেন। আজ একটুও বকলেন না। বললেন, 'এতদিনে তুমি রাস্তায় এসেছ। বুঝতে পেরেছি, ঠিক রিয়াজ করেছো। এখন তো বুঝতে পারো আগে কী বাজাতে? তুমি তো আমায় আলাপ ঝালা শুনিয়েছিলে। রোজ সাধনা করবে এবং শিখতে হবে, তবে গিয়ে হবে। যাক, কাশী যাচ্ছ দাদার বিয়েতে, সকলের সঙ্গে দেখা হবে, কিছুদিন থাকতেই হবে। যন্ত্র নিয়ে যাবে তো?' বুঝলাম বাবার ইচ্ছা নয় যন্ত্র নিয়ে যাই। সেইজন্য বললাম, 'বিয়েতে যাব, বাজাবার সময় পাবো না, তাই যন্ত্র নিয়ে যাব না।' মনে হল বাবা খুশীই হলেন। বললেন, 'কেন যন্ত্র নিয়ে যাও। রোজ সাধনা করবার জিনিষ। এতদিন গিয়ে কাশীতে থাকবে, সাধনা না করলে কি করে চলবে? এ ছাড়া মৈহারে এসে অবধি কাশীতে যাও নি। তোমার সব ভাই, বৌদি কত লোক আসবে, কিছুদিন থেকে তারপর এসো।' বুঝলাম এও পরীক্ষা। বললাম, 'আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসব।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে যেমন তোমার ইচ্ছা, যা ভাল বোঝো করো। যন্ত্র যদি না নিয়ে যাও তাহলে তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, কাশীতে বাজনা নিয়ে গিয়ে সকলকে শোনাব, কিন্তু যখন

কথায় বুঝলাম, বাবার ইচ্ছা নয় যন্ত্র নিয়ে যাই, তখন নিরাশ হয়েই বলতে বাধ্য হলাম শীঘ্রই চলে আসব।

বাবা বললেন, 'শিক্ষার সব চেয়ে বড় বাধা হল কয়েকটা জিনিষ, প্রথম হলো অহংকার। সঙ্গীতের মধ্যে কখনও অহংকার করবে না। সঙ্গীতে প্রবেশ করলে বুঝবে কি নিয়ে অহংকার করবে, কত শিখবার আছে। এখন মনে হয় তোমার মতো যদি বয়স পেতাম তাহলে রিয়াজ করি। কিন্তু এখন বুড়া হয়ে গিয়েছি, রিয়াজ করবার শক্তি নাই।'

বাবা বলে চললেন, 'দ্বিতীয় হলো, ক্রোধ। যদিও আমি রাগী, আমার খারাপ জিনিষটা নিয়ো না, আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল জিনিষ দেখতে পাও, তাহলে সেটা নিও।'

'তৃতীয় বাধা হল, রোগ। এই শুয়ার কে বচ্চেরা প্রায়ই জ্বরে পড়ে, এত অসুখ হলে কী বাজাবে?'

'চতুর্থ বাধা হল, আশংকা। যদি গুরুর প্রতি বিশ্বাস না হয়, তা হলে গুরু হাজারো শেখালেও শিখতে পারবে না।'

'সর্বশেষ বাধা হলো, আলস্য। এই যেমন শুয়ার কে বচ্চে আশিস। আমার ভয়ে বাজায়। আমি না থাকলে খেলা করে, গল্প করে, দিল্লাগি করে। সময় কখনও নষ্ট করতে নাই।'

মনে মনে ভাবলাম কেন বাবা এই কথাগুলো বললেন। কিন্তু কথাগুলো খুবই দামী। অবাক হই, বাবা কি করে এই সব কথাগুলো বলেন।

ছয়ই আগষ্ট, কাশী যাত্রা করলাম। কাশীতে মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, গুল্লুজী এবং আশুতোষের কাছে মৈহারের সব অভিজ্ঞতা বললাম। সকলেই আমাকে উৎসাহ দিলেন।

মহন্ত অমরনাথ মিশ্র বললেন, বাবার কথা। এলাহাবাদে বাবার মৃদঙ্গ শুনে অভিভূত হয়েছেন। এ কথা বাবা মৈহারে আমাকে বলেন নি। বাজনা বাজিয়ে বাবা মহন্তজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই বাজনার ভাব কী?' মহন্তজী বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছিল সমুদ্রের ঢেউএর মত একবার যাচ্ছে এবং একবার আসছে।' এই কথা শুনে বাবা বলেছেন, 'মহারাজ আপনি প্রকৃত ভাব, সাধু লোক। রবাবে বাজাবার সময় এই রকমই হয়। তবে, আমার স্ত্রী বাজাতে আসবার আগে বলেছে, এই বাজনা শুনলে তোমাকে লোকে মারবে।' এই কথা বলে বাবা হো হো করে হেসেছেন। অমরনাথ মিশ্র বললেন, 'বাবা খুবই কৌতুক প্রিয়।' উত্তরে বললাম, 'বাবার বাইরের লোকের সঙ্গে এই ভাব, কিন্তু মৈহারে অন্য মূর্তি।'

আটই আগষ্ট দাদার বিয়ে হলো। বিয়ের সব কাজ হওয়া মাত্রই, বারই আগষ্ট মৈহারে রাত্রে পৌঁছলাম। রমজানের জন্য সারাদিন কষ্টের পর বাবা ঘুমিয়েছেন, সুতরাং জাগাবার ইচ্ছা হলো না। আমার খাটিয়া বাইরে থাকতো। বুদ্ধার কাছে জিনিষগুলো রেখে, খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়লাম। বুদ্ধা বলল, 'বাড়ীর ভিতর জিনিষ রাখবেন না? বাবাকে ডাকলেই দরজা খুলে দেবেন।' আমি মানা করলাম। সকালে উঠেই বাড়ীতে ঢুকেই বাবাকে প্রণাম করলাম। বাবা আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন, 'আরে আরে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? যাক ভালই করেছ। বাজনা কয়েকদিন বাজাও নি, এখন খুব বাজাও।' বললেন, 'অনেকগুলো চিঠি এসেছে, সময়মতো দেখে এগুলোর উত্তর দিয়ে দিও।' ইত্যবসরে

দেখলাম একটা ছেলে এসে প্রণাম করলো। বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর ভাইপো বাহাদুর। বুঝলাম বাবার ভাই আয়েৎ আলী খাঁর ছেলে বাবার কাছে শুনেছি, আলি আকবর, বাহাদুর এবং বাবার কয়েকটা সরোদ, বাহাদুরের বাবাই তৈরি করেছেন।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত সকালে কোন ট্রেনে এলে?' উত্তরে বললাম, 'গত রাত্রে বাইরে এসে শুয়েছিলাম। আপনার কষ্ট হবে ভেবে ডাকিনি।' বাবার এক কথা, 'আরে আরে, আমাকে ডাকো নি কেন?' আমি আর কথা বাড়ালাম না। বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হল। শুনলাম আজই কোলকাতা চলে যাবে। বাহাদুর আমার থেকে তিন বছরের ছোট। বাহাদুর সম্বন্ধে অনেক গল্প আগে শুনেছি। দুপুরেই বাহাদুর চলে গেল।

পনেরোই আগস্ট। স্কুলের ছেলেরা সকালে স্কুল-ইউনিফরম পরে মার্চ পাষ্ট তথা প্রভাত ফেরী সম্পন্ন করার পর, বাবার বাড়ীর পাশে, ছেলেদের খেলার মাঠের সামনে এসে দাঁড়াল, বিউগল বাজাতে বাজাতে। বাবা জামা পায়জামা পরে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। স্কুলের হেডমাষ্টার বাবাকে বললেন, জাতীয় পতাকা উত্তলন করতে। বাবা পতাকা উত্তলনের পর, বাড়ীত ফিরে এসেই একটি কদম গাছ লাগালেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তিন দিন পর রমজান পর্ব শেষ হবে। ভাবলাম শেষ হলেই বাঁচোয়া। ভালোভাবে শিখতে পারব তারপর।

সন্ধ্যার সময় বাবা সরবত খেয়ে খাবার শেষ করেছেন। সবে তামাক খাওয়া শুরু করেছেন হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক চার পাঁচজন মেয়ে নিয়ে ঢুকলেন। বুঝলাম খুব নিজের লোক। অতি পরিচিত না হলেও বৈঠকখানায় সোজাসুজি আসতেন না। নিজের লোক ছাড়া এত সহজভাবে অন্দরমহলে দরজা দিয়ে আসবার সাহস হতো না। সেই ভদ্রলোক 'বাবা' বলে ডাকতেই বাবা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আরে আসুন আসুন বাবাজী। আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য! এরা কারা? আমার মেয়েকে দেখছি না?' ভদ্রলোক একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হল আমার শালী, আর এরা হলো শালীর মেয়ে। মেয়েরা আমাকে ধরেছে আপনার বাজনা শুনবে বলে, তাই এদের নিয়ে এসেছি। আপনার মেয়ে এদের খাবারের জন্য রান্নায় ব্যস্ত আছে।'

আমার সঙ্গে বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবা আমায় দেখিয়ে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বললেন, 'এ আমার ধর্মজামাই, এর স্ত্রী হল আমার ধর্ম মেয়ে। বাবা ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়ে আমারও পরিচয় করালেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এর নাম যতীন। জাতে ব্রাহ্মণ।' বলেই আমাকে বললেন, 'তোমার পৈতে দেখাও।' আমি অপ্রস্তুত হয়ে জামার ভেতর থেকে পৈতে বার করে একটু দেখালাম। বাবা তারপর বললেন, 'এও আপনার মত খুব লেখাপড়া করেছে, এম.এ., ল, জজিয়তি। আমার কাছে, প্রায় একবছর হতে চলল কাশী থেকে শিখতে এসেছে।'

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আমার বাড়ী চেনেন? মৈহারে মাত্র তিন ঘর বাঙ্গালী আছে। আমাকে সকলেই বাগচী বলেই জানে। স্টেশনের কাছে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। এ ছাড়া এখন যে স্টেশন মাস্টার সেও বাঙ্গালী। এতদিন আপনি এসেছেন অথচ আমার বাড়ী যান নি? কালই আমার বাড়ী আসুন।' বাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই

যাবে, আমার জামাইয়ের এখানে যাবে না?' বাবা একটি বড় চুরুট সেই জামাইকে দিয়ে বললেন, 'নিন, বাবাজী।' ভদ্রলোককে দেখলাম সহজভাবেই চুরুট নিয়ে ধরালেন। ভাবলাম, ইনি কী রকম ভদ্রলোক, যে বাবার সামনে চুরুট খাচ্ছেন?

বাবা আশিসকে বললেন, 'যা আমার বাজনা নিয়ে আয়।' আমাকে বললেন, 'তোমার মাকে বলো এদের জন্য চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।' আমি মাকে গিয়ে বললাম। মা আমাকে দেখেই বললেন, 'কী আক্কেল এঁদের। তোমার বাবা সারদিন পরে কোথায় একটু বিশ্রাম করবে, না তার বদলে এদের বাজনা শোনাবে।।' ধীরে আমায় বললেন, 'ভেড়া, এ লোকটা বউয়ের ভেড়া। বউটির বাবা বিরাট বড়লোক ছিল। এই বাগচী বাবু হল ঘরজামাই। বউটি ভাল নয়, আলি আকবরের সঙ্গে ভাইয়ের সম্বন্ধ। কিন্তু আমার বউমা দারোগার ঝি, খুব রাগী, এর বউএর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। ঠিক আছে তুমি যাও, আমি চা করে পাঠাচ্ছি বুদ্ধার হাত দিয়ে। বাবার কাছে যখন গেলাম, ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললেন, 'আপনার বাজনা শুনবো।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে বললেন, 'যন্ত্র নিয়ে এসো।' হাতজোড় করে বাবাকে বললাম, 'আমি কী বাজাবো?' বুঝলাম বাবা খুশীই হলেন। কিন্তু বাবা মুখে বললেন, 'আপনাদের দেখে লজ্জা পাচ্ছে, পরে শুনবেন।' বাবা আমাকে বসতে বললেন। আমি বাবার কাছে মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

বাবা কি পছন্দ করেন, আর কি অপছন্দ করেন, এতদিনে আমি প্রায় বুঝে নিয়েছি। মেয়েদের দিকে তাকালেই সর্বনাশ। বাজনা মেলানো হতে হতেই চা অমলেট এসে গেল। বাবা বাজনা শুরু করলেন। বাবা 'তিলককামোদ' বাজাতে লাগলেন। বাবার বাজনা রেডিওতে শুনি। কাশীতেও চারবার বাজনা শুনেছি। কিন্তু বাড়ীতে একলা কিংবা কয়েকজনের সামনে যখন বাজান, মনে হয় কত প্রভেদ। আমার ধারণা যে ঠিক তা বুঝেছি অনেক পরে।

সবে পনের কুড়ি মিনিট বাজনা হয়েছে, এমন সময় জোরে কিছু পড়ার আওয়াজ পেলাম। চোখ খুলে ভাবলাম কিসের আওয়াজ? দেখলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে কলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব হয়ে। বুঝলাম, চায়ের কাপটি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে। আওয়াজের কারণটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। বাবা তারস্বরে চীৎকার করে বললেন, 'কৌন রে শুয়ার কে বচ্চে?' মুখে দু'বার হুঁ হুঁ আওয়াজ করে আবার সেই কথা, সেই আওয়াজ। বাবাকে বললাম, 'একটি মেয়ে চায়ের কাপ ধুতে গিয়ে, বোধহয় হাত থেকে কাপ পড়ে গেছে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলস? আরে জোরে বলো শুয়ার কে বচ্চে।' আমি এবার একটু জোরেই, বাগচীবাবু যাতে না শুনতে পায়, কথাটাকে বললাম। বাবা বুঝলেন। কলের দিকে তাকালেন। যন্ত্রটি নাবিয়ে রেখে বললেন, 'লাহোল বিলা'। ভদ্রলোক বাবাকে বললেন, 'আমার শালীর মেয়ে খুব কাজের। তাই চা অমলেট খেয়ে, বাসন এবং কাপ ডিস ধুতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে বোধ হয়। আপনি কিছু মনে করবেন না।' বাবা বললেন, 'বাজনা শোনবার সময় কাপ ধুতে যাবার কি দরকার ছিলো? চাকর এসে নিয়ে যেতো। আরে, আরে বলে গড়গড়ায় দু তিনবার টান টেনে, চুপ করে গেলেন। মেয়েটি নিজ স্থানে লজ্জায় এসে বসল। কয়েক মিনিট পরে বাবা

বললেন, 'যে রাগটি বাজাচ্ছিলাম এর নাম 'তিলককামোদ'। এ রাগটি আমার গুরু উজির খাঁ এত ভাল বাজাতেন যে, রামপুরের মহারাজা আমার গুরুর বাজনা শুনবার পর, সর্বশেষে 'তিলককামোদ' শুনতে চাইতেন। আমার গুরু এই রাগটিকে বলতেন, 'হুজুরে পসন্দ'। লোকে ভাবে 'তিলককামোদ' খুব হাল্কা রাগ। ঠুংরীতে সকলে গায়, কিন্তু 'তিলকাকামোদ' যে কত কঠিন এবং করুণ রাগ, কটা লোকে বোঝে?'

'এ রাগের ভাব কি জানেন বাবা? বাজাবার সময় মনে মনে আমি একটা দৃশ্য দেখছিলাম। গভীর অরণ্যে ঝরণার জল বয়ে যাচ্ছে। তার পাশে একটি হরিণ সদ্য প্রসব করে নিজ সন্তানের গাত্র লেহন করছে। মায়ের স্নেহ নিজের সন্তানের প্রতি করুণা ধারায় ঝরে পড়ছে। ঠিক সেই সময় একটি ব্যাধ ধনুকের মধ্যে তীর সংযোজন করে, সদ্য প্রসব করা হরিণ শিশুকে বধ করল। সেই হরিণের কী অবস্থা হল বলুন তো?' উত্তরে জামাই বাবাজী বললেন, 'হরিণটির বড়ই করুণ অবস্থা হবে।' বাতাবরণ তখন নিস্তব্ধ। আমি অবাক হয়ে শুনছি। ভাবছি চক্রদার তেহাইয়ের এক আবর্তন এখনও শেষ হয়নি। তিন আবর্তনে শেষ। অতীতে শেষ হবে না অনাঘাতে? তবলাবাদক সওয়ালের জবাব দিচ্ছে। আজ তবলাবাদকের পরিণামে যে খড়্গ ঝুলছে, বোধহয় বুঝতে পারছে না। বুঝলে তবলা রেখে পালিয়ে যেতো। বাবা বললেন, 'আপনি এত লেখাপড়া করেছেন, বিলেত থেকে পাস করে এসেছেন, আপনি কত গুণী। গুণীর মতই উত্তর দিয়েছেন। বাবা বলুন তো সেই হরিণটা কোথায়?' একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিতে দেরী করছেন দেখে বাবা বললেন, 'হরিণটা কোথায় দেখতে পাচ্ছেন না? হরিণটা হল, বলে নিজের বুকে দুই তিনবার ঘুসি মেরে দেখালেন।' বললেন, 'আমি হলাম সেই হতভাগ্য হরিণ, আর হরিণ শিশু হল এইটা।' এইটা বলে নিজের বাজনাটাকে দেখালেন। জামাইবাবাজীর মুখে আর কোন কথা নাই। 'হায় হায়' বলে দুই তিনবার নিজের কপালে চাপড়ে বললেন, 'আমি তো আমার বাড়ীতে একান্তে পূজা করি, কারোর বাড়ী পিসাবও করতে যাই না, তবে সব কুঢ়রা কেন আমার কাছে আসে?' তারপর বললেন 'বাবাজি আপনি নিজের গায়ে মাখবেন না, আপনার জন্য বলছি না, আপনি অতিথি নারায়ণ আর এই মায়েরা হল লক্ষ্মী, আপনারা এসে আমায় কৃতার্থ করেছেন। আপনাদের জন্য বলছি না। এমন এমন অসুরদের দল আমার কাছে আসে, যারা সঙ্গীতের তমিজ জানে না, তাদের জন্য বলছি। তাদের দেখলে আমি ত্রস্ত হই। আশ্চর্য হই সব অসুরদের দেখে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর, ভদ্রলোকের শালী এবং মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জগজননী ভবানী মা, একাধারে কন্যা, স্ত্রী ও মাতা। পুত্রীরূপে সমর্পণের প্রেরণা দেয়, পত্নীরূপে স্নেহ, আর মাতারূপে বাৎসল্যময়ী। সেবা, স্নেহ, সমর্পণ নারীজীবনের পরিপূর্ণতা। এ ছাড়া মেয়েদের আর একটা রূপ আছে। ওঁ ত্র্যম্বকে শ্যামা ভীমা ভয়ংকরা করাল বদনা কালী। সেই নগ্ন রূপটাকে ভাবলেই আমার ভয় হয়। খেমা কর, খেমা কর, খেমঙ্করী।' এই কথা বলে তিনি বললেন, 'মা জননীরা আপনারা কিছু মনে করবেন না।'

একনাগাড়ে এত কথা বলে গড়গড়ার নল টানতে লাগলেন। দেখলাম তামাক ফুরিয়ে গিয়েছে। কল্কে ভরে নিয়ে এসে বদলে দিলাম। বাবা খুশী হলেন। কিছুক্ষণ টানার পর কি

মনে হলো জানিনা, বললেন, 'যে ভাব নিয়ে বাজাচ্ছিলাম তা তো আর হবে না। তাই আপনারা যখন শুনতে এসেছেন তখন আপনাদের হুকুম পালন করছি। তবে এ সব কি আপনাদের ভাল লাগবে? আপনাদের সিনেমার গান বোধহয় ভাল লাগে।' ভদ্রলোক বললেন, 'বাবা আমার শালীর এই দুই মেয়ে সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।' বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তো এরা মহাগুণী। ওদের সামনে আমি কী বাজাব?' জামাইবাবাজী বললেন, 'একি বলছেন বাবা!' প্রত্যুত্তরে বাবাও বললেন, 'আমি তো কোন পরীক্ষা দিই নি, আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশও করিনি, আমি কিছুই জানি না। সচ্চি, সচ্চি বলছি।' বারবার এই কথা কিছুক্ষণ চলল। তারপর বাবা একটু বাজিয়ে শেষ করলেন। বাজনার শেষে বললেন, 'রমজান চলছে। আরো দুদিন বাকী আছে।' হঠাৎ বুদ্ধা এসে বলল, 'মাকে একটি কাঁকড়া বিছে কামড়েছে।'

মৈহারে কাঁকড়া বিছে আছে। বুদ্ধাকেও একবার কামড়েছিল। তিনদিন বিছানায় শুয়ে, ওরে মা, ওরে বাবা বলে চিৎকার করেছে। কোন রকমে খাবার খেয়েছে। জলপড়া খেয়েছে কোন লাভ হয় নি। কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ভাবলাম মার না জানি কত কষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। বাবা এবং অতিথির জন্য মুখ বুঝে সহ্য করছেন। সময় এখন প্রায় নয়টা।

কাঁকড়া বিছে কামড়েছে শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'এর খুব ভালো ওষুধ স্টেশন মাস্টারের কাছে আছে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আমার নাম করে ওষুধটা নিয়ে আসুন। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। কাঁকড়া বিছের কামড়ে ভীষণ কষ্ট হয়।' বাবা বললেন, 'এত রাত্রে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ী কেউ যায় নাকি?' ভদ্রলোককে বললেন, 'কিছু হবে না, আপনি চিন্তা করবেন না। রাত্রি হয়েছে আপনারা বাড়ী গিয়ে খাবার খান। আপনাদের জন্য আমার ধর্ম মেয়ে, না খেয়ে বসে আছে।' ভদ্রলোক কয়েকবার বললেন, ওষুধটার কথা, কিন্তু বাবা কিছুতেই আমাকে যেতে দিলেন না।

ভদ্রলোক অতিথিদের নিয়ে চলে গেলেন। বাবা মায়ের কাছে গেলেন। আমিও গেলাম সঙ্গে। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?' মা'র মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, বুঝলাম খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে আরে, শুনলাম কাঁকড়া বিছে কামড়েছে, কোথায় ছিল বিছে?' মা অতি কষ্টে বললেন, 'রান্না ঘরের কাছে যেখানে জ্বালাবার কাঠ থাকে, সেখানেই কাঠ আনতে গিয়ে কাঁকড়া বিছে কামড়েছে।' বাবা বললেন, 'খালি নখড়া'। বাবার কয়েকটি কথা যা তিনি অধিক প্রয়োগ করেন, সেই কথাগুলি বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। নখড়া মানে ন্যাকামি। এই কথাটা হিন্দি ভাষায় প্রয়োগ হয়। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, বাবা নখড়া বলেই ক্ষান্ত হলেন না। পরমুহূর্তেই বললেন, 'আমি এতদিন মৈহারে রয়েছি, আমাকে তো কাঁকড়া বিছে কামড়ায় নি। তোমার মন ভালো নয়, তাই কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল।' খালি নখড়া, নখড়া' বলতে বলতে আমাকে বললেন, 'যাও গিয়ে শুয়ে পড়।' আমি ঘরে গিয়ে বাবার কথাই ভাবতে লাগলাম। বাবাকে যতটুকু চিনেছি, কারুর কোন অসুখ হলে ভীষণ ঘাবড়ান, কিন্তু বাইরে থেকে মুখ দেখে বুঝবার উপায় নাই। অবশ্য এও দেখেছি বাবার বকুনির ভয়ে রোগও তাড়াতাড়ি ভাল

হয়ে যায়। মার জন্য চিন্তা হোল, কি কষ্টই পাচ্ছেন। বাবা রেগে যাবেন, নইলে ওষুধ এনে চুপিচুপি মাকে দিয়ে দিতাম। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

হঠাৎ 'কাকা' 'কাকা' আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, আমার মুখের উপর টর্চ ফেলে আশিস আমাকে ডাকছে। ঘাবড়ে উঠলাম। বললাম, 'কী হয়েছে?' সে বলল, 'দিদার খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি আসুন। সঙ্গে সঙ্গে মা'র ঘরে গেলাম। মা আমাকে দেখে বললেন, 'বেডা আর বাঁচব না, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।' দেখলাম তাঁর দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আশিসকে বললাম, 'একটা কাগজ কলম নিয়ে আয়।' একটা চিঠি দিলাম স্টেশন মাষ্টারকে সব কথা জানিয়ে। বাইরে বেরিয়ে বুদ্ধাকে ডেকে বললাম, 'এই চিঠিটা স্টেশন মাস্টারকে গিয়ে দেবে। ওষুধ দিলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে। বিছের কামড়ের কী জ্বালা বুদ্ধার জানা ছিল, তাই সে দৌড়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বুদ্ধা ফিরে এসে একটা শিশি দিলো। মা'র ঘরে গিয়ে ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি দেড়টা বাজে। ওষুধের শিশিটা দেখলাম লেখা আছে, 'লেকসিন'। কী করে প্রয়োগ করতে হয় পড়লাম, লেখা আছে, বিছে, সাপ, কোন বিষাক্ত পোকা, এমনকি গোখরো সাপ কামড়ালেও, একটা পরিষ্কার কাপড়ে সলিউশনটা একটু ভিজিয়ে, খুব জোরে নাকে কয়েকবার টানতে হবে। যে মুহূর্তে হাঁচি হবে, সেই মুহূর্তেই আরাম হয়ে যাবে। একটা কাপড় ছিঁড়ে ওষুধটা দিয়ে মাকে বললাম জোরে টানতে। মা কয়েকমিনিট টানবার পরই দেখলাম দু'বার হাঁচি হয়ে গেল। মাকে বললাম, 'আর ভয় নাই, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।' মাকে দেখলাম দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চুপ করে আছেন।

বাবা সাড়ে চারটের সময় উঠেই হাত মুখ ধুয়ে চা এবং কিছু ফল মিষ্টি খাবেন। দশমিনিটের মধ্যেই দেখলাম মার কষ্টটা বোধহয় একটু লাঘব হয়েছে। বললেন, 'বেডা, এখন কষ্টটা একটু কম মনে হচ্ছে, তুমি যে শান্তি দিলে আল্লা তেমনি তোমার মনোষ্কামনা পূর্ণ করুন।'

পরের দিন সকালে বাবাকে গতরাতের সব ঘটনা বলায়, তিনি মাকে বললেন, 'এখন কেমন আছস?' মা বললেন, 'ভাল।' মা ভোরে উঠে বাবাকে চা, খাবার দিয়েছেন, তাই বাবা বুঝতে পারেন নি মার এত কষ্ট হয়েছে। বাবাকে বললাম, 'এই ঔষধটা বাড়ীতে থাকা ভাল।' বাবা বললেন, 'কোথায় পাওয়া যায়?' বললাম, 'ঔষধের শিশিতে ঠিকানা দেওয়া আছে। জায়গাটার নাম মিহিজাম।' বাবা নিজের ঘরে ঢুকে, একটা খাম এবং লেটার প্যাড দিয়ে বললেন, 'দশ শিশি ভি. পি. করে আনিয়ে নাও। এখানে অনেক লোক সাপের কামড়ে মারা যায়, পরোপকার হবে।'

রবিশঙ্কর চারদিন পর, বিশে আগষ্ট মৈহার আসবে এবং সাতাশে আগষ্ট অন্নপূর্ণা দেবীকে দিল্লী নিয়ে যাবে। ১৯৪৯ সনে আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম রেডিওর চাকরির জন্য, তখন রবিশঙ্কর ডি সি এম এর ভরতরামের বাড়ীতেই থাকত। তার স্ত্রীকে শেখাত এ কথা আগেই লিখেছি। এতদিনে নিজের বাসস্থান ঠিক হয়েছে। সেইজন্য অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা, অন্নপূর্ণা দেবী চলে গেলে আমার শিক্ষাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর থাকাতে সব দিক দিয়ে সুবিধা ছিলো। অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, নিজের মনের কথা। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যা শিখিয়েছি সেগুলো মন দিয়ে ধীরে ধীরে বাজাবেন,

তাহলেই হবে। বাবার কাছে শিখতে গিয়ে কম বকুনি খাবেন। ধমক দেওয়া বাবার স্বভাব। সব সহ্য করে যদি সাধনা করেন, ভবিষ্যতে বুঝবেন, বাবার এই ধমকগুলিই আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।' মনে সান্ত্বনা পেলাম। বললাম, আপনি আমার গুরুজন। মৈহারে এসে আপনাকে বলেছিলাম, দয়া করে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। সেইসময় বলেছিলেন, আপনার মুখ দিয়ে তুমি কথাটা সহজে বেরোয় না। কিন্তু এখন আমার মৈহারে প্রায় দশমাস হয়ে গেল। আপনিও তো আমার গুরু, এখনও কি তুমি বলে সম্বোধন করতে পারেন না? নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।' তিনি হেসে বললেন, 'আপনার কাছেও তো এতদিন সাইকোলজি পড়েছি, সুতরাং আপনিও তো আমার গুরু।' আমি বললাম, 'আমি কিসের গুরু, আপনার কাছে আমি গুরু নয়, 'গরু'। অন্নপূর্ণা দেবী হেসে বললেন, 'আসলে কী জানেন ছোটবেলা থেকে আপনি বলাটা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে একটা বিশেষ কারণে। খুব ছোটবেলায় বাবা একজন মেথরকে ঘরেতে বসিয়ে আপনি করে কথা বলছিলেন। আমার বাবার মত এত বড়, যাঁকে আমি চিরকালই ভগবান বলে জানতাম, মানতাম, তাঁর এই সাধারণ একটা মেথরকে আপনি সম্ভাষণটা ভালো লাগেনি। বাবা মুখ দেখলেই মনের কথা আগে বুঝতে পারতেন। বাবা আমার মুখ দেখেই বললেন, 'তুমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু মেথরকে বসিয়ে আপনি বলছি।' নিঃসঙ্কোচে বলেছিলাম, 'আপনি এতবড় হয়ে, সাধারণ মেথরকে আপনি কেন বলেন।' বাবা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'মা একটা কথা, সারাজীবন মনে রেখো, অতিথি নারায়ণ। কোন বেশে যে ভগবান পরীক্ষা করতে আসেন, তা বুঝবার মত জ্ঞান তো হয়নি। সেইজন্য যে যতই ছোট জাতের হোক, বাড়ীতে কেউ এলে তাকে নারায়ণ জ্ঞানে, যেমন সাধ্য তার সৎকার করবে। এছাড়া কাউকে ছোট ভাববে না। সকলকেই নিজের থেকে বড় ভেবে, আপনি করে কথা বলবে। ছোট ভেবে তুমি করে সম্বোধন করলে মনের মধ্যে অহংকার আসে। তবে নিজের ভাইপো, ভাইঝি, পুত্র স্থানীয়কে তুমি বললে অহংকার আসবে না। এটা যদি করতে পারো, তাহলে ভবিষ্যতে বুঝবে সুরের চেয়েও বড় সেই হয়, যে মানুষের মতন মানুষ হয়। সর্বদা মনে রেখো, গুরুজনদের সম্মান করতে না জানলে নিজেকেও সম্মান করা যায় না।'

একনাগাড়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলে বললেন, 'সেই ছোটবেলায় বাবা যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আজও আমি ভুলি নি। বাবার সেই উপদেশগুলি আজও আমি পালন করি। তাই আপনি কিছু মনে করবেন না, 'তুমি' বলে সম্বোধন করি না বলে।'

অন্নপূর্ণা দেবীর কথাগুলো আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে বললন, বাবা মুখ দেখলেই মনের কথা আগে বুঝতে পারতেন, তাহলে কী বুঝব, আজকাল মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারেন না?' উনি বললেন, 'বাবাকে আগে তো দেখেন নি। বাবা আগেও যেমন কারুর মুখ দেখলেই মনের কথা বুঝতে পারতেন, আজও পারেন। তবে এখন বয়স হয়েছে তো, যার জন্য কখনও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বাবার কাছে কেউ কেঁদে কিছু বললে, বাবা তা বিশ্বাস করে নেন। আগে এটা ছিলো না। এছাড়া আগে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, বাবা বাজাতে বাজাতে কঠিন লয়কারির কাজ করবার সময়, পায়ে বরাবর তাল দিয়ে যেতেন। আজকাল যেমন তবলায় ঠেকা দেয়, আগে তা ছিলো না, প্রায়ই সাথ সঙ্গত হ'তো। বাবার কখনও ভুল হতো না দশ পনের আবৃত্তি বাজয়ে গেলেও, কিন্তু

আজকাল সাথ সঙ্গত নানা ছন্দে বাজাতে বাজাতে পায়ে তালি দেবার দিকে মন থাকে না। সাথ সঙ্গত নানা ছন্দে দীর্ঘক্ষণ কখনও ক্ষণিক থেমে, কখনও আট গুণে; ষোল গুণে, বাজিয়ে সমে পায়ে তালি দেওয়া ভীষণ কঠিন। বাবার কাছে এ ব্যাপারটা ছিলো অতি সরল। তবে এটা ঠিক, এই বৃদ্ধ বয়সেও বাবার সঙ্গীতে যা স্মরণ শক্তি, কল্পনা করা যায় না। এসব কথা এইজন্য বললাম, বাবার কাছে শিখবার সময় যা বললাম মনে রাখবেন। আপনি লেখাপড়া করেছেন, এসব জিনিষগুলো করলেই করতে পারবেন।'

বিশে আগষ্ট এসে গেল। রাত্রে রবিশঙ্কর এলো। স্টেশন থেকে বাড়ী আসবার সময় বাড়ীর সব খবরাখবর তাকে বললাম।

রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, 'রমজানের সময় বাবার মেজাজ কেমন ছিল?' উত্তরে বললাম, 'নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে, বাড়ীতে গিয়ে বলব।' পরের দিন সকালেই আশিসের জ্বর এলো। যথারীতি ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ আনা এবং আমার সারাদিনের কাজ দেখে রবিশঙ্কর বলল, 'যে কাজ আমাদের করা উচিত, সেই সব কাজ তুমি করছ।' বাবাকে রোজ দুপুরে এবং রাত্রে হাতে এবং গায়ে ম্যাসাজ করে দিই দেখে সে বলল, 'বাবার যে সেবা তুমি করছ তার ফল নিশ্চয়ই পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, টাকা পয়সার ব্যাপারে বাবা কাউকে বিশ্বাস করেন না অথচ তোমায় বিশ্বাস করেন, এ কথা ভাবাই যায় না।'

রাত্রে রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণা দেবী দুজনে বাবার কাছে শিখতে এলেন। এবারেও রাগ 'শুদ্ধ কল্যাণ' বাবা শেখালেন। আমার থার্ডে আই এর মাধ্যমে দেখতে ও শুনতে লাগলাম। এবারেও দেখলাম বাবা একবারও অন্নপূর্ণা দেবীকে বকলেন না, যে হচ্ছে না। কিন্তু রবিশঙ্করকে কয়েকবার বললেন, 'দুরু, দুরু, হচ্ছে না।' রবিশঙ্করের এত নাম হয়েছে, কিন্তু বুঝলাম অন্নপূর্ণা দেবী রবিশঙ্করের চেয়ে বাজনায় কত বড়।

আজ শকুন্তলা কন্বমুনির আশ্রম থেকে পতিগৃহে যাত্রা করলেন। তফাৎটা এই যে দুষ্মন্ত সাথেই আছে। ইতিহাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ঘটনা বিদ্যাসাগর মশাই যে ভাবে বর্ণনা করেছেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠল। যদিও বাবা গতকালই এলাহাবাদে গেছেন রেডিওতে, তথাপি বাবার করুণ মুখখানা বারবার মনে পড়ছিল। বাবা মেয়েকে সত্যিই খুবই ভালোবাসেন। তাই, যাবার আগে বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, দিল্লীতে গিয়ে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করানোর জন্য।

বাড়ীর দরজা থেকে মা এবং অন্যান্য বাচ্চারা বিদায় জানাল। স্টেশনে গেলাম আমি। ওখানে অন্নপূর্ণা দেবী এবং রবিশঙ্করকে বিদায় জানাতে মৈহার ব্যাণ্ডের প্রায় সব সদস্যই উপস্থিত। সকালবেলায় গাড়ীটা ঠিক সময়েই ছাড়ল।

অনেকগুলো সজল চোখ বিদায় জানাচ্ছে। এ সম্ভাষণের ভাষা অন্নপূর্ণা দেবী বোঝেন। তাই বারবার সান্ত্বনা দিলেন, 'আবার তো আসবো কাঁদছেন কেন?' সকলেই কাঁদছেন নিঃস্বার্থ হিতৈষীকে হারানোর জন্য। বুঝতে পারলাম, অন্নপূর্ণা দেবী কী পরিমাণে ভরতুকি দিতেন। প্রচারবিমুখ ছিলেন, তাই কৃতজ্ঞের কান্নাই একমাত্র বলতে পারে সত্যটা কী। কিন্তু সকলে কাঁদছে কেন? বহুবার ভেবেছি। হিন্দীর ভক্ত কবি কবীর লিখেছেন, কে শ্রেষ্ঠ?

গোবিন্দ, না গুরু? বাবা আমাদের জীবনে গোবিন্দ আর তাঁকে আপন করার বীজমন্ত্রটি দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। তাই তিনিও গুরু। মনে মনে বললাম—

গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে কাকে লাগুঁ পায়
বলিহারি গুরু আপনো জিন গোবিন্দ দিও দিখায়।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।

১৭

মাসের শেষ দিকে বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন রাত্রে। যা কখনও করেন না, আজ তার ব্যতিক্রম হলো। এসে অবধি দেখছি, বাড়ীতে এসেই গরম জলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে, চা খেয়েই তামাক খাবেন। তারপর আমি শুতে চলে যাব। আজ বাড়ীতে ঢুকেই বললেন, 'উপরের ঘরের চাবি কই?' মা এবং আমি দুজনেই অবাক। বাবার মুখের উপর মা কথা বলতে পারেন না। মা গরমজল তৈরী করে রেখেছেন, হাত, পা ধোবার জন্য। হঠাৎ উপরের ঘরের চাবি চাইতে, মা নিজের ঘরে গেলেন চাবি আনতে। ততক্ষণে বাবার সরোদ তাঁর ঘরে রেখে এসেছি। অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ বুদ্ধা বাবার ঘরে রাখছে। ইতিমধ্যে দেখি বাবা চাবি নিয়ে উপরের ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। উপরে অন্ধকার, সুইচ জ্বালাতে হবে। বাবা উপরে উঠছেন দেখে, তাড়াতাড়ি আমিও গিয়ে সুইচ জ্বালালাম। বাবা তালা খুলে অন্নপূর্ণা দেবীর ঘরে ঢুকলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এভাবে বাড়ীতে এসেই উপরে ওঠার কারণ কী? বাবা কি দেখতে চান ঘর পরিষ্কার আছে কী না? হঠাৎ দেখি বাবা কপাল চাপড়ে ছোট ছেলের মত কাঁদছেন আর বলছেন, 'আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।' আমি হতবাক। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'বিয়ে যখন দিয়েছি তখন তো আর চিরকাল নিজের কাছে রাখতে পারবো না, আমার মা অন্নপূর্ণা চলে গেল আমাকে ছেড়ে।' বাবার চরিত্রের এও একটা দিক দেখতে পেলাম। হাত জোড় করে বললাম, 'এখানে তো চিকিৎসা ঠিকমত হলো না, তাই দিল্লী গিয়েছেন, আবার আসবেন। আপনি তো বলেছেন প্রতিবছর একবার করে আসেন আপনাকে দেখতে। তবে উতলা হচ্ছেন কেন?' বাবা বোধহয় আমার উপস্থিতি ততক্ষণে বুঝতে পারলেন। নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য ধীরে ধীরে নেমে এলেন। আমি তালা দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে, নীচে এসে মায়ের হাতে চাবিটা দিলাম। বাবা চুপচাপ হাত মুখ ধুলেন। বাবাকে গিয়ে চা দিয়ে এলাম। মা কল্কেতে তামাক নিয়ে এলেন, তৎক্ষণাৎ আমি প্রণাম করে বাইরে চলে গেলাম শুতে। মাকে বললাম, 'তালা লাগিয়ে দিন।'

বাইরে এসে চুপচাপ খাটিয়ার উপর বসে রইলাম। বুঝলাম নারকোলের মত বাইরের রূপটা। কিন্তু ভেতরে কী সুস্বাদু মিষ্টি জল। বাবার চরিত্রে যা দেখলাম, এ জিনিষ আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি। কোন নভেলেও এরূপ ঘটনার নজির নেই।

পরের দিন স্কুলের হেডমাস্টার এবং কয়েকজন শিক্ষক বাড়ীতে এলেন। হেডমাস্টার আমার পূর্বপরিচিত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ফুটবল খেলতে পারেন? যখন সম্মতি জানালাম, আমাকে অনুরোধ করে বললেন, 'ইন্টার কলেজ ম্যাচ হবে আগামী চোদ্দ

অক্টোবর থেকে, সুতরাং রোজ বিকেলে একটু অভ্যাস করুন।' বাবার দিকে চাইলাম, বাবা বললেন, 'যেখানে মৈহারের সম্মানের ব্যাপার তখন তুমি নিশ্চয়ই খেলবে। রোজ বিকেলে আশিস, ধ্যানেশকে বেড়াতে নিয়ে যাও, তার বদলে তুমি খেলবে আর একদিকে নাতিরা খেলবে। নাতিদের জন্য একটা রবারের বল আজই কিনে এনে দেবো।'

এরা যাবার পরই টেলিগ্রাম এলো, শিপ্রা ব্যানার্জী বিকেলের ট্রেনে আসছে। বাবা বললেন, 'আলি আকবরের কাছে এ সরোদ শিখেছে। খুব লেখাপড়া করেছে এবং তার বাবা এবং মা দেরাদুনে থাকে।' বাবা বুদ্ধাকে ডেকে বললেন, বিকেলে স্টেশনে যেতে। একটি সুন্দরী মেয়ে বাজনা নিয়ে ট্রেন থেকে নামলে তাকে যেন সে বাড়ীতে নিয়ে আসে। আমাকে বললেন, 'তুমি আর কত কাজ করবে? এ ছাড়া তোমাকে তো বিকেলে খেলতে হবে। তাই বুদ্ধাকেই বললাম।' মনেমনে হাসি পেলো। বুঝলাম কোনো মেয়েকে আনা আমার পক্ষে ঠিক নয়। অবশ্য আমাকে যেতে হলে আমি বুদ্ধাকে সঙ্গে নিয়েই যেতাম। যাক বাঁচা গেল।

পরদিন বাজার থেকে বাবা নাতিদের জন্য একটা রবারের বল কিনে নিয়ে এলেন। সেই যে আমার খেলা শুরু হল মৈহার থাকাকালীন, ফুটবল, হকি এবং ব্যাডমিন্টন, সেগুলি বরাবরই খেলেছি।

বিকেলে খেলা সেরে বাড়ী এসে দেখলাম একটি মেয়ে এসেছে। আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। নমাজ শেষ হবার পর প্রণাম সেরে নিজের ঘরে চলে এলাম। বুঝলাম, শিপ্রা ব্যানার্জী সরোদ নিয়ে বাবার ঘরে এসেছে। বাবার গলার আওয়াজ শোনা গেল। বাবা বলছেন, 'কী রাগ শিখবে?' মেয়েটি কী বলল শুনতে পেলাম না। হঠাৎ বাবার আওয়াজ আবার শুনতে পেলাম, 'ওরে বাবা শ্রী শিখবে। শ্রী অতি বিশ্রী রাগ। শ্রীরাগ কে সুশ্রী করতে হলে কোমল 'রে' এর শ্রুতি আয়ত্তে আনতে হবে, এ হল অতি কোমল। এ তো দেখা যায় না। শুনে শুনে শিক্ষা করে তবে এ রাগ সুশ্রী হবে। ঠিক আছে মেলাও।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক। অবাক আরও বেশী হলাম, মেয়েটি কী করে বাবাকে বলল শ্রী রাগ শিখবে। বুঝলাম মেয়েদের বাবা একটু কন্‌সেস্‌ন করেন।

আমি রিয়াজ না করে শুনলাম। বাবা একটু শিখিয়ে বললেন, 'যাও, আজই ট্রেনে এসেছ, এখন বিশ্রাম করে, খাবার খেয়ে উপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।' কিছুক্ষণ পরে বাবা আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'শিখবে নাকি?' উত্তরে বললাম, 'পরে শিখব।' তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন, 'আর রাগ পেলে না, 'শ্রী' শিখবে? কি করব? বাবা বলে ডাকে, কিছু বলতেও পারিনা, এই বুড়া বয়সে আর এসব ভালো লাগে না।' গত রাত্রে বাবা যে কোমল মনের পরিচয় অজ্ঞাতে দিয়ে ফেলেছেন, এখন তার চিহ্ন নেই, কিন্তু বাবাকে দেখে বুঝতে পারছি, যে কর্তব্যের খাতিরে সব করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন চঞ্চল।

পরের দিনও সেই এক ব্যাপার। রাত্রে শিপ্রা ব্যানার্জীকে শিখিয়ে বললেন, 'আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। মেয়ে বলে কিছু বলতেও পারি না।' তারপর আমাকে বললেন, 'শিখবে নাকি?' তার মানেই না। আমি বললাম, 'কয়েকদিন পর শিখব।'

তৃতীয় দিনে মৈহারে সনৎ এলো। বাবা শিপ্রাকে বললেন, 'যা শেখালাম খুব ধীরে ধৈর্য্যের

সঙ্গে বাজাবে। পরে দ্রুত বাজাবে।' সনতকে বললেন, শিপ্রাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এসো।'

কয়েকদিন পর রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণা দেবীর চিঠি পেয়ে বাবা খুব খুশী হলেন। বাইরে শোবার পালা শেষ হলো। এখন বাড়ীর ভেতরে ঘরেই শুই কেননা শীতের আমেজ এসেছে।

অক্টোবর মাস এসে গেল। আজ এই প্রথম দেখলাম, বাবার কথার উপরে মা একটা মন্তব্য করলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময়।

বাবা বিকেলে মাছ কিনে এনেছেন। রাত্রে খাবার সময় হঠাৎ বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'এখনও এই বুড়া বয়সে ভিক্ষা করতে যেতে হয়, এই নাতিদের জন্য। আলি আকবর আসেও না, এদের দেখেও না। আমার অবর্তমানে এদের কী হবে? এদের কথা ভেবেই বাইরে বাজাতে যাই। এখন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। বাইরে কোথাও গিয়ে আনন্দ পাইনে। বাড়ীর খাবারের কাছে আর কিছুই নাই। তোমার মাকে চিরকাল কষ্ট দিয়েছি। সেই ছোটবেলা থেকে কেবল খেটেই গেল। এবং এখনও, এই বুড়া বয়সেও দিন রাত সে কাজ করে যাচ্ছে। আমি মহাপাপী, তোমার মাকে জীবনে কোন সুখ দিতে পারলাম না। ছোট থেকে বাজনা শিখবার জন্য বাইরে কাটিয়েছি, তারপর মৈহারে এসে সকলকে শিক্ষা দিতে দিতেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল। তোমার মা সারা জীবন খেটে খেটে জীবন পার করে দিলো। এখনও নিত্য নতুন রান্না করে খাওয়ায়। এরকম খাবার তো কোথাও পাইনা।'

হঠাৎ মা'র গলার আওয়াজ পেলাম। দেখলাম দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মা বললেন, 'আমাকে শুনিয়ে নখড়া করছে। কুমিরের চোখে জল।' মার মুখে এ কথা শুনে তো আমি অবাক। হঠাৎ বাবার গলা মধ্য সপ্তক থেকে তার সপ্তকে গেল। 'আরে আরে, কি বলস? ভালো কথা কানে ভালো লাগে না। শুয়ার কে বচ্চে। শুয়ার কে বচ্চে। তোর এই রান্না কুত্তাও খায়না। আমি বলে খাই। আমার জীবনটা নাশ করে দিল।' এই ছাতার রান্না, বলেই থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আরে খাবারের সঙ্গে রাগ করতে নাই, খায়া লও।' বাবা ততক্ষণে উঠে পড়েছেন, কটমট করে মার দিকে, তাকিয়ে বললেন, 'চুপ শুয়ার কি বচ্চে।' তা সত্ত্বেও মা বললেন, 'খাবার হল লক্ষ্মী। খাবারের উপর রাগ করতে নাই, খাইয়া নিন।' বাবা ততক্ষণে মুখ ধুচ্ছেন। মুখ ধুয়ে বললেন, 'কত বড় শুয়ার কে বচ্চের সঙ্গে ঘর করলাম, কখনও সম্বোধন করে আপনি বলে, আবার কখনও তুমি, আবার কখনও তুই। বারে শুয়ার কে বচ্চে।' এ কথা বলেই বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি নির্বাক, স্তব্ধ, আমার কোন ভাষা নাই বলবার।

মা অতঃপর তামাক নিয়ে গেলেন। আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শুনলাম বাবা বলছেন, 'নিকালো, নিকালো, নিকালো, কামের কাম কিছু নয়, লোক দেখান ছাতার কাজ করে।' মাকে চুপ করে তামাক দিয়ে ফিরে আসতে দেখলাম। আমাকে দেখেই মা কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'চিরটা কাল এইভাবে জীবন কাটালাম। অন্নপূর্ণা থাকলে এরকম করে না। অন্নপূর্ণা চলে গেছে, এখন নিজের রূপ ধরেছে।' মাকে বোঝালাম, 'আসলে মেয়ে নাতি চলে গেছে বলে বাবার মন খারাপ, বাবার কথায় কিছু মনে করবেন

না। দেখলেন না, এলাহাবাদ থেকে এসে কী রকম কাঁদতে লাগলেন! আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, বাবার মেজাজ ঠিক হয়ে গেলে আমি তামাক দিয়ে আসব।' আমি সোজা বাবার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা একটা চারমিনার সিগারেট খাচ্ছেন। আমি গিয়ে রোজ যেমন করে থাকি, হাতের আঙ্গুলগুলো ম্যাসাজ করে দিতে লাগলাম। বাবা কিছু বললেন না। চুপ করে একভাবে সিগারেট খেতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'দেখলে তো, কোথায় ভালো কথা বলছিলাম, আর আমায় কী না বলে কুমিরের চোখে জল।' আমি বললাম, 'মেয়ে, নাতি চলে যাওয়ায় মা'র মনে কত কষ্ট আপনি তো বোঝেন।' বললেন, 'আর আমার কষ্ট নয়? বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে,' বলেই কাঁদতে লাগলেন। আমি দেখলাম তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। বাইরে গিয়ে মা'র কাছ থেকে কল্কে নিয়ে এসে বাবার ঘরে কল্কেটা লাগিয়ে দিলাম। বাবা চুপচাপ তামাক খেতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ শরীরটা দলাই মালাই করে প্রণাম করে বাইরে চলে এলাম। মা রোজ রাত্রে গিয়ে কিছুক্ষণ হাত পা টিপে দেন।

মাকে গিয়ে বললাম, 'এখন তামাক খাচ্ছেন, আপনি যান বাবার কাছে। মা কোন কথা আর বললেন না, তখনও মা'র সংসারের সব কাজ হয়নি। আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবার আওয়াজ পেলাম, 'নিকালো, নিকালো।' ছাতার কাম দেখায় আমাকে। লোক দেখানি সেবা করবার দরকার নাই।' মা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমার ঘুম মাথায় উঠলো। বুঝলাম এর জের কয়েকদিন চলবে। তারপর একদিন ঠিকও হয়ে যাবে। হলোও ঠিক তাই।

একদিন পরেই বাবা আমাকে বললেন যন্ত্র নিয়ে যেতে। বাবার বাজাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওঠাতে লাগলাম। বাবা ততই কঠিন অঙ্গ বাজাতে লাগলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করে বাজাতে লাগলাম। বাবা খুশী হলেন। এতটা বোধহয় বাবা আশা করতে পারেন নি। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, করতে যাও, করতে গেলে পাবেই পাবে।' আজ পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময় আশিস এবং আমি দুজনেই একসঙ্গে শিখতাম। আজ বাবা বললেন, 'এবার থেকে তোমরা আলাদা শিখবে। আশিস ছেলেমানুষ, তাকে বাঁধা ধরা শেখাই, কিন্তু তোমাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে।' বাবার কথায় আজ খুব সান্ত্বনা পেলাম। কিন্তু আমার মাথা নত হয়ে গেল অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। তিনি যদি আমাকে না অগ্রিম শিখিয়ে দিতেন, তাহলে কখনও এরকম বাজাতে পারতাম না। এখনও, আমার পেটে ব্যথা হয়, ডাক্তার বলে ডিসেন্ট্রী। ভয়ে বাবাকে কিছু বলি না। হঠাৎ বাবা একদিন বললেন, 'আমার মত বয়স হলে বাতের রোগে ভুগবে সুতরাং রোজ আসন করবে।' মৈহারে মহারাজের কাছে একজন এসেছিলেন, যার কাছে বাবা আসন শিখেছিলেন। বাবা বললেন, 'আমি যে পাঁচবার নমাজ পড়ি, সেও এক আসন। তবে যে আসন আমি শিখেছিলাম, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, এই আসন যদি বরাবর করো তাহলে দেখবে শরীরও ভাল থাকবে।' বাবা আমাকে কয়েকটা আসন শেখালেন। সেদিন থেকেই আমি আসন শিখলাম। আজকার দিনে যেমন ছেলে

মেয়েরা সকলেই আসনের কথা জানে এবং অনেকে করে কিন্তু সেই সময় আসন জিনিষটা ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত। সেই যে আসন শুরু করেছিলাম এখনও প্রতি শীতে কিছু দিন করি। গরমে কিন্তু আসন করা হয়ে ওঠে না। এ আসন সম্বন্ধে নানা তথ্য যথা সময় লিখব। এই সময় বাবা আমাকে রোজ আলাপ শেখালেন। বাবার বকুনি এসময় খুব কম খাই।

এলো সেই ইন্টার কলেজ ম্যাচের দিন। আমি চিরকালই সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলে এসেছি। ম্যাচ আমরা জিতলাম। বাবাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিলো। বাবাও আমার খেলা দেখলেন। বাবা নিজে হাতে প্রাইজ দিলেন। বাড়ীতে আসার পর বাবা বললেন, 'তুমি এত ভাল খেলো। মৈহারের নাম রেখেছ। মনের মধ্যে জিদ কর, বাজনাতেও এইরকম ভাবে বাজাতে হবে, যাতে সকলেই প্রশংসা করে। এতে তোমারও নাম হবে এবং আমারও নাম হবে।' মনের মধ্যে জেদ কর, কথাটাতে হঠাৎই অন্নপূর্ণা দেবীর কথা মনে পড়ে গেল আমার, তিনিও এই কথাই বলেছিলেন।

সবচেয়ে ভাল খেলেছি বলে, ইস্কুলের হেডমাষ্টার আমাকে সত্তর টাকা পুরস্কার দিলেন। যেহেতু আমার পেটে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, সেইজন্য আজ আমি কাশীতে রাত্রে চলে যাব বলে, বুঝলাম বাবার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। আট দিনের জন্য কাশী যাব শুনে বাবা আমাকে বললেন, 'যন্ত্র নিয়ে যাবে না কি?' হায় ভগবান? ভেবেছিলাম যন্ত্র নিয়ে গিয়ে সকলকে শোনাব, কিন্তু বাবার কোড ল্যাংগুয়েজে বুঝে গিয়েছি, তাই বললাম, কয়েক দিনের জন্য যাচ্ছি বলে বাজনা নিয়ে যাব না। চিকিৎসা করিয়েই চলে আসব। বাবা খুশী হলেন।

সন্ধ্যাবেলায় কবিরাজ আশুতোষের ডিসপেনসারিতে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি মহন্তজী, বলদেব উপাধ্যায়, গুল্লজী বসে আছেন। আমাকে দেখে সবাই খুশী হলেন। তাঁদের কাছে মৈহারের নানা ঘটনা সব বললাম। ইতিমধ্যে ডিসপেন্সারীতে এলেন সেতার বাদক মুস্তাক আলি খাঁ। যদিও মৌখিক আলাপ মৈহারে যাবার আগে ছিল, কিন্তু আশুতোষ যখন আমার পরিচয় দিয়ে বললেন যে, আমি মৈহারে উস্তাদ বাবার কাছে শিখছি, তিনি শুনে খুশি হলেন। ডিসপেন্সারী বন্ধ হবার সময় হয়েছিল। সুতরাং সকলেই নিজের নিজের বাসস্থানে উদ্যোগ করতেই আশুতোষ আমাকে বললেন, 'চলো খাঁ সাহেবের সঙ্গে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে একটু গল্প করি।' আশুতোষের সঙ্গে মুস্তাক আলির পরিচয় দীর্ঘদিনের। বছরে একবার কোলকাতা থেকে কাশী আসেন। আশুতোষের দোকানের কাছেই একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি রেস্টুরেন্ট কাম বার। ভাবলাম এ কোথায় এলাম। সহজ সরল ভাবে মুস্তাক আলি আমাকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ভাই, আমি রোজ একটু পান করি।' আশুতোষকে বললেন, 'তোমরা কি খাবে বল?' আশুতোষ কিছু বলার আগেই বেয়ারাকে বললেন, 'এদের দুজনকে মিট চপ দাও এবং আমাকে রোজ যা দাও তাই দাও।' বুঝলাম কাশীতে এলেই বোধহয় এই রেস্টুরেন্টে আসেন। মালিক থেকে বেয়ারা সকলেই পরিচিত। উস্তাদ বাবার শারীরিক কুশল, উপস্থিত কোথায় আছেন এবং নানা কথার পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, নিখিল

কি মৈহারে আছে?' নিখিলের মুখে শুনেছিলাম খাঁ সাহেবের কাছে কিছুদিন শিখেছিল, তাই বললাম প্রায় পাঁচ মাস উস্তাদ বাবার কাছে শিখে, রমজানের সময় কোলকাতায় গেছে। পরে আবার মৈহারে আসবে। আমার কথা শুনে বললেন, 'আমার কাছে নিখিল কয়েক মাস শিখেছিল কিন্তু তারপর ওর বাবার একটি কথায় আর শেখাই নি। এই যাদের মনোবৃত্তি তাদের শেখানো আপনার উস্তাদেরও উচিত নয়।'

কথাটা না ঘুরিয়ে তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি শেখালেন না কেন নিখিলকে?' খাঁ সাহেবকে বললাম, 'আমাকে আপনি করে বলবেন না, তুমি করেই সম্বোধন করুন। আপনি বয়সে অনেক বড়।' খাঁ সাহেব হেসে বললেন, 'ঠিক আছে তুমি করেই বলব। আসলে কী জানো, কোলকাতায় বিনা পয়সায় আমি কাউকে শেখাই না। আমিই কেন? সকলেই কোলকাতায় পয়সা নিয়ে শেখায়। তোমার উস্তাদ এক ব্যতিক্রম। নিখিল ছোটবেলায় আমার কাছে তার বাবার সঙ্গে এসেছিলো। সে বলেছিলো তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছোট ছেলে দেখে মায়া হয়েছিলো, তাই বিনা পয়সায় নিখিলকে শেখাতাম। পরে যখন জানলাম তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ নয়, তখন তার বাবাকে বলেছিলাম আমায় যৎসামান্য কিছু দিতে। উত্তরে তার বাবা বলেছিলো, 'আপনাকে ভাল জমি দিয়েছি, ফসল আগে সেই জমির উপর ফলান, তারপর সেই ফসল যখন বিক্রী হবে তখন তার থেকে আপনার পারিশ্রমিক দেব। এই কথা শুনবার পরই আমি নিখিলকে শেখানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে অবাক হলাম। এখানে নিখিল নিমিত্ত মাত্র। নিখিলের বাবাই প্রধান চরিত্র। কী আর বলব? এক ঘণ্টার মধ্যে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বিদায় নিলাম। খাঁ সাহেবের মার্জিত বাংলা ভাষায় কথা বলা শুনে ভাল লাগল। আশুতোষের কাছে পরে শুনলাম, দীর্ঘদিন কোলকাতায় আছেন এবং বাঙ্গালী বিয়ে করেছেন বলে, এত ভাল বাংলা বলেন।

কাশীতে চারদিন কাটিয়ে আমি মৈহারে দুপুরে পৌঁছলাম। জলবায়ু পরিবর্তনেই আমার পেটে ব্যথা ভালো হয়ে গেল। বাবা আমাকে দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'আরো কিছুদিন কেন কাশীতে রইলে না?' উত্তরে বললাম, 'যন্ত্র না বাজালে ক্ষতি হবে তাই বিজয়াদশমীর পরই চলে এলাম।' বাবা আমাকে বললেন, 'স্নান করে খেয়ে নাও। অনেকগুলো চিঠি এসেছে সেগুলো দেখে সময়মতো উত্তর দিয়ে দিয়ো।' খাবার পর, প্রত্যেকটা চিঠির জবাব লিখে, পোস্ট অফিসে যাবার সময় বাবা আমাকে যেতে দেখেই, সেই এক কথা, 'আরে আরে, এই দুপুরে কেন যাচ্ছ? আমি তো বিকেলে যাব তখন চিঠি ফেলে দেব।' বাবার মেজাজ তো জানি, তাই চিঠি ফেলতে চলে গেলাম।

রাত্রেই আমাকে বললেন, 'কয়েকদিন বাজাও নি, যন্ত্র নিয়ে এসো।' বুঝলাম বাবার মেজাজ প্রসন্ন। 'ইমন' রাগে পুরোনো বন্দিশের খুব ভালো একটা গৎ শেখালেন। বাজালাম, দেখি বাবার খুশী খুশী ভাব। প্রায় ঘণ্টা খানেক শিখিয়ে বললেন, 'বাবা, কত কষ্ট করে এক একটা জিনিষ আমি শিখেছি আর তোমরা তো সহজভাবে পেয়ে যাচ্ছ। আমি তো চাই খুব শেখাতে কিন্তু তুমি তো হজম করতে পারো না, উগলিয়ে ফেলে দাও। এ বিদ্যা একদিনের

নয়। এ এমন ডাল, সেদ্ধ হতে সময় লাগবে। তুমি ভাবছ খুব ভাল বাজাও, কিন্তু তোমার বাজনা অর্থাৎ ডাল, এখনও সেদ্ধ হয় নি। এ ডাল মানুষ তো কোন ছার, কুত্তাও খাবে না। কেবলমাত্র শুঁকবে কিন্তু ছোঁবেও না। ডাল গলতে এখনও বহু দেরী, করতে যাও, তখন ডাল সেদ্ধ হবে। ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে, নিজে খেয়েও আনন্দ পাবে এবং যাকে খাওয়াবে সেও আনন্দ পাবে। কি বুঝলে?'

উত্তরে বললাম, 'বুঝেছি বাবা।' হেসে বাবা বললেন, 'এইসা না, এইসা না। এখন একটু রাস্তায় এসেছো। এখনও বহু শিক্ষা করতে হবে। করলে নিজেই আনন্দ পাবে। এখনও কম করেও দশ বৎসর যদি শিখতে পার, তাহলে কিছুটা হবে।' মনে মনে ভাবলাম ওরে বাবা, দশ বৎসর এখনও শিখতে হবে? যাই হোক বাবাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে এলাম।

পরের দিনেই বাবা রেডিওতে বাজাতে গেলেন। রেডিওতে সুরশৃঙ্গার দুদিন বাজালেন। রেডিওতে শুনলাম 'রাগেশ্রী', 'শঙ্করা' এবং 'খাম্বাজ'।

মৈহারের দৈনন্দিন জীবন ঘড়ির কাঁটার মতো চলে। আশিস, ধ্যানেশ এবং বেবীর অসুখ লেগেই আছে। হাসপাতালে যাওয়া নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। মাঝে মাঝে গরুমহিষ আসে না, পরের দিন আসে। ডাক্তারও মাঝে মাঝেই আসেন।

কোলকাতায় দশই নভেম্বর বাবা, আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের ত্রয়ী বাজনা তানসেন কনফারেন্সে হবে। খুব ইচ্ছা করছে বাজনা শুনবার। ভাবলাম বাবা এলে বলব যদি নিয়ে যান সঙ্গে।

এলাহাবাদ থেকে পাঁচদিন পরে বাবা মৈহারে ফিরে এলেন। মৈহারে দীর্ঘদিন থাকাকালীন যে গাড়ি আসবার কথা রাত্রি বারোটায়, কখনও ঠিক সময়ে আসতে দেখিনি। গাড়ী কখনও একটায়, কখনও দুটোয়, একবার ভোর ছটার সময়েও আসতে দেখেছি। আজ গাড়ী এলো রাত্রি তিনটের সময়ে। যথারীতি বাবা বাড়ীতে এসে, সবকাজ সেরে তামাক খেতে লাগলেন। আমি প্রণাম করে ঘরে যাব, হঠাৎ বাবা ডেকে বললেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। এলাহাবাদে মুস্তাক আলি নিখিল সম্বন্ধে অনেক কথা বললো।' আমায় কাশীতে যে কথা খাঁ সাহেব বলেছিলেন, বাবার মুখে সেই সমস্ত ঘটনাই শুনলাম। সমস্ত ঘটনা বলে বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি করা উচিৎ বলো তো?' এও এক পরীক্ষা, কী উত্তর দেব?

বললাম, 'আন্তরিকভাবে যখন নিখিল শিখতে চায়, তখন তার বাবার কথায় গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।' বাবা বললেন, 'হায় হায়। একজনকে তৈরি করতে গেলে নিজের প্রাণটা দিতে হয়। তার জন্য সময় কই?' আমি চুপ করে, একটু পরেই চলে এলাম নিজের ঘরে।

আবার বাবা প্রবাসে। সুতরাং আমার তিনটেই কাজ। নিজের বাজনা বাজানো, পড়ান আর খেলা, এ বিষয়ে মা অত্যন্ত কনসিডারেট। দরকার না পড়লে বাজার করতে বলেন না, কিন্তু বাবা পছন্দ করেন টাটকা সব্জি। তাই মা মানা করলেও আমি রোজ একবার করে বাজারে যাই। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও বাবা থাকলে আমার বাজার যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা এটা ওরই অধিকার। আর একটা নৈমিত্তিক অভ্যাস রেডিও শোনা।

কোলকাতাতে ট্রায়ো হবে শুনে, মনে মনে লাফাচ্ছিলাম যদি বাবার সঙ্গী হওয়া যায়। প্রাজ্ঞজনের মত ঘুরিয়ে কথাটি বলেও ছিলাম, 'বাবা আপনার তো এখন বয়স হয়েছে, অতদূরে যাওয়া, সঙ্গে একজন গেলে ভালো হয়।' আমার ট্রায়ো শুনতে যাওয়াটায় বার্ধক্য অজুহাত একমিনিটেই ধরা পড়ে গেল। ছলনা যতই সরল হোক বাবা বুঝতে পারবেন, বিশেষ করে সেটা যদি প্রিয়জনের কাছ থেকে হয়। তাই গম্ভীর মুখে করে বললেন, 'এইসা না, এইসা না।' অর্থাৎ কী না ঠিক কথা বলি। আমার সঙ্গে যাওয়াটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল বাজনা শোনা। আগে বাজাও তারপর শুনবে।

আসলে বাবা চাইতেন না আমার রিয়াজের নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ হোক। আর মা এবং বাচ্চারা একা থাকুক এটা বাবার নিশ্চিন্তটাকে বিঘ্নিত করত। তাই দিন পনেরো কাটল রিয়াজ করে আর রেডিও শুনে। এরই মাঝখানে পঞ্চাশের নভেম্বর মাসের তিনটে দিন মনে হচ্ছে উল্লেখনীয় বলে। ছয় তারিখে মারা গেলেন ফৈয়াজ খাঁ। বাবা তাঁকে বলতেন, 'বেটাছেলে গায়ক'। দশ তারিখে হলো কলকাতাতে ট্রায়ো। রেডিওতে শুনলাম। এ যেন সিংহ তার শাবকদের নিয়ে খেলছেন। 'দেশমল্লার' শিখিনি, তবুও বলতে পারি, এরকম গম্ভীর রাগ আমার কাছে অশ্রুতপূর্ব। আবার এক চমক পেলাম ষোল তারিখে। অন্নপূর্ণা দেবী রবিশঙ্করকে নিয়ে বসেছেন সুরবাহারে দিল্লী কন্‌স্টিটিউশানের সৌজন্যে। রেডিওর কৃপায় ইমন কল্যাণ ইথারের বুকে ভেসে এসে, মৈহারের ছোট্ট ঘরেতে এসে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। তখন আমি আমার প্রিয় উপন্যাস পড়ছিলাম, 'বিউটি এ্যাণ্ড দি বিস্ট'।

বাবা ফিরলেন কোলকাতা থেকে। ঠিক বুঝতে পারছি না বাবার মন মত রিয়াজ হয়েছে কী না। অন্যথায় কপালে দুঃখ আছে। বাঁচোয়া যে শিপ্রা ব্যানার্জি এসে জুটলেন। বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে ব্যস্ত হলেন। কিই বা করেন? আমাদের হলে তো ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতেন, কিন্তু স্থান কাল পাত্রে রাগের গতি পথ বদলাতো। তখন, রামের জন্য শ্যামের দুর্ভোগ হত।

যাক এবারের দুর্যোগের মেঘ তাড়াতাড়ি কাটল। অঘ্রাণে এবারে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। একটু খালি হতেই বাবা যন্ত্র নিয়ে ডেকে পাঠালেন। সেই 'ইমন' যা এতদিন ধরে রিয়াজ করছি। কিন্তু আজ পেলাম বাবার কাছে নতুন রূপে। এ যেন পুষ্পশোভিত বিশাল গাছের নীচে ছোট্ট সাজি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। শুধু সাজিই ভরে যায় না, আমিও ঢেকে যাই। কুড়িয়েই কুল পাইনা, তা চয়ন কী বা করব?

কোলকাতা থেকে এসে, বাবা প্রতিবারই এক বোরা চাল নিয়ে বাজার করে বাড়ী আসতেন। এর পর কয়েকদিন চলল থোকে অন্যান্য জিনিস কেনা। বাবা একদিন বললেন, 'এক বছরের মত চাল ডালের ব্যবস্থা করে দিলাম। আমরা বাঙ্গালী, ডাল ভাত আড়াই হাত। আর কিছু পাও বা না পাও।' বিলাসিতা বাবা পছন্দ করতেন না। বাবা বলতেন, 'বিলাসিতা যত বাড়াবে মন ভরবে না। যদিও বাবার ক্ষমতা ছিল প্রতিটি ঘরে ইলেকট্রিক পাখা লাগানোর, কিন্তু কোন ঘরেই পাখা লাগাননি। মৈহারে মহারাজ একটি জার্মানির টেবিল ফ্যান দিয়েছিলেন। যদি কেউ

জিজ্ঞাসা করতেন, 'বাড়ীতে পাখা কেন লাগান নি?' বাবা বলতেন, 'আমি হলাম কুলি কাবাড়ি। আমার পাখা লাগে না। হাতে পাখা খুবই ভালো।' বাবাকে আবার অনেককে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি, বাবা কেন গাড়ী রাখেন না। বাবা বলতেন, 'দুটি গাড়ীই তো আছে।' আবার কেউ জিজ্ঞাসা করত, 'গ্যারেজ তো তারা বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পায় নি।' বাবা হেসে বলতেন, 'গ্যারেজ দেখবেন কী করে? দুটি চরণ পাদুকা দেখিয়ে বলতেন, এই তো দুইটি গাড়ী।'

আসলে প্রয়োজনীয় জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে জোগাড় করে রাখতেন। যেমন, বাজনার তার যথেষ্ট রাখতেন। ব্যাণ্ডের যন্ত্রের তার, বাবা নিজে দিতেন। বাবা পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। যে কাজ নিজে করতে পারেন, তার জন্য অযথা খরচাকে অপব্যয় ভাবতেন।

বাবাকে কৃপণ বলা যায় না, বরং বলব হিসাবী। কোলকাতা থেকে এসে সব জিনিষ পত্র কিনে, দেখেছি, হাতে উদ্বৃত্ত টাকা হলেই বাবা পোষ্টাপিসে রেখে দিতেন। আমার মনে হতো সেই ইংরাজী প্রবাদটি, 'ডোন্ট ট্রাস্ট মানি বাট পুট ইয়োর মানি ইন ট্রাস্ট।' টাকা হাতে থাকলেই খরচ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ব্যাঙ্কে বা পোষ্টঅফিসে রাখো, দেখবে টাকা থাকবে। এককথায় সংসার সম্বন্ধে বাবার যত জ্ঞান, ঘোর সংসারীর মধ্যেও তা আমি দেখতে পাইনি।

বছর শেষ হতে মাসখানেক বাকী। মুহর্‌রম অর্থাৎ দশদিন বাবার কাছে শিখব না। মুহর্‌রমের পর বাবা বললেন, 'এবার থেকে দিনে এবং রাত্রে রোজ শিখবে।'

এর মধ্যে একদিন ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। আমার সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বাবাকে বললেন, আমার বাজনা শুনবেন। বাধ্য হয়ে বাজাতে হলো। ম্যাজিস্ট্রেট আমার প্রশংসা করলেন। বাবাও আমাকে বকলেন না, উপরন্তু প্রশংসা করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাবার পরই বাবা আমাকে বললেন, 'অহংকার কোরো না। লোকের সামনে প্রশংসা করেছি, তাই বলে ভেবো না ভাল বাজিয়েছ। ছাতার বাজনা বাজিয়েছ। ম্যাজিস্ট্রেট সংগীতের কিছুই বোঝে না বলে প্রশংসা করেছিল।' বুঝলাম বাবার এও এক পরীক্ষা।

সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। বাবা পূর্ণিমার চাঁদটা দেখে বললেন, 'পূর্ণিমার চাঁদে সারা ভারতে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ণিমার দিন সকলে লোকে তাজমহল দেখতে যায়। তাজমহলের রূপটাই বদলে যায় পূর্ণিমার দিন, চাঁদের আলোর জন্য। এই আলো দেখে সকলে অবাক হয়। কবি কবিতা লেখে, ভাবুক কত না কল্পনা করে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো দেখে সকলে যেমন মুগ্ধ হয়, বাজনাও সেইরকম বাজাতে হবে, যা শুনলে লোকে ভাবে বিভোর হয়ে যাবে। তবে তো বাজনা।' বাবা কী অদ্ভুত উপমা দিতেন, সব লিখলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। তা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বছর শেষ হতে চললো। বাবা গেলেন এলাহাবাদে। সেখানে বাজিয়ে দিল্লী যাবেন। বাবার নতুন সরোদ হয়ে গিয়েছে। সেই নতুন সরোদ নিয়ে বাবা কটক যাবেন বাজাতে। বাবা বললেন, 'দিল্লী থেকে টেলি করলে, দিল্লীতে গিয়ে আমার পুরোনো সরোদটা নিয়ে আসবে মৈহারে।'

দেখতে দেখতে কেমন করে একেকটা দিন, একেকটা মাস, একটা বছর, কোথা দিয়ে যে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না।

১৮

অনেক টাকার মালিক হলেই কেউ পুঁজিপতি হয় না। কিংবা নিঃসম্বল হলেই কেউ সর্বহারা, লক্ষ্মীছাড়া হয় না। বাবার সবকিছু থাকলেও তিনি নিজে ছিলেন নিরাসক্ত মানুষ। অন্ততঃ নিজের বাড়ীতে তিনি নিরাসক্ত জীবনযাপনই করতেন। ঐশ্বর্য তাকে স্পর্শ করতো না বলে, পরের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করার মত অন্তঃকরণটা তার ছিলো। স্থিতপ্রাজ্ঞ বলতে কী বোঝায় ঠিক হয়ত বুঝি না, কিন্তু এইটুকু বুঝি, লাভ লোকসানে, ক্ষতি বৃদ্ধিতে, বা দুঃখে সুখে যে অবিরক্ত, নিরাসক্ত, অবিচলিত, বিগতস্পৃহ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এটা হয়ত একটা আদর্শ অবস্থা। এর কাছাকাছিও যাঁরা পৌঁছতে পারেন, তাঁরাও মহান কারণ যে পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটার প্রয়োগ হয়েছিলো, সেই অর্জুনের কালেও বাহ্যিক জগৎটা এত জটিল ছিলো না, আজকের মতো। বাবাকে অনেকে দুঃখ বিলাসী ভাবত, কিন্তু ঘটনা তা নয়। বাবা ছিলেন সঙ্গীহীনের সঙ্গী। তাই নিজেকে ভাবতেন সবার অধম, দীনের হতে দীন। সেইজন্য সবার যথার্থ প্রণাম বাবার কাছে পৌঁছত না। কিন্তু বাবার প্রণাম পৌঁছতো স্রষ্টার চরণে।

এ এক বিচিত্র মানুষ। একসঙ্গে উভয় 'ন্যায়' চলে। কখনও 'মার্জার', কখনও 'মর্কট'। মার্জারের ন্যায় অর্থাৎ যেমন করে বিড়ালশিশু পড়ে থাকে, স্বয়ং চলৎশক্তিহীন, জানে মা তাকে কখনও নিয়ে যাবে। আর মর্কটের ন্যায় অর্থাৎ মর্কটশিশু মাকে আঁকড়ে না ধরলে মা তাকে নিয়ে যেতে পারে না। এই বেদান্তের কথাটা বাবা বেদান্ত না পড়লেও বুঝতেন। বলতেন, প্রথম দিকে শিষ্য বেড়ালবাচ্চা। সে নিজে কিছুই করতে পারে না, গুরুকৃপা তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু পরে তাকেই বাঁদরের বাচ্চার মতই খামচে ধরার প্রচেষ্টাটা করতে হবে। তবেই গুরু তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এ শিক্ষা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী, যা এ যাবৎ কারো কাছে পাইনি। বাবা বাজাতে দিল্লী গেলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রবিশঙ্করের টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রাম পেয়েই রাত্রের ট্রেনে যাত্রা করলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী গিয়ে রবিশঙ্করের বাড়ী গেলাম। বাবা আমাকে দেখে বাড়ীর সব খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন, 'মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, এত সেবা করে, যে সেবার তুলনা হয় না। এরকম সেবা তো কেউ করে না।'

বাবা পছন্দ করতেন না কোন লোকের বাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকতে। যেখানে নিরূপায়, সেখানে থাকতেন। মৈহারে ফিরেই বলতেন, 'আহা এত সেবা করেছে, এরকম সেবা তো কেউ করে না। কত যত্ন করে খাবার পরিবেশন করেছে।' তাই বাবা যখন বললেন, 'মা অন্নপূর্ণা এত সেবা করছে, এরকম সেবা আজ পর্যন্ত কেউ করে নি' তখন হাসি চাপলাম।

বাবা বললেন, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে আমার ঘরে শুয়ে পড়। কাল সকালেই যাবে। দিল্লী থেকে এলাহাবাদ হয়ে, রাত্রেই মৈহার পৌঁছে যাবে।' রবিশঙ্কর এ কথা শুনে হাতজোড় করে বলল, 'একটা দিন থেকে পরের দিন যাবে।' বাবা বললেন, 'এইসা না, এইসা না। মৈহারে কেউ নাই, এ ছাড়া সঙ্গীত সাধনায় বাধা পড়া ঠিক নয়। রবিশঙ্করের আর কোন কথা বলার সাহস হল না।

দিল্লীতে বেশ শীত। রাত্রে বাবার ঘরে শুয়ে শীতের মধ্যেও যেন মনে হলো রুম হিটার

আছে। রবিশঙ্কর আমার বিছানার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একটা কম্বল দিয়েছে। এ সত্ত্বেও বাবা জোর করে নিজের একটা কম্বল দিলেন। দেখলাম, খাবার পর বাবা তামাক খাচ্ছেন। হুঁকোতে যে ভাবে কাশীতে অনেককে তামাক খেতে দেখেছি ছোটবেলায়, সেই রকম রবিশঙ্কর ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

সকালে মৈহারে রওনা হবার আগে রবিশঙ্করকে বললাম, 'আমার সরোদ শীঘ্র তৈরি করিয়ে আমাকে খবর দেবেন।' বাবার নতুন সরোদ দেখলাম। দিল্লীতে শর্মা বলে একজন এই সরোদ তৈরি করে দিয়েছে। বাবার পুরোনো সরোদ নিয়ে, প্রণাম করে মৈহারে যাত্রা করলাম। গভীর রাত্রে মৈহারে এসে পৌঁছলাম। বাবা এবার মৈহার ছাড়া হয়েছেন প্রায় ষোল দিনের মত।

বাবা দিল্লী যাবার আগে সংসারের খরচা আলাদা দিয়েছিলেন এবং আমার দিল্লীর আসা যাওয়ার খরচা আলাদা করে গিয়েছিলেন। রোজকার রোজ সব হিসাব কাগজে লিখে রাখি।

মৈহার হলো খুবই ছোট জায়গা। তবে এখানকার যে প্রাকৃতিক শোভা আছে, বাইরে থেকে এলেই সেটা প্রকট হয়। মৈহারের বাড়ীতে চারিদিকে কেবল আকাশের নীল আর গাছের সবুজ সমারোহ। বড় শহরের মত একটুকুও শব্দ নেই। পাখীর ডাকে ঘুম থেকে উঠি। কুয়ো থেকে জল তুলিয়ে স্নান করি। সাধনার জন্য এরকম জায়গা হয় না। কথায় আছে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না। আজও মৈহারের প্রাকৃতিক শোভা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বাবার অবর্তমানে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটি বাড়তি পাওনা হলো, রাত্রি এগারোটা অবধি রেডিও শোনা। তারপর রাত্রি বারোটা অবধি বই পড়া। বই ছিল আমার সাথী।

কটক থেকে বাজিয়ে বাবা এলেন। রূপোর কটকি কাজে সরোদের নীচের দিকে তেল রাখবার জন্য সুন্দর নক্সা, কটকের আকাশবাণীর প্রোডিউসর রেবতী নন্দন দাস মহাপাত্র করিয়ে দিয়েছেন। বাবা আমাকে বললেন, 'কটকে কখনও গেলে এইরকম একটা করিও।' কটকে বাবা সন্তোষবাবুর বাড়ী উঠেছিলেন।

এবারে ফিরে এসে একটু অসস্থ হয়ে পড়েছেন। আসলে বৃষ্টিতে ভিজেছেন। গলায় কফ্ জমেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। এসেই আমায় বললেন, 'একটু চাল আনো তো কিনে।' বাবার অনুপস্থিতিতে চাল দরাদরি করে আমি টাকায় আটপো করে কিনেছি এবং দিল্লী যাবার আগে বাবা পাঁচ পো করে কিনেছিলেন তা শুনে বাবা খুব খুশী হলেন। মৈহারের কাছে সাতনায় গিয়ে ভাল চাল কিনে আনলাম। এছাড়া বাবার ইন্‌কাম ট্যাক্সের সব ব্যবস্থাও করলাম। মৈহারের তহশীলদার আমার লেখা ইন্‌কাম ট্যাক্সের হিসাব নিকাশ দেখে বাবাকে খুব প্রশংসা করলেন। বাবাকে ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে হলো না। তাই বাবা আমার প্রতি খুব সদয় হলেন।

রাজধানী রেওয়াতে গভর্নর হাউসে, বছরে দুটো দিন বাবাকে যেতে হ'তো ব্যাণ্ড পার্টী নিয়ে। ছাব্বিশে জানুয়ারী এবং পনেরোই আগষ্ট। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট কিংবা কোন মিনিষ্টার এলেও বাবাকে যেতে হতো ব্যাণ্ড পার্টী নিয়ে।

এবারেও যথারীতি ছাব্বিশে জানুয়ারী বাবা ব্যাণ্ড পার্টী নিয়ে গেলেন রেওয়াতে। ফিরলেন রাতে। দেখলাম বাবার মেজাজটা ভালো নয়। রাত্রে খাবার খেয়ে বাবা কেবল বললেন, 'এখন রাজার রাজত্ব গেছে, তার বদলে হয়েছে গভর্নর। রাজার রাজত্বের সময়, রাজা শিষ্য হলেও সম্বোধন করতে হ'তো তাকে অন্নদাতা বলে। তবে সঙ্গীতের কদর ছিলো। এখন হয়েছেন গভর্নর, অন্নদাতা বলে সম্বোধন করতে হয় না বটে, তবে এই গভর্নর বা ফভর্নররা সঙ্গীতের কুঢ়। সঙ্গীতের কিছু বোঝে না, গান বাজনার সময় কথা বলছিল। তাই বকে দিয়েছি আর বলে এসেছি এরকম করলে আর আসবো না।'

পরের দিন গুলগুলজী বাবার কাছে এলেন। গরুমহিষের জন্য ভূষি কিনতে হবে। গুলগুলজী টাকা চাইল। বাবা চটে উঠে বললেন, 'বলদের গাড়ীতে ভূষি এনে যে পৌঁছে দেবে তার হাতে টাকা দিয়ে দেবো। এও এক বাবার বিশেষ চরিত্র। বাবা কাউকে টাকা দিতেন না। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কাউকে বিশ্বাস করতেন না। মাল এনে দাও, সঙ্গে সঙ্গে টাকা নাও। যে জিনিষ এনে দেবে, সে যেই হোক না কেন, বাবা বলবেন, 'অশেষ মেহেরবাণী করে জিনিষ নিয়ে এসেছ, নাও পান বিড়ি খাও।' বাবা বলতেন, 'কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, আগে টাকা দিলে যদি না জিনিষ এনে দেয়?' এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম আমি। রবিশঙ্করও আমাকে বলেছে, 'তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। বাবা টাকার ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করেন না।' বিদেশে যখন গিয়েছিলেন পাউণ্ড, ডলার বা ফ্রাঙ্ক এর দর বাড়ত কমত। রবিশঙ্করই এই টাকটা হিসাব করে দিতো। যদি কখনও পাউণ্ড ইত্যাদির দর কমে যেতো, আগের বারে যে টাকা বাবা পেতেন, তা না পেলেই বলতেন, এবারে কম কেন? পরিস্থিতিটা বোঝালে বাবা কটমট করে এমন ভাবে তাকাতেন, যেন টাকাটা রবিশঙ্করই মেরে দিয়েছে। এ সব বলেই রবিশঙ্কর বলত, 'বাবা তোমাকে যে বিশ্বাস করেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

যাক, যে কথা বলছিলাম, গুলগুলজীর কাছে রেওয়াতে কি হয়েছে জানতে চেয়ে যা শুনলাম, তাতে আক্কেল গুড়ুম। এমনিতে বাবা অত্যন্ত বিনয়ী, কিন্তু সঙ্গীতের অমর্যাদা হলে বাবার রুদ্রমূর্তি, যা এবারে গভর্নর ভি. সান্থানাম দেখেছে। বাজনা হচ্ছিল। হঠাৎ বাবার চোখে পড়েছে সকলেই চা খাচ্ছে এবং গল্প করছে, ইত্যবসরে বাবা চিৎকার করে ব্যাণ্ড পার্টির সদস্যদের বললেন, 'বন্ধ করো, বন্ধ করো।' এই আওয়াজে সকলেই হতবাক। বাবার তখন পারা চড়ে গিয়েছে। বাবা জোরে বললেন, 'সঙ্গীত হলো মাতা। মাতার সামনে কোন ছেলে যদি চেয়ারে বসে পা দোলায় এবং মা নীচে বসে থাকে, তাকে কী বলবেন? এক কথায় তাকে বলা হবে 'বদতমিজ'। এ কথা বলেই বাবা বলেছেন, 'আপনারা এখন সরকার, বন্দুক দিয়ে গুলি মারুন।' গভর্নর ও সবাই অবাক। গভর্নর সাহেব বললেন, 'আপনার যা বলবার বলুন।' যে কথা আগে বলেছেন তার আবার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'আজ দেশ স্বাধীন হবার পর বাজনার যে তারের খরচা হয়, তার কি কোন খেয়াল রাখে সরকার? এতদিন সব টাকা আমি বহন করেছি। এ ছাড়া যদি খাওয়া হয় বাজাবার সময় তাহলে তো আমি দুই কোউড়ির লোক। আমার জন্য কিছুই নয়। নিজের গর্ভধারিণী মাকে অপমান করা। এখন আপনাদের রাজত্ব, সকল কর্মচারীদের হাতে বন্দুক, মেরে ফেলুন।' গভর্নর সাহেব লজ্জিত হয়ে বললেন, 'এরকম

আর হবে না। বাজনার তারের জন্য কত খরচা হয়, এ সব কাল ডি এম গিয়ে আপনার কথা জেনে আসবে এবং সরকার সব ব্যবস্থা করবে।' বাবার পারা তখন কমে গিয়ে নরম্যালে পৌঁছে গেছে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'কিছু মনে করবেন না, এটা হল সঙ্গীতের বদতমিজি।' আজকের যুগে কেউ কী কল্পনাও করতে পারবে, গভর্নরকে কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে? বাবা অত্যন্ত বিনয়ী, কিন্তু সঙ্গীতের সময়ে কোনরকম কথা বলা দেখলেই, বাবার মেজাজ সপ্তমে চড়ত। বাবা সঙ্গীতকে পূজা হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন।

অন্যের সঙ্গে বাবার চরিত্রের এই প্রভেদ। তখন কী জানতাম এই ধরনের ঘটনা গভর্নরের সামনেই আবার হবে, যার ফলে মৈহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা হবে এবং তা রূপায়িত হবে। এ ছাড়া ব্যাণ্ডের ছেলেদের মাইনে সব বৃদ্ধি পাবে।

পরের দিনই ডি.এম. এসে বাজনার তারের জন্য বাৎসরিক কত খরচ হয়, জানাতে অনুরোধ করলেন। বাজনার তার, মেরামতি করবার জন্য সব টাকাই সরকার দেবেন। ডি.এম. ছিলেন বাঙ্গালী। বাবা তাকে খুব ভালবাসতেন। ডি.এম. অনুরোধ করলেন, এবার যদি মিনিস্টার কিংবা অন্য কেউ আসে, বাবার যদি কোন অভিযোগ থাকে তাকে যেন বলেন। গভর্নর সাহেব এ অনুরোধ করেছেন। বাবা তখন অন্য মানুষ। বললেন, 'না, না, বাবা, এরকম আর করব না।' কিন্তু বাবার এই ভর্ৎসনা সারা বিন্ধ্যপ্রদেশে প্রচার হয়ে গেল।

এখন মৈহার মধ্যপ্রদেশের মধ্যে পড়ে, তখন কিন্তু বিন্ধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ছিলো। এরপর ভারতের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৈলাশ নাথ কাটজু ও বহু গণ্যমান্য লোক এসেছেন, বাবা আর কখনও এরকম ব্যবহার করেন নি। রাগী হিসাবে বাবার নাম ছিলো। কেননা স্বাধীনতার পূর্বে শেখাবার সময়ে যেহেতু মহারাজা তা ওঠাতে পারছিলেন না, তাই হাতুড়ি দিয়ে তার কনুইয়ে মেরে দিয়েছিলেন। মহারাজা তা সহজভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু এ সংবাদ প্রচার হতে দেরী হয় নি, যার ফলে বাবার বাড়ীতে কেউ আসতেই সাহস পেতো না। এ ছাড়া লোকমুখে যখন সকলে শুনেছে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিনিস্টার, পদস্থ ব্যক্তিরা এবং অনেকে বাবাকে দেখে জড়িয়ে ধরেছেন তখন লোকের চোখে বাবার স্থান অতি উচ্চে উঠেছে। আমি দেখেছি, বাড়ী থেকে বাবা যখন বাজার যেতেন সকলেই বাবাকে দেখে 'বাবা' সম্বোধন করে আদাব করত। সে সময় বাবার অন্যমূর্তি, কে বলবে বাবা ভৈরব?

আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন, তোমাকে এত ভাল লাগে কিন্তু বাজনা নিয়ে যে মুহূর্তে ঘরে আসো, মনে হয় কাশীর বামনা আমাকে খুন করতে এসেছে।' বাবা যা বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ওঠাতে পারলে বাবা খুশী হতেন। আসলে যদি একজন মহান পণ্ডিতকে অ, আ পড়াতে হয় তাহলে কি তার ভাল লাগে? বাবার বাজনার সঙ্গে ঠিক ঠিক ওঠাতে একমাত্র অন্নপূর্ণা দেবী ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি। কিছুদিন পরেই বাবা রেডিওতে বাজাতে গেলেন রাজকোট, আমেদাবাদ, বম্বে, পুনা ও ঔরঙ্গাবাদ।

বাবার যাত্রার পরের দিনই ছিল সরস্বতী পুজো। সেই পাপ কাজ আমাকে করতেই হলো। সরস্বতী মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাইলাম। মন্ত্র জানি না অথচ পুরোহিত।

বাবার অবর্তমানে রেডিওতে বাবার প্রোগ্রাম শুনতাম। এ ছাড়া মৈহারে ভারতের প্রায় রেডিও স্টেশন থেকে বাজনা শুনতাম। দিল্লী, বম্বে, কলকাতা, পুনা, রাজকোট, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ প্রায় সব স্টেশন থেকেই বাবা, আলি আকবরের বাজনা শুনতে পেতাম। রবিশঙ্করের সেই তুলনায় কম শুনতে পেতাম।

এ ছাড়া ভারতের যত নামী গায়ক এবং যন্ত্রকার সকলের গান এবং বাজনা শুনেছি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করতে সঙ্কোচ বোধ করছি না যে, সেই সময় কারো বাজনা শুনে প্রভাবিত হতাম না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন দিল্লী থেকে বুন্দু খাঁর সারেঙ্গী এবং লক্ষ্ণৌ থেকে সাদিক আলীর বীন। বাবা, আলি আকবর ও রবিশঙ্করের বাজনার মধ্যে যে গভীরতা পেতাম অন্য সরোদ এবং সেতার বাদকের মধ্যে মনে হোত ব্যপ্তি কম।

যাক, যে কথা বলছিলাম, বাবা বেশ কিছুদিন পরে মৈহারে ফিরলেন মাত্র। ফিরবার পরদিনই আমাকে বললেন, 'এক কাজ করো তো, প্রথমে হিন্দীতে আমার নাম লিখে দাও। এ ছাড়া বাংলার স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণর নীচে, হিন্দীতে নাম লেখা এবং প্রতিটি শব্দের হিন্দিতে রূপান্তরের কারণটা কী? বাবা এলাহাবাদে গেলেই প্রায় ডিটেক্টিভ বই কিনে নিয়ে আসেন, যা হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত। আমার এই অবাক হওয়াটা বোধহয় বাবা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'এবারে রাজকোটে রেডিওর ডাইরেক্টর বাংলা সইয়ের বদলে হিন্দী কিংবা ইংরেজীতে সই করতে বলছিল। আমি হিন্দী পড়তে পারি কিন্তু লিখতে তো পারিনা। সেইজন্য ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় তাই তোমায় যা বললাম তাই করে দাও। প্রথমে এক জায়গায় লিখে দাও আলাউদ্দিন খাঁ। তারপর প্রতিটি অক্ষর লিখে দাও।'

এবারে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। বাবাকে কয়েকবার বলেছি,রেডিওতে বাজিয়ে চেক নিয়ে এলে কাটনির ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে পারি। মৈহারে সে সময় কোন ব্যাঙ্ক ছিলো না। মৈহারের কাছে, কাটনিতে বাবার একটা এ্যাকাউন্ট, বহুদিন আগে মৈহারের একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তার করিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা বাইরে গেলে, যথেষ্ট টাকা নিয়ে যেতেন। যথেষ্ট টাকা নিয়ে যাবার কারণ, যদি কোন কারণে সেখানে বাজনা না হয় তাহলে কার কাছে টাকা ধার করবেন? বাবা এই টাকা চাওয়াটাকেই ঘৃণা করতেন। বাইরে থেকে তিনি এলেই, মৈহার পোষ্টঅফিসে আমি নিজে টাকা জমা দিয়ে দিতাম। বাবাকে রসিদও দিতাম, বাবা সেই রসিদ যত্ন করে রেখে দিতেন। বাবা এদিকে খুব সঞ্চয়ী ছিলেন। প্রতিটি ম্যাগাজিন কাঠের আলমারিতে রেখে দিতেন। আসলে রেডিওতে বাবা যে শহরেই বাজাতেন, চেক্ পাওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তা ভাঙ্গিয়ে নিতেন। বাবা জানতেন, রেডিওর চেক ভাঙ্গাতে ব্যাঙ্ক একটা কমিশন কেটে নেয়। সুতরাং বৃথা কেন টাকা দেবেন। বাবা যে স্থানেই যেতেন চেকের উল্টো পিঠে সই করে দিতেন। বাবাকে লোকে চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা দিয়ে দিতেন। আসলে রাজকোটে বাবার বাংলা সই বুঝতে না পেরে, হয়ত কথায় কথায় বাবাকে হিন্দীতে লিখতে অনুরোধ করেছিল। অথচ বাবা বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লিখতে পারেন না।

বাবার কথামত হিন্দীতে বাবার নাম লিখে দিলাম। বাবা আমার সামনে বড় বড় স্পষ্ট হরফে নিজের নাম, আমার লেখাটা দেখে লিখলেন। আমি আবার একটু ঠিক করে দিলাম।

কয়েকবার লিখলেন। যখন ঠিক হল আমি বললাম ঠিক হয়েছে। বাবার মুখে হাসি দেখা গেল। ঠিক বারোটার সময় বাবার ঘরে গিয়ে যখন বললাম, স্নানের জন্য জল দেওয়া হয়েছে, বাবা আমাকে বললেন একটা মোটা খাতায় কয়েক পাতা নিজের নাম কেমন লিখেছেন দেখতে। আমি তো অবাক। এতক্ষণ ধরে কয়েকপাতা খালি নামই লিখেছেন। এই বয়সে এত অধ্যবসায় কী করে পান?

বাবাকে বললাম ঠিক লেখা হয়েছে। বাবার মুখে, ছোট ছেলে একটা লজেন্স পেলে যেমন খুশী হয়, সেই ভাব দেখলাম। বাবার সারাদিন খুব খুশী ভাব দেখলাম। বিকেলে ব্যাণ্ড থেকে এসে আমাকে বললেন, 'মৈহারে সার্কাস এসেছে।' হাতি, বাঘ, সিংহ সব বাবা দেখে এসেছেন, ব্যাণ্ড থেকে ফিরবার সময়। আজ শুভারম্ভ হবে। আশিস, ধ্যানেশ এবং বেবীকে নিয়ে সারকেস দেখিয়ে নিয়ে আসতে বললেন। অবাক হলাম। অবাক হলাম, অবার যখন দেখলাম বাবা একশো টাকা মাকে দিয়ে বললেন, 'এই একশো টাকা তোমার কাছে রাখো। যা ইচ্ছা তা কিনো।' মাকেও অবাক হতে দেখলাম। মা, বাবাকে বললেন, 'আজ সূর্য্য কোন দিকে উঠেছে, জীবনে এই প্রথম আমার হাতে মনোমত খরচা করবার জন্য একশো টাকা দিলেন।' এই কথা বলেই মা হঠাৎ বাবাকে প্রণাম করলেন। বাবা বললেন, 'আরে আরে প্রণাম কিসের জন্য?' মা-ও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'জীবনে এই প্রথম টাকা দিলে তাই প্রণাম করলাম।'

মা'র এই কথা শুনে পরে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন এই কথা বললেন, যে জীবনে এই প্রথম বাবার কাছ থেকে টাকা পেলেন? বাবা কি কখনও টাকা দেননি?' উত্তরে মা বললনে, 'ঠিকই বলেছি বেটা! জীবনে কখনও একটা পয়সাও আমাকে দেয় নি। নিজেই সব কিছু এনে দেয় যা দরকার। তোমার বাবার বোধহয় ভীমরতি হয়েছে, নইলে মরবার সময়ে তোমার বাবার মনে হলো, আমার মনোমত কোন জিনিষ কিনবার জন্য। ইচ্ছা তো করে নাতিদের জন্য কখনও কিছু কিনে দিই, নিজের কোন জিনিষের প্রতি মোহ নেই। যা প্রয়োজন তোমার বাবাই, কথা শুনিয়ে, তবে এনে দেয়। এতদিন তো রয়েছ, তোমার বাবার মেজাজ তো দেখেছ।' মার কথা শুনে এই নিয়ে তৃতীয়বার অবাক হলাম। সন্ধ্যাবেলায় সার্কাস দেখলাম। পরের দিন বাবা আমাকে মোটা অঙ্কের টাকা এবং পোষ্ট অফিসের বই দিয়ে বললেন, 'টাকাটা জমা করে দাও।' বুঝলাম বাবা কেন মাকে জীবনে এই প্রথম টাকা দিলেন।

পোস্ট অফিসে গিয়ে রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, আমার সরোদ তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাবার অনুমতি নিয়ে যেন দিল্লী গিয়ে সরোদ নিয়ে আসি। বাবাকে বললাম। বাবা শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'নতুন সরোদ খুব ভাল করে বাজাবে।' উপস্থিত যে সরোদটা বাজাও তার কোন রেশ থাকে না। ভাল বাজনা পাওয়াটা ভাগ্য। দেখ না, আমার কাছে তো এতগুলো সরোদ আছে অথচ আমি যা চাই তা একটা সরোদেও পাই না। নূতন সরোদ করিয়ে নিয়ে এসেছি, এও আমার মনোমত হয় নি। আমার ভাই আয়েৎ আলী এত সরোদ তৈরি করেছে, কিন্তু একটাও ভাল হয় নি। বাহাদুরের সরোদও ভালো হয়নি। তবে আলি আকবরের সরোদটা ভাল বেরিয়ে গেছে। তাই বলছি, ভাল যন্ত্র পাওয়াও ভাগ্যের কথা। এখন দেখ তোমার সরোদটা কেমন হয়? তিন দিন পর আমি এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাব। ফিরে এলেই তুমি

দিল্লী গিয়ে সরোদ নিয়ে এসো। যে কদিন বেঁচে আছি, তার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি পার আমার কাছে, যা খুদকুঁড়ো আছে, যাতে সব নিতে পার খুদার কাছে প্রার্থনা করি।'

রাত্রে বাবার কাছে শিখলাম সেই এক রাগ 'ইমন'। অবাক হই। রোজ নিত্যনূতন ভাবে শেখান। এক জিনিষের কখনও পুনরাবৃত্তি নেই।

১৯

কয়েকদিন পরে বাবা এলাহাবাদ রেডিওতে গেলেন বাজাতে। এবারে বাবার অবর্তমানে বম্বে রেডিও স্টেশন থেকে বাবার সঙ্গীত সাধনার উপর একটি ইন্টারভিউ শুনলাম। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেখেছি, কোনো গায়ক বাদক একটা রাগের নাম পর্যন্ত বলতে চান না। সঙ্গীত সাধনার উপর কথা জিজ্ঞেস করলে, সকলকেই শুনেছি আগে গণ্ডা বাঁধ তাহলে বলব। কিন্তু বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। বাবার কাছে অন্য ঘরাণার শিক্ষার্থীকে কোন রাগ জিজ্ঞাসা করলে, বাবা সঙ্গে সঙ্গে তার চলন রূপ বলে দিতেন এবং কি করে সাধনা করলে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, সব বলতেন। দীর্ঘদিন বাবার কাছে থেকে এই জিনিষ দেখেছি।

বাবার সহজ ভাবে রেডিওতে এসব কথা বলা শুনে, একটা কথাই বুঝেছি যে, বাবা ছিলেন সমুদ্র। সমুদ্র থেকে এক বালতি জল কাউকে দিলে সমুদ্রের জল কি কমে যায়? সুরের সাধনা কিরকম ভাবে করতে হবে, যে ভাবে তিনি বলতেন, অদ্যাবধি বহু ইন্টারভিউ আমি শুনেছি, কোন কিছু গোপন না করে এরকম বলতে শুনি নি। যার অফুরন্ত ধন, তার এক পয়সা দিলে কি কোন ক্ষতি হয়? বাবা ছিলেন সেই জ্ঞানের সমুদ্র।

এর দুই দিন পর হঠাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে বাবার ভারতীয় সঙ্গীতের ওপরে একটা ইন্টারভিউ শুনলাম। এই ইন্টারভিউ লক্ষ্ণৌর গায়িকা সুশীলা মিশ্রার সঙ্গে হলো। বাবা মাঝে মাঝে গান গেয়েও শোনালেন। এর মধ্যে সাতনা থেকে ডাক্তারেরা এসে মৈহারে প্রতি বাড়ীতে বিসিজি টিকা দিল। এর ফলে আমার ইন্‌জেকশান দেওয়ার জায়গায় একটু ফুলে গেল এবং আশিস, ধ্যানেশ এবং বেবী তিনজনেই জ্বরে পড়ে গেল। তবে একদিন পরেই ঠিক হয়ে গেল। রক্ষা পেলাম। বাবা যদি এসে দেখতেন সকলেরই শরীর খারাপ, বলতেন 'লখছন ভাল নয়।'

বাবা যথাসময়ে এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন, এবারেও পাঁউরুটি এবং বিস্কুট নিয়ে এলেন। এ ছাড়া বাবা এবারে অনেক হিন্দী বই নিয়ে এসেছেন। যাকে বলে 'তিলিস্মি' বই। এই বইগুলো রূপকথার। রাত্রে সেদিন ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। বাবা ডাক্তারবাবুকে, ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে খাওয়ালেন। ডাক্তারবাবু খুব খুশী হয়ে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে। বাবা বললেন, 'তোমাদের বুড়ো মা তো কোথাও কিছু শেখেনি.। নিজের মন থেকে যা ভাবে তাই করে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'মা'র হাতের এত ভাল খাওয়ার জন্যই আপনার শরীর এখনও এত ভালো আছে।' বাবা বললেন, 'আরে আরে তোমরা তো কত ভালো খাও। আমার এখানে সাধারণ খাওয়া। যেমন করে হোক পেট ভরানো।' এই কথা বলেই, বাবা ডিটেকটিভ বই এবং তিলিস্মি বইগুলো ডাক্তারকে দেখালেন। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইসব বই আপনার ভালো লাগে?' উত্তরে বললেন, 'ছোটবেলায় তো বই পড়বার সুযোগ হয় নি। তাই এখন এই সব বই পড়লে নিজের বয়স অনেক কম মনে হয়। মনে হয় বয়স বেশী

হয়ে গেলেও, মনে মনে যেন বয়স খুব কম হয়ে গিয়েছ।' কোথায় যেন পড়েছিলাম বার্ধক্যে ডিটেক্টিভ বই পড়লে এবং ছোটদের রূপকথা পড়লে মনের বয়স কমে। কিন্তু বাবা এই কথাগুলো তো কোথাও পড়েন নি। কি জানি, বাবা এ কথা কি করে জানলেন। বাবা এলাহাবাদ থেকে এসেই পঞ্জিকা দেখে আমাকে বললেন, 'দোসরা মে তে লেখা আছে যাত্রা শুভ, সুতরাং ওই দিন তুমি দিল্লী যাত্রা করবে। তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।' আসলে বাবার কী পরিমাণে যে অন্ধ কুসংস্কার ছিল তা কল্পনা করা যায় না।

বাবা প্রতিমাসে পঞ্জিকা দেখে মাসের ফলাফল দেখতেন। মাসের ফলাফল খারাপ দেখলেই বাবা বলতেন, 'এই মাসে ফলাফল ভাল নয় লিখেছে, সুতরাং লক্ষণ ভাল নয়।' বাবা নিজের রাশি বলতেন সিংহ রাশি। বাবাকে কে যে বলেছিল জানি না। বাবা আলি আকবরের কুষ্ঠি তৈরী করিয়েছিলেন শুনেছি, কিন্তু সেই কুষ্ঠি কখনও দেখিনি। বাবার কুষ্ঠির কথা কখনও শুনি নি। একটা কথা বলতেন বাবা, তাঁর সিংহ রাশি, সেইজন্য সিংহের মত মেজাজ পেয়েছেন এবং দুর্গাপূজার অষ্টমী, মহাষ্টমীর দিন জন্ম হয়েছে বলে বাবা মায়ের এত ভক্ত। যার জন্য কথায় কথায় মা, মা বলতেন।

যাক, বাবার কথায় শুভযাত্রা শুনে দিল্লী যাত্রা করলাম। পরের দিন দিল্লী পৌঁছলাম। দিল্লীতে রবিশঙ্করের বাড়ী মাননগরে। বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়ে কয়েকজন লোক দেখলাম। রবিশঙ্কর পরিচয় করিয়ে দিল নিজের শিষ্য বলে। হরিহর, অমিয় এবং উমাশঙ্কর সেতার বাজায়। রবিশঙ্করের বন্ধুস্থানীয় নরেশচাঁদ মল্লিককে দেখিয়ে বললেন, যদিও অপেশাদার কিন্তু ভালো যন্ত্র তৈরি করতে পারেন এবং রবিশঙ্করের জোয়ারি বরাবর করে দেয়। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নি, রবিশঙ্করের কাছেই থাকেন। রবিশঙ্কর আমাকে ছোট সরোদটাই নিতে বলল। ছোট সরোদটি যদিও আমার সরোদ থেকে বড়, তবুও তাকে ছোটই বলব। আমি বড়টাই পছন্দ করেছিলাম, প্রমাণ সাইজ বলে। এ সরোদটি ঠিক বাবার মাপের। কিন্তু সে বলল, বড় সরোদ বাজাতে কষ্ট হবে, ছোট সরোদ খুব তৈরী বাজবে। ইচ্ছা না থাকলেও ছোটো সরোদটি নিলাম। পরে বুঝেছিলাম ছোট সরোদ নিয়ে কি ভুলই না করেছিলাম। রবিশঙ্করকে বললাম, রাত্রে মৈহার ফিরে যাব। সে বলল, দুটো দিন থেকে মৈহার যেয়ো।

রবিশঙ্কর তখন রেডিও স্টেশনে চাকরি করছে। আমাকে সে খেয়ে নিতে বলল তার সঙ্গে। খেয়ে রবিশঙ্কর আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে গেল। অন্নপূর্ণা দেবীর শরীর খারাপ। জ্বর হয়েছে ক'দিন হলো। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি দেখলাম রান্না করছেন। শরীর খারাপ হয় বলে, রবিশঙ্কর অন্য একটা বড় ফ্ল্যাট ঠিক করেছে।

রবিশঙ্করের সঙ্গে রেডিও স্টেশন গেলাম। ১৯৪৯ সনে দিল্লীর রেডিও স্টেশনে সাত দিন চাকরি করেছিলাম। আবার আজ সেই রেডিও স্টেশনে গেলাম। রেডিও স্টেশনে রবিশঙ্করের একটা আলাদা ঘর এবং একজন অফিসার সেই ঘরে বসে। অর্থাৎ অফিসিয়াল যত কাজ তার ইনচার্জ হলেন সেই অফিসার। সেই অফিসারকেই পরে দেখতে পাই এলাহাবাদ এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর হিসাবে।

বেশিরভাগ সময় তার স্টুডিওতে অর্কেস্ট্রা তৈরি করতে হয়। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অন্নপূর্ণা দেবীর এখনও কি ফিট হয়?' কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়েছেন কি না? উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ এখনও মাঝে মাঝে ফিট হয়। তুমি তো জানো অন্নপূর্ণা কত জিদ্দি। কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাবে না। কত করে বলেছি, কিন্তু বলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই কথা বলে কপালে হাত রেখে বলল, 'তুমি এসেছ, তোমার কথা শোনে, তুমি আজ বাড়ীতে গিয়ে একবার বলো না।'

রেডিও থেকে বাড়ীতে এলাম তার সঙ্গেই। সন্ধ্যায় রবিশঙ্করকে শেখাতে দেখলাম। রাত্রে খেতে বসে অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নতুন বড় ফ্ল্যাট ভালো হয়েছে শুনলাম, কিন্তু জ্বর বাধিয়ে বসলেন সুতরাং নতুন ফ্ল্যাটটা দেখা হোলো না। কাজের লোক তো একটা দেখলাম কিন্তু রান্না করে না কেন, যখন আপনি অসুস্থ।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'এই দিল্লীতে এমন লোক পাওয়া কঠিন যে সব কাজ করতে পারে। রান্না আমি না করলে, পণ্ডিতজীর এই ভক্তদের কে রান্না করে খাওয়াবে?' রবিশঙ্কর চুপ, দেখলাম হাওয়ার গতি অন্যদিকে যাচ্ছে।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'আপনাকে বলেছিলাম সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে, অথচ শুনলাম ডাক্তার দেখান না। কি জন্য এ্যাবনরমাল সাইকোলজি পড়ালাম? বইটা খুলে মেলানকোলিয়ার চ্যাপ্টারটা পড়বেন। আমার মনে হয় আপনার মেলানকোলিয়া হয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্ট নিরাময় করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, যে কারণে মেলানকোলিয়া হয় সেটা আপনি নিজেকে এড্‌জাস্ট করে ঠিক করতে পারবেন।' অন্নপূর্ণা দেবী রবিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইসব কথা যতীনবাবুকে বলেছ?' রবিশঙ্কর একেবারে চুপ। তার চোখটা থালার দিকে, মাথা নীচু করে খেয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হোলো অন্নপূর্ণা দেবীর সামনে রবিশঙ্কর একেবারে জুজু। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'দেখা হলেই আপনার কেবল উপদেশ দেওয়া দেখছি যাবে না। আমার অসুখ হলে কী আর হবে। যতদিন বেঁচে আছি, পণ্ডিতজীর ভক্তদের দিনরাত সময় করে খাওয়াতে হবে। আমি মরে গেলে পণ্ডিতজী শান্তিই পাবে। আমার থাকাতে অনেক ব্যাপারে ওর অসুবিধা হয়। একমাত্র শুভর মুখ চেয়ে বেঁচে আছি। নইলে কবেই মরে যেতাম। বড় বড় কথা বলছেন, এ্যাড্‌জাস্ট বলছেন, এ্যাড্‌জাস্ট কখনও এক পক্ষে হয়?'

পণ্ডিতজীকে দেখিয়ে বললেন, 'সামনে দেখছেন, এক রূপ, আর বাইরে আলাদা রূপ। অন্য ফ্ল্যাট দেখে কি হবে? বিরাট বড় ফ্ল্যাট হওয়ায় আমার কোন মোহ নাই। পণ্ডিতজী তাঁর সুবিধার জন্য কত বড় ফ্ল্যাট দেখেছেন। একটা ছোট ঘর হলেই আমার চলে যায়। যাক এ সব কথা। প্রথমে বলুন আপনার শিক্ষা, বাবা, মা এবং বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন?' অন্নপূর্ণা দেবীর একনাগাড়ে এতগুলো কথা শুনে ভাবলাম এ নিয়ে কথা বাড়ানো উচিত হবে না। কেননা কথা বলার গতিটা যে দিকে যাচ্ছে, তাতে মনে হ'লো সামনে কালকেউটে অপেক্ষমান, তাই চটজলদি সাবধান হলাম।

অন্নপূর্ণা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছেন? কথা বলছেন না কেন? বাবা মা কেমন

আছেন?' সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তার দিল্লী চলে আসবার পর, বাবার উপরের ঘরে গিয়ে কান্নার কথা শুনে বিচলিত হতে দেখলাম। অন্নপূর্ণা দেবী বাবাকে কত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসেন বুঝলাম, কেননা বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখে আর কোন কথা নাই।

পরের দিন শুভকে দেখলাম বেশীর ভাগ সময় নিজ মনে ছবি আঁকে, যেমন মৈহারে আঁকত। শুভকে বললাম, 'মন দিয়ে লেখাপড়া করতে। যে কোন কাজে বড় হতে গেলে লেখাপড়াটা সাহায্য করে।' শুভ আমাকে জোর করল ক্যারাম খেলতে। মৈহারেও খেলতাম। আজও খেললাম। নতুন সরোদটা একটু বাজালাম। এ সরোদটা আগের থেকে অনেক ভাল। কিন্তু এরও রেশ থাকে না। রবিশঙ্কর বলল, 'বাজাতে বাজাতে বাজনার আওয়াজ খুলবে। বুঝছি ছোট সরোদ বলে তোমার মনটা খুঁত খুঁত করছে। ইচ্ছে হলে বড় সরোদটাই নিতে পারো, তবে ছোট সরোদে কম মেহনতে দেখবে তৈরি বাজবে।' ইচ্ছা না থাকলেও ছোট সরোদটাই নিলাম।

রাত্রে অন্নপূর্ণা দেবী কয়েকটা কঠিন পাল্টা, বোল, মীড় শিখিয়ে দিলেন রিয়াজ করবার জন্য। দিল্লীতে দু'দিন থেকে তৃতীয় দিন সকালে দিল্লী থেকে যাত্রা করলাম। পরের দিন সকালেই মৈহারে এসে পৌঁছলাম। বাবা সব খবরাখবর নিয়ে বললেন, 'নতুন ফ্ল্যাটটি কেন দেখে এলে না? উত্তরে বললাম, 'হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর জ্বর হওয়ার জন্য দেখতে পারলাম না।' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তার দেখছে না?' উত্তরে বললাম, 'ঘাবড়াবার কিছুই নাই। দুই একদিনেই সেরে যাবে।' বাবা বললেন, 'আরে আরে, এই অবস্থায় পঙ্গপালদের জন্য রান্না করতে হচ্ছে-দুর্ভাগা, এইজন্যই মৈহারে এলে আমি রাঁধতে দিই না। আসলে মনে শান্তি না থাকলে শরীর মন কি ভাল থাকে? আমার মায়ের শরীর ভাল থাকবে কি করে?' বাবার কথা শুনে আমি অবাক।

আমার নতুন সরোদ দেখে বাবা এবং মা আশীর্বাদ করে বললেন, 'এখন খুব রিয়াজ করো।' নতুন সরোদে দুপুরেই বাবা আমাকে গৌড়সারং-এর চলন শিখিয়ে রিয়াজ করতে বললেন। বাবা বললেন, 'সব রাগের আরোহী অবরোহী হয় না। রাগের চলন শিখতে হয়। এই চলনটাকেই আরোহী অবরোহী ভেবে বাজাবে।' এসে অবধি দুপুরে কেবল কাফি এবং ভীমপলাশীই বাজিয়েছি। আজ গৌড়সারং বাজাতে যেমন আনন্দ আমি পেলাম, ঠিক সেইরকম মনে হলো অত্যন্ত কঠিন।

সন্ধেবেলায় বাবা বললেন, 'আজ ভূপালি শেখ।' ভাবলাম এও বাবার পরীক্ষা। মৈহারে আসার পর বাবা বলেছিলেন, তিনবছর তাঁর গুরুর কাছে কেবল 'ইমনই' শিখেছিলেন। যদি আমি তিনটে বছর ইমন শিখতে পারি তো দেখব বাজনার অনেকটা শিখে ফেলেছি। বাবার এই কথা শুনে অবাক হতাম। এতদিন সন্ধ্যায় কেবল ইমনই বাজিয়েছি। বহুবার ভেবেছি কেন অন্য রাগ বাবা শেখান না। কিন্তু আজ যখন বাবা বললেন, 'নতুন রাগ 'ভূপালি শেখো', ভাবলাম পরীক্ষা। বললাম, 'না, এখন ইমনই শেখান।' বাবা জোরের সঙ্গেই বললেন, 'ইমন তো শিখবেই, এখনো তো আসল 'ইমন' শেখো নি, তবুও ঔড়ব জাতির রাগ ভূপালি বাজাও। এখন 'ভূপালি' এবং 'ইমন' এক দিন অন্তর অন্তর সাধনা করবে।'

পরের দিন বাবা রাগ 'তোড়ি' শেখালেন। বাবা বললেন, 'সকালে দুটো রাগ 'ভৈরো' এবং 'তোড়ি', দুপুরে 'ভীমপলাশী' ও 'গৌড়সারং' এবং রাত্রে 'ইমন' এবং 'ভূপালি' একদিন অন্তর, একটা করে বাজাবে এবং আমার কাছে রোজ শিখবে। দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। আমার মনে হোলো এক ক্লাস উপরে উঠলাম।

এই প্রথম, মৈহার ব্যাণ্ডের বাজনার জন্য এলাহাবাদ রেডিও থেকে বাবাকে আমন্ত্রণ করেছে। বাবাকে বললাম, 'বাইরে বাজাবার জন্য অনুমতি দিতে হবে, এ ব্যাপারে ডি.এম. এর কাছ থেকে চিঠি এসেছিল। সুতরাং ডি. এম. কে একটা চিঠি দেওয়া দরকার। চিঠি দিলেই অনুমতি এসে যাবে।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, লিখে দাও।'

পরের দিন বাবা বললেন, কয়েকদিন থেকে পায়ের ব্যথা বেড়েছে। কি জানি পঙ্গু হয়ে যাবো কি না।' এ কথা শুনে মা আমাকে বললেন, 'বাজারে পাওয়া যায় বাদুড়ের হাড়। এটা টোটকা ঔষুধ। দুটো নিয়ে এসো। তোমার বাবাকে একটা পরিয়ে দেব এবং আমিও একটা পরে নেব।' বাদুড়ের হাড় কোথায় পাওয়া যায় জানিনা। সকালেই গুলগুলজীর বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। গুলগুলজী একটা দোকান থেকে কিনিয়ে দিলেন। পোস্ট অফিস থেকে ফিরে মাকে দিলাম। বাদুড়ের হাড়ে একটা ফুটো ছিল। তার মধ্যে সুতো পরিয়ে, মা বাবার পায়ের গোড়ালির কাছে জোর করে পরিয়ে দিলেন, বাবা প্রথমে আপত্তি করলেন। বললেন, 'আমার এসবের দরকার নেই। তোমার তো ব্যথা পায়ে, তুমি ওই সব পর।' উত্তরে মা বললেন, যে তিনিও পরবেন এবং বাবাকেও পরাবেন। এই কথা বলে মা জোর করে পরিয়ে দিলেন। বাবা আর আপত্তি করলেন না। মা চলে যাবার পর আমাকে বললেন, 'তোমার মা অনেক টোটকা জানে। তোমার মায়ের একবার মাথা খারাপ হয়েছিল, অর্থাৎ পাগলের ভাব, দেশের একজন কবিরাজ ভালো করে দেয়। সেই কবিরাজের কাছে তোমার মা অনেক টোটকাও শিখেছিল। আল্লা জানে এতে কী হয়। তোমার মা যদি পরিয়ে নিশ্চিন্ত হয় তাই পরলাম।'

মুখে বাবা বলতেন বটে কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এসে অবধি দেখছি মুখে বললেও অন্তরে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। দীর্ঘদিন থেকে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। কয়েকদিন পর বাবা বললেন, 'আরে আরে, তোমার মায়ের ঔষধে সত্যই তো ব্যথাটা কমেছে।' বাবার এই সুতো পরানো বাদুড়ের হাড় হারিয়ে গেলে, আমি থাকাকালীন বরাবর কিনে দিয়েছি। বাবার জীবিত থাকাকালীন আমি বাদুড়ের হাড় পরে থাকতে দেখেছি।

বাবা কোলকাতায় গেলে দক্ষিণা রায়চৌধুরীর বাড়িতে উঠতেন। বাবার সঙ্গে আলাপ হয় জ্যোতিষ ভট্টাচার্যর মারফৎ। এই জ্যোতিষ ভট্টাচার্য বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির কাছে নোটেশন লেখা শিখতেন, সেতার শিখেছিলেন এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছে। দক্ষিণা রায়চৌধুরী বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বাবার মুখে এ কথা শুনেছি। সেই দক্ষিণা রায়চৌধুরীর চিঠি পেলাম। মৈহারে আসছেন। বাবা তাঁর উচ্চ প্রশংসা করলেন। বললেন, 'জমিদার বংশের ছেলে। আমার বড় ছেলের মত। সে এলে যেন তার কোন কষ্ট না হয়।'

ইদানিং দেখছি বাবা কানে একটু কম শুনছেন। ডাক্তারকে বললাম। ডাক্তার সাতনা থেকে এক ডাক্তার ডেকে পরীক্ষা করালেন। বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' ঔষধ দিয়ে

কানটা পরিস্কার করে দিলেন। ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম, সাতনার ডাক্তারটি ই.এন.টি. স্পেশালিস্ট। আসলে কানে অনেক ময়লা জমে গিয়েছিল, তাই কান পরিষ্কার করে দিলেন। একটা ঔষধ কিনে রোজ রাত্রে শোবার আগে দু'ফোঁটা দু'কানে লাগাতে বলে সাতনার ডাক্তারটি চলে গেলেন।

কিছুদিন পরই দক্ষিণা রায় চৌধুরী এলেন। দক্ষিণা রঞ্জনের কাছে, বাবা আমার খুব প্রশংসা করে, আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হল আমার বুড়ো বয়সের ছেলে। আমার নাম রাখবে।'

এই সময় নিখিলের একটা চিঠি এল। বাবার কাছে অনুমতি চেয়েছে আসবার জন্য। 'এই বয়সে আর পারিনা', বাবা বললেন। এ কথা বলার পরই নিখিলের বাবার চিঠির সম্বন্ধে সব কথা বলে বললেন, 'আমাদের বাঙ্গালীদের কি মনোবৃত্তি।' দক্ষিণাবাবুকে বললেন, 'কোলকাতায় গিয়ে বলে দিতে, যে এখন শরীর ভাল নাই, তার সম্মতি পেলেই যেন মৈহারে আসে।'

দক্ষিণারঞ্জন চারদিন মৈহারে ছিলেন। প্রায় সকলকেই দেখি বাবার সামনে হ্যাঁ-তে হ্যাঁ করেন, এবং না-তে না করেন। বাবার কোনো কথার প্রতিবাদ করার সাহস কারো নাই। দক্ষিণারঞ্জনকেও তাই দেখলাম। কিন্তু তিনি সত্যই বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। খুব সরল লোক বলেই মনে হলো। তিনি বিচক্ষণ লোক এবং যে কদিন বাবাকে দেখেছেন তাতে এই তত্ত্বটা বুঝেছেন, বাবাকে পার্থিব সুখ আকর্ষিত করে না, তথাপি এ বাড়ির জল সংকট দেখে ভদ্রলোক চিন্তা ব্যক্ত করলেন এবং বাবাকে অনুরোধ করলেন, যদি এর সমাধানের পথ বের করতে পারেন তিনি, তাহলে বাবা যেন সেটা স্বীকার করে নেন। দক্ষিণারঞ্জনের মনে ছিলো কুয়োতে পাইপ বসিয়ে, বড় ওয়াটার পাম্প মেসিনের মাধ্যমে জলকে ছাতের উপর টাঙ্কিতে তুলে নেওয়া যায়। আর তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে প্রয়োজন মাফিক, বাড়ীর বিভিন্ন জায়গার বসান কলের সঙ্গে। বাবার ব্যাপারটা মনঃপুতঃ হলো। কিন্তু এসব ঝামেলা পোয়াবে কে? দক্ষিণারঞ্জন নিজেই বললেন সে দায়িত্বটা তাঁর।

চারদিন পর বাবা দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে এলাহাবাদে চলে গেলেন রেডিওতে বাজাতে। বাবার যাবার পর, আমার চোখের যন্ত্রণা, মাথা ধরা, পেটে ব্যথা আদি উপসর্গ দেখা দিল। ডাক্তারবাবু শুনে বললেন একবার সাতনাতে গিয়ে চোখের ডাক্তারকে দেখাতে। আমি সাতনাতে গেলেই বাবা চিন্তিত হবেন, সুতরাং মনের জোরে সব সহ্য করলাম। তখন কি জানি এ এনিমিয়ার পূর্ব লক্ষণ। তিন মাস পরে তা জানতে পেরেছিলাম। মোটামুটি, মনের জোরে সব কাজ করে যেতে লাগলাম।

কয়েকদিন পর বাবার কাছে বলতে বাধ্য হলাম। তাঁকে বললাম, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই কয়েকদিন পরে শিখব। বাবা যথারীতি ঘাবড়ালেন। বললেন, 'কেন এইরকম হচ্ছে? কাশীতে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এসো।' উত্তরে তাঁকে বললাম, 'ভয়ের কোনো কারণ নাই। ডাক্তারবাবুর কথামত ঔষধ খাচ্ছি ঠিক হয়ে যাবে।' বাবা বললেন, 'কথায় আছে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; এই তিন থাকতে নয়। যতই শরীর খারাপ হোক, রোজ অন্ততঃ বাজাবে। একটু ঠিক হলেই শিখতে আসবে, ডাকতে যেন না হয়।

আবার বেশ গরম পড়ে গিয়েছে, সুতরাং বাড়ীর বাইরে খোলা মাঠে শোওয়া আরম্ভ

হয়ে গিয়েছে। একদিন উঠলো ধুলো ঝড়। বাবা তখন ব্যাণ্ডে। ঘরের জানলাটা খোলা দেখে মনে হলো জানলাটা বন্ধ করে দিই। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি খাটের উপর এক বিশাল মোটা জাবদা খাতার পাতা ফড় ফড় করে উড়ছে। আরে এটা তো সেই খাতাটা, যেটার প্রথম পাতায় বাবাকে হিন্দীতে বর্ণমালা লিখে দিয়েছিলাম। যদিও অপরাধ হবে বুঝতে পারছিলাম তবুও লোভ সামলাতে না পেরে পাতাগুলো উল্টাতে লাগলাম। আরে সর্বনাশ! বাবা এটা করেছেন কী! সারা খাতাটা জুড়ে হাতের লেখা অভ্যাস করেছেন?

কোথাও, পাতার পর পাতা হিন্দীতে কেবল আলাউদ্দিন খাঁ, তো কোথাও বা একাদিক্রমে রাম রহিম কৃষ্ণ করিম। আবার কিছু পাতা ডাক্তার আলাউদ্দিন খাঁ মৈহার। ধন্য অধ্যবসায়। মনে মনে ভাবলাম, যার বয়েসের হিসাবটাই মানি, বাবার মতে একাশি বা আমার মতে একাত্তর; এই বয়সে এ পর্যায়ের রিয়াজ করা ক্লান্তিকর বিরক্তিকর, একঘেয়ে, কি করে ধাতে সইল। একটা তত্ত্বই বুঝলাম, বাবার অভিধানে অসম্ভব শব্দটা নাই। তাই যে জিনিষটা জীবনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে, বাবা তাকে রিয়াজ করে আয়ত্ত করে নিয়েছেন। পড়াশোনায় ঋজু মানুষের গোঁ হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইকেই জানি, আর বাস্তবে গোঁ ধরলে সর্ব সম্ভব তা বাবাতে দেখেছি। ভালো হয়েছে। কেউ বাবাকে সখ চাপায়নি পাহাড়ে চড়ার। অন্যথায় আমার স্থির বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রথম মানুষ বাবাই হতেন শীর্ষে পৌঁছনোয়, এতে কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। বাবার ফেরার সময়। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। নমাজের পর বাবা ডাকলেন শিখবার জন্য। চুরি করে খাতা দেখার জন্য অপরাধী ভাবছিলাম নিজেকে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই নাটকে যেমন পর পর ক্লাইম্যাক্স, আসলে যাকে বলে চূড়ান্তের আধিক্য, ঠিক তেমনি বাবা গোটা আটেক জাবদা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। যার কটা মাত্র আমি দেখেছিলাম। শেষ কটাতেও এই একই ধরনের রিয়াজ করেছেন বাবা। বললেন, 'এত দিনে একটু অভ্যাস করেছি। পরে চোখ বুলিয়ে দেখো কোথায় কি ভুল ত্রুটি আছে।' তারপরেই শেখাতে আরম্ভ করলেন।

ছোটবেলায় আমার মেজদা গাইত 'ভূপালি'। বড় হয়ে অনেক 'ভূপালি' গান শুনেছি। কিন্তু যন্ত্রে? যন্ত্রে এ যাবৎ ভূপালি শুনিনি। বাবা সংক্ষেপে একটু আলাপ থেকে বিলম্বিত গৎ প্রথম কয়েকদিন শিখিয়েছেন। আজ শেখালেন তারানা। ভূপালি যে এত গম্ভীর রাগ কল্পনারও বাইরে ছিল।

হঠাৎই ওইসময় ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। আমার শেখা ততক্ষণে শেষ হয়েছে। ডাক্তারবাবু আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, বাবা আমাকে চায়ের জন্য বললেন। ডাক্তারবাবু সিগ্রেট খেতেন না। কিন্তু পান খেতেন। বাড়ীতে পানের সরঞ্জাম থাকত। বাবা সকালে খাবার পর এবং সন্ধ্যার খাবার পর পান খেতেন। মা-ও খলের মধ্যে পান ছেঁচে নামমাত্র জর্দা দিয়ে খেতেন। ডাক্তারবাবুও এলেই পান এবং জর্দা খেতেন।

তিনি এসেই বললেন, 'বাবা আজ মনটা ভাল নাই।' এ কথা শুনেই বাবা বললেন, 'কি হয়েছে বাবা, মন কেন ভালো নাই? বাড়ীর সব কুশল তো?'

উত্তরে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে বাড়ীর সব ভালো আছে। কিন্তু সকালে একটা কঠিন অপারেশন করেছি, সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে দেখি অবস্থা ভাল নয়। ওষুধ দিয়ে এসেছি। ছেলেটি সবে একবছর বিয়ে করেছে। অল্প বয়স্কা স্ত্রী। হাসপাতাল থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে যদি একটু বাজান, তাহলে মনে একটু সান্ত্বনা পাবো।' গরম কাল হলেও, ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে বাবা বসেছিলেন, কারণ উঠানের পাথর থেকে গরম ভাপ বেরোয়। বারান্দায় মক্কা মদিনার একটা ছবি ছাড়া সব ছবিই ছিল দেব দেবীর।

বাবা বললেন, 'আমার গুরুদেব উজির খাঁর অতি প্রিয় রাগ 'তিলক কামোদ' বাজাচ্ছি। সকলে বলে হাল্কা রাগ 'তিলককামোদ', কিন্তু এ রাগ বড়ই গম্ভীর রাগ। গায়ক গায়িকারা ঠুংরিতে তিলককামোদ গায়। এ রাগটি বাজাবার চেষ্টা করছি যেভাবে শিখেছি। রাগটি শুনে, কি ভাব মনে হয় বলবেন, কেন না আপনি সঙ্গীতের একজন সমঝদার শ্রোতা।' এই কথা বলেই বাবা আলাপ বাজাতে লাগলেন। পনেরো কুড়ি মিনিট, আলাপ সবে মন্দ্রে হয়েছে; হঠাৎ দেখলাম ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। দেখলাম তাঁর চোখ বুজে গেছে। বাবা চোখ বুজে বাজাচ্ছেন। তাই দেখতে পান নি। আমি তাঁর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম ফিট হয়ে গেলেন না কি।

কিন্তু ফিটের লক্ষণ ছিলো না। বাজাবার সময় কথা বললে, বাবা চিৎকার করে উঠবেন সেইজন্য ডাক্তারবাবুকে একটু ধাক্কা দিলাম। ডাক্তারবাবুকে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে ভয় পেলাম। খুব ধীরে নিজের ঘর থেকে, এক গেলাস জল নিয়ে ডাক্তারবাবুর চোখে দিলাম। বাবা চোখ বুজে বাজিয়ে যাচ্ছেন। চোখে জল দেওয়া সত্ত্বেও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন আরো ভয় হল। আবার ঘরে গিয়ে জলের ঘড়াটা নিয়ে এসে, ধীরে ধীরে বাবাকে ডাকলাম। বরাবার এ যাবৎ দেখেছি, এক মনে বাবা যখনই কোন কাজ করেন, হঠাৎ ডাকলে বাবা ভয় পেয়ে অচমকা চমকে ওঠেন, বলে ওঠেন, কোন রে শুয়ার কে বচ্চে। এক মনে বাবা কাজ করলে বাবাকে গলার কাশির আওয়াজ বা গরমকালে পাখার বাতাস দিতাম। বাবার তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতজোড় করে ডাকার কারণটা বললাম। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এটা রপ্ত করেছি। এবার একটু জোরেই বাবা বলে উঠলাম। বাবা চমকে উঠে ডাক্তারবাবুকে শুয়ে থাকতে দেখা মাত্রই হাতজোড় করে বললাম, 'বাজনা শুনতে শুনতে ডাক্তরবাবু শুয়ে পড়েছেন।' ঘড়ার জল হাতে নিয়ে চোখে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, চোখ খুলে এবার তাকালেন ডাক্তারবাবু।

অবাক হয়ে তাকিয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই, বাবা বলে উঠলেন, 'শুয়ে থাকুন বাবা, শরীর কি ভাল নাই?' ডাক্তারবাবু এক দুই মিনিট পরেই, উঠে বসে খুব ধীরে বললেন, 'বাজনা শুনতে শুনতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।' সামনেই একটা কৃষ্ণের ফটো ছিল, চুরি করে মাখন খাচ্ছেন। ফটোটা দেখিয়ে ডাক্তারবাবু বলল, 'বাজনা শুনতে শুনতে আমার মনে হোল, কৃষ্ণ বেরিয়ে এসে আপনার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।' বাবা অবাক হয়ে শুনছেন। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে বাবা বললেন, 'আপনি তো ব্রহ্মজ্ঞানী, অত্যন্ত ভক্ত তাই দেখেছেন,

আপনি ধন্য, আপনি ধন্য। আমি কখনও এ দৃশ্য চোখের সামনে দেখিনি।' ধীরে ধীরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'কত বড় শক্তি আজ বুঝলাম।'

ডাক্তারবাবু এবং বাবার কথা শুনে আমার অবস্থা খারাপ। আগেই বলেছি আমার অকারণ হাসির কথা। ভাবলাম ডাক্তারবাবুর এ কি অদ্ভুত অভিনয়, নিজের গায়ে চিমটি কেটে হাসি কোনরকমে চাপলাম। এ সব আওয়াজে মা-ও চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। কারো মুখে কোন কথা নাই।

খাবারের ডাক পড়লো। খেতে বসে বাবা বললেন, 'ডাক্তারবাবু খুবই উঁচু জগতের লোক, নইলে কি কখনও এমনি হয়?' মা হঠাৎ বললেন, 'বেশী জর্দা হয়ত খেয়ে ফেলেছে, তাই মাথা ঘুরে শুয়ে পড়েছে। নখড়া। ভেক ধরেছে।' আমার মনের কথাই মা বলেছেন, শুনেই আমি জোরে হেসে ফেললাম, কোন রকমেই সে হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, 'মা ঠিকই বলেছেন।' বাবাও কয়েক মিনিট হেসে বললেন, 'আরে আরে কী বল তোমরা?' আমি অতি কষ্টে হাসি দমন করে চুপ করে রইলাম। মা আবার বললেন, 'দু'দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় অন্ন।' বাবা চুপ করে কিছু ভাবছিলেন। বললেন, 'আল্লা জানে কার মনে কী আছে।' কোনরকমে খাওয়া শেষ করেই বাইরে চলে গেলাম শুতে।

পরের দিন মা বললেন, 'তোমার বাবা লোক চিনতে পারে না, যারা ভেক ধরে তোমার বাবার কাছে, তারা প্রিয়, আর যারা প্রাণ দিয়ে সেবা করে তারা বকুনি খায়।'

মা'র কথা শুনে আমি হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পেলাম না।

২০

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যে, মহারাজ দিলীপের প্রশংসাসূচক কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে একটিতে লিখেছেন, তিনি প্রজাদের কাছ থেকে যে কর নেন তৎপরিবর্তে শতাধিক রূপে সেই রাশিকে জনকল্যাণে ব্যয় করেন। এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে একটা উপমার সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি, আদত্তে হি রসম্ রবি। অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর থেকে নিজ তেজে জলকে বাষ্প করে তুলে নেন নিজের পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য নয়, বর্ষারূপে শতগুণে ফেরৎ দেবার জন্য। বাবার জীবনটাও অনেকটা সেরকম। কারো কাছ থেকে এক পেলে দ্বিগুণ ফেরৎ দিতে চান। তা সে পুত্রই হোক, আর ছাত্রই হোক। এই বস্তু বিনিময়ে, যে বাবাকে দিতো, সেই থাকত লাভে। কারণ এরকম অকপটে কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষ বিরল। আসলে আমরা সব নিয়ে কৃতার্থ হতে চাই। কিন্তু বাবা দিয়েই কৃতার্থ হতে চাইতেন।

মৈহারে এসে এতদিনে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা হল এই যে, যে মুহূর্তে বাবার কোন কাজ, যা বাবার পক্ষে সম্ভব নয়, করেছি; সেই মুহূর্তে বাবা দিনরাত খুব শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু ইনকামট্যাক্সের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি, সাতনা গিয়ে চাল এনেছি, বাবার অবর্তমানে নাতিদের বিসিজি টিকে দিইয়েছি, তার জন্য পরের দিন আমার নতুন সরোদের গিলাফ অর্থাৎ খোল তিনি নিজের হাতে তৈরি করে দিলেন। যেহেতু মাসের শেষে ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে এলাহাবাদ রেডিওতে যাবেন, তার জন্য আমাকে রোজ শেখাতে লাগলেন।

ডি.এম.-এর অনুমতি এসে গেছে, ব্যাণ্ড নিয়ে বাবা এলাহাবাদে যেতে পারেন।

রেডিওতে এলাহাবাদে এই প্রথম প্রোগ্রাম, সুতরাং পঁচিশ মে-তে বাবা এলাহাবাদে যাবার জন্য একঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছলেন। বাবার মেজাজ ব্যাণ্ডের ছেলেরাও জানে, সকলেই স্টেশনে এসে গেছে। গাড়ী বরাবরই লেট থাকে। আজ গাড়ী তিন ঘণ্টা লেট। বাবা ঘন ঘন চুরুট খাচ্ছেন আর বলছেন, 'লকছন ভালো নয়।' কারো মুখে কোন কথা নাই। বাবা বললেন, 'এই ব্যাণ্ড নিয়ে রেডিওতে যাচ্ছি, গাড়ী তিন ঘণ্টা লেট, দেখ কি হয়? তোমাদের ভাগ্যে ভালোয় ভালোয় যদি ফিরে আসতে পারি।'

এলাহাবাদ থেকে অর্কেস্ট্রা শুনলাম। বাবা রেডিওতে বরাবরই অপ্রচলিত রাগ বাজান যার নাম আগে শুনিনি। এবার রেডিওতে তাঁর খাম্বাবতী কাম্বাড়া শুনলাম।

রমজান এসে গেল। রোজার এই একটা মাস কবে যে শেষ হবে তারই প্রতীক্ষায় থাকি। সকাল থেকে জল এবং তামাক না খেয়ে বাবার মেজাজ সপ্তমে থাকে। সন্ধ্যার সময় জল খাবার এবং তামাক খেয়ে এবার জোর করে শেখাতে লাগলেন।

আশিস আলাপ, জোড়, ঝালা পর্যন্ত বাবার সঙ্গে সুন্দর করে বাজিয়ে যেতো কিন্তু যে মুহূর্তে বাবা বলতেন, 'কী গৎ গতকাল শিখিয়েছিলাম বাজা!' আশিস মাথা নীচু করে চুপ। সে ভুলে গেছে, বাবার মেজাজের পারা চড়ে উঠে। এগারই জুন বাবা যে অমানুষিক মার তাকে মারলেন, বাধ্য হয়ে মা এবং আমি ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাত্রে বাবা কাঁদতে লাগলেন।

পরের দিনই আশিসের জ্বর এসে গেল। সকালে ওষুধ আনতে হাসপাতালে যেতেই দেখি হাসপাতালের সামনে লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কী? এরকম তো কখনও হয় না। লোকমুখে শুনলাম মৈহারের একটি লোক আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ের মধ্যে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাড়ার লোকে দরজা ভেঙ্গে আগুন নিভিয়ে লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সে সাধারণ লোক নয়। লোকেদের কথায় বুঝলাম, লোকটিকে মৈহারের প্রায় সকল লোকেই চেনে।

শুনতে পেলাম লোকটি বরাবরই সাধু প্রকৃতির ছিল। একবার এক সাধুবাবা, এই লোকটিকে মৈহারে সারদা দেবীর মন্দিরের লাগোয়া নির্জন পাহাড়ের একজায়গায়, পরের মঙ্গলার্থে একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে কোন ধাতু ছুঁলেই সোনা হয়ে যাবে। তবে নিজের বিলাসিতার জন্য যদি কখনও ধাতু ছুঁয়ে সোনা তৈরি করে, তাহলে এ মন্ত্র প্রভাবহীন হয়ে যাবে। সেই সাধুবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে লোকটি বহু গরীব এবং পরোপকারী লোককে ধাতু ছুঁয়ে সোনা করে দিয়েছে। এর প্রমাণ মৈহারের বহু লোকের কাছে আছে, যারা এখনও জীবিত। ইদানিং কিছুদিন হল, ওই লোকটির পক্ষে সংসার নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। লোকটির স্ত্রী বিড়ি বানিয়ে সংসার নির্বাহ করত। আর লোকটি রোজ নিজের পূজাপাঠ নিয়েই দিনরাত কাটাত। কিছুদিন হল, মৈহারের লোকেরা দেখতে পায় লোকটির বিরাট প্রাসাদ তৈরি হয়েছে এবং তার স্ত্রীও এখন আর বিড়ি বানায় না। উপস্থিত বিড়ির ব্যবসা করে। তার কাছে এখন অনেক কারিগর বিড়ি বাঁধে। কদিন হল লোকটি নাকি পাগলের মত হয়ে যায়। পাগল

হবার কারণ, মন্ত্রপূতঃ করে ধাতু ছুঁলে আর সোনা হচ্ছে না। আসলে, লোকটির স্ত্রী নিজের ছেলেমেয়েদের দারিদ্র্য দেখে স্বামীকে বলে, 'নিজের ঘরের ছেলে মেয়ে বৌ একবেলা কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন করে, সে দিকে খেয়াল নাই? বাসস্থানের ভাড়া বাড়ীর ছাতের জন্য বর্ষাকালে সকলে ভিজে কষ্ট পায়। সুতরাং ছেলেদের মুখ চেয়ে আমাদের জন্যও সোনা করে দাও।' স্ত্রীর কথা শুনে লোকটি বলে, 'অমার নিজের যদি কিছু করি তাহলে আমার শক্তি থাকবে না। এর ফলে কোন গরীব লোককে সাহায্য করতে পারব না।' স্ত্রী নাছোড়বান্দা। নিজের দারিদ্র্যের জন্য প্রতিদিন বলার পর লোকটি, স্ত্রীকে ধাতু ছুঁয়ে প্রচুর সোনা করে দেয়। তার ফলে স্ত্রী মৈহারে বিরাট প্রাসাদ বানায় এবং বিড়ির ব্যবসা শুরু করে। একদিন এই লোকটি একটা গরীব লোকের ধাতু ছুঁয়ে সোনা করতে গিয়ে বিফল হল। সেইদিন থেকে তার মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। স্বপ্নের মধ্যে সাধুবাবা বলছেন, 'তুই নিজের জন্য সোনা করেছিস, সুতরাং তোর গুণ আমি নিয়ে নিলাম।' কয়েকদিন পরেই ঘটেছে এই অঘটন।

লোকটি নিজের স্ত্রীকে বারংবার দোষারোপ করে বলেছে 'নিজের সংসারে স্বাচ্ছল্যের জন্য সোনা তৈরি করতে গিয়ে আমি সব কিছু হারালাম।' কয়েকদিন খাওয়া স্নান সব বন্ধ করে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে নিজের মনে বিড় বিড় করে কথা বলে কাটিয়েছে। আজ নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। যে আমাকে ঘটনাটি বলল, একটি মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওই হল লোকটির স্ত্রী। দেখলাম, সে নিজের বুক চাপড়াচ্ছে আর কাঁদছে। ঘটনাটা শুনে আমি তো অবাক!

যদিও অলৌকিক ঘটনার বহু বই পড়েছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ কখনও এ ধরনের ঘটনা চোখে পড়েনি। হাসপাতালে গেলাম। অপারেশন থিয়েটারের সামনে, হাসপাতালের লোক টুলে বসে আছে। কাউকে যেতে দিচ্ছে না। আমার লোকটিকে দেখার ইচ্ছা হল টুলে যে কর্মাচারীটি বসেছিল সে আমাকে জানে। সুতরাং সে আমাকে অপারেশন থিয়েটারে যেতে মানা করল না। জীবনে সেই প্রথম অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলাম। দেখলাম একটা লোক শুয়ে আছে, আর অস্পষ্ট স্বরে বলছে, 'আউর সোনা লেও, আউর সোনা লেও।' সারা শরীরে হলদে ঔষধ লাগানো হচ্ছে। শরীরের যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে, মনে হল কয়লার মতো কালো। কিছুক্ষণ আগেই লোকটিকে আনা হয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার ওষুধ লাগাচ্ছে। নার্স, কম্পাউণ্ডার এবং এসিস্ট্যান্ট ডাক্তার মুখে কাপড় দিয়ে একমনে নিজের কাজ করছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আমি লোকটির যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনছি। যেহেতু গল্পটি আগেই শুনেছি, সেই হেতু মনে হলো লোকটি নিজের স্ত্রীকেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করে বলছে, 'আউর সোনা লেও, আউর সোনা লেও।' হঠাৎ ডাক্তারের দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তিনি আমাকে বললেন, 'দাদা আপনি চলে যান, এ দৃশ্য দেখে আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।' তাঁকে বললাম, 'আমার জন্য ভয়ের কিছু নাই। আমার মনের জোর আছে।' কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারকে আমি বললাম, 'রাত্রে অতি অবশ্য একবার বাড়ী আসবেন।' ওষুধ নেওয়া হল না আশিসের জন্য।

বাড়ীতে এসে আশিসের জন্য ওষুধ না আনতে পারার কারণ বললাম। বাবা সব শুনে

বললেন, 'আরে আরে, সেই মহাত্মার এই পরিণাম হয়েছে।' বুঝলাম বাবা তাঁকে চেনেন। বাবার কাছেও, ওই লোকটি সম্বন্ধে এবং নিজের সম্বন্ধে, তাঁর জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা যা বললেন, শুনে অবাক হলাম। অন্য কেউ হলে হয়ত বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু বাবা কখনো মিথ্যা কথা বলবেন না। বাবা বললেন, 'এই লোকটি অনেককে এইরকম ধাতু ছুঁয়ে সোনা করে দিয়েছে। তার সম্বন্ধে বহু লোকের কাছে শুনেছিলাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পূর্বে মহারাজের সময়ে হাসপাতালে এক বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর যে সময়ে রাজারা গদিচ্যুত হল, সেই সময় হাসপাতালের ভার সরকার নিলেন। সেই বাঙ্গালী ডাক্তার ধন্বন্তরী ছিলেন। আমার বাড়ীতে কারো রোগ হলেই বাড়ীতে এসে দেখে যেতেন। রাজার রাজত্ব যাবার পর, সেই ডাক্তারের কাছে প্রথম শুনি সাধুটির কথা। ডাক্তার ওই সাধুর স্ত্রীকে একবার মরণাপন্ন অবস্থার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই জন্য সেই লোকটি ডাক্তারকে নিজের অলৌকিক শক্তির কথা বলে ডাক্তারের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার তো প্রথমে একথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু টাকার লোভ তো সকলেরই থাকে। পরীক্ষার জন্য দুইটি পিতলের ঘড়া দেখিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন সোনা করে দিতে। আধ্যাত্মিক লোকটি পিতলের দুটি ঘড়ায় মন্ত্র পড়ে, হাত দিতেই সোনায় পরিবর্তিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরই ডাক্তার চাকরি ছেড়ে কাটনিতে চলে যায়। সেখানে বিরাট বাড়ী বানিয়ে ডাক্তারি করতে থাকে।' বাবার কথায় বুঝলাম, ওই বাঙ্গালী ডাক্তার আমার মৈহার আসবার একবছর আগেই চলে গিয়েছেন। তিনি চলে যাবার পরই ডাক্তার গোবিন্দ সিং এসেছেন। বাবা বললেন, 'ডাক্তার সেই লোকটির কথা আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন। কিন্তু এইসব হারামের টাকা আমি চাই না। সেই লোকটি আমার কাছে এসে বলে, জীবনে অর্থের অভাব হবে না। সারাজীবন সঙ্গীতের সাধনা করুন। কিন্তু যে ঘড়াকে সোনা করে দেবে, সেই ঘড়াই যদি একদিন সাপে বদলে যায়! সেইজন্য হাতজোড় করে তাঁকে বলেছিলাম, আমার টাকার দরকার নাই। শুধু আমাকে আশীর্বাদ করুন।' বাবার কাছে এই গল্প শুনে আমার মনে হয়েছিল, নিজের মেহনতের টাকাই বাবার কাছে প্রিয় ছিল। যে ধাতু ছুঁলেই সোনা হয়, সে লোভ তিনি কত সহজেই সংবরণ করেছিলেন। বাবার এও এক বিরল চরিত্র। আজকের যুগে কেউ কী ভাবতে পারবে?

এই গল্পটি বলে বাবা নিজের জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা শোনালেন। রামপুরে যে সময় উজির খাঁর নিকট শিক্ষা করতেন সেই ঘটনাটি সেই সময়ের। বাবা শিক্ষাকালীন কত কষ্ট করে সব জায়গায় শিখেছেন সে কথা বাবার কাছে শুনেছি। শেখাবার সময় বাবা প্রায় বলতেন, 'কত কষ্ট করে এক একটি জিনিষ সংগ্রহ করেছি, অথচ কত না সহজে তোমরা পাচ্ছ। অথচ আমার কাছে যা খুদ কুঁড়ো আছে তা তোমরা শিখতে পারছ না।' কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার কথা তো কখনও বলেন নি, বাবা অবশ্য বাইরে থেকে এসে কোনো কথাই বলতেন না। কোনো লোকের কাছে আতিথ্য পেলে তার গুনগান শতমুখে করতেন, 'এমন সেবা জীবনে কেউ করেন নি।' কিন্তু, ওই মহাত্মার অলৌকিক শক্তির গল্প প্রসঙ্গে রামপুরের একটী ঘটনা শুনলাম। বাবা বললেন, 'রামপুরে সে সময় দিনের বেলায় উজির

খাঁর সেবা করতাম, রাত্রে সারা রাত বাজাতাম। ঘুম যাতে না আসে, সেইজন্য নিজের কোমরে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে, সামনে একটা কাঠের হুকের সঙ্গে দড়ির দিক বেঁধে রাখতাম। ঘুম এলেই দড়িতে টান পড়ত। সাবধান হয়ে যেতাম, আবার বাজাতাম। প্রতিপ্রহরের রাগ বাজিয়ে 'শুদ্ধ ভৈরবী' বাজিয়ে নমাজ পড়তাম। নমাজ পড়ার পর চা এবং আগের দিনের রাখা রুটি, নুন দিয়ে খেতাম।

একদিন শুদ্ধ 'ভৈরবী' বাজাচ্ছি, এমন সময় এক বিরাট লম্বা মোটা কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। কাবুলিওয়ালাকে দেখে ঘাবড়াই। জানি, কাবুলিওয়ালা ধার দেয় এবং সুদ নেয়। কিন্তু আমি তো কোন টাকা ধার করিনি, তবে কাবুলিওয়ালা কেন আমার কাছে? আমার ভাব দেখে কাবুলিওয়ালা বলল, 'রোজ তোমার বাজনা শুনি। ভালো লাগে। আমাকে একটু চা খাওয়াবে' জানিনা, খুদার বেশে কে আসে। সুতরাং চা তৈরী করলাম কাবুলিওয়ালা ঝোলার থেকে একটা কালো নারকোলের পাত্র বার করলো। এই রকম কালো পাত্র হিন্দু সাধুদের কাছে দেখেছি। সেই কালো নারকোলের পাত্রটা বার করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে পাত্রটি টিপে ধরলো আলাদিনের চিরাগের মতো, পাত্রটি সোনার মত রং হয়ে গেল। আমি তো ভয়ে অস্থির। এ কোন যাদুকরের খপ্পরে পড়লাম। কাবুলিওয়ালা আমাকে বলল, 'এটা বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসো, এটা সোনা। তুমি তো গরীব। তুমি নিজে খেতে পাওনা তো আমাকে কী খাওয়াবে? আমি একমাস তোমার কাছে থাকব এবং তোমার বাজনা শুনব। সপ্তাহে একটা রুটি খাব এবং রোজ কেবল চা খাব। একমাস থাকবার পর তোমাকে একটা জিনিস দেব। সেই জিনিষটা রাখলে সঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করবে।' এ কথা শুনে মনে হলো, আমার সঙ্গীতের সিদ্ধিলাভের দরকার নাই। দয়া করে বিদায় হলে বাঁচি। কিন্তু এ কথা বলতে সাহস হোল না। বললাম, 'আপনার আশীর্বাদে এক কাপ চা এবং সপ্তাহে একটা রুটি খাওয়াতে পারব।' কিন্তু আমার কথা শুনে সে বলল, 'তোমাকে যা বলছি তাই করো।' ভয়ে আর কিছু বলতে না পেরে বেরোলাম। ভয় হলো যদি পুলিশ আমার কাছে এত বড় সোনার পাত্র দেখে চোর ভাবে তাহলে তো বিপদ।

অনেক চিন্তা করে আমার এক বিশ্বস্ত লোকের কাছে গেলাম। সে লোকটি তবলা শিখত আমার কাছে। লোকটির নাম সুন্দরলাল। তাকে পাত্রটি দেখিয়ে বললাম, 'বল তো এটা কী?' সে অবাক হয়ে বলল, 'এই সোনার কমণ্ডলু কোথায় পেলেন?' সব কথা বললাম। অনেক টাকায় সে ওটি বিক্রী করে দিল। একতাড়া একশো টাকার নোট ওই কাবুলিওয়ালাকে দিলাম। কাবুলিওয়ালা একমাস রোজ সকালে চা, দুধ নিয়ে এসে আমাকে চা করে খেতে বলতেন, এবং নিজে খেতেন। একমাস পরে আমি যেখানে থাকতাম, তার কাছে একটা পুকুরে, সাতদিন শরীরটা জলের মধ্যে রেখে মুখটা খুলে থাকতেন। সাতদিন থাকার পর আমাকে একটা মাদুলি দিয়ে বলল, 'যে কোন শনিবার বা মঙ্গলবার আগরবাত্তি দিয়ে মাদুলিটা পুজো করে ধারণ করবে। কোনরকম ভয় পেলে তাবিজ ফেলে দিও না। এই মাদুলিটা একমাস পরলে তোমার সব দুঃখ চলে যাবে। এ ছাড়া যে কারণে এত কষ্ট করে বাজনা শিখতে এসেছো তাতে সিদ্ধি লাভ করবে এবং ধারণ করবার পর একথা কাউকে বলবে না।' কাবুলিওয়ালা চলে গেল।'

'আমার কাছে উভয় সমস্যা। একবার মনে হলো খুদার বেশে কেউ বুঝি আলাদীনের

প্রদীপ দিয়ে গেল। এর ফলে গুরুর কাছে শিক্ষা ভাল করে পাব এবং সঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করব। পরমুহূর্তে, মনে হলো কোনো বদলোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাকে মাদুলি দিলো না তো? হয়ত এতে আমার খারাপ হবে। দেশে থাকতে ছোট বেলায় অনেককে মাদুলি পরতে দেখেছি। বহু চিন্তা করে এক মঙ্গলবার সকালে স্নান করে মাদুলি ধারণ করলাম। সারারাত বাজাতাম অন্ধকারে । তেলের খরচা একমাস, সারারাত জ্বললে অনেক পয়সা লাগত। সেইজন্য ঘরে অন্ধকারে বাজাতাম।

'সে দিন মাদুলি পরে, রাত্রে বাজাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো একটা ভাল্লুকের মত, গায়ে বনমানুষের মত লোম। চোখ দুটো মনে হচ্ছে আগুনের মত জ্বলছে। মনে হলো স্বপ্ন দেখছি বুঝি। না এ তো স্বপ্ন নয়। আমার কোমরে দড়ি আছে। ঘুম এলেই দড়িতে টান পড়বে। ভয়ে আলো জ্বাললাম। আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কিছুই নাই। দরজাও বন্ধ, সুতরাং কোনো চোরও নয়। ভয় পেলাম। কাবুলিওয়ালা বলেছিলো, একমাস ধারণ করলেই সব মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। ভয় পেলেও মাদুলি ফেলে দিও না। সুতরাং আলো জ্বেলে বাজালাম। তারপর কিছু দেখতে পেলাম না। দ্বিতীয় দিন রাত্রে বাজাচ্ছি, আবার সেই দৃশ্য।'

'জোনাকি পোকা যেমন জ্বলে আর নিভে যায় সেই রকম গোলার মত চোখ দেখলাম। কাবুলিওয়ালা যে রুটি খেতেন সেই পরিমাণ, জলে গুলে যেরকম মোটা হতো, সেই রকম দুটো চোখই কেবল নয়, আজ দুটো মূর্তি দেখলাম। ভয়ে ভয়ে আলো জ্বাললাম, দেখি কিছু নাই। ক্রমাগত তিন দিনে তিনটি মূর্তি দেখলাম। এবারে আমার মনে ভয় হলো। এক মাস ধারণ করতে বলেছে কাবুলিওয়ালা। তাহলে একমাস যদি পূর্ণ হয়, তাহলে কি তিরিশটা এরকম বনমানুষের মতো ছায়া এবং ষাটটা আগুনের গোলা দেখব? তিন দিনের দিন আমার বাজনা মাথায় চড়ে গেছে। চতুর্থ দিনে ভয়ের চোটে বাড়ীর কাছে যে নদী ছিল তার মধ্যে ফেলে দিলাম মাদুলিটি। এতদিন কাউকে এ কথা বলিনি। নদীতে মাদুলি ফেলে দিয়ে, গুরুদেব উজির খাঁর নিকট কাবুলিওয়ালার একমাসের সব ঘটনা বললাম। গুরুদেব আমার কথা শুনে "হায় হায়" করে উঠলেন। বললেন, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে।' এই কথা বলেই গুরুদেব মহারাজকে বলে নদীর মধ্যে জাল ফেললেন। ডুবুরিকে বললেন, 'ডুবে যেমন করে পারুন মাদুলিটা খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু সেই মাদুলি পাওয়া গেল না।' বাবা একনাগাড়ে বলে গেলেন অলৌকিক গল্প।

আমার মনে হলো এ কোন আরব্য উপন্যাস শুনছি! অন্য কেউ এ কথা বললে আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ সকালে হাসপাতালে যা দেখে এলাম এবং বাবার মুখে শুনলাম, বাঙালী ডাক্তারকে সোনা করে দিয়েছিলো, তাহলে বাবার ওই গল্প, স্বপ্ন বলে কী উড়িয়ে দেব? মনে পড়ে গেল সেক্সপিয়রের সেই হ্যামলেট নাটকে যে আছে 'দেয়ার আর মোর থিংকস ইন হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ হোরেসিও দ্যান আর ড্রেম্‌ট্‌ অফ ইন ইওর ফিলসফি।' জীবনে কিছু কিছু আশ্চর্য ব্যাপার আজও ঘটে। সারাদিন এই দুটি ঘটনা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল।

ডাক্তার এসে সন্ধ্যের সময় আশিসকে দেখে বললেন, 'বোধহয় ম্যালেরিয়া, ভয়ের কিছু নেই। ঔষধ দিলেন। ডাক্তারবাবুর কাছে আত্মঘাতী লোকটির সব গল্প শুনলাম। বাবা

বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুর কাছে নিজের জীবনের শোনা ঘটনা এবং রামপুরের ঘটনা বললেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'লোকটি বিকালেই মারা গেছে। এত বেশি জ্বলে গিয়েছিল যে বাঁচানো সম্ভব হল না।' তিনি যাবার সময় বললেন, 'আমাদের ভারতবর্ষে এরকম অলৌকিক ঘটনা অনেক শোনা যায়।'

এদিকে আশিসের জ্বর কমছে না, দেখে বাবা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, আর বাজাবার সময় মারব না। তবে আর শেখাবও না, কেননা ভুলে গেলেই মারতে হবে।' বারবার বাবা আমার কাছে থারমোমিটার নিয়ে আসেন, আর জিজ্ঞেস করেন, জ্বর কমল কী না। বাবার এ ছেলেমানুষি দেখে হাসি পায়।

এক এক সময় মনে হয় আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তাই আজ বাবাকে বললাম, 'বাবা আমার দ্বারা এই কঠিন বিদ্যা হবে না। এখনও সময় আছে। কোনো একটা চাকরি পেয়ে যাব।' বাবা ঘাবড়িয়ে যান। বলেন, 'এখন তো অন্তত এটুকু বোঝ, আগে কী বাজাতে এবং এখন কী বাজাচ্ছ। এখন চলে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। এ এক দিনের কাজ নয়। মন প্রাণ দিয়ে বাজাও, নিশ্চয়ই হবে। তোমাকে কত কাজ করতে হয়। কী করবে, নিজের বাড়ী হলে সব কাজ করতেই হয়। সব কাজ করে বহু রাত অবধি বাজাও। সাধনা করলে ফল পাবেই।' এর পর আমার শিক্ষার সময় বাবা বকেন না। আজ বাবা বললেন, 'এখন তো আগের থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারো। এখন কয়েকটা সরগম এবং রাগ শেখাব। কিছু রাগ শেখো। রেডিও তো শোনো। শুনে শুনে অর্দ্ধেক শিক্ষা করে নিতে হবে। একমাস রোজ একটা রাগ শেখাব। রিয়াজ করবে তারপর আবার একটা রাগ নিয়ে শিখতে হবে।' বাবা এ-সময়ে একমাস দেওগিরি বিলাবল, দেশ, আলাইয়া বিলাবল, পুরিয়া ধানেশ্রী, কাফী কাম্বাড়া, কাফীর ফরমাইসি চক্রদার গৎ, খাম্বাজ, শুদ্ধ বসন্ত শেখালেন। সব রাগের ঢিমা, দুনী, গৎ, সরগম শিখিয়ে বললেন, 'বাবা, প্রেম জাগাও' এরপর রাগের ভাব বোঝালেন।

একমাস খুব শেখালেন। আমি ভুলতাম না বলে বাবা খুশী হতেন। অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার ফলেই এখন বাজাতে পারি। বাবা বললেন, অনেক রাগ শেখালাম, আবার এই সব রাগের প্রথম থেকে শেখাব। সারা জীবন বাজাতে হবে। এতদিন ইমন বাজিয়েছ বলে, এখন তাড়াতাড়ি শিখতে পারো। তবে এখন বহু শিখতে হবে। শ্রুতি, অতি কোমল, নানা তাল কত কিছু শিখতে হবে, এখন কল্পনাই করতে পারবে না। যত দিন যাবে ততই বুঝবে।'

তারিখটা ছিল ষোলই জুন। আজ বাবা এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে যাবেন। বাবা একটা ঝোলা টাঙ্গার একদিকে টাঙ্গিয়ে রেখে দিলেন। স্টেশনে গিয়ে দেখলাম টাঙ্গার চাকার সঙ্গে লেগে একটা দিক ছিঁড়ে গিয়েছে। বুঝলাম বাবার মেজাজ খারাপ হবে। বাবা দেখেই বললেন, 'এটা খুব খারাপ লক্ষণ। দেখো তোমাদের ভাগ্যে যদি ফিরতে পারি।' বাবার কুসংস্কার ছিল ষোল আনা। বাবাকে বোঝালেও সেই এক কথা বারবার বলবেন।

বাবার এলাহাবাদ যাবার পরই সাতনা থেকে চিঠি এল। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল

করতে হবে। এর জন্য চিন্তা নেই, সব তৈরী রেখেছি। এলাহাবাদ থেকে বাবার আসবার তিন দিন পর, বাবাকে নিয়ে যেতে হবে। পরের দিন দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে বুঝলাম কোলকাতা থেকে মেকানিক নিয়ে আসছেন কুঁয়োতে পাইপ লাগাবার জন্য। আন্দাজ করলাম, যে ট্রেনে বাবা আসবেন সেই ট্রেনেই দক্ষিণারঞ্জনও আসছেন। কোলকাতা থেকে এলাহাবাদ নেমে মৈহারের ট্রেন যখন ধরবেন নিশ্চয়ই স্টেশনে দেখা হয়ে যাবে, হলোও তাই।

যথারীতি পাঁচদিন পর স্টেশনে গিয়ে দেখি বাবার সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনও আছেন। স্টেশনে আমাকে দেখেই বাবা বললেন, 'আমার বড় ছেলে এসেছে। এর থাকবার জন্য উপরে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' উত্তরে বললাম, 'চিঠি পেয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।' বাবা খুশী হলেন। সঙ্গে যে মেকানিক এসেছে তার শোবার ব্যবস্থা বাড়ীর বাইরের লনের উপর করে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে বাবাকে নিয়ে সাতনাতে গেলাম ইন্‌কম ট্যাক্সের অফিসারের কাছে। অফিসার বাবাকে দেখে নমস্কার করে বললেন এই বাহানায় আপনার মত উস্তাদের দর্শন হল। উত্তরে বাবা বললেন, 'আপনারা কত বড় অফিসার! লোকে বৃথাই আমাকে উস্তাদ বলে, আমি হলাম দাসানুদাস।' বাবা যেভাবে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলেন সে কথা শুনে সকলেই লজ্জিত হয়। ইন্‌কাম ট্যাক্সের কাগজপত্র দেখে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। অফিসার বাবা এবং আমাকে চা খাওয়ালেন। বাবা নিজের কেস থেকে একটা মোটা চুরুট অফিসারকে দিলেন এবং নিজেও একটা ধরালেন। আমার পরিচয় যেভাবে বলেন সকলকে, তা আগেই বলা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকও একটু অবাক হলেন, লেখাপড়া শিখেও বাজনা শিখছি বলে। কথাটা তিনি বলেই ফেললেন যে এরকম দেখেন নি কখনও। যাই হোক বাবার কোন ট্যাক্স দিতে হবে না জেনে বাবা খুশী হলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এলাম।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবার মেজাজ খুব ভাল। আমাকে এদিন 'দেশমল্লার' শেখালেন। বললেন শেখো তবে কাম্বাড়া অঙ্গে শ্রুতির কাজ অনেক দেরীতে রপ্ত হবে। শুনে শুনে তবেই হবে।' আসলে এটা বরাবর দেখেছি যে মুহূর্তে কোন একটি কঠিন কাজ করেছি সেই ক্ষণে বাবা খুব ভাল মেজাজে শিখিয়ে প্রতিদান ভেবে আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হন।

পরের দিন রাত্রে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে সাতনা গেলাম, পাইপ লাগাবার যাবতীয় জিনিষপত্র কিনবার জন্য। সাতনাতে যাবার পথে দক্ষিণারঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবার সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?' উত্তরে দক্ষিণাবাবু বললেন, 'দুই বছর আগে বাবার সঙ্গে পরিচয়। আসলে আমার ভগ্নী প্রতিমা রায় চৌধুরী সেতার শিখত জ্যোতিষ ভট্টাচার্য বলে এক ভদ্রলোকের কাছে। সেই ভদ্রলোক এনায়েৎ খাঁ সাহেবের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কাছে গিয়ে নোটেশন শিখতেন। প্রথম শিক্ষা জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের কাছে হলেও, জ্যোতিষ ভট্টাচার্যই আমার বোন প্রতিমাকে নিয়ে বাবার কাছে যান। সঙ্গে আমিও ছিলাম। জ্যোতিষ ভট্টাচার্যকে বাবা খুব ভালবাসতেন। প্রতিমার বাজনা শুনে বাবা রাজী হলেন শেখাবার জন্য। ১৯৪৯ সনে

বাবাকে প্রার্থনা জানাই আমাদের বাড়ীতে থাকবার জন্য, কিন্তু বাবা তানসেন কনফারেন্সে বাজাতে গিয়ে কনফারেন্সের সেক্রেটারি শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই ওঠেন। খাবার জন্য অনুরোধ করলাম। বাবা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খাবার পর বলেছিলেন পরেরবার কোলকাতা এলে আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন। ১৯৫০ সনে তানসেনে যখন বাজাতে গিয়েছিলেন তখন আমাদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। আমার মায়ের সাত্ত্বিক বিচার দেখে বাবা বলেছিলেন, এরপর থেকে কোলকাতায় গেলে আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন। আমার বোন প্রতিমাকে বাবা মেয়ের মতো এবং আমাকে বড় ছেলের মত দেখেন।' মনে মনে ভাবি বাবার এরকম কতো ধর্ম ছেলে, মা এবং মেয়ে আছে? সহজ সরল মানুষ দক্ষিণারঞ্জনকে খুব ভাল লাগল। সব জিনিস কিনে রাত্রে মৈহারে ফিরলাম।

দক্ষিণারঞ্জনকে দেখে মনে হলো দক্ষ কারিগর। আটদিনের মাথায়, বাড়ীর ভিতর এবং শৌচাগারে, এবং বাইরে আমার স্নানের জন্যও, কল লেগে গেল। বাবা ছোট ছেলের মতন আনন্দে দক্ষিণারঞ্জনকে বললেন, 'তোমায় কত কষ্ট দিলাম?' বুঝলাম বাবার বিনয়ের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন পরিচিত আছেন।

রাত্রে বাবা দক্ষিণারঞ্জনকে বললেন, 'বহুদিন থেকে ইচ্ছা ছিল তোমার মায়ের জন্য একটা বড় ঘর করে দেব। নাতিরাও বড় হচ্ছে। একটি ঘরেই নাতিদের নিয়ে শোয়। উপরে যদিও ঘর আছে, কিন্তু তোমার মা বুড়া হয়েছে। উপর নীচ করতে পারে না। তাছাড়া, সে ঘরে অন্নপূর্ণা, আলি আকবর, রবু বা তোমার মত ছেলে এলে থাকে। কুয়োর থেকে জল টেনে বাড়ী করতে গেলে, জল টানতে টানতে কারিগর সময় কাটিয়ে দেবে। এখন তো আর জলের কষ্ট নাই তোমার কৃপাতে। তাই ভাবছি নিচের তলায় (বাবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত, একটি বড় এবং ছোট ঘর করব। এই ঘরটিতে তোমার মা থাকবে। এছাড়া উপরতলার দুটো ঘরের উল্টোদিকে যে ঘরে মা শোয় তার উপরে একতলা বানিয়ে তিনটে ঘর তৈরী করব। নক্সা করাই আছে। এই বুড়া বয়সে ওই একটা ছোট ঘরে তোমার মা নাতিদের নিয়ে কষ্ট পায় সুতরাং কাল থেকেই এর কাজ শুরু করব। জানি না কদিন আছি, আলি আকবর তো আসে না, তার এসব খেয়াল নেই। আলি আকবরের যে কাজ করা উচিত ছিল, সে কাজ তুমি কোলকাতা থেকে এসে করে দিলে। খুদা তোমার মঙ্গল করুক।' বাবা একনাগাড়ে এ সব কথা বলে দক্ষিণারঞ্জনকে বলেছিলেন, 'তোমার কী মনে হয়, করা উচিৎ কী না? তিনি বললেন, 'নিশ্চয় করুন। আপনার আত্মীয় স্বজন সকলে যদি একসঙ্গে আসে এবং কিছু অতিথি আসে তাহলে তারা কোথায় থাকবে?'

পরের দিন সকালেই দক্ষিণারঞ্জন কারিগরদের নিয়ে সাতনা চলে গেলেন। অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আজ শুক্রবার, সুতরাং বাজনা বাজাতে হবে না। ছুটির দিন। এই শুক্রবারের জন্য বৃহস্পতিবার রাত্রে যে আনন্দ উপভোগ করতাম, আজও স্মৃতির মণিকোঠায় তা জ্বলজ্বল করে। আসলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে রোজ দিন রাত চলে। ব্যতিক্রম হয় একদিন শুক্রবার। এদিন দেরী করে ঘুম থেকে উঠব। আশিস শুক্রবার নাস্তার একটু আগে আমাকে উঠিয়ে দিতো। বাবারও সে দিন ঘড়ির কাঁটার মত দিন চলে না। ব্যাণ্ডে শেখাতে যান না।

ব্যাণ্ডের একদিন ছুটি। আমাদের শিক্ষা দেন না। কিন্তু বাবা সারাটি দিন বাড়ীতে থাকলেও, একমাত্র বাজার যাওয়া ছাড়া সর্বদাই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে সময় কাটাতেন। সকলে যখন ঘুমিয়ে থাকে, বাবা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু আমি দেরী করে উঠে মুখ ধুতে যাওয়ার সময় বারান্দায় বাবার সম্মুখীন হতাম। আমাকে দেখেই বলতেন, 'আজ এত দেরী করে উঠেছ কেন? আজ কী শুক্রবার?' উত্তরটা হ্যাঁ শুনে, হেসে বলতেন, 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসো, নাস্তার আর দেরী নেই।' প্রতি শুক্রবারই এর ব্যতিক্রম কখনও হয়নি। শুক্রবার রাত্রে মন খারাপ হয়ে যেত কেননা পরের দিন থেকে আবার ঘড়ির কাঁটার মত চলতে হতো। ছুটির যে কী আনন্দ দীর্ঘ সাত বছর যা পেয়েছি, ভুলবার নয়।

এই ছুটির দিন বাবা আমার সঙ্গে সাংসারিক এবং নানাবিধ বিষয় আলোচনা করতেন। আজ বাবা নিজের জীবনে কত কষ্ট করে শিক্ষা করেছেন তা সবিস্তারে বললেন। বুঝলাম, যাতে আমি নিরাশ হয়ে মৈহার ছেড়ে চলে না যাই। পরিশেষে বাবা বললেন, 'নারীর প্রলোভন সঙ্গীতে বড় বাধা। এখন তো মৈহারে আছো তাই বুঝতে পারছ না, কিন্তু যখন মৈহার থেকে বাইরে গিয়ে বাজাবে তখন বুঝবে। এই কথা বলে বাবার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষাকালীন সময়ে, এবং শিক্ষার পর যা বললেন, শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। কাহিনীটি বলে আমাকে কসম অর্থাৎ দিব্যি দিয়ে বললেন, 'কাউকে বোলো না।'

আমাকে এই কাহিনী বলার কারণ যাতে আমি সাবধানে থাকি। এ কথা বলেই বললেন, 'আগেও যথেষ্ট ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। নারী এবং সুরা থেকে একশো মাইল দূরে থাকবে, তবেই সঙ্গীতের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে। বাবার কথা শুনে মনে হোল, এত সংযমী পুরুষ কী সম্ভব? যে রমনীর প্রস্তাব বাবা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা কি সম্ভব, বাবার মত এক দরিদ্র শিক্ষার্থীর পক্ষে? যে সময়ে বাবা কোনো রকমে খিচুড়ি খেয়ে দিন কাটান, সেই সময়ে যে রমনীর প্রস্তাব বাবা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অন্যের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হত না। বাবা যদি সেই প্রস্তাবে রাজী হতেন, তাহলে সেই শিক্ষাকালীন সময়ে কয়েক লাখ টাকার মালিক হতেন, যার মূল্য কোটি টাকার সমান ছিল যে দিন গল্পটা শুনেছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, যে হেতু বাবা বরাবরই ধর্মভীরু সেইজন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। এক ভিখারী যদি এক লাখ টাকার লটারি পায়, তার মনের অবস্থা কী হবে? কিন্তু বাবার মনের বিকারকে নিজেই সংযত করেছিলেন সেদিন, এ ঠিক পরমহংসদেবের গল্পেই পড়েছি। অপ্সরীর আহ্বানে তাকে মা বলে সম্বোধন করা কী যৌবনে সম্ভব? আমার চোখে বাবা তন্মুহূর্তেই পরমপুরুষ হয়ে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

২১

একটা জিনিষ বরাবরই মৈহারে গিয়ে দেখেছি, বাবা সকালে প্রায়ই মাংস কিনে আনতেন, সঙ্গে চারটি টেংরী আনতেন চার নাতির জন্য। এখন শুভ নেই, সুতরাং মাংস আনলে তিনটে টেংরী আনতেন। নাতিদের জ্বরটা ঠিক পালাক্রমে হতো একথা আগেই বলেছি। কোনো নাতির জ্বর হলেই অন্তরে বাবা ভীষণ ঘাবড়ে যেতেন, কিন্তু বাইরে এই কথাটি নিশ্চই বলবেন, 'আরে শুয়ার কে বচ্চে, এই বুড়া বয়সে মাংস আর মাংসের টেংরি কিনে নিয়ে

আসি। অসুরের খাবার টেংরী খেয়েও শরীর খারাপ হয়? শরীর জোরালো হলে মন ও বুদ্ধিও জোরালো হবে। এ কথা ভেবেই টেংরী নিয়ে আসি। টেংরী খেলে গায়ে অসুরের মত জোর হবে অথচ হাত দিয়ে ওজনে ডিরি বেরোয় না। আমি ভাবি এই টেংরী খেয়ে রিয়াজ করতে পারবে অথচ দেখি তখনই জ্বর লেগেই আছে। আসলে যাতে বাজাতে না হয় তার জন্য জ্বর হয়েছে বলে শুয়ে আছস?' এতবার একথা শুনেছি যে মনে গেঁথে আছে।

কয়েকটা কথা যেমন 'শুয়ার কে বচ্চে', 'কামচোর', 'নখড়া', 'সরফরাজী', 'এইসা না, এইসা না' 'আমি কারো বাড়ী পেসাবও করতে যাই না, কিন্তু আমার এখানে লোকে কেন আসে,' এসব প্রায় রোজই কারো না কারো প্রতি প্রয়োগ হতো। আজ এই বৃষ্টির দিনে আশিসের জ্বর। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্ষিত হতে লাগল। যেমন জোর বৃষ্টি তেমন হাওয়া চলছে। এর মধ্যে যাওয়াও কঠিন। এ সত্ত্বেও ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ এবং পোষ্ট অফিস থেকে চিঠি নিয়ে এলাম। বাবা মৃদু বকলেন। এত হাওয়া বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার কী দরকার ছিল? দিন রাত কেবল ভরে (অর্থাৎ খুব খায়) জ্বর হবে না? অসুখে ভুগবে না? তুমি কি এখানে এইসব করতে এসেছ? এসব কথাও আমার কাছে ডালভাত হয়ে গেছে। মনে মনে বুঝেছি বাবা ওষুধ আনাতে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বুঝলাম, আজ রাত্রে ভাল শিক্ষা হবে। বাজাবার সময় বকুনি খাব না, হলও ঠিক তাই। রাত্রে 'দেশমল্লার' শেখালেন। পরের পর কয়েকদিন বাবা যথেষ্ট শেখালেন। বৃষ্টি হচ্ছে বলে এই প্রথম 'মিয়াঁ কি মল্লার' শেখালেন। এই যে শুরু হল, বসন্ত পঞ্চমীর দিন শুদ্ধ বসন্ত এবং বর্ষা পড়লেই 'মিয়া কি মল্লার', 'দেশ মল্লার' দিয়েই শুরু হবে। মৈহারে যতদিন ছিলাম এর ব্যতিক্রম হয় নি। যত দিন গেছে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মল্লারের সংখ্যা বেড়েছে। বর্ষা কালে মল্লার ছাড়া আর কোন রাগ বাবা শেখাতেন না।

বাইরের কোন পরিচিত লোক এলে আমার ঘরেই তার ঠাঁই হতো। আমার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় খাবার আমাকে দিতে হতো। একবেলা থাকবে, ঠিক আছে। একদিন থাকলেও, চলতে পারে। দুইদিন থাকলে, ঝড়ের ইঙ্গিত। তৃতীয় দিনে বিরাট ঝড় আর চতুর্থ দিনে হবে প্রলয়। অবশ্য তার কারণও আছে। যে মানুষ চুপচাপ থাকতে ভালোবাসেন অথচ অতিথি ভগবান বলে এ বৃদ্ধ বয়সে আতিথ্য দেখাতে হবে। বাইরে বাবার ক্রোধের কোনো চিহ্ন থাকবে না অথচ আমাকে দেখলেই বলবেন, 'ভেদ লাগাও' (অর্থাৎ কথাবার্তা বলে বোঝো কেন এসেছে আর কবে যাবে)। লোক দেখলে ত্রস্ত হই, তোমাদের শিক্ষার বাধা হবে সুতরাং ভেদ লাগাও। আমার তো হাসির রোগ। কখনও হেসে ফেলি বাবার দুটি রূপ দেখে, যার জন্যে বকুনিও খাই। এই বৃষ্টির মধ্যেও লক্ষ্ণৌ থেকে একটি ছেলে এসেছে। ছেলেটি সরোদ বাজায় রেডিওতে। বাবাকে খুব শ্রদ্ধাও করে। বাবা লক্ষ্ণৌ গেলে বাবার কাছে শেখে। ছেলেটির নাম রসিক বিহারীলাল। বাবা ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, আমার ঘরে ব্যবস্থা করতে।

ছেলেটির বাজনা লক্ষ্ণৌ রেডিওতে শুনেছি। ছেলেটি ছিল স্টাফ আর্টিস্ট। বাবা লক্ষ্ণৌ গেলে তানপুরা ছাড়ত। ছেলেটি বাবাকে বলল, সারদা দেবীর দর্শন করতে এসেছে। এ কথা শুনে বাবা খুশীই হলেন। ছেলেটি বাবার কাছে রাত্রে শিখল। রাত্রে বাবাকে যখন ম্যাসেজ

করতে গেলাম, বললেন, 'ভেদ লাগাও কবে যাবে।' পরের দিনই ছেলেটি চলে গেল। একদিন বাবা যথেষ্ট আপ্যায়ন এবং গল্প করলেন। কিন্তু চলে যাবার পরে বললেন, 'এইসব মুফৎ খোরদের নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম।' রাত্রে বাবা আমায় দেশমল্লার শেখালেন।

বাড়ীতে মজুর লেগেছে। তিনমাস লাগল উপর তলার ঘর এবং নীচের তলার দুটো ঘর করতে। বাড়ীর চেহারা পাল্টে গেছে।

বাবা বলতেন, মজুরদের সঙ্গে নিজেকেও মজুর হতে হবে, তবে তাড়াতাড়ি কাজ হবে, নইলে চুপটি করে বিড়ি খাবে, লোক দেখানো কাজ করে চলে যাবে।

একদিন বাবার ঘরের সামনের বালব ফিউজ হয়ে গিয়েছে। বাবাকে বললাম। বাবা বললেন, কী বললে? বাল্‌বটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। বাবা চটে উঠলেন, বললেন, আরে ইংরেজের বাচ্চে। বাঙ্গলা ডুম বলতে পারো না? আমি তো বাবার মেজাজ জানি, চুপ করে রইলাম। বাবা টাকা দিলেন, বাল্‌ব কিনে লাগিয়ে দিলাম।

বাড়ী তৈরী হচ্ছে, জানলা, দরজা, কড়ির জন্য কাঠ কিনতে হবে। কাঠের মিস্ত্রি টিম্বার মার্চেন্টকে ডেকে আনলেন। টিম্বার মার্চেন্ট সব মাপ নিয়ে বলল, কাঠ পাঠিয়ে দেবে তবে কিছু আগ্রিম হলে ভালো হয়। সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মাথা গরম, অগ্রিম কেন? কাঠ এনে পৌঁছে দিয়ে যাও, নগদ টাকা নাও। সেও বোধহয় বাবার মেজাজ জানে, বলল ঠিক আছে। ধীরে-ধীরে বাড়ী তৈরী হল। চুনকাম হয়ে গেল। পেন্ট কেবল বাকী। এ কাজ কেবল একটি মজুরই করবে। বাবা বিরাট একটা ড্রাম নিয়ে এলেন। রং নিয়ে এলেন। ড্রাম বাবা খুললেন, আমার কাছে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। বাবা দক্ষ কারিগরের মত ড্রাম থেকে সাদা জিনিষ বার করে একটা বালতিতে রাখলেন রং মেলালেন। নূতন বুরুশ নিয়ে কারিগরকে দিলেন। বললেন, 'প্রথমে কড়ি খুব ভাল করে রং করো উপর এবং নীচের পাঁচটা ঘরে।' মজুর রং করতে চলে গেল। বাবা আবার রং করতে লেগে গেলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখছি। বাবা বুঝলেন আমার অবস্থাটা। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা হলাম চাষাড়ি, চাষের কাজও জানি আবার কুলি কাবাড়িরও কাজ জানি। তোমরা হলে শহরের ছেলে। কেবল লেখাপড়া করেছ। শহরে তৈরী রং পাওয়া যায়। তার দাম অনেক বেশী। অথচ নিজে রং তৈরী করলে তার দাম অনেক কম।'

দুটো হাতেই রং লেগে আছে বলে, মুখে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে কাঠি জ্বালিয়ে দিলাম। বাবা খুশী হলেন। কিন্তু হেসে বললেন, 'কি বাবা বেঁচে থাকতেই মুখে আগুন দিচ্ছ? মরে গেলে তো জানি ছেলে মুখে আগুন দেয়।' বাবার এ কথায় আমি হতভম্ব। কথাটা তো বাবা ঠিকই বলেছেন। আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম, 'দুই হাতে আপনার রং লেগে আছে।' বাবা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তুমি ঠিকই করেছা। তোমার সঙ্গে একটু দিল্‌লগি করলাম।' বুঝলাম বাবার মেজাজ খুব ভাল আছে, এ না হলে আমার সঙ্গে কখনও পরিহাস করতেন না। দুপুরের নিয়ম মত চান করে খাওয়া হলো। মিস্ত্রিরাও, দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসে। তাদের জন্যও এক ঘণ্টার বিশ্রাম, খাওয়ার। খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক আড়াইটের সময় বাজাতে হবে।

কিছু আগে আশিস আমায় উঠিয়ে দিয়ে বলল, 'রং এর মজুর আসেনি, দাদু রং লাগাচ্ছে।' আমি তো অবাক! দুপুরের পর একটা থেকে পাঁচাট অবধি ওদেরই রং লাগাবার কথা, অথচ বাবা রঙ লাগাবেন কেন? সোজা ওপরে উঠে গেলাম। দেখলাম একটা চৌঘরির ওপর চড়ে বাবা কড়ি কাঠে বুরুশ দিয়ে রঙ লাগাচ্ছেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মজুর কোথায় গেল।?' বাবা বললেন, 'মজুরটা কামচোর। পয়সা বাড়ানোর ধান্ধা। খাবার খেয়ে, কাজ করছে কিনা দেখতে এসে দেখলাম মজুরটা নাই, বুঝলাম পালিয়েছে। বাবাকে বললাম, 'আপনি নেমে পড়ুন। বড়ই বিপজ্জনক কাজ করছেন, যে কোন সময়ে পড়ে যেতে পারেন। আমি এখনই কোন রঙের মিস্ত্রি ডেকে আনছি।' বাবা বললেন, 'এখন কোথায় মিস্ত্রি পাবে? মিস্ত্রিরা তো কাজে কোথাও লেগে আছে। কালকে দেখো। আজ এই রংটা আমিই লাগিয়ে দিই নতুবা রংটা খারাপ হয়ে যাবে।' কথাটা ঠিকই বলেছেন বাবা। মিস্ত্রি আজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু কড়িকাঠ রং করতে বাবা যে ভাবে বুরুশ চালাচ্ছেন, যে কোন সময়ে পড়ে যেতে পারেন। বাবাকে বললাম, 'আপনি নেমে আসুন, আমি করে দিচ্ছি।' বাবা বললেন, 'জীবনে কখনও এসব কাজ করেছো?' উত্তরে বললাম, 'আমাকে বুঝিয়ে দিন কিভাবে করতে হয়। বুঝিয়ে দিলে আমি পারব।' বাবা আমার এ কথা শুনে বোঝালেন বুরুশ চালাবার নিয়ম।

বাবা বললেন, 'এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না। এক ঘণ্টার ওপর রঙ লাগিয়েছি, একটু বিশ্রাম করে তারপর আবার করব।' মনে মনে বুঝলাম এ কী কঠিন পরীক্ষা আমার জীবনে এলো। করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ। করলে বাহবা। বাবা বলবেন, ঠিক হলো না, সর্বনাশ করে দিলে। আর যদি না করি, তাহলে বাবার মেজাজ খারাপ হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে বাবা করতে পারেন, আর আমি করতে পারি না? কড়ি কাঠের সিকিভাগ রঙ হয়েছে।

নীচের থেকে বাবাকে চুরুট নিয়ে এসে দিলাম। তার পর প্রায় জোর করে চৌঘড়িয়ার উপর চড়ে রং লাগালাম। বাবা চুরুট খেতে খেতে আবার বোঝালেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'ঠিক ঠিক, আরে আরে এ তো বেশ ভালই করতে পারছ। ঠিক আছে, একটু করে নেমে এসে বাজাতে যাও, তারপর আমি করব।' আমার নিজেরই ভয় লাগছে পড়ে যাবো কিনা। অথচ বাবা কোন সাহসে করবেন। আসলে কোন কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাবা নিশ্চিন্ত হন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, এও এক কলা। এর মধ্যেও বাজনার 'ডা' এবং 'রা' লাগে। হাতে রীতিমত জোর লাগে। তা সত্ত্বেও বাবাকে কোন মতেই এ কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। এই বয়সে যদি পড়ে যান তাহলে বিপদ। বাবা কিছুক্ষণ আমার কাজ দেখে আবার বললেন, 'ঠিক, ঠিক হচ্ছে।' বাবাকে বললাম, 'আপনি নীচে যান, আমি সব করে দেব।' বাবা নমাজ পড়তে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই চা খাবার জন্য আশিস ডাকল। নীচে গেলাম চা খেতে। বাবা আমাকে বললেন, 'আর তোমাকে করতে হবে না, এবার গিয়ে বাজাও, এখন আমিই করব। উত্তরে বললাম, 'এ কাজ এই বৃদ্ধ বয়সে করা উচিত নয়। আমিই করব।' চা খেয়ে উপরে গেলাম। বিকেল পাঁচটা অবধি বুরুশ দিয়ে রঙ লাগাতে গিয়ে মনে হলো ডান হাতটা টনটন করছে।

সন্ধ্যা বেলায় বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যন্ত্র নিয়ে এসো।' বুঝলাম আজ বিকেল পর্যন্ত রঙ লাগিয়েছি বলে বাবা নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। বাবা শেখালেন 'তিলক কামোদ।' আলাপ থেকে বিলম্বিত এবং মধ্য লয়ের গৎ শিখিয়ে ছুটি দিলেন। একটুও বকলেন না। কেবল একটি কথাই বলেন, 'ভাব পৈদা কর।'

পরের দিন রঙ লাগাবার মজুর এলো না। বাবা বললেন, 'দেখলে তো? মজুরটা ভেগেছে, ভাবছে তাকে পা ধরে ডেকে আনব, আসলে দর বাড়াচ্ছে, যাতে আট আনা বাড়িয়ে দিই। কাউর দরকার নাই। আমি সব করতে পারি। এসব বেইমান মজুরের দরকার নাই।' বাবার এও এক পরীক্ষা। বললাম, 'আমি অন্য লোক ঠিক করে নিয়ে আসব।' বাবা বললেন, 'কোনো মজুরের দরকার নাই। তুমি বাজাতে যাও, আমি নিজে রং লাগাবো আট ঘণ্টা, যেমন ওরা করে সকাল আটটা থেকে বারোটা এবং একটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।' বাবার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। বুঝলাম বাবা মজুর রাখবেন না। সুতরাং আমার সম্পূর্ণ দুটি মাস লাগল উপর এবং নীচের দরজা, জানলা এবং কড়ির রং লাগাতে। এই দুই মাস রাত্রে বাবা আমাকে নিয়মিত যে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলি অমূল্য সম্পদ।

আজকাল আশিস আর আমাকে আলাদা শেখান। কখনও একসঙ্গেও শেখান। বাবা যেমন 'ধুলিয়া মল্লার' শেখালেন দুজনকেই। প্রথমদিনেই আলাপ থেকে নিয়ে একটা মসীদখানি এবং একটু দ্রুত গৎ শিখিয়ে ছেড়ে দিলেন। পরের দিন আশিস 'ধুলিয়া মল্লার' শেখার সময়, বাবার সঙ্গে আলাপ, জোড়, ঠৌক ঝালা সব ঠিক বাজিয়ে গেল। এরপরেই বাবা নিজের বাজনা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'কাল যে বিলম্বিত গৎ শিখিয়েছিলাম বাজাও তো।' আমি যে মুহূর্তে বাজাতে যাব, বাবা বললেন, 'তুমি বাজিও না।' আশিসকে বললেন, 'তুই বাজা।' শুনে আশিসের মাথা নীচু। বাবার সেই এক কথা, 'কিরে ভুলে গেছস?' আশিস তবু চুপ। বাবা তখন আমাকে বললেন বাজাতে। আমি বাজাবার পরই কটমট করে আশিসের দিকে চেয়ে বললেন বাজাতে। আমার বাজনা শুনে আশিস সঙ্গে সঙ্গে বাজালো। তারপর বাবা বললেন, 'দুনী গৎ কি শিখিয়েছিলাম?' এবারও আশীসের মাথা নীচু। বাবা তখন আমাকে বাজাতে বললেন। আমার বাজানোর পরই আশিস বাজাতে পারত। আমার সঙ্গে বসলে এই অবস্থায় বকুনি খেত। কিন্তু যখন একলা শিখত, সেই সময়ে গৎ ভুলে যেত, সে সময় বাবার রুদ্র মূর্তি এবং অমানুষিক মার কেউ কল্পনা করতে পারবে না। কখনও আমি এবং মা গিয়ে ক্রোধ সংবরণ করতে বলেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। পরমুহূর্তে বাবার ঘরে বসে কাঁদা এবং নিজের মনে বলা, 'ওই শুয়ার কি বচ্চের কী হয়েছে। এখন ঘুমোচ্ছে। সব মারগুলো আমারই লেগেছে।'

দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যের দেখা নেই। হঠাৎ মা এক দিন পিছলে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে মার মুখ দিয়ে কেবল একটু আওয়াজ বেরুল, 'হায় আল্লা।' তৎক্ষণাৎ বাবা বললেন, 'নখড়া'। সঙ্গে সঙ্গে মা উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন। আমরা তখন খাচ্ছি। মা খাবার দিয়ে রান্না ঘরে যাবার সময় এই বিপত্তি। খাবার পর বাবার তামাক মা দিয়ে আসেন। মার কাছে গিয়ে বললাম, 'খুব লেগেছে?' 'হ্যাঁ, বড্ডো ব্যথা করছে।' মা বললেন, 'শুনলে তোমার

বাবার কথা। আমার পড়ে যাওয়াটা যেন ইচ্ছে করে করেছি, ওনার সহানুভূতি পাব বলে। হায় আল্লা, তোমার বাবা কিনা বললো নখড়া।' উত্তরে মাকে বললাম, 'বাবার স্বভাব তো জানেন।' তামাক নিয়ে বাবার কাছে গেলাম।

বাড়ীর কাজ শেষ হতে এখনও দেরী আছে। এর মধ্যে পনেরোই আগষ্ট ব্যাণ্ড নিয়ে বাবাকে রেওয়ার রাজভবনে যেতে হল। গাড়ীর অব্যবস্থার জন্য ডি. এম. এবং ডি. সিকে বাবা কথা শুনিয়েছেন জানতে পারলাম ব্যাণ্ডের গুলগুলজীর মুখে।

ডাক্তার গোবিন্দ সিংকে বাবা একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। বাড়ীতে এসে যে কম্পাউণ্ডার ইনজেক্সন দেয় তাকেও বলা হল। ডাক্তারবাবু মাংস খেয়ে বললেন, 'এত ভাল রান্না কখনও খাই নি।' কম্পাউণ্ডার ব্রাহ্মণ। সে মাংস খেল না। সে নিরামিষ খেল। বিকেলে বাবার একটু চোঁয়া ঢেকুর উঠেছে। মা বললেন, 'ওই বামন কম্পাউণ্ডারের নজর লেগেছে। লুকিয়ে মাছ মাংস খায় কিন্তু ডাক্তারের সামনে ব্রাহ্মণ সেজেছে। এর জন্য আপনার নজর লেগেছে।' বাবা বললেন, 'এডা কি কয়?' দিনটা ছিল শনিবার। বাবাকে দাঁড়াতে বলে মা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা কুলোতে সরষে, শুকনো লাল লংকা নিয়ে বাবার গায়ে লাগিয়ে কুলোর মধ্যে ফেললেন। আমার কাছে এটা আশ্চর্য নয়, কেননা ছোটবেলা থেকে কাশীতে আমার মাকেও দেখেছি এই প্রক্রিয়া করতে। মাকে দেখেছি একটা কিছু বলতো। তিনবার এই রকম করে আগুনে ফেলে দিত। নজর লাগলে কোন গন্ধ বেরোয় না। আর অন্য ক্ষেত্রে গন্ধের চোটে বাড়ীতে টেকা দায় হয়ে পড়ত। তার মনে হল কেউ নজর দেয়নি। কিন্তু অবাক হলাম মৈহারে মাকেও, সেই এক প্রক্রিয়া করতে দেখে। আমার উপস্থিতি দেখে বাবা বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। বাবা বললেন, 'দেখ তোমার মায়ের কাণ্ড।' মা কুলোর জিনিষ নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। বাবা এবং আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে। মা একটু পরে এসেই বললেন, 'একটু কী গন্ধ পাচ্ছ লংকার? আমি ঠিকই বলেছি, বামনার নজরই লেগেছে।' বাবা পরে আমাকে বললেন, 'তোমার মা এইরকম অনেক কিছু জানে। সত্যিই তো কোনো গন্ধ বেরোলো না।' বাবাও বিশ্বাস করেন এসবে কিন্তু বাইরে প্রকাশ করতে চান না। এই প্রক্রিয়াটার অর্থ আজও আমার কাছে বিস্ময়। এর নজীর অনেক দেখেছি যা যুক্তি এবং তর্কের বাইরে।

বাড়ীর কাজ চলছে। রাত্রে শেখবার পর যে মুহূর্তে উঠতে যাব, মনে হতো পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে। দাঁড়াতে পারতাম না। বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে, শিক্ষা সমাপ্তির পর বাবাকে প্রণাম করে স্বরোদ নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাব। কিন্তু বাজাবার পর যেহেতু যাচ্ছিনা, তাই বাবার নজরে পড়েছি। বাবা বললেন, 'কী হল?' নিজের অবস্থার কথা বললাম। বাবা বললেন, 'আরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা কামড়েছে। কিছুক্ষণ বসে থাক, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি পায়ে চিমটি কাটতাম। মাঝে মাঝেই এরকম হতে লাগল। এই সময়ে একদিন ডাক্তারবাবু এলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যতীনের পায়ে এইরকম ঝিঁ ঝিঁ লাগে কেন।' ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা বুঝে বললেন, 'ভিটামিনের অভাবে এরকম হয়।' বাবা শুনে বললেন, 'আমি তো বাবা খিচুড়ি খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, আমার তো কখনও এমন

হয় নি। ভগবানের দয়ায় এখানে খাবারের অভাব নাই।' এ কথা শুনে বাবাকে আমি বললাম, 'মৈহার আসবার আগেও একনাগাড়ে পড়ার পর কখনও হতো। এ কিছু না, পায়ের শিরায় টান পড়ে। বাবা বললেন, 'আরে আরে এইসা না, এইসা না, ডাক্তার বাবা যে বলছে, লখছন ভাল নয়।' বাবাকে ডাক্তারবাবু এতদিনে চিনেছেন। তিনি বললেন, 'কয়েক দিন ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

বাড়ির কাজ চলছে। বাবার মেজাজ খারাপ। হঠাৎ বাবার চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে দেখি মালিকে বাবা বকছেন, 'চোপ, চোপ, কামচোর।' আমাকে দেখেই বাবা বললেন, 'শুনছ, এই কামচোরের কথা, নখড়া করে বলছে দুই টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে।' ইশারায় ভুরা মালীকে যেতে বললাম। পরে বাবাকে হাতজোড় করে বললাম, 'মালীর মাইনে দু'টাকা বাড়িয়ে দিন। মালীর স্ত্রীর শরীর ভাল নয়। ওষুধ খেতে হয়।' বাবা মালীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমার স্ত্রীর শরীর খারাপ আমাকে বলো নি কেন? ঠিক আছে দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। এ ছাড়া ডাক্তার বাবুকে বলে দেব, তোমার স্ত্রীর যেন চিকিৎসা ভাল করে করেন।'

অবশেষে বাড়ীর কাজ শেষ হল। বাবা বললেন, 'এবারে উপরের ঘরে আশিস এবং ধ্যানেশ আলাদা আলাদা ঘরে থাকবে। উপরের তিনটে ঘরেই খাট চেয়ার রাখা হয়েছে। তুমিও উপরের ঘরে থাকবে।'

আমি বললাম, 'আশিস ও ধ্যানেশ উপরে থাক। আমি যেমন আছি, সেইরকমই থাকব আপনার পাশের ঘরে। বাইরে থেকে কেউ এলে, উপরের খালি ঘরে থাকতে পারবে। কথাটা বাবার মনঃপুত হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাবা ভাব বিভোর হয়ে বললেন, 'খুদা যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। বেশী আশা করা ভালো নয়। আশা কখনও মেটে না। বেশী আশা করলে লোকে বিপথে যায়। অর্থ, বাড়ী, সম্মান, প্রতিপত্তি, পুত্র কেউ কারো নয়। একমাত্র সত্যি হলো আল্লা অর্থাৎ সারদা মা। একদিকে ধর্ম এবং পরকাল, অন্যদিকে জগতের অসীম সুখ। প্রথমে মায়ার বাঁধনে পড়েছিলাম, তাই এই অবস্থা।' এই কথা বলেই চুপ করে বাবা তামাক খেতে লাগলেন।

কিছুদিন পরেই দুর্গাপূজা। বাবা আমাকে বললেন, 'কাশীতে পুজোর সময় কত আনন্দ, এখানে তো কিছুই হয় না। কাশীতে গিয়ে কয়েকদিন আনন্দে পুজোটা কাটিয়ে এসো।' বুঝলাম বাবার এও এক পরীক্ষা। বাবাকে বললাম, 'এখন কাশী যাব না। কিছুই বাজাতে পারি না, কোন মুখে কাশীতে যাব।' বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'যেমন তোমার ইচ্ছা।'

বাবার বেশীর ভাগ চিঠির উত্তর আমিই লিখি। কিছুদিন আগে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের একটি চিঠি এসেছিল। সে চিঠির উত্তর আমি দিয়েছিলাম। আজ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ চিঠি দিয়েছেন বাবাকে। আমার পরিচয় জানতে চেয়েছেন, কেননা আমি বাবার হয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, প্রাইভেট সেক্রেটারী টু উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। বাবা খুশী হলেন চিঠিটা পড়ে। বললেন, 'স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে থাকেন। গেরুয়া বসন পরেন। সঙ্গীতের উপর অনেক বই লিখেছেন, অতি পণ্ডিত লোক।' ছোট বেলায় কাশীতে

রামকৃষ্ণ মঠে আমার বন্ধুর দাদাকে দেখতাম মঠেই থাকেন। সকালে এবং বিকালে গান করেন। যদিও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন, কিন্তু সাদা পাঞ্জাবী এবং সাদা লুঙ্গী পরতে দেখেছি। আমার অবচেতন মনে এই ছবি একটা দাগ কেটেছিল। মৈহারে এসে বাবার সান্নিধ্যে এসে বুঝেছি সঙ্গীত সাধনার ধন। মনের একটা ইচ্ছে জাগ্রদ হলো, স্বামীজীকে চিঠি দিলাম। সময় হলে তখন আপনাকে জানাব। আশা করি আমায় নিরাশ করবেন না।'

আজ দেবীপক্ষের প্রতিপদ। আজ বাবা রাত্রে শেখালেন, 'দেশ' এর আলাপ, জোড়, ঠোক ঝালা শেখাবার পর ওঁর নিজের সরোদ রেখে বললেন, 'এবারে সঙ্গে সঙ্গে তিলককামোদের ছেড় বাজিয়ে বিলম্বিত গৎ বাজাও তো দেখি।' গৎটার মুখড়া নানাভাবে করে, সমে এসে পড়ে, বাজালাম। বাবা খুশীই হলেন। বললেন, 'করতে যাও, করতে গেলে পাবেই পাবে।'

চতুর্থীর দিন দক্ষিণা রায়চৌধুরী কোলকাতা থেকে এলেন বাবা খুব খুশী হলেন দেখে। দক্ষিণারঞ্জন বললেন, 'পুজোর সময় এলাম আপনার কাছে। মহাঅষ্টমীর দিন আপনার জন্ম, সেইজন্য এসেছি।' বাবা বললেন, 'বাবা তুমি আমার বড় ছেলের মত কাজ করেছ। জলের কষ্ট দূর করে দিয়েছ। আলি আকবর কী করবে জানি না, অন্ততঃ বাসস্থানের ব্যবস্থা তো করে দিলাম নাতিদের জন্য। আলি আকবর মা সারদা দেবীর মন্দির দেখবে আর সাধনা করবে, বাবা সপ্তমীর দিন মাকে ডাকলেন। মা আমাকে বললেন, কোলকাতার লোককে ডাকো। দক্ষিণারঞ্জনকে ডাকলাম। মা আমাকে আদ্দির কাপড় দিলেন, জামা এবং পায়জামা করবার জন্য। দক্ষিণারঞ্জনকে ধুতি এবং আদ্দির কাপড় দিলেন। মা বাবাকে বললেন, 'যতীনের মা তো কত আশা নিয়ে বসে আছে। যতীনকে কয়েকদিনের জন্য কাশীতে যেতে দিন।' বাবা বললেন, 'আরে আমি তো বলেছিলাম যেতে, তোমার ছেলেই যেতে চায় না।' আসলে বাবার মনে একটা ভয় আছে যদি কাশী গিয়ে আর না ফিরে আসি।

অষ্টমীর দিন বাবার জন্মদিন বলে মা পায়েস করলেন। আমি একটা মালা বাবাকে পরিয়ে দিলাম। বাবার খুব খুশী ভাব। যেহেতু কাশী যাইনি। দশমীর দিন বাবা রাত্রে সাধনা করবার জন্য অনেক জিনিষ গেয়ে এবং বাজিয়ে শেখালেন। তারপর 'শ্রী' রাগ এই প্রথম বাবা আমাকে শেখালেন। রাত্রে দশমীর প্রণাম করতেই যেমন বারবার বলে থাকেন, সেইরকম বললেন, 'আরে আরে কর কি? তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে আমায় প্রণাম করে আমার পাপ বাড়িও না। আমি হলাম ম্লেচ্ছ।'

যে কথা আগেও বলেছি সেই কথাই বললাম, 'আমার মতে আপনি হলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। পৈতে ধারণ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না। সত্য, ক্ষমা, সততা, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যার আছে সেই হল প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যার এই গুণ থাকে না সেই হল ম্লেচ্ছ।'

বাবা বললেন, আরে আরে বলো কি। যাক খুদা তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ করুক এই দুয়া করি।'

পরের দিন দক্ষিণারঞ্জন কোলকাতা চলে গেলেন। যেহেতু কাশী যাইনি, বাবা প্রসন্ন হয়েছেন বুঝলাম কথায়। বাবা বললেন, 'কাল থেকে সকালে, বিকালে এবং সন্ধ্যায় রোজ এক একটি রাগ শেখাব একমাস, তিরিশটা রাগ সকালে, তিরিশটা রাগ দুপুরে এবং তিরিশটা

রাগ রাত্রের, শেষ হলে বলবে। তারপর সেগুলি কিছুদিন সাধনা করে আমাকে শোনাবে।' মন প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

বাবা একটা কথা প্রায়ই বলেন, 'আগে কর শেষের আয়োজন।' একটি কথার ব্যাখ্যা নানাভাবে করা যায়। সঙ্গীতের মধ্যে যে ব্যাখ্যা বাবা বলতেন তা আগেই বলেছি। সংসার করতে যে সব জিনিষের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকলে তিনি খুশী থাকতেন। সেই প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কম হলেই, বাবার মেজাজ গরম হয়ে যেত। মৈহারে রান্না হতো কাঠের আগুনে। যার জন্য একটা ঘর কাঠেই ভরা থাকত। যতই থাক চব্বিশঘণ্টাই আগুন থাকত। ভোর বেলায় বাবার চা চাই। না পেলেই বাবার হুঙ্কার শুনতে হবে। সকাল থেকে রাত অবধি তামাকের জন্য টিকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। দেরী হলেই বিপদ। কাঠ ঘরভরতি থাকলেও ধীরে-ধীরে কমে যাবে। কাঠের দরকারের সময় মা বলতে সাহস পান না। হঠাৎ সকালে বাজারে যাবার সময়, মা যে মুহূর্তে বললেন কাঠ ফুরিয়ে গেছে, কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে, বাবার হুঙ্কার শুনতে পেলাম। পোষ্ট অফিসে যাবার সময় হয়েছিল। বাবা আমাকে দেখেই বললেন, 'দেখ কাঠ নাই শুনছি। ঘর ভরতি কাঠ ছিল, এখন বলছে কাঠ নাই। কোথা থেকে এখন কাঠ জোগাড় করি?' বুঝলাম বাবার সমস্যাটা। কাঠের ব্যবস্থা ব্যাণ্ডের গুলগুলজী করে। তার সঙ্গে জানাশোনা আছে একজন গরুর গাড়ীর ব্যবসায়ীর সঙ্গে। কাঠের দোকান থেকে কাঠ কিনে সেই গাড়ীতে ভরে বাড়ী পৌঁছে দেয়। এখন তো গুলগুজলীকে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে বিকালে যখন বাবা ব্যাণ্ডে যাবেন। বিকেলে বললে পরদিন আসবে।

এমন নয় যে বিকেলের রান্নার জন্য কাঠ নেই, পাঁচ সাতদিন ভালো ভাবেই চলে যাবে। কিন্তু যে মুহুর্তে বাবা শুনলেন সুতরাং পরে হলে চলবে না, আজই চাই। বাবার এই স্বভাব জানি বলেই বাবাকে বললাম, 'চিন্তা করবেন না। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।' বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কী করে ব্যবস্থা করবে?' উত্তরে বললাম, 'এ্যালাবিয়া সাহেবের জানা একজন লোক আছে যে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করে। সুতরাং সেই গরুর গাড়ীতে কাঠ কিনে নিয়ে আসব।' বাবা বললেন, 'টাকা?' বাবাকে এত দিনে বুঝেছি যা, টাকা আগে, নৈব নৈব চ। তাই বাবাকে বললাম, 'যা দাম হবে, বাড়ীতে পৌঁছে দিলে দিয়ে দেব।' বাবা বললেন, 'দেখ কি করতে পার।' বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ীর ব্যবস্থা করে কাঠের দোকানে গিয়ে বললাম, গাড়ীটা ভরে দাও। কাঠ ওজন করে ভরা হল। বললাম, একটা কাগজে দাম লিখে দাও। মৈহারে এখন আমাকে সকলেই চেনে। সুতরাং কোনো অসুবিধা নাই। বাড়ীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে দেখলাম জানলার ধারে চেয়ে বসে আছেন। বাবা দরজা খুলে বেরোলেন। কাঠ দেখে খুব খুশী। রসিদ দিয়ে বললাম, কত টাকা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিলেন। বাবার মনে শান্তি। সুতরাং বিকেলে শিখতে সুবিধে হলো।

রাত্রে একটা বাছুর মারা গিয়েছে। মৈহারে দীর্ঘ সাত বছরে এ জিনিষগুলো দেখেছি। মুরগী, গরু, মহিষ সব আছে। কখনও গরু মহিষ না এলে বাবার মেজাজ খারাপ, আবার কেউ মরে গেলে বাবার মনকষ্ট। এ তো থাকবেই। বাছুর মারা গিয়েছে শুনে বাবার মনঃকষ্ট

বুঝলাম। কিন্তু উপায় কি? মৈহারে এই প্রথম আলি আকবর টাকা পাঠিয়েছে। বাবা প্রথমে চটে উঠলেন, এতদিনে মনে হয়েছে ছেলেমেয়ের কথা। বাবা টাকা ছুঁলেন না। বললেন, 'তোমার মাকে গিয়ে দিয়ে দাও টাকা।' বাবা কিন্তু মনে মনে খুশী হয়েছেন। কিন্তু একথাও ঠিক, বাবা আলি আকবরের একটা টাকাও হাতে করে নেন নি। মাকেও কখনও বলেননি ওই টাকা কি করলে, যা আলি আকবর পাঠিয়েছে?

বাবা আজ রাত্রে আশিসকে এবং আমাকে 'তিলককামোদ' বাজিয়ে গৎ বললেন। আশিস ভুলে গেছে। আমাকে বাজাতে বললেন। আমি বাজাবার পরই তাকে সেই নির্মম প্রহার। বললেন, 'বুঝতে পারলে, এই সব বন্দিশ কোটি টাকার সম্পত্তি। বাঁদরকে মুক্তোর মালা দিয়েছি, তা কি বুঝেছে? হীরে দিলেও তার মর্ম বোঝে না। বাঁদর বমি করে ফেলে। হজম করতে পারে না।'

নাতিকে বাবা যেমন মারেন, কাঁদেন সেই সঙ্গে, আবার তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সিনেমাতেও নিয়ে যান। শিক্ষার সময়, বাবা একটা কথা প্রায় বলতেন। একদিন তোড়ীর আলাপ থেকে শেষ করে ধুয়া মাঠা, এবং পরমাঠা দিয়ে শেষ হল। বাবা বললেন, ভাব দিয়ে যদি ঠিক ঠিক বাজাও তাহলে রাগের মধ্যে রঙ্গ আসবে, আর যদি আতাইয়ের (মানে যারা না শিখে, শুনে শুনে বাজায়) মতো বাজাও, রাগের মধ্যে জঙ্গ (মরচে) দেখতে পাবে। অর্থাৎ ভালভাবে বাজালে রাগের মধ্যে রং এর বাহার হবে। ভাল ভাবে না বাজালে চকচকে বাসনের মধ্যে মরচে পড়ে গেলে যেমন খারাপ লাগে, সেইরকম বাজনার মধ্যেও হবে। কথাটা হিন্দিতে বাবা বলতেন, 'রাগে রঙ্গ নহি তো রাগে জঙ্গ।'

বাবা রোজ নতুন নতুন রাগ শিখিয়ে বললেন, যা শেখালাম এগুলো বাজাও। তারপর আবার শেখাব। কথাটা বলেই বাবা আমাকে বই পড়তে দিলেন। বইএর নামটা পড়ে ভাবলাম, এ বই বাবা কেথায় পেলেন এবং কেনই বা দিলেন? বইটার নাম 'পুরুষের শত্রু নারী।' বইটা পড়লাম। বাবা প্রাচীন পন্থী। বুঝলাম বাবার হুঁশিয়ারী বাণী। বাবা সন্তানের ভাল চান, তাই এই বই দিয়েছিলেন আমাকে।

বাবাকে একদিন পরে বই ফেরৎ দেবার সময় বাবা বললেন, 'এই সব কথা আশিসকে বুঝিও।' বাবাকে সম্মতি জানিয়ে আশিসকে যেভাবে বুঝিয়ে দিলাম, সেও আমার পক্ষে সমস্যা। বাজনায় গৎ ভুলে গেলেও বারো বছর বয়সে যা শুনেছিল, আঠারো বৎসর বয়সে যখন দেখা হয়েছিল, বুঝেছিলাম বাবার সে কথা ভোলে নি। বাবা যে বলেছিলেন, 'যে দিন ওই সব কিছু দেখব, আছাড় মেরে ফেলব।'

মৈহারে এসে খাঁটি দুধ, ঘি খেয়ে হজম করতে পারি নি যার জন্য প্রথমে ডিসেন্ট্রিতে ভুগেছি, পরে এ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছি। বাবাকে বলিনি, পাছে বাবা ঘাবড়ে যান। কিন্তু এ্যানিমিয়া হয়েছে যেদিন বাবা ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে পারলেন, বাবার সেই এক কথা, লখছন ভালো নয়, কাশীতে গিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত, নইলে কোনো অঘটন ঘটলে বাবা কী জবাব দেবেন।

বাবা নাতিদের নিয়ে সিনেমা গেলেও একদিন সিনেমায় গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছেন। এই ব্যতিক্রম-এর কারণ একটা গান বেসুরো ছিল। আমি নিজে সিনেমাটা দেখে বুঝেছিলাম, যে গল্পের এক চরিত্র গান গাইতে চায় কিন্তু তার গাইবার ক্ষমতা নেই, সুতরাং ইচ্ছে করেই দেখান হয়েছে যে সে বেসুরো গাইছে। বাবা তা দেখেই নাতিদের নিয়ে চলে এসেছেন।

একদিন বাবা পয়সা দিলেন আমাকে সিনেমা যাবার জন্য। সিনেমায় নাম 'জয় হনুমান'। সিনেমায় গিয়ে একটা কথা শুনে অবাক হলাম। সেদিন আমার যাওয়ার জন্য সিনেমার মালিক অ্যালাবিয়া সাহেব এবং রতন শেঠ ধন্য হয়েছেন। বাবাকে দিয়ে সিনেমার উদঘাটন হয়েছিল কিন্তু বাবা সিনেমা দেখেন নি। কিন্তু আজ নাতিদের নিয়ে উপরে ব্যালকনিতে না বসে সর্বনিম্ন টিকিট কেটে বাবা নাতিদের নিয়ে সামনে বসেছেন। ওপরে অ্যালাবিয়া সাহেব শুনে, নীচে এসে বাবাকে দেখে অবাক। অ্যালাবিয়া সাহেব বলেছেন, 'আপনি টিকিট কিনে নাতিদের নিয়ে এইখানে বসেছেন যেখানে সাধারণ শ্রেণীর লোক বসেন।' বাবা নাকি উত্তর দিয়েছেন, 'বাবা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বসেই আনন্দ পান কারণ বাবাও নিম্নশ্রেণীর লোক। উপরন্তু নাতিরা এই ছোট বয়সেই উপরে গিয়ে গদীতে বসে অভ্যাস করলে, পরে বেঞ্চে বসতে অসুবিধে হবে। সেইজন্য বেঞ্চে বসার অভ্যাসই ভাল। প্রথমে কষ্ট করতে হয়। উপযুক্ত হয়ে গদীতে বসতে পারলে পরে আনন্দ পাবে।' বাবাকে কোনোমতেই যুক্তি দিয়ে রাজী করাতে পারেন নি। মৈহারে বাবা কয়েকবার সিনেমা গিয়েছেন নাতিদের মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু পরদিনই বলেছেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনেমায় যেতে মুখে যে আনন্দ দেখি, বাজাবার সময় সে আনন্দ তো দেখি না।' এ কথা বলেই বলেছেন যন্ত্র নিয়ে বসতে। হঠাৎ আমাকেও যন্ত্র নিয়ে যেতে বলেছেন। আগে শিখিয়েছিলেন উজীরখানি গৎ বিলম্বিত খাম্বার রাগে এবং দ্রুত গৎও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বারো বছর বয়সে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক, আলাপ জোড় যা বাজায় কল্পনা করা যায় না, এইটুকু ছেলের জন্য, কিন্তু ভুলের মাসুল যা পেতে দেখেছি আজ লিখতে বসে সেইসব কথা মনে আসছে। নতুন শেখাচ্ছেন, আবার সেই 'ইমনও' শেখাচ্ছেন। নতুন বন্দিশও শেখাচ্ছেন, আবার পুরোনো বন্দিশও চাইছেন। এইখানেই আশিসের স্মরণ শক্তি লোপ পেতো, যার ফলে সে মার খেয়েছে। আমার মনে হয় বাবার ভাষায়, আশিসের জন্য সেইগুলো হলো সঙ্গীতের সার্টিফিকেট। আজ তাই লিখতে বসে আশিসের কথাই মনে হচ্ছে। আশিসকে নিজের ভাইপো বলে যেমন ভালোবেসে ছিলাম আজও মনে-মনে ভালোবাসি। কতবড় প্রতিভা ছিল। অবশ্য সবই ভাগ্য। তবুও উপলক্ষ্য বলে একটা কথা আছে। সে যা হতে পারত তা হলো না, সে কার দোষে?

২২

মৈহারে শিখবার আশা নিয়ে অনেকে এসেছে, কিন্তু কয়েকজন ছাড়া, সকলেই এক বর্ণ না শিখেই বিদায় নিয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে অপ্রিয় কাজটা আমাকে করতে হয় নি।

এক ভদ্রলোক একটা আধুনিকা মেয়েকে নিয়ে সকালে নিজের গাড়ীতে এসে বাবার বাড়ীতে ঢুকলেন। কেবল ভদ্রলোক হলে বাবার ঘরের দরজা আমিই খুলতাম, কিন্তু যে হেতু অল্পবয়স্কা মহিলা সুতরাং ওটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। দরজার আওয়াজ পেতেই বাবাই

দরজা খুলে দিলেন। শুনলাম কিছু কথাবার্তা। চাকরকে ডেকে বাবা চা দিয়ে সৎকার করলেন। শুনলাম বাবা বলছেন, বয়স হয়ে গিয়েছে তাই শেখাবার সামর্থ্য নাই। ভদ্রলোকেরা চলে যাবার পরই বাবার ঘরে গেলাম। দৈনন্দিন চিঠির উত্তর যা লিখেছি শোনাবার জন্য। আমাকে দেখেই বাবা বললেন, 'যে মেয়ে এত সাজসজ্জা করে সে গান কি শিখবে?' আধুনিক বেশভূষা বাবার কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে, তাই নাকচ হয়ে গেল।

মৈহারের বাসিন্দার মধ্যে কয়েকজন ছাড়া কখনও আমার থাকাকালীন অন্য কাউকে আসতে দেখিনি। লোকমুখে শুনেছি বাবার কাছে ভয়ে কেউ আসে না। মুসলমানদের মধ্যেও কাউকে আসতে দেখিনি। ব্যতিক্রম তিনবারই দেখেছি।

প্রথম ব্যতিক্রম, বাবা যে রহিম বক্সের কাছে তামাক কিনতেন, তার ছেলে একদিন এলো। রহিম বক্স মক্কা হয়ে এসেছে বলে প্রসাদ দিতে এসেছে। ভক্তিভরে বাবা প্রসাদ নিলেন। বাবার বারান্দায় ছিল দেবদেবীর ছবি এবং একটিই মাত্র মসজিদের ছবি, তাই দেখে বিস্ময় বোধ করল। বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেই বসল, 'আপনার এখানে হিন্দু দেবতাদের ছবি কেন?'

বাবা খুব সহজভাবে বললেন, যে কথা বহুবার শুনেছি। পুত্র স্থানীয় ছেলেটিকে বাবা বললেন, 'আমি হিন্দুও নই এবং মুসলমানও নই। আমার কোন জাত নাই। আমি 'পুমাজ' করি। অর্থাৎ পূজার 'পূ' এবং নামাজের 'মাজ', এককথায় পূমাজ করি।' বলেই বাবাকে হাসতে দেখেছি। ছেলেটি এই দর্শনতত্ত্ব বুঝতে পারেনি। আমার কাছে এ ব্যাপারটা মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মনে হয়েছে এতবড় দার্শনিক তত্ত্ব তো কখনও পাইনি বা কখনও শুনি নি। আজও যখন মনে হয়, ভাবি এ সব কথা বাবা কোথায় পড়েছিলেন। মাঝে মধ্যে না থাকতে পেরে যে মুহূর্তে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পেয়েছি একটি কথাই, 'আমি তো লেখাপড়া করি নি, আল্লা যা বলান তাই বলি।' এ কথা শুনে বরাবরই বিস্ময় বোধ করেছি।

বেশ শীত পড়েছে। বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে। বাড়ীর চারিদিকে বাউণ্ডারি দেওয়ালও আছে। বাড়ীর পশ্চিম দিকে বাউণ্ডারি থাকলেও বাবার অনেকটা জমি আছে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবাকে একদিন এসে বলেছিলেন, সেই জমিটার চতুর্দিক ঘিরে দিতে। যদিও বাড়ীর পশ্চিমদিকে কোন বাড়ী ছিল না কিন্তু বাউণ্ডারির যেখানে শেষ হয়েছে, একলাইনে কয়েকটা বাড়ী আছে এবং শেষ বাড়ীটা গভর্নমেন্ট হাসপাতালের ডাক্তারের। ওই বাড়ীতে দীর্ঘদিন এক বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন মহারাজার সময় থেকে, সেই ডাক্তারের রিটায়ারমেন্টের পর শুনেছি ডাক্তার গোবিন্দ সিং এসেছেন। সেই বাঙ্গালী ডাক্তার রিটায়ার করে কাটনিতে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করেন। তিনি একদিন এসে হাজির। বাবা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ ডাক্তার বাবা, ধন্বন্তরী ডাক্তার।' আমার অর্শের অপারেশন এই ডাক্তার দীর্ঘদিন আগে করেছিলেন।' ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও রক্ত পড়ে কী না?' উত্তরে বাবা বললেন, 'কখনও কখনও পড়ে।' এ কথা শুনে ডাক্তারবাবু যা বললেন, শুনে অবাক হলাম। ডাক্তারবাবুর কথায় বুঝতে পারলাম, অর্শের পাঁচটা বলি ছিলো, চারটে

অপারেশন ডাক্তারবাবু করেছেন। ইচ্ছা করেই একটা করেন নি। করেন নি একটি কারণেই। একটু রক্তপাত হয়ে গেলে বাবার মঙ্গল, কারণ রক্তপাত না হলে আবার হাই-ব্লাড-প্রেসার হয়ে যেত।

বাবা খাওয়ার পর উদ্বৃত্ত জমিটার বাউণ্ডারি করতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশটা ডাক্তারবাবুকে বললেন, ডাক্তারবাবু বাবাকে বললেন, 'অতি অবশ্য যথাশীঘ্র করিয়ে নিন। এখন অবশ্য কোনো ভয় নাই কিন্তু পরবর্তীকালে কে না কে দখল করে নিতে পারে।' ডাক্তারবাবু চলে যাবার পরের দিনই, নাতিদের কথা ভেবে বাবা আমাকে নির্দেশ দিলেন এর ব্যবস্থা করতে। পরদিনই বাড়ীর নক্সা দেখে পশ্চিম দিকে স্কোয়ার জমির ওপর চূণ দিয়ে বাউণ্ডারি করে দিল মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এসে। কাজ শুরু হয়ে গেল। বাবা দক্ষ কারিগর। চাকরদের নির্দেশ দিলেন কিভাবে মাটি কেটে কাঠের টুকরো লাগাবেন, কাঠের দূরত্বের মধ্যে গাছের কঞ্চি এমন ভাবে লাগালেন, যে কিছুদিন পর সেই কঞ্চির মাঝে গাছ এবং ফুলের কিছু চারা লাগানো গেল। এ কাজে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু আমার উপস্থিতি বাবা পছন্দ করেন। বাবাকে মাঝে মাঝে নিজের হাতে কাজ এবং তদারকি করতে দেখে অবাক হই। এই বয়সে এত কর্মদক্ষতা কোথা থেকে পান? সত্যিই অবাক লাগে।

একদিন সকালে বিন্ধ্য প্রদেশের পোস্টমাস্টার জেনারেল, মিস্টার বসু এলেন। এসে ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন বাবার বাজনা শুনবেন। বাবার কাছে আসার আর একটা কারণ হল, বাবা নিজের চিঠিপত্র ঠিক পান কিনা। কোন অভিযোগ থাকলে জানাতে। সঙ্গে দেখি মৈহারের পোষ্টমাস্টার ঠিক চোরের মত বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। একে অতিথি নারায়ণ, তারপর লেখাপড়া জানা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাংলায় কথা বলা দেখে বাবা খুবই উল্লসিত। বাবা পোষ্টমাষ্টারের খুব প্রশংসা করলেন। মনে হলো পোষ্টমাষ্টারের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। বাজনা শুনে মি. বসু চলে গেলেন।

পরের দিন বাবা সকালে আশিস এবং আমাকে একসঙ্গে শেখাচ্ছেন। আলাদা আলাদা শেখালেন না কারণ হাতে কম সময়। বাজারে যাবার সময় একটু আগে করে দিয়েছেন। বাজার থেকে ফিরেই বারোটা অবধি যে কাজটা চলছে তার তদারকি করবেন। এখন অন্য কোনো কাজ নয়, যতক্ষণ কাজটা শেষ না হয়। শেখাবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের বাজাতে বলে, তামাক খাওয়াটা বাবার একটা অভ্যাস। আগুনটা কমে এলে বাবা টিকেটা একটু খুঁচিয়ে দেন। আজকে ঘটল একটা অঘটন। এই অঘটন থেকে আমি যে শিক্ষা পেলাম, সেই শিক্ষাটা সঙ্গীত থেকে কোনো অংশে কম নয়। শিক্ষাটা পেলাম, অল্পে কাতর না হওয়া। মনের জোর থাকলে মানুষ শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণাকে জয় করতে পারে। সে কথাটাই এখন বলি।

মাথা নীচু করে বাজাচ্ছি। হঠাৎ বাবার মুখে বেশ জোরেই একটা আওয়াজ। আরে, আরে। বাবার এই কথা শুনে মনে হলো বাজনায় কোনো ভুল করেছি। তাকিয়ে দেখি বাবা নীচু হয়ে হাতটা ওঠালেন। দেখলাম টিকের আগুন কার্পেটের উপর পড়েছে। আগুনে

কার্পেট জ্বলে যাবে ভেবে তাকাতেই দেখি ছোট মাকড়সার আকৃতি নড়াচড়া করছে। চটিটা দিয়ে আগুনটা নেভালাম এবং পোকাটাকেও মারলাম। বাবাকে পোকাটা দেখিয়ে বললাম, একটা পোকাও রয়েছে। পোকাটা দেখে বাবা বললেন, আরে আরে। এতো কাঁকড়া বিছে। বাবার মুখের আকৃতি দেখে বুঝলাম, বাবার কষ্ট হচ্ছে। বাবাকে বললাম, 'আপনার কাছে যে লেকসিন ওষুধ আছে সেটা বার করুন।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'যে ওষুধের কথা বলছ সে ঔষধ তো সাপ কাটবার ওষুধ।' বললাম, 'সাপ কাটার ওষুধ কেবল নয়, কাঁকড়া বিছে এবং যে কোনো বিষাক্ত পোকা কামড়ালে ঠিক হয়ে যায়। কাঁকড়া বিছেতে মা'র যে কষ্ট হয়েছিল তা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো হয়ে গিয়েছিল।' কে শোনে কার কথা। বাবার সেই এক কথা, 'আরে না না সাপ কামড়াবার ওষুধ কাউকে কাটলে তার জীবন রক্ষা পাবে। ছাতার কাঁকড়া বিছে, ওষুধ নষ্ট করে লাভ নাই। বিপদে আপদে কাজে লাগবে।' বাবাকে বললাম, 'ওষুধ অনেক থাকবে।' কিন্তু কোনো জিনিষ না বললে তাকে হ্যাঁ করানো সম্ভব নয়। যতই বাবাকে বললাম ওষুধ ব্যবহার করতে, বাবা না করে বাজনা ছেড়ে চলে গেলেন, বাড়ীর বাউণ্ডারির কাজ দেখতে। পেছন পেছন বাবার সঙ্গে গেলাম। বললাম ওষুধটা ব্যবহার করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? দেখি চাকরের উপর গালি বর্ষণ হচ্ছে। আরে আরে কামচোর, যে হেতু আমি নাই তাই কাজ ফাঁকি। বাবাকে কয়েকবার বললাম ওষুধটা লাগাতে। বাবা চটে গিয়ে বললেন, 'নিজের কাম করো, আমার জন্য চিন্তা করবার দরকার নেই।' বাবার মূর্তি দেখে আর সাহস হলো না। চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার বাবাকে হাতজোড় করে গিয়ে বললাম, 'খুব কী কষ্ট হচ্ছে?' ববা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'বলছি কিছু হয়নি, এরপরও যদি বারবার এসে বিরক্ত করো তাহলে তোমার বিপদ। যাও নিজের কাজ করো।' আমি অবাক। জেনে শুনেও ওষুধ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? কিন্তু বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে আর সাহস হলো না।

ঘড়ি দেখে বুঝলাম বাবার স্নানের সময় হয়েছে। বাবাকে বলতে গিয়ে দেখি বাবার অবস্থা চরমে উঠেছে। তারসপ্তকে বাবা চাকরদের কেবল কামচোর বলছেন এবং মাঝে মাঝে কোদাল চালাচ্ছেন। হাত জোড় করে বললাম, 'জল দেওয়া হয়েছে স্নান করবার জন্য।' বললেন, 'যাও আসছি।' মৈহারে এসে অবধি দেখেছি যতই কাজ করুন না কেন স্নানের সময় বললেই সব কাজ ছেড়ে বাবা স্নান করতে যাবেন। কিন্তু আজ এর ব্যতিক্রম হলো। বাবা এলেন না। গরম জলে, সাইটিকা পেনের জন্য বারোমাস ঠাণ্ডা জল মিলিয়ে বাবা স্নান করেন। যখন বারোটা পনের হয়ে গেল দেখলাম বাবা এলেন না। আবার বাবাকে বললাম, স্নান করতে আসবার জন্য, কেননা গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাবার সেই এক উত্তর, চলো যাচ্ছি। যখন একটা বেজে গেল বাবাকে বললাম, 'একটা বেজে গেছে, স্নান করবার জন্য আসুন।' বাবার চোখ দেখে ভয় হয়। রেগে গেলে মনে হয় বাবার চোখ ঠিকরে যেন বাঘের মতন হয়ে গিয়েছে। সে চোখ যারা দেখেছে তারা এই কথাটা বুঝবেন। কারো সাহস হবে না কথা বলার। কিন্তু যেহেতু কী পরিমাণ কষ্ট হয় দুই তিনবার দেখেছি বলেই, সাহস করে বাবাকে আবার বললাম, 'কোবরা সাপের জন্যই ওষুধ নয়, শিশিতে লেখা আছে

স্পষ্ট করে কাঁকড়া বিছে, যে কোন বিষম পোকা, কয়েকবার শুঁকবার পর হাঁচি এলেই বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। কোবরা সাপের বিষ যখন ভালো হয়ে যায় তখন কাঁকড়া বিছে তার সামনে কিছু নয়। এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।' বাবাকে কোনো মতেই রাজী করাতে পারলাম না। আমার দীর্ঘ দিন কাটাবার পর, জীবনে এই প্রথম দেখলাম, স্নান করবার সময় বললেই যে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে আসেন, তিনি এলেন একটার সময়। বাড়ীতে ঢুকেই বাবা বললেন, 'মাটি কোপাতে কোপাতে হাতে খুব মাটি লেগে গেছে সাবানটা ঘর থেকে নিয়ে এসো।' তাঁর ঘর থেকে সাবানটা নিয়ে এলাম। বাবা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বললেন, 'একটু তামুক নিয়ে ঘরে এসো তো। যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে, একটু তামাক খেয়েই স্নান করব। আমার জন্য তোমাদের দেরী হলো।' বাবা কিছুক্ষণ তামাক টানলেন। আমার আর সাহস নাই জিজ্ঞাসা করি কষ্ট হচ্ছে কী না। নিজের থেকেই বাবা বললেন, 'আরে! এই কাঁকড়া বিছের কামড়ে সত্যি কষ্ট হয়। তবে চাকরদের গালাগালি করে মনটা অন্যদিকে করলাম। তবুও হাতের আঙ্গুলে যেখানে কামড়েছে এখনও চিন চিন করছে। তবে যে কথা তোমায় বললাম, তোমার মার কাছে যেন বোলো না। তোমার মাকে যখন কামড়েছিল ওকে বলেছিলাম 'নখড়া' কিন্তু এখন যদি কষ্টের কথা বলি, তোমার মা আমাকে কথা শোনাবে। এই কথা বলেই বাবা স্নান করতে গেলেন।

স্নান করে খাবার খেতে বসলে, মা বললেন, 'আমাকে তো বলেছিলে আমার মন খারাপ তাই বিচ্ছু কামড়েছে। আপনাকে কখনও এ যাবৎ কামড়ায়নি। তবে আজ কেন কাটল? তার মানে আপনারও মন ভালো নয়। নিজের বেলায় আঁটিশুটি অন্যের বেলায় দাঁত কপাটি। এতক্ষণ চুপ করে বাবা শুনছিলেন, এবারে নিজমূর্তি ধারণ করলেন। বললেন, 'আরে আরে কী বলস? আমাকে সত্যই তো এতদিন কাটেনি। তোমার পাপে আমাকে কামড়েছে। তোমার অভিশাপে আমাকে কেটেছে।'

খাবারের পরই বাবাকে তামাক দিলাম। বাবাকে তামাক মা রোজই দেন দিনের মধ্যে কতবার তার ইয়ত্তা নেই। দিনরাত চরকির মত মা পরিশ্রম করেন। সেইজন্য মার কষ্ট লাঘবের জন্য রোজ আমি অন্ততঃ তিন চারবার দিই। এ ছাড়া মার উপর যখন চটে যান, তখন একমাত্র আমিই দিলে বাবা রাগ করেন না, অথচ মা দিলে খাবেন না। আমার দীর্ঘদিন থাকার কালে, মা ছাড়া বাবার ঘরে গিয়ে তামাক দেবার সাহস কারো ছিল না। এছাড়া বাবার ঘরে আমি যেহেতু চিঠি, পরামর্শ, কবিতা পড়ার উপলক্ষে যতটা ঢুকেছি, এ সাহস বাবার কোনো শিষ্য বা বাড়ীর কোনো পরিবারবর্গের মধ্যে দেখিনি। এ কথা বলার কারণ নিজের প্রশংসা করা নয়। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির জোরেই নিঃস্বার্থে সাহস করে গিয়েছি। তার মধ্যে কোন মন পাবার জন্য করিনি। বাবা বোধহয় এটা বুঝতেন, সেই জন্য বাবা আমার পরামর্শ এবং কথা যা শুনেছেন, সে কথা বাবাকে সাহস করে কাউকেও বলতে দেখিনি। মৈহারের বাইরে অনেকে হয়ত করেছে, কিন্তু সেখানে আর বাড়ীতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

বাবার সেই বিছে কামড়ান দেখে বুঝেছিলাম যেহেতু মাকে 'নখড়া' বলেছিলেন সেইজন্য ওষুধ লাগান নি। ব্যথার চোটে বাবা রাত্রে এবং পরদিন সকালে আমাদের শিক্ষা

দেননি। কিন্তু একটা কথা বুঝেছি, কোন রোগ হলে কষ্ট তো হবেই, তবে মনের জোর থাকলে অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে যায়। বাকীটা ওষুধে হয়। যতই কষ্ট হোক, বাবাকে কখনও কষ্ট হচ্ছে বলে লোকের সহানুভূতি নিতে দেখিনি। এই ঘটনায় বাবার কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি, যে কোনো ব্যাপারে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এ শিক্ষা জীবন সংগ্রামের সহায়ক।

তারিখটা ছিল পনেরোই নভেম্বর। শিক্ষার ব্যাপারে এটা একটা স্মরণীয় দিন। মৈহারে আসবার আগে বাবার এবং কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গতে যে ছন্দ আমায় মুগ্ধ করেছিল, আজ বিলাবলে সেই ছন্দের গৎ শেখালেন। সে সময়ে 'ডা' বোল দিয়েই গৎটা বাবাকে শুনিয়েছিলাম। সে সময় কাশীতে বা বলেছিলেন, 'রডা' বোল বাজাতে। সে সময় আমার কাছে ছিল ল্যাটিন কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারি।

বাবার কাছে শুনলাম, ত্রিতালের বদলে আদ্ধার ঠেকা লাগাতে হয় এই গতে, সঙ্গতের সময়। আদ্ধার ঠেকায় গৎ এবং মাধুর্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। বাবা বললেন, 'এই গৎ' এর নাম আমি দিয়েছি দাদু-নাতির গৎ। এর মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রধান। কেবল কৃন্তন, জমজমা এবং ছোট ছোট মীড় দিয়ে বাজালে এই গৎ-এর আনন্দ পাওয়া যায়।' বাবা তবলা নিয়ে আদ্ধার ঠেকা লাগালেন এবং পরে ত্রিতালেও বাজালেন। বাজাবার পর বললেন, 'ত্রিতালে বাজালেও সমে আসবে কিন্তু গৎ-এর আমেজ নাশ হয়ে যাবে।' কাশীতে যখন কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে বাবা বাজিয়েছিলেন, ঠেকাটা বলে দিয়েছিলেন। বাঁয়াটা দাবিয়ে কণ্ঠে মহারাজ বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন। শ্রোতারা আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। সে সময় ঠেকাটা এবং সরোদে গৎ-এর বোল 'রডা' আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল, কিন্তু সেই পুরোনো কথা সহজে মনে পড়ল। এ কথাও মনে পড়ল, বাবা কেন সে সময় বলেছিলেন, পালটা, বোল, কৃন্তন না শিখলে এ গৎ বাজানো যায় না। সে সময় ভেবেছিলাম বাবা শেখাতে চান না। যে পরিস্থিতি কাশীতে দেখেছি, সুতরাং ভাবাটা আমার অন্যায় নয়। আজ বুঝলাম বাবার কথাটা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। সন্ধ্যে বেলায় ইমনেও এই ছন্দে গৎ শেখালেন। মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

পরের দিন এই প্রথম বাবা আমাকে বললেন ভাল সিনেমা এসেছে। সিনেমার নাম 'তানসেন'। নাতিদের এবং তোমার মায়ের টিকিট কেটে বসিয়ে দিয়ে এসো। সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে বাড়ীতে আসবার পরে বাবা আমার সেই আদ্ধার ঠেকায় ইমনের অন্য বন্দিশ শেখালেন।

পরপর দুই দিন। একদিন বাবা এবং আমি 'তানসেন' সিনেমা দেখতে গেলাম। গরমকাল হলে রোজই দেখতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু শীতকাল, বাড়ীর দরজায় তালা দিয়ে চাবি বাবা নিজের কাছে রেখে দেন সেই জন্য একদিনের বেশী আর দেখতে পারলাম না। ডাক্তার গোবিন্দ সিং তানসেন দেখেছেন। তিনি এসে বাবাকে বললেন, খুব ভাল একটা সিনেমা এসেছে। অনুরোধ করলেন সিনেমাটা দেখতে। ডাক্তারবাবু যখন জানতে পারলেন বাবা সিনেমাটা দেখে এসেছেন জিজ্ঞেস করলেন, 'একথা কি সত্য যে বৈজু বাওরা তানসেন থেকেও বড় ছিলেন?' উত্তরে বাবা বললেন, 'যারা ভগবানের কাছে মনোরঞ্জনের জন্য

নিভৃতে সাধনা করে তারাই বড়। সকলের মনোরঞ্জনের জন্য বাজাতে হলে সঙ্গীতের স্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। কারণ পূর্বে এবং আজকালকার যুগেও ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না। যেমন তানসেনের ছেলের মধ্যে বিলাস খাঁ বড় ছিলেন অন্যান্য ভাইদের তুলনায়। বিলাস খাঁ মসজিদে এবং জঙ্গলে একান্তে সাধনা করতেন। একান্তে ভগবানের সাধনা করলে খাবারের ব্যবস্থা ভগবানই করে দেন। বহু সাধু সন্ত এবং ফকির নির্জন গুহার মধ্যে ভগবানের আরাধনা করেন বলে প্রণম্য। সুতরাং এক গুরুর শিষ্য হলেও বৈজু বাওরা তানসেন থেকে বড় ছিলেন।' ডাক্তারবাবু বাবার সঙ্গে খুব সহজ সরলভাবে প্রশ্ন করতেন। কথায় কথায় ডাক্তারবাবু বললেন। 'আমার বোন অন্নপূর্ণা তো কোথাও বাজায় না, তাহলে কি আলি আকবর এবং রবিশংকর থেকে বড়?' উত্তরে বাবা বললেন, 'আপনার বোন অন্নপূর্ণার কাছে আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর শিশু। এমন কি আমার থেকেও ভাল বাজায়। আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর, সঙ্গীতের স্তর থেকে অনেক নেবে গেছে জনতার মনোরঞ্জনের জন্য। আমার কোথাও বাজাতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু এই নাতি নাতনিদের জন্য ভিক্ষায় বেরোতে হয়। আমাকেও লোকের মনোরঞ্জনের জন্য দেড় দুই ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু শোনাতে হয়। কিন্তু আপনার বোন অন্নপূর্ণাকে প্রথমেই শিক্ষা দেবার সময় বলেছিলাম, অর্থ উপার্জনের জন্য তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি না। সঙ্গীতকে তুমি সাধনা ভেবে মনে মনে ঈশ্বরকে মালা চড়াবে। পূজা করবে। আজকালকার মত একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সকলের সামনে পূজা করে, লোকের ভেট গ্রহণ করবে না। লোকের সামনে ভেক ধরে ঠাকুরকে পূজা করলে যেমন লোকেরা টাকা, অলঙ্কার, মিষ্টি, কাপড় ইত্যাদি দেয়, যার ফলে নিজের মনে অহঙ্কার জাগে। সেই অহঙ্কার হলে সিদ্ধাই হয় না। তোমার বোন যেহেতু একান্তে ঠাকুরকে শোনায়, যার জন্য সঙ্গীতকে সে ধরে রেখেছে। আমার বাজনা কী শুনবেন? অন্নপূর্ণার বাজনা শুনলে বুঝতে পারতেন তার বাজনার গভীরতা।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'একবার অন্নপূর্ণা এবং রবিশঙ্করের বাজনা রেডিও থেকে শুনেছিলাম।' বাবা বললেন, 'রবিশঙ্করের টাকার অভাব ছিল বলে অন্নপূর্ণা একবার বাজিয়েছে আমার অনুমতি নিয়ে। রেডিওর এক বড় অধিকারী আমাকে অনুরোধ করায় এই অনুমতি দিয়েছিলাম। তবে অন্নপূর্ণাকে এ কথা বলেছি, কোন জায়গায় না বাজালেও, প্রকৃত শিক্ষার্থী যদি পায়, তাহলে যে খুদ কুঁড়ো আমি সারাজীবনে সংগ্রহ করেছি, তা নিশ্চয়ই শেখাবে যার ফলে আমার গুরু উজীর খাঁর নাম থাকে। তবে আজকাল সে শিক্ষার্থী কোথায়? আজকাল সকলেই কয়েক বছরে উস্তাদ হতে চায়। তিরিশ বৎসর সাধনা করলে তবে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।'

ডাক্তার গোবিন্দ সিং বললেন, 'বাবা মৈহারের মহারাজকে সকলেই 'মহারাজা' বলে সম্বোধন করত, কিন্তু আমার চোখে আপনিই সঙ্গীত জগতের মহারাজা, কেননা বহু উস্তাদ আমি দেখেছি কিন্তু আপনার মত নিরহঙ্কারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এখনও চোখে দেখিনি। তবে এ কথা ঠিক, আমার বোন অন্নপূর্ণার মত এত গুণী হয়েও এত সাধারণ বেশভূষা আমার জীবনে দেখিনি।' এই কথা শুনে বাবা নিজের সম্বন্ধে 'তোবা, তোবা' করে দুই গালে দুইবার চাপড় মেরে বললেন, 'আমি সাধারণ লোকের দাস। দীন হীন আমি। তবে অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে যা বললাম তা ঠিক। সঙ্গীতকে যে পেয়েছে তার কাছে দামী অলঙ্কার, বেশভূষা

তুচ্ছ। সেই জন্য যোগিনীর মত থাকে। এই জন্যই অন্নপূর্ণা আমার কাছে একাধারে মা এবং কন্যা। তার মধ্যে সেই ভাব আছে বলেই ভগবান তার মনে সেই সুর দিয়েছেন। আসলে যে নিজের মধ্যে সকলকে দেখতে পায়, আর সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় সে কখনও কারো অনিষ্ট করতে পারে না এবং সেই হল প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ। আমি হতে চেয়েছিলাম সেই প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু সংসারধর্ম পালন করার জন্য ভিক্ষার রাস্তা ধরতে হলো। তাই গুরুর কৃপায় যা পেয়েছিলাম, পেয়েও হারিয়েছি। সকলকে সারা জীবন শিক্ষা দিতে দিতেই জীবনটা চলে গেল।' ডাক্তার গোবিন্দ সিং বললেন, 'আপনার মত এত শিষ্য আর কজন উস্তাদ তৈরী করেছেন?' গাইতে বা বাজাতে অনেকেই পারে কিন্তু আপনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন আপনার শিষ্যদের মধ্যে। এরচেয়ে বড় আর কী আছে?'

নভেম্বরের মাঝামাঝি মৈহারে বাবার এক ধর্ম জামাই একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বাবার কাছে এলেন। বাবার এক ছাত্রের পত্নী, বহুল প্রচারিত কোলকাতার একটি মাসিক পত্রিকায় বাবার উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটিতে বাবার কয়েকটি ছবি দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ভুল তথ্য দিয়ে লেখিকা বাবাকে মহান করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বাবার মত আদর্শ চরিত্র থাকলেও, আমার জীবনে সেরূপ আদর্শের সন্ধান এ যাবৎ পাই নি। কিন্তু যা নয়, বাড়িয়ে মিথ্যা কথা লিখবার দরকার কী? যে মিথ্যা কথা লেখা ছিল তার জের আজও চলছে। সেই ভুল তথ্যগুলো কী? আমার ইংরাজী বইতে যে কথা আংশিক লিপিবদ্ধ করেছি। যদিও পত্রিকাটা ধর্মজামাই নিয়ে এলেন কিন্তু আমার হাতে পড়ল না। উনি যা পড়ে শোনালেন বাবাকে, সেইটুকুই শুনলাম। আর ওঁদের কথার ফাঁকে একটু চোখ বোলালাম। মিথ্যার বীজ কল্পনায় কত তাড়াতাড়ি বিষবৃক্ষ হয় তা তো জানতাম না। জানলাম কয়েকদিন পর।

বাবা সেই পত্রিকার তথ্য সম্বন্ধে কোথাও প্রতিবাদে সোচ্চার হননি। যদিও বাবা আপাত প্রচারবিমুখ ছিলেন তবুও ওনার বিষয়ে লিজেন্ডারি টেল অর্থাৎ রূপকথার গল্প কেউ বললে বা লিখলে উপভোগ করতেন। সেটা ছিল ওর স্বভাব, কৌতুকপ্রিয়তার একটা অঙ্গ। তাতে তথ্য নির্বাসিত হোক বা ঠ্যাং ভেঙ্গে হাসপাতালেই যাক, তাতে বাবার কিছু যেত আসতো না। এখানেও হোলো তাই। বাবা সব ব্যাপারটাই হজম করবার চেষ্টা করলেন। একটা কথা খালি কাবাবে হাড্ডির মত বাবার কাছে ঠেকল।

প্রতিবেদিকা আবেগের বশে সঙ্গীত সাধক আর হিন্দু ধর্ম সাধক এ দুটোর ব্যাপার যে আলাদা, একেবারে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তাই অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল যে বাবা মাছ, মাংস, রসুন, ডিম, পেঁয়াজ কিছুই খান না। অর্থাৎ এককথায় শাকাহারি। ঘটনাক্রমে বাবা নিষিদ্ধ বা সিদ্ধ কোন মাংসই খেতেন না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু মুরগীতে। সুতরাং তার আমিষ ছিল মাছ, মুরগী, ডিম, রসুন আর পেঁয়াজ। তাই বাবা নিরামিষাশী লেখা সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বললেন, 'আরে আরে আমাকে তো বৈষ্ণব বানিয়ে দিয়েছে।'

একথা ঠিক যে বাবা বাড়ী ছাড়া যেখানেই খেতেন নিরামিষটাই ছিল প্রিয়।

বাবার চিঠি এলে সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর লিখে ফেলা আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। কুমিল্লা

থেকে চিঠি এলে তার জবাব বাবা নিজেই দিতেন। এ ছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে বাবা চিঠি দিতেন। কোলকাতার তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারি শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চিঠি পেয়ে বাবা নিজেই জবাব দিলেন। বাবার চিঠির মধ্যে যে বিনয় থাকত, সেটা সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্য এই চিঠিটা হুবহু উদ্ধৃত করছি। কুমিল্লার চিঠি পাওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু কোলকাতা দিল্লীতে যাদের বাবা চিঠি দিয়েছিলেন, খবর নিয়ে জেনেছি সে চিঠিগুলো তাদের কাছে নেই।

যাক, সে কথা বলছিলাম, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের চিঠি পেয়েই বাবা সঙ্গে সঙ্গে নিজে লিখে আমায় দিলেন। আমি পড়েই পোষ্ট অফিসে ফেলে দিলাম। বাবা শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন—

মাইহার স্টেট
২৪-১১-৪১

শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত নিপুন,

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হলেম। মা সরস্বতী নাদ ব্রহ্মের চরণে প্রার্থনা করি জগৎগুরু তানসেন কনফ্রেন্স মঙ্গলমতে জনপূয় সকলে অতি আনন্দ লাভ করুন। সুর শ্রুতির শক্তির দ্বারায় মোহিত হক। নির্ভীয়ে কর্ম্ম সম্পন্ন হক এই প্রার্থনা করি।

আমি বুড় হয়েছি। ৮২ বৎসর গত দূর্গাপূজার মহা অষ্টমি দিবস হতে আরম্ভ হল। আমি সঙ্গীত পুজারি, বাদক হতে পারি নাই। কনফ্রেন্সে শ্রুতাদের জন্য ও অর্থের জন্য। নতুন নতুন গুণিজন আহ্বান করা উচিৎ। আমার হাজিরি দুই বৎসর হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত হাফেজ আলী খাঁ সাহেবকে ডাকা উচিৎ কেননা সেও এই ঘরের শিশ্ব ও মহাগুনি। আমার গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছে। ইনি হলেন ভারতবর্ষের রত্ন সন্তান, সুরে সকলকে মোহিত করতে পারে। আপনাকেও আমার গুরু শ্রীযুক্ত দবীর খাঁ সাহেব বিনা বিশারদ সঙ্গীতাচারী। তিনি আপনাকে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন। গান ও যন্ত্রবাদন সকল বিষয়ে নিপুণ করেছেন। আপনি বাঙ্গালী জাতির রত্ন সঙ্গীত নিপুণ। ছয় মাস যাবৎ বাৎরূগে ভুগেছি। মায়ের ও খুদার কৃপায় এখন ক্রমে ভালর দিকে যাইতেছি। নাতিকে নিয়ে তিন চার ঘণ্টা বাজিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিশেষ ক্লান্ত মনে হয় না। আমার গুরু উস্তাদ সকলকে, উস্তাদ শ্রীযুক্ত দবীর খাজিকে শত শত আদাব জানাবেন। একপ্রকার। আপনার ও পরিবার সকলের কুশলদানে সুখী করিবেন। আপনার মাতাঠাকুরাণিকে আমার প্রণাম জানাবেন। এবার বৌমার হাতের রান্না খাইবার আমার অধৃষ্টে মা অন্নপূর্ণা দান করেন নাই এ জন্য দুঃখিত। আশায় রহিলাম ভাজ্যে যদি থাকে মার হাতের অন্ন নিশ্চয়ই পাইব।

ইতি
আপনার
আলাউদ্দিন

বাবার এই চিঠিটা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন। বাবার চরিত্রের এটা একটা দিক। বাবা

যে কোন গায়ক বা বাদককেই মহাগুণী বলতেন। এই চিঠিতে শৈলেন বাবুকে যেমন লিখেছেন, দ্বিতীয়তঃ বাবার গুরু উজির খাঁর নাতি, বয়সে অনেক ছোট হলেও দবীর খাঁ সাহেবকে গুরু বলে সম্বোধন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা নিজে সরোদ বাজিয়ে হলেও হাফেজ আলী খাঁ সাহেবের প্রোগ্রাম যাতে রাখা হয় তার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে এখানেই ইতি করলাম।

এই চিঠি লেখার পরের দিনই বাবার বাড়ীতে মৈহারের রাজকুমার এলেন। মৈহারে এসে শুনেছি রাজাদের রাজত্ব যাবার পরই মহারাজা জববলপুরে বাড়ী তৈরি করে সেখানেই থাকেন। বাবা বড় রাজকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজকুমার এসে বাবাকে সোজাসুজি বললেন, বাজনা শুনবার আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। বাবা ডেকে পাঠালেন সুরদাসকে তবলা বাজাবার জন্য, ব্যাণ্ডে যে ঢোলক বাজায়। রাজকুমারের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো। বাবা সরোদের বদলে বেহালা বাজালেন। বাবা বললেন, 'আজ যে রাগ রাজকুমারকে শোনাবেন তার একটা ইতিহাস আছে। রামপুরে শিক্ষাকালীন এই রাগটি তিনি শিখেছিলেন, তাঁর গুরু উজির খাঁর স্ত্রীর কাছে। গুরুমাতাও সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন। বাবার সেবায় মুগ্ধ হয়ে গুরুমাতা বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা রাগ শেখাব। এই রাগ যখন বাজাবে তখন আমাকে মনে পড়বে।' রাগটির নাম 'বিহারী', বিলম্বিত গৎ আড়া চৌতালেতে বাজাবেন এবং মধ্যলয়ের গৎটি আদ্ধা ঠেকায় বাজাবেন। লোকে ঠুংরী শুনতে ভালবাসে। বাবা ঠুংরি বাজান না। তিনটি রাগের সংমিশ্রণে এই রাগটিতে ঠুংরীর চাল থাকলেও বাবা যা বাজালেন, মনে মনে তার অর্ধেকটা নকল করে পরে ঘরে বাজিয়েছিলাম। বাবার কাছে বিহারী শিখেছিলাম কিন্তু অনেক পরে।

বাজনা শেখাবার মাঝে-মাঝেই ভাবে বিভোর হয়ে বাবা কখনও সীতারাম আবার কখনও মা সারদা, জ্বালামুখী, কৃপাদায়িনী, বিদ্যাদানী, মা ভবানী, দুঃখ-হরণি ইত্যাদি বলে গাইতেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতেন। এ দৃশ্য এসে অবধি কয়েকবার দেখেছি, এবং দীর্ঘকালীন থাকার ফলে বহুবার বাবার ভাব বিভোর অবস্থা দেখেছি। বাবার চোখে মুখে এক অদ্ভুত নৈসর্গিক ভাব ফুটে উঠত।

কিছুদিন ধরে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হচ্ছে। ডাক্তার রক্তপরীক্ষা করে বলেছে এ্যানিমিয়া। ইনজেকশন ও ওষুধ চলছে। সকালে গোশালায় বাজাই। মনের জোরে সব কাজ করে যাই। পাছে বাবা ঘাবড়ান। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আমার কাছে অকল্পনীয়। এরূপ আর একবার হয়েছিল মৈহারে থাকাকালীন। বাবা যে কত বড় শিক্ষক বুঝতে পেরেছিলাম। গোশালায় আমার ঘরে যখন বাজাতাম সে সময় চাকর বুদ্ধাকে বলে দিয়েছিলাম, যদি বাবা বাজাবার সময় গোশালায় কখনও আসেন আমাকে আগে জানিয়ে দিতে। এ কথা বুদ্ধাকে বলার অবশ্য একটা কারণ ছিল। বাবা কখন যে কোথায় থাকেন বলা সহজ নয়। বাবার দিন এবং রাত্রের কার্যক্রম যদিও জানা ছিলো, কিন্তু বাবার যে মুহূর্তে একটি কাজের কথা মনে আসবে, সেই সময়ই সেই কাজ করবেন। গোয়ালারা ঠিক মত গরু এবং মহিষকে খাবার খাওয়ায় কী না, অথবা গোশালা সুন্দর ভাবে পরিষ্কার রাখে কী না

দেখবার জন্য, বাবার ভয়ে কেউ কাজে ফাঁকি দিতে পারতো না। একদিন রবিবারের সকালে যেহেতু পোষ্টঅফিসে যাবার প্রয়োজন নাই, একমনে বাজাচ্ছিলাম। আলাপ, জোড় সব বাজিয়ে গৎ বাজাচ্ছি, এমন সময় বুদ্ধা এসে বলল, 'আজ বাবা সকালে গোশালার পেছনে খুরপি দিয়ে জমি খুঁড়ছিলেন। তরিতরকারির বীজ লাগাচ্ছিলেন বলে। বাবা আজ আপনার বাজনা শুনছিলেন।' একথা শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। অনেক জিনিষ যা অন্নপূর্ণা দেবী শিখিয়ে গিয়েছেন সেই জিনিষও বাজিয়েছি। রাগের মাথায় বুদ্ধাকে বললাম, 'আমাকে বলো নি কেন?' উত্তরে বুদ্ধা বলল 'আমাকে বলবার জন্য সে আসছিল কিন্তু বাবা বুদ্ধাকে বলেছেন ওদিকে যাচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে খুরপি দিয়ে মাটি ঠিক করো।' একথা শুনে আমি অবাক। বাবা কি ভেবেছেন বুদ্ধা আমাকে গিয়ে বলে দেবে? জানি না আজ ভাগ্যে কী আছে। স্নান করে খেতে বসে বাবা বললেন, 'আজ বাজনা শুনেছি। খুব মন দিয়ে এইভাবে বাজালে এর ফল পাবে। করতে যাও, করতে গেলে পাবেই পাবে।' যাক গা দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাবার এ কী পরীক্ষা।

বাবার সব দিক খেয়াল থাকে। একদিন বাবা আমাকে ডেকে উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। উপরের ঘরে ছোট একটা ঘর আছে। সে ঘরে আমি কখনও যাইনি। ঘরটা তালা বন্ধ থাকতেই দেখেছি। বাবা সেই ঘরটা খুলতে দেখি বড় একটা কাঠের আলমারি রয়েছে। বাবা চাবি দিয়ে সেই আলমারিটা খুললেন। দেখলাম আলমারিটা ঠাসা খাতা এবং বইএ। বাবা এক একটা করে সব বার করলেন। দশ পনেরোটা খাতা সঙ্গে নিলেন। বললেন, 'এই হল আমার সম্পত্তি। সঙ্গীত যা শিক্ষা করেছি সব লিখে রেখেছি এই খাতায়। মাঝে মাঝে পরিস্কার করি। পরিস্কার না করলে উই পোকা কেটে দেবে।' শুকনো নিমপাতা এবং ন্যাপথলিনের গুলি দিয়ে আবার সব খাতা ভরে রাখলেন। এই প্রথম বাবা আমাকে দেখালেন নিজের খাতা। দশবারোটা খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এইগুলো নীচে নিয়ে চলো। মনে মনে ভাবো কতই না ভালো বাজাও, এখনো কত শিখতে হবে।' অবাক হলাম আলমারীভর্তি খাতা দেখে, কত রাগের গান আছে?

আগেই বলেছি ডাক্তার এ্যানিমিয়া হয়েছে বলে ওষুধ এবং ইনজেকশন দিয়েছে। ওষুধ চলছে। হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল মনে হলো। আশিস এবং আমাকে বাবা ডাকলেন শিখবার জন্য। বাবাকে বললাম শরীরটা ভালো নেই, সেইজন্য শিখব না। বাবা আমাকে বললেন, 'যাও সিনেমা দেখে এসো। ভাল বই এসেছে 'ভক্ত ভগবান'। ঠাকুর দেবতার বই দেখলে মন এবং শরীর ভাল হয়ে যাবে।' বাবা জোর করে আমাকে পাঠালেন। কয়েকদিন শিখলাম না। বাবা আশিসকে শেখালেন। আমাকে বললেন, শুনতে। বাবা মুখে মুখে কঠিন বোলের বিস্তার বললেন। এ অঙ্গ আমি অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আগেই শিখেছি। বুঝতে পারি কতটা আমাকে অগ্রিম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যার জন্য বাবার কাছে বকুনি না খাই।

কিছুদিন পরে কোলকাতা থেকে শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা চিঠি এল। চিঠিতে লিখেছেন যেহেতু রবিশঙ্কর প্লেনে দিল্লী থেকে কলকাতা যাবে, সেইজন্য দু'শো টাকা আরো বেশী দিতে অনুরোধ করেছে। রেডিওতে বছরের যে কদিন ছুটির বরাদ্দ, তার থেকে বেশী

ছুটি নিলে মাইনে পায়না বলেই প্লেনে যেতে হবে। শৈলেন রাজী হয়েছেন যেহেতু বাবা তার গুরু সেইজন্য বাবাকেও দুশো টাকা আরো বেশী দেবেন। এবং আলি আকবরকেও দেওয়া হবে। এই চিঠি পেয়ে বাবা বললেন, 'এদের কাছে টাকার প্রয়োজন হয়ত বেশীই। হয়ত কেন, সত্যিই তাই। কিন্তু টাকার চেয়েও আরো বড় জিনিষ আছে পৃথিবীতে, যার কাছে টাকা তুচ্ছ। সে জিনিষটা হলো সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা।'

নভেম্বরের শেষে তানসেন কনফারেন্সে এবারেও বাবা, আলি আকবর, এবং রবিশঙ্করের ত্রয়ী বাজনা হোল। রেডিওতে রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে রাত্রি সওয়া দুটো অবধি রিলে করে শোনানো হলো। প্রথমে আধ ঘণ্টা সামতাপ্রসাদের লহরা হল। তারপর পলুসকারের গান। এবং সর্বশেষে ত্রয়ী যন্ত্র সংগীত হোলো। সঙ্গত করলো কেরামতুল্লা এবং সামতাপ্রসাদ। বাজনা শুনে মনের মধ্যে জিদ হলো, যেমন করে হোক বাজাতেই হবে।

২৩

কোলকাতা থেকে বাবা ফিরে এলেন। বাবাকে বললাম, রেডিওতে বাজনা শুনেছি। এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'এ বাজনা লড়ন্ত-এর বাজনা, লোকদের মনোরঞ্জনের বাজনা। আসলে বাজনা হওয়া উচিৎ সুর দিয়ে আগাগোড়া ভরিয়ে দেওয়া। কিন্তু কনফারেন্সে সকলের কথা ভেবে বাজাতে হয়। আর বাজাতে ইচ্ছা করেনা।'

হঠৎ রবিশঙ্কর ছয়শত টাকা মনি অর্ডার করে পাঠাল। টাকা দেখে বাবা বললেন, 'আরে আরে, আমাকে কেন টাকা পাঠিয়েছে? আমার কি টাকার অভাব আছে? আমার যা টাকা আছে যতদিন বেঁচে আছি ঠিকই চলে যাবে। কারো কাছে হাত পাততে হবে না। খুদার অশেষ মেহরবানী। এখুনি টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।' টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। ভাবলাম বাবা বোধহয় কোলকাতায় আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে বলেছেন, বাড়ীর কত আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং এখনও করতে হবে। তাই রবিশঙ্কর টাকা পাঠিয়েছে।

রাত্রে হঠাৎ বাবা আমাকে বললেন, 'এতদিন তো বাজাচ্চ। বাজাও ইমন। মনে কর সব গুনীজন জলসায় বসে তোমার বাজনা শুনছে। সেইভাবে বাজাও তো দেখি?' এটি কঠিন পরীক্ষা। বাজালাম। সম্পূর্ণ আলাপ অঙ্গ শেষ হতেই হঠাৎ বাবা আশিসকে বললেন তবলা আনতে। আমি তো অবাক। তবলা দুই মিনিটের মধ্যে মেলালেন। তবলা মেলাবার কায়দা বাবা বললেন। এ যাবৎ দেখে এসেছি, তবলা মেলাতে কত সময় লাগে কিন্তু বাবা তবলা কোন সুরে আছে দেখে, গুল্লীতে হাতুড়ি ঠুকে যে কায়দায় তবলা মেলালেন, তা আমার কাছে বিস্ময়। বাবা বাজালেন তবলা। বাজাবার পর মনে হোল বাবা খুশী হয়েছেন। বললেন, 'ইমন একটা এমন রাগ, অন্যরাগ শেখবার ফাঁকে বরাবরই শিখতে হবে ইমন।'

পরের দিনই বজ্রাঘাত হোল একটি সংবাদে। আলি আকবর একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়েছে বাবাকে। চিঠিটা আমি না পড়ে বাবাকেই খাম ছিঁড়ে পড়তে দিলাম। বাবা সব চিঠি আমাকে দিয়েই পড়ান, কিন্তু আলি আকবরের চিঠি বলে পড়তে লাগলেন। দেখলাম বেশ কয়েকপাতার চিঠি। ক্ষণে ক্ষণে বাবার মুখের পরিবর্তন দেখতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি কোনও অশুভ সংবাদ তো নয়? চিঠি পড়ে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'আরে শুয়ার কে

বচ্চে। আমার ছেলে হয়ে কি করে এমন কুত্তার স্বভাব পেল? কুত্তা কুত্তিকে দেখলেই যেমন পিছে পিছে যায়, হায় আল্লা, এ তো দেখছি কুত্তারও অধম।' বাবা আমাকে চিঠিটা দিলেন পড়তে। পড়লাম চিঠি। অবাক হলাম।

বাবার অনুমতি চেয়ে আলি আকবর লিখেছে, রাজদুলারী বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করবে। বাবা বললেন, 'কি বুঝলে? যার চার ছেলে এক মেয়ে, সে আবার বিয়ে করছে? হায় হায় নামের কী বাহার। রাজদুলারী। নামটা শুনে কী মনে হয়? এর উত্তর তুমি দাও। আমি লিখব না।' কিন্তু পরমুহূর্তেই আলি আকবরকে চিঠি লিখলেন। চিঠি লিখে আমাকে পড়তে বললেন। পড়লাম, কি আর বলব, চিঠি পোষ্ট করে দিলাম। বাবা আজ জোর করে আমাকে রাত্রে সিনেমা পাঠালেন। সিনেমার নাম 'নমুনা'। সিনেমার নায়ক নায়িকা দেবানন্দ, কিশোর শাহু এবং কামিনী কৌশল। বাবা বললেন, 'আলি আকবরের এক নমুনা দেখলে, আর সিনেমার এক নমুনা দেখে এসো।' বাবা রোজ বাজারে যাওয়ার সময় কি সিনেমা হচ্ছে বোধ হয় দেখতেন। দেখাটা স্বাভাবিক। বাজারে যেতে গেলেই বড় পোষ্টার, বাঁদিকে তাকালেই দেখা যাবে। আমারও চোখে রোজই পড়ত। বাবার কথায় সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে এলাম। মা'র শরীরটা বিকেল থেকেই খারাপ। সিনেমাটা পুরো না দেখে চলে এলাম। বাবা এ যাবৎ ভক্তিমূলক সিনেমা দেখতে আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কী পরীক্ষা? বাবাকে বললাম, 'বইটা ভাল নয়, এবং মা'র শরীর বিকেলে খারাপ দেখেছিলাম বলে, চলে এলাম সিনেমা না দেখে।' এসে দেখলাম মায়ের একটু জ্বর হয়েছে। ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে এলাম। বাবা খুশী হলেন।

নিত্য নৈমিত্তিক যেমন চিঠি নিয়ে এসে বাবাকে পড়ে শোনাই, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। কয়েকটা চিঠি পড়ার পর এমন যে একটা চিঠি পড়তে হবে, তা কি আমি স্বপ্নেও কখনও ভেবেছি? চিঠিটা লিখেছেন আমার পরিচিত কাশীর ভট্ট পরিবারের একজন। মৈহারে আসবার আগে যে আমাকে বারবার বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছে। এক সময়ে লক্ষ্ণৌতে যে আলি আকবরের পরম ঘনিষ্ঠ ছিলো এবং বাবারও স্নেহভাজন, সেই পরম ভট্ট যে আমার বড়দাদার কাছে পড়েছে, তারই চিঠি। বাবাকে লিখেছে আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের যুগলবন্দী শুনে মনে হয়েছে সিংহ এবং বাঘের লড়াই। স্তুতি দিয়ে শুরু হয়েছে তারপর আমার নামটা দেখে চমকে উঠেছি। পড়তে পড়তে মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু চোখ পড়ে যাচ্ছে। কিছু পড়বার পরই বুঝলাম, বাবা যেমন কানপাতলা এ সব মিথ্যা কথা বললে নিশ্চয়ই সত্য বলেই ধরে নেবেন। আমাকে চুপ দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল পড়ছ না কেন?' হাত জোড় করে বললাম, 'আমি আপনার কাছে শিখেছি তাই ঈর্ষা হয়েছে, যার জন্য কল্পিত সব কাহিনী লিখেছে।' আমার কথা বোধহয় আমার বাবা বুঝলেন। তবুও বললেন, 'ঠিক আছে কী লিখেছে পড়।' পড়লাম চিঠিটা। চিঠিতে লিখেছে 'যতীন আপনার এবং আলি আকবরের বাজনার সর্বদাই সমালোচনা করত। আসলে যতীন গোয়ালিয়রে হাফেজ আলি খাঁর কাছে শিখতে গিয়েছিল, সেখানে টিকতে না পেরে বাধ্য হয়ে আপনার কাছে গেছে। সুতরাং যে আপনার এবং আলি আকবরের চিরকাল নিন্দা

করেছে তাকে শিখিয়ে খুব বড় ভুল করবেন। অতএব তাকে পত্রপাঠ বিদায় করুন। আপনার বাড়ীতে শিখতে গেলে পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন। আমার নাম বলবেন না।'

অবাক হলাম চিঠিটা পড়ে। মানুষ এত মিথ্যাবাদী এবং নীচ হতে পারে। এ কথা কথাচ্ছলে আলি আকবরের নিকট শুনেছিল, যে বাড়ীতে রেখে বাবা কাউকে শেখান না, সুতরাং ভেবেছিল আমাকেও নিশ্চয় বাবা রাখেন নি। অন্য বাড়ী থাকি এবং শিক্ষা করি বাবার কাছে।

গম্ভীরভাবে বাবা বললেন, 'তুমি আমার কাছে পাশ করেছ। তোমার ভয়ের কিছু নাই। তুমি সত্যবাদী বলেই চিঠিটা পড়েছ। চিঠিটা পড়ে নিজের মনে বানিয়ে অন্য কথা বললে আমি বুঝতেই পারতাম না। লোক চিনে রাখ। যে যাই বলুক না, নিজের শক্তিকে জাগাও। ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় করো। তা হলে ভুল ত্রুটি ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চলতে পারবে। আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ করো কতক ঈশ্বরে, কতক অন্যত্রে, তাহলে সমস্ত কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের দোষ প্রতিকূল শত্রুর মুখে শোনা ভাল। নিজের অনুকূল লোক দোষ ঠিক দেখতে পারে না। জীবনে যত দোষ এবং দুঃখ দেখা যাবে ততই ভাল, এর থেকে বৈরাগ্য আসবে। উপস্থিত অন্য চিঠিগুলো পড়ো।' বাবার এই কথায় প্রথমে মনে হয়েছিল বাবা বোধহয় কিছুটা বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু পরে বুঝলাম বাবা আমার কথাই বিশ্বাস করেছেন। বাকী কয়েকটি চিঠি পড়ে কি উত্তর দিতে হবে জেনে নিজের ঘরে চলে এলাম। সব চিঠি লিখে, খাওয়ার পর পোষ্ট করে বাড়ী ফিরে এলাম। ভগবান জানেন বাবার মনে কতটুকু দাগ কেটেছে। আমার জন্য কঠিন পরীক্ষা। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ। কোন জিনিষ পেতে হলে তার জন্য সব ত্যাগ করতে হবে। ঠিক আছে। একবার কাশী যাই, তারপর বোঝাপড়া করব। বাজনা বাজাতেই হবে। বাজনা বাজাতে পারলেই প্রকৃত চিঠির উত্তর দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার সময় বাবা ডাকলেন শিখবার জন্য। ইমনে আজ নূতন নূতন লয়কারির কাজ, সম, বিষম, অতীত, অনাঘাতে কী ভাবে বাজিয়ে, সাথ সঙ্গত করে লড়ন্তের পরে তবলা বাদককে বিভ্রান্ত করার রাস্তা বললেন। হঠাৎ দরজায় আঘাত পড়ল। শোনা গেল টাঙ্গা-ওয়ালার আওয়াজ। দরজা খুলে দিতেই দেখি একটি ছেলে সুটকেস বেডিং নিয়ে এসেছে। বাবাও সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কারণে আগমন?' অপরিচিত লোক এলেই বাবা চোখটা একটু ছোট করে যেভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি কারণে আগমন?' তাতে আগন্তুককে বরাবর বিচলিত হতে দেখেছি, এবং এক উত্তরই প্রায় শুনেছি, 'আপনার দর্শন করতে এসেছি।' বাবার প্রশ্ন হবে, 'আমাকে দর্শন করবার কী আছে? দর্শন করবার জন্য সারদা দেবীর মন্দিরে যান, বলেই বারবার প্রশ্ন করবেন, 'সচ্চি সচ্চি?' আগন্তুক যদি আসার সত্য কারণ বলে দেয় তাহলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু বারবার দর্শন করতে এসেছি বলবার পর, যদি অন্য কারণ হয় তাহলে তার দুর্গতির সীমা থাকত না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও অন্যদের মত সেই দুর্গতি হয়েছিল, কিন্তু প্রথম দর্শনে তা হল না। ছেলেটি বাবার ছোট ছোট চোখ দেখে প্রথমে বলেছিল, 'আপনার দর্শন করতে এসেছি।'

কিন্তু দ্বিতীয় বার বাবা যে মুহূর্তেই বললেন, 'সচ্চি সচ্চি করে বলুন কি বাসনা নিয়ে এসেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি দুইটি পত্র তাঁর হাতে দিলো। বাবা আমাকে চিঠিটা দিলেন। দুটো চিঠির বক্তব্য একই, 'এ ছেলেটি আপনার খুব ভক্ত, আপনার দর্শন করতে মৈহার যাচ্ছে।' চিঠির প্রেরক কিন্তু দুজনেই বাবার অতিভক্ত, অতি পরিচিত। একটা চিঠি দিয়েছেন ধর্মপুত্র দক্ষিণা রায়চৌধুরী এবং অপরটি দিয়েছেন তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারি শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবাকে যখন দুটি চিঠি পড়ে শোনালাম এবং বললাম, প্রেরকের নাম, বাবা ছেলেটির বাক্স বিছানা নিয়ে আমাকে বললেন, ঘরে নিয়ে যেতে। খাবারের কথায় ছেলেটি বলল খাবার খেয়ে এসেছে। বাবা আমাকে বললেন, 'ছেলেটির হাবভাব ভাল লাগছে না। ভেদ লাগাও কেন এসেছে? আমাকে দর্শন করতে আসার তো যুক্তি নাই। লখছন ভালো না, ভেদ লাগাও। কি জানি কার মনে কী আছে? খুব সাবধানে রাত্রে থাকবে।' বাবাকে বললাম, 'চিন্তা করার কিছু নাই।' বাবা বললেন, 'আরে বল কী? চিন্তা করার কিছু নাই? এখানে খরচা করে কোলকাতা থেকে এসেছে আমাকে দর্শন করতে? চিঠি দুটো জাল নয় তো?' চিঠি নিজেদের প্যাডে দুজনেই লিখেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নেই বলতে, বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, ভেদ লাগাও কেন এসেছে? কবে যাবে এখান থেকে? লখছন ভাল নয়।' চলে এলাম নিজের ঘরে। ঘরে এসে দেখি ছেলেটি জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরে ঢুকেছি ছেলেটি বুঝতে পারেনি। ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'কী দেখছেন?' ছেলেটি আমাকে দেখে বলল, 'দূরে ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে ওটা কী?' উত্তরে বললাম, 'সিনেমা।' ছেলেটি বলল, 'চলেন না সিনেমায় গিয়ে একটু চা খেয়ে আসি।' এ কথার কী উত্তর দেব? সংক্ষেপে বললাম, 'বাড়ীর সদর দরজায় বাবা তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং শীঘ্র জামা কাপড় বদলে শুয়ে পড়ুন, কারণ আলো জ্বালা দেখলে বাবা রাগ করবেন।' কথায় কাজ হল। ছেলেটি ব্যাগ খুলে লুঙ্গিটি বার করল। কোথা থেকে এসেছেন এবং কেন এসেছেন জানতে চাইলাম। ছেলেটি উত্তরে বলল, বগুড়ায় তার বাড়ী। এ কথা বলেই একটি মাসিক পত্রিকা আমার হাতে দিল, যে মাসিক পত্রিকায় বাবার উপর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। বাগচীবাবুর কাছে এই পত্রিকাটা আগেই দেখেছি। নিজের থেকেই ছেলেটি বলল, 'বাবার বিষয়ে এই প্রবন্ধটা পড়ে বাবাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হোলো। কোলকাতায় তানসেনে বাজনা ছিল বলে, সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তার দ্বারা একটা সুপারিশ পত্র নিয়েছিলাম। সেক্রেটারির মুখেই শুনেছিলাম এন্টালীতে একজনের বাড়ীতে বাবা কোলকাতায় এলে থাকেন। সুতরাং তার ঠিকানা নিয়ে দেখা করি, তার দ্বারাও একটা সুপারিশ পত্র নিয়ে এসেছি।' ছেলেটির কথায় বুঝলাম মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধটা ছেলেটিকে অভিভূত করেছে। ছেলেটিকে ম্যাগাজিন ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'এখন শুয়ে পড়ুন।' ছেলেটিও বাক্সের মধ্যে ম্যাগাজিন রেখে মনে হোলো কিছু খুঁজছে। বাবার ঘরের আলো নিভে গেছে। সুতরাং আমিও আলো নেভানোর জন্য ব্যস্ত। হঠাৎ বাক্সের মধ্যে একটা কাঠের বাঁশী দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঁশি বাজান না কি?' বিনয়ের সঙ্গে বলল,

'একটু বাজাবার শখ আছে।' কথাটা শুনে সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঁশী শিখবার ইচ্ছা নিয়ে কি এখানে এসেছেন?' ছেলেটি বলল সেই এক কথা। প্রবন্ধটা পড়ে এত অভিভূত হয়েছে যার জন্য বগুড়া থেকে বাবার দর্শন করতে এসেছে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে, আলো নিবিয়ে ছেলেটিকে বললাম, 'আর কথা নয়, এখন শুয়ে পড়ুন, সকালে কথা হবে।'

সকালে উঠেই বেরোবার মুখেই বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বুঝলে ছেলেটাকে দেখে?' বাবাকে সব বললাম গত রাত্রের কথা। ছেলেটি বগুড়া নিবাসী শুনে বাবা সকালেই থলে হাতে নিয়ে বেরোলেন। বুঝলাম অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করতে থলে হাতে নেওয়ার মানেই মাংস আনতে যাচ্ছেন। বাবা এলেন জিলিপি এবং মাংস নিয়ে। সকালে নাস্তার সময় বাবা ছেলেটিকে বললেন, 'দেশ বিভাজনের পর বগুড়ার অবস্থা কি রকম? বাবা নিজের দেশের ভাষায় কথা বলেন। ছেলেটিকেও উত্তর দিতে দেখলাম পূর্ব বঙ্গীয় ভাষায়।

দুপুর বেলায় হঠাৎ আলি আকবরের টেলিগ্রাম এল। চৌদ্দোই ডিসেম্বরে বম্বে এক্সপ্রেসে বাহাদুরের সাথে জুবেদা খাতুন এসে পৌঁছবে। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবাকে সংবাদটা বললাম। বাবা সংবাদটা শুনে মনে হলো হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'আরে এ কী ব্যাপার। চিঠি না দিয়ে হঠাৎ টেলি করেছে বৌমা আসছে। আলি আকবর না এসে বাহাদুরের সঙ্গে কেন পাঠাচ্ছে?' বাবাকে বোঝালাম আলি আকবর বোধহয় প্রোগ্রামে ব্যস্ত আছে, সেইজন্য বাহাদুরের সঙ্গে পাঠাচ্ছেন। বাবা হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাকে বললেন সংবাদটা। বাবা আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, 'আমার এখানে পর্দানশীন। বাড়ীতে বৌমা আসছে। অবশ্য তুমি হলে আমার ছেলে, তোমার জন্য কিছু নয়, তবে যে ছেলেটি এসেছে তাকে বিদায় করো যে করে হোক।' বাবা কিছু বলবেন না অথচ এই অপ্রিয় কাজের ভার আমার ওপর। ছেলেটিকে কি করে বলব চিন্তা করতে লাগলাম। দুপুরে খাবার পর মা আমায় বললেন, 'দারোগার ঝি নিশ্চয়ই আলি আকবরের সঙ্গে রাগারাগি করে আসছে। তোমার বাবা আমার শ্বাশুড়ির মেজাজ পেয়েছে। আমার শ্বশুর খুব শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু শ্বাশুড়ি খুব রাগী ছিলেন। তোমার বাবা তার মায়ের মত চণ্ডাল রাগটা পেয়েছে। আলি আকবর ঠিক উল্টো। আমাকে তো এতদিন দেখছ, তোমার বাবার ভয়ে একটা কথাও বলতে পারি না। আলি আকবর আমার মেজাজ পেয়েছে। তার মুখে বেশী কথাই শুনতে পাবে না, কিন্তু দারোগার ঝি? একেবারে উল্টো। তোমার বাবার মত রাগী। আল্লা জানে দারোগার ঝি কেন এখানে আসছেন বাহাদুরের সঙ্গে? বোধহয় আলি আকবরের সঙ্গে ঝগড়া করেই আসছে।' যেহেতু পুত্রবধূ দারোগার মেয়ে এবং রাগী, সেইজন্য বাবা এবং মা কখনো কখনো বৌমার বদলে 'দারোগার ঝি' বলে সম্বোধন করতেন।

আজ রাত্রে স্টেশনে যেতে হবে। মুরগীর ঘর এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। মজুরদের সঙ্গে বাবা থেকে সব কাজ দেখছেন। বাবা সকালেই বললেন, 'আরে কী ঠিক করলে? ছেলেটি যেন সন্ধ্যার আগেই চলে যায়।'

সকালে একবার ছেলেটিকে বললাম, 'বাবার এখানে পর্দানশীন। বাবার পুত্রবধূ আসছে সুতরাং আজ চলে গেলেই ভালো।' ছেলেটি সহজ সরল ভাবেই বলল, 'মাসিক পত্রিকায়

বেরিয়েছে বাবা সব ছাত্রদের নিজের বাড়ীতে রেখে খাওয়ান এবং শিক্ষা দেন। এইতো আপনিও আছেন? আমারও তো ইচ্ছা করে বাবার পুত্রবধূকে দেখি।'

ছেলেটির কথায় অবাক হলাম। বলে কি? বাবার পুত্রবধূকে দেখবার ইচ্ছা পোষণ করে! ছেলেটি এখন কয়েকদিন থাকতে চায়। মাসিক পত্রিকায় বাবার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ ভুল তথ্য দিয়ে ভরা, তা তো ছেলেটি জানে না। ছেলেটিকে বাধ্য হয়ে বললাম, 'যে সংবাদ মাসিক পত্রিকায় পড়েছেন, তার মধ্যে নানা ভুল তথ্যের মধ্যে এটিও একটা। আমিই এক ব্যতিক্রম। বাবা কখনো নিজের বাড়ীতে কোন ছাত্রকে আশ্রয় দেন না এবং খাবারও দেন না। আজ পর্যন্ত যারা এসেছে সকলেই অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে থেকেছে এবং খেয়েছে। তবে এ সংবাদ ঠিক, শেখাতে বাবা একটিও পয়সা নেন না। বাবা অত্যন্ত পর্দানশীন, সুতরাং পারলে আজ দুপুরে খেয়ে বাসে করে সাতনায় চলে গেলে কোলকাতা যাবার জন্য মেল পেয়ে যাবেন।' 'নইলে' এতটুকু বলে চুপ করে গেলাম। আশিস, ধ্যানেশ এবং বেবীকে পড়াতে লাগলাম। সবে পড়াতে বসেছি, বাবা এসে আমাকে বললেন, 'ছেলেটি কেবল আমার কাছে ঘুর ঘুর করছে কেন? তাকে কিছু বলো নি?' আমার পক্ষে উভয় সংকট। বললাম, 'আজকেই চলে যাবে।' আমার কথা শুনে বাবা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মনে হলো। বললেন, 'তাই যেন হয়। ছেলেটির মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছি না। এর কি কোন কাজ নাই। কথায় আছে কর্মাধীন ভগবান এবং কর্মহীন পশু।' একথা বলেই বাবা আবার মিস্ত্রিদের কাছে গেলেন পাছে তারা ফাঁকি দেয়।

পড়ান সবে শেষ হয়েছে, হঠাৎ একটা জোর আওয়াজে চমকে উঠলাম। তার সপ্তকে বাবার আওয়াজ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি বাবা এদিকেই আসছেন। বাবার আওয়াজে একটা কথাই শুনতে পারছি, 'ও যতীন, ও যতীন, ও যতীন।' এক নিঃশ্বাসে এই সম্বোধন করে বাড়ীতে ঢুকেই আমায় দেখে বললেন, 'এতক্ষণে ভেদ খুলেছে, কেমন এসে অবধি বলছে, আমাকে দর্শন করতে এসেছে, আর এইমাত্র এখন আমায় বলছে বাঁশী শিখবার বাসনা নিয়ে এসেছে। বগুড়ার লোকেরা বলেছে, বাঁশী শিখে এসে বগুড়ার নাম উজ্জ্বল করুক। কেমন, মিথ্যেবাদী প্রবঞ্চক, যার কথায় ঠিক নাই, তার বাবার ঠিক নাই। এখনি নিকালো, নিকালো, নিকালো। অবশ্য অতিথি, দুপুরে এই মুহূর্তে খাইয়ে ওকে বিদায় কর, তবেই আমি স্নান করব।' সেদিনকার সেই সামান্য মুখচোরা ছেলেটা কেমন করে এই অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছল, সেই রহস্যটা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। পরে বাবার কাছে সব শুনে জলের মত পরিস্কার হয়ে গেল। ছেলেটিকে দেখলাম বাবার এই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়েছে। ঘরে গিয়ে দেখলাম ছেলেটি কাঁদছে। মায়া হল ছেলেটিকে দেখে। কিন্তু কী করব? আমি তো নিরুপায়, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'বাবা মিথ্যা কথা একেবারে পছন্দ করেন না। প্রথম দিন তো বাবা এবং আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন কেন বলেন নি?'

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'প্রথম দিন বাবার দৃষ্টি দেখে সাহস করে বলতে পারি নি। এছাড়া মাসিক পত্রিকাটা পড়ে সাহস করে এসেছিলাম থাকা খাওয়া যখন ফ্রি, তাহলে শিখেই যাব।' আমি আর কথা বাড়ালাম না। বললাম, 'এখুনি আমি খাবার নিয়ে আসছি,

খেয়ে নিয়েই সাতনা চলে যান বাসে।' আমার কথা শুনে করুণ ভাবে ছেলেটি বলল, এই কথা শুনবার পর আর কি খাওয়া যায়?' উত্তরে একটি কথাই বললাম, 'না খেলে আরো খারাপ হবে।' ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাংস নিয়ে এসে ছেলেটিকে বললাম, 'শীঘ্র খেয়ে নিন।' ছেলেটির অবস্থা করুণ, যাকে বলে নাকের জলে চোখের জলে। এই অবস্থায় খাবার সম্পন্ন হলো। ছেলেটিকে বাসে উঠিয়ে চলে এলাম। মনে হলো একটি সংবাদ পত্রে কিংবা মাসিক পত্রে এরূপ ভুলসত্য ছাপা হলে, কত লোকের মনে ভ্রান্তি আসে, সে কথা কি কেউ একবার ভেবেও দেখে না?

রাত্রের ট্রেনে বাহাদুরকে আসতে দেখলাম। যেহেতু আগে দেখেছি, তাই চিনতে পেরে চলন্ত গাড়ীতেই উঠে পড়লাম, নিশ্চয়ই অনেক জিনিষ আছে। মৈহার স্টেশনে একটিই মাত্র কুলি সেই সময় যান বাহনের জন্য একটিই মাত্র টাঙ্গা। ট্রেন থেকে তাড়াতাড়ি সব জিনিষ নামালাম।

বাবার পুত্রবধূ জুবেদা খাতুন দুই ছেলে নিয়ে এসেছে। আগেই নাম শুনেছি প্রাণেশ এবং অমরেশ। প্রাণেশকে দেখতে একেবারে আলি আকবরের কার্বন কপি। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। প্রাণেশ এবং অমরেশ দুজনেই আমার কাছে এলো। মনে হলো যেন অনেকদিনের চেনা। যদিও খুব ছোট, ভাবলাম দুটি আরও ছাত্র হলো। এদেরও পড়াতে হবে। মনে যে রূপ অঙ্কিত হয়েছিল জুবেদা খাতুন সম্বন্ধে, ভিন্নরূপ দেখলাম। বাবা যদিও বলেছেন আমার জন্য পর্দানশীন নন, তাহলেও বাবার সামনে কথা বলা উচিৎ হবে না। এতদিনে বাবার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাটা বুঝতে পারি। টাঙ্গা এল একটু পরে সকলকে জিনিষপত্র দিয়ে টাঙ্গাতে উঠিয়ে দিয়ে বললাম, বাড়ীতে যেতে। আমি হেঁটেই বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করলাম। বাড়ীতে এসে দেখলাম, বাবা বাহাদুরকে উপরের নতুন ঘরে ঠিক করে দিয়েছেন। জুবেদা খাতুনকে দেখলাম দেড় হাত ঘোমটা। বাবা আমাকে বললেন, 'তোমার কত কষ্ট হল এই শীতে।' বাবার এই সব কথা আমার কাছে নতুন নয়। চা খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন বাবা চারদিনের জন্য রেওয়াতে ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে কমিশনারের নির্দেশে গেলেন। বাবা যাবার পরই মা'র পুত্রবধূ আমার সঙ্গে খুব সহজভাবেই এসে ছেলেদের পড়াই বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আলি আকবর আমার বিষয়ে খুবই প্রশংসা করেছে এ কথাও বললেন।

রান্নাঘরে মার কাছে আলি আকবরের সম্বন্ধে যে ভাষায় জুবেদা খাতুন বলতে লাগলেন সেটা সুখশ্রাব্য নয়। পরে মা আমাকে বললেন, 'দারোগার মেয়ে রাগী এবং জাতখুনী। আমার ছেলের জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছে।' রোজ এই ধরনের কথা শুনে মনে হোল, আকাশবাণীর কার্যক্রম সকালে এবং সন্ধ্যায় কিছুটা বিরতি দিয়ে অবিরাম চলেই যাচ্ছে।

আলি আকবরের একটা চিঠি পেলাম। আমাকে অনুরোধ করে লিখেছে, বাবাকে যে কোন প্রকারে একটু বোঝাতে। বুঝতে পারলাম না বাবাকে কি ভাবে বোঝাব। মৈহারে নানা সমস্যা। নিজের শরীরও ভাল যাচ্ছে না। এর পর কোথা থেকে নূতন একটা সমস্যা ঝড়ের মত এসে সব বিপর্যস্ত করে দিল।

বাবা মৈহারে ফিরে এলেন রেওয়া থেকে। বাবার কাছে শুনলাম, ব্যান্ডের বাজনা হয়েছে, বিদেশী সব হোমড়া চোমড়া লোক এসেছিল।

বাবার পুত্রবধূ আসাতে একটা সুরাহা হল। শুনলাম, মার বদলে জুবেদা খাতুন রান্না করছেন। যাক এবারে মা একটু বিশ্রাম পাবেন। কিন্তু মাও ঠিক বাবার মত। চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। কিছুনা কিছু কাজ করবেন।

জুবেদা খাতুন সবে দশ দিন মৈহারে এসেছেন। মামস্ হল। ডাক্তার এল। ঔষধ নিয়ে এলাম। এ বাড়িতে বার মাস রোগ লেগে আছে, সুতরাং হাসপাতালে যাওয়াটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

লেখাপড়ার প্রকরণ আমার সাথে সাথে শুরু হয়েছে। আমি বাজনা শিখি আর বাচ্চারা পড়ে। কোন নূতনত্ব ছিল না। সাধারণ মেধায় আশিস, ধ্যানেশের মধ্যে বেবী ছিল ব্যতিক্রম। যেমন ব্যতিক্রম ছিল শুভ। শুভ চলে যাওয়ার পর, জুবেদা খাতুন আসার পর, যেহেতু সাথে এসেছিল প্রাণেশ ও অমরেশ, আমার ছাত্রসংখ্যা তখন কুল্লে পাঁচ।

বাবার ছিল আজব বাই। অর্থাৎ কিনা যে জিনিষটা হবে সেটা নিখুঁত হওয়া চাই। বাচ্চারা পড়বে তাই তৈরী হল চেয়ার টেবিল। আমি পড়াব, সুতরাং গুরুর আলাদা চেয়ার। বললাম, 'এর দরকার কি?' তৎক্ষণাৎ সেই উত্তর, 'আরে না না, তুমি গুরু।' বাবার আয়োজন করে দেবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু অন্যের মন বসানর ক্ষমতা তো ছিল না। সেটা তো বাচ্চাগুলোর উপরে। ওরা তো সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। আকাশে ঘুড়ি উড়ছে দেখলেই মন ওড়ে। সব থেকে সরস ধ্যানেশের অবস্থা। বাবা ভোলানাথের মত ভোলা মন পেয়েছে। বেড়ালের মার সাড়ে তিন পা গিয়ে ভোলার মতন। যতই বকি, বেমালুম হজম। বড়দিনের সকাল বেলায় বেশ ভাল মেজাজেই পড়াতে বসেছিলাম। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মাস খানেক ধরে যা পড়িয়েছি, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে ধ্যানেশের জন্য। ধ্যানেতে সব অন্তর্ধান হয়েছে। কোন দিন যা হয়না তাই হলো। এ যেন উপজ অঙ্গের রাগ চাপল। হুড় হুড় করে টেনে নিয়ে গেলাম বাবার কাছে। বললাম, 'পাথর খুদলেও মূর্তি হয় কিন্তু এ তার থেকেও বেশি নিরেট।' আবেগের মাথায় আরও কয়েকটা জড়ত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছিলাম। হঠাৎ টনক নড়ল। বোধহয় বেশি করে ফেলেছি। হাজার হোক বাবা নাতিদের সম্পর্কে কতটা গ্রহণ করবেন আমি জানতাম না।

বাবা, কে জানে কেন, আমাকে পড়াতে বারণ করলেন, কিন্তু যা কখনও হয় নি। তাই হলো। দুপুর বেলায় স্নানের আগেই আমাকে যন্ত্র নিয়ে যেতে বললেন। শেখাবেন, আমার কাছেও আশ্চর্য ঠেকল, কেননা গত দুই বছর এসময়ে কাউকে শেখাতে দেখিনি। পর পর কয়েক দিন সকাল বিকেল শিক্ষা চলল। বুঝলাম, যাতে বাচ্চাদের পড়া নিরবচ্ছিন্ন থাকে এটা হল তার ইনসেনটিভ।

বিবাহ ব্যাকুল আলি আকবরকে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলাম, নব পরিণয়ের আদৌ আবশ্যকতা আছে কিনা? আলি আকবরের লয়কারী জবাব নাই। চিঠির উত্তরে এমন সম বিষমের গৎ এর মত উত্তর দিল জুবেদা খাতুনকে, যে সে বেচারী ভ্যাবাচ্যাকা। আর আমাকে

জানাল চিঠি পেয়েছে। সেটাও সোজাসুজি নয়। জুবেদার সৌজন্যে। যাক জটিল পরিস্থিতিতে বাষ্পের চাপ কম কি করে করতে হয়, সেটা আলি আকবর বোঝে। টাকার কৈবল্যভার, এ এক অনন্তরূপ। যতই দেখি বিস্ময়ে মরি। পাঁচশ টাকা এল বাবার নামে। যদিও মায়ের হাত হয়ে জুবেদা খাতুনের করতলগত হল তথাপি বাবা খুশী। ছেলে টাকা তো পাঠিয়েছে। বাবা নিজের মনে আমাকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার জীবন আর আমার দুঃখের কথা কাকে বলব। এক খুদা ব্যতীত কেউ জানে না।' বাবার দুঃখটা বুঝি। বাইরে সুখ কিন্তু ভেতরে দুঃখ।

বাবা রেডিওতে গেলেন বাজাতে। বছরের শেষ হতে এক দিন বাকী। সুরশৃঙ্গারে বাবা বাজালেন শুদ্ধ কল্যাণ। জোড়ের সময় আবেগেতে গাইতে লাগলেন, সীতারাম সীতারাম বলে। সেই পর্যায়ে যদি ওঠা যায়, তা হলে শিল্পীর উপর কোন বাধা নিষেধ কাজ করে না, কারণ সে আর শিল্পী থাকেনা, সে হয় স্রষ্টা। আর স্রষ্টা নিয়ম সাপেক্ষ নয়।

এক ঘটনাবহুল ইংরাজী সাল তামামী হল। মনে মনে ভাবলাম, আবার কোন এভারেস্টের চুড়ো সামনে আছে জানি না।

২৪

কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে। আমার সবুরের সাতাশ মাস পার হয়েছে। বাবার যেহেতু কোন বন্ধু ছিল না, তাই বহু সোজাসুজি চিন্তা, সোজাসুজি ভাষায় বাবা করতে পারতেন না। তবুও চন্দন গাছে বেল গাছ পেয়ে পেয়ে একটু গন্ধ হয়েছে। বাবাও আংশিকের আংশিক মনের কথা মাঝে মাঝে বলে ফেলেন। শুনেও ভাল লাগে কিন্তু প্রমাদ গুনি, কারণ কথাগুলো হয় দুমুখো গৎ-এর মত। কখনও ঝিকে মেরে বৌকে শেখান, আবার কখনও বৌকে মেরে ঝিকে শেখান। যাকেই শেখান শিক্ষার ফাঁকে বুঝতে পারি এ এক অসাধারণ বহুদর্শিতা। এ বই পড়ে আল্পস পর্বত পার হওয়া নয়। এ নেপোলিয়নের পদযাত্রার অভিজ্ঞতা। নিটোল, নিখুঁত, আর বাস্তবানুগ। মাঝে মাঝে আমার বয়সটা হয়ে দাঁড়ায় বিড়ম্বনা। জীবনের দুরূহ কিন্তু কঠিন সত্যকে বাবা যেভাবে সোজাসুজি রাখেন প্রায় বেসামাল হয়ে পড়ি। এ এক বিচিত্র মানুষ।

মৈহার থাকাকালীন একটা কথা, তিনবার তিনটি প্রসঙ্গে বাবা আমাকে বলেছিলেন। আজ প্রথম বললেন, 'বাবা রূপ দেখে গেছো পাগল হোয়ো না। শতবর্ণ গাভীর কোন মূল্য নাই যদি দুধ না দেয়। কিন্তু লোকে এই শতবর্ণ গাভীর পেছনেই দৌড়ায়। কথায় আছে 'কাম প্যারা চাম প্যারা নয়' অর্থাৎ যে রমণী কর্মঠ এবং সম্পূর্ণের অধিকারী, সেই রমণীকেই নির্বাচন করবে যার মধ্যে সঙ্গীতের প্রেম আছে। যে রমণী দেখতে অপরূপ সুন্দরী কিন্তু নড়তে পারেনা, সঙ্গীত শুনলে যার মাথা খারাপ হয়ে যায়, যে মেয়ে সিনেমার গানের জন্য পাগল, কোন সঙ্গীত শিল্পীর সেই প্রকার রমণীকে নির্বাচন করা উচিত নয়। আগেকার কালে রমণীরা অন্য জাতের হতো তাই অসুবিধা হতো না তাদের মানিয়ে নিতে, কিন্তু বর্তমান যুগে যে হাওয়া চলছে, তাতে যারা সঙ্গীতের সেবা করছে, তাদের স্ত্রী নির্বাচন অতি অবশ্য ভেবে চিন্তে করতে হবে। এই কথাটা মনে রেখো এবং অন্যকে বুঝিও।' বুঝলাম বাবা এ কথা কেন বললেন।

বাবার পুত্রবধূ এলেন, যার সম্বন্ধে যদিও একতরফা কিছু শোনা আছে, সেটা বড় কথা

নয়। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'কিউরিঅসিটি ইজ্ এ ফেমিনিন ভাইস্।' কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম কথাটা বাবার পুত্রবধূ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাবার সামনে দেড় হাত ঘোমটা কিন্তু বাবার অবর্তমানে আমাকে বললেন, 'আমি কারো সামনে বেরোই না কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু আপনি আমার ছেলেদের ও মেয়েকে পড়াচ্ছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি বলেই সব কথা বলছি।' সেই যে শুরু হলো তার আর শেষ নাই। লেখাপড়াহীন শূন্য জীবনে অনেক কিছু দেখে এবং শুনে অভিজ্ঞতা হয়েছে। অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছে। পাঁচটি সন্তানের জননী। ছোটবেলা থেকে বর্তমান পর্যন্ত আলি আকবরের সব কাহিনী, মৈহারের বাঙ্গালি কয়েকটি পরিবারের কাহিনী, রবিশঙ্করের কাহিনী, পূর্বে এবং বর্তমানে বাবা এবং মায়ের কাহিনী সব শুনে আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হলো। এও কি হয়? কি জানি, মনে হয় মানুষ নিজের সংসারে ত্রুটি বিচ্যুতির চাইতে, পরের সংসারের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির বা অঘটন নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে বড় ভালবাসে। কি জানি কেন আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের বিরুদ্ধে কোন খরাপ কথা শুনতে ভাল লাগেনা, তাই সব শুনে একটি কথাই বললাম, 'যা হবার হয়ে গিয়েছে সে ভেবে আর কি লাভ? কবর খুঁড়বেন না। কবর খুঁড়লে পোকাই বেরুবে, সুতরাং মাটি চাপা দিয়ে দিন। এটা করতে পারলে মনে শান্তি পাবেন।'

দশই জানুয়ারী আলি আকবর আসবে। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার মেজাজ খুব ভাল। বাবা গেছেন বাজারে। হঠাৎ ধ্যানেশকে হাতা দিয়ে জুবেদা খাতুন এত জোরে মারলেন যে ভাবা যায় না। এ এক আলাদারূপ জুবেদা খাতুনের। কি অপরাধ? কেন মারলেন? আসলে ঠিক মত লেখাপড়া করছেনা বলেই মার? একটা কথাই কেবল বললাম, 'দয়া করে ছেলেদের মারবেন না। শাসন নিশ্চয়ই করবেন। বাবা আশিসকে মারেন তার একটা কারণ আছে। বাবার মত পারদর্শীর নূতন শিক্ষার্থীকে শেখান কষ্টকর। সেইজন্য হাত চলে। কিন্তু আপনার সেটা শোভা পায় না। আমার উপর যখন ভার দেওয়া হয়েছে সেটা আমিই বুঝবো।' ছেলেকে এরকম অকারণে হাতা দিয়ে মেরে, বোধ হয় নিজের ভুল বুঝেছেন, তাই চুপ করে রইলেন।

আলি আকবর এল। ছেলের প্রতি বাবার কি অপত্য স্নেহ বুঝলাম। এবারেও সেই একই ধরনের প্রশ্নোত্তর। সন্ধ্যার সময় এ্যালাবিয়া সাহেবের অনুরোধে আলি আকবর এবং আমি 'দাস্তান' সিনেমা দেখতে গেলাম। রাত্রে খাবার সময়ে বাবা আমার খুব প্রশংসা করলেন আলি আকবরের কাছে। উপরের ঘরে আলি আকবরের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো। তাঁকে বললাম, মাঝে মাঝে আসতে এবং টাকা পাঠাতে। বাবার মেজাজ তাহলে ভাল থাকবে। আমাদের সকলের হবে উপরি পাওনা, বাড়িতে বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে। আলি আকবর বলল, তার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যোধপুর ছেড়ে বম্বে গিয়ে এক একদিন এমনি হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গাড়ি পার্ক করিয়ে সময় কাটিয়েছেন। একথা শুনে কষ্টই হলো। কথা প্রসঙ্গে বাবার কথা বললাম। 'মেয়ে দেখে গেছো পাগল হয়ো না।' আলি আকবর চুপ করে শুনে আমাকে বলল, 'ধর্মগুরু টাট বাবার অনুমতি নিয়ে বিয়ে করবো।' আমাকে একটা বই দিল পড়বার জন্য এবং বলল, বইটা পড়ে যেন বাবাকে দিই এবং বোঝাই। বইটা নিয়ে নিচে চলে

এলাম। রাত্রে এক নজরে হিন্দী বইটা পড়লাম। বইটার প্রতিপাদ্য বিষয় ভদ্রঘরের একটি মেয়ে কি করে বারবনিতা হলো। শেষে একজন সহৃদয় পুরুষ সব জেনে শুনেও তাকে বিয়ে করে সমাজে স্থান দিল। সকালে উঠেই আলি আকবরকে বইটা ফেরত দিয়ে বললাম, 'এ বই বাবাকে দিতে পারব না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বইয়ের সঙ্গে কি আপনার বিবাহের মিল আছে?' উত্তরে একটি ছোট 'হুঁ' শুনে, আমার চোখ কপালে উঠল। সকাল দশটার ট্রেনে আলি আকবর জব্বলপুরে চলে গেল।

বাবার কোমরে ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও দলাই মালাই করে দিলাম। নিয়মিত হাত এবং মাথার নিচে ম্যাসাজ করি। বাবার এই মাসাজে মৃদু আপত্তি করলেও, কোমরে কিংবা পায়ে কিছুতেই ম্যাসাজ করতে দিতেন না। জোর করে করতাম। বাবার মৃদু আপত্তি, সেই এক কথা, 'ব্রাহ্মণ হয়ে এই কাজ করে আমাকে পাপের ভাগী করছ।'

আলি আকবরের যাবার পরই মার হঠাৎ বমি শুরু হয়ে গেল। বাজারে যাবার সময় পুত্রবধূ দেড় হাত ঘোমটা দিয়ে বাবাকে মার জন্য জর্দা আনতে বললেন। মার নেশা বলতে একটিই। পান ছেঁচে একটি টিপ জর্দা দিয়ে পান খাওয়া। জর্দার কথা শুনে বাবার একটি কথা কেবল শুনতে পেলাম। 'বমি হচ্ছে অথচ জর্দা চাই।' সন্ধ্যার সময় মা ঠিক হয়ে গেলেন।

কিছু দিন ধরে দেখছি আশিস যেন একটু মাতব্বর হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তার কারণ বুঝলাম। আলি আকবর সম্বন্ধে সব গল্প আশিসকে তার মা বলেছে, এটাই এখন রোজকার কাজ। আমার সামনেই একদিন যে ভাষায় ছেলের কাছে তার বাবার সম্বন্ধে বলতে শুনলাম, হঠাৎ মাথা গরম হয়ে উঠল। আমার একটা খারাপ স্বভাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটু জোর মন্তব্য করি। সেটা যে অন্যের পক্ষে কতটা অসহ্য তা মনে থাকে না। পুত্রকে এ কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? ছোট ছেলের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে? জুবেদা খাতুনকে বোঝালাম, এই সরল শিশুর সঙ্গে বন্ধুর মত গল্প করবার সময় হয়নি। ছেলে বড় হলে বন্ধুর মত সব কথা বলা যায় কিন্তু তাই বলে এই ভাষায়! ভাষাটা মার্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু যে ছোটবেলায় কোন শিক্ষাই পায়নি, সে মার্জিত থাকবে কি করে? তবে একটা কথা ঠিক, আমি কিছু বললে চুপ করে যান।

টেলিগ্রাম এল। রবিশঙ্কর জানিয়েছে একুশে জানুয়ারী মৈহার আসছে শুভ এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে। বাবার খুব খুশী খুশী ভাব দেখলাম। বাবার মুখে কয়েকবার শুনলাম 'আমার অন্নপূর্ণা মা আসছে। এবারে আমার সময় ভাল আসবে।' উপরে চাকরকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে ঘর পরিষ্কার করালেন। মনে ভাবলাম অন্নপূর্ণা দেবী এলে বাবার মেজাজও ভালো থাকবে। বাবার অবর্তমানে আমার শিক্ষাও হবে।

নির্দিষ্ট দিনে স্টেশন গেলাম। রাত্রি বারটার জায়গায় দুটোয় গাড়ি এল। সব জিনিষপত্র নামাতেই রবিশঙ্করের প্রথম প্রশ্ন, 'বাবার মেজাজ কেমন?' বাবার কথা বললাম। শুভকে দেখলাম একটু লম্বা হয়েছে। শুভ এখন দশ বছরে পড়েছে। পরের দিন সকালেই ব্যাণ্ডপার্টির সকলে বাড়িতে এসে হাজির। বাবার কাছে শুনেছেন অন্নপূর্ণা দেবী আসছেন, তাই সকলে এসেছে। বাবার মেজাজ খুব ভাল। একটা জিনিষ আমার মনে হয়েছে অন্নপূর্ণা দেবীর চরিত্রে এমন জিনিষ আছে যা সচরাচর দেখা যায় না। সেটা হল তার আচরণে

শালীনতা আছে, সঙ্কোচ নেই। তার কথায় সরসতা আছে, প্রগলভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সকলেই তার ব্যবহারে আকৃষ্ট। যখনই তিনি আসতেন বাড়িতে যেন নূতন সজীবতা দেখা দিত। বাবার অপত্য স্নেহটা প্রকট হয়ে দেখা দিত বার বার। এবারে রবিশঙ্করের সঙ্গে চারটে দিন অনেক কথা হোল। দুপুরে দু'ঘণ্টা এবং রাত্রে দু'ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যায় বুঝতে পারি না। এই চার দিনে রবিশঙ্কর নিজের জীবনের যে কাহিনী শোনান, তার কিছুটা জুবেদা খাতুনের কাছে শুনেছি। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে জুবেদা খাতুনকেই দায়ী করল নিজের জীবনের অশান্তির জন্য। রবিশঙ্কর নিজে থেকেই বলল, 'তোমাকে আগেই বলেছি কি ভাবে আমি মানুষ হয়েছি। আমি চাই আজকের যুগে একটু আলট্রা মডার্ণ হতে, কিন্তু অন্নপূর্ণা বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। কারো সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। আসলে ও হল খুব জেদী। দেখ জীবনে বিয়ের একটা বছর খুব ভাল কাটল। আমার বিয়ের সময় জুবেদা ছিল না তাই রক্ষে। কারণ বাবা সেই সময় জুবেদাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার জীবনের পাষ্ট হিস্ট্রি আলি ভাইকে সব বলেছি। আলি ভাইও এমন, নিজের স্ত্রীকে সে সব কথা বলেছে। বিয়ের এক বছর পর শুভ হয়েছে। তার কিছুদিন পর জুবেদা সুন্দরী মৈহারে ফিরে এল। সে সময় অন্নপূর্ণা অত্যন্ত সরল ছিল। ছোট থেকে সে বাবা এবং ভাইকে দেখেছে। অন্য মেয়ের সঙ্গে যে একটা সম্বন্ধ থাকতে পারে, এটা অন্নপূর্ণার কল্পনার বাইরে। সেই অন্নপূর্ণাকে জুবেদা আমার জীবনের সব ঘটনা বলে দিল। আমার সুখের সংসারে আগুন লাগিয়ে দিল। আমার সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধই ত্যাগ করল। যদিও আমি অপরাধ করেছি তা বলে তার ক্ষমা নেই? রাগ করে কিছুদিন আলি ভাইয়ের কাছে লক্ষ্ণৌ চলে গেল। বাবার কথা ভেবে পরে এলেও সেই জিনিষ আর রইলো না। এ কথা ঠিক, সাধু প্রকৃতির লোক বলে আমি এক মুহূর্তের জন্য দাবী করি না। তবে একেবারে প্রথম নম্বরের দুর্বৃত্ত বললেও আপত্তি করব। আমাকে চরিত্রবান বললে গালি দেওয়া হয়। চরিত্রহীন আমি নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে দুশ্চরিত্র নই। চরিত্রহীন অথচ দুশ্চরিত্র নয় এর কি অর্থ আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার চরিত্রের এই খবরটুকু জানা আছে বলেই, বোধ হয় বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাড়ির মত আরও অনেক বাড়িতে আমার অবাধ প্রবেশ আছে।' এ কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে বাবা একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রত্যেক চিঠি বাবা আমাকে দেখান, বানান শুদ্ধ করে দেবার জন্য, কিন্তু শুদ্ধ না করলেও বাবার কথামত বাবার কোন চিঠিই আমার কাছে গোপন নয়। সেই চিঠিতে বাবা লিখেছেন, 'ভাই সাহেব, আদাব। আমার জামাই রবুর চরিত্র ভাল নয়। সে প্রজাপতির স্বভাব পেয়েছে। শুনেছি আপনার কাছে কখনও যায়। গেলে ক্ষতি নাই কিন্তু দয়া করে নিজের বাড়িতে রাখিবেন না।' এ ধরনের চিঠি যে বাবা লিখতে পারেন এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। রবিশঙ্করের এই দোষ কিছু শুনেছি। কিন্তু রবিশঙ্কর একনাগাড়ে বলে যেখানে শেষ করল, সে সময় বাবার এই চিঠির কথা আমি বললাম না। আজ পর্যন্ত কখনও বলিনি পাছে মনে কষ্ট পায় এবং বাবাকে ভুল বোঝে।

রবিশঙ্কর আমার অবাক চাহনি দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ?' উত্তরে বললাম,

'কিছুনা, শুনছি আপনার কথা।' এমন সময় ধোপানি এল কাপড় নিতে। রবিশঙ্কর জামা পায়জামা গেঞ্জি সবই কাচতে দিলো। শুনলাম রবিশঙ্কর দুই বেলা এক গেঞ্জি পরে না। ধোপানির দিকে রবিশঙ্করের তাকান দেখে, অন্নপূর্ণাদেবী হঠাৎ বললেন, 'কি ভাবছ? অগ্রিম টাকা দেবে নাকি? তোমার তো অনেক পুরানো ধোপানি।' কথা শুনে রবিশঙ্করের দেখি মাথা নিচু। মনে হলো চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। মিন মিন গলায় রবিশঙ্কর বলল, 'তুমি ওকে কিছু টাকা দাও।' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'ইচ্ছে যখন নিজে হাতেই দাও।' এবারে রবিশঙ্করের মুখ দেখবার মত। ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটুও দেরী হল না। আজ বুঝলাম তার পাষ্ট হিস্ট্রি। মনে হলো ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে রবিশঙ্কর ভুগছে। পরে রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'যতীন তোমার কথা অন্নপূর্ণা খুব মানে। যেহেতু বাবাকে এত সেবা কর, ছেলেদের পড়াও, এজন্য অন্নপূর্ণা খুব কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। তাই বলছি তুমি ওকে একটু বুঝিও যাতে একটু এ্যাডজাস্ট করে নেয়।' কথা ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা কথা বলুন তো, এখনো কি হিস্টিরিয়া হয়? কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে কি দেখিয়েছেন?'

রবিশঙ্কর বলল, তুমি তো জান না, আমার কথায় কোন পাত্তাই দেয় না। ডাক্তার কিছুতেই দেখাবে না। একবার 'না' করলে 'হ্যাঁ' করান আমার পক্ষে অসম্ভব। হিস্টিরিয়া এখনও হয়। ডাক্তার ওষুধ দিলে, যে কোন রোগই হোক না কেন, একদিন খেয়ে আর খাবে না।' অবশ্য এ জিনিষটা আমার দেখা আছে। কিন্তু কেন? স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে তখন যতটুকু জেনেছিলাম, তা টাকায় এক নয়া পয়সা জেনেছি। জানলাম অনেক কিছু, সে তো অনেক পরে।

রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হলেই আদিরস নিয়ে গল্প হয়। নানা মুখভঙ্গি করে যেভাবে সে আদিরসের গল্প করে হাসতে হাসতে প্রাণ যায়। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে অন্নপূর্ণাদেবীর আওয়াজ শুনতে পাই। 'কিসের এত হাসি? একটা ভাল ছেলেকে পাকান হচ্ছে বুঝতে পারছি?' অবাক হই রবিশঙ্কর একেবারে চুপ। তা বলে গল্প শেষ হয় না। গল্প চলে, অন্নপূর্ণা দেবী আর কিছু বলেন না।

মনে পড়ে গেল বাবার পুত্রবধূর কথা। প্রথম প্রথম এসে আমাকে বলেছিলেন, রবিশঙ্করই আলি আকবরকে নষ্ট করে দিয়েছে। রবিশঙ্কর যখন শিখতে আসে, তখন আলি আকবর খাবার পর রোজ রবিশঙ্করের বাড়ি চলে যেত। রবিশঙ্করকে বাজনা শেখাত, তার পরিবর্তে রবিশঙ্কর আদিরসে পাকা করে দিল। একথা যখন শুনেছিলাম বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু আজ মনে হোল কথাগুলো যা বলেছিল তা সত্যি। যোগ বিয়োগ মিলে যাচ্ছে। যদিও রবিশঙ্কর আমাকে বলেনি যে আলি আকবরকে আদিরসের তালিম দিয়েছে এবং তার পরিবর্তে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছে। মনে পড়ছে জুবেদা খাতুনের কথা। আলি আকবর ও অন্নপূর্ণা দেবী তখন যা বাজাত, তার কাছে রবিশঙ্কর ঠিক তেমনি, যেমন আশিস বাবার কাছে।

রবিশঙ্কর এবার দুদিন বাবার কাছে 'যোগ' এবং 'কামোদ' শিখল। যদিও আমি শিখিনি কিন্তু এখন এতটা হয়েছে যে শুনেই প্রায় শিক্ষা হয়ে গেল। অবশ্য এর কৃতিত্ব অন্নপূর্ণা দেবীরই।

বাবা কিন্তু জামাই এসেছে বলে আমাকে বললেন, 'বুদ্ধাকে বল মুরগী হালাল করে নিয়ে আসতে।' রবিশঙ্কর যখনই আসে, হরলিকস, ওভালটিন, সিগার নিয়ে আসে। অন্নপূর্ণা দেবীই কিন্তু হাতে করে দেন। বাবা হরলিকস বা ওভালটিন কখনও কেনেন না। খাবার পর অন্নপূর্ণা দেবী যখন দিনে হরলিকস এবং রাত্রে ওভালটিন দেন, বাবা বলেন, 'এটা কি?' বেশ রসিকতা হয়। একজন নাম বলেন, অপরজন বলেন, 'আরে আরে এসব দামী জিনিষ নিয়ে এসেছ কেন?' বাবার প্রশ্নের উত্তরে শুনতে পাই বয়স হয়েছে, এগুলো খাওয়া ভালো।

যাবার আগের দিন রবিশঙ্কর একটা ক্যামেরা আমাকে দিয়ে বলল, 'অন্নপূর্ণার একটা আলাদা ফটো উঠিও। অবশ্য ছেলেদের ও জুবেদারও কয়েকটা উঠিও। আসলে আমি কতকরে বলি কিন্তু কিছুতেই ফটো ওঠাবে না। তুমি বললে না করতে পারবে না।' এ কথা শুনে আমি তো অবাক। ক্যামেরা অবশ্য আমি দেখেছি কিন্তু কি করে ফটো ওঠাতে হয় আমার অজানা। রবিশঙ্কর বুঝিয়ে দিল রোদ থাকলে কি ভাবে ফটো ওঠাতে হবে। সব বুঝিয়ে রবিশঙ্কর আমাকে বলল নেগেটিভ সাতনা থেকে ডেভেলপ্ করিয়ে রবিশঙ্করকে যেন পাঠিয়ে দি। কিন্তু আমার হলো সমস্যা। রবিশঙ্করকে যখন ফটো ওঠাতে দেন না তা হলে আমাকে অনুমতি দেবেন কেন? বাজনা শিখবার সময় অন্নপূর্ণা দেবীকে বাবার মতই রাগী মনে হয়। আমি তখন কেঁচোর মত। কিন্তু আমি যখন পড়াই, তখন কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর আলাদা রূপ। ছাত্রীর মত। তখন আমি অনেক কথা বলি। চুপ করে শোনেন। দেখি ফটো ওঠাতে পারি কিনা। মনে সংশয় হয় ফটো না হয় ওঠালাম কিন্তু কোন কারণে যদি ঠিক মতো না ওঠে। ফটো ওঠানো একটা নেশা, এ নেশা আমার কখনও ছিল না এবং পরেও কখনও হয়নি। খেলার এক নেশা ছোট থেকে। মৈহারে এসে ফুটবল, হকি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলেছি এবং রোজ খেলেও থাকি কিন্তু ফটো ওঠানর আর্টকে বুঝতে একটু সময় লাগল।

রাত্রে রবিশঙ্কর বৌ বলে ডাকল জুবেদা খাতুনকে। দেখলাম খুব মাইডিয়ার ভাব। স্বাভাবিক। যতই হোক শালার বৌ। রবিশঙ্করের হয়ে ওকালতি করতে দেখলাম জুবেদা খাতুনকে। অন্নপূর্ণা দেবীকে বোঝাতে লাগলেন, কেন রবিশঙ্করের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন। রবিশঙ্কর এবং জুবেদা খাতুন দুজনে এক হয়ে গিয়ে, যেন ছোট মেয়েকে বোঝাচ্ছেন। আমি নীরব দ্রষ্টা। অন্নপূর্ণা দেবী, মনে হল এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। আমার মনে হ'ল মানুষের বিশ্বাস ভাঙ্গার মত ট্র্যাজেডি আর কিছু নাই। যার জন্য এই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। রবিশঙ্করকে একটা কথাই বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, বরাবরই আপনি কেন পলিগেমাস? এটাও একটা মানসিক রোগ। এখনও সময় আছে, আপনি নিজে একটু এ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন না?' বুঝলাম কথাটা রবিশঙ্করের মনঃপূত হল না। কিন্তু কি করব? আমি যা ভাল বুঝি স্পষ্ট মুখের ওপরই বলি, পেছনে নয়।

দেখতে দেখতে ২৬ শে জানুয়ারী এসে গেল। রিপাবলিক ডে'র জন্য বাবা রেওয়া গেলেন ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে আর রবিশঙ্কর পাটনায় যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল। স্টেশনে রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'বৌ থেকে সাবধানে থেকো, নইলে কি হবে ভাবতে পারবে না।' একথা শুনে

আমি তো অবাক। এ কোন ডুপ্লিসিটি। এ যাবৎ তো আমার সঙ্গে খুব ভালই ব্যবহার করেছেন জুবেদা খাতুন, কিন্তু রবিশঙ্কর নানাভাবে আমাকে সাবধান কেন করল? রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরের আমি একজন ব্লাইণ্ড সাপোর্টার। রবিশঙ্কর যখন একথা বলল, নিশ্চয়ই আমার ভালোর জন্যই বলল। সাবধান থাকব। কিন্তু মাথায় কিছুতেই এলো না জুবেদা খাতুন আমার কি করবে? সাবধান কি অর্থে? ঠিক স্পষ্ট হল না। রাত্রে বাবা ফিরে এলেন।

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার বলেছে এনিমিয়া। রিয়াজ ঠিক মত হচ্ছে না। চোখে পড়েছে ঠিকই। অন্নপূর্ণা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক করে রিয়াজ কেন করছেন না।' বললাম অসুখের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিসের শরীর খারাপ? বাজালেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। না বাজাবার জন্য বাহানা।' এ কথা শুনে আমি তো অবাক। যদিও মাথা ব্যথা তবু আজ খুব বাজালাম।

আজ সরস্বতী পূজা। জানতাম না গতকাল বাবা নূতন কাপড় এনেছেন আমার জন্য। সকালেই পুজোর আগে দিলেন। পুজো করতে হোল। মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে করি কিন্তু কি করব উপায় নাই। বিকেলে অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে একটা ফর্দ দিলেন কিছু জিনিষ কিনে আনবার জন্য। দেখি লেখা আছে, চা, বিস্কুট, ছেলেদের লজেন্স, প্রসাধন সামগ্রী। বুঝলাম বাবার অর্দ্ধেক খরচ কমে গেল। যাক বাবার মেজাজ ভাল থাকবে।

১৯৫০ সনে নিখিল ৫ মাস থেকে চলে গিয়েছিল। তারপর কখনও কখনও চিঠি দিয়েছে আসবার জন্য অনুমতি চেয়ে। বাবা না করে দিয়েছেন। দু বছর পর আবার নিখিলের চিঠি এল। বাবা অনুমতি দিলে সে আসবে। সঙ্গে বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর একটা সুপারিশ পত্রও এসেছে। সুপারিশ পত্রটি পড়ে, বাবা বললেন লিখে দিতে মৈহারে আসবার জন্য।

আজ খুব মন দিয়ে আট ঘণ্টা বাজালাম। না বাজালে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে সুমধুর বাণী শুনতে হবে।

হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা এলেন। বাবা প্রায় সকল মহিলাদের ধর্ম মেয়ে বলেই সম্বোধন করতেন। সেই হিসেবে ধর্ম ছেলে, ধর্ম জামাই, ধর্ম নাতির শেষ ছিল না। যে ভদ্রমহিলা এলেন, বাবা তাকে ধর্ম মেয়ে বলেই সম্বোধন করলেন। যেহেতু ধর্ম মেয়ে সুতরাং তার স্বামী হল জামাইবাবা। ধর্ম মেয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে জুবেদা খাতুন শুরু করলেন আরব্য উপন্যাস। অন্নপূর্ণা দেবীও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। জুবেদা খাতুন বললেন, 'এই ভদ্রমহিলাকে একদা ঝাঁটা পেটা করে দিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিলাম বাবা এবং তার পুত্রের উপস্থিতিতে।' হয়তো এ ব্যাপার নিয়ে অনেক জল ঘোলা হ'তো কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ সব কথা উঠিয়ে লাভ কি?' জুবেদা খাতুন চুপ করে গেলেন।

আজকের দিনটা স্মরণীয়। রবিশঙ্কর ক্যামেরা দিয়ে গিয়েছিলেন। কি করে কথাটা উত্থাপন করব ভেবে পাই না। রবিশঙ্করকে ফটো ওঠাতে দেন না অথচ আমাকে কেন ওঠাতে দেবেন অন্নপূর্ণাদেবী? রবিশঙ্করের যুক্তি, যেহেতু বাবার সেবা করি, ছেলেদের পড়াই এবং অন্নপূর্ণা দেবীকেও পড়াই তাই আমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি তো লক্ষগুণে, কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। হতে পারে অন্নপূর্ণা দেবী আমার কাছে কৃতজ্ঞ বলে আমার কথা শুনবেন

কিন্তু এই আনডিউ অ্যাডভানটেজ আমি কেন নেব? আমি হলাম, এক নম্বরের যাকে বলে সেন্টিমেন্টাল ফুল। যদি আমার কথায় না করে দেন, তা হলে সেটা হবে মৃত্যুর সমান। অন্তর্দ্বন্দ্বে যখন বিপর্যস্ত তখন মনে পড়ে গেল রবিশঙ্করের অনুরোধ।

আমার একটা স্বভাব ছোটবেলা থেকেই ছিল। যাকে যা বলবার, ভনিতা না করে এক কথায় স্পষ্ট করে বলা। কিন্তু আজকের কর্মাশিয়াল যুগে আমি অচল। সেটা হচ্ছে কথার মার প্যাঁচ। ভনিতা করে এদিক ওদিক কথা বলে, সন্তুষ্ট করে নিজের কার্যোদ্ধার করা, যা আজকের যুগের ধর্ম। আজ এই পরিণত বয়সে সেটা উপলব্ধি করেছি কিন্তু এখনও তাকে আয়ত্ব করিনি কেননা মনে হয়েছে এটা হল ডুপ্লিসিটি। যে সময়ের কথা বলছি তখন এ জ্ঞান ছিল না কিন্তু সে দিন যা করেছিলাম আজও তাই করি।

যাক যে কথা বলছিলাম। মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে সোজা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে গিয়ে বললাম, 'একটা অনুরোধ করব, রাখবেন?' একটু অবাক হয়ে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি এমন কথা?' আবেগের সঙ্গে বললাম, 'এমন অনুরোধ করবনা যাতে আপনার কোন ক্ষতি হয়। তবে অনুরোধটা না রাখলে মনে কষ্ট পাব।' একটু থতমত খেলেন অন্নপূর্ণাদেবী। বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'এবার গড় গড় করে রবিশঙ্করের সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, সব কথা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম। আমার সত্য কথা বলায় মনে হোল একটু দ্রবীভূত হয়েছেন। যদিও প্রথমে আপত্তি করলেন পরে রাজী হলেন। তবে হুঁশিয়ার করে বললেন, 'এ ধরনের অনুরোধ আর ভবিষ্যতে কখনও করবেন না।' আমি তাঁর সেই হুঁশিয়ারি ভুলিনি। জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ ফটো ওঠানো। প্রথমে অন্নপূর্ণা দেবীর ফটো ওঠালাম। তারপর জুবেদা খাতুনের সঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবীর ফটো ওঠালাম। আমার খুব ইচ্ছা ছিল ছেলেদের সঙ্গে একটা ফটো উঠাই। কিন্তু কে উঠাবে? জুবেদা খাতুন আমার এবং শুভর ফটো ওঠালেন। কিন্তু সেই ফটোগুলোর মধ্যে প্রায় সব ভাল উঠল না। একটা ফটো কোনমতে উতরাল। কথা ছিল নেগেটিভগুলো রবিশঙ্করকে পাঠিয়ে দেব। আমার বন্ধু কালিয়া সাহেব সাতনা থেকে পরের দিন ফটো প্রিন্ট করে আমাকে দিল। রবিশঙ্করকে ফটো পাঠিয়ে দিলাম।

পরের দিন লক্ষ্ণৌ থেকে একটি ছেলে এল। নাম সন্তোষ প্রামানিক। বাবা লক্ষ্ণৌ গেলে বাবার খুব সেবা করত। বাবার কাছে এসেছে গান শিখতে। বাবা প্রথমে বলেছিলেন লক্ষ্ণৌতে কোন গায়কের কাছে শিখতে। কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা দেখে বাধ্য হয়ে গান শেখাতে শুরু করলেন। ছেলেটিকে গান শেখাতে গিয়ে কয়েকটি পাল্টা দিলেন। প্রথম দিনেই বাবার যা মূর্তি দেখলাম মনে হোল এই বুঝি মার খাবে। বাবার কেবল একটিই কথা, 'ত্যক্ত করে মারল।' বাবা আমাকে বললেন, 'এর ব্যবস্থা একটু করে দাও মঠে, যেখানে থাকা খাওয়ার কোন পয়সা না লাগে।' তিন দিনের মধ্যেই ছেলেটির সব ব্যবস্থা করে দিলাম মঠে। বাবা ছেলেটিকে একটি নূতন ধুতি এবং বারো টাকা দিয়ে মঠে স্থানান্তরিত করলেন। ছেলেটি চলে যাবার পর বাবা বললেন, 'লক্ষ্ণৌ গেলে আমাকে খুব দলাই মালাই করে দিত। লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে পড়ত। অত্যন্ত গরীব ছেলে। কিন্তু এ কি গান শিখবে? ছেলেটির ভবিষ্যতে দুঃখ আছে।'

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। অন্নপূর্ণা দেবী এবং জুবেদা খাতুনকে দেখলাম ছেলেদের

জন্য সোয়েটার বুনছে। হঠাৎ একটু গা গরম মনে হোল। পরে বুঝলাম জ্বর। অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'একজনকে একটা সোয়েটার করে দেবো। যে কোন রং পছন্দ করে উল কিনে আনুন। আপনার মাপেই সোয়েটার হবে। সুতরাং দোকানদারকে বললে উল দিয়ে দেবে।' জ্বর নিয়েই গেলাম এবং উল কিনে এনে দিলাম।

নিখিল এল হাতে রসগোল্লা নিয়ে। বাবা বললেন, 'দাম কত?' নিখিল অনুনয় করে বলল, 'এর আবার দাম কি?' বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'কোন ছাত্রের পয়সায় কিছু খাই না। এমন কি বিনামূল্যে কোন জিনিস গ্রহণ করি না।' এ মূর্তি দেখে নিখিল ভয় পেয়ে দাম বলল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা নিখিলকে টাকা দিয়ে আমাকে বললেন, 'রসগোল্লা তোমার মার হাতে গিয়ে দাও এবং নিখিলকেও দাও।' নিখিল এসে জিতেন্দ্র প্রতাপের বাড়িতে উঠেছে। তখন কি নিখিল জানত ঠিক চার মাসের মধ্যেই তাকে চিরকালের মত মৈহার ত্যাগ করতে হবে?

বাবা নিখিলকে বললেন, সপ্তাহে একবার করে আসতে। যেহেতু পরের দিন শুক্রবার, সেই হেতু শনিবার সন্ধ্যার সময় আসতে বললেন। নিখিল যথারীতি শনিবার এল। প্রথমে একটু বাজনা শুনলেন। পরে বললেন, 'এ বাজনা একেবারে রবিশঙ্করের নকল। আগেও বলেছিলাম, রবিশঙ্করের নকল করলে সকলেই বলবে নকল। তোমাকে নূতন ঢংএ শেখাবার জন্য মীড়ের রেওয়াজ করতে বলেছিলাম, তা কর নি। এ কথা বলেই চার সুরের কয়েকটা মীড়ের অঙ্গ রিয়াজ করতে বললেন। নিখিলের খুব মাথা নড়ত। এই মাথা নাড়ানার জন্য বকুনি খেল। বাবা বললেন, 'এইগুলো তৈরি হলে তবেই আসবে, তার আগে নয়।'

বাবা সঙ্গীতের সমুদ্র ছিলেন, যার গভীরতা মাপা জোকার বাইরে। একটা জিনিষ অন্ততঃ বুঝতে পারি, একটা রাগ দীর্ঘদিন ধরে শিখেছি, অথচ কোন রিপিটেশন নেই। বাবার মধ্যে এ ক্ষমতা ছিল, বিভিন্ন অঙ্গে এক এক জনকে এক নূতন কায়দায় শেখাতেন। সেটা বুঝলাম আজ যখন বাবার কাছে সুর শৃঙ্গারের সঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবী সুরবাহার শিখছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ জোড় শুনলাম। জানা রাগ অথচ বুঝতে পারছি না। মন্দ্রসপ্তকে পাঁচটা সুরের বিস্তার চলছে তো চলছেই। অনেক পরে বুঝলাম রাগ 'তিলক কামোদ'। 'তিলক কামোদ' বাবার কাছেও কয়েকবার শুনেছি এবং নিজেও শিখেছি। কিন্তু এরকমভাবে বিস্তার তো শিখিনি। বাবা যখন রেডিওতে বা কোন লোক এলে বাজিয়েছেন, সে সময়ও এরকম শুনিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম বাবা যখন রাত্রে কোন কোন দিন নিজের ঘরে বাজান, সে সময় এ ধরনের বাজনা শুনেছি। আজকের বাজনা শুনে মনে হোল, যার যতটা নেবার ক্ষমতা বাবা ততটাই দেন। তিলক কামোদ বাবার অত্যন্ত প্রিয় রাগ। আমারও খুব ভাল লাগে কিন্তু এরকম আলাপ যেন কল্পনা করা যায় না। পরে বুঝেছি এ আলাপের নাম 'কৈদ আলাপ'। বুঝলেও এই পরিণত বয়সে মনে হয় সুরশৃঙ্গার বা সুরবাহারেই বোধ হয় এই ধরনের আলাপ সম্ভব। দুটো বাজনার আওয়াজই এত মধুর যে মনে হয় মনটাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করছে।

বাবার কাছে একটা কথা অনেকবার শুনেছি। বাবা বলতেন, 'মন, বুদ্ধি, চিন্তা এই তিনটি স্থির করে, অহঙ্কার বর্জন করে সাধনা করতে হবে। নিজের ভেতর দেখতে হবে। বাবা, তুমি তো কাশীর ছেলে। কাশীর গঙ্গায় ডুবকি লাগিয়ে প্রাণায়াম কর। ডুবকি লাগিয়ে কিছুক্ষণ

থাকলেই মনে হবে মারা যাচ্ছ। কিন্তু অভ্যাস করে যে দিন ডুবকি লাগিয়ে অনেকক্ষণ প্রাণায়াম করতে পারবে সেদিন বুঝবে সঙ্গীতের আসল তত্ত্ব।' তাঁর কাছে বহুবার এই কথা শুনেছি। আজকের বাজনা শুনে আমার মনে হলো একেই বোধ হয় বলে গঙ্গার মধ্যে ডুবকি দিয়ে প্রাণায়াম করা।

পরের দিন একটি সেতার নিয়ে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার বাজনা একটু শুনুন।' বাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই শুনব।' ভদ্রলোক বাজালেন। বাজাবার পর বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, 'আপনি তো খুব ভাল বাজান।' ভদ্রলোক বললেন, 'যদি আপনার ভাল লেগে থাকে, তাহলে দয়া করে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন যে আমি ভাল বাজাই।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'আমার লেখা সার্টিফিকেট কি হবে? আমি তো সঙ্গীতের কিছু জানি না। দিন দুনিয়ার মালিক আল্লা ছাড়া কিছু দেনেওয়ালা তো কাউকে দেখলাম না। আসলে খুব মন প্রাণ দিয়ে বাজান। বাজাতে পারলে সেটা হবে প্রকৃত সার্টিফিকেট।' এ কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখে আর কথা নেই।

নিখিল এসে একদিন শিখবার পর আর আসবার সাহস পাচ্ছে না। নিখিলকে বাবা খুবই স্নেহ করেন। কিন্তু যে বীজ বপন করে দিয়েছে নিখিলের বাবা, সেটা বাবার মাথা থেকে যাচ্ছে না। বাবার একটা স্বভাব ছিল, বাইরের যে কোন লোক এলেই জিজ্ঞেস করতেন, 'এই লোকটাকে দেখে কেমন বুঝলে?' এ সব হল বাবার কঠিন পরীক্ষা। যদি বাবা আমার কাছে কোন পরামর্শ চাইতেন, নিঃসংকোচে হাতজোড় করে যা ভাল বুঝতাম তাই বলে দিতাম। বাবার একটা স্বভাব ছিল প্রথমেই 'না' বলা, কিন্তু বরাবরই আমার পরামর্শ মতই কাজ করেছেন। যদিও তিন চার বার নিজের অভ্যাস অনুযায়ী মাথাটা নড়িয়ে বলতেন, 'যা ভাল বোঝ তাই কর।' নিখিলের আসার পর বাবা একদিন যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'নিখিলকে কি রকম মনে হচ্ছে?' উত্তরে বললাম, 'আপনার চেয়ে কে বেশি বুঝবে?' কিছু বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ। কয়েকদিন পর বাবা আবার বললেন, 'নিখিলের বদ্‌গুণ বাজনার সময় মাথা নাড়া।' নানা লোকের কাছে নানা কথা শুনেছেন তারই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হল। হঠাৎ বাবা বললেন, 'আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালীদেরই শিখিয়েছি, অথচ বাঙ্গালীদের মত পরশ্রীকাতর এবং খারাপ লোক দেখিনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।'

২৫

মাসের শেষ, বাবা এলাহাবাদ রেডিওতে বাজাতে গেলেন। বাবা যাবার পর নিখিল বাড়িতে এল। অন্নপূর্ণাদেবীকে দিদি এবং জুবেদা খাতুনকে বৌদি বলে সম্বোধন করে অনেকক্ষণ গল্প করল। নিখিলের কথায় বুঝলাম, মৈহারে আসবার আগে দিল্লীতে গিয়েছিল। কথায় কথায় রবুদা এবং দাদার গুণগান করল। আলি আকবরকে দাদা বলে সম্বোধন করে। বুঝলাম জুবেদা খাতুনের সঙ্গে আগে থেকে আলাপ আছে। পাঁচদিনের মাথায় বাবা ফিরবেন। এই পাঁচদিন কেবল 'ইমন'ই শিখলাম অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে। অবাক হই, ইমন রাগের বোধ হয় শেষ নাই। এখন মনে হয় ঠিক মত একটা রাগ শিখলে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। আলি আকবর দু'শো টাকা পাঠিয়েছে। বাবা বললেন, 'স্ত্রী, এতগুলো নাতি-নাতনী আছে অথচ এই

টাকা পাঠিয়েছে। এ টাকা আমার দরকার নেই। তোমার মাকে এই টাকা দিয়ে বল বৌমাকে দিয়ে দিতে।' মাকে টাকা দিলাম। মা টাকাটা বৌমার হাতে দিলেন। জুবেদা খাতুনের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। যখন দেখেন ছেলেদের এবং বাড়ির সব খরচা অন্নপূর্ণাদেবী করছেন, অথচ তিনি করতে পারছেন না, লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। বাবাকে স্নো, পাউডারের কথা বলা যায় না। কিন্তু সেগুলোও অন্নপূর্ণ দেবী ঠিক সময় ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু অবাক হই আলি আকবরের যেন কোন দায় দায়িত্ব নেই। এ এক আজব চরিত্র।

সবে দশদিন অন্নপূর্ণা দেবী এসেছেন। এর মধ্যেই তিনদিন হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঠিকও হয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই নানা প্রশ্ন করতাম। একটা কথাই মনে হয়েছে, মনের মধ্যে বরাবরই টেনসন থাকে, বাইরে তা প্রকাশ করেন না। যদি প্রকাশ করতেন তা হলে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যেত। এরোগ একমাত্র রবিশঙ্করই ঠিক করতে পারে। কিন্তু রবিশঙ্করের দ্বারা সম্ভব নয়। মনে মনে দুঃখ হয়।

বাবা দুই দিন হোল ফিরে এসেছেন। সকাল থেকে কয়লা, কাঠ বাড়ির কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে এনে, যে মুহুর্তে বাড়ি এসেছি, দেখি নিখিল এসেছে। শুনলাম বাবা নিখিলকে বলছেন, সেবা করলে মেওয়া পাবে। দেখছ তো যতীন কত কাজ করে। আর তুমি কোন গুরুঠাকুর যে তোমাকে ডেকে শেখাতে হবে। আরে আরে, ভেবো না, তোমাকে কোন কাজ করতে বলছি। তোমার কাছে কোন কাজ চাই না। খুব বাজাও। একটা কথা মনে রেখো, কিছু দিলে কিছু পাওয়া যায়। তোমার কাছে কোন টাকা কিংবা কোন সেবা চাই না। অন্তরে শ্রদ্ধা আনো তা হলেই সব হবে। আগামী কাল এসে বাজনা শোনাও। এখন যাও। নিখিল চলে গেল।

আজ ৬ই মার্চ। আজ শুভকে বাবা সরোদ শুরু করালেন। রবিশঙ্করের খুব ইচ্ছা শুভ সরোদ বাজাক। সেই জন্য শুভর সরোদে হাতেখড়ি। খুব খুশী মনে শুভকে শিখিয়ে বাবা তামাক খেতে লাগলেন।

বাবার মেজাজ আজ ভাল। বাবা আজ খুব ভাল মেজাজে আমাকে ইমনই শেখালেন। আজ এই প্রথম ধামারে একটা গৎ শেখালেন।

পরের দিন নিখিল এল। নিখিলকে এই প্রথম চার সুরের মীড় দিয়ে ইমনের একটি গৎ শেখালেন। বাবা গৎটি শিখিয়েই নিখিলকে বললেন, এইটা ঠিক করে খুব ভাল ভাবে অভ্যাস করে তবে দুদিন পরে আসবে।' পরের দিন জিতেন্দ্র প্রতাপ এসে শিখল।

সকাল থেকেই আশিসের জ্বর হয়েছে। বাবার মেজাজ খারাপ। আশিসের জ্বর সম্বন্ধে কথা হচ্ছে সেই সময় নিখিল শিখবার জন্য এল। হঠাৎ বাবার যেন পারা চড়ে গেল। নিখিলকে দেখেই বললেন, 'কেন লোকে তোমার নামে অভিযোগ করে, নিশ্চই তুমি খারাপ, তুমি মিথ্যাবাদী।' নিখিলের তো অবস্থা খারাপ। যাক শিক্ষা করে চলে গেল। নিখিলের জন্য দুঃখ হয়। আমার মৈহার আসবার পর কোলকাতায় বাবা দুই বার গিয়েছেন। কোলকাতা থেকে এসে দুইবারই একটা কথা বলেছেন, 'কোলকাতায় কত প্রতিভাধর ছেলে আছে, যারা গাইলে বা বাজালে খুব বড় হতে পারত, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বাবা মা এবং বাড়ির

লোকেরাই মূর্খের মত প্রশংসা করে তাদের বারটা বাজিয়ে দেয়।' এ কথা শুনে আমার মনে হতো, মিথ্যা প্রশংসা শুনলে অহঙ্কার আসে বলেই বাবা কাশীতে গেলে, আমার সরোদ নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না। পাছে লোকের প্রশংসায় আমারও অহঙ্কার হয়। কিন্তু বাবার কথাটা যে কত মূল্যবান সেটা মৈহার ছাড়ার পর বুঝেছি। তবে নিখিলের জন্য দুঃখ হয় এই ভেবে যে, সে তো কোন দোষ করে নি। একটা চিঠিই হোল তার কাল। এই চিঠির কথা বাবা কখনও ভুলতে পারেন নি। ভুলতে না পারলেও শিক্ষা দিতে কখনও কার্পন্য করেননি। কিন্তু এত স্নেহ পেয়েও নিখিল চার মাসের মধ্যেই মৈহার থেকে চির বিদায় নিল। সেও এক ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

আশিসের জ্বর ভাল হোল এবং শুভ বিছানা নিল। শুভর জ্বর একেবারে তুঙ্গে। ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। বললেন ভয়ের কিছু নাই। হাসপাতালে গিয়ে কমপাউণ্ডার পাঠিয়ে দেবেন। ডুস দিয়ে পায়খানা হয়ে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছে হাসপাতালে গেলাম। কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে আসবার সময় পোস্ট অফিস থেকে চিঠি নিয়ে এলাম। বাবারই সব চিঠি। একটা চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। চিঠির উপর লেখা আছে কনফিডেনসিয়াল। চিঠিটা রবিশঙ্কর আমাকে লিখেছে বাড়ি আসবার আগেই চিঠিটা পড়লাম। চিঠি পড়ে অবাক হলাম। রবিশঙ্কর লিখেছে, একটি মেয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করছে। সেই মেয়েটি বাবাকে চিঠি দিতে পারে। আমাকে অনুরোধ করে লিখেছে, বাবাকে যেন সে চিঠি পড়ে না শোনাই। রবিশঙ্কর দেখে গেছে বাবার সব চিঠি খুলে পড়ে শোনাই এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই। রবিশঙ্কর লিখেছে, যদি এরকম কোন চিঠি যায় তাহলে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে। আরও অনুরোধ করেছে, এই চিঠির কথা যেন অন্নপূর্ণাকে না জানাতে। কোন কালেই আমার অভ্যাস নাই একজনের কথা অন্যকে লাগান, যদি তাতে কারও ক্ষতি হয়। এ চিঠি তো বলার প্রশ্নই আসে না। এ চিঠির কথা এই প্রথম আজ লিখছি। এ যাবৎ কাউকে বলিনি। চিঠি পড়ে আমি অবাক। কিসের জন্য একটি মেয়ে রবিশঙ্করকে ব্ল্যাকমেল করছে? বুঝলাম স্ত্রী ঘটিত ব্যাপার। কি কোয়েনসিডেন্স জানি না, বাবাকে চিঠি পড়ে শোনাতে গিয়ে একটা চিঠি দেখি প্রেরকের নাম একটি মেয়ে। চিঠির এক লাইন পড়েই বললাম চিঠিটা আমার। অন্য চিঠি পড়ে কি উত্তর দিতে হবে জেনে নিজের ঘরে চলে এলাম। মেয়েটির চিঠি পড়ে অবাক হলাম। আমি যদি মৈহারে না থাকতাম এই সময়ে, তা হলে বাবা অন্য কাউকে দিয়ে চিঠি পড়াতেন। পরিণাম কি হত ভেবে নিজের মনেই চমকে উঠলাম।

পরের দিন শুভর খবর নিতে গিয়ে দেখি অন্নপূর্ণা দেবী কাঁদছেন। মৈহারে এসে অবধি দেখেছি বাড়িতে অসুখ লেগেই আছে। কিন্তু তার জন্য কাঁদতে কখনও দেখিনি। অভয় দিয়ে বললাম, 'কাঁদবার কি আছে? আসলে জ্বর একটুও কমেনি বলে ঘাবড়েছেন। এখনই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঔষধ নিয়ে আসছি। রাত্রে শুভ একেবারে স্বাভাবিক, জ্বরের চিহ্নও নাই। বাবাকে আট দশবার উপর নিচ করতে দেখেছি। বাবাকেও বোঝাতে হয়েছে। অসুখ হলেই বাবা বিচলিত হয়ে পড়েন।

তিনদিন পর নিখিল এল শিখতে। নিখিলকে দেখেই বাবার সেই পুরনো কথা। 'সকলে তোমার সম্বন্ধে খারাপ বলে কেন? তুমি ভেক ধরেছ? একটা কথা মনে রাখবে, 'দিয়ে ধন বুঝি মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' উপরওয়ালাই সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করেন। মনে পাপ থাকলে উপরওয়ালাই কেড়ে নেন।' বুঝলাম শুভর শরীর খারাপের জন্য বিচলিত হয়ে আছেন। তা সত্ত্বেও নিখিলকে শেখালেন, তারপর আমাকে বললেন, 'শিখবে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'এখন কয়েকদিন বাজিয়ে পরে শিখব।' বুঝলাম খুশী হয়েছেন।

পরের দিন বাবা জোর করে 'ভৈরব' বাজাতে বললেন। বললেন, 'ভৈরব' অতি কঠিন রাগ। 'ভৈরব' আগেও শিখিয়েছেন কিন্তু আজ অন্য ভাবে শেখালেন। নূতন গৎও একটা শেখালেন। এখন আশিসকে রোজ আলাদা শেখান।

আজ সতেরই মার্চ। দিনটা স্মরণীয়। স্মরণীয় এই জন্যে যে প্রাণেশকে বাবা একটা ঢোল দিয়ে বললেন সঙ্গে সঙ্গে বাজাও তো। সকালে আশিস, ধ্যানেশ, বেবী এবং শুভ রোজ প্রথমে গান গায়। দুই সুরের, তিন সুরের, চার সুরের ক্রমানুসারে পালটার সঙ্গে অবলীলাক্রমে প্রাণেশ সঙ্গত করে গেল। দেখে আমি স্তব্ধ। এ কল্পনা করা যায় না। কয়েকদিনের মধ্যেই আশিসের গৎ-এর সঙ্গেও সঙ্গত করতে লাগল। এ এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা।

জুবেদা খাতুন অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'আশিসের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবার জন্য সুরদাসকে বলা উচিত।' গম্ভীরভাবে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'সময় হলে বাবা নিজেই ব্যবস্থা করবেন। বাঁধা জিনিষ এখন শিখছে। সুতরাং তবলার এখন দরকার নাই।' রেওয়ার মহারাজের তরফ থেকে চিঠি এল। অর্কেস্ট্রা নিয়ে যাবার অনুরোধ এবং উপরন্তু সরোদ বাদন। সুতরাং ডি.সি.-কে চিঠি দিলাম।

নিখিল এল। বাবা বললেন, 'পরের দিন সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে যাবেন। সুতরাং আজ শেখাবেন না। বাবা মাকে বললেন, অত সকালে নাস্তার দরকার নাই।' অন্নপূর্ণা দেবী ভোরেই বাবাকে নাস্তা দিলেন, যদিও মা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাবা অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখে আর কিছু বলতে পারলেন না। বললেন, 'কাল তো মানা করে দিয়েছিলাম। কেন এত সকালে কষ্ট করে নিচে এলে?' বাবা যেমন করে থাকেন, রাত্রি তিনটের সময় তৈরি হয়ে স্টেশনে যাবেন। চারটের পর বাবাকে বাড়িতে রাখা অসম্ভব। দশ মিনিট স্টেশনে যেতে লাগবে। তবুও বাবার সেই এক কথা, চল স্টেশনে গিয়ে গল্প করব। হায় ভগবান! এ জিনিষ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। বাবা বললেন, 'দেখ রাত জেগে তুমি আমার সঙ্গে স্টেশনে এলে। নিখিলকে বলেছি আজ ভোরের ট্রেনে যাব, তার কি আসা উচিত নয়? দেখ বাড়িতে পড়ে ঘুমচ্ছে।' উত্তরে বললাম, 'রাত্রে আসতে হয়তো অসুবিধে আছে তাই আসেনি।' সঙ্গে সঙ্গে বাবার সেই এক কথা, 'এইসা না এইসা না।' আমার কথাটা উড়িয়ে দিলেন।

বাবার যাবার পরের দিন জুবেদা খাতুন আশিসকে দিয়ে আমাকে উপরে ডেকে পাঠালেন। উপরে দিয়ে দেখি অন্নপূর্ণাদেবীর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ঘাবড়ে গেলাম। টি.বি. হলে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় জানতাম। টি.বি. রোগটা সেই সময় আজকের ক্যানসার

রোগের মতই ভয়ের ছিল। দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার গোবিন্দ সিংকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার গোবিন্দ সিং দেখে বললেন, টি.বি. নয়। ঘাবড়াবার কিছু নাই। সেপটিক টনসিল। শুনলাম ছোটবেলায় টনসিল অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তার ইনজেকশন এবং ওষুধ দিয়ে গেলেন। বিকেলেই ভাল হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময় রেওয়া থেকে বাবা মৈহারে এসে পৌঁছুলেন। ব্যাণ্ডের জন্য একটা খামে টাকা এবং বাবার নামে একটা খাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখ ত গুনে কত টাকা মহারাজ দিয়েছেন।' গুনে দেখলাম ব্যাণ্ডের জন্য ৫০১ টাকা এবং বাবার জন্য ৫০০১ টাকা দিয়েছেন।

অন্নপূর্ণা দেবী বারণ করে দিয়েছিলেন, বাবাকে অসুখের কথা বলতে, কারণ বাবা ঘাবড়ে যাবেন। তাই কিছু বললাম না। একটা দিন থেকেই বাবা দিল্লী যাবেন। সন্ধ্যায় এসেই বাবা আমাকে যন্ত্র নিয়ে বসতে বললেন। রাত্রে কেবল তারপরণের শিক্ষাই দিলেন।

পরের দিনটা ছিল আমার কাছে স্মরণীয় দিন। একদিক দিয়ে স্মরণীয় আবার বিস্ময়েরও বটে। দিনটা ছিল ২৬শে মার্চ। মৈহারে এসেছি প্রায় দু'বছরের ওপর। 'ইমন' দিয়ে শুরু হয়েছিল। তার পর মাঝে মাঝে বাবা অনেক কিছু শিখিয়েছেন। মাঝে মাঝেই এখনও ইমন চলছে। আজ বাবা বললেন, 'এতদিন যে ইমন শিখলে সেটাও ঠিক। এবারে 'ইমন'এর চলন একটু আলাদা করে দিয়ে বললেন, এই অঙ্গে এবার 'ইমন' বাজাও। বাবার এই অঙ্গে একটা স্বর বর্জিত করলেই শুদ্ধ পুরিয়া হয়ে যাবে। এই শুদ্ধ পুরিয়া কেউ বাজায় না। প্রথমে এই অঙ্গে 'ইমন' কিছুদিন বাজাও।' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। দিল্লী যাবার আগে বাবা অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'মা আমার অনুপস্থিতিতে নাতিদের একটু দেখো এবং শিখিও। আমি না থাকলে সকলেই ফাঁকি দেবে। আমার ভয়ে বাজায়। সঙ্গীতের মধ্যে লগন এখনও আসেনি। সুতরাং একটু খেয়াল রেখো।' পরের দিন বাবা দিল্লী গেলেন। যদিও টাঙ্গাওয়ালাকে সকালে আসতে বলেছি কিন্তু বাবার তর সয়না। দুঘণ্টা আগে স্টেশনে যাবেনই। বাবা বোধ হয় এতদিনে জানতে পেরেছেন আমি ইচ্ছে করে একটু দেরী করি; তাই আমার বলা সত্ত্বেও বাবা বুদ্ধাকে ডাকতে বললেন টাঙ্গাকে। ঠিক সেই সময়ে টাঙ্গাওয়ালা এসে পৌঁছল। বাবার একটা স্বভাব, যে কাজ যে মুহূর্তে বলবেন সেই মুহূর্তেই করতে হবে নইলে মেজাজ খারাপ। নিজের বেলায়ও ঠিক এই নীতি। বাড়িতে কোন কাজ করতে করতে হয়তো একটু জরুরী কথা মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কাজ স্থগিত করে যে কাজ মনে পড়ে গেল সেই কাজটা প্রথমেই করবেন। এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে গিয়ে এই প্রথম বললেন, 'জান কেন এত আগে স্টেশনে আসি। যদি কোন জিনিষ ভুল করে না এনে থাকি, তাহলে বাড়ি গিয়ে আনবার সময় থাকে। এ অভ্যাস আমার চিরকালের। বহুদিন আগে একবার কোলকাতা থেকে আমার সঙ্গে তিমিরবরণ মৈহার যাচ্ছিল। স্টেশনে এসে তিমিরবরণের কথা মনে পড়ে গেল ভুলক্রমে সরোদই আনে নি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়ে সরোদ নিয়ে এল। যদি দুই ঘণ্টা আগে স্টেশনে না আসতাম তা হলে কি সরোদ আনতে পারত?' মনে মনে হাসি পেল। বাবা বাইরে যাবার দুদিন আগেই সব জিনিষ প্যাক করে রেখে দিতেন। আমার মৈহার থাকাকালীন বরাবরই দেখেছি। কোনদিন এমন হয়নি যে কিছু ভুলে বাড়ি রেখে স্টেশনে গিয়েছেন।

বাবা যাবার পরের দিন আশিসরা যেমন গান করে তার পর বাজায় তার ব্যতিক্রম হলো না। বাজাবার শেষে হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবী শুদ্ধ ভৈরবীতে একটা মধ্য লয়ের গৎ আশিসকে শেখালেন। গৎটা এত ভাল লাগল যে আমিও নিজের যন্ত্র নিয়ে বসে শিখে নিলাম। রাত্রে আমাকে অন্নপূর্ণা দেবী আলাদা শেখালেন।

বাবা যাবার দু'দিন পর অন্নপূর্ণা দেবীরে কাছে শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। বাড়ির যাবতীয় কাজ ছাড়া, নিজে আলাদা রিয়াজ করে সকাল, বিকেল এবং রাত্রি বারটা অবধি শিক্ষা চলতে লাগল।

'ইমন' রাগের শেষ নেই। মীড় এবং গমকের কয়েকটা জিনিষ খরজে যা বললেন বাজানো অত্যন্ত কঠিন। বললাম, 'এ অত্যন্ত কঠিন। সরোদ কাউকে তো এই জায়গায় খরজের মধ্যে সাত সুরের মীড় এবং গমক বাজাতে দেখিনা।' সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বললেন, 'পাকামি করবেন না, যা বলছি করুন। যা কেউ করে না সেটা করলেই তো লোকে বুঝবে।'

আজ ২রা এপ্রিল। আজকের দিনটার কথা আমার জীবনে আজও ভুলিনি। বিশেষ করে 'নন্দকোষ' রাগটা যখনই বাজাই তখনই ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। বাবা বা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে বকুনি খাওয়াটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু শিক্ষাকালীন কেউ থাকলে অস্বস্তি অনুভব করতাম। কারও সামনে বকুনি খেলে আত্মসম্মানে লাগত, তাছাড়া নার্ভাসও হয়ে যেতাম। বাবার কাছে রাত্রে যখন শিখতাম বুদ্ধাকে বলা ছিল, যে কেউ আসুক তাকে বলে দিতে এখন বাবা শেখাচ্ছেন। তবে মাঝে মাঝে বুদ্ধা কোন কাজে ব্যস্ত থাকায়, কয়েকবার এমন হয়েছে বাইরের লোক এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বাবাকে ডেকেছে। লোকের আসাতে প্রায়ই শিক্ষায় বাধা পড়ত। আবার কখনও শিক্ষা চললেও বকুনি খেলে সঙ্কুচিত বোধ করতাম।

আজ রাত্রে অন্নপূর্ণা দেবী নূতন রাগ 'নন্দকোষ' শেখাতে লাগলেন। হঠাৎ জুবেদা খাতুন এসে বসে গেলেন। অনুরোধ করে জুবেদা খাতুনকে বললাম যেতে, কেননা শিক্ষাকালীন কেউ থাকলে অসুবিধা বোধ করি। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'থাকুন না বৌদি, আপনি বাজান।' তা সত্ত্বেও নিজের অসুবিধার কথা বললাম। বাবার পুত্রবধূর কিন্তু যাবার লক্ষণ দেখলাম না, যেহেতু অন্নপূর্ণা দেবী থাকতে বলেছেন। আমার মনে হোল কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁদ দেখার সাধ। বাজনা হচ্ছে অথচ সোয়েটার সেলাই করছেন। সঙ্গীতের ঘরের পুত্রবধূ হয়ে সঙ্গীত শিখবার সময় এ আচরণ অশালীন মনে হোল। কিন্তু কি করে এসব কথা বলা সম্ভব যখন অন্নপূর্ণা দেবী কিছু বলছেন না। যদি অন্য কাউকে শেখাবার সময় এই সেলাই করা দেখতাম তা হলে বলেই দিতাম, বাজনা শুনতে বসে এ কি হচ্ছে? অন্নপূর্ণা দেবী সে সময় সেতার বাজিয়ে শেখাতেন। বাবার কাছে বকুনি না খাই তার জন্য বরাবর আমাকে একটু এ্যাডভান্স শিখিয়ে দিতেন যার ফলে বাবার কাছে শিক্ষায় অসুবিধা হত না। শিক্ষা চলছে, আলাপ চলছে। হঠাৎ খরজের গান্ধার থেকে মধ্য সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত আরোহীতে একটা লম্বা মীড় বাজিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে খরজের মধ্যম থেকে মধ্য সপ্তকের মধ্যম লাগিয়েই, খরজের মধ্যমে ফিরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হোল। বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীর মধ্যে দেখেছি, একটা জিনিষ না বেরোন পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বেন না। যে

জিনিষটা বলেছেন বারবার সেটাই করাবেন। তারপরই শিক্ষা বন্ধ করিয়ে বলবেন, এটা হলেই পরে আবার শেখাবেন। এই কঠিন মীড়ে সরোদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিছুতেই আসছে না, বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। ততই অন্নপূর্ণ দেবীর পারা চড়ছে। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। নূতন রাগ শুরু করিয়েছেন। আলাপ শুরু করে এইখানে আটকে গেছি। মাঝে মাঝেই 'হচ্ছে না, হচ্ছে না' শুনছি, এছাড়া জুবেদা খাতুনের উপস্থিতির জন্য বকুনি খাবার ফলে আরও নার্ভাস হচ্ছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'যান এটা রিয়াজ করবেন, আমার মাথা খারাপ করে দিলেন।' মাথা নিচু করে বাজাচ্ছিলাম। তাকাতেই দেখি এ এক রুদ্র মূর্তি। রাগের চোটে এক একটা তার আঙ্গুলের মধ্যমা দিয়ে টানতে লাগলেন। এবং পর পর চারটা তার ছিঁড়ে ফেললেন। তারপরই রেগে বললেন, 'যান এখান থেকে। যতক্ষণ না ওঠে ততদিন মুখ দেখাবেন না।' বাবার কাছে একমাত্র আমিই কখনও মার খাই নি, তবে বকুনি খেয়েছি প্রচুর, কিন্তু আজকের এই বকুনি মারের থেকেও বেশি মনে হোল। জুবেদা খাতুনের উপস্থিতির ফলে আমার প্রেস্টিজ যেন পাংচারড হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র নিয়ে নিচে নেমে এলাম। কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে বসে রইলাম। মনে মনে বলি গুরু কন্যা দেখছি গুরুর মতোই ক্রোধী, কিন্তু শিক্ষার সময় রাগের চোটে তার ছিঁড়ে ফেলা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। আলো জ্বেলে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না হঠাৎ উপর থেকে অন্নপূর্ণা দেবীর স্বর শুনলাম। 'রাত হয়েছে এখন শুয়ে পড়ুন। তাড়াতাড়ি সকালে উঠে রিয়াজ করবেন। আলো নিভিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুম? এই বকুনি খাবার পর কি ঘুম আসে?

পরের দিন অন্নপূর্ণা দেবী একেবারে সহজ সরল। কথা প্রসঙ্গে কি করে রিয়াজ করতে হবে, নানা কথা বললেন। রাত্রে নন্দকোষই শিখলাম। আজও চটলেন কিন্তু গত কালের মত নয়। রোজ আমার শিক্ষা চলতে লাগল।

১০ই এপ্রিল বাবা দিল্লি থেকে বাজিয়ে ফিরলেন। বাবাকে খুব গম্ভীর দেখলাম। বাবার কাছে পরে শুনলাম, দিল্লীতে সকলের কথায় আলি আকবর, রবিশঙ্কর এবং বিলায়েৎ খাঁর একসঙ্গে বাজানা হয়। সঙ্গীতের মধ্যে পার্টিবাজি। নিজের লোককে দিয়ে তালি দেয়। সঙ্গীত কি সার্কাস? বাজনা বাজাবার সময় যখন লোকে তালি দেয়, বুঝতে হবে মূর্খ শ্রোতা, আর না হয়ত বুঝবে, নিজের লোক দিয়ে তালি লাগায়। আলি আকবরের প্রতি রাগ করে বললেন, 'তিন জনের বাজাবার সময় আলি আকবর খুব কম বাজিয়েছে। এত কম বাজায় কেন? এর জন্য কি ছোট থেকে শিক্ষা দিয়েছি? আলি আকবরের যে ক্ষমতা আছে, সকলের হাত বন্ধ করে দিতে পারে কিন্তু তা করে নি।' এই কথা বলেই বাবা চুপ করে গেলেন। বাবার কথা শুনে অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম, রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর এলে জিজ্ঞাসা করব কি হয়েছিল। বাবার কথায় জানতে পারলাম, তবলায় কিষণ বাজিয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় নিখিল এল। বাবা নিখিলকে মীড় দিয়ে এক টোকায় আটগুণ বাজিয়ে ইমনের গৎ যা শিখিয়েছিলেন, নানাভাবে করতে বললেন।

পরের দিনই আশিসের জ্বর এল। সুতরাং বাবার মেজাজ খারাপ। আশিসের জ্বরটা ধীরে ধীরে বাড়তেই লাগল। বাবা আমাকে শেখাতে চাইলেন, কিন্তু রিয়াজ করছি, পরে শিখব

বলে শিখলাম না। নিখিল কিন্তু বাবার মেজাজ বোঝে না। সেতার নিয়ে শিখতে এল। বাবার মেজাজ খারাপ তাই খুব বকুনি খেল। বাবা বললেন, 'রিয়াজ করে এক সপ্তাহ পরে আসবে।'

১লা বৈশাখ। বাবা বললেন, 'আজ আলি আকবরের জন্মদিন।' বাবা সকালেই মাংস আনতে গেলেন। বাংলা পঞ্জিকা অনেক আগেই ভি.পি. করে এসে গেছে। ছেলের জন্মদিন বাবার মেজাজ খুব ভাল। নিজে হাতেই দাড়ি কাটলেন। বাবার কাছে সব সরঞ্জামই থাকত। চুলও নিজেই কাটতেন। আমি যাওয়ার পর থেকে সাহায্য করতাম। নাতিদের চুলও তিনি নিজেই কেটে দিলেন। রাত্রে বাবা 'কাফির' একটি সুন্দর গৎ শেখালেন।

আজ রাত্রে ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলো। যেহেতু আলি আকবরের জন্মদিন সেইজন্য বাবার মেজাজ প্রসন্ন। ডাক্তার, বাবাকে বাজাবার অনুরোধ করলেন। বাবা বাজালেন। বাজাবার পর ডাক্তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বাবা, আপনি তো ডান হাত দিয়ে খাবার খান, সিগারেট খান কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে সরোদ, ভায়োলিন, রবাব, সুরশৃঙ্গার বাজান কেন? আপনি তো বাঁ-হাতি নন। কেননা হারমোনিয়াম, তবলা, মৃদঙ্গ ডান হাত দিয়ে বাজান।' এ প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে বললেন, 'বাবাজি, আপনি বাঁ হাত দিয়ে কি করেন?' ডাক্তার ঠিক বাবার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। বাবা নিজে থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, 'বাঁ হাত দিয়ে শৌচাদি করেন, সেই জন্য বাঁ হাত অপবিত্র। বাজাতে গেলে দুই হাতই লাগে।' সরোদের প্লেটটি দেখিয়ে বললেন, 'এর মধ্যেই বাঁ আঙ্গুলের প্রয়োগ বেশি হয় সেইজন্য মাতেশ্বরীর সেবা করতে ডান হাত দিয়ে প্লেটের উপর বাজাই। বাঁ হাতের আঙ্গুলে জবাটা শুধু ধরি। সেই জন্য সুরশৃঙ্গার, রবাবও বাঁ হাত দিয়ে বাজাই।' এই কথা বলে হাসতে লাগলেন। কথাটা আমার কাছে কেমন হেঁয়ালির মত লাগল। হারমোনিয়ম তা হলে ডান হাত দিয়ে বাজান কেন? তবলা, মৃদঙ্গই বা ডান হাত দিয়ে বাজান কেন? বাঁ হাতে বাজান সম্বন্ধে এযাবৎ দুই জায়গায় দুই রকম পড়েছি। প্রথমে এক জায়গায় বেরিয়েছিল আহমদ আলী সরোদ শেখাতে রাজি হয়েছিলেন যদি বাবা বাঁ হাতে বাজান। বাবা রাজি হয়েছিলেন। আবার এক জায়গায় বেরিয়েছিল, বাবা সরোদ ডান হাতেই বাজাতেন, কিন্তু উজির খাঁর কাছে যাবার পর বাঁ হাতে সরোদ বাজাতে আরম্ভ করেন। কেননা উজির খাঁ বলেছিলেন, 'তোমার আঙ্গুল পড়ছে ভুল, সেই জন্য বাঁ হাতে বাজালে শেখাব।' কিন্তু বাবার কাছে এ যাবৎ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি, কেন বাবা বাঁ হাতে বাজান। সকলকেই এক কথা বলতে শুনেছি, বাঁ হাত অপবিত্র বলে বাজনার প্লেটে মাকে সেবা করবার জন্য ডান হাত দিয়ে প্লেটে বাজান এবং বাঁ হাত দিয়ে জবা ধরেন।

পরের দিন দুটো টেলিগ্রাম এল। একটা টেলিগ্রাম এসেছে যে পরের দিনই বাবাকে রেওয়া যেতে হবে ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে। সকাল বেলায় রেওয়া থেকে গাড়ি আসবে। দ্বিতীয় টেলিগ্রাম এল নিখিলের। নিখিলের বাবার শরীর খুব খারাপ সুতরাং পত্রপাঠ যাবার জন্য লিখেছে। বাবা নিখিলকে ডেকে বললেন, 'যতই হোক, বাবা! তোমার বাবার শরীর খারাপ সুতরাং আজই চলে যাও। শরীর ভাল হয়ে গেলে মৈহারে এসো।'

রেওয়া যাবার জন্য বাবা সকালেই তৈরী হয়ে রইলেন। গাড়ি আসবার কথা সকাল

দশটায়। ব্যাণ্ডের ছেলেরা ন'টার সময় বাবার বাড়িতে এসে গেছে। সকাল ন'টার থেকে বাবার পায়চারি শুরু হয়ে গেছে। এ জিনিষ আমি দেখে অভ্যস্ত। দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল। মনে মনে ভাবলাম, আজ যে আসবে বাবাকে নিতে তার কপালে দুঃখ আছে। রেওয়া থেকে এক অফিসার দুপুর বারটার সময় একটি বাস এবং ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছল। কথা দিয়ে সময় মত না এলে যেই হোক না কেন, বাবার কাছে সুমধুর বাণী শুনতেই হবে। ছাত্রদের যে সময় বাবা ডাকতেন, যদি কোনক্রমে একমিনিট দেরী হোত, বাবা শেখাতেন না। বাবা বলতেন, 'প্রথমেই বেতালা এসেছে, তো কি শিখবে? যাও পরের দিন আসবে।' অফিসার লোকটি যখন এলেন, বাবা বললেন, 'কটা বেজেছে? আসবার কথা সকাল দশটায় আর এসেছেন দুপুর বারটায়?' মুখটা কাচুমাচু করে ভদ্রলোক বললেন, 'রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই দেরী হয়ে গিয়েছে। কে শোনে কার কথা? শুরু হয়ে গেল বাবার সঙ্গীতের বোল। চোখ এবং ভুরু কুঁচকে বাবা বললেন, 'জানতে হয় হমারে বাংলামে এক কহাবত্ হয়, যার কথার ঠিক নাই তার বাবার ঠিক নাই।' হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বাবার একথা না বুঝে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'নহি সমঝা, যিসকা জুবানকা ঠিক নহি হয়, উসকা বাপকা ঠিক নহি।' একথা শুনে ভদ্রলোকের ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম। বাবা তখন বার বার একটা কথাই বলবেন, 'এইসা না, এইসা না, সময়ের মূল্য যে বোঝে না তার মত অকমর্ণ্য লোকের কি হবে?' কিছুক্ষণ বলার পর, বাবার রাগ কমে গেলে বলবেন, 'বাবা বুরা মত মাননা,' অর্থাৎ আমার কথায় কিছু মনে করো না। যাক, বাবা দুপুরে ট্যাক্সি করে এবং ব্যাণ্ডের ছেলেরা বাসে রেওয়া গেলেন। রাত্রেই বাবা ফিরে এলেন।

সকালে বাবা বললেন, 'গতকাল পরিশ্রম করে রাত্রে ফেরবার ফলে মাথাটা খুব ধরেছে।' জোর করে বাবাকে কপালে বাম লাগিয়ে দিলাম। বাবা আরাম পেলেন। যা কখনও বলেন নি এ যাবৎ, বাবা বললেন, 'বাবা যা নাস্তা করতে যা। যে আনন্দ দিলে খুদা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন এই প্রার্থনা করি।' প্রথম কথাটা 'নাস্তা' করতে যা' বলেই কিন্তু তুমি বলে বললেন। আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল। আজ পোস্ট অফিস যাওয়ার সময় বাগচী বাবু আমায় দেখতে পেয়ে ডাকলেন। একটি মাসিক পত্রিকা পড়বার জন্য দিলেন। মাসিক পত্রিকায় দেখলাম, শোভনা সেন নাম্নী একজন মহিলা রিপোর্টারের, দিল্লীর যে ত্রয়ী বাজনা হয়েছিল তার উপর একটা সমীক্ষা। মনে পড়ে গেল দিল্লী থেকে এসে বাবা বলেছিলেন, 'পার্টি পার্টি।' যাক এ বিষয়ে আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর এলে জিজ্ঞাসা করব। এ সংবাদটি আমার কাছে পরম বিস্ময়ের মনে হোল।

বাবার সব দিকে খেয়াল থাকে। বাবা বললেন, 'পরশু নিখিল কোলকাতা গেছে?' বললাম, 'আজ কোলকাতা যাবে।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'কি রকম ছেলে নিখিল? পরশু যাওয়া উচিত ছিল তার বদলে আজ যাবে? জেনে শুনে বাহানা করে টেলি করেছে নাকি?' এর উত্তর কি দেব? আজ নিখিল সকাল বেলায় বাসে সাতনা চলে গেছে। সাতনা থেকে মেল ধরে কোলকাতা যাবে।

বাবা দিল্লী থেকে আসবার পর থেকে আশিস জ্বরে ভুগছে। আজ সকালে যেমন সকলে

গান গায়, তার পর আশিস একলা সরোদ বাজায়, সেই মতে রিয়াজ করল। আশিস বাঁধা ধরা মতো একদিন 'বিলাবল', পরের দিন 'ভৈঁরো', তার পরের দিন 'শুদ্ধ ভৈরবী' বাজায়। এই ক্রম দেখে আসছি। আজ 'শুদ্ধ ভৈরবী' যা শিখেছে বাবার কাছে, গৎ বাজিয়ে ঝালা শেষ করে নূতন যে গৎটি অন্নপূর্ণা দেবী শিখিয়েছেন সেইটি বাজাল। হঠাৎ বাবার জোরে একটি আওয়াজ শুনলাম, 'বন্ধ কর, বন্ধ কর।' এই আওয়াজ শুনে মনে হোল, অন্নপূর্ণা দেবী কি গৎটি ভুল শিখিয়েছেন? ভুল বাজালে বাবার এই আওয়াজ স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিনে বুঝেছি অন্নপূর্ণা দেবীর মত এত ভাল কেউ বাজাতে পারে না। তবে? বাবার ঘরে গেলাম। বাবার ঘরে যেতেই শুনলাম, বাবা বলছেন আশিসকে, 'তোর পিসিমা এই গৎ শিখিয়েছেন, গৎটা ভুলিস না। কিন্তু আমার সামনে কখনও বাজাবি না। আশিস মাথা নেড়ে 'হাঁ' করল। এ কথা শুনে বাবা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এই গৎ শুনে তোর আর এক পিসিমা জাহানারার কথা মনে পড়ে যায়।' আমার উপস্থিতি দেখে বাবা আমাকে বললেন, 'আমার এক মেয়ে জাহানারা ছিল। সে মারা গেছে। শ্বশুর বাড়িতে তাকে অনেক অত্যাচার করত। আমার মেয়ে গরুর মাংস কখনো খেত না, যার জন্য তার শ্বশুর বাড়ির সকলে বলত 'কাফের'। সকলের অত্যাচার সইতে না পেরে আমার কাছে মৈহারে এসে মারা যায়। জাহানারা যখন ছোট ছিল তখন খুব কাঁদত। কাঁদলে তোমার মা বিরক্ত হয়ে বলত, 'দিনরাত আমি কাজ করব আর তোমার মেয়েকে সামলাব। যতই হোক তোমার তো মেয়ে, তুমি সামলাও। আমি তো বাবা, সকলে যেমন ছেলে মেয়েকে আদর করে কান্না থামায়, আমি তা কখনও করতাম না। যে মুহূর্তে কান্না অবস্থায় তোমার মা আমার কাছে নিয়ে আসত, সেই সময় সরোদ নিয়ে ভৈরবীর এই গৎটি বাজাতাম। জাহানারা এই গৎটি শুনেই দুলে দুলে নাচত এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে যেত। ছোটবেলায় জাহানারার গলা খুব ভাল ছিল। বাঁশির মত গলা। তাকে তো ঠুংরি শেখাতে পারি না, ছোটবেলায় তাকে ভজন শিখিয়েছিলাম। জানি বিয়ে হয়ে যাবে, তাই গান বাজনা শেখাই নি। জাহানারার মৃত্যুর পরে এই গৎ আমি কখনও বাজাই নি। এই গৎটির গান আমি শিখিয়েছিলাম জাহানারাকে।' এই কথা বলে আশিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর পিসিমার মনে আছে দেখছি, তাই শিখিয়েছে। এই গৎ ভুলিস না, তবে ভুলেও আমার সামনে কখনও বাজাস না।' এই কথা বলেই বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই গৎটার ভাব হোল বাৎসল্য। জাহানারার মৃত্যুর পর আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম অন্নপূর্ণার বিয়ে দেব না। অন্নপূর্ণার বিয়ে দিলেও এই রকম হবে। সেইজন্য ছোট থেকে তাকে আমি প্রথমে গান শিখিয়ে সেতার শুরু করেছিলাম। অন্নপূর্ণাকে ভেবেছিলাম খুব ভাল করে গান শেখাব। ছোট থেকে তার গলা ছিল বাঁশীর মত মধুর, কিন্তু তার টনসিল অপারেশন হবার পর ভাবলাম, যদি গলার আওয়াজ খারাপ হয়ে যায় তাই তাকে সেতার ধরালাম। ছোটবেলায় তার গলা কি মধুর ছিল। সে মস্ত গায়িকা হতে পারত। তার জন্য দুঃখ নাই। টনসিলের পরেও অন্নপূর্ণার গলা যা আছে তা খারাপ নয়। তবে বাজনায় আমি তাকে যা শিখিয়েছি এত ভাল কেউ বাজাতে পারে না। গান ছেড়ে সেতার শুরু করিয়ে, পরে সুরবাহার শেখাই। ছোট থেকেই অন্নপূর্ণাকে বুঝিয়েছিলাম তোমার বিয়ে এই যন্ত্রের সঙ্গে দিলাম। এই বাজনা ভগবানকে শোনাবে। এই বাজনাই হবে

তোমার স্বামী, দেবতা সব কিছু। এই যন্ত্র বাজিয়ে অর্থ উপার্জন করবে না, তা হলে আসল সঙ্গীত থাকবে না। তোমার জীবনের ভরণ পোষণের সব ব্যবস্থা আমি করে যাব। কিন্তু আল্লার মরজী ছিল অন্য রকম। উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিদেশ থেকে ফিরে এসে যখন রবু আমার কাছে শিখতে এল, তার কয়েক বছর পর উদয়শঙ্কর মৈহারে এসে আমার সঙ্গে সারদা দেবীর মন্দির দর্শন করতে গেল। মন্দিরে উদয়শঙ্কর আমাকে বলল, 'বাবা আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাই।' উত্তরে আমি বললাম, 'আমি দীন হীন, আমার কাছে কি আছে যে ভিক্ষা দেব।' উদয়শঙ্কর তখন বলল, 'আপনার কন্যাকে আমায় ভিক্ষা দিন আমার ভাই-এর জন্য। রবিশঙ্কর সেতার বাজাচ্ছে এবং আপনার মেয়ে এত ভাল বাজায়, এই বিবাহ হলে খুব সুখের হবে।' এ কথা শুনে তো আমি চমকে উঠলাম। বিদেশে যাবার আগে জাহাজে উঠবার সময় উদয়শঙ্করের মা আমাকে বলেছিল, 'আপনার হাতেই রবিশঙ্করকে দিলাম। আজ থেকে আপনিই এর বাবা।' এ কথা শুনে পুত্রবৎ স্নেহে তাকে বিদেশে একটু শিখিয়ে পরে মৈহারে শিখিয়েছি। আগে রবু একেবারে আতাই ছিল। ভাঁড়ের মত নাচত। স্বভাবও ভাল ছিল না। মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। ঠিক প্রজাপতির স্বভাব ছিল। মৈহারে শিখছে, এই সময়ে উদয়শঙ্কর যখন এই প্রস্তাব দিল, প্রথমে হ্যাঁ করতে পারিনি। বললাম, মন্দিরে কথা দিতে পারব না, পরে ভেবে বলব। আমার জ্ঞাতি ভাই কুটুম্বরা সকলেই মানা করেছিল। এমনকি মৈহারের মহারাজ বলেছিল, 'আমার বোন অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করছে যেহেতু তার কাছে সঙ্গীত শিখতে পারবে। বিয়ে করলেও আপনিও যত্ন নিয়ে শেখাবেন, যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব।' সকলেই না করেছে, কিন্তু দুটো কথা ভেবে আমি বিবাহে রাজী হয়েছিলাম। প্রথমতঃ রবুর মা আমাকে দিয়ে কথা নিয়েছিল, যেন রবুকে সন্তানের মত দেখি। রবুর মাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি যে অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিয়ে দেব। কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর প্রস্তাব দিল, সেই পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ ভাবলাম, বিবাহ না করে একটী মেয়ের সারা জীবন অভিভাবকহীন হয়ে কাটান কঠিন। আমি কতদিন বাঁচব? অন্যরা কে কতটা দেখবে কে জানে। এ ছাড়া জাহানারার কথা মনে ছিল। বহু চিন্তা করে আলমোড়াতে রবুর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলাম। কন্যা সম্প্রদান আমি করতে পারি না, যেহেতু আমি মুসলমান। একেবারে হিন্দু মতে, রবুর এক সম্পর্কে মামা ছিল, তাকে দিয়েই অন্নপূর্ণাকে সম্প্রদান করিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয় ভুল করেছি। অন্নপূর্ণা মা আমার সুখী নয় কেননা, রবিশঙ্করের প্রজাপতি দোষ এখনও যায় নি লোকমুখে শুনতে পাই। নইলে আমার মা অন্নপূর্ণার এই সব হিস্টিরিয়া রোগ কেন হবে? মনের শান্তি না থাকার ফলে সর্বদাই কষ্টে থাকে। আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। যদিও অন্নপূর্ণা বলে সে আনন্দে আছে কিন্তু আমি বুঝি, সে আমার মুখচেয়ে এই কথা বলে পাছে আমি কষ্ট পাই। হায় আল্লা! জ্ঞানতঃ জীবনে কারো অমঙ্গল চিন্তা করিনি, কিন্তু জানিনা আগের জন্মে কি পাপ করেছিলাম যার জন্য কোন মেয়ের ভাগ্যেই সুখ নাই। আমার বড় মেয়েও সুখে নাই। রইল একমাত্র ছেলে আলি আকবর। আল্লা ক্ষমতা দিয়েছিল, কিন্তু টাকার পিছনে পড়ে তার সঙ্গীত থেকে তাকে দূরে টেনে নেবে। আমার ছেলে হয়ে এরকম কেন হোল? এখন বলছে আবার বিয়ে করবে।" এই কথা বলে বাবা মাথা চাপড়াতে লাগলেন। বাবার সব কথা

শুনে আমি হতভম্ব। এসব কথা আমার জানা ছিল না। আমার কাছে এ এক বিস্ময়। হঠাৎ দেখি আশিস বাজনা ছেড়ে কখন উঠে গেছে। ঘরে রয়েছেন কেবল বাবা এবং আমি। বাবাকে কিছু বলার মত কথা খুঁজে পেলাম না। একটা কথা আমার মনে হোল, অন্নপূর্ণাদেবী শেখাবার সময় কখনও কখনও গান করতেন। এত মিষ্টি গলা আমি কখনও শুনি নি। অথচ বাবা বললেন টনসিল অপারেশনের পর তাঁর সে গলা নেই। অবাক হয়ে ভাবলাম, তাহলে আগে গলার আওয়াজ কত মধুর ছিল।

২৬

গরম পড়েছে। কিন্তু মৈহারে গরম কালেও রাতের শেষে বেশ ঠাণ্ডা। গায়ে একটা চাদর দিতে হয়। এ ছাড়া খোলা বলে প্রাকৃতিক হাওয়ার যে কি আনন্দ তা কল্পনা করা যায় না। গরমে বারান্দায় বাবাও শোন। কিন্তু রাত্রি এগারটা অবধি বাবা ঘরে বসে তামাক খান এবং বেশির ভাগ কাবুল রেডিওর প্রোগ্রাম শোনেন। সেই গানে বাবা আজানের আনন্দ পান। বাবার আলো যতক্ষণ না বন্ধ হয় ততক্ষণ আমাকে বাজাতে হয়।

একটা কথা আগেই বলেছি, আমার মৈহার থাকাকালীন খুব কম দিন গেছে যে দিন হাসপাতালে যেতে হয় নি। বার মাস কারো না কারো অসুখ লেগেই আছে। তবে এ কথা ঠিক, এই অসুখের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার পরিশ্রমের বিনিময়ে বাবা অমূল্য সম্পদ দিয়ে আমার কাছে ঋণমুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'তুমি আমায় ঋণী করে আমার অপরাধ বাড়াচ্ছ। আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারি না।' যে মুহূর্তে কোন একটা বিপদ আসত তার সমাধান করলেই বাবা দিন রাত শিখিয়ে বাবা নিজে ভারমুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। এ এক বিচিত্র চরিত্র।

বাবার মাঝে মাঝেই পেটে ব্যথা হয়। এ রোগ বহুদিনের। বাবা একদিন আমাকে বললেন বহু চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু মাঝে মাঝেই কষ্ট হয়। এ রোগ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বোধ হয় ভাল হতে পারে। সব কথা জানিয়ে কাশীর কবিরাজ আশুতোষকে লিখতে বললেন। বাবা তাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম। বাবা আমাকে বললেন, 'লিখে দাও ভি. পি. করে পাঠাতে। বিনা পয়সায় ওষুধ পাঠালে খাবো না। ডাক্তার বৈদ্যকে পয়সা না দিলে ঠিকমত চিকিৎসা হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই কাশী থেকে এক মাসের জন্য তিরিশ পুরিয়া ঔষধ এসে গেল। আশুতোষ চিঠিতে জানালেন যে একমাস ওষুধ খেয়ে কেমন থাকেন জানালে আবার ওষুধ পাঠাবেন। টাকার কথায় লিখলেন, নাতি হয়ে দাদুর চিকিৎসা করায় নিজেকে ধন্য মনে করবেন। নিরাময় হলে তাঁর কাছে সেটাই হবে বিরাট সার্টিফিকেট এবং ফিস্। পথ্যের মধ্যে লিখলেন সব কিছু খেতে, একমাত্র ডাল ছাড়া। পথ্যের কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আরে দাদু, এ কি পথ্য লিখেছে? আমরা বাঙ্গালী, ডাল ভাত আড়াই হাত। ডাল না খেলে কি কচু খাব? এই বৈদ্যের ওষুধ চলবে না।' বাবা বললেন লিখে দিতে যে খিচুড়ি এবং ডাল ভাত বাবার প্রিয় খাদ্য সুতরাং এ ওষুধ চলবে না।' পর মুহুর্তেই বললেন, 'আশু দাদু হয়তো কিছু মনে করবে। মনে করলে কি হবে, সত্য কথা লিখে দাও, সব ডালই কি নিষেধ?' আশুতোষকে সব কথা বুঝিয়ে লিখলাম। আশুতোষ লিখলেন, 'কোন ডালই চলবে না, তবে

মুসুরির ডাল সিদ্ধ করে তার জল খেতে পারেন।' এই চিঠি পেয়ে বাবা বললেন, ওষুধগুলো ফেলে দাও। ওই ডালভাত চিরকাল খেয়েছি। ডাল না খেয়ে কি হাতিঘোড়া খাব?' বাবা একদিনও ঔষধ খেলেন না। বাবা মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।

চৌদ্দ দিন পরে নিখিল এল। বাবা নিখিলকে বলেছিলেন, চার সুরের মীড় ভাল ভাবে ঠিক করে তবে যেন শিখতে আসে। এর মধ্যে জিতেন্দ্র প্রতাপ সিং মাঝে মাঝে বাবার কাছে শিখতে আসে।

নাতিদের কিছু হলেই বাবার মন খারাপ হয়ে যায়। দিন রাত এক কথা, লখছন ভাল নয়, খুদা জানে কি হবে। শুভর জ্বর এসেছে। আমাকে দেখেই বললেন, 'ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। শুভর জ্বর হয়েছে সকাল থেকে। আমার জানা ছিল না। হঠাৎ বাবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা শুনে বললাম, 'সকালেই ডাক্তারের কাছে কেন যাবেন?' বাবা বললেন, 'শুভর জ্বর হয়েছে।' বললাম, 'আপনি কেন যাবেন আমি থাকতে?' উত্তরে বললেন, 'সকালে তুমি নিজের সাধনা কর।' হঠাৎ দেখি বাবার পুত্রবধূ অমরেশকে ধরে ভীষণ জোরে একটা মুষ্ঠাঘাত করলেন। বাবারও চোখে পড়ে গেছে। আর যায় কোথায়? বাবা ক্ষেপে লাল। চিৎকার করে বললেন, 'আমার সামনে এত বড় ক্ষমতা হয়েছে, দারোগার ঝি আমার এত ছোট নাতিকে এমন করে মারল। এই মুহূর্তে আলি আকবরকে টেলি করে দাও যে দারোগার ঝিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। এই রাগের জন্যে বম্বে টিকতে পারে নি। আমার ছেলের জীবনটা নাশ করে দিয়েছে।' বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, হয়তো দুষ্টুমি করে মার খেয়েছে। বাবা আমার উপর চটে লাল, 'মারলে এই রকম জোরে মার, এত ছোট ছেলেকে। ঐ মারটা আমার উপর পড়েছে। যাও, জল্‌দি টেলি করে এসো।' বাবাকে বললাম, 'টেলি করলে আলি আকবর ঘাবড়ে যাবে তাই চিঠি লিখে দিচ্ছি।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে খাম এবং প্যাড দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে চিঠি লিখে দাও, চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে যেন নিয়ে যায়।' চিঠি লিখে পোষ্ট অফিসে গেলাম এবং শুভর ঔষধ নিয়ে এলাম। বাবা গুম হয়ে রইলেন। জুবেদা খাতুনের মাঝে মাঝেই রুদ্র রূপ দেখি, কিন্তু মনে হয় এর কারণ অনেক। যার স্বামী এত নামী, অর্থও উপায় করে অথচ টাকা পাঠায় না। অন্নপূর্ণা দেবী সব খরচা করেন। এ ক্ষেত্রে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। মনে মনে দুঃখই হয়। ভাবি, শিল্পীদের স্ত্রী হওয়া মেয়েদের বোধ হয় অভিশাপ। সাধারণ মেয়েরা যেমন স্বামীকে কাছে পায়, শিল্পীর স্ত্রীরা তা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যদি শিল্পীর স্ত্রীরা একটু এ্যাডজাস্ট করতে পারত। অবাক হই, বাবার কাছে এতদিন শিক্ষা করেও বাবার ভাল জিনিষগুলো কেন এরা গ্রহণ করল না। এর কারণ আমার মনে হয়, অল্প বয়সে বাজনা বাজিয়ে লোকের প্রশংসা এবং রমণীদের সান্নিধ্য এঁদের এই অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিয়েছে। বাবার স্বপ্ন বোধ হয় সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

পরের দিন অমরেশেরও জ্বর হল। বাবা চটে লাল। পোস্ট অফিস থেকে চিঠি নিয়ে এসে বাবার ঘরে ঢুকে দেখি, বাবা পঞ্চিকা দেখছেন। বললেন, 'এই মাসে সিংহ রাশির ভাল যাবে না লেখা আছে।' ওঁর কুষ্ঠি কখনও দেখি নি অথচ বরাবরই বলতে শুনেছি সিংহরাশি।

মনে মনে হাসি পেল। ডাক্তার এলেন, বললেন 'ভয়ের কিছু নেই। জ্বর না কমলে পরের দিন ইঞ্জেকশন দেবো।' শুভ এবং অমরেশ, দু'জনেরই ম্যালেরিয়া হয়েছে। কারও জ্বর না কমায় পরের দিন ইনজেকশন দিলেন। মারের পরিণতিতে এতকিছু।

জুবেদা খাতুনের মেজাজ অনেকটাই দেখেছি এতদিনে। মায়ের উপরও মেজাজ দেখাতেন। আমার চোখেও পড়ত। অন্নপূর্ণা দেবীর সামনে চুপ। মার মুখে কোন কথা নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই। নাতিদের সঙ্গে গল্পকরে আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নিজের মনটা হাল্কা করতেন। অন্নপূর্ণা দেবী নিজের হাতে ওষুধ এবং পথ্য খাওয়াতেন। চারদিন পর দুজনেই ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু আশিসের জ্বর হল।

বাবা বাজার থেকে ফেরার পথে এক গাড়ি টালি এবং মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। মিস্ত্রি দিয়ে আমার রিয়াজের ঘর গোশালার ছাতে টালি লাগাতে বললেন। সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। সামনে বর্ষাকাল, টালি না লাগালে বৃষ্টি পড়বে ঘরে।

টালি লাগাবার দুদিন পরই বৃষ্টি শুরু হল। বাবা আমাকে মিয়াঁকি মল্লার শুরু করালেন। বললেন, 'বর্ষাকালে কেবল মল্লার বাজাবে।'

প্রতিবারের মত আজ আয়কর সম্বন্ধীয় চিঠি এল। এ চিঠি এলেই বাবা ঘাবড়ে যেতেন। আমি ব্যাণ্ড পার্টির যন্ত্রের মেরামতি, অন্যান্য যন্ত্রের তারের খরচা সবই আয় করের হিসাবের মধ্যে দেখাতাম, কিন্তু বাবার ভাল লাগত না, তাঁর বিবেকে বাধত। এ ব্যাপারে প্রত্যেক বার ডাক্তারবাবুকে দিয়ে বাবাকে বোঝাতে হত। ডাক্তার বাবু হিসেব দেখে প্রশংসা করলে বাবা খুশী হতেন। হিসেবের কাজটা কাগজে টাইপ করিয়ে বাড়ি ফিরতে বিকেল তিনটে। বাবা নমাজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই অসময়ে কোথায় গিয়েছিলে?' সব বলতে খুশী হলেন। বললেন, 'এই সব করবার জন্য কি তুমি এসেছ?' চুপ করে রইলাম। রাত্রে খুব প্রসন্ন মেজাজে শেখালেন।

আশ্চর্য্য হচ্ছি আলি আকবরের ব্যবহারে। চিঠির কোন উত্তর নেই। বাবার রাগ পড়ে গেছে। কয়েকবার অবশ্য বলেছিলেন, 'আলি আকবর বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছেনা কেন?'

কয়েকটা গল্পের বই ছাড়া জেনারেল নলেজ এবং বাংলায় মনোবিজ্ঞানের বইএর অর্ডার দিয়েছিলাম। আজ ভি. পি. যোগে এল। অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, আগে জেনারেল নলেজ এবং মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে, পরে মাঝে মাঝে গল্পের বই পড়তে। অন্নপূর্ণা দেবী তখন অনুগত ছাত্রীর মতই আমার কথা শুনতেন। মাঝে মাঝে 'সঞ্চয়িতা' থেকে কবিতা পড়েও শোনাই। পড়াশোনার সময় চুপ করেই শোনেন। বাজনা শেখাবার সময় অন্য মূর্তি।

বাড়ির কাজ বরাবরই বাবা কিছু করে যাচ্ছেন। তাঁর কথা হল, আলি আকবরের তো কোন খেয়াল নেই, সুতরাং যতটা পারি করে দিয়ে যাই। মুরগীর ঘরটা দেখে মনে হয় কোন লোকের থাকবার একটা সুন্দর ঘর। তিনি বলেন, 'ডিম খাব আর তাদের থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা করব না?'

চড়াই পাখি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। বাবা নিজেই বেতের ছোট ছোট বাটির মত কিনে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিতেন। গোশালা থেকে খড় নিয়ে চড়াইগুলো বাসা বাঁধত। বাসাগুলো

দেখে বাবা খুব খুশী হতেন। খাবার সময় রোজ ভাত ছড়িয়ে দিলে পাখিগুলো দলে দলে এলে, বাবার মন খুশীতে ভরে উঠত। একবার চাকর জায়গা ময়লা হচ্ছে বলে বাসা ভেঙ্গে ফেলে দিল। বাবা চটে লাল। বলে উঠলেন, 'আরে আরে এ হল মহাপাপ।' কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তারা বাসা বেঁধে ফেলল। বাবা দেখে বললেন, 'মানুষ অল্পে কাতর হয় কিন্তু পাখি হয়েও এদের কত উদ্যম। মানুষ জ্ঞানবান হলেও এই শিক্ষা নিতে পারে না। পাখি বর্ষার আগেই কি রকম বাসা বেঁধে ফেলে। মানুষও যদি সময় নষ্ট না করে এই উদ্যম নিয়ে কাজ করে, তাহাল সব কিছু করতে পারে। প্রতি বছর বর্ষণ তো হবেই সেই রকম জীবনে অনেক বাধা বিঘ্ন আসবেই, তা বলে কি নিজের কর্ম থেকে বিচ্যুত হবে। সব কাজের মধ্যেও নিজের সাধনা করে যেতে হবে।' বুঝলাম, বাবা প্রকারান্তরে বোঝালেন, সংসারের নানা কাজ করতে হয় বটে, কিন্তু ইচ্ছা এবং মনের জোর থাকলে তার মধ্যেও সাধনা করা যেতে পারে।

১৯৩৫ সনে ফকির চন্দ্র চোপড়া এবং তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতা চোপড়া মৈহারে আসেন। ফকির চন্দ চোপড়া স্যানডারসন লাইম কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সময় থেকেই বাবার সঙ্গে তাঁদের আলাপ। চোপড়া সাহেবের স্ত্রীকে বাবা মেয়ের মত ভালবাসতেন। তিনি প্রথমে বাবার কাছে হারমোনিয়াম শিখেছিলেন, পরে সেতার শিখতেন। অত্যন্ত ভদ্র পরিবার। অন্নপূর্ণা দেবী যখন ছোট ছিলেন, সেই সময় থেকেই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। মৈহার যাবার পর বাবা আমার সঙ্গে চোপড়া সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছু টাইপ করবার দরকার হলেই, আমি তাঁর অফিসে গিয়ে চোপড়া সাহেবের ম্যানেজার, রতন সিং সৈনিকে দিয়ে করিয়ে আনতাম। বহুবার চোপড়া সাহেব নিজের গাড়ি করে বাবাকে সাতনা যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে ধর্মকন্যা এবং জামাই বলে বাবাকে আপ্যায়ন করতে দেখেছি। চোপড়া সাহেবের বড় ছেলে বিনোদ চোপড়া মাদ্রাজ গিয়ে ভারতনাট্যম নৃত্য শিখেছিলেন। সিনেমায় নাট্য নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। বাবা তাকে নাতির মত স্নেহ করতেন। মৈহার গিয়ে তার কথা শুনেছি, কিন্তু দেখলাম এই প্রথম। আমার সঙ্গে বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার কাছে থেকে সব খবরাখবর নিতে লাগলেন। খুব স্নেহ পেয়েছে ছেলেবেলা থেকে, তাই সহজভাবেই বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বাবা তাকে বললেন, 'আচ্ছা দাদু, মাদ্রাজ গিয়ে ভারতনাট্যম শিখে এসে সিনেমায় নাচের ডাইরেক্টর হয়েছ শুনেছি। বলতো মৃদঙ্গ ও তবলা শিখেছ কিনা?' সে খুব সহজ ভাবেই জবাব দিল, 'মৃদঙ্গ শেখেনি তবে তবলার ঠেকা বুঝতে পারে। বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'দাদু তা হলে কচু নাচ শিখেছ তুমি। সিনেমায় ডাইরেকশন দাও অথচ মৃদঙ্গ জান না, তা হলে নাচের কম্পোজের সময় কি বাজাতে হবে, মৃদঙ্গ এবং তবলা বাদককে কি করে বলবে? নাচের কম্পোজের জন্য নানা যন্ত্রের বিষয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোল নানা রকম দেশী এবং বিদেশী যন্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সিনেমাতে কি করে ডাইরেকশন দেবে। তবে একটা জিনিষ তোমাকে বলি দাদু, নাচের লাইনটা ভাল নয়, বিশেষ করে সিনেমাতে নানা রকমের মেয়েদের সঙ্গে থাকতে নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন। দেখ আমি কম বয়সে কোলকাতায়, থিয়েটারে বেহালা বাজাতাম। তখন থিয়েটারে ভাল বংশের মেয়েরা আসত না। অবশ্য সিনেমাতে শুনেছি ভালঘরের মেয়েরা আজকাল কাজ করে। কিন্তু আমি

থিয়েটারে বাজান বন্ধ করে দিলাম। কারণ খারাপ মেয়েদের সংসর্গ আমার ভাল লাগেনি। তার পরই আমি সঙ্গীত শিখতে কোলকাতা, রামপুর গিয়েছি। জীবনটা শিক্ষাতেই কাটিয়ে দিয়েছি। সিনেমার লাইন ভাল নয়।' এতক্ষণ বিনোদ চোপড়া চুপ করে শুনছিল। এবার বলল, 'দাদু, নাচের লাইনটা যদি খারাপই হবে, তবে আপনি কেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিলেন?' বাবা বললেন, 'দাদু দুটো কারণে গিয়েছিলাম। প্রথম, ছোট থেকে আমার দেশভ্রমণের খুব সখ ছিল। দ্বিতীয়, মৈহারের মহারাজ আমাকে বাড়ির জন্য বিরাট জমি দিয়েছেন কিন্তু বাড়ি তৈরির টাকা দেন নি। উদয়শঙ্কর যখন আমাকে বলল, বিদেশে একক বাজনার জন্য আমাকে ভালই টাকা দেবে, তখন রাজী হয়েছিলাম এইভেবে যে বিদেশে ঘোরাও হবে এবং টাকা পেলে সেই টাকায় বাড়ি তৈরীও হবে। নাচের অর্কেস্ট্রা, আমার ছাত্র তিমিরবরণ যখন প্রথমবার উদয়শঙ্করের কাছে গিয়েছিল, তখন করেছিল। অর্কেস্ট্রার দায়িত্ব আমার ছিল না। তাই নাচের পার্টির সঙ্গে গেলেও একক সরোদ বাজিয়েছি। এটা ঠিক বিদেশের মেয়েরা খুব সঙ্গীত প্রেমী। তারা উদয়শঙ্করের নাচের জন্য বহু টাকা দিয়েছে, যাতে নাচের খরচের অসুবিধা না হয়। কিন্তু এ লাইনে সহজ সরল মেয়েদের প্রতারিত হতে দেখে মন ক্ষুন্ন হয়েছে। যার জন্য উদয়শঙ্কর বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আর কখনও যাই নি। একবার গিয়ে যে টাকা পেয়েছি সেই টাকায় মৈহারে ছোট বাড়ি তৈরি করেছি। কয়েক বছর উদয়শঙ্করের সঙ্গে থাকলে বহু টাকা পেতাম, কিন্তু সেখানে সরলতার সুযোগ নিয়ে মেয়েদের প্রতারিত করা হয়, সেখানে টাকার মোহে যাবার ইচ্ছা আমার হয়নি।' বাবার কথা শুনে বিনোদ খুবই প্রভাবিত হল। বলল, 'দাদু আমি সিনেমার কাজ ছেড়ে সঙ্গীত নাটক একাডেমির কোন সংস্থায় কাজ করবার চেষ্টা করব।' বাবা খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন। সব শুনে আমার মনে হল, বড় হবার জন্য, টাকা রোজগার করবার জন্য, সকলেই লেখাপড়া শেখে অথবা নানা কলাবিদ্য আয়ত্ত্ব করে। এ কথাও ঠিক, বড় হওয়া মানে কারও ক্ষেত্রে বিত্তশালী হওয়া, বড় মাপের একজন প্রকৃত মহৎ মানুষ হওয়া নয়। বাবা চেয়েছিলেন মহৎ হতে। অন্যের সঙ্গে বাবার এখানেই পার্থক্য। তাঁর সংযমের কাছে টাকার হাতছানি হার মেনেছে। তাই তিনি নমস্য।

বাড়িতে হঠাৎ যেন জ্বরের জোয়ার এল। একে একে সবাই ভুগল। বাবা অসুখে ওষুধ খেতে চান না। ব্যতিক্রম দেখলাম অন্নপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রে। তিনি ওষুধ, পথ্য, ফল দিলে বাবা ছোট ছেলের মত খেয়ে নিতেন। বলতেন, 'কেন কষ্ট করছ মা? তুমি আমার মা, তোমার কথা অমান্য করতে পারি না।' অন্নপূর্ণা দেবীর অবর্তমানে বহু কষ্টে জোর করে এক আধবার ওষুধ খাইয়েছি কিন্তু তার জন্য বেগ পেতে হয়েছে। অন্য কারও সাহস ছিল না। বাবা ওষুধ ফেলে দিতেন। ভাল হতেন প্রায় মনের জোরে। তবে আমার থাকাকালীন অসুখ মাত্র কয়েকবারই হয়েছে। সকলে যখন একের পর এক ভুগছে, একদিন বললেন, 'আর এসব ভাল লাগে না, যার সংসার সে বুঝুক। আমি এবার আশিসকে নিয়ে দেশে যাব, কুমিল্লাতে।' আশিস ছিল বাবার অতি প্রিয়। এ কথা শুনে আমার অবস্থা খারাপ। আমার শিক্ষার কি হবে? এখন তো অন্নপূর্ণা দেবী আছেন, কিন্তু তিনি তো চলে যাবেন, তখন কি হবে? অবশ্য বাবার মতি বদলাতে দেরি হয় না তাই রক্ষে।

বাবা সব বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে, যখন যা প্রয়োজন বলে মনে হত, সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করতেন। জলের অভাবের জন্য দক্ষিণারঞ্জন যখন মেশিন লাগাতে বলেছিলেন, বাবা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করেছেন। ভবিষ্যতে প্রত্যেক নাতির একটি করে ঘর এবং মায়ের একটি বড় ঘর দরকার ভেবে বর্ডারের নক্সাই বদলে দিলেন। মুরগীর ঘর হল। ছাতের প্যারাপেট ওয়াল হল। সিঁড়ি করা, ছাতে যাবার জন্যও তৈরি হল। এবারে বাবার মনে হল, তাঁর বাড়ির সামনেই অন্নপূর্ণাদেবীকে মহারাজ যে জমি দিয়েছেন, তার বাউণ্ডারী ওয়াল দিয়ে একটা গেট করা এবং একটা ছোট বাড়ি করা প্রয়োজন। অন্নপূর্ণাদেবী এ কথা শুনেই বাবাকে বারণ করলেন। নানা কথাবার্তার পর ঠিক হল বাড়ি না করলেও বাউণ্ডারী ওয়াল দিয়ে একটা গেট করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি কোন লোক তাঁর অবর্তমানে কব্জা করে নেয়, তা হলে কি হবে? অতএব পরদিন ইঁট পাথরের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল।

অনেকদিন হল আমার এ্যানিমিয়া হয়েছে। চিকিৎসাও চলছে। কিন্তু কোন উপশম হচ্ছে না। ডাক্তার বাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন কাশীতে গিয়ে চোখ, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়ে আসতে।

পরের দিন হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেলাম। কারও অসুখ হলে বাবা বলতেন, 'নখড়া করছে।' কিন্তু আমাকে কখনও বলেন নি। আমার ক্ষেত্রে বলতেন 'লখছন ভাল নয়। তোমার ঠিকানা দাও টেলি করে দিই। কিছু হলে আমি কি জবাব দেব তোমার বাড়িতে।' বাবার এই কথায় আমার অসুস্থতা অর্দ্ধেক ভাল হয়ে যেত। ভগবানের অসীম কৃপা, সাত বৎসর মৈহার প্রবাসকালে বোধ হয় চার বার বিছানায় পড়েছি ম্যালেরিয়া জ্বরে। রক্তাল্পতা এবং আমাশয়ে ভুগেছি, তবে বিছানায় দীর্ঘদিন শুয়ে থাকি নি। মনের জোরে সব কাজ করেছি। বাবার অবর্তমানে অন্নপূর্ণা দেবী এবং জুবেদা খাতুন আমার ঘরে এসেছেন। অন্নপূর্ণা দেবী হরলিকস, পথ্য করে দিয়ে আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। রাত্রে নিখিল এসেছে। নিখিলকে দেখে বাবা বললেন, 'কাল যন্ত্র নিয়ে শিখতে আসবে।' আশিস সব ভুলে যায়, তাই তাকে রোজ শেখাই, ফাঁকিবাজ, না বসলে ফাঁকি দেবে।' বাবা আজ আশিসকে পুরিয়া রাগের একটা সুন্দর সরগম, আলাপ শিখিয়ে শেষ করেছেন। হঠাৎ নিখিল আমার ঘরে এসে কাগজ এবং কলম চাইল। জিজ্ঞেস করলাম 'কি হবে?' বলল, 'পুরিয়ার সরগমটা খুব ভাল, লিখে নেবো।' কাগজ কলম দিলাম। লিখে নিয়ে নিখিল চলে গেল। এই সময়ে জিতেন্দ্র প্রতাপ সিং এবং নিখিল আসে। বাবা আলাদা আলাদা এদের শেখান। নিখিলকে মীড়ের অঙ্গ রিয়াজ করিয়ে সবে মীড় দিয়ে গৎ শিখিয়েছেন, এবং সেই শিক্ষাই চলছে। পরদিন সকালে জিতেন্দ্র প্রতাপ এসে বাবাকে বলল, 'বাবা কাল আপনি নিখিলকে যে পুরিয়ার সরগমটা শিখিয়েছেন, অপূর্ব। সেই সরগমটা রাত্রে এসে শিখব।' বাবা শুনে বললেন, 'আমি তো নিখিলকে পুরিয়ার সরগম শেখাই নি। আশিস ছেলেমানুষ, তাকে মাঝে মাঝে এক একটা রাগ শেখাই। পরীক্ষা করবার জন্য শেখাই, তার স্মৃতিশক্তি কতটা মনে রাখতে পারে। নিখিলকে নতুন ঢংএ শেখাচ্ছি। একটা রাগ ঠিক মত শিখলে সব করতে পারবে। তার মানে বিশ্বাস নাই আমার উপর। কখন শুনলে পুরিয়ার সরগম বাজাচ্ছে।' উত্তরে জিতেন্দ্র প্রতাপ বলল, 'গতকাল আপনার বাড়ি থেকে গিয়ে একটা

কাগজ দেখে বাজাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম পুরিয়া রাগ। ভাবলাম গতকাল মুখে মুখে শিখিয়েছেন তাই কাগজে লিখে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি নিখিলের কাছে থেকে নিলাম না, ভাবলাম শিখলে আপনার কাছ থেকেই শিখব।' হঠাৎ বাবার গলার আওয়াজটা জোর হল। মনে হল বাবা রেগেছেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'যে যেমন তাকে সেই রকম শেখাই। দশ জনকে দশ রকম ভাবে শেখাতি পারি। নিখিলকে নতুন ঢং-এ শেখাতে শুরু করেছিলাম। তার সময় হলে পুরিয়া শেখাব। কত কিছু শিখতে হবে। প্রথমে রাগাধ্যায়, তারপর তালাধ্যায়, রাগ ভেদ, রাগ রাগিনী, শ্রুতি, আন্দোলন কত কিছু শিখতে হবে। ভিত সবে তৈরি করছি। এর মধ্যেই অন্য দিকে মন যায় কেন? আরে আরে নিমকহারাম! ওর বাবার শিক্ষাতে বোধ হয় এই সব করছে। এই আমাদের বাঙ্গালী চরিত্র।' বুঝলাম বাবা চটেছেন। আমার শরীর ভাল নেই, শুয়ে আছি। এই সব কথাবার্তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম্। ভাবলাম, আজ নিখিলের কপালে দুঃখ আছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম বাবা বলছেন, 'নিখিলকে এ সব কিছু বোলো না। রাত্রে এলে যা বলবার আমি বলব।' জিতেন্দ্র প্রতাপ চলে যাবার আগে আমার ঘরে এল। খবরাখবর নিয়ে বলল, 'আপনি কি কাল নিখিলকে কাগজ দিয়েছিলেন সরগম লিখবার জন্য?' কথাশুনে চিন্তিত হলাম, ভাবলাম একি এক তীরে দুই পাখি মারতে চায়? বললাম, 'দিয়েছিলাম। কেউ কাগজ চাইলে দেব না? আপনিই যদি চান দেব না?' জিতেন্দ্র প্রতাপ বলল 'তা তো বটেই' বলে উঠে গেল।

পর দিন সকালে উঠে নিজের কাজে লেগে গেলাম। জ্বর নেই। দুর্বল লাগছে। বাবা আমাকে দেখে বললেন, 'আজ বিশ্রাম কর। কেন উঠেছ?' আমার হাসি পেল এই ভেবে, যদি আজও বিশ্রাম নিই বাবা কাশীতে টেলি করতে বলবেন। বাবা বললেন, 'হাসছ কেন?' কোন রকমে হাসি বন্ধ করে বললাম, 'আমার হাসির রোগ আছে।' বাবাও তা জানতেন। তবুও বললেন, 'হাসির রোগ আছে, পাগল নাকি?' চুপচাপ নিজের ঘরে এসে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করলাম। সন্ধ্যার আগে বাইরে তাকিয়ে আছি। উদ্দেশ্য, নিখিল এলে সাবধান করে দেওয়া। সত্যকথা বলে ক্ষমা চেয়ে নিলেই, বাবা রেগে গেলেও ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু নিখিলের আসতে দেরি হচ্ছিল। ও দিকে বাবা নমাজ পড়তে শুরু করেছেন। আর অপেক্ষা করা চলে না। বাবার নমাজ পড়ার শেষে অপেক্ষারত আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করলাম। নিখিলও ঠিক তখন যন্ত্র নিয়ে এল। প্রণাম করতে যেতেই বাবা চিৎকার করে উঠলেন, 'দূরসে, দূরসে, চোর, চোর মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক।' নিখিল হতভম্ব! নিখিলের মুখ দেখে বুঝলাম জিতেন্দ্র প্রতাপ কিছু বলে নি। বাবা চোখ ছোট করে এবং ভ্রূ কুচকে বললেন, 'তোমার বিষয় যা শুনেছিলাম, দেখছি সবই ঠিক। তোমাকে এক নতুন ঢংএ শিক্ষা শুরু করেছিলাম। আশিসকে যে পুরিয়ার সরগম শিখিয়েছিলাম কাল কেন চুরি করে কাগজে লিখে নিয়ে গেছ। তোমার সময় হলে, তোমাকেও শেখাতাম।' নিখিল নীরবে শুনেছে। হয়তো ভাবছে কি করে জানলেন? আচমকা বাবা চীৎকার করে বললেন, 'ভেক ধরে আছ? নিকালো, নিকালো, নিকালো' বলতে বলতে মারতে উদ্যত হয়ে নিখিলের দিকে এগিয়ে যেতেই, ঐ রূপ দেখে ভয়ে যন্ত্র নিয়ে নিখিল পালিয়ে গেল। বাবা নিজের মনেই বলতে

লাগলেন, 'হারে শয়তান, শয়তান।' আমি ভাবলাম, নিখিল নিশ্চয়ই মনে করল আমিই বাবাকে বলেছি। তাই ঠিক করলাম, পরদিন সকালে গিয়ে তাকে বলব বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে, তা হলেই তাঁর মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। নিখিল তো ধারণাও করতে পারবে না যে জিতেন্দ্র প্রতাপ এসে সব জানিয়ে গেছে বাবাকে।

পরদিন সকালে পোষ্ট অফিস যাবার সময় জিতেন্দ্র প্রতাপের কাছে শুনলাম, গতকাল রাত্রেই বম্বে এক্সপ্রেসে নিখিল বম্বে চলে গেছে, তার ভাইয়ের কাছে। ভাবলাম, এই ধারণা নিয়েই সে গেল যে আমি বাবাকে বলেছি। জিতেন্দ্র প্রতাপকে বললাম, 'এ কাজ কেন আপনি করলেন যার ফলে নিখিলের শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল?' তিনি বললেন, 'ভাবতে পারিনি, বাবা আমার কথার ওপর এত গুরুত্ব দেবেন।' কিন্তু তখন জানতাম না নিখিলেরও যাবার কারণ হিসাবে লোকের মুখে অন্যের নাম যুক্ত হবে। নিখিলের ধারণা যে ভুল, তা তাকে বুঝিয়েছিলাম ১৯৭২ সনে বাবার প্রয়াণের পর। ১৯৫০ সনে সে মোট পাঁচ মাস মৈহারে ছিল আর ১৯৫২ সনে ছিল সাড়ে তিন মাস। মোট মৈহারে ছিলো সাড়ে আট মাস। ১২ জুন রাত্রে চলে গেল। অদৃষ্ট কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানেনা। নিখিল তার এক প্রমাণ।

২৭

বাবার এক বিচিত্র স্বভাব ছিলো। বাড়িতে অতিথি এলে নারায়ণ জ্ঞানে আপ্যায়ন করতেন। নিজে থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কাজের অজুহাতে তাকে যেতেও বলতেন না, ফলে তাঁকে কথা বলতে হত বেশি। আর বেশি কথা বলা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ, যার জন্য মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। অতিথি চলে গেলেই বারবার তামাক খেতেন আর বলতেন, 'মাথা খারাপ করে দিল'। কেউ এলে যদি তিনি দরজা খুলে দিতেন, আপ্যায়ন যথারীতি হত। কিন্তু যদি আমি দরজা খুলে দিয়ে কাউকে বসাতাম, তবে অতিথি চলে যাবার পর আমার প্রতি অগ্নিবর্ষণ হতো। বার বার আমাকে বলতেন, 'মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কেন তুমি দরজা খুলে দিয়েছ?' যদি বলতাম, 'আপনার কাছে এসেছিল বলেই খুলতে হয়েছিল', সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'তুমি বসালে বলেই এতক্ষণ বক বক করতে হল।' তাঁর এ স্বভাব জানা থাকলেও বহুবার তাঁর কাছে কথা শুনতে হয়েছে। অথচ যত কাজই থাক, অতিথির সঙ্গে তিনি কথা বলতে যেতেন বিনা বিরক্তিতে। কারণ একটাই, অতিথি ভগবান, কোন বেশে তিনি পরীক্ষা করতে এসেছেন কি জানি। কিন্তু কেউ যদি আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইতেন তবেই বিপদ। বৃদ্ধ বয়সেও বাবা যে ভাবে অতিথিকে আপ্যায়ণ করতেন তাতে অতিথিরও লজ্জা পাবার কথা। কিন্তু তারা চলে যাবার পর, বার বার শুধু বলতেন, বৃথা অমূল্য সময় নষ্ট হল, কোন কাজ হোল না।

মৈহারে যতদিন ছিলাম বাবার চিঠি পড়া এবং উত্তর দেবার কাজ ছিল আমার। তখন দেখেছি বাইরে থেকে কেউ এসে কয়েক দিন থাকতে চাইলে তিনি বলতেন, 'কেন আসতে চায়? বৃথা সময় নষ্ট করবে, তোমাদের শিক্ষায় বাধা পড়বে। লিখে দাও আসবার কোন দরকার নেই।' চিঠি পড়ে যখন মনে হতো তার কোন বিশেষ পরিচিত লোক, যাঁকে তিনি আসতে বলায় পত্রলেখক আসতে ইচ্ছুক, সে কথা তাঁকে জানালেও তিনি বলতেন, 'আমি

কাউকে আসতে বলিনি।' এ সবক্ষেত্রে আমার মনে হত, তাঁরা ভাবতে পারেন বাবাকে না জানিয়েই আমি প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে জবাব দিয়েছি না আসবার জন্য। তাই হাত জোড় করে বাবাকে বলেছি, 'এরকম লিখলে ভদ্রলোক মনে কষ্ট পাবেন।' তখন বলতেন, 'তোমার আর কি? এখানে আসলে, কোথা থেকে খরচা চলবে?' এর উপর কথা বলা চলে না। ঘরে এসে চিঠির উত্তর লিখতে বসলেই, আমার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতেন। কাছে যাবার পর দু তিনবার বাঁদিকে চোখ ঘুরিয়ে বলতেন, 'আরে আরে, ভাল দেখায় না বলেই খালাস, যা ভাল বোঝ তাই করো।'

তাঁর একটা স্বভাব ছিল বাইরে গিয়ে নূতন কারও সঙ্গে পরিচিত হলে, তাঁকে বলতেন মৈহারের কুটিরে পদার্পণ করলে বাবা কৃতার্থ হবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি এলে যে অবস্থা দাঁড়াত, সে বিষয়ে একটা কাহিনী বললেই তাঁর চরিত্রের একটা দিক বোঝা যাবে।

মৈহারে চিঠি ফেলার সময় ছিল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, রাতের ট্রেনে সে চিঠি চলে যেত। আর এর পর লেট ফি দিয়ে স্টেশনে পোষ্ট করলে, সে চিঠি রাতের ট্রেনেই যেত। একদিন ব্যাণ্ড থেকে এসে বাবা আমাকে একটি জরুরী চিঠি লিখতে বললেন। চিঠি লিখে পোষ্ট করতে যাবার সময় বললেন, 'আগামীকাল সকালে পোষ্ট করলেই চলবে।' লেট ফি দিয়ে, পোষ্ট করার কথা বলায় খুশী হলেন। গরম কাল। স্টেশনে যেতেই দেখি একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী এসেছে। রাস্তায় দেখা হল কাশীর বয়োবৃদ্ধ মৃদঙ্গবাদক মুন্নুজীর সঙ্গে। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল কারণ মহন্ত অমর নাথ মিশ্রের গুরু। সারদা দেবীর মন্দির দর্শনে অনেকেই মৈহারে আসেন। ভাবলাম সাধু প্রকৃতির মুন্নুজীও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন। তাঁকে দেখেই নমস্কার করে বললাম, 'আপনি মৈহারে কি মনে করে? তিনি জানতেন না আমি মৈহারে এসেছি। তিনি আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ?' বললাম, 'বাবার কাছে শিক্ষার জন্য দু'বছরের উপর হোল এসেছি।' শুনে তিনি বললেন, 'তোমার উস্তাদের সঙ্গে এলাহাবাদে যখন রবাবের সঙ্গে বাজিয়েছিলাম, বার বার অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসতে। জব্বলপুর থেকে কাশী যাওয়ার পথে মনে হল তাঁর এখানে কয়েকদিন থেকে কাশী যাব।' একথা শুনে আরো ভালো করে বুঝবার জন্য বললাম, 'বাবা আপনাকে আসতে বলেছিলেন?' তিনিও অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার উস্তাদ না বললে কি আসতাম?' লজ্জিত হয়ে বললাম, 'এক মিনিট দাঁড়ান, আমি চিঠিটা ফেলে আসি তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' হাঁটতে হাঁটতে নানা বিষয়ে কথা হল। দেখলাম তার সঙ্গে একজন ছাত্রও আছে। ভাবলাম সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, আমার কপালে দুঃখ আছে। বাড়ির লনের বাইরে দাঁড় করিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাবা বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। একটু পরেই নমাজ পড়বেন। তাঁকে বললাম, 'মুন্নজী এসেছেন।' ভ্রু কুঁচকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে মুন্নুজী?' বললাম, 'কাশীর মৃদঙ্গবাদক যিনি এলাহাবাদে রবাবের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন। যাঁকে আপনি বার বার আসতে বলেছিলেন, তিনি এক ছাত্র নিয়ে জব্বলপুর থেকে কাশী যাবার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' বাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'আমি কাউকে আসবার জন্য বলিনি, তুমি

স্টেশনে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।' বললাম, 'আমি কেন নিয়ে আসব?' স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে শুনলাম, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাই বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এসেছি।' বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন, 'আরে আরে, কোথায় লোককে নিয়ে এসেছ।' বললাম, 'বাইরে বারান্দার কাছে দাঁড় করিয়ে এসেছি।' এ কথা শুনে বাবা তড়াতাড়ি ঘরের দিকে গেলেন। তাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আরে আরে মহারাজ, আপকো পদধূলি পড়নেসে হামারা কুঠিয়া ধন্য হো গয়া, বিরাজে বিরাজে। দয়া করে আসুন।' বাবা আধা বাংলা আধা হিন্দিতেই অবাঙ্গালীর সঙ্গে কথা বলতেন। অনেকের কাছে বোধগম্য হতো না। বাবা বললেন, 'এ হল কাশীর ব্রাহ্মণ আপনার রাত্রের খাবার বাজার থেকে এনে দেবে।' মুন্নুজী বললেন, 'দিনের বেলায় একবারই ভোজন করি, রাত্রে কেবল দুধ খাই। বাড়ির অকল্যাণ হবে ভেবে বাবা আমাকে গাছ থেকে কমলা লেবু, মৌসম্বী এবং দুধের ব্যবস্থা করতে বললেন, মুন্নুজীর ছাত্রের জন্য বাজার থেকে পুরী, তরকারী, মিষ্টি নিয়ে এলাম। এসে দেখলাম বাবা এই ফাঁকে নমাজ পড়ে মুন্নুজীর সঙ্গে গল্প করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'বাইরে দুটো নেয়ারের খাটের ব্যবস্থা করে দাও।' বাবা মুন্নুজীকে বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে এসেছেন বিশ্রাম করুন। কয়েক দিন থাকলে বাড়ি পবিত্র হবে। এখানে গরু মহিষ আছে। হিন্দু গয়লা দুধ দেয়, কোন অসুবিধা হবে না।' মুন্নুজী নিজের থলে থেকে একটি পাত্র দিয়ে আমাকে বললেন, এই পাত্রে দুধ নিয়ে এসো। সঙ্গে স্টোভ আছে গরম করে নেবো।' তাঁর গলায় চাদর এবং ছোট্ট কৌপিন পরা দেখে বাবা প্রভাবিত হলেন। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'জলের ব্যবস্থা করে দাও আর জিজ্ঞাসা করে এস যদি কোন জিনিষের প্রয়োজন হয় জানাতে।' মুন্নুজীকে কুয়োর পাশে কল দেখিয়ে দিলাম। পরিবেশ দেখে খুশী হয়ে বললেন, 'এ রকম নির্জন জায়গা সাধনার জন্য খুব ভালো।' নিজেই বললেন, আমি চারটেয় উঠে পড়ি এবং উঠে মাঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বেড়িয়ে আসি।' বাবার কথা মত তাঁর আর কোন জিনিষের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাওয়ায়, তিনি বললেন, 'নেয়ারের খাটে আমি শয়ন করি না, আমার জন্য একটা চৌকি ব্যবস্থা করে দাও।' এ কথা বাবাকে বলায়, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আরে আরে নেয়ারের খাটে শোন না', বলেই বুদ্ধাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বাবুর দেশের অতিথি এসেছে, কাঠের চৌকির ব্যবস্থা করে দাও।' এ কথা বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যেমন, তোমার কাশীর লোকও তেমনি। অবাক কথা নেয়ারের খাটে শোয় না। কাঠের চৌকিতে শোয়।' ভাবলাম এখন তো সবে যন্ত্র মেলান হচ্ছে, বাজনার ঝালা কি ভাবে শেষ হবে ভগবানই জানেন। বুদ্ধাকে দিয়ে কাঠের চৌকির ব্যবস্থা করলাম। ভগবানের দয়ায় বাবার এখানে কোন জিনিষেরই অভাব নেই। প্রথম রাত নির্বিঘ্নে কাটল। পরের দিন সকালে বাবা মুন্নুজীকে গোশালা দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে আপনি রান্না করে খাবেন। আপনার ভোজনের জন্য কি কি দরকার দয়া করে বলুন।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ আপনার চাল, ডাল, তরিতরকারী, মশলা যা লাগবে ব্যবস্থা করে দেবে।' মুন্নুজী গোশালা দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন, 'আমার জন্য কেবল ঘি এবং সিঙাড়ার আটা আনিয়ে দিন। আমি পুরী এবং হালুয়া

বানিয়ে খাব।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, ' কোন সঙ্কোচ করবেন না। কেবল পুরী এবং হালুয়া কেন খাবেন?' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ সব জিনিষ কিনে নিয়ে আসবে।' মুন্নুজী বললেন, 'দুপুরে আমি ভাত তরকারী খাই না। কেবল পুরী আর হালুয়া খাই। রোজ এই আমার খাদ্য।' বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আরে আরে আপনি তো মহাত্মন, ঋষির জীবন যাপন করেন। মহাভাগ্য আমার আপনার মত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়েছে।' আমাকে বললেন, হরলিক্সের একটা শিশি, খুব ভাল করে ধুয়ে, বাজারে গিয়ে এক শিশি ঘি এবং আটা কিনে আনো। হাটবাজার সেরে বাড়ি ফিরে প্রথমেই গোশালায় গিয়ে দেখলাম জায়গাটা গোবর দিয়ে নিকোন হয়েছে কিনা। মুন্নুজীর নিজের কড়া, থালা, গেলাস দেখে বার বার এক কথাই বাবা বললেন, 'আপনার মত সাত্ত্বিক লোক দেখে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে।'

মুন্নুজীর রান্না হালুয়ার পরিমাণ দেখে আশ্চর্য হলাম। এক কড়াই হালুয়া। মাত্র কয়েকটা পুরী। আমাকে একটা থালা আনতে বললেন। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ দেবেন। ভোগ দিয়ে নিজের জন্য সামান্য হালুয়া এবং একখানা পুরী রেখে ছাত্রকে কিছুটা দিলেন। বাকী সব হালুয়া আমাকে দিয়ে বললেন, প্রসাদ নিয়ে বাড়ির সবাইকে দিও।' খাবার সময় পুজোর হালুয়া বলাতে বাবা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে খেলেন।

সন্ধ্যা বেলায় বাবা মুন্নুজীর সঙ্গে ধ্রুপদ এবং তাল নিয়ে আলোচনা করলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ সুলতালের ঠেকা মৃদঙ্গে কিভাবে বাজান।' সুলতাল, ধামার এবং একটি চতুরঙ্গ বাবা শিখিয়েছেন। নাতিরা পালটা রিয়াজ করে, রোজ চতুরঙ্গ ত্রিতালে, এবং দুটি গান করে ধামারে এবং সুলতালে। সুলতালের ঠেকা আমার জানা ছিল। মুন্নুজী যে মুহূর্তে সুলতালের ঠেকা বললেন, বাবা আনন্দে তাঁকে ধরে বললেন, 'আমার গুরুর কাছে এই ঠেকা শিখেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো কাছে শুনি নি। সকলেই দুই দুই ছন্দে পাঁচ বার বাজায়। এ হল প্রাচীন ঠেকা। আমার এতদিনকার জীবনে কেবল আপনার কাছে এই ঠেকা শুনলাম। আপনি মহাগুণী।' রাত্রি নটা পর্যন্ত তাল নিয়ে বাবা এবং মুন্নুজীর মধ্যে নানা বোল পরণ শুনলাম। বাবা মুন্নুজীকে বললেন, 'দুধ ফল খেয়ে বিশ্রাম করুন।' মুন্নুজীর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে ভিতরে এসে দেখি বাবা বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'লোক দেখে কেন ত্রস্ত হই বুঝতে পারছ? দুই দিন তোমার কোন রিয়াজ হচ্ছে না, এবং শিখতেও পারছ না। কেন যে লোক আসে বুঝি না। কাশীর লোক বলে বাড়িতে নিয়ে এসেছ।' উত্তরে বললাম, 'আমি কেন নিয়ে আসব? আপনি এলাহাবাদে বলেছিলেন বলেই এসেছেন।' বিরক্তি সহকারে বললেন, 'আরে বল কি? তুমি না নিয়ে এলে, আমি কি তাকে ডেকে নিয়ে এসেছি?' আবার বললাম, 'মুন্নুজী আপনার কাছে আসছিলেন দেখে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এটাকে কি আমার আনা বলে?' এবারে ঘৃত আহুতি পড়ল। বাবার কাছে সকলেই ছিল চিনির বলদ, আমিও। কিন্তু তবুও অনেক ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছি। তিনি রাগ দেখিয়েছেন কিন্তু আমার কথা রেখেছেন। আমার প্রতি আস্থা ছিল বলেই হয়তো তিনি শিং নাড়লে আমাকে ঘাঁটান নি। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'এতক্ষণ বৃথা বক বক করে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভেদ লাগাও কবে যাবে?' মুন্নুজীর সামনে তিনি বললেন, আনন্দ

পাচ্ছেন, আমাকে বলছেন ভেদ লাগাও। এই কথা ভেবে আমার হাসি পেল। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আরে আরে তোমার এই কথা শুনে হাসি পায়?' এ কথা শুনে হাসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু হাসি আমার স্বভাব, কারণে বা অকারণে তাই তাঁর গম্ভীর মূর্তি দেখেও হাসতে হাসতেই বললাম, 'আপনার কষ্ট দেখে হেসে ফেলেছি।' বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আরে আরে, তুমি পাগল নাকি, কারো কষ্ট দেখে হাসি পায় নাকি? বুঝেছি হাসিটা তোমার রোগ, যাক ভেদ লাগাও কবে যাবে এখান থেকে।' ঝড়ের সংকেত দেখতে পাচ্ছি। দুই রাত্রি বাস হয়েছে। মুন্নুজীর মত এমন সদাশয় ও সাধু প্রকৃতির লোক সঙ্গীত জগতে কমই দেখেছি। রাত্রে ভেদ লাগাতে সঙ্কোচ হল। কি করে জিজ্ঞাসা করব কবে তিনি যাবেন? কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন বাজারে যাবার আগে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নিয়ে আসা অতিথিকে জিজ্ঞাসা কর কিছু আনতে হবে কিনা?' মুন্নুজীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অম্লান বদনে বললেন, 'গতকাল যা এনেছিলে, তাই নিয়ে এস।' বাবাকে সে কথা বলাতে তিনি বললেন, 'বল কি, এক দিনে এক শিশি ঘি এবং আটা শেষ হয়ে গেছে?' শুনে বললাম, 'তিনি একটা পুরী এবং নাম মাত্র হালুয়া খান। গতকাল তো একথালা হালুয়া এবং পুরী ভোগ লাগিয়ে বাড়ির জন্য দিয়েছিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আমাদের প্রসাদের দরকার নাই, নিজে প্রসাদ খান। চল তো দেখি।' এই কথা বলেই বাবা হন্ত দন্ত হয়ে গোশালায় গিয়ে মুন্নুজীকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি তো কিছুই খান না, আমাদের জন্য প্রসাদ চাই না। আপনার জন্য ঘি এবং আটা আনিয়ে দিচ্ছি। আপনি এবং আপনার ছাত্রই খাবেন।' এই কথা বলেই বাবা আমায় বললেন, 'ঘি এর শিশি নিয়ে চল আমার সঙ্গে।' বাজারে গিয়ে বাবা আমাকে ঘি এবং আটা কিনে দিলেন। বাড়ি চলে এলাম। সন্ধ্যার সময় মুন্নুজী বললেন, 'আগামীকাল রাত্রের ট্রেনে কাশী যাবো। সারদা দেবীর অধিষ্ঠান মৈহারে। সুতরাং তীর্থক্ষেত্র। শাস্ত্র বলে তীর্থক্ষেত্রে তিনরাত্রি বাস করতে হয়।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'না না মহারাজ, সে হবে না, আপনার মত সাত্ত্বিক বিচারের সাধু এখানে রয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্য। এক সপ্তাহ থেকে তবে যাবেন।' এ কথা শুনে মুন্নুজী বললেন, 'ঠিক আছে আপনি যখন এত বলছেন কালকের দিনটা থেকে পরশু সকালে যাব। কাশীতে অনেক কাজ আছে।' বাবা আর জোর করলেন না। রাত্রে খাবার সঙ্গে মৃদঙ্গে মুন্নুজী সঙ্গত করলেন। বাবা মুন্নুজীর প্রশংসা করলেন।

পরদিন বাবা জিজ্ঞেস করাতে, জেনে এলাম মুন্নুজীর রান্নার কোন জিনিষেরই প্রয়োজন ছিল না। তাঁকে জানালাম সে কথা। সন্ধ্যায় মুন্নুজী বাবাকে বললেন, 'অনুমতি দিন, আজ রাত্রের ট্রেনে যাব।' বাবা বললেন, 'না না একদিন আরো থেকে যান। কাশীতে যখন কাজ আছে জোর করব না। কাল সকালে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রের ট্রেনে যাবেন।' মুন্নুজী বললেন, 'তীর্থক্ষেত্রে তিনদিনই থাকি। আপনার কথায় আজ রাত্রি থেকে কাল সকালেই ট্রেনেই যাবো।' বাবা আর জোর করলেন না। আজ রাত্রেও সঙ্গীত নিয়ে অনেক আলোচনা হল। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পঞ্চম সওয়ারীর ঠেকা আপনি কি বাজান।' মুন্নুজী ঠেকা

বললেন। বাবার ঠেকার ছন্দের সঙ্গে মিলল না। বাবা পরে বললেন, 'অর্দ্ধ মাত্রার কোন ঠেকা, যেমন সাড়ে সাত, সাড়ে আট, সাড়ে নয়, কি রকম ভাবে বাজান।' মুন্নুজী সহজভাবে বললেন, 'অর্দ্ধ মাত্রার ঠেকা জানি না। অর্দ্ধ মাত্রার ঠেকা কখনও শুনি নি এ পর্যন্ত।' বাবা অর্দ্ধ মাত্রার ঠেকা দু রকম বুঝিয়ে দিলেন। আমারও শেখা হয়ে গেল। চার রাত্রি বাস করে সকালে ছাত্রকে নিয়ে মুন্নুজী কাশী চলে গেলেন।

অতিথির উপর এরকম মনোভাবের কথা পড়ে পাঠক বাবার সম্বন্ধে ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু এ মনোভাবের কারণ অন্য। মৈহারে যাবার আগে তাঁকে দেখেছি খুব সহজ সরল কৌতুকপ্রিয়, কিন্তু মৈহারের বাড়িতে দেখেছি অন্য রূপ। তাঁর মুখে কোন কথা নেই, ভয়ে সবাই ধীরে ধীরে কথা বলে। মাকে একদিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে মা বলেছিলেন, 'চিরটা কালই তো বাড়িতে এই রকম দেখেছি। রাগই দেখেছি, হাসতে দেখি বাইরের কেউ এলে।' এখানে এতদিন থেকে বুঝেছি বাড়িতে একটা কঠিন আবরণের সৃষ্টি করেছিলেন। এটা না হলে বাড়িতে সঙ্গীতের বাতাবরণ থাকত না। তিনি বুঝতেন কাজ, শুধু ঘুমোনোর সময়টুকু ছাড়া। তাঁকে বলতে শুনেছি 'কর্মাধীন ভগবান এবং কর্মহীন পশু।' তাঁর দৈনন্দিন জীবন চলত ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। সুতরাং কেউ এলে তাল কেটে যেত। মুখের উপর সে কথা বলতে পারতেন না তাই রাগটা প্রকাশ পেত বাড়ির লোকের উপর আর একটা কারণ ছিল। অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁকে দৌড়াদৌড়ি করতে হত, নিজের কাজ করতে পারতেন না, তার জন্য মাথা গরম হত। তাঁর মনে হত অতিথির পরিচর্যা হয়ত ঠিক মত হচ্ছে না।

কাশী থেকে আমার টেলিগ্রাম এল। বাবাকে জানালাম। এর আগে তিনিই যেতে বলেছেন, যাই নি তার জন্য তিনি খুশীই হয়েছেন। আজ কিন্তু শুনেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'যাও, চিকিৎসা করিয়ে এস। তবে বেশী দিন না বাজিয়ে থাকা ভাল নয়, তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করিয়ে চলে এস। আমার এক ছাত্র আছে কাশীতে তার সঙ্গে দেখা করে এস।' কিছুদিন আগে কাশী থেকে বাবার কাছে তাঁর চিঠি এসেছিল। বহুদিন আগে তাঁর দুই মেয়েকে কবিরাজ আশুতোষ বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন বাজনা শেখার উদ্দেশ্যে, অন্য সময়ে তারা রান্নার কাজে সহায়তা করবে মাকে। একদিন নজরে পড়ে একটি মেয়ে কড়া ভর্ত্তি দুধে হাত দিয়ে সর তুলে খাচ্ছে। পত্রপাঠ বাবা বিদায় করেছিলেন। ভদ্রলোক এনায়েৎ খাঁর কাছে শিখেছিলেন। পরে বাবার কাছে শেখেন। বাবা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বাবা আরও বললেন, 'কবিরাজ দাদুর সঙ্গে দেখা করে তবলা শুনো। তবলার ঠেকা শিখে এস।' বুঝলাম না এ আবার কোন পরীক্ষা।

পরের রাত্রে কাশী যাওয়া ঠিক হল। কাশী গিয়েই বাবার ছাত্র অধিকারী বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কাছে শুনে অবাক হলাম যে বাবার সমসাময়িক এক উস্তাদ অধিকারীবাবুকে বলেছিলেন, যদি দেখ কোন ছাত্র খুব ভাল বাজাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কিছু লোক রোজ পাঠাবে, সেই ছাত্রকে প্রশংসা করবার জন্য। প্রশংসা শুনে তার সঙ্গীতের বারটা বেজে যাবে। অধিকারীবাবুর ভূতপূর্ব সেই উস্তাদ তাঁকে সঙ্গীতের এই তালিমটিই প্রথম

শিখিয়েছিলেন। অথচ বাবা সে দিকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কেউ কিছু জানতে চাইলে বলে দিতেন। বুঝলাম, কেন বাবা আমাকে সরোদ নিয়ে কাশী আসতে দেন না। তাঁর অন্যান্য উপদেশগুলোও মনে পড়তে লাগল।

কাশীতে আমার শুভানুধ্যায়ী অমর নাথ মিশ্রের কাছে শুনলাম, তাঁর বড় দাদা মারা গেছেন, যিনি বর্তমান সঙ্কটমোচনের মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের বাবা। কাশীতে এবার সাহিত্যিক বলদেব উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হল না। খবর পেলাম লক্ষ্ণৌতে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে গিয়েছেন। বলদেবজীর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। মৈহার যাবার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৈহার যাবার পরিকল্পনা করেছি, ঠিক কিনা? উত্তরে বলেছিলেন, 'দেরী না করে অবিলম্বে চলে যান।' তাঁর মতো শিক্ষিত লোকের মূল্যবান কথাটি আমি ভুলি নি। আশুতোষের ডিস্‌পেনসারিতে গুল্লুজীর সঙ্গে গেলাম। দেখি তবলাবাদক কিষণ বসে আছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিল্লীতে আলি আকবর, বিলায়েৎ ও রবিশঙ্করের বাজনা কেমন হয়েছিল?' কিষন বলল, 'সকলে বলে বিলায়েৎ নাকি খুব তৈরি ঝালা বজায়, কিন্তু রবিশঙ্করের ঝালা শুনে মনে হল না বিলায়েৎ তৈরি ঝালা বাজায়। আসলে প্রচার তাই ছিল। তবে এটা ঠিক এই বাজনায় নিজের লোক লাগিয়ে তালি পেটান হয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আলি আকবর কেমন বাজিয়েছিল?' কিষাণ বলল, 'যে যতই বাজাক, একটু বাজিয়েই আলি আকবর সকলকে মোহিত করে দেয়।' চুপ করে সব শুনলাম। বাবা বলেছিলেন আলি আকবর বেশি বাজায়নি।

আশুতোষকে নিজের ব্যাধির কথা বললাম। ওষুধ দিলেন। ডাল খেতে বারণ করলেন। বাবার কথাও তাঁকে বললাম। মনে মনে ভাবলাম আমারও এ ওষুধ চলবে না। আমাদের গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এ্যানিমিয়ার কথা শুনে বললেন, ' টেনশন থেকে এ রকম হচ্ছে।' আমাশার ওষুধ দিলেন। চোখ পরীক্ষা করাতে বললেন। পরীক্ষায় চোখের রোগ ধরা পড়ল না। মহন্ত অমরনাথ মিশ্রের বাড়ি কয়েকদিন গেলাম। গঙ্গার ধারে বাড়ি। শহরের মধ্যে এত নিরিবিলি জায়গা ভাবা যায় না। সাধনার জন্যও এ স্থান ভাল। তুলসীদাস এখানে থাকতেন। এখানে বসেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর পাদুকা এবং অন্যান্য জিনিষ সযত্নে রাখা আছে। অমর নাথ মিশ্রের পূর্বজদের তুলসীদাস এই স্থান দান করে গিয়েছিলেন। অমর নাথের মত সাত্ত্বিক লোক কমই দেখেছি। বাবার সঙ্গে এলাহাবাদে রবাবের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন। বাবার সম্বন্ধে বললেন, 'তোমার ভাগ্য খুব ভাল এমন মহাপুরুষের সঙ্গে আছ। খুব ভাল করে শিক্ষা করে এসো।' তাঁর সঙ্গে সঙ্কটমোচন দর্শন করতে গেলাম।

একদিন আশুতোষের বাড়ি গিয়ে তাঁর তবলা শুনলাম এবং বললাম, 'বাবা আপনার ঠেকা শিখে যেতে বলেছেন।' তিনি ঠেকা দেখালেন। তাঁর কয়েকজন ছাত্রের বাজনাও শুনলাম। বাবা তাঁকে নাতির মত স্নেহ করতেন। আলি আকবর, রবিশঙ্করের সঙ্গে অনেক বাজিয়েছেন শুনেছি। বাবাও অনেকবার নিয়ে বসেছেন।

কাশীতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। কে, কবে কোথায় কত ভাল বাজিয়েছেন, তা

জানানো আর পরনিন্দা, পরচর্চাই হল প্রধান আলোচ্য বিষয়। অথচ বাবা, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর, এঁদের কথায় এসব কখনও প্রকাশ পেতে দেখিনি। সঙ্গীতজ্ঞের জগতে, মৈহার এবং কাশীর কত তফাৎ চোখে পড়ল।

এখানে হরেন ভট্টাচার্য এবং স্বরোদ বাদক ভোলা ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হোল। ভোলা ভট্টাচার্য বললেন, 'পনের দিন পর লক্ষ্ণৌতে আমার বাজনা আছে।' তারিখ এবং সময় লিখে নিলাম। কথায় কথায় বললাম, 'কাশীর জনৈক ব্যক্তি মিথ্যে তথ্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বাবাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন, বাবা যেন আমাকে না শেখান।' তাঁরা অবাক হয়ে বললেন, 'কে এমন কথা লিখেছে।' এ কথা শুনে হাসি পেল। বললাম, 'পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়।'

জ্যোতিষ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'আপনার দেওয়া 'মিউজিসিয়ানস অব ইণ্ডিয়া' বইখানায় আমার অনেক উপকার হয়েছে।' তিনি বাবার খুব প্রশংসা করলেন। পূর্ববঙ্গের জমিদারী চলে যাওয়ায় মুসলমানদের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। কিন্তু বাবার সম্বন্ধে বললেন, 'বাবা তো মুসলমান নয়, খাঁটি বাঙ্গালী।'

বাবাকে চিঠি দিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত জবাব পেলাম।

মাইহার, ২১-৬-৫২

কল্যাণবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তুমার পত্র এই মাত্র পাইলাম। তুমার মা ভাল আছেন জেনে সুখী হলাম তুমার কর্ম সেরে আসিবে। আসিবার সময় যদি পার ১০ টাকার কনফ্লেট নিয়ে আসিবে, এলাহাবাদে পাইবে। এলাহাবাদ হতে কিছু বড় কলকে যদি আনতে পার ও বেত নিবে স্টেশনের সামনের বড় রাস্তায় পাওয়া যায় তুমার বন্ধু বান্ধব আত্মিয় সকল আমার স্নেহ আশীর্বাদ জানাইবে। একপ্রকার তুমার মঙ্গল কামনা করি। অদ্য খুব বৃষ্টি হয়েছে। তুমার মায়ের ঘরের ছাত দিয়ে কিছু জল পড়ে এই জন্য মন খারাপ হয়ে গেছে। তুমি এলে পর যা হয় করা যাবে। বৃষ্টির দুরুন পায়ের ব্যাথা খুব বেড়েছে প্রায় পূর্ব্বের মত, তুমার মায়ের আশীর্বাদ জানিবে ছুটদের প্রণাম নিবে আর সব মঙ্গল ইতি

বাবা
আলাউদ্দিন

কয়েকদিন থেকে, কাশী হতে মৈহার যাত্রা করলাম। পথে এলাহাবাদ পৌঁছে সুপ্রভাত পালের বাড়ি গেলাম। তাঁর কথা বাবার কাছে খুব শুনেছি। মৈহার যাবার আগে যখন এলাহাবাদ যেতাম তখন পরিচয় হয়েছিল। বাবা এলাহাবাদ থেকে হুঁকোর চিলিম নিয়ে যেতে বলেছিলেন। তিনিই তা কিনে দিলেন। আলি আকবর, রবিশঙ্করও তাঁর বাড়ীতে উঠতেন। তাঁর মা, দিদি সকলের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বিকালে মৈহার যাত্রা করলাম। রাত দুটোয় মৈহার পৌঁছে বাড়ি গিয়ে বাইরে শুয়ে রইলাম।

২৮

পরদিন আমাকে দেখেই বাবা বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে এলে?' বললাম, 'বাজনা বন্ধ হওয়ার জন্য চলে এলাম।'

তাড়াতাড়ি ফেরায় বাবা খুশী হয়েছেন বুঝলাম। দেখলাম অনেক চিঠি জমেছে। সব চিঠির জবাব দিলাম। রাত্রে বললেন, 'আশু দাদুর কাছে তবলা শুনেছ কি না?' বললাম, 'শুনেছি।' একথা শুনে বাবা হঠাৎ তবলা বার করে, তবলায় বুড়ো আঙ্গুল কিভাবে রাখতে হয় শেখালেন। যন্ত্রে যেমন প্রথমে পাল্‌টা বাজান হয়, তবলায় কি ভাবে প্রথমে রিয়াজ করতে হয় এক ঘণ্টা ধরে দেখালেন। কি করে যন্ত্র মেলাতে হয় বোঝালেন। এ যাবৎ দেখেছি তবলা মেলাতে বাদকরা দীর্ঘ সময় নেন কিন্তু বাবার অতি অল্প সময়ে মেলাবার পদ্ধতি দেখে অবাক হলাম। তবলার প্রথম শিক্ষার্থীকে যেভাবে শেখান হয়, তা থেকে কত প্রভেদ দেখে বিস্মিত হলাম। আজ মনে হয় তাঁর কাছে কি সম্পদই না ছিল! বাবা বললেন, 'রবিশঙ্কর আগামীকাল মৈহার আসবে।' শুনে খুব আনন্দ হল। কাশীতে শুনে এসেছি সাতই জুলাই গুরু পূর্ণিমা। কাশীতে এই দিন গুরুরা ছাত্রের কাছে অনেক কিছু পেয়ে থাকেন এবং নিয়ম পালন করতেও দেখেছি। কিন্তু মৈহারে সে সব কিছু দেখিনি। ভাবলাম রবিশঙ্কর এলে গুরু পূর্ণিমার কথা বলব।

পরদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। রাত্রি আটটার পর বৃষ্টি নামল। রাত্রে রবিশঙ্করকে আনতে স্টেশনে গেলাম। যাবার পথে এক হাঁটু জল। রাত দুটোয় গাড়ি এল। জল দেখে রবিশঙ্কর বললেন, 'রাত্রে স্টেশনেই কাটাতে হবে।' টাঙ্গাও অনুপস্থিত। ষ্টেশন মাষ্টার মুস্তফীবাবু এবং চায়ের ষ্টলের, জলির সাহায্যে টাঙ্গার ব্যবস্থা করে রবিশঙ্করকে বাড়ি নিয়ে এলাম। বাড়ি এসে তিনি অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আমার প্রশংসা করে বললেন, 'আজ যতীন না থাকলে স্টেশনেই রাত কাটাতে হত।' আড়ালে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্ল্যাকমেল করে যে চিঠি এসেছিল তা অন্নপূর্ণাকে বলনি তো?' উত্তরে বললাম, 'পাগল হয়েছেন? এসব কথা বলে সংসারে অশান্তি ডেকে আনব?' শুনে তিনি খুশী হলেন। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন রবিশঙ্কর বাবার চন্য সিগার, ওভালটিন, হরলিক্স আরও কিছু নিয়ে এলেন। সকালে বাবার সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'প্লেনে মাদ্রাজ থেকে এসেছি।' প্লেনে চড়ায় বাবার ভীতি ছিল। কখনও চড়েন নি। কিছুদিন আগে যোধপুরের মহারাজা নিজেই প্লেন চালিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। বাবা বললেন, 'প্লেনে যাবে না।' রবিশঙ্কর বললেন, 'রেডিওর চাকরিতে, ছুটি বেশি পাওয়া যায় না বলে, প্লেনেই যাতায়াত করতে হয়।' বাবা দোনামনা করে সম্মতি দিলেন।

বাবা বাজারে যেতেই রবিশঙ্কর আমাকে উপরে ডাকলেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখলাম। রবিশঙ্কর তিনটে সাড়ী বের করে অন্নপূর্ণা দেবীর হাতে দিয়ে বললেন, 'মাদ্রাজ থেকে কিনে এনেছি।' এই কথা বলেই পাঁচ শ' টাকা হাতে দিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী সাড়ী হাতে নিয়ে খাটের উপর রেখে দিলেন। দেখলেনও না কেমন সাড়ী। আমি বিস্মিত! আমার দিদি, বৌদিদের দেখেছি সাড়ী পেলে কত খুশী, কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলাম অন্নপূর্ণা

দেবীকে। টাকাও খাটের উপর রেখে বললেন, 'এই রকম সাড়ী এবং টাকা কতজনকে দাও।' এ কথায় রবিশঙ্করের মুখের করুণ চেহারা দেখে মায়া হল। কোন কথা নেই মুখে, ঠিক যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। মিন্‌মিনে গলায় বললেন, 'মাদ্রাজের সাড়ী খুব ভাল বলে নিয়ে এসেছি।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'আমার ভাল সাড়ীর দরকার নেই। তুমি কি ভেবেছ সাড়ী পেলে আমি খুব খুশী হব। আমার কাছে সাধারণ সাড়ীই ভাল।' এ সব শুনে, আমার সঙ্কোচ হওয়ায়, কাজের বাহানা করে নেমে এলাম। বিকেলে রবিশঙ্করকে বললাম, 'আগামী কাল গুরু পূর্ণিমা। কাশীতে ছাত্ররা গুরুকে মালা, চন্দন, ধূপকাঠি, মিষ্টি এবং প্রণামী দিয়ে পুজো করে। সুতরাং কাল বাবাকে পুজো করব।' রবিশঙ্কর বললেন, 'মৈহারে কখনও এসব হয়নি। তবে আগামী কাল নিশ্চয়ই হবে।' রবিশঙ্কর বুদ্ধাকে টাকা দিয়ে সব ব্যবস্থা করতে বলল।

পরদিন সকাল বেলা যখন বাবাকে মালা, চন্দন দিয়ে বললাম, 'আজ গুরু পূর্ণিমা।' বাবা অবাক হলেন কিন্তু মনে মনে খুশী হলেন। বললেন, 'আমি তো সে রকম গুরু হতে পারিনি। সুতরাং এসব কেন?' একে একে রবিশঙ্কর, অন্নপূর্ণাদেবী, ছেলেরা এবং আমি মালা চন্দন পরিয়ে প্রণাম করলাম।

দুপুরে খাবার পর রবিশঙ্করের কাছে অদ্ভুত এক কাহিনী শুনলাম। বুঝলাম রবিশঙ্কর অত্যন্ত কান পাতলা। তার শিষ্য হরিহরকে নিয়ে অনেক কথা হল। বুঝলাম এইসব চামচেরা নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য কত নীচে নামতে পারে। আসলে রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর দুজনেই স্তাবকের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। স্তাবকেরা এই কাজ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে গুরুপুত্র এবং জামাই বলে শ্রদ্ধা করি। তাঁরাও আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। আমি সর্বদাই এদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করবার পরামর্শ দিই। বুঝি এরা এসব শুনতে অভ্যস্থ নয় তবুও চুপ করে থাকে।

রবিশঙ্করের কথায় বুঝলাম, অন্নপূর্ণাদেবীর অবর্তমানে চামচেদের হয় পোয়া বারো, যা তিনি থাকলে হয় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে সকলেই ভয় পায়। এর ফলে নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। রবিশঙ্কর ছাত্রদের সমবেদনা পাবার জন্য যখন বলে, অন্নপূর্ণাদেবী তার মনোমত সাজপোষাক পরে না, সিনেমা যায় না, সেই সময় চামচেরা রবিশঙ্করকে সমর্থন করে। এসব ছাত্ররা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শেখবার সুযোগ পায় না। তারা নিজেদের গুরুজীকে অনুরোধ করে, তার অবর্তমানে যেন অন্নপূর্ণা দেবী তাদের শেখান। রবিশঙ্করও অন্নপূর্ণা দেবীকে বলে শেখাবার জন্য। অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, 'তোমার কাছে যখন শিখছে তখন কি শেখাব? আমি কি জানি?' ছাত্ররা এক বাড়িতে থেকেও অন্নপূর্ণা দেবী রাত্রে কখন রিয়াজ করেন শুনতে পায় না। অথচ তারা জানে তিনি যথেষ্ট গুণী। একবার তারা ডুয়েট শুনেছে। তারা এটুকু বুঝতে পারে, কে কতটা বাজায়। এই সব কারণে চামচেরা রবিশঙ্করের কান ভারি করে। তিনিও সব বিশ্বাস করেন।

রবিশঙ্করের কাছে ব্যাপারটা শুনে আমার কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আগের বারও আপনাকে বলেছিলাম, ছোট থেকে যে পরিবেশে অন্নপূর্ণা দেবী মানুষ হয়েছেন তা বদলান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বাবার কাছে এতদিন থেকে বুঝতে

পারেননি, সঙ্গীতই হল তাঁর আসল অলঙ্কার। সে অলঙ্কারের শোভা যে দেখেছে তাকে এই মিথ্যা আড়ম্বর পীড়া দেয়, তা ছাড়া হরিহর একটা চামচে। সে এবং অন্যান্য ছাত্ররা নিজেদের গুরুমা সম্বন্ধে এসব কথা বলবার সাহস পায় কোথা থেকে? আমার মনে হয় কয়েকটা কথা মনে রাখলে আপনার মঙ্গল হবে। প্রথমতঃ দেখবার প্রণালী সকলের সমান হয় না। সুতরাং কান পাতলা হবেন না। নিজে বিচার করবেন। দ্বিতীয়তঃ উড়ো খবর যারা রটায় তারা ভিতরে তলিয়ে দেখে না। শেষ কথা হল জীবনের আনন্দ গৃহস্থালীতে, চাকরিতে নয়। চাকরিটা বজায় রাখতে হয় গৃহস্থালীর সুবিধা হবে বলে। সুতরাং চামচেদের দূর করুন। আপনি কি চান, তিনি দিনরাত চাকরাণীর মত আপনার ছাত্রদের সেবা করবেন? আপনি কি বোঝেন না, আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্য নীরবে সব কাজ করে যান? অথচ আপনি? আপনার ভোলা উচিৎ নয় আপনি কাকে বিয়ে করেছেন। জানি এ কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগছে না। কথায় আছে উচিত কথা বললে পরে জ্বলবে লোকের হাড়। আমার কথায় রাগ না করে একটু ভেবে দেখবেন।'

একনাগাড়ে এত কথা বলে চুপ করে গেলাম। মনে মনে বলি, ঝগড়া কি শুধু মুখে হয়? মনের সঙ্গে মনের ঝগড়া হয় না? রুচির সঙ্গে রুচির? নিজের ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে অন্যের ব্যাকগ্রাউণ্ডের? আসলে এইসব কারণে বনিবনা হয় না। বুঝলাম, আমার কথায় রবিশঙ্কর ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, 'তুমি তো কেবল আমারই দোষ দেখ। একটু তো বোঝাতে পার অন্নপূর্ণাকে এ্যাডজাস্ট করে চলতে। আমার ছাত্ররা বাড়ির সব কাজ করে। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা চিঠি লেখে, ট্রেনের, প্লেনের টিকিট কাটা ইত্যাদি কাজ করে।' তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমিও তো বাড়ির সব কাজ করি, তা বলে মায়ের বিরুদ্ধে বাবাকে বলব?' বাবা তো আমাকে এত বিশ্বাস করেন যে মার হাতে টাকা না দিয়ে আমার হাতে দেন। কিন্তু আমি, বাবা হাজার বলাতেও, ড্রয়ারে টাকা রেখে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিই।' রবিশঙ্কর চুপ। পরে বললেন, 'ঠিক আছে, দেখি হরিহরকে কি উপায়ে হটাতে পারি।' আর বিশেষ কোন কথা বলা উচিত নয় ভেবে নীচে চলে এলাম।

রবিশঙ্কর এই প্রথম, মৈহারে আট দিন থেকে দিল্লী গেছে। তাঁকে এবারে পেয়েছি অনেকদিন। তাঁর আসবার তিন দিন পরেই বাবা এলাহাবাদ গেলেন। বাবার যাবার পরই দিল্লীর প্রোগ্রামের জন্য টেলিগ্রাম এলো। এলাহাবাদে সুপ্রভাত পালকে টেলিগ্রাম করে দিল্লীর প্রোগ্রামের কথা জানিয়ে দিলাম। এবারে দিনরাত রবিশঙ্করের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললাম। তার সম্বন্ধে আমার দুটো ধারণা হল। প্রথমতঃ মনে হল তিনি মুখে এক রকম কথা বলেন, কিন্তু কাজে আর এক রকম করেন। মুখে খুব মিষ্টি, ভেতর বোঝা শক্ত। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধও হয়েছি। এত নাম হয়েছে কিন্তু কত সহজ সরল। বাজনা সম্বন্ধে কোন হামবড়াই করে না। এর মধ্যে ব্যাণ্ড পার্টির সকলকে বাড়িতে ডেকে ব্যাণ্ড শুনেছে। মিষ্টি খাইয়েছে। সঙ্গীত নিয়ে তার সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। বুঝেছি বড় বাদক হলেও থিওরি সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। ডাক্তার গোবিন্দ সিং এবং স্টেশন মাষ্টারের অনুরোধে একদিন বাড়িতে বাজিয়েছে। সঙ্গত করেছে সুরদাস।

লক্ষ্য করেছি অন্য বারের তুলনায় বাবা রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা কম বলেছেন। বেশ গম্ভীর ছিলেন। আলি আকবরের সঙ্গে কথা না বললেও, জামাই বলে রবিশঙ্করের সঙ্গে একটু কথা বলেন। রবিশঙ্করকে বললাম, 'আপনার কাছে বাবা এত গম্ভীর কেন?' বললেন, 'শুভর অসুখ শুনে চিঠি দিইনি বলে চটে আছেন।' আলি আকবরকে যা বলি, রবিশঙ্করকেও সেই কথাই বললাম, 'চিঠি দেন না কেন? চিঠি দিলে বাবার মেজাজ ভাল থাকে। আর আমাদেরও সুবিধা হয়। বাড়ির সকলের প্রতি বকাবকি কম, এবং আমাদের শিক্ষারও সুবিধা হয়।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর চুপ করে গেল। আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। আমাকে বলল, 'অন্নপূর্ণাকে একটু চা নিয়ে তোমার ঘরে আসতে বল না।' আমি বললাম। তিনি চা নিয়ে আমার ঘরে এলেন। কথায় কথায় রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিল্লীতে আলি আকবর, বিলায়েৎ খাঁ'র সঙ্গে আপনার বাজনায় কি হয়েছিল?' মাসিক পত্রিকার সমালোচনা ও সেই প্রসঙ্গে বাবার কথা বললাম। রবিশঙ্কর কথাটার গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'এই বাজনার সময় যদিও আমার শরীর খারাপ ছিল তবুও জ্ঞানদার কথায় বাজিয়েছিলাম। এই বাজনার সময় লোক নানা রকম জটলা করেছে। যে কোন তালে বা রাগে ইচ্ছে করলে আমি বিলায়েৎকে জব্দ করতে পারতাম। লোকে বলে বিলায়েৎ খুব তৈরি ঝালা বাজায়, কিন্তু বাজাবার সময় দেখলাম খুব সহজেই আমি বাজিয়ে গেলাম।' কাশীতে কিষনের মুখে যা শুনেছিলাম রবিশঙ্করের কথার সঙ্গে তা মিলে গেল। আর কোন কথা হল না এ বিষয়ে। অন্য কথাবার্তার পর রবিশঙ্কর উপরে চলে গেল।

রবিশঙ্কর দিল্লী যাবার পরদিন, সুপ্রভাত পালের টেলিগ্রাম এল। জানতে পেলাম বাবা দিল্লীর প্রোগ্রামে যাবেন না। পরদিনই বাবা এলাহাবাদ থেকে চলে এলেন।

আজ একুশে জুলাই। ছেলেদের পড়াচ্ছি। হঠাৎ বাবা ডাকলেন। একটা মাসিক বাংলা পত্রিকা দিয়ে বললেন, 'দেখ তো এটা কি লিখেছে? ক্যানছার কি?' প্রবন্ধটায় বেরিয়েছে অত্যধিক সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, বৈজ্ঞানিকরা সমীক্ষা করে বুঝেছেন। ক্যানসার মারাত্মক ব্যাধি, তার কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। দশটার ওপরে সিগারেট যেন কেউ না খান। ক্যানসার রোগের কারণ এবং লক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাবাকে বোঝালাম। শুনে বললেন, 'আমি তো চুরুট খাই, তামাকও খাই। কখনও কখনও একটা দুটো সিগারেট খাই। তাহলে কি আমারও ক্যানছার হবে?' তাঁকে বললাম, 'বঙ্কিম বাবুর আমল থেকে, তামাকের উল্লেখ পেয়েছি। ছোট থেকে বহু লোককে হুঁকো টানতে দেখেছি। এ রোগ তো কারও হয়েছে বলে শুনিনি।' তিনি বললেন, 'এইসা না, সিগারেট খাওয়া ভাল নয়।' বুঝলাম তিনি বার বার এই জন্য বলছেন যে আমি যেন সিগারেট না খাই।

সন্ধ্যায় আমাকে দেশ মল্লার শেখাচ্ছেন। ডাক্তারবাবু এলেন। বাজাবার সময়, ডাক্তারবাবু এলে কথা বলতেন না। আপ্যায়ন করতে গেলেই ডাক্তারবাবু বলতেন, 'সঙ্গীতের চেয়ে বড় আহার কি আছে? দয়া করে শেখান আমি শুনি।' বাবা খুশী হতেন। অন্য কেউ এলে বাবা বলতেন, 'বহু আশা নিয়ে কাশীর এই ব্রাহ্মণ শিখতে এসেছে। একে শিক্ষা দিয়ে নিই তার পর আপনার সঙ্গে কথা বলব।' যাই হোক আমাকে শেখাবার পরেই বাবা ডাক্তারবাবুকে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যানছার কি?' ডাক্তারবাবু উচ্চারণ শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। তাঁকে প্রবন্ধটার বিষয় বলে বললাম, 'বাবা ভয় পেয়েছেন তামাক খান বলে তাঁর ক্যানসার হতে পারে।' ডাক্তারবাবু আমার কথা শুনে বাবাকে বুঝিয়ে বললেন, 'সিগারেট খেলেই ক্যানসার হবে তা নয়, তবে বেশি সিগারেট খাওয়া হানিকর।' তাঁর কাছে সব শুনে বাবা আশ্বস্ত হলেন।

রাত্রে বাবাকে বললাম, 'ভোলা ভট্টাচার্যের সরোদ হবে আজ রাত্রে।' তিনি বললেন, 'রাত্রে রেডিও লাগিও শুনব।' বাজনা শুনলাম। বাবা নিজের বিছানায় শুয়ে শুনছিলেন। আমি খাটের সামনের সোফায় বসে শুনছিলাম। বহুদিন পর বাজনা শুনছি, রাগ কাফি। আলি আকবরের সঙ্গে সে বহুদিন একসঙ্গে থেকেছে। বাবার অতিপ্রিয় ভোলা ভট্টাচার্য। মৈহার আসবার আগে কাফির যে গৎ শুনতাম, সেই গৎটাই শুনলাম। ভাবলাম তিনি ছোট থেকে বাজাচ্ছেন, আগেও যেমন শুনেছি এখনও তেমনই। আমি যেন এই বাজনা থেকে অনেক ভাল বাজাতে পারি। হঠাৎ বাবার আওয়াজে চমক ভাঙল। বাবা বললেন, 'ঠোঁটের ফাঁকে হাসি কেন? মনে মনে ভাবছ তুমি এর থেকে ভাল বাজাও। হতে পারে শিক্ষা পেয়ে এর থেকে ভাল বাজাও। যে যেমন শিক্ষা পেয়েছে, সেই রকম বাজায়। খুব মেঘ হলে যখন সূর্য ঢেকে যায় তখন হাওয়ার দরকার হয়। খুব জোরে হাওয়া হলে মেঘ সরে যায় তখন সূর্য দেখা যায়। ঠিক সেই রকম জ্ঞান ঢাকা পড়ে গেলে অজ্ঞানতা দেখা যায়, সেই সময় হাওয়ার খুব দরকার হয়। সুতরাং কখনও অহঙ্কার কোরো না। অহঙ্কার হলেই নিজের কান মুলে খুদার কাছে ক্ষমা চাইবে। তবে বড় হতে পারবে। আর যদি অহঙ্কার হয়, তা হলে যে গাছ সবে পুঁতেছ, তা আর কখনও বাড়বে না। এইসা না, এইসা না, কান মুলে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাও। একটা কথা মনে রাখবে নিজের দোষ দেখবার চেষ্টা করবে। পরের দোষ দেখো না। মন তুমি বুঝ বড়, নিজের শ্ছিদ্রের নাই পারাবার, পরের শ্ছিদ্র তালাস কর।' এ কথাটা বহুবার বাবার মুখে শুনেছি। ছিদ্রকে তিনি বলতেন শ্ছিদ্র। এক একটা কথা শুনে ভাবি কোথা থেকে শিখেছেন। তিনি তো বলেন লেখাপড়া শিখিনি। কিন্তু শুনে আমি অবাক। আমার হাসি এবং মনের কথা বুঝে গিয়েছেন। কোন কথা না বলে কান মুলে চুপ করে বাজনা শুনতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম বাবা কি অন্তর্যামী!

এর পরদিন অন্নপূর্ণা দেবীর জমির বাউণ্ডারী ওয়াল, আর তাতে একটা ছোট লোহার ফটক লাগিয়ে কাজ শেষ হল। বাবা বললেন, 'এবারে একটা ছোট বাড়ি তৈরী করে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হব।' বাউণ্ডারী ওয়াল করতে অন্নপূর্ণা দেবী প্রথমে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বাবা করে দিলেন। কিন্তু বাড়ির নাম শুনেই অন্নপূর্ণা দেবী প্রবল আপত্তি করে বললেন, 'বাড়ি করলে আমার মরা মুখ দেখবেন।' এ ধরনের কথা কখনও শুনিনি তাঁর মুখে। বাবা এ কথা শুনে বিচলিত হলেন। একটি কথাই বললেন, 'একি দিব্যি তুমি দিলে মা? ঠিক আছে তোমার এ কথার পর আমি আর বাড়ি করব না।'

আজ লিখতে বসে সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবা বাড়ি করলেন না। রবিশঙ্কর বলেছিল বাড়ি করবে, তাও হয় নি।

জমির দেয়াল শেষ হল। এর জন্য আমাকে অনেক কিছু যোগাড় করতে হয়েছে। দেখাশুনাও করতে হয়েছে। তাই খুশী হয়ে বাবা আমাকে বীরারঙ্গের প্রকার ভেদ শিখিয়ে, বিলাবলে উজিরখানি অতি বিলম্বিত এবং দ্রুত প্রাচীন গৎ এর বন্দিশ শেখালেন। বাজনার পর বাবা বললেন, 'ঘাবড়িও না, ভয়ে পালিয়ে যেও না। সঙ্গীত এক দুই বছরের কাজ নয়। জীবনভোর করতে হবে। এতদিনে একটু রাস্তায় এসেছ। এখন ধীরে ধীরে একটু উন্নতি হচ্ছে। করলেই হবে। আমার দ্বারা হবে না, এ কথা কখনও ভাববে না। হিম্মতে মরদ, মদদে খুদা। এ কথা ভুলো না।'

আজ আবার বাবার মেজাজ খুব ভাল। রাত্রেও বাবা ইমন রাগে ধ্রুপদ, খেয়াল, তন্ত্রকারি, গায়কি অঙ্গে, বিভিন্ন শৈলীতে শেখালেন।

আজ সূর্য কোন দিক থেকে উঠেছে জানি না, পোষ্ট অফিসে গিয়ে দেখি আলি-আকবরের চিঠি এসেছে। চিঠি লিখেছে জুবেদা খাতুনকে। যথাস্থানে চিঠি দিলাম। দুপুরে খাবার পর আমাকে বললেন, 'চিঠিটা পড়ুন।' আমি অবাক। আলি আকবর চিঠি লিখেছে তার স্ত্রীকে, সে চিঠি আমি কেন পড়ব? এ কথা বার বার বলাতে, জুবেদা খাতুন বললেন, 'আমি বলছি, পড়লে জাত যাবে না। অনেক কিছু জানতে পারবেন।' আমি বললাম, 'আমার জানবার দরকার নেই।' জুবেদা খাতুন গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'তোমার দাদা আদিখ্যেতা করে চিঠি লিখেছে, পড়তে বললাম এত করে যতীন বাবুকে, তবু পড়লেন না।' অন্নপূর্ণা দেবী চুপ করে শুনলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। বাবা ব্যাণ্ডে যাবার পর অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'জীবনে যত কষ্ট পাবেন, সঙ্গীতে তত দরদ বাড়বে। দুঃখ না পেলে সঙ্গীতের মধ্যে ঢোকা যায় না।' কেন হঠাৎ এ কথা বললেন? বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। কথাটা আমার মনে দাগ কাটল। মনে হল দার্শনিকের মত এত বড় কথা কি করে বললেন? মনে তো হয় না পড়ে এ কথা বলেছেন। তবে কি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন এই সত্য। কি জানি!

পরের দিন অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখলাম সুরবাহার নিয়ে বাবার কাছে যেতে। রাত্রে দেড় ঘণ্টা দেশ মল্লার শুনলাম। বাবা সুরশৃঙ্গার বাজাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুর বাহারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এ রাগ তো আমিও শিখেছি কিন্তু এতক্ষণ ধরে কেবল আলাপ জোড়! আজ লিখতে বসে মনে হয়, সে সময়ে টেপ রেকর্ডারের নামও শুনিনি, চোখেও দেখিনি। যদি টেপ রেকর্ডার থাকত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা বিরাট সম্পদ সংগ্রহ করে রাখা যেত।

দিল্লী রেডিও সঙ্গীত সভায় বাজাবার চিঠি এল। আঠার দিন পরে বাবা দিল্লী যাবেন। ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। বাবার সরোদের চামড়া বসে গেছে। তিনি নিজেই ছাগলের চামড়া কাটিয়ে এনে নিজের হাতে সকাল থেকে পরিষ্কার করলেন। এ জিনিষ আমার কাছে নূতন। তিনি বললেন, "বাজনা বাজাও, বাজনা বাজাতে যে সব জিনিষের প্রয়োজন হয় সব শিখতে হবে।' চামড়ার আকার প্রথমে কি ছিল, পরে কি দাঁড়াল, বসে বসে দেখলাম। বৃষ্টি বন্ধ হল

কিছুক্ষণের জন্য, রোদের দেখা পাওয়া গেল। চামড়া শুকোতে দিলেন। বললেন, 'বর্ষার সময় চামড়া বদলালে পরের বর্ষায় চামড়া এত বসে না।' পরের দিন সরোদের চামড়া লাগাতে বসলেন। অবাক হয়ে আমি দেখছি। বাবা সব বিষয়েই অভিজ্ঞ। হঠাৎ বাবা আমাকে বললেন, 'ঘর থেকে জম্বুরাটা নিয়ে এস তো?' তাঁর মুখের কথা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে হবে, নইলে বিপদ। কিন্তু জম্বুরা কি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নিয়ে আসতে বললেন?' তিনি বললেন, 'কথাও শুনতে পাও না? কালা নাকি? জম্বুরা জম্বুরা।' বেশ জোরেই বললেন। গেলাম তাঁর ঘরে। ভাবলাম চামড়া লাগাবার কোন জিনিষের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় জিনিষটি কি? কিছুই বোধগম্য হল না। দেরী করাও বিপদ, তাই আবার গিয়ে বললাম, 'জম্বুরাটা খুঁজে পাচ্ছি না।' একথা শুনে তিনি উঠে বললেন, 'আমার বাজনার বাক্সে আছে খুঁজে পাচ্ছ না?' বাবা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে ঘরে গেলেন। আমিও পিছু পিছু গেলাম। তাঁর বাজনার তার থাকত যে ডিবাতে তার ভেতর থেকে বের করলেন একটা প্লাস। সেটা দেখিয়ে বললেন, ' কৌটোর মধ্যে বাজনার যাবতীয় জিনিষ যা যা লাগে সব এইটাতে থাকে, জানো না?' প্লাসকে যে জম্বুরা বলে তা আমার কাছে নূতন। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি প্লাস চাইছিলেন?' বাবার দৃষ্টি হল তীক্ষ্ণ। বললেন, 'আরে প্লাস কে বচ্চে, ইঞ্জিরি বল? বাংলা নাম জান না?' আমি চুপ করে বাবার পেছনে চলতে লাগলাম। বাবা আমাকে চামড়াটা ধরতে বলে, প্লাস দিয়ে টানতে লাগলেন। সরোদে যে ভাবে চামড়া লাগালেন, দেখে মনে হল একজন দক্ষ কারিগর। আমার পক্ষে কোন কালেই এ কাজ সম্ভব হবে না। কিন্তু চিন্তাটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল, আমার দরকারের সময় কি হবে? আমার জন্য তো বাবাকে এত মেহনত করতে বলাতে পারব না।

শুভর সরোদের জন্য মঙ্গল মিস্ত্রি আজ নূতন তুম্বা তৈরি করে দিয়ে গেল। বাবা খুব খুশী হয়ে শুভর সরোদে পরিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার সময় আশিসকে শেখাবেন কিন্তু তার জ্বর এসেছে। বাবার সেই এক কথা, 'আরে শান্তি পেলাম না জীবনে, দিন রাত ভরবে অথচ পায়খানা হবে না। ওর বাবার চাকর আছে ওষুধ আনবার, যাও শুয়ার কি বচ্চে কো হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। যাতে না বাজাতে হয় তার জন্য নখড়া।' বাবা মনে মনে ঘাবড়েছেন কিন্তু বাইরে এই আওয়াজ। দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এলাম। বাবার তিরস্কারের ভয়েই পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল।

সকালে দুটো চিঠি এল। সাতনা থেকে ডি. এম. এর চিঠি, ব্যাণ্ডের নূতন বাজনা কিনতে কত টাকা লাগবে জানতে চেয়ে। তাছাড়া ১৫ই আগস্ট রেডিওতে ব্যাণ্ড বাজাতে হবে, তাই বাবা যেন পত্রপাঠ একবার দয়া করে একদিনের জন্য সাতনা যান। অন্য চিঠি এসেছে শান্তিনিকেতন থেকে। ভাইস চ্যান্সেলার বাবাকে অনুরোধ করেছেন, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ভিসিটিং প্রফেসর হিসাবে থাকবার জন্য। তিনি জানিয়েছেন, বাবার থাকা-খাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত থাকবে। কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম, বাবা গেলে ছাত্ররা বাবার কাছে বাজনা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করবে। শিক্ষার পদ্ধতিও বুঝতে পারবে। এই চিঠি শুনে বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সে কতকাল আগের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত ছিলেন। ইউরোপ যাবার আগে উদয়শঙ্করের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। তখন এ্যাবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছিল। গুরুদেব আমার বাজনা কয়েকদিন শুনে একজনকে ডেকে বললেন, নন্দলাল, আলাউদ্দিনের অমূল্য মাথাটা রেখে দাও। এ কথা শুনে আমি তো অবাক! এ আবার কি কথা। পরে বুঝেছিলাম আমার মাথার একটা মূর্তি করে রাখতে বলেছিলেন। নন্দলাল বাবু খুব উঁচুদরের চিত্রকর ছিলেন। নন্দলাল বাবুর এক ছাত্র রামকিংকর বেইজ পনের মিনিটের মধ্যেই আমার একটা মূর্তি করে দিল। সেই গুরুদেবের আশ্রম থেকে যখন ডাক পড়েছে সুতরাং যাওয়া দরকার। তুমি কি বল?' তাঁর কথা শুনে বুঝলাম যাবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু তিনি না থাকলে আমার শিক্ষা হবে না। তবে অসুবিধা হবে না যদি অন্নপূর্ণা দেবী ডিসেম্বর অবধি থাকেন। যাই হোক যা হবার হবে। বললাম, 'শান্তিনিকেতন এখন তীর্থক্ষেত্রের মত। সারা পৃথিবীর বহু লোক সেখানে যান। ভারতের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কবিগুরুর স্বপ্ন ছিল শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করা। করেছিলেন। সুতরাং আমন্ত্রণ যখন পেয়েছেন যাওয়াই ভাল।' বাবা খুসী হলেন। বললেন, 'শান্তিনিকেতন গেলে আশিসকেও নিয়ে যাব। আমি না থাকলে ফাঁকি দেবে। তবে যাবার আগে তোমাকে শিক্ষা দিয়ে যাব। সেগুলি খুব সাধনা করবে। ফিরে এলে আবার শিক্ষা দেব। এখনও বহু শিক্ষার বাকী আছে।'

ডি.এম. ব্যাণ্ডের প্রয়োজনীয় যন্ত্র কিনবার জন্য বাবাকে সাতনা যেতে অনুরোধ করায়, দুপুরের ট্রেনে সেখানে চলে গেলেন। তিনি রওনা হলেন আর বাড়িতে জুবেদা খাতুনের আওয়াজ সপ্তমে শুনতে পেলাম। যেহেতু ঝি ভাল করে বাসন মাজেনি তাই অকথ্য ভাষায় তিরস্কার চলছে। মা যতই চুপ করতে বলেন আওয়াজ ততই বাড়ে। বাড়ির সকলেই একত্রিত হয়েছে। হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবী নিচে আসতেই আওয়াজ বন্ধ হল। বাবা না থাকলেই এসব ঘটে।

বাবা সাতনা থেকে ফিরে এসেছেন। নাতিদের মনোরঞ্জনের জন্য 'আওয়ারা' সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছেন। পরদিন বলছেন, সিনেমা দেখবার নাম শুনে যেমন আনন্দ হয়, বাজনা বাজাবার জন্য সেই আনন্দ দেখতে পাই না।' এক মাস দুই মাস অন্তর সাতনা থেকে সনৎ একদিনের জন্য এসে শিখে যায়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে গিয়ে বাজিয়েছেন। তারপর দিল্লী গিয়েছেন। রেডিওতে মিয়াঁ কি মল্লার বাজনা শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গত করেছেন কণ্ঠে মহারাজ।

বাবার অবর্তমানে আমার শিক্ষা একদিনও বাদ পড়েনি শুক্রবার ছাড়া। অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে নিয়মিত শিখিয়ে যাচ্ছেন। শেখাবার সময় একদিন অঘটন ঘটল। মানা করা সত্ত্বেও জুবেদা খাতুন শিক্ষাকালে বসে শুনতে লাগলেন। কয়েক দিন ঝিঁঝিঁট শিখছি। তারিখটা ছিল ২০ শে আগষ্ট। বীরারঙ্গের কঠিন অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে যাচ্ছি। অন্নপূর্ণা দেবী সেতার বাজাবার পরই আমি বাজাচ্ছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম হাততালির আওয়াজে। দেখি জুবেদা

খাতুন বাহবা দিয়ে হাসছেন। শিক্ষাকালে এরকম হাততালি দেওয়া ভাবতেই পারি না। বাবার ভাষায় বে-আদবী। ভয় হল। অন্নপূর্ণা দেবী ভাবতে পারেন, এই হাততালির প্রশংসায় আমার অভিমান হতে পারে, যে সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে যাচ্ছি। গম্ভীরভাবে তাকালাম। আমার দৃষ্টি দেখে জুবেদা খাতুন চুপ করে গেলেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে গম্ভীর দেখলাম।

অন্নপূর্ণা দেবীকে রোজ পড়াই। ইংরাজী থেকে বাংলা একটা অভিধান আনিয়ে দিয়েছি। সাইকোলজি এবং এবনরমাল সাইকোলজি দুইই পড়াচ্ছি। এত অল্প সময়ে এতটা আয়ত্ব করেছেন ভাবা যায় না। অত্যন্ত মেধাবী। ভি. পি. করে কিছু গল্পের বইও আনান হয়েছে। অন্নপূর্ণা দেবীর সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত চলে। রাত্রে শেখাবার পর বই পড়েন। গরমকাল। বাড়ির বাইরে শোবার আগে পর্যন্ত উপরে আলো জ্বলতে দেখতে পাই। বাবা যে কথা বলেন শেখাবার পর, অন্নপূর্ণা দেবীর মুখেও শুনতে পাই। মাঝে মাঝেই বলেন, 'এখনও বহু দেরী। সবে একটু রাস্তায় এসেছেন। যতদিন যাবে দেখবেন এর শেষ নেই।' একথা শুনে মনে মনে ঘাবড়াই, আবার জেদও চাপে, যে ভাবেই হোক বাজাতেই হবে।

রাগ ইমনের বোধ হয় শেষ নেই। বাবার কাছেও শিখি আবার অন্নপূর্ণা দেবীর কাছেও শিখি। একদিন দেশ মল্লার, পরের দিন ঝিঁঝিঁট, আবার তার পরের দিন ইমন। কয়েকটা রাগ চক্রাকারে শিক্ষা হয়। বাবার অবর্তমানে শিক্ষা এবং রিয়াজ বেশি হয়।

মৈহারে, গাড়ি বছরে হয়ত একদিন ঠিক সময়ে আসে। বরাবর দুই তিন ঘণ্টা লেট থাকে। স্টেশনে চা এর স্টলের জলির সঙ্গে গল্প করে সময় কেটে যায়। দিল্লী থেকে বাবা ফিরে এলেন। গাড়ি লেট সাত ঘণ্টা, রাত বারটার জায়গায় সকাল সাতটায় গাড়ি এল। বাবা যেমন বলে থাকেন, বৃথা কেন কষ্ট করে স্টেশনে ছিলাম সেই কথাই বললেন। কিন্তু আমাকে দেখে খুশী হলেন।

বর্ষাকাল সুতরাং মল্লারই শিক্ষা হয়। বাবা এসে রোজ শেখাতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ ইমন নিয়ে বসলেন। মাঝে মাঝে অবাক হই। এসে অবধি ইমন রাগ শিখছি, কিন্তু কখনও একটি জিনিষের পুনরাবৃত্তি নেই। এই রাগে বিলম্বিত, দ্রুত, অন্য তালে বন্দিশ শিখেছি সব সময়েই নবরূপে নব পরিচয়ে। বাজনার পর আজ নূতন কথা বললেন। বুঝলাম, বাজনা শুনে খুশী হয়েছেন। বললেন, 'ভাল বাজালে তোমারও নাম হবে আমারও নাম হবে। যদি তুমি ভাল বাজাতে না পার তাহলে আমারও বদনাম হবে। লোকে ভাববে আমি তোমাকে শেখাই নি। তুমি কি চাও? সুতরাং রিয়াজ কর মন প্রাণ দিয়ে। এখন তো বুঝতে পার আগে কি বাজাতে। এখনও অনেক শিখতে হবে। সাধনা করতে হবে তবে তার ফল পাবে।' তাঁর কথা শুনে মনে উৎসাহ পেলাম। ভাবলাম বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাজানর কৃতিত্বের পেছনে অন্নপূর্ণা দেবীর অবদান অসীম। এ ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীর কাছ থেকে কেবল নিয়েই যাচ্ছি, দেবার সাধ্য আমার নেই। আমার শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ছাড়া আর কি দিতে পারি।

একটা জিনিষ দেখে বরাবর অবাক হয়েছি। অন্নপূর্ণা দেবীর হিস্টিরিয়ার আক্রমণের আগে বোঝা যেত। কিন্তু জ্বর হলে বোঝা যেত না। স্নান, খাওয়া, বাজনা সব কাজ করে

যেতেন। অবাক হতাম বাবার কথায়। যে মুহূর্তে জ্বর হত, বাবা দেখেই বলতেন, 'মা তোমার শরীর ভাল নেই?' অন্নপূর্ণা দেবী সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'ভাল আছি।' এ কথা শুনে বাবা বলতেন, 'তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার জ্বর হয়েছে। আমার মাথার দিব্য থার্মোমিটার দিয়ে দেখ তো।' বাবা জোর করে থার্মোমিটার মুখের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে, বের করে আমাকে দিতেন, 'দেখ তো জ্বর আছে কি না?' দেখতাম একশ থেকে একশ দুই অবধি জ্বর, কখনও বেশি দেখেছি। বাধ্য হয়েই বলতাম জ্বর-এর কথা। শুনেই বাবা বলতেন, 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, চোখ দেখেই বুঝেছি। যাও গিয়ে বিশ্রাম কর।' বাড়ির কেউ তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারতেন না, তিনিও কখনও মুখ ফুটে বলতেন না। জ্বর কত হয়েছে বলাতে আমার প্রতি অন্নপূর্ণা দেবী রেগে গিয়ে বলতেন, 'জ্বর হয়েছ বলে বাবাকে অযথা কেন চিন্তিত করেন? জ্বর হলেও বাবাকে বলবেন না।' উত্তরে বরাবর বলতাম, 'বাবার কাছে মিথ্যে কথা কেন বলব? তাছাড়া জ্বর হলে আমাকে বলতে পারেন ওষুধ এনে দিতে পারি।' এ কথার উত্তর একটাই পেয়েছি 'আমার জন্য কারও চিন্তা করবার দরকার নেই। বাবাকেও বলবার দরকার নেই। ওষুধ আনবারও দরকার নেই। একটু জ্বর হলে আমি মরব না।' ওষুধ খেতেন বাধ্য হয়েই যখন হিস্টিরিয়া হত। ডাক্তারের কাছে ইনজেকশন নিতেই হত। কিন্তু তিনদিনের জন্য প্রতিদিন তিনটি হিসেবে নয়টি ট্যাবলেট আনলেও ছয়টি ট্যাবলেট আর খেতেন না। দেখতাম খাননি। রাগ করে বলতাম, 'ওষুধ না খেলে, আমাকে অযথা কেন কিনতে যেতে হয়?' শুনে একটু নরম হলেও বলতেন, 'আপনাকে ওষুধ আনতে কে বলেছে? কেন আনেন? আমি মরতে চাই।' বহুবার এই কথা শুনেছি। কিন্তু কেন মরতে চান?

একটা সরকারী হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীতে বছরে সাত হাজার তিনশ একান্ন জন লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বেঁচে থাকে। উনিশশ দশ সালে বিখ্যাত লেখক টলস্টয় প্রায় আত্মহত্যাই করেছিলেন। তারও আগে ফ্রান্সের লেখক জ্যাক রুশো অনেকের মত উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বিখ্যাত লেখক স্টীকান জুইগ উনিশশ বিয়াল্লিশ সালে বিষ খেয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেছিলেন। মরবার আগে তাঁরা লিখে গিয়েছিলেন, এই পৃথিবী মানুষের বসবাসের যোগ্য নয়। এটা পৃথিবীর অনেক প্রতিভাবান মানুষের মনের কথা।

অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমি প্রতিভাময়ী বলেই মনে করি। উপরের সমীক্ষাটাই মাথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এ এক অদ্ভুত পারিবারিক জীবন! অসুখ হলে ঔষধ খাবেন না, ডাক্তার দেখাবেন না। রবিশঙ্কর কেন জোর করে চিকিৎসা করায় না, তা আমার বোধগম্য নয়। মনে হয় আমরা বাইরে থেকে যা দেখি সেটা মোটেই আসল দেখা নয়। সংসারে সকলেই আমরা বাইরেটা দেখে বিচার করি, ভেতরটা বুঝবার চেষ্টা করি কি? মনে হয় রবিশঙ্কর ভেতরটা বুঝবার চেষ্টা করে না, করলে এরকম কেন হবে?

২৯

বাবার সব দিকে নজর আছে। দুধ খেয়ে বললেন, 'গয়লা চুরি করে দুধ নিয়ে যায়। রোজ কতটা দুধ হয় তার একটা মাপ আছে। গয়লা নিশ্চয় জল মিশিয়ে সেই মাপটা পূরণ করে।' বাবা পরের দিন আমাকে বললেন, 'গয়লা যখন দুধ দোয় তখন একটু নজর রেখো।' আমাকে যেতে হল। বাড়তি একটা কাজ হল। এই কাজের জন্য বাবা ঝাঁপতালে একটা কঠিন দ্রুত বন্দেজ শেখালেন। না বলে দিলে, কেউ বুঝতে পারবে না গৎটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। যেহেতু বাবা শান্তিনিকেতন চলে যাবেন প্রায় একমাস পর, তাই তিনি বললেন, রোজ শিখবে।' কয়েকদিন একেবারে ধ্রুপদ অঙ্গে আলাপ শেখালেন। বললেন, 'শিখে রাখ, ধ্রুপদ অঙ্গের মধ্যে খেয়ালের অঙ্গ একটুও থাকবে না।'

ছেলেদের পড়াশোনায় মন নেই। বাবা একদিন বললেন, না পড়া করতে পারলে খুব মারবে। এখন আমাকে ছয় জনকে পড়াতে হয়। আশিস, ধ্যানেশ, প্রাণেশ, অমরেশ, বেবী এবং শুভ পড়ে। সকলেই এক রকম পড়ে কিন্তু ব্যতিক্রম ধ্যানেশ। ধ্যানেশের অমনোযোগিতার জন্য মাঝে মাঝে জোরে ধমক লাগাই। একদিন অন্নপূর্ণা দেবীর নজরে পড়ে গেলাম। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'যদিও বাবা বলেছেন পড়া করতে না পারলে মারবেন, কিন্তু বাবার সামনে কখনও মারবেন না। মারতে দেখলে বাবা চটে যাবেন। মারার বদলে বকবেন। তবে বাবার অবর্তমানে দরকার হলে নিশ্চয়ই মারবেন।' একথা শুনে সাবধান হলাম। কি করব বুঝি না। পড়াতে গেলে সাধারণ গণিত কিংবা যে পড়া দিয়েছি পারে না, মাথা গরম হয়ে যায়। নানা কারণে মাথা গরম হয়ে যায়, রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পড়ি। এই বইটা পড়লে মনটা একটু হালকা হয়।

বাবা এলাহাবাদ গেলে, পাঁচদিন অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে দিন রাত শিক্ষা করি। পুজো এসে গেছে। এবারে পুজোর সময় মুহর্‌রম পড়ে গেল। বাবা নাতিদের নিয়ে একদিন সিনেমা গেলেন 'জয় মহালক্ষ্মী' দেখতে। যেহেতু মুহর্‌রম সেইজন্য মহাষ্টমীর দিন বাবার জন্মতিথি পালন হলনা। জন্মতিথিতে পায়েস তৈরি হয় এবং আমি একটা মালা বাবাকে পরিয়ে দি।

বিজয়ার দিন বাবাকে এক শিশি আতর দিলাম। আতর পেয়ে বাবা খুব আনন্দিত হলেন। আমাকে দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে একটা বাক্স আনলেন। বাক্সটা খুলতেই, দেখে অবাক হলাম যে আতরের শিশিতে সেটা ভর্তি। বাবাকে কখনও আতর লাগাতে দেখিনি। বাবা বললেন, 'বহুদিন আগে একজন লোক প্রায়ই মহারাজের কাছে আতর বিক্রী করতে আসত। তারই কাছে আমি আতর বানাবার প্রণালী শিখেছিলাম। বাক্স ভর্ত্তি আতর দেখিয়ে বললেন, 'এখানে যত আতর দেখছ সব আমি তৈরী করেছি।' একটা শিশি খুলে তিনি পরখ করতে বললেন। দেখে বিস্মিত হলাম যে বাবা এত ভাল আতর নিজে তৈরী করেছেন। কাশী থাকাকালীন আমার আতরের সখ ছিল। বাবার ভয়ে কাশীতে গেলেও আতর আনি নি। বাবা হলেন সঞ্চয়ী। রেখেই দিয়েছেন কিন্তু কখনও ব্যবহার করেন নি। আতর তাঁর প্রিয় বলে এর পর কাশীতে গেলে বাবার জন্য আতর নিয়ে যেতাম। মৈহার ছাড়ার পর যতবার গিয়েছি বাবার জন্য আতর এবং মার জন্য জর্দা নিয়ে যেতাম। তাঁরা আনন্দিত হতেন।

রবিশঙ্করের চিঠি এল। জানিয়েছে, সাতই অক্টোবর তাঁর ধর্মগুরু টাট বাবাকে নিয়ে মৈহার আসবে। এই চিঠি পেয়ে উপরে যে নূতন তিনটি ঘর হয়েছে, তার মধ্যে একটি বাবা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। রবিশঙ্করের কাছে টাট বাবা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শুনেছি। এলে বুঝতে পারব। মনের মধ্যে কৌতূহল হল।

মুহর্‌রমের সময় বাবা বাজান না। আমাকে প্রতিবারই বাজাতে বলেন কিন্তু বাজাই না। এই সময় দিনরাত চারটে বই পড়ি। যে বইগুলো আমার একান্ত সাথী। এগুলি হল সঞ্চয়িতা, ওমর খৈয়াম, মেঘদূত এবং গীতা। বাবাকেও মাঝে মাঝে সঞ্চয়িতা কবিতা পড়ে শোনাই। তিনি কবিতা শুনতে ভালবাসেন। কবিতা শুনবার সময় মনে হয় বাবা ধ্যানস্থ।

তেরদিন পর বাজনা বাজালাম। এতদিন পর বাজাচ্ছি বলে বাবার কাছে শিখলাম না। কিন্তু পর দিনই, জোর করে শেখালেন এবং বললেন, 'কিছুদিন পরই শান্তিনিকেতন চলে যাবো, সুতরাং যতটা পার শিখে নাও।' আমাকে শেখাবার পর অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে শেখাতে বসলেন। আমার ঘরের থার্ড আই অর্থাৎ দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগলাম। বাবা সুরশৃঙ্গারে পুরিয়া ধানেশ্রী বাজাতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা দেবী বাজিয়ে যাচ্ছেন। বিস্ময় লাগে। এত গুণী অথচ অন্য সময় দেখলে কে বলবে এই সহজ, সরল, নিরাভরণা মেয়েটির মধ্যে এত পাণ্ডিত্য আছে।

পরের দিন পোষ্ট মাষ্টারের কাছ থেকে জানলাম, রবিশঙ্কর টেলিফোন করে জানিয়েছে এক দিন পরে আসবে। বিকেলে টেলিফোনও এল।

আজ সাতই অক্টোবর। সন্ধ্যার সময় স্টেশনে গেলাম। প্যাসেঞ্জার ট্রেন জব্বলপুর থেকে রবিশঙ্কর টাট বাবা এবং নিজের ছাত্র হরিহরকে নিয়ে নামল। টাট বাবার দেহে মিহি টাট (চট) বস্ত্রের আলখাল্লা। হরিহর আমাকে দেখেই নাম ধরে 'হ্যালো' করল। হরিহর রবিশঙ্করের কান ভারী করে জানতাম। এর সম্বন্ধে গতবারে কথাও হয়েছিল। তাই নিজেকে মাতব্বর ভেবে যে মুহূর্তে আমার নাম ধরে হ্যালো করল, সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ডোন্ট ফরগেট দ্যাট আই অ্যাম প্রাইভেট সেক্রেটারী অফ বাবা।' রবিশঙ্করের চামচে বোধহয় আমার কাছ থেকে এরকম অভ্যর্থনা আশা করে নি। রবিশঙ্কর তাকে বকুনি দিল। টাট বাবা বাড়িতে এলেন। তিনি ঘন ঘন চা খান আর মাঝে মাঝে পাঁপড় ভাজা। এ কথা রবিশঙ্কর জানতেন দুয়েরই ব্যবস্থা হল। টাট বাবা সম্বন্ধে রবিশঙ্করের কাছে থেকে নাম মাত্র জানা ছিল। টাট বাবা রবিশঙ্করের ধর্মগুরু। নিরালায় ডেকে টাট বাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। রবিশঙ্কর তাঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা বলে বলল, 'অনেক শিষ্য আছে যাদের বর্তমানে বয়স সত্তর বৎসর। তিরিশ বছর আগেও ঠিক এই রকমই দেখেছেন তাঁরা।' দেখে মনে হয় চল্লিশ বছর বয়স। অথচ কেউ কেউ বলে টাট বাবার বয়স একশ বছর। অনেকে বলে দু'শ থেকে পাঁচশ বছর। যতই অলৌকিক ঘটনা শুনি না কেন, বয়সের কথাটা শুনে হাসি পেল। আমার জীবনে কিছু ভণ্ড সাধু দেখবার সুযোগ হয়েছে। ছোট থেকে আমার জন্মগত স্বভাব, যাচাই করে তবেই শ্রদ্ধা করব। ছোটবেলায় আমাদের পাড়ার মাষ্টারমশাইয়ের উপদেশগুলো মেনে চলতাম। লোক চরিত্র বুঝবার জন্য তিনি একটি প্রবাদ

বলতেন, 'সোনা কষ একবার, মানুষ কষ বারবার।' সুতরাং যতক্ষণ না টাট বাবার কোন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, ততক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকাই ভাল। বাড়িতে আসবার পর কিছু ধর্মীয় প্রবচন দিলেন। বাবাকে দেখলাম রামভক্ত হনুমনের মত বেদবাক্য শুনলেন। বাবার বাজনা শুনতে চাইলেন টাট বাবা। বাবা সুরশৃঙ্গার বাজালেন। হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। টাট বাবার ধ্যান ভঙ্গ হল। বললেন, 'বাজনা শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টি না পড়লে সমাধি হয়ে যেত। সে সমাধি ভাঙ্গাতে সকলের অসুবিধা হত।' রবিশঙ্কর বলল, 'সমাধি হয়ে গেলে জোরে জোরে নাম গান করলে সমাধি ভঙ্গ হয়।' বাবা ভক্তিতে গদ গদ হয়ে গেলেন। আমার হাসি পেল, কোন রকমে চাপলাম। রাত্রে একটা চেয়ারে টাট বাবা বসে আছেন। বাবা বললেন, 'মহাত্মা, বাইরে থেকে এসে আপনি হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনার হাত পা টিপে দিই।' একথা শুনে প্রসন্ন মুদ্রায় টাট বাবা একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাত টিপতে লাগলেন। আমার কাছে বাবাই মহাত্মা। তাঁকে এ কাজ করতে দেখে অস্বস্তি বোধ করলাম। বাবা আমাকে দেখিয়ে টাট বাবাকে বললেন, 'আমার বুড়ো বয়সের ছেলে, খুব সুন্দর হাত পা দলাই মালাই করতে পারে।' এ কথা শুনে টাট বাবাকে বললাম, 'আমি কি আপনার হাত টিপে দেব।' টাট বাবা ইশারায় একটি হাত টিপতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বললাম, 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি ম্যাসাজ করে দিচ্ছি।' বাবাকে নিবৃত্ত করে আমিই ম্যাসাজ করতে লাগলাম।

সিনেমার মালিক এ্যালাবিয়া সাহেব এবং পুরণ চন্দ শেঠ বাবার কাছে টাট বাবার কথা শুনেছিলেন। এ্যালাবিয়া সাহেব আমাকে বলেছিলেন, টাট বাবা যদি পরের দিন সিনেমাতে পদধূলি দেন তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। তাঁর পদধূলি পড়লে সিনেমাও ভাল চলবে। ম্যাসেজ করতে করতে এই অনুরোধের কথাটা বললাম। টাট বাবা সম্মতি জানালেন। রাত্রে খাবারের সময় হোল। বাবাকে বললাম, 'আপনারা খেয়ে আসুন। আপনারা এলে আমি যাব।' বাবা, রবিশঙ্কর ও হরিহর খেতে গেলেন। কি মনে হল, ম্যাসাজ করতে করতে বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বড় আশা নিয়ে বাজনা শিখতে এসেছি। আপনি তো অন্তর্যামী, বলুন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে কিনা। যদি না হয় তা হলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।' এ কথা শুনে বাবাজী মৃদু হেসে বললেন, 'হবে, এখানে থেকে শেখ।' আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

পরদিন দুপুরে আশিসের বাজনা শুনলেন। তাকে আশীর্বাদ করলেন। এ্যালাবিয়া সাহেবকে জানালাম সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় বাবাজী সিনেমায় যাবেন। তিনি জানতে চাইলেন বাবাজী কী খেতে ভালবাসেন। উত্তরে বললাম, 'চা এবং পাঁপড় ভাজা ছাড়া কিছু খান না।' রবিশঙ্কর, হরিহর ও টাট বাবাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার আগে আমাকে বলল, 'একটু আগে গিয়ে সিনেমায় বলো, যে টাট বাবা যাচ্ছেন।' সাতটার আগেই আমি সিনেমায় গিয়ে দেখলাম, এ্যালাবিয়া সাহেব, পুরণশেঠ এবং মৈহারের একজন পুরনো কংগ্রেস সমর্থক, রামাধার পাণ্ডে বসে আছেন। আমাকে দেখে রামাধার পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই টাট বাবা লোকটি কে?' উত্তরে রবিশঙ্করের কাছে যে সব অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছি

বললাম। সব কথা শুনে রামাধার পাণ্ডে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বয়স কত?' যা শুনেছি তাই বললাম। এ কথা শুনে রামাধার বললেন, 'সব বোগাস কথা।' কথাটাও সবে শেষ হয়েছে আর ঘড়িতেও তখন ঠিক সাতটা, ইতিমধ্যে টাট বাবা শিষ্যদের নিয়ে এলেন। রূপোর কাপে চা এবং পাঁপড় ভাজা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। টাটবাবা সকলকে আশীর্বাদ করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই, আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলে এলেন।

বাড়িতে এসে টাট বাবা আমার বাজনা শুনতে চাইলেন। বাবা বললেন, 'বাজনা শুনিয়ে আশীর্বাদ নাও।' বাজালাম। টাট বাবা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বাবা খুশী হলেন।

মা, অন্নপূর্ণা দেবী এবং জুবেদা খাতুন একবারই এসে প্রণাম করে গিয়েছেন। ধর্ম আলোচনা কিংবা বাজাবার সময় এঁরা উপস্থিত ছিলেন না। রবিশঙ্করের কাছে আগেই শুনেছি, তিনি টাট বাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী মন্ত্র নেন নি। রবিশঙ্করও জোর করেন নি। রবিশঙ্করকে, টাট বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে দেখেছি, কিন্তু বাড়ির মহিলা মহল তাঁর সামনে কখনও উপস্থিত থাকেন নি। বাবাকেও তাঁদেরকে এসে বসতে, বলতে শুনিনি। রাত্রে খাবার সময় বাবা আমাকে বললেন, 'মহাত্মা একা থাকবেন উপরে, সুতরাং তুমি গিয়ে হাত পা টিপে দিয়ে আশীর্বাদ নাও। খাওয়া হয়ে গেলে রবু উপরে গিয়ে বসবে তখন তুমি এসে খাবে।' তাঁর কথা মত আমি ওপরে গিয়ে টাট বাবাকে ম্যাসেজ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর টাট বাবা আমাকে বললেন, 'যে লোকটি সিনেমাতে কোণে বসেছিল, সেই লোকটি কে?' বললাম, 'শুনেছি দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকে কংগ্রেসের একজন কর্মী।' এ কথা শুনে টাট বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের যাবার আগে ঐ লোকটি কি বলছিল?' এবারে আমার অবাক হবার পালা, টাট বাবা কি করে জানলেন রামাধার পাণ্ডে কি কথা বলছিল। ক্ষণিকের জন্য, কলেজে পড়বার সময় একজন পাঞ্জাবী এবং একজন বাঙ্গালী তান্ত্রিকের, মনের কথা বলে দেবার ক্ষমতার কথা মনে পড়ে গেল। এত এক হিপনটিক বিদ্যা। টাট বাবাকে বললাম, 'আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিল কোথা থেকে এলেন।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বললে?' উত্তরে রবিশঙ্করের মুখে যে সব অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছিলাম সেই কথাগুলো বলেছি বললাম। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'এ কথা শুনে লোকটি কি বলেছিল?' এ প্রশ্ন শুনে আমি পায়ে হাত দিয়ে বললাম, 'আপনি তো অন্তর্যামী, সবই জানেন, অযথা এই সব প্রশ্ন করে আমাকে কেন পরীক্ষা করছেন।' আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন। এই সময় হরিহর উপরে আমাকে বলল, 'খেতে যান।' আমি খেতে গেলাম।

রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর এলেই, উপরের ঘরে গিয়ে গল্প করি রাত বারটা একটা পর্যন্ত। আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, 'টাট বাবাকে কি রকম দেখলে?' বললাম, 'রাত্রে উপরে গিয়ে বলব।' খাবার খেয়ে রোজকার মত বাবার ঘরে ঢাম্পি করে দিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে যাবার পূর্বমুহূর্তে শুনতে পেলাম, রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে বলছে, 'তুমি তো আমার কোন ছাত্রকে শেখাও না, অথচ যতীনকে তো এত যত্ন করে শিখিয়েছ এবং শেখাও।' একথা কানে আসাতেই আমার পা অনড় হয়ে গেল। যেমন নিঃশব্দে

গিয়েছিলাম তেমনি ভাবে ফিরে এলাম ধীরে ধীরে। এই প্রথম রবিশঙ্করের প্রতি আমার ঘৃণা হল। সামনে আমাকে কত ভাল কথা বলে। আমাকে বরাবর বলেছে বাবার বকুনি খেয়ে যেন না ঘাবড়াই। বাবার তিরস্কারগুলো পরে আশীর্বাদ মনে হবে। এ ছাড়া নিজে অন্নপূর্ণা দেবীকে বলেছে বাবার অবর্তমানে শেখাতে। তাঁর অবর্তমানে শেখালে তাঁর কাছে বকুনি খাব না। অথচ, আজ কি কথা শুনলাম? টাট বাবা আমার বাজনা শুনে প্রশংসা করেছেন, তার জন্যই কি এই কথা বললেন অন্নপূর্ণা দেবীকে? রবিশঙ্কর হয়ত আশা করেনি তিন বছরের মধ্যে আমি এতটা বাজাব। ঘুম যেন কেড়ে নিয়েছে। রবিশঙ্করের কথাগুলো ঝিঁঝিঁ পোকার মত আমার কানে বাজছে। এখন আমার কি কর্তব্য? নানা কথা মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করল। এতক্ষণ যে 'সু'টা প্রবল ছিল, সেটা 'কু'তে বদলে গেল। কোথায় হারাব রবিশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা, হারালাম টাট বাবার প্রতি। ভদ্রলোক যদি সত্যই ভাল হতেন, তবে তার সংস্পর্শে এসে রবিশঙ্কর কেন ভাল হয়নি? সাদা কাতানের নিচে এত মলিন অন্তঃকরণ আমি দেখতে পেলাম, আর তিনি দেখতে পান না। ধন্য অন্তর্যামীতা! কংগ্রেস নেতা পাণ্ডে সিনেমা হলে কি বলেছিলেন জানার এত আগ্রহ, আর কালিমা লিপ্ত পট্টশিষ্য রবিশঙ্করের অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত করেন নি কেন? মনে হোল এটা একটা ব্যবসায়িক বোঝাপড়া। উভয়েই উভয়ের পরগাছা। ধন্য পরগাছা! এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরদিন সকালে টাট বাবা চলে যাবেন। সকালেই উঠলাম। বাড়িতে চন্দন বাটানো হয়েছে রবিশঙ্করের নির্দেশে। বাবা টাট বাবার কপালে চন্দন লাগিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে বাবাও গেলেন টাট বাবার সঙ্গে। গাড়ি ছাড়বার আগে বাবা কাঁদতে লাগলেন। কান্না একটা ছোঁয়াচে রোগ। বাবার কান্না দেখে আমারও চোখ জলে ভরে গেল। রবিশঙ্কর টাট বাবার সঙ্গে হরিহরকে নিয়ে চলে গেল।

মহাত্মাদের সম্বন্ধে বহু বই পড়েছি। কলেজ জীবনে কাশীতে বয়োবৃদ্ধ 'হরিহর বাবা' এবং পিশাচসিদ্ধ বাবার দর্শন করেছি। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত পড়ে প্রেরণা পাই। টাট বাবার সমাধি হতে হতে ভঙ্গ হল দেখলাম। কিন্তু এ সব দেখা সত্ত্বেও রবিশঙ্করের কাছে যে সব অলৌকিক গল্প শুনেছিলাম সেগুলো আমার মনে কোন রেখাপাত করল না। বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম। দুটো দিন বাবার ভক্তি দেখলাম। স্টেশনে কাঁদতেও দেখলাম। কিন্তু বাড়িতে এসেই বাবাকে স্বাভাবিক মনে হল। তাঁর মুখে একটা কথাই শুনলাম। আমাকে দেখে বললেন, 'আমার তো ত্রিনেত্র খোলে নি। কি জানি, কোন বেশে ভগবান এসে দেখা দেন।' টাট বাবা চলে যাবার পর বাবার যে মন্তব্য শুনলাম, সে কথা মৈহারে এসে বহুবার শুনেছি।

বাবা সন্ধ্যার সময় শিক্ষা না দিয়ে নিজের ঘরে একা বাজাচ্ছেন। কি রাগ বুঝতে পারছি না। চুপ করে শুনছি। হঠাৎ তিনি ডাকলেন। বললেন 'টাট বাবা যাবার পর এই নূতন রাগটি তৈরি হল।' রাগটিকে তিনি 'হেমন্ত' নামে চিহ্নিত করলেন। আশিসকে ডেকে শেখালেন। রাগের চলন বললেন। মসিদ খানি গৎ শিখিয়ে মধ্যলয়ের আদ্ধা ঠেকায় একটা গৎ বাজিয়ে আশিসকে শেখালেন। শুনে শুনে আমারও শিক্ষা হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'রাগ তৈরি করা

এমন কিছু বাহাদুরি নয়। আগে সব রাগ শিখতে হবে। তার পর যেমন তান তৈরি হয় সেই রকম রাগ তৈরি করা যায়।' রাগ তৈরি করার এক অভিনব উপায় বোঝা গেল। বার বার একটা কথাই বললেন, 'এখন বহু রাগ শিখতে হবে। রাগ তৈরি করবার রাস্তা তো বললাম। যে উপায়ে রাগ তৈরি করা যায় বললাম, সেই উপায়ে যদি একটা রাগ তৈরি কর, ভুল করবে। তান তৈরির মত, মনে কর একটা রাগ তৈরি করলে, কিন্তু তুমি তো জান না, যা তৈরি করলে তা হয়ত বহু প্রাচীন প্রচলিত রাগ। সুতরাং বহু রাগ শিক্ষা করে রাগ তৈরি করা যায়। এখন বহু দেরি। হেমন্ত' রাগটা খুব ভাল লাগল।

দুই তিন দিন পরে বাবা আমাকে ললিত শেখালেন। পুরনো বন্দিসের একটা গৎ শেখালেন। আমার বাজনা শুনে বাবা বললেন, 'টাট বাবার কৃপা পেয়েছ, তাই এত তাড়াতাড়ি বাজাতে পারলে এত কঠিন গৎ।' মনে মনে ভাবলাম টাট বাবার কৃপায় হয়নি, যাঁর কৃপায় এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারলাম তিনি হলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

রাত্রে বাবা একটি নূতন রাগ তৈরি করে বললেন 'হেম বেহাগ'। হেম আর খেম অত্যন্ত কঠিন রাগ। সেই হেম এর সঙ্গে, হেম বেহাগের সম্বন্ধ নেই। হেম কল্যাণে হেম এর ভাব আছে। দুটি রাগের মিশ্রণে রাগ হলে আরোহী অবরোহী দেখলে বোঝা যায়। এই হেম বেহাগকে হেমন্ত বেহাগও বলতে পার। আবার বেহাগ হেমও বলতে পার। কিন্তু স্পেনাম না রেখে, এর হেম নামটা নিয়ে হেম বেহাগ নামটা মনে এসেছে। হেমন্ত আর বেহাগের মিশ্রণে এই রাগটি।' এই কথা বলে আমাকে বেহাগের মসিদখানি এবং মধ্যলয়ে আদ্ধা ঠেকায় গৎ শেখালেন।

পরদিন বাবা রেওয়া গেলেন ব্যাণ্ডের যন্ত্র দেখবার জন্য। ব্যাণ্ডের যন্ত্রগুলি পুরনো হয়ে গিয়েছে। ভায়োলিন, সেতার, নলতরঙ্গ এবং অন্য যন্ত্রের জন্য ডাইরেক্টর অব এডুকেশনকে লেখা হয়েছিল। খবর এসেছে যন্ত্রগুলির ব্যবস্থা সরকার করছে। বাবা যন্ত্রগুলি দেখে ঠিক আছে কিনা মতামত প্রকাশ করলেই পাঠিয়ে দেবে। সেই জন্য বাবাকে রেওয়া যেতে হল।

বাবার যাবার পর অন্নপূর্ণা দেবীকে টাট বাবা যাবার আগের দিন ঘটনাচক্রে যে কথা শুনেছিলাম, তা বলে বললাম, 'মনে হয় রবিশঙ্করের ইচ্ছা নয় আমি আপনার কাছে শিখি। আমি চাইনা আমার জন্য আপনাদের পারিবারিক অশান্তি হোক।' আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'পাকামি করবেন না। কে কি বলল সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। খুব মন দিয়ে রিয়াজ করুন। না বাজাতে পারলে লোকের কাছে কি করে মুখ দেখাবেন? যান নিচে গিয়ে বাজান।' এ কথা শুনে আর বলার সাহস পেলাম না। চুপচাপ নিচে চলে এলাম। মনে হল বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবী কারো কাছে যদি এতটুকু উপকৃত হন পরিবর্তে তার একশ গুণ দিয়ে উপকারীর ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করেন। যেহেতু ছেলেদের পড়াই, বাবার সমস্ত কাজ করি সেই জন্য অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিক্ষা পাই। রবিশঙ্করের কোন ছাত্রকে শেখান না অথচ আমাকে শেখাচ্ছেন, এ দেখে রবিশঙ্করের অবাক হওয়াটা আশ্চর্য নয়। বাজিয়ে উঠবার পর অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'আপনি বাড়ির জন্য যা করেন তা তো মূল্য দিয়ে শোধ করা যায় না। সব ছেড়ে কত আশা নিয়ে আপনি এসেছেন। বাবার

কৃপায় যৎসামান্য যা আমি শিখেছি, সেটা আপনাকে শেখালে আমি কিছুটা ঋণ মুক্ত হব।' তাঁর এই কথাটি আমি আজও ভুলি নি। যাঁর কাছে জ্ঞানের এমন ভাণ্ডার তিনি কত বিনয়ী।

দুপুরবেলা দেখলাম অন্নপূর্ণ দেবী বাজনার গিলাবটা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করছেন। শুনলাম গত রাতে একটা বিড়াল মখমলের ঢাকনাতে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে। বাবা বিকেলেই চলে এলেন। মখমলের ঢাকনাটা দেখে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'ঢাকনাটা এখানে কেন?' অন্নপূর্ণা দেবী কারণটা বললেন। বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মা, কয়েকদিন তোমার শরীর খারাপ থাকার দরুণ যন্ত্র বাজাওনি। সেই জন্য বিড়াল নিজের কাজ করে তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, যন্ত্র রোজ না বাজালে তার পরিণাম কি।' বাবার এই কথা শুনে আমি অবাক। বুঝলাম অন্নপূর্ণা দেবীও লজ্জা পেয়েছেন। এ ধরনের কথা এসে অবধি কখনও শুনিনি। মৈহার থাকাকালীন কখনও শুনিনি। এই মৃদু বাক্যবাণ প্রথম নিক্ষিপ্ত হল।

রেওয়া থেকে বাবা এসে বললেন, 'সরকারের নিয়ম, কোন জিনিষ কিনতে গেলে কনডাল না মোন্ডার কি করে। আসলে যারা যন্ত্র বিক্রী করে তাদের যন্ত্রের দাম লিখে গভর্নমেন্টকে জানাতে বলে। যে, কম দামে যন্ত্র দেবে সেই যন্ত্রই সরকার কিনবে। যে যন্ত্র দেখলাম সব অখাদ্য। তাই বলে এসেছি কোলকাতা গেলে ভাল যন্ত্র দেখে কিনে আনব। সরকারের এইসব আজে বাজে নিয়ম। আমার কথায় রাজী হয়েছে। শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতায় গিয়ে বাজনা কিনে নিয়ে আসব। যন্ত্র যখন আনব টেলি করে দিলে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে ডি.এম.-এর লোকেরা থাকবে সাতনাতে। তারাই মৈহারে পৌঁছে দেবে।' ব্যাপারটা বুঝলাম, গভর্নমেন্ট টেণ্ডার কল করে জিনিষ কেনে এবং বেচে জানতাম। টেনডার কথাটাকে বাবা কনডাল না মোন্ডার বললেন বুঝতে একমিনিট সময় লেগেছিল। বুঝলাম বাবার কথায়, সরকারের যেটা স্বাভাবিক নিয়ম, তা খাটেনি।

সকালে গোশালায় রিয়াজ করে নাস্তা শেষ করেছি, এমন সময় বুদ্ধা বলল, 'একটি ছেলে এসেছে।' বাবাও নাস্তা শেষ করেছেন। একটি ছেলে এসেছে শুনেই বাবা নিজে গিয়ে দরজা খুললেন। তাঁর পেছনে আমিও গিয়েছি। দেখি একটি ছেলে যন্ত্র হাতে নিয়ে বাস্ক বিছানা নিয়ে এসেছে। মনে হল এ আবার কোন বিপদ এলো। কিন্তু তাকে দেখে বাবা বললেন, 'আরে আরে দাদু এসেছে, এস এস।' তাঁর এই আপ্যায়নে অবাক হলাম। তাকে দেখিয়েই বাবা বললেন, 'যার কৃপাতে আমি সরোদ শিখবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এই ছেলেটির প্রপিতামহ। এই বলে আমাকে বললেন, 'আমার এই নাতির নাস্তার জন্য তোমার মাকে বল।' আমাকে দেখিয়ে ছেলেটিকে বললেন, 'এ হল তোমার কাকা।' ছেলেটি আমাকে প্রণাম করল। তার নাস্তার জন্য মার কাছে গেলাম। ভাবলাম, কে এই ছেলেটি? ছেলেটি অতি নম্র এবং অমায়িক। তার প্রপিতামহর জন্য বাবা সরোদ শিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ব্যাপারটি বোধগম্য হল না। নাস্তা নিয়ে ছেলেটিকে দিলাম। বাবাকে খুব খুশী মেজাজে দেখলাম। দেখলাম তিনি সকলের খবরাখবর নিচ্ছেন। ছেলেটিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'আমিও একদিন তোমার মত মহামূর্খ উস্তাদ ছিলাম। সে সময় আমি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট বাজাতাম, নিজেকে অনেক বড় উস্তাদ মনে করতাম। সেই সময় মুক্তাগাছার

রাজার দরবারে অনেক গুণী উস্তাদরা যেতেন। একদিন পূজার সময় মুক্তাগাছার রাজার বাড়ী গেলাম। সে সময় সন্ধ্যা হয়নি। দারোয়ানকে বললাম, রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দারোয়ান আমাকে দেখে একবার ভেতরের দিকে তাকাল। দেখলাম এক ভদ্রলোক বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে দারোয়ানকে বললেন ভিতরে আসতে দিতে। তার কাছে শুনলাম, ঐ ভদ্রলোকই রাজা। ভেতরে ঢুকতেই রাজা সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে দেখা করতে চাও?' আমি বললাম, 'আমি একজন উস্তাদ। গান জানি, ভায়োলিন বাজাই এবং কয়েকটা যন্ত্র বাজাতে পারি। আমার মত উস্তাদ ভারতে কম আছে। শুনেছি আপনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রেমী সেইজন্য এসেছি আপনাকে বাজনা শোনাতে।' রাজা সাহেব আমাকে বললেন, 'সকালে এস তোমার বাজনা নিয়ে।' সকালে গিয়েই দেখি রাজা সাহেব নিজের লোক নিয়ে মোটা গদির উপর বসে আছেন। একজন দাড়িআলা মুসলমানকে দেখলাম, একটা বাজনার তরফ মেলাচ্ছেন। সেতার বাজনা দেখেছি কিন্তু এই বাজনাটা দেখি নি। বাজনা মিলিয়ে বাজাবার পর বুঝলাম তোড়ি বাজাচ্ছেন। এই বাজনার গুরুগম্ভীর আওয়াজ এবং বাজনা শুনে আমি হতবাক। এই বাজনা শুনে আমার সকল অহঙ্কার চলে গেল। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাজনা শেষ হতেই আমি পা দুটি ধরে বললাম, 'উস্তাদজী আমাকে দয়া করে এই বাজনাটা শেখান। আমি আপনার সেবা করব, রান্না থেকে সব কাজ করে দেব।' উস্তাদজী বললেন, 'আমি তো আমার বংশের লোক ছাড়া কাহাকেও শিক্ষা দিই না।' এ কথা শুনে হতাশ হয়ে মহারাজের পা ধরে বললাম, 'আপনি আমার বাবা। আপনি উস্তাদজীকে বলে রাজী করান যাতে আমাকে শেখান। রাজা সাহেবের দয়া হল আমাকে দেখে। রাজা সাহেব উস্তাদজীকে রাজী করিয়ে সেই দিনই আমার গণ্ডা বাঁধালেন। সব খরচা মহারাজা করলেন। জান সেই মহারাজা কে? সেই মহারাজা হলেন মুক্তাগাছার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরী। আমি সেই দিন থেকে রাজাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতাম। আর সেই উস্তাদ কে জান? সেই উস্তাদ হল আমার সরোদের গুরু আহমদ আলি। আহমদ আলি ছিলেন রামপুরের আবেদ আলি খাঁর ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষরা বাহাদুরশা'র দরবারে বাদক ছিলেন। আমার উস্তাদ আহমদ আলি খাঁ ঘুঘুডাঙ্গায় চাকরি করতেন দুলিচাঁদ মাড়ওয়ারীর কাছে।

বাবা যে গল্প বললেন, এ আমার জানা ছিল। এ যাবৎ বাবার জীবনী অনেক জায়গায় লিখে পাঠিয়েছি, যা পড়েছি 'মিউজিসিয়ান অব ইনডিয়া' বইতে। সে বইটিতে লেখা ছিল আহমদ আলি খাঁ মুক্তাগাছার কোর্ট মিউজিসিয়ান ছিলেন। কিন্তু বাবার কথায় বুঝলাম, তিনি ওখানে বাজাতে গিয়েছিলেন। ইংরেজী বইটা যখন মৈহারে এসে শুনিয়েছিলাম বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'সব ঠিক লেখা আছে।'

এর পর বাবা বললেন, 'রাজা জগৎ কিশোরের মৃত্যুর পর দুইবার আমি মুক্তাগাছা গিয়েছিলাম। প্রথমে একবার উদয়শঙ্করের সঙ্গে গিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমে মহারাজার ঘরে গিয়ে ফরাসে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সকলে আমাকে ফরাসে বসতে বললেও আমি বসি নি। দ্বিতীয়বার, নেত্রকোণা কনফারেন্সে যাবার আগে তিন চার দিন মুক্তাগাছায়

ছিলাম। সেই সময় একদিন গানের সঙ্গে খোল বাজিয়েছিলাম। কতবড় দানী মহারাজ ছিলেন তা ভাবতে পারবে না। বিরাট রাজপ্রাসাদ। কত হাতি ঘোড়া ছিল। মহারাজ শিকার এবং সঙ্গীতের অত্যন্ত প্রেমী ছিলেন।'

একনাগাড়ে এত কথা বলে বাবা ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজা জগৎকিশোর ছিলেন আমার ধর্মবাবা। আর এই ছেলেটি হল তাঁর প্রপৌত্র। সেই হিসেবে এ হল আমার স্নেহের নাতি।' ছেলেটির নাম শুনলাম দ্যুতিকিশোর আচার্য। এত বড় বংশের ছেলে, কিন্তু দেখে খুব অমায়িক এবং নম্র স্বভাবের মনে হল। আশিস, ধ্যানেশের পাশের ঘরে ছেলেটির বন্দোবস্ত করে দিলাম। একটা রাত কাটল।

পরদিন বাবা আমাকে বললেন, 'দ্যুতিকে বল আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যেতে। নাতিটি এসেছে সেতার শিখবার জন্য। অথচ তের চৌদ্দদিন পর আমি শান্তিনিকেতন চলে যাব। আমি চলে গেলে কি করে শিখবে?' বাবার কথা শুনে আমি হতবাক। বাবার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। অথচ এই অপ্রিয় কাজটা আমাকেই করতে হবে। ছেলেটি হয়ত অন্য কিছু ভাববে। বাবা রাত্রে যথারীতি আমাকে শেখালেন ঝিঁঝিঁট।

আজ দীপাবলী। বাড়িতে আলো জ্বালান হল প্রদীপ দিয়ে। বাবা নাতিদের জন্য বাজি কিনে আনলেন। বেশির ভাগ ফুলঝুরি। জ্বালিয়ে ছেলেদের হাতে দিতে হল। প্রাণেশ এবং অমরেশ ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বাবা ছোট ছেলেদের মত আনন্দে মেতে উঠলেন। রাত্রে আশিস এবং আমাকে ইমনের মধ্যে নানা প্রকারের গমক শেখালেন। অবাক হই। ইমন কি শেষ হবে না? এও এক আশ্চর্য, যখনই শিখি নূতনত্ব থাকে। ইতিমধ্যে দ্যুতির সঙ্গে বাবা রোজ কোলকাতার গল্প করেন। একদিন বাবা সব নাতিদের এবং দ্যুতিকে নিয়ে 'রাম রাজ্য' সিনেমা দেখতে গেলেন।

বাবা মাঝে মাঝে মনোরঞ্জনের জন্য নাতিদের সিনেমায় নিয়ে যান। সিনেমা দেখাও একটা সংক্রামক ব্যাধি। বাবাকে বলতে পারি না তাঁর নাতিদের এই বয়সে সামাজিক বই দেখা ভাল নয়। প্রথম মৈহারে এসে দেখেছি, নাতিদের সঙ্গে বাজাবার সময় ছাড়া রাত্রে নিজের ঘরে বসিয়ে খুব গল্প করতেন, রেডিও লাগিয়ে শোনাতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখছি বাবা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। নাতিরাও আর বেশি কাছে যায় না। প্রাণেশ এবং অমরেশের সঙ্গে বাবা আগের মতই প্রাণোচ্ছল। আশিস, ধ্যানেশ, শুভ, বেবীর সঙ্গে একটু দূরত্ব হয়েছে। নাতিরাও বুঝেছে দ্যুতি বাবার খুব প্রিয়। তাই শুভ দ্যুতিকে বলল, 'দাদুকে বলে আর একদিন সিনেমা যাবার ব্যবস্থা করুন।' আশিস, ধ্যানেশ সকলেই ঠাকুরদার জায়গায় 'দাদু' বলে এবং মাকে 'দিদিমা' বলে। প্রথম প্রথম আমার কানে লেগেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি বাবাই দাদু বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। যাক, যে কথা বলছিলাম। শুভ দ্যুতিকে বললেও, দ্যুতি দাদুকে অনুরোধ করতে সাহস পেল না। অতঃপর শুভ আমাকে বলল, 'আপনি দাদুকে অনুরোধ করুন, আমাদের সিনেমায় যেন নিয়ে যান।' এই সিনেমার ঝোঁক আমার ভাল লাগল না। আমি সোজা অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'বাবা আদর করে সব ধরনের সিনেমায় নাতিদের নিয়ে যাচ্ছেন। আমার কিছু বলা শোভা পায় না। এই বয়সে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তা বলে, একদিন দেখবার

পর শুভ আমাকে বলছে বাবাকে বলবার জন্য।' এ কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী এই প্রথম শুভকে একটা চড় মারলেন। নিজেকে অপরাধী মনে হল। আমি শুভকে বোঝালাম সিনেমা দেখার পরিণতি কি। শুভ বুঝল। বলল, 'দাদু না নিয়ে গেলে আর কখনও বলব না।'

বাবাকে আবার রেওয়া যেতে হবে কারণ মন্ত্রী ডক্টর কৈলাশ নাথ কাটজু আসবেন। ডি.এম. এসে অনুরোধ করে গেছেন ডক্টর কাটজুর সামনে যেন বাবা রাগ না করেন। তাঁর কোন অভিযোগ থাকলে যেন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর ভি. সান্থানামকে বলেন। এ কথা শুনে বাবা ডি.এম. কে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'আরে না না, একবার হয়েছে বলে কি বার বার হবে।' বাবা রেওয়া গেলেন। আমি নিজের ঘরে বাজাচ্ছি। দ্যুতি এসে আমার বাজনা শুনতে লাগল। বাজনা শেষ হওয়ার পর দ্যুতি আমাকে বলল, 'আপনি আমাকে একটু শেখাবেন?' বললাম, 'এখন তো বাবা শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে যাও, তাঁর কাছে শেখ। তিনি ফিরে এলে তাঁর অবর্তমানে শেখাব, নতুবা বাবা চটে যাবেন। শিক্ষাকালীন বাবার রাগটা বুঝলাম দ্যুতির জানা আছে।

রেওয়া থেকে ফিরবার পর ব্যাণ্ড এর গুলগুলজীর কাছে শুনলাম, কৈলাস নাথ কাটজু বাবাকে দেখেই গলায় গলা মিলিয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে বিন্ধ্য প্রদেশের যত এম.এল.এ.; এম.পি. এমনকি গভর্নর, বাবার মূল্যায়নের ধারণা জন্মেছে।

আজ শুভর সরোদে হাতে খড়ি হল। রবিশঙ্করের ইচ্ছা ছিল শুভ সরোদ বাজাক, সেইজন্য শুভর সরোদ শিক্ষা শুরু হল। বাবা আদর করে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'বাজাও দাদু।' শুভর মধ্যে প্রতিভা আছে। বাজনার অনুভবটা ছোট থেকেই জন্ম নিয়েছে। মৈহারে এসে যখন শুভকে দেখেছিলাম তখন বাবার কাছে সব নাতিরাই রাতের রেডিও শুনত। সেই সময় একদিন অন্নপূর্ণা দেবীর বাজনা শুনে, শুভ বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা দাদু এই বাজনাটা কি খুব দুঃখের?' আমি এ কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। শুভ আসলে বোঝাতে চেয়েছিল, যে রাগটা বাজাচ্ছে সেটা কি করুণ রসের? সে কথাটা আমি আজও ভুলি নি। সরোদের মত পরদাবিহীন যন্ত্রে প্রথম শুরু দেখেই, মনে হল শুভর প্রতিভা আছে। মনে হল সে এই বংশের নাম রাখবে। রাত্রে শুভ অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে বাজাতে লাগল।

দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতন যাবার সময় হয়ে গেল। বাবা আশিস এবং দ্যুতিকে নিয়ে শান্তিনিকেতন গেলেন।

বাবা যাবার পর সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আমার শিক্ষা শুরু হয়ে গেল অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে। নিজেকে বিব্রত বোধ করি। জুবেদা খাতুন সোয়েটার বুনতে থাকেন শিক্ষাকালীন। আমার মনে এটা সঙ্গীতের বে-আদবী। ছোট থেকে এই সাংগীতিকী পরিবারে থেকেও, যদি এই ধরনের কাজ যাতে না করেন তা বলতে হয়, তার চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? অন্নপূর্ণা দেবী কিছু বলতেন না। কিন্তু শিক্ষার সময় কারো উপস্থিতি আমি পছন্দ করতাম না। তার কারণ আগেই বলেছি, কারো সামনে বকুনি খেলে লজ্জিত হয়ে মাথাটা যেন ভোঁতা হয়ে যেত।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে বাবা চিঠি দিয়েছেন। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

সান্তীনিকেতন
২৭-১০-৫২

কল্যাণবর,

শ্রীমান বাবা জিতেন জানিবে আমরা মঙ্গলমতে সান্তীনিকেতনে পৌঁছেএছিয়াছি বেশ আনন্দে আছি এখানকার সকলে খুব আদর যত্ন করিতেছে সবরকমেই, সুখ সান্তী নিয়ে আছি কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে ব্যতিক্রম ঘটেছে ডালভাত তেলপক্য সব খেতে হয়, ঘৃতের নামগন্ধ নেই। শ্রীমান আশীষের শরীর ভাল আছে এরজন্য আমার চিন্তা হয়। তিন দিন যাবত সরদি কাশীতে একটু ভুগিতেছি। সন্ধ্যার পর সান্তীনিকেতনের সবজনতা এসে রূজ আমাদের বাদ্য শুনা করে ছেলে মেয়ে সব মিলে যেবাটিতে আমি থাকি সেখানে ভরে যায়। রূজ এরূপ চলছে। অনেক শিষ্য ঝুটেছে, এখানের টিচাররা শিক্ষা করে। কর্ত্তাপক্ষ হতে আমায় কুন রূপ আদেশ দান করে নাই কি করিতে হবে যা করিতে হয় নিজ ইচ্ছানু যাই করি। তুমরা সকল কেমন আছ, আমার স্নেহের নাতি নতিন মা এরা কেমন আছে সব যানিয়ে চিন্তাদুর করিবে। তুমাদের কুশল জানার জন্য ব্যাকুল আছি, চাকরদের কার্য কর্ম্ম ঠিক চলে কিনা ঐন্য২ সব জানিয়ে চিন্তাদূর করিবে। শ্রীমান রবিশঙ্করের কুশলআদি জানাবে ও আমি এখানে এসেছি সব জানাবে। বিশেস আর কি জানাব সকলে আমার আসির্ব্বাদ নেবে।

প্রাণেষ অমরেসের শুভ ধ্যানীষ শ্রী সকলের সাস্ত কেমোন আছে জানাবে এদেরে আমার স্নেহাশীষ দেবে একপ্রকার আছি তুমাদের কুশল কামনা করি। সময় পেলে মাঝে ২ যেয়ে বেন্ড পারটিতে এরা নিয়মমত কর্ম্ম করে কিনা এদেরে জানিয়ে আমার কাছে রিফট করিবে।

ইতি
বাবা
আলাউদ্দিন

চিঠিটা পড়ে বুঝলাম দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না। বাড়িতে দেশী ঘিয়ের রান্না খেতেন অথচ শান্তিনিকেতনে গিয়ে তেলের রান্না খাচ্ছেন। মা এবং বাড়ির সকলকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম। মৈহারে যাবার পর থেকে বাবা আমাকে কখনও যতীন আবার কখনও জিতেন বলে সম্বোধন করতেন। চিঠিতেও মাঝে মাঝে যতীন এবং জিতেন বলতেন এবং লিখতেন। জিতেন বলে ডাকবার একটা কারণ ছিল। সাতনার ধর্ম জামাই-এর নাম জিতেন বলে বাবা ঐ নামটা ডেকে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই আমাকে ভুলবশতঃ বাড়িতে এবং চিঠিতে কখনও জিতেন বলতেন। মা কিন্তু কোন দিনই জিতেন বলেন নি। বরঞ্চ বাবাকে কয়েকবার বলেছেন, 'আরে যতীনকে তুমি জিতেন বলে ডাক কেন?' উত্তরে বাবা বলেছেন, 'দীর্ঘকাল সাতনার ধর্মজামাইকে ঐ নামে ডেকেছি বলে যতীন নামটা মনে থাকে না।'

বাবার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমাচার জানিয়ে জবাব দিলাম। তাঁর অবর্তমানে মৈহারে নানা অশান্তি থাকলেও একটা সান্ত্বনা ছিল, যে কারণে মৈহারে এসেছি তার থেকে বঞ্চিত হইনি। বছরের শেষ দিন পর্যন্ত যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। তিনি বরাবর বলেছেন, 'যে কদিন আমি মৈহারে আছি যতটা পারেন শিখে নিন।' শান্তিনিকেতন থেকে

বি.দ্র. : বাবার হস্তাক্ষরের নমুনা হিসাবে এই পত্রটি ছাপা হল। অন্যান্য পত্রগুলি যথাযথ ছাপা হল যাতে স্পষ্ট বোঝা যায়। উপরিউক্ত পত্রটিও স্পষ্ট করে ছাপা হল সকলের বোধগম্যের জন্য।

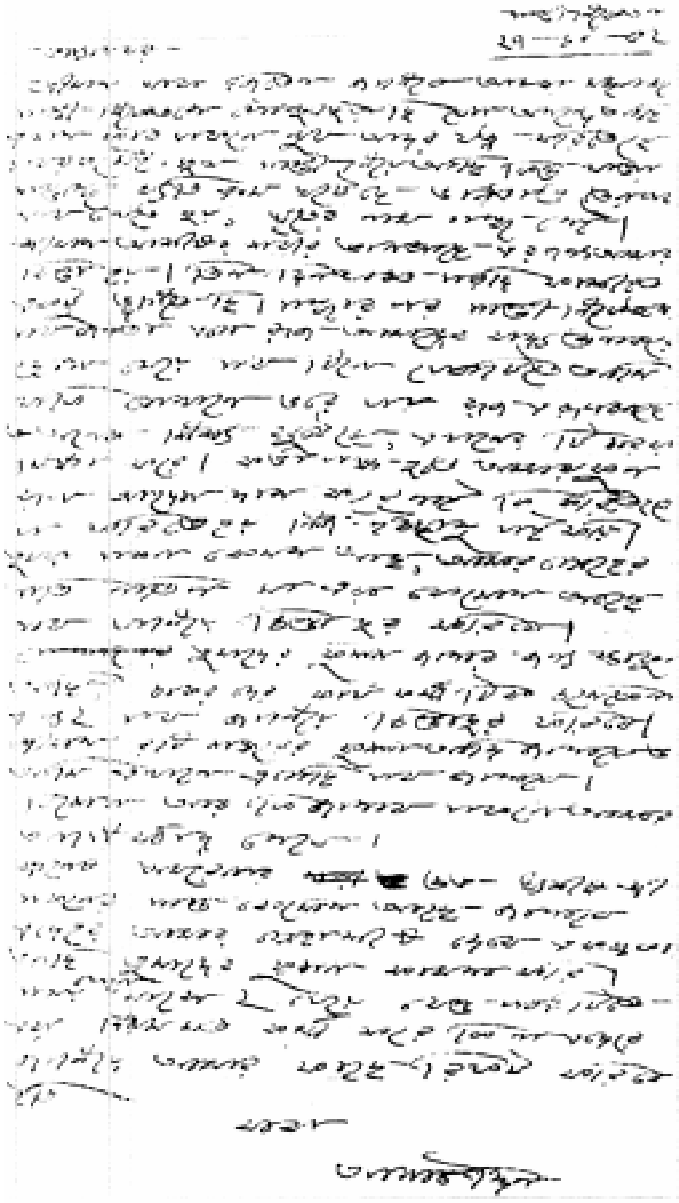

বাবা মৈহারে এলেই অন্নপূর্ণা দেবী দিল্লী চলে যাবেন। বাবার অবর্তমানে আর্থিক চিন্তা আমাকে করতে হয়নি। বাবা অবশ্য টাকা দিয়ে গিয়েছেন, টাকা পাঠাবেনও, কিন্তু বাড়তি খরচটা অনেক। সেই খরচটা বরাবরই অন্নপূর্ণাদেবী পূরণ করেন। তার জন্য নিশ্চিন্তে সাধনা করতে পারছি।

অশান্তি তো থাকবেই। অশান্তির আর এক নাম জীবন। বাবার অবর্তমানে, মা বরাবরই নিজের মনের দুঃখ আমার কাছে কখনও প্রকাশ করে নিজেকে হাল্কা অনুভব করেছেন। মাকে যথাসাধ্য বুঝেছি। তাঁর স্নেহ আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। মার মুখে কোন কালেই কথা নাই। ব্যতিক্রম হয়েছে কয়েকবার মাত্র যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু জুবেদা খাতুনের কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। অন্নপূর্ণা দেবীর অবর্তমানে মাকে নানা কথা বলতে শুনেছি। মা কিন্তু জুবেদা খাতুনের মেজাজ জানেন বলেই চুপ করে থাকেন। তবে জুবেদা খাতুনকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। সে কি নিয়ে থাকবে? লেখা পড়া করেনি যে বই নিয়ে সময় কাটাবে। গান বাজনা শিখলে তাই নিয়ে সময় কাটাত। দুঃখও হয় তার জন্য। স্বামী থাকতেও একটা চিঠি দেন না। টাকাও পাঠান না। যার জন্য মনে মনে হীনমন্যতায় ভোগা স্বাভাবিক। তার কাজের মধ্যে কখনও রেডিও শোনা, ছেলে মেয়েদের সঙ্গে পরনিন্দা পরচর্চা করা, আর রাগ হলে ছেলেদের মারা এবং অযথা মাকে কটু সম্ভাষণ করা। মনোরঞ্জন বলতে কিছু নেই। সকলে সিনেমা গেলেও, ঘরের বৌ বলে সিনেমাও যেতে পারেন না। সুতরাং সারাদিন কি করে কাটবে? তবে একথা বলতেই হবে, জুবেদা খাতুনের মত নারী আমি দেখি নি। তার কথা বলার ভঙ্গি, ভাষা, ব্যবহার সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কথায় বলে বোবার শত্রু নেই। অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে এসব করতে সাহস পান না কারণ তিনি সর্বদাই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই জন্য নিজের মনেই গজ গজ করেন। এক একটা কথা এমন বলেন, যা শুনে মাথা গরম হয়ে যায়। যেমন একদিন মাকে বললেন, 'ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে।' এর অনেক অর্থ হয়। কি কারণে মাকে বলছেন বোঝা যায় না। অবাক হই, মাকে কোন সাহসে এ সব কথা বলেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিখি বলে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছি। এটা কারও মনঃপূত নয় যে আমি শিখি, কিন্তু আমার কপালে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডন করবে? আমার শিক্ষা যাতে না হয় তার জন্য কি গভীর চক্রান্ত হয়েছিল ভাবলে মাথা গরম হয়ে যায়।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তানসেন সঙ্গীত সমারোহতে সম্মিলিত হবার জন্য বাবার কাছে চিঠি এল। শান্তিনিকেতনে বাবার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

শুক্রবার ছুটির দিন। ভাল সিনেমা এলে আশিস, ধ্যানেশ এবং শুভকে দেখিয়ে আনি। 'ঝাঁসীর রানী' সিনেমা এসেছে। অন্নপূর্ণা দেবী টাকা দিয়েছেন। সিনেমা গিয়েছি, সিনেমা নির্বাচনের ভার আমার উপর। মাকে মাঝে মাঝে নাতিদের সঙ্গে সিনেমায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিই। মা কেবল একটা কথাই বলেন, 'বেডা তোমার জন্যই সিনেমা দেখতে পেলাম। তোমার বাবা কখনও সিনেমায় নিয়ে যায় না। সিনেমা দেখা পছন্দ করেন না। অথচ নিজে নাতিদের নিয়ে মাঝে মাঝে যাবেন।' মার কথা শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

আমার শিক্ষা এবং সাধনা নিরন্তর চলছে। তার ফাঁকে অন্নপূর্ণা দেবীকে পড়াই। পড়াবার ফাঁকে গল্পচ্ছলে চেষ্টা করি যাতে রবিশঙ্করের প্রতি মনটা একটু সদয় হয়। এ ছাড়া গল্পচ্ছলে বুঝবার চেষ্টা করি অশান্তির কারণ কি? যে অশান্তি মনে পোষণ করে হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। অবশ্য এবারে বাবা যাবার পর এখনও ফিট হন নি। একদিন গল্পচ্ছলে রবিশঙ্কর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ সমাচার জানতে চাইলাম। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরমুহুর্ত্তেই বললেন, 'আমার সঙ্গে এ বিষয়ে বেশি আলোচনা করবেন না, এ সব আলোচনা করলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।' এ উত্তর আশা করিনি, কিন্তু পড়াবার সময় নানা কেস হিস্ট্রি শোনাতে শোনাতে বুঝতে পারলাম রোগের উৎসস্থল কোথায়? চেষ্টা করি যাতে নীরোগ থাকেন, এটা আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

তিনটি রাগ একদিন অন্তর শিখি। ঝিঁঝিঁট, ইমন এবং পিলু। শিখবার সময় বরাবরই আমার একটা কথা মনে হয়, সেতারে কি দক্ষতা। এ জিনিষ তো কারো সেতারে শুনতে পাই না। একটা কথাই মনে হয় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন সাধনার দ্বারা। এটা তো এখন বুঝতে পারি, কিছু অঙ্গ সেতারের জন্য সহজ কিন্তু সরোদের জন্য কঠিন। আবার কিছু অঙ্গ সরোদের জন্য সহজ কিন্তু সেতারের জন্য কঠিন। কিন্তু সেতার শুনে মনে হয় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। যে অঙ্গ সেতারে কেউ বাজায় না, সেই কঠিন অঙ্গ জলের মত বাজিয়ে যান। শিক্ষার সময় ঠিক বাবার মত উপদেশ দেন। প্রায়ই শিক্ষার সময় বলেন, 'সৎপথে থাকতে হবে, প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে হবে, তবেই সঙ্গীত হবে। আর সৎপথে না থাকলে সঙ্গীত যেটা হবে সেটা নাম মাত্র।' মাঝে মাঝে বলেন, 'কষ্ট করে বাবার কাছে শিখবেন, সব সহ্য করে শিখতে পারলে তার ফল অবশ্যই পাবেন।' মনে মনে সান্ত্বনা পাই এসব কথা শুনে। হঠাৎ শুভর জ্বর এসে গেল। ওষুধ এল। অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখি মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

৩০

কোন খবর না দিয়ে, আলি আকবর লক্ষ্ণৌতে রবিশঙ্করের সঙ্গে বাজিয়ে, একা মৈহার এল। এই প্রথম সরোদ নিয়ে এসেছে যেহেতু বাবা নেই। মনে মনে আনন্দ হল। কিছু অঙ্গ আছে যা অন্নপূর্ণা দেবী বলেন সাধনা করতে এবং আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। কথাচ্ছলে বলেছি, 'এ অঙ্গ তো কেউ বাজায় না।' উত্তর একটাই পেয়েছি, 'পাকামি করবেন না। যা বলছি তাই করুন। যা কেউ করেনা সেটা করলেই তো নূতনত্বের আনন্দ পাবেন।' মনে হল কায়দা করে আলি আকবরকে বলব সেই অঙ্গ বাজাতে। আলি আকবরের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হল। কিছুক্ষণ পরে ভাবুকের মত নিজের জীবনের করুণ কাহিনী শোনালেন। বাবার কাছে কত মার খেয়েছেন। মারের ভয়ে বাড়ি থেকে দুই বার পালিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট বয়সে কত কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ হয়েছেন এবং এত রিয়াজ করেছেন যে ভাবা যায় না। এত বয়স হয়েছে, কখনও বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার সাহস হয়নি। ছোট বেলার কাহিনী বলে নিজের বিবাহের কাহিনী বললেন। সেই বিবাহের কাহিনী থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিভাবে গেছে এবং যাচ্ছে সব বললেন। চুপচাপ সব শুনবার পর বললাম, 'মৈহারে মাঝে মাঝে এলে সব দিক দিয়েই মঙ্গল। সংসারে শান্তি ফিরে আসবে। মৈহারে

এলে বাবারও মেজাজ ভাল থাকবে যার ফলে আমাদেরও সুবিধা। এ ছাড়া আপনার নিজের স্ত্রীকে চিঠি লেখা, এবং টাকা পাঠান উচিত। এসব না করার ফলে মনে নানা প্রতিক্রিয়া আসা সম্ভব।' চুপ করে শুনে গেল আলি আকবর। ভাবলাম আজ এতদূরই থাক।

পরদিন আলি আকবরকে অনুরোধ করলাম বাজাতে। বললাম, 'বাজনা শুনি কেবল রেডিওতে, কনফারেন্সে, কিন্তু সামনে শুনতে পাই না। সুতরাং আজ বাজনা শুনব।' বাজনা শুনবার ইচ্ছা তো আছেই উপরন্তু পঞ্চমে এবং খরজে মীড় গমকের কয়েকটা অঙ্গ বাজাতে বলব। প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। অন্নপূর্ণা দেবী এবারে বললেন, 'বাজাও না দাদা, অনেক দিন তোমার বাজনা শুনিনি।' আলি আকবর গম্ভীর হয়ে বলল, 'বোন, তোমার এবং বাবার সামনে বাজাতে আমার অবস্থা অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে যায়।' এ কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি যে বল দাদা, বাজে কথা বোলো না, বাজাও।' আলি আকবর গম্ভীর ভাবেই বলল, 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' ভাইবোনের পারস্পরিক প্রীতি এবং আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করল। আমি সরোদটা নিয়ে এসে আলি আকবরের সামনে রাখলাম। আলি আকবর বাজাল। বাজনার শেষে আমি বললাম, পঞ্চমে এবং খরজে এই সব কঠিন মীড় এবং গমক কিকরে বাজবে। বলল, 'খুব রিয়াজ করলে এই সবের পারফেকশন হবে।' অসুস্থ শরীর নিয়ে শুভ চুপ করে বাজনা শুনছিল। আলি আকবর শুভর চুপ করে একাগ্রচিত্তে বাজনা শুনতে দেখে বলল, 'বোন, আমার একটা কথা মনে রেখ। শুভ দেখবে রবিশঙ্করের থেকেও ভাল বাজাবে।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি যে বল দাদা।' আলিআকবর বলল, 'যা বললাম দেখো হয় কিনা।' এক ফাঁকে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম 'দেখুন আমি যা বলেছিলাম সত্য কিনা। পঞ্চম এবং খরজে এই মীড় এবং গমক হওয়া কঠিন। আলি আকবরও বাজাতে পারল না।' আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী ধমক দিয়ে বললেন, 'পাকামি করবেন না। খালি বড় বড় কথা।'

আলি আকবর আসবার পর থেকেই জুবেদা খাতুন গম্ভীর ছিলেন। আজ সকালেই জ্বর এসে গেল। ডাক্তার এল। সারাদিন রাত জ্বর কমবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আলি আকবরকে বললাম ঘরে গিয়ে বসতে। জবাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'আমি গেলে জ্বর আরও বেড়ে যাবে।' এ কথা শুনে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝালাম। কিন্তু দেখলাম সঙ্গীত ছাড়া আলি আকবর আর কিছুই জানে না। অথচ জানি, আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের চামচের অভাব নেই। এরা কারও কাছে অপ্রিয় কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং বুঝলাম আমার কথা মনঃপূত হল না। অবশ্য এটা ঠিক দু'পক্ষেরই দোষ আছে নইলে এরকম হবে কেন?

পরদিন ডাক্তারবাবু জুবেদা খাতুনের রক্ত নিলেন পরীক্ষার জন্য। দুপুরেই এসে বললেন, 'রক্তে কোন দোষ নেই, ভয়ের কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাবে।' সত্যই জ্বর বিকেলে ছেড়ে গেল। রাত্রে আলি আকবর জুবেদা খাতুনকে খোঁচা দিয়ে টন্ট করতে লাগল। এই শুনে জুবেদা খাতুন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আদিখ্যেতা করে তোমায় কে আসতে বলেছে। কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাও।' সত্যই আলি আকবর যেতে চাইল কিন্তু কোলকাতা যাবার রিজারভেসন পেল না। দুদিন পর রিজারভেসন পেল।

বাবার চিঠি এল। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যাণবর

শ্রীমান বাবা দিতেন তুমার পত্রে সব বিসয় অবগত হয়ে সুখী হলেম। শ্রীমান আশীষ ভাল আছে, আমার শরীর বিশেষ ভাল থাকে না। খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। চিন্তার কারণ নাই। বীশ্বভারতীর সেবা করতে এসেছি ১ মাস কেটে গেছে আরেকটা মাস কোনপ্রকারে কাটলেই চলে আসিব। ঐদ্য এক টেলি এসেছে মাইহার হইতে তহশীলদার সাহেব করেছেন টেলিখানা পাঠাইলাম পরে দেখিবে। আমি এই সময় জাইতে পারিব না বলে জবাব দিয়েছি, তুমিও তিনিকে জানাবে তিনমাসের জন্য আমি ছুটি নিয়েছি এই তিনমাস আমি শরীরের জন্য শান্তি নিয়ে যেখানে আনন্দ পাই তাই করিবার ইচ্ছা। চিপ সেক্রেটারি মহাশয়কে আমি এ সব জানিয়ে এসেছি ব্যাণ্ড পারটির যন্ত্রের উয়াডার দিয়েছি তৈয়ার না হওয়া পর্য্যন্ত মাইহার আসিব না এ সবকথা তহশীলদার সাহেবকে জানাবে। তুমার দাদা আলি আকবরের সঙ্গে কিম্বা শ্রীমান রবিশঙ্করের সঙ্গে আশীষকে পাঠাইবার ইচ্ছা আছে। এখন তাদের মতামৎ জেনে যাহা হয় করা জাবে। শ্রীমান শুভ, ধ্যানীষ শ্রী প্রানেস অমরেষ সকলকে আমার স্নেহ জানাবে। বিশেষ আর কি জানাব একপ্রকার আছি তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

বাবা

চিঠি পড়ে অবাক হলাম। আলি আকবরকে চিঠি পড়ালাম। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মুখভাবে। বাবার কথামত চিঠি লিখে দিলাম তহশীলদারকে। আজ দুটো ঘটনা ঘটল। এই দুটো ঘটনায় বুঝলাম আলি আকবর অত্যন্ত কানপাতলা। এ ছাড়া বহুদিকের দুর্বলতা আছে। কি কারণে কানপাতলা সেই কথাটা আগে বলি। মৈহারে পাঁচ ছয় জন আছেন যাঁদের কাছে বাবা সব কথা খোলাখুলি বলেন। সংসারের বিশেষ করে আলি আকবর, রবিশঙ্করের সব কথাই বলেন। যাঁদের সঙ্গে আসা যাওয়া আছে তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছে জেলার, যাঁকে সকলেই কোর্ট সাহেব বলে। আলি আকবর আসাতে কোর্ট সাহেব সকালে এলেন। দুজনে কথাবার্তা বলছেন। আমি নিজের কাজে ব্যস্ত। কোর্ট সাহেব যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আলি আকবরের মুখটা কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর খারাপ নাকি' উত্তরে আলি আকবর বলল, 'শরীর ঠিকই তো আছে। আচ্ছা একটা কথা বলতো, বাবা কি বাড়ির কোন উইল করেছেন?' অবাক হয়ে বললাম, 'কেন বলুন তো।' আলি আকবর বলল, 'কোর্ট সাহেব বলল যদি আমি রাজদুলারীকে ডিভোর্স না করি তাহলে বাবার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর কোন জিনিসেই অধিকার আমার থাকবে না। এই মর্মে বাবা নাকি উইল করেছেন?' বুঝলাম আলি আকবরের মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আলি আকবরকে বললাম, 'কোর্ট সাহেবের এই কথা আপনি বিশ্বাস করলেন? একেবারে বাজে কথা। উইল করলে আমি জানতে পারতাম।' আমার কথা শুনে আলি আকবর বিশ্বাস করল। আসলে কোর্ট সাহেবের বলার উদ্দেশ্য, ডিভোর্স করলে বাবা খুশী হবেন। তার জন্যই একটি কল্পিত কাহিনী বলেছেন।

এক দিনেই পর পর দুটি ঘটনা ঘটল। একটির কথা আগেই বলেছি, দ্বিতীয় ঘটনার কথা এবারে বলি। বখসিসের লোভে বাড়ির দাই চাকরাণী চুপিচুপি আলি আকবরকে বলেছে,

'নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বম্বে চলে যান নইলে বাবা কোনদিন অপমান করে বহুরাণীকে তাড়িয়ে দেবে। বাবা খুব চটে আছেন।' এই কথা শুনে আলি আকবর দুপুরে খাবার পর বলল, 'বাবা কি চটে আছেন জুবেদার প্রতি?' আবার অবাক হবার পালা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলেছে এ কথা?' আলি আকবর বলল, 'বাবা নাকি অপমান করে জুবেদাকে তাড়িয়ে দেবে?' কথায় কথায় বুঝলাম চাকরাণী বলেছে। বললাম, 'আপনি টাকা পাঠান না, চিঠি লেখেন না বলে বাবা চটে যান। তার মানে এই নয় যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন।' আলি আকবর নিশ্চিন্ত হল। এবারে বললাম, 'দিল্লীতে যে আপনাদের বাজনা হয়েছিল বিলায়েতের সঙ্গে তার জন্য বাবা আপনার প্রতি চটে গেছেন। আপনি নাকি বেশি বাজান নি।' এ কথা শুনে আলি আকবর বলল, 'মিসেস চরতরামের অনুরোধে বাজিয়েছিলাম। বিলায়েৎ, রবিশঙ্করকে বাজাতে সুযোগ দিয়েছিলাম। আমি বেশি বাজালে ওদের বাজনা চাপা পড়ে যেত তাই বেশি বাজাই নি।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি হয়েছিল?' শোভনা সোমের যে মন্তব্য কাগজে বেরিয়েছিল সে কথাটা বলাতে, আলি আকবর বলল, 'ওটা কি বাজনা হয়েছে, রেসলিং এর মত বাজনা। রাগের তালের কোন ঠিক ছিল না। ব্যাপারটা ছিল দলাদলি।' ব্যাপারটা এবারে আমার কাছে বোধগম্য হল। আমার মনে হল কাশীতে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বিলায়েৎকে বাজাতে দেন নি। রবিশঙ্করের কাছে পরে যে ঘটনাটা শুনেছিলাম, তার জন্যই বোধ হয় নিজের লোক লাগিয়ে তালি দিয়ে ব্যাপারটার একটা রূপখাড়া করা হয়েছে।

রাত্রে আলি আকবর আমার ঘরে এসে বলল, 'বাজাও'। ইমন বাজালাম। মন্দ্র, মধ্য সপ্তকে আলাপ করে অন্তরা বাজাবার পর আলি আকবর হঠাৎ সুর করে আমাকে বাজাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাজালাম। আলি আকবর খুসী হয়ে বললে, 'খুব বাজাও। বম্বেতে নিখিল আমার কাছে শিখছে।' তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হলাম। কি মিষ্টি গলা! উচ্ছ্বসিত হয়ে গলার প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, 'আমার গলা শুনে ভাল বলছ, অন্নপূর্ণার ছোট বেলার গলা শুনলে পাগলা হয়ে যেতে। অন্নপূর্ণা যদি গাইত তাহলে ওর মত গায়িকা ভারতবর্ষে হত না। যদিও টন্সিল অপারেশনের পর অন্নপূর্ণার গলা সেইরকম নেই, তা হলেও ওর গলা শুনবে অবাক হয়ে যাবে।' বাবার কাছে একবার এই কথা শুনেছিলাম। আলি আকবরের কাছে এই কথা শুনে মনে হল এখনও গলার যে মিষ্টত্ব তার তুলনা নেই। আগে তা হলে না জানি কি ছিল?

আজ ছয়দিন আলি আকবর এসেছে। জুবেদা খাতুন মাঝে মাঝেই জ্বরে ভুগছেন। আজ আবার জ্বর এল। খুবই দুর্বল। টলে পড়ে যাচ্ছেন। মৈহারে এসে অবধি জ্বর দেখাটা আমার কাছে ডাল ভাতের মত হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা একে একে জ্বরে পড়ে। কিন্তু জুবেদা খাতুনের এই রকম একদিন ভাল থাকতে না থাকতে জ্বর হওয়া এই প্রথম। আলি আকবর বললেন, 'আমাকে দেখে জ্বর হয়েছে। রান্না করবার সময় জ্বর আসে, রান্না হয়ে গেলেই জ্বর ভাল হয়ে যায়।' মনে মনে ভাবলাম এ কি রসিকতা! রাত্রে জুবেদা খাতুন ঠিক হয়ে গেলেন।

আজ সাতাশে নভেম্বর। আলি আকবর কোলকাতায় যাবেন। সকালে বাগচী বাবু সস্ত্রীক এলেন। তিনি কয়েকটি মাসিক পত্রিকা আমাকে পড়তে দিলেন। পত্রিকায় দেখলাম, 'আমার

কথা' উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। শুভময় ঘোষ কর্তৃক অনুলিখিত। লেখাটা এক নিমেষে পড়ে শেষ করলাম। দেখলাম আলি আকবর বাগচী বাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। লেখাটা পড়ে বুঝলাম, বাবা শান্তিনিকেতনে যাবার পর, তাঁর কথায় শুভময় ঘোষ লিখেছেন। লেখাটায় কয়েকটা নূতন জিনিষের সন্ধান পেলাম। কিন্তু কয়েকটা ভুল তথ্যও নজরে পড়ল। একবার ভুল তথ্য প্রকাশের ফলে বগুড়ার ছেলেটির কি দুর্গতিই না হয়েছিল। এইবার যে ভুল তথ্যটি লেখা হয়েছে, তখন কি জানতাম ১৯৮২ সালে এই লেখাটিরই হিন্দি অনুবাদ করে একটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে? আর সেই প্রকাশনটা হবে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীত এ্যাকাডেমির দ্বারা ভূপাল থেকে। এখন মনে হয় একটি বিকৃত ঘটনা সংবাদে বা মাসিক পত্রিকায় বেরলে সেটি পরবর্তীকালে ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়। ইতিহাসের উপর সকলেই নির্ভর করে ইতিহাস হল ট্রুথ। কিন্তু সত্যই কি তাই? ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় যা সব লেখা আছে তা সব কি সত্য? তা হলে উপায়? ইতিহাসের গবেষণা দরকার। আলি আকবর সাতনা থেকে কোলকাতা মেলে কোলকাতা যাবেন। সুতরাং বাগচীবাবু সস্ত্রীক চলে গেলেন নিজের বাড়ি। কোলকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন ১লা ডিসেম্বর কোলকাতা রেডিওর প্রোগ্রাম শুনতে।

আজ সন্ধ্যায় যথারীতি রাগ পুরিয়া শিখলাম। রাত্রে রেডিওতে কোলকাতা স্টেশনের মারফৎ তানসেন কনফারেন্স থেকে রিলে শুনলাম। তিনপুরুষের বাজনা। বাবা, আলি আকবর এবং আশিস, তিন পুরুষের ত্রয়ীযন্ত্র সংগীত বলে ঘোষণা করা হল। রাগ হেম বেহাগ। তবলার সহযোগীতা করলেন অনোখেলাল এবং আল্লারাখ্যা। বাড়িতে সকলেই বসে বাজনা শুনলাম। এই তিনপুরুষের বাজনাটা ঐতিহাসিক। এর আগে বাপ, ছেলে এবং নাতি একসঙ্গে কখনও বাজায়নি। বাবা নিজের ছেলেকে নিয়ে বসেছে এর নজরি আছে, কিন্তু তিন পুরুষ! শুনে খুব আনন্দ হল। তবে বাবা একাই একশ। বাবার বাজনার কাছে সব ম্লান হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার গোবিন্দ সিংকে বলেছিলাম বাজনা শুনতে। পরদিন তিনি আমাকে দুটো বই পড়তে দিলেন। একটা কিরোর লেখা এস্ট্রোলজির বই, যার মধ্যে জন্ম তারিখ হিসাবে মানুষের ভাগ্য লেখা আছে। আর একটা এনসাইক্লোপিডিয়া অব সেক্সুয়াল সায়েন্স।

কাশীতে এক ভণ্ড সাধু এবং জ্যোতিষ দেখেছিলাম যখন স্কুলে পড়ি। জ্যোতিষের সঙ্গে এক সাকরেদ ছিল। শিষ্য বাড়ির ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির সকলের কথা একটা কোড সঙ্কেত বলে দেয়। গুরু সেই কথা বলে সকলকে বিস্মিত করে। মৈহারেও একবার শুনলাম বিরাট এক সাধু জ্যোতিষ এসেছে। অবস্থান করছে এক মন্দিরে। মহিলাদের ভিড় বেশি। কিন্তু এ্যালাবিয়া সাহেব এবং চোপড়া সাহেব মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন একবার দেখতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কাশীতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাই লাভ করলাম। একান্তে সাধুকে বললাম, 'আগামীকাল যদি মৈহারে দেখতে পাই তাহলে সকলকে মেরে তাড়াব।' পরদিন সাধু চলে গেল। এ গল্পটা এই জন্য লিখলাম যাতে লোকে এই ধাপ্পাবাজীতে না ভোলে।

আজ বাবার একটা চিঠি পেলাম। লিখছেন

সান্তীনিকেতন
২.১.৫২

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা জতিন তুমার পত্র এইমাত্র পাইলাম সববিষয় অবগত হয়ে চিন্তা দূর হল চুন্নিলাল সেটের কাছে জেয়ে একটিন ঘি নিয়ে আসিবে, আমি এসে এর মূল্য দেব আসবার সময় সেটাকে বলে এসেছি, যা কিছু চাহিবে সব দিবে, আমার নাম করে আনিবে। ২০০ ও ১৯০০ খরচের জন্য পাঠিয়েছি খাই খরচ করিতে কুন রূপ দিধা করিবেনা তুমরা সকলের যাতে কষ্ট না হয় তাহা করিবে, ঐদ্য আমি সজ্জাগত হয়ে পড়েছি, কমরে ব্যথার দুরূন, ৯ তারিখ এখান থেকে কার্য্য শেষ করে কলিকাতা যাইব লাটসাহেব একটা কনফ্রেন্স করিতেছে সিয়ার দাসের ফণ্ডের জন্য, যা টাকা উটিবে ফণ্ডে দিবে ১০-১১-১২ পর্যন্ত কনফ্রেন্স হবে। সেখানের কাজ শেষ করে মাইহার আসিব। ও যন্ত্রগুলি তৈয়ার হয়ে গেলে পাঠিয়ে তারপর মাইহার আসিব। সকলকে আসির্ব্বাদ দিবে নাতি নাতিন সকলকে জিজ্ঞাসা করিবে এদের জন্য কি আনিব জেনে আমাকে কলিকাতা শ্রীমান দক্ষীনাবাবার ঠিকানায় পত্র লিখে জানাবে তুমার মা, ও বৌমা, তুমারদিদিকে বলিবে এদের কি দরকার জেনে আমায় জানাবে।

একপ্রকার তুমাদের কুশল জানিয়ে সুখী করিবে

ইতি
বাবা

চিঠির মাসটা ১২র জায়গায়, বাবা ভুলে ১ করেছেন। চিঠিটা পেলাম ছয় দিনের মাথায়। তাঁর সব দিকে খেয়াল আছে। এই চিঠির দ্বারা তাঁর চরিত্রের একটা দিক বোঝা যাবে। তাঁর চিঠি পেয়েই জবাব দিলাম।

কয়েকদিন পর বুঝলাম ভণ্ড জ্যোতিষ বহুলোকের টাকা নিয়ে পালিয়েছে। মৈহারে এই নিয়ে কয়েকদিন সব জায়গায় আলোচনা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে একসঙ্গে নানা কাজ মাথার উপর। মানসিক চাপ পড়েছে। রিয়াজও করছি। ব্যাডমিন্টন খেলাও চলছে। রবিশঙ্করের একটি চিঠি এল। অন্নপূর্ণা দেবীকে লিখেছেন, বাবা বৃথাই শান্তিনিকেতনে আছেন। বাবার মৈহারে চলে আসা উচিৎ। অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে একথা জানতে পারলাম।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম, সিনেমার ছবি নিয়ে যে ভদ্রলোক এসেছে সে বাঙ্গালী। যেদিন খবর পেলাম, সেই দিন সে বাড়িতে এসে হাজির। নিজের পরিচয় দিল একজন সঙ্গীতপ্রেমী বলে। নারায়ণ রাও পটবর্দ্ধনজীর কাছে কিছুদিন শিখেছেন। তারপর ভদ্রলোক একটা বই দিলেন। বইটা দেখে বুঝলাম তিনি জ্যোতিষী। প্রশ্নের তালিকায় মানুষের জীবনের যা কাম্য সবই আছে। পারিশ্রমিক সর্বনিম্নে পঞ্চাশ টাকা থেকে উর্দ্ধে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। ভাবলাম যিনি এত বড় জ্যোতিষ এবং যাঁর পারিশ্রমিক এত টাকা, তিনি কেন সিনেমার ফিল্ম নিয়ে সাধারণ চাকরি করছেন? ভদ্রলোক কয়েক সেকেণ্ড গুণ গুণ করে বসন্ত রাগে গান করে বললেন, 'সিনেমার লাইনে অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করে। যেহেতু আমার একমাস সময় খুব খারাপ, সেইজন্য এই সাধারণ কাজ নিয়ে তিনদিনের

জন্য মৈহারে এসেছি। মৈহারে অর্থ উপায় করার জন্য আসি নি। বাবার নাম শুনেছি সিনেমার মালিকের কাছে। যদিও শুনেছি বাবা নেই, তবু আপনার বাজনা শুনবার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি।' ভদ্রলোককে দেখে অত্যন্ত অমায়িক বলেই মনে হোল। বাজনা শোনালাম। তিনি খুসী হয়ে রাত্রে সিনেমায় গিয়ে দেখা করতে বললেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস আছে। মৈহারে আসবার আগে তিনজন জ্যোতিষীর প্রতি আমার আস্থা ছিল। কিন্তু প্রতারক জ্যোতিষী অনেক দেখেছি। যিনি এসেছেন তাঁর প্রতি কোন বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর কাছে রাত্রে গেলাম। কেউ কোন প্রশ্ন করলে, গুণ গুণ করে বসন্ত রাগে একটু গেয়েই কয়েকজনকে যা বলতে শুনলাম, শুনে বিস্মিত হলাম। সহজে কাউকে এই সব বিষয়ে বিশ্বাস করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। এখানে ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেকেই জেনে গেছেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস হবার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই শেষ করব। আমার সঙ্গে তাঁর গল্প হচ্ছে ইতিমধ্যে সারকেল ইন্সপেক্টর এসে হাজির। আমি তাঁকে সম্বোধন করতে যাব কিন্তু তিনি ইসারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। জ্যোতিষী ভদ্রলোক, পিছন দিকে বসে থাকায় তাঁকে দেখতে পান নি। সারকেল ইন্সপেক্টর এসে নমস্কার করে বললেন, 'শুনলাম জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনি অভিজ্ঞ, দয়া করে আমাকে কিছু বলবেন?' ভদ্রলোক একটু গুণ্ গুণ্ করে গেয়েই বললেন, 'পুলিশের লাইনে চাকরি করছেন, সি.আই.ডি. ডিপার্টমেন্টে যাবার আগ্রহ কেন?' এই কথা শুনেই সারকেল ইন্সপেক্টর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ভদ্রলোক সারকেল ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'সি.আই.ডি. ডিপার্টমেন্টে যাবেন না।' এই ধরনের অলৌকিক কয়েকটা ঘটনা দেখে আমার বিশ্বাস হল। রাত্রেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমার মনে হল বাড়ি নিয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখাই যাতে তিনি মনের শান্তি খুঁজে পান। অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম কিন্তু তিনি এলেন না। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করলে ভদ্রমহিলার জীবনে শান্তি আসবে।' তিনি ভদ্রমহিলার নামের প্রথম অক্ষরটা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, তিনি গুণ্ গুণ্ করে গেয়েই বললেন, 'তিন বছরের মধ্যেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর ডিভোর্স হয়ে যাবে।' এ কথা শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। আমি বললাম, 'এর কোন প্রতিবিধান নাই।' তিনি বললেন, 'কাল বম্বে যাবার আগে বলব।' তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি সিনেমায় গেলাম। গিয়ে দেখি বেশ কিছু লোক নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। আমি নিজে দুটো কথা জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক আমার মনের কথা বুঝে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসুন। আজ আমার সঙ্গেই থাকুন। সকালের ট্রেনে যাবার সময় আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাব।' বাড়ি গিয়ে খাবার খেয়ে সিনেমায় গেলাম। একের পর এক লোককে যা বললেন, মনে হল তাঁর অলৌকিক শক্তি আছে। সারারাত্রি থেকে ভোরে ভদ্রলোকের সঙ্গে স্টেশনে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করলে ডিভোর্স হবে না।' তিনি বললেন 'ডিভোর্স তো হবেই, তবে একটা রত্ন ধারণ করলে তিন বছর হয়ত ডিভোর্স হবে না। কিন্তু এক দিন ডিভোর্স হবেই। তবে রত্ন ধারণ করলে, ডিভোর্স না হলেও সারা জীবন দাম্পত্য প্রেমে সুখী হবেন না।' তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম। এবার আমি নিজের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার কি মনে হল জিজ্ঞাসা করলাম, 'এক ভদ্রলোক আমার প্রতি কি রকম

মনোভাব পোষণ করেন।' তিনি বললেন, 'যার কথা বলছেন তার নামের প্রথম অক্ষরটা কি?' নামের প্রথম অক্ষরটা বললাম তিনি একটু গুণ্ গুনিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক কি উত্তর পশ্চিম গাজিয়াবাদের কাছে থাকেন?' অবাক হলাম, বললাম 'হাঁ'। ভদ্রলোক যা বললেন, তা শুনে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'লোকটি একনম্বরের অভিনেতা। সামনে তার এক রূপ, কিন্তু পিছনে একেবারে অন্য। ভদ্রলোক সেক্সুয়ালী পারভারটেড। ভদ্রলোকটি থেকে সাবধান থাকবেন। চিরকাল আপনার শত্রুতা করবেন।' এই কথা বলে আমাকে বললেন, 'একটি স্যাফ্যায়ার ধারণ করুন আর ভদ্রমহিলাকে একটি রুবী ধারণ করতে বলুন।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আসল ষ্টোন কোথায় পাওয়া যাবে?' তিনি হায়দারাবাদের একটি দোকানের নাম বললেন। ভোর বেলায় ষ্টেশন থেকে ফিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে সব বললাম। আমার ভবিষ্যৎ ভাল হবে জেনে তিনি আমাকে বললেন, 'ষ্টোনটা আনিয়ে নিন।' কিন্তু আমি বললাম, 'আপনি যদি ষ্টোন না ধারণ করেন তাহলে আমিও ধারণ করব না। আমার থেকে আপনার জন্যই আমি চিন্তিত। আমি মনে প্রাণে কামনা করি ভবিষ্যৎএ আপনি সুখী হোন। আপনার মনের অশান্তি দূর হলে, আমার থেকে কেউ বেশি সুখী হবে না।' কি ভেবে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'ঠিক আছে আনিয়ে নিন।' আমার এক স্বর্ণকার ছাত্রকে দিয়ে দুটো রূপোর আংটি বানালাম। অন্নপূর্ণা দেবীকে জোর করাতে আংটি পরলেন এবং নিজেও ধারণ করলাম। অন্নপূর্ণা দেবীকে অনুরোধ করে বললাম, 'এ কথা রবিশঙ্করকে বলবেন না, কারণ এ কথা শুনলে তাঁর চিন্তা হবে।' অন্নপূর্ণা দেবী আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। অবাক হলাম, একটু পরেই আংটি খুলে রেখে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আংটি খুলে ফেললেন কেন?' উত্তরে বললেন, 'আমি না কিনলে আপনি পরতেন না বলেই আমারটা আনিয়েছিলাম। আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। আপনার ভাল হবে বলেই আনিয়েছিলাম।' আমি জানি যে জিনিষটাতে না করবেন, সেটাতে হাঁ করান কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই চুপ করে গেলাম। তবুও অনুরোধ করলাম, পরলে তো কোন ক্ষতি নাই? সুতরাং পরে থাকুন না। সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর, 'এই আংটি বা কোন অলঙ্কার আমি পরি না। যা হবার হবে। এই সব আংটি পরে কি হবে?' আমার মুখে আর কোন উত্তর নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বাবার নিম্নলিখিত পত্রটি পেলাম।

কলিকাতা
শ্রীমান দক্ষিনা বাবার বাটি
৫-১২-৫২

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পেয়েছি বৌমার অসুখ ও স্নেহের শুভর অসুখ জেনে বড় চিন্তিত হয়ে পরিলাম, আমার শরীরও বিশেষ ভাল নয় এজন্য এলাহাবাদ প্রগ্রাম করিতে যাইব না সেখানে নিষেধ লিখে দিয়েছি।

কনফ্রেন্সে কয়দিন যেইয়ে বাজিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পরেছি এজন্য যাইতে পারিব না, আশীষ ভাল আছে, তুমার চিঠি পাওয়ামাত্র নাম দস্তখত করে পাঠিয়েছি আশা করি পেয়ে

থাকিবে। বেতন পেয়েছ কিনা জানাবে না পাইলে জানাবে খরচের বেতনের জন্য টাকা পাঠাব আলি আকবর ও রবির সঙ্গে দেখা হয়েছে এরা টলে গেছে।

আমাকে এখানে ১৬ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিতে হবে কলিকাতার লাটসাহেব নিমন্ত্রন করেছে ১৩ তারিখ লাটসাহেবের নিমন্ত্রন রক্ষা করে, পরে সান্তীনিকেতনে যাইব।

কলিকাতায় আমার নামে, আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমিতি স্থাপন করেছে, সেখানে আমায় খুব সম্মান দিয়েছে।

এই সময় সকলেই আমাকে সভাসমিতি করে মানপত্র দিতেছে আমার আসার অতিরিক্ত, এসব কারনে নানা জাগার নিমন্ত্রণ রক্ষা করার দুরূন সান্তীনিকেতনে যাইতে পারিতেছি না। আমার স্নেহের মা শ্রীমতি অন্নপূর্ণাকে জানাবে, এত বেশি খেটে ২ যেন শরীরটি নষ্ট না করে, এতে আমি কষ্ট পাই তুমার মাকে বলিবে একে যেন খাটিয়ে মেরে না ফেলে। আশীষের প্রণাম নেবে এবং সকলকে আমার স্নেহ ও আসির্ব্বাদ জানাবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি বেণ্ডের যন্ত্র তৈয়ার করার জন্য উয়াডার দিয়েছি

ইতি

বাবা

পু : ডিসি যদি আমার সম্বন্ধে কিছু বলে তবে জানাবে আমি ব্যাণ্ডের যন্ত্রাদি তৈয়ার করাতেছি। একমাস পরে যন্ত্রগুলি পাঠাব। আমার শরীর অসুস্থ জানাবে। জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে আমার বাদ্য হয়ে ছিল আশ্রমে। আমি তাকে বলেছিলাম গতের ঠেকা পরিবর্ত্তন কর, এ কথার দুরূন সে তবলা ছেরে চলে আসে, আমার নামে মানহানির মকর্দ্দমা করিবে, যদি মকর্দ্দমা করে আমাকেও করিতে হবে, এ জন্য কি হয় ভগবান জানেন ঐন্য লোকের কাছে এই কথা প্রকাশ করিবে না। যদি মকর্দ্দমা করে তবে আর কিছু দিন কলিকাতায় থাকিতে হবে অধৃষ্টে যা আছে তাহা হবে চিন্তা করিও না। কলিকাতায় আমার অনেকদিন হয়ে গেল শান্তিনিকেতনে মাত্র ১ মাস ছিলাম আর ১ মাস থাকিতে হবে। শ্রীমান দক্ষীণাবাবুর সেবা যত্নে চলতে ফিরতে পারি, আপন পুত্রও এমন সেবা করিবে না যা সেবা এদের পাইতেছি। মাইহারেও এমন সেবা পাই না আশীষের মুখে শুনিবে তাদের সেবার কথা কুন জন্মে সে আমার পুত্র ছিল তা না হলে এমন করিতে পারে না। বেতনের টাকা পেয়েছ কি না জানাবেতুমাদের সংস্বার খরচ কিভাবে চলে আমায় ডানাবে, তুমাদের কুনরূপ কষ্ট খাওয়া পরায় না হয় আমাকে সব জানাবে বৌমার যাতে শরীর ভাল থাকে তার বিধান করিবে। ঔষধ পত্র যা লাগে তাহা আনিয়ে চিকিৎসা করাবে আমি এসে টাকা দেব। স্নেহের দাদু দিদি, আমার মাকে স্নেহ আসির্ব্বাদ জানাবে।

ইতি

বাবা

তিনি লিখেছেন ৫ই ডিসেম্বর, কিন্তু চিঠি পেলাম প্রায় দশ দিন পর। বাবার নামে সঙ্গীত সমিতি স্থাপন করেছে জেনে মনে আনন্দ হল। যে কাজ আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের করা উচিৎ ছিল, সেই কাজ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান করেছে জেনে মনে মনে তাঁদের কৃতজ্ঞতা

জানালাম। বাবা চিঠির শেষে যা লিখেছেন তা পড়ে বিস্ময় বোধ করলাম। রবিশঙ্করের অন্তরঙ্গ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কোন সাহসে বাবার নামে মান হানির কেস করেছে? যদি কেউ ভুল ঠেকা লাগায়, তাকে প্রকৃত ঠেকা বলে দেওয়া সম্মানহানির প্রশ্ন আসে কি করে? চিঠি পড়েই বাবাকে চিঠি দিলাম। তাঁকে লিখলাম, 'কোন চিন্তা করবেন না। বেয়াদবী ক্ষমা করবেন, আপনি যদি ঝাঁপতালে কোন গৎ বাজান, তার পরিবর্তে কোন তবলাবাদক যদি সুলতালের ঠেকা লাগায় তাহলে তবলা বাদককে ঠেকা পরিবর্তন করতে বলায় অসম্মানের প্রশ্ন কোথায় ওঠে? যদি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এইরূপ করে থাকেন, তা হলে তাঁর আরও সম্মান হানি হবে। আমার মনে হয় কোর্টে কেস উঠলে এক ঘণ্টা নানা তালে আপনি যদি বাজান, ভারতবর্ষের কোন বাদকই তাল বুঝতে পারবে না। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তো কোন ছার! সুতরাং কোন চিন্তা না করে বড় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন।' চিঠিটা অন্নপূর্ণা দেবীকে পড়ালাম। চিঠি পড়ে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার এতদিন জানা ছিল ঘরোয়া জলসায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বাজান। কনফারেন্সে কখনও বাজান না। অবশ্য বাজনাটা হয়েছে কোন আশ্রমে। তার মানে শ্রোতাসংখ্যা কমই ছিল। চিঠিটা কয়েকবার পড়লাম। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ দিল্লী গিয়ে কিছুদিন রবিশঙ্করের সাথে রিয়াজ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা রবিশঙ্করের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে, বাবার নামে মানহানির কেস করল কোন সাহসে? ভারতবর্ষের বড় বড় গুণী তবলাবাদককে দেখেছি বাবার গৎ ধরতে পারে না। এ ছাড়া কাশীর আশুতোষের কাছেও বহু ঘটনা শুনেছি। তবে এই সাধারণ জ্ঞানপ্রকাশ কোন সাহসে বাবার সঙ্গে বাজাতে বসেছে? হয়ত রবিশঙ্করের বন্ধু বলে পুত্রস্নেহে নিয়ে বসেছেন। তাই বলে মান হানির কেস? যাক বাবা না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি হয়েছিল বোঝা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক জ্ঞানপ্রকাশ তাঁর প্রশংসকদের সামনে না বাজাতে পেরে অপমানিত বোধ করেছেন। সেইজন্য কি এই মানহানির কেস?

রাত্রে যথারীতি মালকোষ এবং চন্দ্রকোষের দুটি দ্রুত গৎ শিখলাম। অন্নপূর্ণা দেবী একটা কথাই সর্বদা বলেন, 'একটা জিনিষ ঠিকমত সাধনা করতে পারলে পরে সব জিনিষই সহজ হয়ে যায়। ইমন রাগ ঠিক মত শিখতে পারলে পরে তাড়াতাড়ি সব হয়ে যাবে। উপস্থিত অনেক রাগ শিখিয়ে দিচ্ছি এই ভেবে যাতে বাবার কাছে শিখতে সুবিধা হয়। কিছুদিন মারবা এবং পুরিয়া শিখলাম। সরোদের জন্য কঠিন রাগ। শুদ্ধ মধ্যম এবং পঞ্চমের তারে আঘাত লাগলেই রাগের বারোটা বেজে যাবে। মারবা এবং পুরিয়া একদিন অন্তর শিক্ষা চলতে লাগল।

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি ধ্যানেশ ঠিকমত মন দিয়ে পড়ছে না। সর্বদাই অমনোযোগী। যে অঙ্কগুলো করতে দিয়েছি সেগুলো করেনি। না করার কারণ বলল, 'গতকাল জ্বর হয়েছিল।' জুবেদা খাতুনকে বললাম, 'ধ্যানেশের গতকাল জ্বর হয়েছিল, বলেন নি কেন? উত্তরে বললেন, 'মিথ্যা করে বলছে জ্বর হয়েছে।' এই কথার পর যে অমানুষিক মার মারলেন, তা কল্পনার বাইরে। নিজেকে অপরাধী মনে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লাম। মৈহারে জুবেদা খাতুন আসবার পর কখনও জোরে প্রতিবাদ করিনি, যদিও অনেক ব্যাপারে রাগ হয়েছে। রাগের চোটে বললাম, 'বকুনি দিতে হলে আমি বকব। মারতে হলে

আমি মারব। লেখা পড়ার ব্যাপারে দয়া করে আপনি নাক গলাবেন না। অন্য ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা করুন।' আমার রাগ দেখে জুবেদা খাতুন চুপ করে গেলেন, যা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

মার মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার ইচ্ছা হয়। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'মাকে নাতিদের সঙ্গে সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে আসুন। ধ্যানেশকে মারার জন্যই বোধহয় এই মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। 'নির্দোষ' সিনেমা মা দেখতে গেলেন। বইটা শুনেছি ভাল। জুবেদা খাতুন মায়ের সিনেমা যাওয়া নিয়ে টিপ্পনি কাটলেন। উত্তরে বললাম, 'সারা জীবন যে কষ্ট করেছেন, তার বিনিময়ে জীবনে কিছু পান নি। সিনেমা দেখে যদি একটু আনন্দ পান তার মধ্যে টিপ্পনী কাটাটা উচিৎ নয়।' জুবেদা খাতুন চুপ করে গেলেন।

পরদিন বাবার চিঠি পেলাম। লিখেছেন—

কলিকাতা
শ্রীমান দক্ষীনাবাবুর বাটি হতে
১২-১২-৫২

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পেয়ে সববিষয় অবগত হলেম। বৌমার শরীর এখনও সারে নাই জেনে বড় চিন্তিত হলেম দয়াময় তাঁহার সুস্ত শরীর করুন এই আসির্ব্বাদ করি।

কাগজগুলি সই করে যথা পাঠালেম প্রগ্রাম গ্রহন করিলাম। ঐন্য সব ভাল আছে জেনে সুখি হলেম। আশীষ ভাল আছে তার প্রণাম নেবে। ২০০্ শতটাকা মনিঅডার যোগে পাঠান হল প্রাপ্যসংবাদ জানাবে, এই টাকা তুমাদের সংসার খরচের জন্য পাঠাইলেম। কি জানি আমার বেতন পেয়েছ কিনা এজন্য চিন্তা করে টাকা পাঠালেম। বেণ্ডের জন্য যন্ত্র ফরমাস দিয়েছি ১ মাসের পরে যে ঐ যন্ত্রগুলি পেক করে তুমার নামে পাঠান হবে বেহালা যেন ঐত্যন্ত দাম, একটা বেহালা পুরান ঠিক করেছি ১২৫্ টাকায় চেলোর দাম ৪৫০ সারে ৪ শও করে এ জন্য খরিদ করি নাই শ্রীমান গুলগুলকে বলিবে নাগদ ষ্টেটে যেয়ে যেন চেলো, বেহালা দুটি যন্ত্র জোগার করে আনে আমি এলে মূল্য দেব।

আমার শরীর খুব দুর্ব্বল হয়ে গেছে দক্ষীনা বাবু খুব সেবা করিতেছে এজন্য একটু ভাল আছি। এই মাসের প্রগ্রাম এলাহাবাদের কেন্সেল করে দিলেম শরীর খারাপ দুরূন।

একপ্রকার তুমাদের কুশল চাই ইতি

বাবা
আলাউদ্দিন

চিঠি পড়ে বুঝলাম, ফিরতে দেরী হবে যার জন্য বাবা এলাহাবাদের রেডিও প্রোগ্রাম নাকচ করে দিয়েছেন। ব্যাণ্ডের বাজনা সম্বন্ধে লিখেছেন। তার সবদিকে খেয়াল আছে। বিদেশে এতদিন ঠিক মনোমত খাবার হচ্ছে না বলে শরীর ভাল যাচ্ছে না বুঝলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিলাম।

মৈহারে শীত খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। শীতের জন্য কিছুদিন থেকে অন্নপূর্ণা দেবী এবং

জুবেদা খাতুনকে সোয়েটার বুনতে দেখেছি। অন্নপূর্ণা দেবী আজ একটা সোয়েটার সম্পূর্ণ করেছেন। হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, 'দেখুন তো, যে সোয়েটারটা করেছি আপনার গায়ে ফিট করে কিনা?' সোয়েটারটি পরে বললাম, 'ঠিক আছে। যার জন্যে করেছেন তার ঠিকই হবে।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'যে হেতু আপনার জন্য তৈরি করব বললে উল কিনে আনতেন না, তাই আপনাকে বলেছিলাম আপনার মাপে একটা সোয়েটার করব। সুতরাং শীত পড়েছে সোয়েটারটা পরুন।' সোয়েটার একটা নয় একেবারে দুটো। আমি তো অবাক। সঙ্গীত শিক্ষা পেয়ে আমি যথেষ্ট ঋণী সুতরাং আর ঋণী হতে চাই না। বললাম, 'আমি সোয়েটার পরি না। অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'বাবা থাকলে, শীতকালে যেমন লেপ করে দিয়েছিলেন, সেই রকম শীতকালে নিশ্চয়ই আপনাকে সোয়েটার কিনে দিতেন। বাবা এখানে নেই বলে তাঁর অবর্তমানে সোয়েটার করে দিয়েছি। আর কবে আসব, কি আসব না, জানি না, সেই জন্য দুটো সোয়েটার তৈরি করে দিলাম। দুই তিন শীত চলে যাবে। সুতরাং লজ্জা পাবার কিছু নাই, পরুন।' এ কথার পর আর কথা চলে না।

সোয়েটার পেয়ে মন সঙ্কুচিত হলেও, গ্রহণ করলাম। শুভর জন্য এবং মায়ের জন্যও সোয়েটার তৈরি করেছেন দেখলাম। এতদিন জানতাম সঙ্গীতেই নিপুণ কিন্তু এত ভাল সোয়েটার তৈরি করতে পারেন দেখে অবাক হলাম। জুবেদা খাতুনকে অনেকটা উল কিনে দিয়েছেন। তিনি নিজের ছেলেদের জন্য সোয়েটার তৈরি করছেন।

রবিশঙ্কর রাত্রে মৈহার এল। অনেক রাত অবধি গল্প হল। কথায় কথায় বাবার চিঠির কথা বললাম। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা জিজ্ঞাসা করায়, রবিশঙ্করের উত্তর শুনে অবাক হলাম। বুঝলাম যেহেতু জ্ঞানপ্রকাশ রবিশঙ্করের অনেক প্রোগ্রাম করেন তাই এই ব্যাপারটা সহজভাবে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে খুব উত্তপ্ত আলোচনা হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম এ কোন ধরনের শিষ্য? কি এমন বাজনা জ্ঞানপ্রকাশ বাজান যার জন্য ঠেকা বলে দেওয়াতে ছাত্রদের সামনে অপমানিত বোধ করে কেস করবে? রবিশঙ্কর কি দেখেনি ভারতবর্ষের বড় বড় উস্তাদদের বাবা গৎ এর সম দেখিয়ে দেন। এ ব্যাপারে কাশীর আশুতোষের কাছে কত গল্প শুনেছি। তা ছাড়া মৈহারে আসার আগে ভারতের তিনজন নামী তবলাবাদককে গৎ এর সম এবং তার পরণের সময় বলতে শুনেছি, 'নহি হুয়া'। এই কথা বলেই বোল পরণের বোল বলতে শুনেছি। কাশীতে এবং এলাহাবাদ রেডিওতে কয়েকবার দেখেছি যে এত বড় বড় তবলা বাদকরা বুঝতে পারেন না। আর জ্ঞানপ্রকাশ সেই জায়গায়, ঠেকা বলে দেওয়া সত্ত্বেও না বাজাতে পেরে কেস করেছেন? কত বড় উদ্ধত। অথচ রবিশঙ্করের মনোভাব দেখে তার প্রতি এই দ্বিতীয়বার ঘৃণা হল। জানি আমার এই সব কথা রবিশঙ্করের ভাল লাগেনি। কিন্তু আমার স্বভাব কি করে বদলাব! যেটাকে উচিত বলে জানি সেটার জন্য কোথাও পালিয়ে বসে থাকা অন্যায় মনে করি। মুখের উপর বলে নিজেকে অনেক হালকা মনে হয়। আত্মসম্মান বোধ কারও একচেটিয়া নয়। যার নিজের আত্মসম্মান বোধ আছে সে অপরের আত্মসম্মান বোধকে সমীহ করে।

পরদিন সকালেই জুবেদা খাতুনের জ্বর এসে গেল। বাজার, ওষুধ, ধোপা এবং অন্যান্য কাজ করতে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হল। রবিশঙ্করের বাজনা শুনলাম যখন রিয়াজ করতে লাগলেন। কাল আমার রাগ দেখে রবিশঙ্কর আজ অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'যতীনের এখানে অনেক কাজ করতে হয়, এবার যতীনকে দিল্লীতে নিয়ে চল। সারাদিন মন দিয়ে নির্ভয়ে বাজাতে পারবে।' এ কথা শুনে মনে হল দিল্লীতে গেলে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিখতে পারব, কিন্তু পরমুহূর্তে রবিশঙ্করকে বললাম, 'আমি গেলে বাবা আপনার উপর চটে যাবেন। ভাববেন, আপনি আমাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি চাই না আপনার প্রতি বিরক্ত হন। বাবার কাছে থেকেই আমি শিখব।' রবিশঙ্কর আর কিছু বলল না। আজ লিখতে বসে বুঝতে পারছি রবিশঙ্কর কত বড় ডিপ্লোম্যাট ছিল। সে সময় বুঝি নি। আজ এই পরিণত বয়সে জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সেই সময়ে তার বাইরে এবং ভেতরে কত প্রভেদ ছিল। আজ মনে হয় এইজন্য বোধ হয় অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না। যাক, এটা তো বিরাট পর্ব। শান্তিপর্বের কথা পরে লিখব।

পরদিন বাবার নিম্নোক্ত চিঠি পেলাম।

সান্তীনিকেতন
সঙ্গীতভবন
২০-১২-৫২

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা জিতেন্দ্র তুমার পত্র পাইয়া সর্ব বিষয় অবগত হইলাম, আমি ১৭ তাঃ সান্তীনিকেতনে এসেছি, শ্রী আসিষ দক্ষীনা বাবার কাছে তাকে রেখে এসেছি। সামনের আলমারির পিতলের একটু তুমা আছে তার ভিতরে বাকসের চাবি আছে, সেই চাবি দিয়ে লুহার পুটমেন খুলে তার ভিতরে লুহার সিন্দুকের চাবি পাইবে, সবুজ রঙ্গের খলতার ভিতরে সিন্দুকের চাবি পাইবে, সেই চাবির সঙ্গে সবুজ রঙ্গের সূতা পেছা যে চাবি আছে সেই চাবিতে উপরের তালা খুলিবে লালরঙ্গের সুতুয় যে চাবি বাধান আছে সেটাতে নিচের তালা খুলিবে, দুই চাবি দিয়ে প্রথমে খুলে, সিন্ধুকের সামনে সাদা হাতলটা আছে সেটা ডাইন ধিগে ঘুরালেই সিন্ধুকের পাল্লা খুলিবে। পাল্লা খুলিলেই উপরের তাকে চুঙ্গাগুলি পাইবে তার ভিতরে সব কাগজ পাইবে।

সুন্ধুকে পৃথক তালা লাগান আছে সেটা খুলিবার জন্য ঘর বন্ধ করার চাবির গুচ্ছাতে বড় যে চাবি পাইবে সেটা দিয়ে পৃথক তালা খুলিবে আমার ঘর বন্ধ করবার চাবির গুচ্ছাতে লম্বা চাবি আছে লুহার চাবি সেটা দিয়ে খুলিবে।

আমার লুহার সিন্ধুকে যাতে খারাপ না হয়, তুমি যদি খুলিতে না পার, কাটরা যাইতে বাঁদিকের যে দোকানের শেঠের বড় দুকান এদের এখানে এনে খুলিবে যার তার হাতে নয়। আশাকরি তুমিই খুলিতে পারিবে, চাবি দিয়ে খুলে সামনে হাতলটা ডাইন ধিগে ঘুরালেই পাল্লা খুলিবে না ঘুরালে খুলিবে না।

১৯০০্ টাকা পাঠান হল আমার নামে পুষ্টাফিসে জমা করে দিবে বহিও তুমার মায়ের

কাছেই আছে ভিতরে যে ডাইন টুল আছে তার নীচে যে পুটমেল আছে তার ভিতরে সন্ধুকের চাবি আছে। আলমারির ভিতরে যে পিতলের তুমা আছে তার ভিতরে চাবির গুচ্ছা পাইবে সেই চাবি দিয়ে টুলের নিচে যে ছুট পুটমেন সেটা খুলিলেই সিন্ধুকের সবুজ কাপরে মুরা ও তারে মুরা চাবি পাইবে।

চুঙ্গার ভিতরে যদি রেখে থাকি বের করে টাকা জমা করে দিবে সামনের কুঠার তুমাদের সকল সংবাদ জেনে সুখি হলেম শ্রীমান শুভর অসুখ শুনে চিন্তিত হলেম দয়াময় মঙ্গল করিবেন।

জ্ঞানবাবুর সব চুকে গেছে কুনচিন্তা নেই, ঠাকুর সব মিটমাট করে দিয়েছেন আমি ঠাকুর ও মা পেয়েছি জগতে আর আমার কুন সত্রু নাই, ঠাকুরই শরীর ভাল রাখিবেন ঔষধের দরকার হবে না জগজননী মাতা সারদা ও ঠাকুর পরমহংস পেয়েছি এখন আমার জিবন সফল হয়ে গেছে কলিকাতায় শ্রীমান আশীষের নাম আশীষকুমার হয়েছে এই নামেই তুমরা সকলে ডাকিবে। কলিকাতাবাসি সকলেই তাকে সাদরে গ্রহন করেছে। কলিকাতা তাকে রেখে এসেছি সেখানে সে বড় আদরে স্নেহে আছে শ্রীমান দক্ষীনা বাবা ও তাহার মা বোন নিজের সন্তানমত মনে করে, আমাদের চেয়ে এরা বিশেষ যত্ন করে, এদের মতন আমরা যত্ন স্নেহ আদর সেবা করিতে পারি না, সে রাজার মতন সুখে আছে তুমার মাকে বলিবে তার জন্য যেন চিন্তা না করে। তার বাজনা ও স্বভাব চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হয়েছে, তাকে সকলে আপনার জন বলে গ্রহণ করেছে।

আমার সিন্ধুক যদি খুলিতে না পার তবে ১৫্ টাকা জরিমান দেব সেটাই শ্রেয় মনে করি।

কলিকাতা লাটসাহেব আমাকে আমন্ত্রণ করেন। আমাকে যথাচিৎ মানপত্র দেন এবং ৫০০্ টাকা দান করেন, মালা নিজহাতে পরান। ১২-১৩-১৪ জানুয়ারিতে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন লাটসাহেব এসব রক্ষা করে পরে মাইহার আসিব। তানসেন কনফ্রেন্স সহ ৩১০০্ শত টাকা কলিকাতায় পেয়েছি, কনফ্রেন্সের টাকা দিয়ে বেণ্ডের যন্ত্র খরিদ করিতেছি, যন্ত্রসব তৈয়ার হতেছে ১ মাস পরে পাইব সব তুমার নামে পার্শেল করে পাঠাব। সান্তীনিকেতনের জল আমার উপযুগি হয় না এতে অর্শ্বরূপ বেরে রক্তপাৎ হয়, এর জন্য বেশ দুর্ব্বল হয়ে পরেছি চিন্তার কারণ নেই।

আমার মা শ্রীমতি অন্নপূর্ণাকে বিশেস মেহানৎ করিতে দেবে না এর শরীর ভাল থাকে না, রান্নার জন্য মেয়েলোক চেষ্টা করে আনিবে আমার স্নেহের মাকে কষ্ট দেবে না সে যদি কষ্ট পাবে তবে আমার আত্যা কষ্ট পাবে আর বলিবার কিছু নেই, সকলকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাবে, তুমি আমার স্নেহ ভালবাসা আসির্ব্বাদ নেবে।

একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

বাবা
আলাউদ্দিন

বাবা যে কত বড় সংসারী, এবং প্রত্যেক জিনিষ কত সযতনে রাখতেন, এ চিঠিই তার প্রমাণ।

রবিশঙ্করকে চিঠিটা দিলাম পড়তে। তিনি পড়ে বললেন, 'বাবার যে বিশ্বাস অর্জন তুমি

করেছ সেটা কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি।' এ কথা আগেও শুনেছি সুতরাং অবাক হবার কিছু নেই। সে সময়ে সরল বিশ্বাসে রবিশঙ্করকে বিশ্বাস করতাম। আজ মনে হয় রবিশঙ্কর বোধ হয় মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করতেন। তিনি এসেছেন বলে মা মুরগী রান্না করলেন। সকালে রেডিও লাইসেন্স করালাম। রবিশঙ্করের কথায় গুলগুলজীকে খবর দিলাম। সন্ধ্যায় রবিশঙ্কর বাজালেন। এখন বাজনা বুঝতে পারি। কোন অঙ্গ, আমার কাছে বিস্ময়কর নয়। আগে যেগুলি বিস্ময় উদ্রেক করত, এখন মনে হয় সাধনা করলে আমিও সেগুলি বাজাতে পারব। রাত্রে অন্নপূর্ণা দেবীর কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুব সহজভাবে রবিশঙ্করকে বললেন, 'একজন এষ্ট্রোলজার বলেছেন আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাবে তিন বছর পরে।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর নির্বোধের মত তাকিয়ে রইল। আর আমার মনে হল বাড়িতে আচমকা যেন বাজ পড়ল। রবিশঙ্করের সামনে অন্নপূর্ণা দেবীকে বলতে পারলাম না, 'মানা করা সত্ত্বেও কেন এই কথা বললেন?'

পরদিন রবিশঙ্কর মা এবং ছেলেদের নিয়ে 'সজা' সিনেমা দেখতে গেলেন। সিনেমায় যাবার পরই অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, 'এতদিন বৃথাই আপনাকে সাইকোলজি এবং এবনরম্যাল সাইকোলজি পড়ালাম। আপনাকে বার বার বারণ-করা সত্ত্বেও রবিশঙ্করকে কেন এই কথা বললেন? সংশয় এবং সন্দেহ মানুষকে কুরে কুরে খায়। এর থেকে মানসিক রোগ পর্যন্ত হতে পারে। যাদের অত্যন্ত ষ্ট্রং মাইণ্ড তাদের পক্ষে এই কথার কোন মূল্য নাই। তারা এই সব কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। কিন্তু রবিশঙ্করকে এত দিনে যতটা বুঝেছি, সে ছোট ছোট কথায় নার্ভাস হয়ে যায়। কেন বৃথা তাঁর মনে একটা চিন্তার বীজ বপন করলেন?' আমার কথা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। অন্নপূর্ণা দেবী খুব সহজ ভাবে কথাগুলি শুনে গেলেন। কিন্তু আমার কথাটা সত্যে পরিণত হল। সিনেমা থেকে ফিরেই রবিশঙ্কর আমাকে এষ্ট্রোলজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। বুঝলাম তাঁর মনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। বললেন, 'তিন বছর পরে জ্যোতিষি ডিভোর্স হবে বলেছে? কথাটাকে সহজ করে বললাম, 'এ সব কথায় কিছু মনে করবেন না। তবে বাবার ভাষায় 'খুদা' কোন ভেষে এসে কি বলে যায়' সেই কথা মনে করলে আংটিটা পরবার যেন জোর করবেন।' রবিশঙ্কর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আন মনে বলল, 'তিন বছরের পর বলেছে ডিভোর্স হবে।' শেষ কালে বলল, 'আমার কথায় আংটি পরবে না। কত চেষ্টা করেছি গয়না পরবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই যখন পরে নি তখন আংটি পরবে আমার কথায়?'

জুবেদা খাতুনের সকাল থেকেই জ্বর। মার শরীরও খারাপ। মৈহারে আসার পর আজ এই প্রথম অন্নপূর্ণা দেবীকে রাঁধতে দেখলাম। রান্নায় মা গেলেও অন্নপূর্ণা দেবীই রান্না করলেন। খাবার সময় মাংস এবং ডাল দেখে অবাক হলাম। রান্নাও একটা কলা বিদ্যা। দিল্লীতে শুনেছি রান্না করেন। খাবার খেয়ে মনে হলো, মার হাত পেয়েছেন। মায়ের হাতের কয়েকটা পদ, যেমন মাছ, মাংস, ডাল যে কি অপূর্ব, যে না খেয়েছে কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর রান্নার তুলনা নেই। তিনি সব কাজেই যে এত দক্ষ এ ধারণা আমার ছিল না। মনে হল রবিশঙ্কর দুর্ভাগা, অন্নপূর্ণা দেবীর মূল্য বুঝতে পারেনি। আহারান্তে রবিশঙ্কর জব্বলপুর চলে

গেলেন। যদিও আলি আকবরের কাছে আগে শুনেছিলাম, রবিশঙ্করও যাবার আগে ডাক্তার হর্ষের খুব প্রশংসা করলেন। ডাক্তার হর্ষে যেমন জব্বলপুরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, তেমনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমী। জব্বলপুর হয়ে গেলেই ডাক্তার হর্ষের ওখানে বাজিয়ে তবে যান। ষ্টেশনে রবিশঙ্করের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হল। নিজের জীবনের অনেক ঘটনা বললেন। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন। ভাবলাম সেই বাঙ্গালী এষ্ট্রোলজার কি অন্তর্যামী? আজ বুঝলাম রবিশঙ্কর কেন অন্নপূর্ণা দেবীকে এত ভয় পায়। অবাক হই, সকলের সামনে দু'জনকে দেখে মনে হয় কতসুখী এবং আদর্শ দম্পতি, কিন্তু নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি তাঁরা একলা থাকলে কত দূরত্ব ভাব। এটা আমাকে সর্বদাই অবাক করেছে।

পরদিনই বাবার চিঠি পেলাম—

সান্তীনিকেতন
২৩-১২-৫২

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা জিতেন জানিবে কলিকাতা হতে ১৭ তাঃ সান্তীনিকেতনে এসেছি ১৯০০ শত টাকা পেয়েছ কিনা জানাবে ঐ টাকা পুষ্টাফিসে আমার নামে জমা করে দেবে। সিন্ধুক খুলবার চাবি পেয়েছ কিনা জানাবে। না পাইলে আমায় জানাবে। ১৫্ টাকা জরিমানা রেডিওর জন্য দিতে হবে এর জন্য চিন্তা নাই, যদি চাবি পেয়ে থাক তবে সিন্ধুক খুলিবে।

আলমারির ভিতরে পিতলের তুমার ভিতরে চাবির গুচ্ছা আছে সেই চাবি দিয়ে টুলের নিচে যে ছুট পুটমেন তার ভিতরে লুহার সিন্ধুকে চাবি আছে সবুজ কাপরের খালিতার ভিতরে ঐ চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলা যাবে সন্ধুক খুলার চাবির মধ্যে সুতায় জরান চাবি দিয়ে সন্ধুক খুলিবে। চাবি দিয়ে খুলে পরে সামনে যে হাতল আছে ঐটা ডাইন ধিগে ঘুরাইলে সিন্ধুকের তালা খুলিবে নচেৎ নয়। সিন্ধুকের উপরের থাকে চুঙ্গাগুলি পাইবে ওর ভিতরে চেক ও বেঙ্কের বহির সঙ্গে রেডিওর কাগজ পাইবে। আশিষ কলিকাতায় আছে দক্ষীনবাবুর কাছে আমি একা আছি সান্তীনিকেতনে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

বাবা

শ্রীমান জিতেন
দীর্ঘ জীবেষু

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম। তাঁকে জানালাম রেডিওর লাইসেন্স করিয়েছি। তাঁর সিন্দুক খুলে সব কিছুই পেয়েছি। তিনি লেখাপড়া না করলেও কত টানা লিখতেন এবং কত অধ্যবসায় থাকলে এ রকম কেউ লিখতে পারে, ভাবলেও বিস্ময় হয়, যদিও বানান ভুল থাকত।

মা আজ বললেন, 'বেডা তোমার বাবা এলে আর তো সিনেমা দেখতে পাব না। ধ্যানেশের মুখে শুনলাম একটা ভাল বই এসেছে। তুমি এই সিনেমাটা নাতিদের নিয়ে যাবার অনুমতি দাও।' মার কথাটা বুঝলাম। মাকে একদিন বলেছিলাম ছোট ছেলেদের সামাজিক বই দেখা ভাল নয়। সেই জন্য মা বললেন, নাতিদের নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে। যে বইটা এসেছে সেটা ভক্তিমূলক। বইটার নাম 'নরসি ভগৎ'। মাকে বললাম, 'ঠিক আছে সন্ধ্যার

সময় বসিয়ে দিয়ে আসব।' অন্নপূর্ণা দেবী এই কথা শুনলেন। তিনি টাকা দিলেন। রাত্রে মা এবং নাতিদের সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে এলাম।

আজ রাত্রে অন্নপূর্ণা দেবী মুখে গান গেয়ে গেয়ে শেখালেন। সেতার নিয়ে বসলেন না। মনে হল শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। শিক্ষার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর কি ভাল নেই?' উত্তরে বললেন, 'এমন কিছু নয়। একটু মাথা ধরেছে।' চোখ দেখে সন্দেহ হোল, জ্বর হয়নি ত! অনেক অনুরোধ করে থারমোমিটার দিয়ে দেখলাম একশ ডিগ্রি জ্বর। অবাক হই, জ্বর হলেও বলবেন না; ওষুধ খেতেও চাইবেন না। অথচ সব কাজ করে যাবেন। এ এক বিচিত্র জীবন।

আজ বছরের শেষ দিন। শান্তিনিকেতন হতে বাবার চিঠি পেলাম।

সান্তীনিকেতন
২৭-১২-৫২

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা জিতেন তুমার পত্রে সব বিষয় অবগত হলেম। শ্রীমান বাবা রবিশঙ্করের এসেছে জেনে সুখী হলেম, এর যাতে কষ্ট না হয় সেধিগে লক্ষ রাখিবে। ২০০্ টাকা তুমাদের খরচের জন্য পাঠান হয়েছে এর দ্যারায় ঘি, চিনি, গম সব খরিদ করিবে। তুমি লিখিয়াছ সব বিসয় জানালে আমার কষ্ট হবে, কি বিষয় সব ভাল করে লিখে জানাবে, তুমার এসব লিখা পরে চিন্তীত হয়ে পরিলাম, কোন রূপ গোপন করিবে না পত্রপাঠ আমাকে জানাবে। যাতে তোমাদের কষ্ট না হয় এজন্য টাকা পাঠাইলাম গুলগুলকে বলিবে চেলো যন্ত্রটি যেন নাগদ হতে নিয়ে আসে মূল্য ঠিক করে যেন আনে, এখানে দুইটি বেহালা দুইটি এসরাজ একটি সেতার, দুইটি হারমোনিয়াম কেনা হয়ে গেছে। লোহার নল কেনা বাকি আছে। এসরাজ, সেতার হারমোনিয়াম তৈয়ার হচ্ছে একমাসের ভিতর দিবে।

এসব তৈয়ার না হোয়া পর্যন্ত আমি আসিতে পারিব না, তারসানাই লাগান হবে এসরাজে বারাওদ্দি দস্তখত করে পাঠাইলেম পত্রপাঠ সব জানাবে নচেৎ দুঃখিত হব। ঐন্য লোক রান্নার জন্য ঠিক কর, অন্নপূর্ণাকে রান্না করতে দেবে না, এরজন্য আমি দুঃখিত হলেম। স্নেহের দাদু শ্রীমান শুভর জন্য আমি চিন্তীত আছি, বাটীতে শান্তিসুখ না থাকিলে এর জন্য মহাচিন্তিত ও বুড়াবয়সে কষ্ট করা কার জন্য সান্তীর জন্য সান্তী চাহি। কি সব বিষয় হয়েছে সব খুলে জানাবে নচেৎ তুমার উপর আমি তেক্ত হব। বুধহয় বৌ সম্বন্ধে কোন কারন হবে যা হয় সব খুলে লিখিবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি, এসময় আমি বড় অসান্তিতে আছি শরীর ভাল নয় অর্শরূপে রক্তপাৎ হয়ে শরীর বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে চলতে ফিরতে মাথা ঘুরে, বাটিতে যদি অসান্তি হয়ে থাকে তবে মাইহার আসিব না। সিধা জন্মস্থানে চলে যাইব, যাচে অসান্তী দূর হয় তাহা করিবে।

ইতি
বাবা

পু : জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে। চিন্তার কারণ নাই।

চিঠি পড়ে রূপক তালের কথা মনে হল। এখানকার সব সমাচার জানতে চেয়েছেন। এখানে অশান্তি হলে এখানে না এসে দেশে পূর্ববঙ্গে চলে যাবেন। চিঠির শেষটা পড়ে নিশ্চিন্ত হলাম। জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। যাক জ্ঞান বাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা মিটমাট করতে রবিশঙ্করের কি ভূমিকা ছিল? বাবার আসবার পর সব বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু মৈহার থাকাকালীন রবিশঙ্কর কি চক্রান্ত করেছিল এবং কি করে সব মিটমাট করেছিল সে কথা নিজেও বলেনি এবং বাবাকেও নিশ্চিত বারণ করেছিল। বাবার স্বভাব ছিল সব কথা স্পষ্টভাবে বলা। কিন্তু অত স্পষ্ট বক্তা হয়েও সম্পূর্ণ কথাটা বলেন নি। রবিশঙ্কর জানত, যদি আমি সে সব কথা জানতে পারি, তাহলে রবিশঙ্করের নিস্তার নাই। তাই আমার ধারণা বাবাকে নিজের দিব্যি দিয়ে আমাকে বলতে বারণ করেছিল যার ফলে বাবা আমাকে বলেন নি।

ব্যাপারটা লতায় পাতায় বৃদ্ধি হয়ে দীর্ঘদিন পরে যখন একটা মাসিক পত্রিকায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সে সময় রবিশঙ্করের নীচ মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। নানা ভুল তথ্য ক্রমাগত বেরোবার পরই বাংলায় এই বইটা লেখা আমার অন্যতম কারণ হয়ে পড়ে।

কেন বাবার চিঠিটা পড়ে রূপকতালের কথা মনে হয়েছে, এবং ঘোষের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে চিঠিটা পড়লে লোকে বুঝতে পারবে। কিন্তু পরের কথাটা, যে সংবাদ পরে জেনেছিলাম, সেই সংবাদ পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না বিশদ ব্যাখ্যা করি। পূর্ণ ব্যাখ্যা যথাস্থানে করব। দেখতে দেখতে তিন বছর কয়েক মাস হয়ে যাবার পরও মনে হচ্ছে সংগীত সমুদ্রের বালুকা বেলায় কেবলমাত্র উপলখণ্ড কুড়াচ্ছি।

৩১

বাহান্নর দরজায় করাঘাত করলাম। জানুয়ারীর প্রথম দিনের স্মৃতিটা যেন সিনেমার মত ফুটে উঠল। স্ত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি। পুরো একটা বছর পর মনে হোল, যদি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ না হ'তো তা হলে হয়ত বাবা এ বছর বলতেন, নারীরও প্রাক্‌বিবাহ দেখেশুনে স্বামী নির্বাচন করাই ভাল। আমিও এই মতই পোষণ করি, বিশেষ করে অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে। শুধুমাত্র রাজার মেজাজে সাতনরী হার যদি মর্কট করকমলেষু হয় তাহলে মুক্তো অহেতুক দন্তস্ফুট হয়ে ছড়িয়েই পড়ে। কিন্তু বাবা নেই সুতরাং প্রসঙ্গটা অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে আমি যতই ভাবছি নিজেকে নেপথ্যে রাখব, ততই সামনে এসে পড়ছি। কি করব উপায় নেই। কেন না, এসব কথা না বললে আমার সময়কালের ইতিহাস বলা হয় না।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কখন তার যশ, মান ও খ্যাতির তুঙ্গে নিয়ে যাবে তা সে আগে থাকতে জানে না। আবার পতন অভ্যুদয় বন্ধুরপন্থার নিয়মে নিয়তি কখন অলক্ষ্যে বন্ধুর পন্থা রচনা করে চলেছে তাও মানুষের অজ্ঞাত। অদৃষ্ট যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সে আগে থাকতে বুঝতে পারে না। উদ্দাম যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যারা নিজেদের ভাসিয়ে

দেয় তখন কি তারা জানতে পারে যে পরিণতিতে তাকে কি ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে?

বাবার এই বিরাট কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তি এত বিশাল যে তা একটি গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র।

সঙ্গীতে একটা কথা আছে তেহাই। তেহাই এর অর্থটা খুব জটিল নয়। একটা সীমিত নিবদ্ধতায় সমমাত্রিক ছন্দ পর পর তিনবার আসে। হঠাৎ তেহাই শব্দটা এই জন্যে আনলাম যে এর সাহায্যে কিছু সংক্ষিপ্তসার করতে চাই। এ তাবৎ অসংখ্য ঘটনা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে। দৈনন্দিন জীবনের কিছু আকস্মিকতা ছাড়া বেশির ভাগটাই ছিল 'কমন'। যে গুলো শুরুতে আমার কাছে ছিল 'আনকমন'। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু আজ যদি সেগুলো আবার লিখি তা হলে হবে পুনরাবৃত্তি দোষ। বাছুর হত যে বারে, সেই হিসাবে নাম রাখা, যেমন সোমবার হলে সুমিয়া, এইভাবে মঙ্গলিয়া, বুধিয়া, গুরুচরী, শুকরিয়া, শনিচরী। বৃহস্পতি বারকে হিন্দীতে গুরুবার বলে। সেইজন্য বৃহস্পতিবারে বাছুর হলে গুরুচরী নাম রাখতেন। বাছুর হলে বাবা আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা হতেন। আবার মরে গেলে পুত্রশোকের মত ভেঙ্গে পড়তেন। জ্বর আসত, প্রলাপ বকতেন। এসব বার মাসই হত। এ সব না লেখার ফলে দুটো লাভ হবে। ব্যাপারটা হবে কনডেন্‌স্‌ড্‌ আর মোর সাবজেক্ট ওরিয়েনটেড।

মৈহারে বাঁদরের উৎপাত ছিল না। কালে ভদ্রে কখনও একটা বাঁদর দেখা যেত। শীতকালে এখানে যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে সেই রকম গরম কালে প্রচণ্ড গরম। তবে গরম কালে বাইরে শুলে একটা চাদর গায়ে দিতে হয় রাত্রি বারটার পর। নূতন বছর শুরু হয়েছে। একদিন হঠাৎ একটা গোদা বাঁদর অন্নপূর্ণা দেবীর ঘরে ঢুকল। হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবী ও শুভর জোরে একটা আওয়াজ শুনলাম। দেখি খালি হাতে জুবেদা খাতুন উপরে উঠে বাঁদরটাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার ঘর থেকে আওয়াজ পেয়ে গিয়ে দেখি একটি বড় বাঁদর মুখ খিঁচাতে খিঁচাতে খাচ্ছে। জুবেদা খাতুনের সাহস দেখে অবাক হলাম। অন্নপূর্ণা দেবী এবং শুভর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

বাবার অবর্তমানে বাড়ির পরিবেশটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে। মনটা খারাপ থাকলেই বইপড়ে মনের ভারটা লাঘব করি। শুভ আজকাল দুপুরে খাবার পর রোজ নিজের মনে ছবি আঁকে। অভ্যাসটা নতুন দেখা দিয়েছে। প্যাস্টেল, নানারকম রং, কাগজ সব ব্যবস্থা আছে। দুপুরে ঘুমের বালাই নেই। সকলেই একটা বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে চলে। ব্যতিক্রম জুবেদা খাতুন। বেচারি কর্মহীন। সব থেকেও তার কিছুই নেই। পরনিন্দা এবং পরচর্চা ছাড়া কি করে সময় কাটবে। অবশ্য দু'বেলা রান্না করেন। একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে সকলের সমালোচনা করা। শিক্ষার ব্যাপারে ছেলেদের প্রতি বাবা যত কঠোর মেয়েদের প্রতি তেমন নয়। মেয়ে বলতে এ যাবৎ তিনবার শিপ্রা ব্যানার্জী এসেছে। দুই তিনদিন চোপড়া সাহেবের স্ত্রী এসেছেন। রাগ হলেও মেয়েরা মায়ের জাতি বলে, এই দুই ছাত্রীকে কিছু বলেন নি। কিন্তু এই রাগ চেপে রাখার জন্য নিজের পরিবার বর্গের প্রতি অকারণে রাগ প্রকাশ করেছেন। জুবেদা খাতুন বাবার সমালোচনা করতেও ছাড়েন না।

কবে যে আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে গুরুপুত্র এবং জামাই বলে দুর্বলতা মনে দানা বেঁধেছিল জানি না। যার ফলে এদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই, রাগে স্থান, কাল, পাত্র না ভেবে যা ইচ্ছা বলে দিতাম। যদিও আমার নানা অভিযোগ এদের প্রতি ছিল, তবুও কারো এতটুকু নিন্দা সহ্য করতে পারতাম না। উপকার বলতে যা বোঝায় যদিও কখনও এঁদের কাছে পাইনি, এঁদের জন্য আমি অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছি। এঁরাও কিন্তু তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। বাবার পুত্র এবং জামাই বলে বরাবর সম্মান করেছি। কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। উনিশশ বাহাত্তরের পর আলি আকবরের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ থাকলেও ইচ্ছাকৃত ভাবেই দেখা করি নি। রবিশঙ্করের কাছে নানা অভিযোগ থাকলেও একটা কারণেই তার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিলাম, যদি অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক থাকে। বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু উনিশশ আটাত্তর সনে এমন একটি কথা বলল, আমার সেজ ভাই হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে, যার পর রবিশঙ্করের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবার সুযোগ থাকলেও দেখা করি নি। জীবনে তিন জনের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর, গুরুপুত্র এবং জামাই বলে, আর আমার দাদার প্রতি দুর্বলতার কারণ, তাঁরই অনুপ্রেরণায় আজও আমি সঙ্গীত জগতে টিকে আছি। আলি আকবরের তুলনায় হাজারোগুণে রবিশঙ্কর আমার ক্ষতি করেছে, তবুও মনের কোণে দুর্বলতা ছিল, কিন্তু এখন এক ফোঁটাও নেই, একথা অকপটে স্বীকার করছি। তবে এটা ঠিক, আলি আকবরের প্রতি আজও আমার দুর্বলতা আছে। একজন আমার নামে নানা অপপ্রচার করেছে, যার ফলে সঙ্গীত জগতে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তবে তার জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এক সময় নিশ্চয়ই অভিমান হত কিন্তু আজ আর কোন অভিমান নেই। তাদের সঙ্গে দেখা হলে একটা কথাই বলতাম, যা বাবা প্রায়ই বলতেন, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান আর সব গরু, জানো না, যে যারে ঠকাতে চায় সে তার গুরু।'

আমার শিক্ষা দিনরাত চলছে। বাবা এলেই অন্নপূর্ণা দেবী চলে যাবেন। আজ এই প্রথম অন্নপূর্ণা দেবী বাঁয়াতে ঠেকা লাগাতে লাগাতে বললেন, আমাকে গৎ বাজিয়ে ছোট ছোট তোড়া বানিয়ে বাজাতে বললেন। এই ক্রম বেশ কিছু দিন চলেছে। প্রথমে আমার অসুবিধা হত, পরে সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথাই বলতে পারি, মাঝে মাঝেই যেখান থেকে ইচ্ছে নানা ছন্দে এবং লয়ে যে সুন্দরভাবে মুখে মুখে ছোট ছোট তোড়া বলতেন এবং গৎ এর মুখড়াতে এসে পড়তেন, কল্পনা করা যায় না। বলতেন, 'যেমন কথা বলি সেইরকম তোড়া বাজাতে হবে।' তানও সেই রকম হ'তো। পৌনে, সোয়া, অর্দ্ধমাত্রা থেকে তান তোড়া যে অবলীলাক্রমে তিহাই দিয়ে বাজাতে বাজাতে বলতেন তা একমাত্র বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবী ছাড়া আমি কারো মধ্যে দেখি নি। অবশ্য আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের শিক্ষা পদ্ধতি দুই তিন বারের বেশি দেখবার সুযোগ হয় নি। মোলিয়োর, নামকরা নাট্যকার ছিলেন। তিনি জানতেন না যে সারাজীবন তিনি সনেটেই কথাবার্তা বলেছেন। আমার কাছে বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে মোলিয়োরের মত মনে হয়েছে।

আজ বাবার নিম্নোক্ত চিঠি পেলাম।

কলিকাতা হইতে
শ্রীমান দক্ষীনা বাবার বাটি হতে
১২-১-৫৩

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যোতিন তুমার পত্র এই মাত্র পাইলাম সববিষয় অবগত নির্চ্চিন্ত হলেম। আমার শরীর একটু ভাল আছে চিন্তার কারণ নেই, এখানে লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি ১০ তারিখ আমি সিঘ্রই আসিবার চেষ্টা করিতেছি। সেতার এসরাজ সব তৈয়ার হয়ে গেছে মাত্র দুইটি হারমোনিয়াম বাকি আছে, ২-৩ দিনের মদ্ধে তৈয়ার হয়ে যাবে, হারমোনিয়াম তৈয়ার হলেই আমি চৈলে আসিব। যন্ত্রগুলি সঙ্গেই আনিব তুমার একটু কষ্ট করে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত সকাল সাৎটার গাড়িতে যদি এলাহাবাদ পর্যন্ত আস তবে যন্ত্রগুলি দেখেশুনে গারি হতে লামান যাবে, তুমি এসে এই কার্য্যটি করিলে আমার সাহায্য হবে। যেদিন কলিকাতা হতে রূয়ান হব তার পূর্ব্বে তুমাকে টেলি করে যানান হবে। বেগুপারটির ছেলেদের বলিবে কয়জন যেন ঐদিন রাত্রে ষ্টেশনে যন্ত্রাদি ভাল করে লামাবার জন্য এদের বলে দিবে। শ্রীমান আশীষকুমারের প্রণাম নিবে, চেকের রসিদগুলি দস্তখত করে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছি। বুধ হয় ওরা পাইয়া থাকিবে। এই চেকগুলি আসিলে বেঙ্কে জমা করিওনা, রেখে দেবে, ফেব্রুআরি মাসে যখন প্রুগ্রামে যাইব তখন ভঙ্গিয়ে নিব। যদি পাঠিয়ে দিয়ে থাক তবে ঠিক আছে, চেক না পাঠাইলে রেখে দিবে। গাই মহিসের জন্য ভুসার বন্দবস্ত করিতে হবে যদি চেষ্টা করে গ্রামের বেগুের ছেলেদের দ্যারায় কিম্বা ঐন্যের দ্যারায় ঠিক করিতে পার তবে ভাল হবে। শ্রীযুক্ত উত্তম চান্দ জিকে বলিবে জলের পাম্প পাঠাবার সব ঠিক করেছি, লগদ টাকা দিয়ে খরিদ করে পাঠাতে হবে। এতে যদি রাজি হয় তবে দক্ষীনাবাবুর নামে পাঠিয়ে দিতে বলিবে। এ সম্বন্ধে দক্ষীনা বাবু তুমায় পত্র লিখেছিল তার উত্তর পায় নাই। একপ্রকার কুশল কামনা করি ইতি

বাবা

কোলকাতা থেকে লিখেছেন। ব্যাণ্ডের যন্ত্র, মৈহারে আসার কথা আর কোলকাতার কার্যক্রম সম্বন্ধে লিখেছেন। বাবাকে পত্রপাঠ জানিয়ে দিলাম চোপড়া সাহেবের গাড়ি নিয়ে সাতনা যাব। চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবা আসছেন জেনে মনের সব যন্ত্রণা চলে গেল। আজ এই প্রথম অন্নপূর্ণা দেবী, দীর্ঘ সময় ধরে জোয়ারী করালেন মঙ্গল মিস্ত্রীকে দিয়ে। জোয়ারী জিনিষটার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কি করে করতে হয় তার নির্দেশ দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। জোয়ারী করতে একজন আনাড়ির পক্ষে অনেক সময় লাগল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকও হল। সামনে বসে এই প্রথম জোয়ারী করতে দেখলাম। সরোদে বাবা নূতন ঢং এ তৈরি করেছিলেন যা অন্য সরোদ থেকে ভিন্ন। সুতো দিয়ে বাবাকে চারটে সুরের জোয়ারী করতে দেখতাম। সরোদের জোয়ারী এবং সুরবাহারের জোয়ারী আকাশ পাতাল তফাৎ। সুরবাহারে এক একটি সুর মীড়ে টানলে তরফের তারের আওয়াজ বেরোয়।

বাবা এসে গেলে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আর শিখতে পারব না বলে দিন রাত শিক্ষা

চলছে। একটা কথা বরাবরই বলেন, 'সকলেরই এইরকম অবস্থা ছিল একসময়ে, কিন্তু নিরন্তর সাধনা এবং শিক্ষা করলে তার ফল নিশ্চয়ই পাবেন।' মাঝে মাঝে নিরাশ হলেও মনে উৎসাহ পাই।

বাবা আসছেন বলে ছেলে এবং বাড়ীর সকলের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্নপূর্ণা দেবী ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবা এলে মেজাজ না খারাপ হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

আজ আবার বাবার চিঠি পেলাম। একসঙ্গে বিভিন্ন তারিখে লেখা। পত্রদু'টি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কলিকাতা হইতে
১৬-১-৫৩

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতিন জানিবে যন্ত্রপাতি প্রায় কেনা হয়ে গেছে, কল্য একটা চেলো পেয়েছি ২৫০্ আড়াইশত টাকাতে, ঐদ্য বিকালে এটা নিয়ে আসিব। ২২ তাং আমরা যাত্রার বন্দোবস্ত করিতেছি, পূর্ব্বে তুমায় টেলি করে জানাবো। তুমি এক কায করিবে সকালের গাড়ীতে সাৎনা চৈলে আসিবে এসে কমিসনার সাহেবের কাছে যেয়ে একটা গাড়ির বন্দবস্ত করিবে, কমিশনারকে বলিবে যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি বোম্বে মেলে সাৎনা নামিব, সাৎনা হতে যন্ত্রগুলি নিয়ে মাইহার পৌঁছছিতে পারি তারজন্য একটা গাড়ির বন্দবস্ত করে দিতে হবে এতগুলি যন্ত্র নিয়ে এলাহাবাদে ওঠানামা করা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর, এজন্য তুমায় জানালেম যাতে আমাকে কষ্ট পাইতে না হয়। সাৎনা হতে যাতে যন্ত্রগুলি ভাল করে নিয়ে জেতে পারি তার বন্দবস্ত কমিসনার সাহেবের দ্যারায় করাবে। শ্রীমান আশীসও সঙ্গে থাকিবে আমার যন্ত্র নিয়ে ১০-১১টি যন্ত্র হবে ও বিছানাপত্র আছে এসব নিয়ে অনেক হবে, এসব দেখেশুনে নামাবার জন্য তুমি সাৎনা উপস্থীৎ থাকিবে। আশাকরি তুমরা সকলে ভাল আছ। যাত্রার পূর্বে টেলি করে তুমায় জানাব সময়মত উপস্থীথ থেকে আমার সাহায্য করিবে তুমার কষ্ট হবে। সাৎনা হতে নাতিধিগকে সঙ্গে নিয়ে নিবে, শ্রীমান সনৎকে সঙ্গে নিয়ে কমিসনারের কাছে যাইবে। অধিক আর কি লিখিব একপ্রকার তুমাদের কুসল চাই, আশীষের প্রণাম নিবে। ইতি

বাবা

কমিসনার সাহেবকে আমার আদাব বলিবে, তিনি যদি দয়া করে স্টেশনে এসে যন্ত্রগুলি দেখেন তবে আমি অতি সুখি হব। ফাস্টক্লাসে আসিব। ২২ তাং জানুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিব।

বাবার এই চিঠি পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছেন, যেন সব বন্দোবস্ত থাকে। কোলকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন আগেই চিঠি দিয়েছেন, তেইশে জানুয়ারি বাবা সাতনা এসে পৌঁছবেন, তা সত্ত্বেও এক দিন পরে আবার চিঠি দিয়েছেন? এ চিঠি লেখার কারণ, দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি যদি কোন কারণে না পাই। যদিও টেলিগ্রাম পেয়েছি তবুও চিঠি লিখেছেন।

কলিকাতা
১৭-১-৫৩

কল্যানবর

শ্রীমান জিতেন তুমার টেলি পাইলাম এত টাকা দিয়ে রিজারবেসন করার দরকার নেই। যন্ত্রগুলি উপরে ভাল করে রেখে এবং মুটা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেওয়া যায় আমার যন্ত্র নিয়ে ১০টি যন্ত্র হবে, বেগ বিছানা হবে চার পাচটি, সবগুলি উপরে রেখে যেমন নেওয়া যায় সেরূপ বন্দবস্ত করিবে। তুমাকে নিয়ে তিনখানা টিকেট কিনবে, যা উচিৎ ভারা হয় তা দিব। এরূপ বন্দোবস্ত করিলে টাকা কম লাগিবে। কমিসনার সাহেবের কাছে যেয়ে বলিবে তিনির আদেসে গারি ঠিক করিলে খরচ কম লাগিবে এবং গবরমেন্টের যন্ত্র, মালপত্র যাইবে এজন্য গারির মালিক আপত্তি করিতে পারিবেনা। কমিসনার সাহেব যদি গবরমেন্টের গারির বন্দবস্ত করে দেন তাহলে কুন কথাই নাই জানিবে। মাল বহনকরা লরি হলেও চলিবে। পাঞ্জাবী দেওয়ান লাইমকোম্পানি হতে যদি লম্বা লরি গাড়িটা যুগার করিতে পার তবে আরও ভাল হয় মাল বহন করা লরি। তহসিলদার সাহেবকে যয়ে বল তিনি বন্দবস্ত করে দেবেন। তিনি যদি না করেন তুমি জেয়ে মালিকের কাচে আমার কথা বলিবে লম্বা গারিটা একদিনের জন্য দিতে। ছাতনা যাতায়াত পেট্রল খরচ যা পড়ে দেব। এও যদি না হয়, তবে ওমচাদ সেঠের কাছে যেয়ে বলিবে ইনির মালগারিটা দেওয়ার জন্য যদি দেন তবে ওই গারিতে চৈরে তুমি ছাতনা স্টেসনে ২৩ জানুয়ারি বোম্বে মেল গারি আসার সময় মতে উপস্থিত থাকিবে। এসব তুমি যদি না করতে পার তবে আমি এসে এর বন্দবস্ত যাহয় করিব। যেসব বিসয় জানালাম সব চেষ্টা করে দেখিবে। রিজারবেসন করিবেনা, যদি অন্য গারি না পাও তবে মালগুলি উপরে নিয়ে যাওয়া যায় তার বন্দবস্ত করিবে। চ্চ তাং বোম্বে মেলে চাপব ঐদ্য রিজারবেসন করিব। যাবার পূর্বে তুমায় জানাব একপ্রকার কুশল কামনা করি ইতি

বাবা

পুন : ফাস্ট ক্লাস গাড়িতে আসিব যন্ত্রের কারণে।

বাবার আসার আগের দিন অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখলাম জেনারেল নলেজের বই পড়ছেন যা কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিয়েছি। ইংরেজী না বুঝলে ডিক্সনারী দেখেন। শিক্ষার ব্যাপারে অধ্যবসায়ের ত্রুটী নেই।

সকালেই সাতনা চলে গেলাম। সাতনায় গিয়ে ডি.এম.-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে এ.ডি.এম.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গাড়ি তৈরি ছিল। হাতে সময় আছে। সাতনায় বাবার প্রথম শিষ্য এবং ধর্ম-জামাই যতীন ব্যানার্জির বাড়ি গেলাম। সনৎ, রণজিৎ এবং বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করে বিকেল তিনটের সময় স্টেশন গেলাম। বাবা সব বন্দোবস্ত দেখে খুসী হলেন। মৈহারে আসবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিকমত রিয়াজ করেছ তো? এবারে দেখবো সাধনা করে কত অগ্রসর হয়েছ?' বাবার কাছে শুনলাম, মৈহার থেকে তাড়া খেয়ে নিখিল, তার দাদা বম্বে থাকা সত্ত্বেও আলি আকবরের বাড়িতেই বেশি সময় কাটায় এবং শিক্ষা করে। কথায় বুঝলাম, বাড়িতে আলি আকবরের নূতন স্ত্রী থাকার

জন্য, নিখিলের আলি আকবরের বাড়িতে বেশি সময় কটান বাবা পছন্দ করেন না। মৈহারে সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

পরদিন বাবা কোলকাতায় টেলিগ্রাম করতে বললেন। চিঠিও দিলেন। কোলকাতা থেকে বাবা মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। মাকে বললেন, 'তোমার ছেলেকে মিষ্টি দাও।' বাবার কথা শুনে হাসি পেল। মিষ্টি এলে মা তো দেবেনই, তবুও আমাকে খুসী করবার জন্য এই বিনয় বরাবর দেখেছি। অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখেই বললেন, 'মা তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।' অন্নপূর্ণা এর উত্তর যথাযথ দিলেন। বাবা নাতিদের খবরাখবর নিলেন। আশিস বাবার থেকে দূরে দূরেই রইল। বাবা সব খবরাখবর নিলেন। কিন্তু, রবিশঙ্কর সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না, বাবার কাছে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা শুনলাম। বাবা বললেন, 'আশিসকে সঙ্গে নিয়ে বাজাচ্ছি বলে 'আদ্ধার ঠেকা (বাবার ভাষায় দাদু নাতির গৎ) বাজাতে বলায় কেবল ত্রিতালের ঠেকাই বাজাতে লাগলো জ্ঞান বাবু। আদ্ধার ঠেকা বলা সত্ত্বেও, না বাজাতে পারার জন্য নিজেকে অপমানিত ভেবে কোর্টে নালিশ করেছিলেন এই বলে যে, আমি তাকে অপমান করেছি। আমি তো রবুর বন্ধু বলে এই গৎ বাজিয়েছিলাম, যাতে সব শ্রোতারা শৃঙ্গার রসের আনন্দ পায়, কিন্তু আমার ঠেকা বলায় মানহানির জন্য আমাকে কোর্টের সমন পাঠায়।' বাবার কথা শুনে সবিনয়ে বললাম, 'বাবা বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আপনি যদি সুলতানে বাজান, তার পরিবর্তে কোন তবলাবাদক যদি ঝাঁপতালে বাজায়, তবে তবলাবাদককে এই কথা বললে কি অপমান করা হয়? সেই রকম যদি আদ্ধার ঠেকার পরিবর্তে কেউ ত্রিতাল বাজায় তাহলে গৎএর মাধুর্যই থাকবে না। আগে বুঝলাম না কিন্তু মৈহার এসে বুঝেছি, এই ঠেকাই কাশীতে কণ্ঠে মহারাজ, আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাজিয়েছিলেন।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আরে কণ্ঠ (কণ্ঠে মহারাজকে বাবা এই নামে ডাকতেন।) কি সুন্দর বাজিয়েছিল, অথচ এই ঠেকা বলাতে কোর্ট কাছারি।' বাবার কথা শুনে আবার আমি বললাম, 'কেস যদি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ করেই থাকেন তা হলে ভয়ের কি আছে? কোর্টে গেলে জ্ঞানবাবুর আরও বদনাম হ'তো, তা ছাড়া যদি ত্রিতালেই কঠিন বন্দিশের গৎ আপনি এক ঘণ্টাও বাজিয়ে যান, আমার ধারণা ঠেকা না বলে দিলে জ্ঞানপ্রকাশ তবলাতে হাতই ছোঁয়াতে পারবেন না। আমার এই কথা শুনে বাবা বললেন, 'বাবা তুমি যা বললে কলকাতায় হীরু বাবুও (হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) এই কথা বলেছিলেন। হীরু বাবু বলেছিলেন আদ্ধার ঠেকা বলা সত্ত্বেও যদি কেউ না বাজাতে পারে তাহলে তাকে অপমান করা বলে না। সুতরাং কোন ভয়ের কিছু নাই। হীরু বাবুর নির্দেশে আমিও উকিলের নোটিশ দিয়েছিলাম, এই বলে যে আমি কোন অপমান করি নি। কিন্তু রবু কোলকাতায় সব মিটমাট করে দেয়।' এই কথা বলে বাবা চুপ করে গেলেন। বাবার কথা শুনে আমার মনে হোল যদি কোন দিন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে বাজাবার সুযোগ পাই, তা হলে এর সমুচিত জবাব দেব। কোর্ট কাছারির নামে বাবার মত সোজা লোক ভয় পেতে পারেন, কিন্তু আমি বাবা নই। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে, দুইবার সুযোগ পেয়ে জ্ঞানবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম বাজাবার জন্য, কিন্তু দুইবারই জ্ঞানপ্রকাশ বলেছিলেন, 'আমি তো রিয়াজ করবার সময় পাইনা, সুতরাং কি বাজাব?' বাবার কাছে সব কথা সেই সময় শুনিনি,

কিন্তু অতিরঞ্জিত করে ব্যাপারটা পড়েছি অনেক পরে একটি মাসিক পত্রিকায় ১৯৮৬ সনে, কিন্তু ঘটনাটা? যাক সেটা যথাস্থানে লিখব। যেহেতু রবিশঙ্কর সম্বন্ধে বাবা কোন কথা বললেন না, সেইজন্য রবিশঙ্করকে আমি একটা চিঠি দিলাম। 'বাবা বোধ হয় রেগে আছেন কোন কারণে সুতরাং বাবাকে একটা চিঠি দেবেন।' বাবা যে কোন কারণে রবিশঙ্করের উপর রেগে গেছেন বুঝতে পারলাম একটা জিনিষ দেখে। বাবার শোবার খাটের পায়ের দিকে সেতার বাজাচ্ছে এই ভঙ্গিমায় রবিশঙ্করের একটি ফটো ছিল। হঠাৎ দেখি বাবা ফটোটা উঠিয়ে ছোট ঘরের মধ্যে রেখে দিলেন। এ যাবৎ দেখেছি রবিশঙ্করের ফটোটা দেখে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, ফটোটা কার? বাবাকে আনন্দিত চিত্তে বলতে শুনেছি, 'ঐ ফটোটা আমার জামাই-এর। ওর নাম রবিশঙ্কর। জাতে ব্রাহ্মণ। আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি।' কিন্তু আজ এ কি হল? বাবা কেন ফটোটা যা এতদিন টাঙ্গান ছিল সরিয়ে রেখে দিলেন। নিজের মনেই বাবাকে বলতে শুনলাম, 'আমার পায়ের কাছে নিজের ফটো রেখে দিয়েছিলো। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' আশ্চর্য হলাম। এমন কি কারণ ঘটল?

রাত্রে বাবা বললেন, 'চারদিন আগে সরস্বতী পূজা হয়েছে, ঠিক মত পুজো করেছিলে তো?' উত্তরে সম্মতি জানালাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যন্ত্র নিয়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন, 'সরস্বতী পুজোর দিন বরাবর বাজাবে শুদ্ধ বসন্ত। খেয়াল অন্য রকম। কিন্তু প্রাচীন কালে ধ্রুপদ অঙ্গে শুদ্ধ বসন্তে গান এবং যন্ত্রে বাজত। এই শুদ্ধ বসন্তের আর এক নাম আদি বসন্ত।' এই কথা বলে রাগের চলন বলে আলাপ থেকে শুরু করে মসীদ খানি গৎ এবং দ্রুত গৎ শেখালেন। শুদ্ধ বসন্ত আজ পর্যন্ত কখনও শুনিনি। বসন্ত রাগ, বসন্ত বাহার, পরজ বসন্ত গানে শুনেছি। কিন্তু গুরু গম্ভীর রাগ 'শুদ্ধ বসন্ত' আগে কখনও শুনিনি। বাবার কাছে শিখবার সময় আমি সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে গেলাম। বাবা খুশী হলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক রিয়াজ করেছ মনে হচ্ছে। এই রাগ বসন্ত কালে দিনে এবং রাত্রে সব সময় বাজান যায়। এই রাগ পরে চৌতাল এবং ধামারে শিখবে।' বাবা এতদিন ছিলেন না বলে সন্ধ্যায় এসেই রাত্রে আমাকে শেখালেন, যা আজ পর্যন্ত হয় নি।

পর দিন সকালে আবার শুদ্ধ বসন্ত শেখালেন। আজ আবার একটি নূতন গৎ শেখালেন। রবিশঙ্কর মৈহারে এসেছিল কিনা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। বুঝলাম তিনি চটে আছেন। আজ আবার রবিশঙ্করকে একটা চিঠি দিলাম। রাত্রে বাবা আবার আমাকে নিয়ে বসলেন। শুদ্ধ বসন্তই শেখালেন। রাগটি খুবই গম্ভীর মনে হোল। দু'দিন পরে আশিসকে নিয়ে বাবা বসলেন। আশিস বেশ সুন্দর বাজিয়ে গেল। পরদিন বাব রেওয়া গেলেন। রেওয়াতে তাঁর দুই দিন বাজনা আছে। এ ছাড়া ব্যাণ্ডের জন্য যে সব যন্ত্র এনেছেন সেই গুলোর বিষয়ে কথা বলে ৯ই ফেব্রুয়ারী মৈহারে ফিরবেন।

আশিস এখন তের বছর বয়সে পড়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দেখলাম জুবেদা খাতুন একদিন আশিসকে জোরে এক চড় কষালেন। কি অপরাধে মারলেন। শুনলাম, তার এটুকু শিক্ষা হয়নি যে কোলকাতায় যার বাড়িতে এতদিন ছিল তাঁকে দক্ষিণা জ্যাঠামশায় না বলে 'দক্ষিণা' বলেছে। আশিসকে বললাম, 'অন্যকে সম্মান দিলে নিজে সম্মান পাবে।'

আশিস নিজের ভুল বুঝতে পারল। জুবেদা খাতুনকে বললাম, 'আশিস নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে, তবে না মেরে বড়কে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় বোঝান উচিত ছিল। মারলে কি বুঝবে নিজের দোষ?'

বাবা বাজাতে গেছেন। একজন বাঙ্গালী ভট্টাচার্য বাবু এসে উপস্থিত। বললেন, কোলকাতায় কোন উস্তাদ আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। সেইজন্য মৈহারে এসেছি বাবার কাছে বুঝতে 'কালচার অব মিউজিক' কাকে বলে? বুঝলাম কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের। কোলকাতা থেকে বাবা সবে এক সপ্তাহ এসেছেন। ভদ্রলোককে বললাম, 'বাবার মেজাজ ঠিক নেই সুতরাং কোলকাতায় যখন যাবেন তখন যেন তাঁকে এই সব প্রশ্ন করবেন।' এই বলে কোলকাতার ঠিকানা দিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় করলাম। এই রকম কতজনকে যে আমার বিদায় করতে হয়েছে তা বলা মুস্কিল। বাবা এ সব কথা শুনে প্রথমেই বলতেন, 'গলায় একটু গান করুন তো।' তারপর একটা সুর লাগিয়ে হয়ত বলতেন, কি সুর বলুন তো?' ভদ্রলোক বাবার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলেই বাবা বলতেন, 'গলায় কিছুই বেরোয় না, অথচ সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা। আগে ভাল করে গান শিখুন তারপর এইসব বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই গবেষণা করবেন।' এ কথা শুনেছি বলেই ভদ্রলোককে বিদায় করেছিলাম।

এবারে কোলকাতা থেকে এসে অবধি বাবাকে খুব গম্ভীর মনে হচ্ছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যে মানহানির কেস করেছিল, রবিশঙ্কর নাকি তা ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু কোলকাতা থেকে এসেই রবিশঙ্করের ফটোটা হটিয়ে রাখলেন কেন? রাত্রে শুদ্ধ বসন্ত শেখাবার পর বললেন, 'গল্পটি এক পাঠান বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম। এটি আফগান রূপকথা।' আমি তো অবাক! হঠাৎ রূপকথা শোনাবার কারণ কি? বাজনা শেখাবার সময় বাজনার ভাব এবং রসের কথা নানা দৃষ্টান্ত নিয়ে বোঝাতে দেখেছি কিন্তু আজ দেখছি বাবা রূপকথার গল্প শুরু করলেন। 'এক হরিণ শিশু জঙ্গলের একান্তে আপন মনে থাকত, নাচত, খেলত, গাইত, সুন্দর ছোট্ট জীবন। একদিন কোথা থেকে এল একটা ব্যাধ। গাছের ফাঁক থেকে মারল এক তীর। তীরটা গিয়ে গায়ে বিঁধল। তীব্র ব্যথায় হরিণ প্রাণভয়ে পালাতে লাগল অনেক অনেক দূরের একটা পাহাড়ের গুহায়। খুব জোরে দৌড়ে গিয়ে ভাবল, আমি হরিণ এত জোরে বহুদূরে পালিয়ে এসেছি। ব্যাধ এখানে আসতে পারবে না। আমি এখন নিরাপদ। যদি ঘাটা শুকিয়ে যায় তবে আমি বেঁচে যাব। বাঁচবার জন্য কি আকুতি! হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে দেখল মূর্তিমান যমের মত গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাধ, হাতে তার তীর আর ধনুক। আর্তনাদ করে উঠল হরিণ, না না আমাকে মেরো না আমি বাঁচতে চাই! ভয় আর কৌতুহলে হরিণ প্রশ্ন করল, 'তুমি তো দু'পায়ের মানুষ, আমি এত দূর ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু আমি কোথায় পালিয়ে এসেছি তুমি জানলে কি করে? ব্যাধের সরল উত্তর, কেন? আমার তীর বিঁধে তোমার গা থেকে যে রক্ত পড়ছিল সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ দেখে দেখে আমি চলে এসেছি। এক মুহূর্ত আগে যে বাঁচার জন্য আকুতি প্রকাশ করেছিল, সে ব্যাধকে বলল, আমায় মেরে ফেল; আমার বাঁচার সাধ চলে গেছে। বিস্মিত ব্যাধ প্রশ্ন করল, এই তো তুমি বাঁচার জন্য প্রাণ ভিক্ষা করছিলে আর এখন মরতে চাইছ? হরিণ উত্তর দিয়েছিল, 'যব অপনা হি খুন

সাথ না দিয়া, তো জিকে ক্যা করেঙ্গে।' অর্থাৎ স্বরক্তই যেখানে বিশ্বাস ঘাতক, সেখানে বাঁচার কোন মূল্য নাই।' গল্পটি বলার পর বাবাকে গম্ভীর দেখলাম। কিছু পরে বললেন, 'নিজের স্বার্থের খাতিরে, অনেক লোক পিতার শবাধারকেও বিক্রয় করে নিজের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানর জন্য।'

বাবা হঠাৎ এ গল্প কেন বললেন আমার বোধগম্য হল না। মাঝে মাঝে এক একটা কথা উঁকি দেয় কিন্তু যুক্তি দ্বারা নাকচ করে দিই। দীর্ঘ একত্রিশ বছর পর, বাবা কেন যে এই গল্পটি বলেছিলেন বুঝেছিলাম।

কয়েকদিন পরই রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। রবিশঙ্কর জানিয়েছে আলিআকবর পাঁচই ফেব্রুয়ারি মৈহার পৌঁছবে এবং তার পরদিন গায়ক এ. টি. কাননকে নিয়ে রবিশঙ্কর মৈহার আসবে এবং আট তারিখে ফিরে যাবে। এ চিঠি পেয়ে ভাবলাম, তাহলে তো বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে দেখলে বাবা খুশী হতেন।

বাবার অবর্তমানে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে শিখেছি। একদিন কথায় কথায় অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৈহারের মহারাজা আপনার বাজনা শুনে খুশী হয়ে যে এত বড় জমি দিয়েছেন, সেই সময় কি রাগ বাজিয়েছিলেন?' জমি দেওয়ার ব্যাপারে যৎসামান্য বাবার কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু কি রাগ শুনে মহারাজা খুশী হয়েছিলেন জানবার কৌতূহল ছিল অনেক দিন। আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'ছোট থেকে কখনও বাড়ির বাইরে বেরোই নি। এমন কি মহারাজাকেও দেখি নি। বিবাহের পর মহারাজা বাবাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'আপনার কাছে প্রশংসা শুনেছি, আমার বোন অন্নপূর্ণার বাজনা একবার আমাকে শোনান।' মহারাজের অনুরোধে বাবার কথায় মহারাজের কাছে গিয়ে বাজিয়েছিলাম।' অন্নপূর্ণা দেবীর কথায় বুঝলাম, বাজাবার সময় বাবা এবং রবিশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'বাজিয়েছিলাম মালকোষ, মালকোষ শুনে মহারাজা কেঁদে ফেললেন এবং আমার নামে জমি দিলেন।' এই কথা বলেই বললেন, 'যত সব বাজে কথা, যেমন মহারাজা, তাঁর কান্নাও সেইরকম।' এই নিরভিমানী উত্তর শুনে অবাক হলাম। বাবা তো বলেছিলেন, 'অন্নপূর্ণার বাজনা শুনে কাঁদতে কাঁদতে মহারাজা বলেছিলেন, 'এরকম বাজনা আমি কখনও শুনি নি।' অথচ এ কথা না বলে অন্নপূর্ণা দেবী ব্যাপারটা কোন গুরুত্ব দিলেন না। আসলে আমার কৌতূহল ছিল কি রাগ বাজিয়েছিলেন জানবার। যেহেতু অন্নপূর্ণা দেবী কিছুদিন পরেই চলে যাবেন সেইজন্য আমার কাছে একটা খাতা চাইলেন। দুই দিনে চারটে রাগের চলন, আলাপ, জোড় লিখে দিলেন। বাবার কাছে শিখবার সময় যাতে অসুবিধা না হয়।

আলি আকবর মৈহারে এলেন। স্টেশনে আমাকে দেখে বরাবরের মত জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবার মেজাজ কি রকম?' বললাম, 'ন'তারিখে মৈহারে ফিরবেন।' আলি আকবর এ কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন মনে হোল। অনেক রাত্রে এলেন বলে বেশি কথা হল না। পরদিন সকালেই এ. টি. কাননকে নিয়ে রবিশঙ্কর মৈহার এলেন। স্টেশনে আমাকে দেখেই এত আন্তরিকভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন যা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে হয়।

পরদিন সকালে আলি আকবর, রবিশঙ্কর, এ. টি. কানন এবং আমি সব ছেলেদের নিয়ে

দেবীদর্শন করতে গেলাম। মন্দিরে গিয়ে অনেক ফটো ওঠান হল। এবারে আলিআকবর সরোদ নিয়ে এসেছে। আমি, আলী আকবর এবং রবিশঙ্করকে বললাম, লোকমুখে শুনি আপনাদের দ্বৈত যন্ত্র বাজাবার কথা, কিন্তু আমরা তো কখনও শুনতে পাই না সুতরাং আজ রাত্রে আপনারা বাজান। মৈহারের বিশিষ্ট কয়েকজনকে ডাকব। ম্যাজিস্ট্রেটকেও ডাকব। দুজনেই আমার কথায় রাজী হলেন। আমি সুরদাসকে তবলা বাজাবার জন্য খবর দিলাম। মৈহারের দশ পনেরজন সঙ্গীত প্রেমীকে বাজনা শুনবার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। ম্যাজিস্ট্রেটকেও নিমন্ত্রণ করলাম। সন্ধ্যার সময় বাজনা শুরু হল। পুরিয়া ধানেশ্রীতে আলাপ জোড়, ঝালা যে মুহূর্তে শেষ হল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আপনাদের ধন্যবাদ।' এই কথা বলেই চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম কি বেরসিক লোক। লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। তারপর তাকাতেই, রবিশঙ্করের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমার অবস্থা বুঝে রবিশঙ্কর মুচকি হাসল। তারপর গৎ শুরু হল। ডুয়েট এই প্রথম শুনলাম খুব ভাল লাগল।

সকালেই সকলে চলে গেলেন। যাবার আগে আলি আকবর বলল, 'নিখিল বম্বেতে শিখছে। বাবা বলেছেন নিখিলকে গায়কি এবং তন্ত্রকারী অঙ্গে শেখাতে।' বাবা কোলকাতা থেকে এসে যে কথা বলেছিলেন তা বললাম। উত্তরে আলি আকবর বললেন, 'তুমি তো জান বাবা কত পর্দানশীন, সেইজন্য এ কথা বলেছেন।' স্টেশনে ব্যাণ্ডপার্টির সকলে গিয়ে পৌঁছেছে। নানা বিষয়ে কথা হতে লাগল। রবিশঙ্কর আলি আকবরকে বলল, 'আলু ভাই, সব পুরনো বন্দিশগুলো একটু মুখে মুখে বলতো, যেমন ইমন, খাম্বাজ, বেহাগ, বিলাবল, ঝিঁঝিঁট, পাহাড়ী, কাফি, জিলা, গারা, জিলাকাফি, পিলু, ললিত ইত্যাদি। এই কথা শুনে গুলগুলজী বললেন, 'বাবার বাজনায় যে ওজন, তা কারো মধ্যে দেখা যায় না।' এ কথা শুনে আমার মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগল। গম্ভীর ভাবে আমি বললাম, 'বাবার বাজনার মধ্যে একটা জিনিষ যা আমি দেখেছি আজ পর্যন্ত কারো মধ্যে দেখিনি। সকলেই দেড়ী, আড়ী, কুআড়ী, ঝুলনা, পিপিলীকা, গোপুচ্ছা ছন্দ বাজায় কিন্তু 'পকডিউ' ছন্দ বাবা যেভাবে বাজান, এ ছন্দ আমি আজ পর্যন্ত কারো কাছে শুনি নি। গায়ক বা বাদক কারও কাছে না। বাবার এটা একটা বৈশিষ্ট্য। আমার কথায় সকলেই বাবার প্রশংসা করতে লাগলেন।

বাবার যে বৈশিষ্ট্য 'পকডিউ' ছন্দের কথা বললাম, সেই পকডিউ কথাটা বুঝতে গেলে একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, নবম শ্রেণীর। সেই সময় বি.এ., বি.টি.-র ছাত্র মাসে দুই তিন দিনের জন্য এসে পড়াতেন। ব্যাচেলার অব ট্রেনিং, সুতরাং ক্লাসে কি ভাবে পড়াবেন তার জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক পেছনে বসে দেখতেন। আমি কোন কালেই মেধাবী ছাত্র ছিলাম না, তবে খেলায় এবং আবৃত্তিতে আমার নাম ছিল। স্কুল পরিদর্শন করতে এলে নানারকম প্রোগ্রামের আয়োজন হত। কবিতার আবৃত্তি আমি করতাম। সকলেই ভাবত আমি খুব মেধাবী ছাত্র। ক্লাসে বি.টি.-র ছাত্র যাঁরা পড়াতে আসতেন, খবর রাখতেন কারা ভাল ছাত্র। ইংরেজী ক্লাসে, পড়াবার সময় এক একজনকে এক একটি ইংরেজী শব্দ বলে প্রশ্ন করা হত, শব্দটির অর্থ কি? আমাকেও প্রশ্ন করা হতো। হঠাৎ আমার মাথায় একটা শব্দ গজাল। শব্দটা হল 'পকডিউ'। পড়াতে পড়াতে আমাকে

ইশারা করে যে মুহূর্তে বি.টি.র অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট ইস দ্য মিনিং অব কনসেনট্রেশন?' সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললাম, 'পকডিউ'। অধ্যাপক আমার উত্তর শুনে বসতে বলে অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

যাক যে কথা বলছিলাম। স্টেশনে আলি আকবর, রবিশঙ্কর, এ.টি কানন এবং ব্যাণ্ডের সব ছাত্রদের সামনে যখন বললাম, বাবার বাজনার বৈশিষ্ট্য 'পকডিউ' ছন্দ যা কারও কাছে শুনিনি, সকলেই চুপ করে রইল। কয়েক মিনিট পরেই রবিশঙ্কর আমাকে ডেকে হাঁটতে হাঁটতে অন্যদিকে গিয়ে কয়েকটা অবান্তর কথা বলে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বাবা তোমাকে পকডিউ ছন্দ কি রকম ভাবে শিখিয়েছেন?' মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম রবিশঙ্কর কেন আমাকে গল্পচ্ছলে আলাদা ডেকে নিয়ে গেছেন। 'পকডিউ' শব্দটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করার ফলে রবিশঙ্কর কথাটা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, যেন শব্দটির সঙ্গে কত পরিচিত। গম্ভীরভাবে বললাম, 'আপনাদের ছন্দটি যেভাবে বাবা শিখিয়েছেন আমাকেও 'পকডিউ' সে ভাবেই শিখিয়েছেন।' আমার উত্তর এরকম হবে রবিশঙ্কর আশা করেন নি, আমতা আমতা করে বললেন, 'তা তো বটেই, তবুও জিজ্ঞাসা করছি, তোমাকে কি ভাবে 'পকডিউ' শিখেয়েছেন।' দুই তিনবার নানাভাবে ছন্দটি জানতে চাইল। উত্তরে আমি সেই একই কথা বললাম। রবিশঙ্করের বার বার প্রশ্ন করায় আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। হেসে, বাবা যে তিনটি অক্ষরের অশ্লীল শব্দটি বলেন, যেটা তাঁর মুদ্রাদোষ, সেই শব্দটি বলে 'পকডিউ' শব্দের অর্থ বললাম। রবিশঙ্কর প্রাণখোলা হাসি হেসে সকলের কাছে এসে আলি আকবরকে বলল, 'আলু ভাই, বাবা যে 'পকডিউ' ছন্দ বাজায় যার তুলনা নেই, যতীন বলল, সেটা কি জান?' আলি আকবর সেই সময় কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'যতীন একটা কি বলল বটে কিন্তু কথাটা শুনতে পাইনি।' এবারে রবিশঙ্কর বিশদভাবে কথাটা ব্যাখ্যা করল। হাসির ঢেউ বয়ে গেল। মনে মনে বুঝলাম, 'রবিশঙ্কর কত চতুর। 'পকডিউ' কথাটা শুনে তার নতুন লেগেছে। সুতরাং যে হেতু শেখেনি বাবার কাছে, সেইজন্য কথাটা জানবার জন্য কি রকম সবজান্তার ভাব নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। ট্রেন ছাড়বার আগে রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'চললাম মিষ্টার 'পকডিউ'।

পরদিন গাড়ি লেট থাকার ফলে রাত্রি তিনটের সময় বাবা ফিরলেন। বাড়িতে এসে টাঙ্গাওয়ালাকে বাবা যে সময় পয়সা দেন, তার মধ্যেই সরোদ নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে মাকে ডাকতেই মা দরজা খুলে দেন। কিন্তু মা আজ গভীর রাত্রি বলে আমার আওয়াজ পান নি। দিন রাতের পরিশ্রমে গভীর নিদ্রায় শুয়েছিলেন। এ রকম কখনও হয় না। যতই রাত হোক একবার ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে দেন। মৈহার থাকাকালীন ব্যতিক্রম তিনবার হয়েছিল। এর পরিণামও এক প্রকারে হয়েছিল। বাবা এসে গিয়েছেন। আমি জোরে ডাকছি দেখেই, বাবা দরজার কাছে এসে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মা এসে দরজা খুলে দিলেন। বাবার সেই একই এক কথা, 'এই বুড়া বয়সে ভিক্ষায় যাই আর এরা খাবে আর ঘুমাবে।' রাগ ভাঙতে এক দিন লাগবে। তামাক মায়ের বদলে আমি দেব।

বাবার একটা বিচিত্র স্বভাব ছিল। কোন কারণে রাগ হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রসঙ্গটা বলে

দিতেন। কিন্তু এইবার কোলকাতা থেকে এসে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। বুঝতে পারছি কোন কারণে চটে আছেন কিন্তু প্রকাশ করছেন না। এতদিন থেকে, বাবার প্রতিটা আচরণ বুঝতে পারি। সেইজন্য এবারের হিসাবটা মিলছে না। আমার ধারণার কথাটা অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম। তাঁর চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। বললেন, 'ছোট থেকে দেখছি বাবা কখনও কারো প্রতি রাগ হলে চেপে রাখতে পারেন না, কিন্তু কোলকাতা থেকে এসে মনে হচ্ছে কিছু চেপে আছেন, যা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।' কথাটা বিশেষ করে আরও মনে হচ্ছে এই জন্য যে, সাতনা থেকে ফিরে রবিশঙ্কর, আলিআকবর, এ.টি. কানন এঁরা মৈহার এসেছিলেন শুনেও, বাবার মনের উল্লসিত ভাবটা দেখিনি। যদিও উচ্ছ্বাসটা বাইরে কখনও প্রকাশ করেন না, তা হলেও কথাবার্তায় বুঝতে পারি। আমার ধারণাটা যে ঠিক সে কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম কিছুদিন পর। সে সময় আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর মৈহার এসেছিলেন, প্রায় দেড় মাস পরে, সেই সময় বাবার রাগের কারণটা বাবা নিজেই প্রকাশ করেছিলেন।

কিছুদিন ধরে আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মাথা ধরা, সময়ে সময়ে মাথাটা ঘুরে যায়, দুর্বল অনুভব করি। ডাক্তার বলেছে এর জন্য কাশীতে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে। এ ছাড়া বায়ু পরিবর্তন হলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কাশী থেকে চিঠি এল, আমার মায়ের শরীর খারাপ। কয়েক দিনের জন্য কাশী গেলে ভাল হয়। মাকে কথাটা বললাম। বাবাকে বলতে সাহস হয় না ঘাবড়ে যাবেন বলে। কিন্তু একদিন কথায় কথায় মা, বাবাকে বলেই দিলেন আমার মায়ের শরীর খারাপের কথা। বাবা আমাকে ডেকে সব শুনলেন। বললেন, 'ধ্যানেশের মুসলমান ধর্মমতে ছুন্নৎ হবে কয়েকদিন পরেই। এ ছাড়া তিন চার দিন পরে একবার কাটনি যেতে হবে ব্যাণ্ডের হারমোনিয়ামের টিউন ঠিক করবার জন্য। কিন্তু মায়ের শরীর খারাপ যখন বলছো অবিলম্বে কাশী যাও।' বাবাকে বললাম, 'আপনি কাটনি থেকে ফিরে এলে এবং ধ্যানেশের মুসলমানী হয়ে যাবার পর কাশীতে যাব।' বাবা এ কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, যেহেতু বাবার বাড়িতে কাজ আছে বলে, সেই ভেবে কাশী যাওয়া স্থগিত করেছি। সুতরাং তার পুরস্কার পেলাম।

পরদিনই সকালে এবং রাত্রে বাবা যন্ত্র নিয়ে শেখালেন। সকালে ভৈঁরো রাগে তিনটি গৎ শেখালেন। রাত্রে পূর্বী শেখালেন। বাবা বললেন, 'ধ্রুপদ অঙ্গের পূর্বী কেউ বাজায় না। পূর্বীতে সকলেই পুরিয়া ধানেশ্রীর মধ্যে শুদ্ধ মধ্যম লাগিয়ে বাজায়। অবশ্য প্রচলিত পুরিয়া ধানেশ্রী সকলে যা বাজায়, সেনী ঘরাণার সঙ্গে মেলেনা। ধ্রুপদ অঙ্গের পূর্বী বেহাগের অঙ্গে হয়। এ ভাবে এ রাগটা সারা হিন্দুস্তানে কজনেই বা শিক্ষা করেছে বা বাজাতে জানে? আমার যুগে আমিই বাজাই, আর তোমার যুগে তুমিই বাজাবে যদি ঠিক শিক্ষা করতে পার। এ রাগ আমার উস্তাদ উজির খাঁ সাহেবের কাছে যেভাবে শুনেছি এবং শিখেছি, মনে হয়েছে তিনি বেহেস্তের ফরিস্তা।'

পরদিন বাবার বলাতেও শিখলাম না। মাথা ঘুরছে। আমার সরোদের চামড়া বসে গেছে। বাবা বললেন, 'তোমার চামড়াটা বদলে দেব।' একদিন পরে গুলগুল মহারাজকে নিয়ে কাটনি

গেলেন। কাশী যাবার নাম শুনলেই, বাবার কথায় বুঝতে পারি, মনে মনে ভাবেন বোধ হয় ফিরব না। কাটনি যাবার আগে বারবার একটা কথাই বললেন, 'বাজনা কয়েক বছরে হয় না। কাশির ল্যাংড়া আমের মত। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এ নটে শাক নয়, যে বীজ পুঁতলেই কয়েকদিনের মধ্যে শাক খাওয়া যায়।' বাবার কাটনি যাবার পরই মঙ্গল মিস্ত্রী ছাগলের চামড়া এনে হাজির করল। শুনলাম, গতকাল বাবা সাত টাকা মঙ্গল মিস্ত্রীকে দিয়ে বলেছেন ছাগলের চামড়া এনে পরিষ্কার করতে। যেহেতু আমার বাজনায় চামড়া বদলাতে হবে। মনে মনে অবাক হলাম। গতকালই বলেছেন, চামড়া বদলাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল যেখানে কাজ করে, সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছেন। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল।

বাবা ফিরে এলেন কাটনি থেকে। মৌলবীর সঙ্গে পরামর্শ করে দিন স্থির করলেন ধ্যানেশের মুসলমানীর জন্য। বাবা আমাকে বললেন, 'আলি আকবরকে টেলিগ্রাম করে দাও এই কাজে যেন আসে। বৌ থাকতে বাড়ির কথাও ভাবেনা।' বাবাকে বললাম, 'দু দিন পরে বাড়িতে কাজ, টেলিগ্রাম করলেও আলি আকবর আসবে কেমন করে?' বাবা বুঝলেন, বুঝলেও সেই এক কথা, 'বাড়ির বউ ছেলেদের কথা ভাবে না।'

বাবা আমার সরোদের চামড়া মঙ্গল মিস্ত্রীকে দিয়ে করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। বাবা ডাক্তার বাবুকে বললেন মুসলমানীর কথা। তিনি বললেন, 'আমি নিজে এই কাজ করে দেবো, কারণ যারা এই কাজ করে, তাদের ছুরি ভাল হয় না। পুরনো পন্থা আজকাল কেউ মানে না। আগে বাড়িতেই প্রসব হ'তো কিন্তু আজকাল হাসপাতালে হয়, কারণ কত বিপদ আসতে পারে।' কিন্তু বাবা প্রাচীন পন্থী। বাবা বললেন, 'হাজানকে (যারা অস্ত্রোপচার করে) বলে এসেছি।' ডাক্তারবাবু বাবাকে চেনেন। বললেন, 'ঠিক আছে, গরম জলে ধুয়ে যা ব্যবস্থা করবার আমি করে দেব, তার পর হাজান মুসলমানী করে দেবে।' বাবা খুশী হলেন।

আজ ষোলই ফেব্রুয়ারী। ডাক্তার গোবিন্দ সিং এবং তার সহযোগী, ডাক্তার দিওয়ান এলেন। অস্ত্রোপচারের ছুরি ডিসইনফেক্ট করা হোল। বাবা মনে মনে বিচলিত হয়েছেন; যদিও বাইরে প্রকাশ করছেন না। হাজান এল, অস্ত্রোপচার করল। বুঝলাম, ব্রাহ্মণদের যেমন পৈতে হয় পুরোহিত দিয়ে অল্প বয়সে, মুসলমানদের সেইরকম ছুন্নৎ হয় হাজানকে দিয়ে। ডাক্তার বাবুদের বাবা বাড়িতে খাওয়ালেন।

কথা ছিল পরদিন কাশী যাব, কিন্তু যাওয়া হলো না। ধ্যানেশের জ্বর এসে গেল। বাবা যদিও আমাকে যেতে বললেন, কিন্তু আমি গেলাম না। ধ্যানেশের ঘাটা শুকোতে সময় লাগবে। মায়েরও শরীর খারাপ হয়ে গেল। মৈহার এসে অবধি মাকে অসুখে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখিনি। বুঝলাম তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিলাম। রাত্রে ডাক্তার গোবিন্দ সিং ধ্যানেশ এবং মাকে দেখলেন। ডাক্তার বাবু বললেন, 'মায়ের জন্য কোন চিন্তা নাই। বদহজমের জন্য বমি এবং পেটে ব্যথা হচ্ছে।' ধ্যানেশের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলেন। বাবা ডাক্তারবাবুকে বারবার বলতে লাগলেন, 'বাবা আপনার মত ছেলে গর্বের বস্তু। সময়ে অসময়ে সর্বদাই এসে আপনি কত কষ্ট করেন।' ডাক্তার বাবুরও সঙ্গে সঙ্গে

জবাব, 'ছেলে হয়ে বাড়িতে কারোর অসুখ করলে, দেখব না। তারজন্য দিন রাত কোনটাই অসময় নয়।' ডাক্তার সিং সঙ্গীত রসিক লক্ষ্ণৌতে ডাক্তারী পড়বার সময় কিছুদিন তবলা বাজিয়েছিলেন। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'দুইটি জিনিষ সম্বন্ধে আমার মনে বহুদিন থেকে একটা কৌতুহল আছে।' বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বিষয়ে কৌতুহল?' বিনয়ের সঙ্গে ডাক্তার বললেন, 'আপনার কাছে বহুবার শুনেছি আপনাদের ছাত্রদের মধ্যে সব থেকে ভাল বাজায় আমার বোন অন্নপূর্ণা। আমার কৌতূহল, নিশ্চয়ই অল্প বয়সে সুরবাহার শুরু করেছিল। অত ছোট বয়সে সে অত বড় যন্ত্র কি করে বাজাত?'

বাবা হেসে বললেন, 'অন্নপূর্ণার সুরবাহার বাজাবার একটা ইতিহাস আছে। আমার আদরের মেয়ে জাহানারার মৃত্যুর পর ভেবেছিলাম অন্নপূর্ণাকে আমি গান শেখাব না। সে বহুদিন আগের ঘটনা। অন্নপূর্ণার বয়স তখন বোধহয় চার পাঁচ বৎসর। আলি আকবরকে চার বছর বয়স থেকে সরোদ শুরু করিয়েছি। আলি আকবর ছোটবেলায় সব ভুলে যেত বলে খুব মারতাম। একদিন একটা জিনিষ বারবার বলা সত্ত্বেও কিছুতেই ওঠাতে পারছিল না। না ওঠাতে পারার জন্য খুব মারলাম ডাণ্ডা দিয়ে। যখন বারবার বলা সত্ত্বেও ওঠাতে পারল না, রাগ করে বাজারে চলে গেলাম থলি নিয়ে। কিছুদূর যাবার পর মনে হল, রাগের চোটে টাকা নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি। সুতরাং বাড়ী ফিরতে হোল। বাড়ীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম যে জিনিষটা আলি আকবর ওঠাতে পারছিল না, সেই জিনিষটা গলায় গান গেয়ে ঠিক করছে। অবাক হয়ে বাড়ী ঢুকে দেখি অন্নপূর্ণা গান গেয়ে আলি আকবরকে বলছে, 'দাদা এইরকম ভাবে বাজাও।' আলি আকবর আমায় দেখতে পেয়েই বাজনা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু অন্নপূর্ণা যেহেতু পেছন করে দাঁড়িয়েছিলো, সেইজন্য সে তার দাদাকে বলছে, 'কি হল দাদা, বাজাও না? অন্নপূর্ণার বাঁশীর মত মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনে আমি অবাক। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে অন্নপূর্ণার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলাম। সেই দিনই তানপুরা ধরিয়ে সরগম শেখাবার আগে বললাম, আমার গুরুদেবকে প্রণাম করো। তারপর মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললাম, তোমাকে আমি শেখাব। ভেবেছিলাম তোমাকে আমি শিখাব না, কিন্তু তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে। তারপরে তাকে ছোট সেতার কিনে সেতার শেখাতে আরম্ভ করলাম। প্রায় দশবছর সেতার শেখাবার পর আমি সুরবাহার ধরালাম। অন্নপূর্ণার বিয়ের দুই বছর আগে সুরবাহার শুরু করিয়েছি। সঙ্গীতে আলাপ বাজানই সবচেয়ে কঠিন। সুরবাহারে এক সপ্তক মীড়ে বাজান যায়। তাই সুর বাহার ধরালাম। বিয়ের পর রবুকেও সুরবাহার করিয়েছিলাম, পাছে হীনমন্যতা জাগে এই ভয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরে এর পক্ষে এটা বজায় রাখা সম্ভব হোল না কারণ এ বড় কঠিন সাধনার বস্তু।' এক নাগাড়ে বাবা কথাগুলো বলে ডাক্তার বাবুকে হেসে বললেন, 'বাবা আপনার কৌতূহল ঠিকই। অত ছোট বয়সে অত বড় সুরবাহার কি করে বাজাবে?'

সব শুনবার পর ডাক্তার গোবিন্দ সিং বললেন, 'বাবা আমার একটা কৌতূহল যা ছিলো তা পূর্ণ হল। আমার আর একটা কৌতূহল তবলার তাল সম্বন্ধে। আপনি অনুমতি করলে আমার কৌতূহলের কথাটা বলি।' ডাক্তারবাবুর আসাতে বাবার চিন্তা দূর হয়েছে। মনটাও

প্রসন্ন। হাসতে হাসতে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাল সম্বন্ধে কি কৌতূহল আপনার?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'বহুদিন থেকে আমার মনে হয়েছে, তালের মধ্যে একতাল, ত্রিতাল, চৌতাল আছে, কিন্তু দোতাল নেই কেন?' এক কথা শুনে বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'বাবাজী আপনি লেখাপড়া করেছেন, চিন্তা করতে পারেন, আপনার এই কৌতূহল হয়েছে এতদিন বলেন নি কেন? 'দোতাল' আছে, কিন্তু কেউ বাজায় না।' এই কথা বলেই ঠেকা বলে হাতে তালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ডাক্তারবাবু বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। তিনি যাবার পর ভাবলাম তাঁর কৌতূহলের জন্য নূতন একটা তাল শিখলাম। এ যাবৎ বাবার কাছে অনেক তাল শিখেছি কিন্তু দোতালে তালি কি কঠিন ভাবে পড়ছে, না বুঝিয়ে দিলে সাধারণের পক্ষে তালি দেওয়া সহজ নয়।

জিজ্ঞাসু পাঠকের নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে, এরকম একটা মূল্যবান ঠেকার মাত্রা এবং তালি বিভাজন আমি বোঝাচ্ছি না কেন? সত্যি বলতে কি আমি নিজে অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা করিনি এবং নিজে কারোর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে শিক্ষা দান করি না। তাই জানাতে বা শেখাতে আমার কোন দ্বিধা থাকা উচিৎ নয় বা নেই। কিন্তু একটু বিরক্তি নিশ্চয়ই আছে। এবং সেই উষ্মা প্রচ্ছন্ন নয় প্রত্যক্ষ। হিন্দিতে একটা কথা আছে 'দুধকা জলা ছাঁচ ফুঁককর পীতা হয়।' অর্থাৎ যার একবার গরম দুধ খেতে গিয়ে মুখ পুড়েছে, সে ননীও ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খায়। আমার অবস্থাও তাই। তিন রকমের আপদ পেয়েছি আমার জীবনে। এ ঠিক কালিদাসের মত। আজ পর্যন্ত এই আপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আমার পুনরাবৃত্তিই ঘটে চলেছে।'

কথায় আছে ধান ভানতে শিবের গীত। কোথায় দোতাল আর কোথায় কালিদাস। পাঠক ভাবছেন, যোগাযোগের যোগসুত্রটার জট পাকিয়ে গিয়েছে বোধ হয়। না, আসলে তা নয়। এক ছিলেন রাজা। তাঁর সভায় ছিল তিন শ্রুতিধর পণ্ডিত। কিন্তু অসৎ। একজনের একবার, একজনের দুবার, একজনের তিনবার শুনলে মুখস্থ হত। কাব্যরসিক রাজা প্রচার করলেন, যে নূতন কাব্য শোনাবে তাকে তিনি সহস্র মুদ্রা দেবেন। দেশ দেশান্ত থেকে কবি আসেন, কাব্য পাঠ করেন। কাব্য পাঠ শোনা মাত্র যার একবার শুনলে মুখস্থ হয়, তিনি তো এটা আগেই শুনেছি বলে গড় গড় করে শুনিয়ে দেন। তার ফলে কাব্যটা দু'বার পাঠ হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয় সভাপণ্ডিত বলেন এ আমারও জানা। এবং তিনিও গড়গড় করে শুনিয়ে দেন। তার ফলে তিনবার পাঠ। তৃতীয় দুষ্ট পণ্ডিতের তিনবার শুনে মুখস্থ হওয়ার জন্য তিনিও হেসে বলেন, আমিও জানি এবং শুনিয়েও দেন। এর ফল হল, কোন কবি আর নব্য কাব্য পাঠের জন্য পুরষ্কার পান না। সরল রাজাও শঠের শাঠ্য বুঝতে পারেন না। এই রকমই এক হতাশ কবি রাজ দরবার থেকে লাঞ্ছিত হয়ে অশ্রুসজল চোখে দেশান্তরী হচ্ছিলেন। ভাগ্য ভাল। পড়বি তো পড় কালিদাসের সামনে। মহাকবি সব বৃত্তান্ত শুনলেন। মনে একটু দুষ্টুমি এবং রসিকতার ইচ্ছা জাগল। উদ্দেশ্য ছিল শ্রুতিধরদের একটু মেরামত করা। অচিরাৎ দুটি পংক্তি রচনা করলেন। সরস এবং সুন্দর অলঙ্কৃত শব্দে। অর্থ না বুঝে শুধু রচনাটা শুনলেও নবীনত্বের আস্বাদন পাওয়া যায়। তার অন্তর্নিহিত অর্থটা হল রাম বান। বাংলায় তর্জমা করলে অনেকটাই এই রকম দাঁড়ায়, 'হে রাজা তুমি একজন অসাধারণ শূরবীর। তোমার

আত্মমর্যাদা বোধ, বীরত্ব, পিতৃভক্তি, সততা প্রভৃতি অসাধারণ গুণ আছে। একদা তোমার পিতা আমার কাছে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ করেছিলেন, এবং উক্ত ঋণ পরিশোধিত হবার আগে তাঁর স্বর্গলাভ হয়। তুমি তার যোগ্য পুত্র সুতরাং তুমি সেই ঋণ পরিশোধ কর। তাছাড়া এ কথাটা তোমার সভাস্থ সকলেই জানেন।' অতঃপর কালিদাস সেই অসহায় কবিকে নিয়ে পৌঁছলেন রাজসভায়। নিজের পরিচয় না দিয়ে বললেন, 'আমি একজন সাধারণ কবি। হে রাজা আমার এই কবিতাটি শ্রবণ করুন।' কবিতাটি অপূর্ব রূপক এবং উপমাদ্বারা রচিত। রাজা শুনে প্রসন্ন হলেন। কিন্তু শ্রুতিধরদের অবস্থা করুণ। যদি বলেন রচনা জানা অর্থাৎ পুরনো, তা হলে রাজার পিতা ঋণ নিয়েছিলেন স্বীকার করতে হয়। সে অবস্থায় সুদে আসলে লক্ষাধিক। আর যদি ঋণকে অস্বীকার করার জন্য বলতে হয় জানিনা, তা হলে রচনাটার নব্যতা প্রমাণিত হবে। তা হলেও লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। তিন জনেই গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। রাজা কিংকর্তব্য বিমূঢ়। তখন কালিদাস নিজের পরিচয় দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা রাজাকে বললেন। রাজাও বুঝলেন কত যথার্থ গুণী কবি এই অসৎ কবিদের জন্য লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েছেন। রাজা তখন তাঁর অসৎ শ্রুতিধরদের মস্তক মুণ্ডন করে জলীয় দধিতে স্নান করিয়ে বৃষভবাহনে দেশের সীমানা পার করালেন।

গল্পটা বললাম কেন? এ তাবৎ ভারতবর্ষের অবস্থাটা তাই। যাকেই যা কিছু বলি সেই আগের থেকে জানে। আমার ইংরেজী বইতে লিখলাম বাবার সুর মন্ত্র। আমার এক গুরুভাই আকাশবাণীর সাক্ষাৎকারে বললেন, 'এটা উনি আমাকে শিখিয়েছেন।' কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার। একটা শব্দের প্রিন্টিং ওমিশন ছিল। তিনি কোলকাতায় আকাশবাণীর মাইকের যে কথাটা ওমিটেড ছিল বলে বাদ দিয়েই বাকীটুকু আউড়ে গেলেন। আবার গল্পের ভূত চেপেছে। লোভ সামলাতে পারছি না। তবে তার আগে এখানে আমার ইরোজী বইতে উল্লিখিত সুর মন্ত্রটির, একটী শব্দ যেটুকু ছাপা হয়নি সেটুকু বাদ রেখেই বাকীটা যথাযথ লিখে দিলাম। সম্পূর্ণ সুরমন্ত্রটি এইসব অসৎ সবজান্তাদের আয়ত্তের বাইরে যাতে থাকে সেইজন্য এর মন্ত্রটি অসম্পূর্ণ রাখাহল।

সুরমন্ত্র

পগ পরে সাধু শরণন ধরে ধ্যান।
রাম শ্যাম মাধো নাম স্বরূপ গিরিধারী ওঁ।।

এবারে গল্পটি বলা যাক। একটি কম লেখা-পড়া করা ছেলে হোটেলে পেল চাকরি। কাজ আগন্তুকদের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলা আর অর্ডার বুক করা। ভাবল, বসতে বলার ইংরেজীটা কি জানলে ভাল হ'তো। বাড়িতে ছিল বাংলা থেকে ইংরাজী একটা বিবর্ণ ডিক্সনারি। খুঁজতে খুঁজতে পেল শব্দটি। লেখা আছে বসুন। আসলে ছিল 'রসুন'। 'র' এর বিন্দুটা ঝাপসা হয়ে গেছে। পরের দিন সেজে গুজে টাই লাগিয়ে গেল হোটেলে। প্রথম গ্রাহকের দিকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলল, 'গারলিক স্যার।' ফলে চাকরি গেল ছেলেটির।

আমার সেই গুরুভাইটিরও গ্যারলিক স্যার। পকডিউ ছন্দের ব্যাপারে রবিশঙ্কর। সারা ভারতে অসংখ্য তবলাবাদক পেয়েছি যারা আদৌ জানেন না তালটা, কিন্তু তাদের ঠেকাটা

বললে, 'গারলিক স্যার' ভঙ্গিমায় বলেন ' হেঁ হেঁ এতো আমাদের ঘরের জিনিষ।' কত রাগ আর কত গৎ এ দেশেতে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' করে ঘরের জিনিষ হয়। একটাই জিনিষ বুঝি, 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' সত্য স্বীকার করলে যে কেউ ছোট হয় না, এই কথাটি পেচককুলদের বোঝাতে পারি না।

রাত্রে বাবা নিজের হাতে লেখা সঙ্গীতের খাতা দেখছিলেন। হঠাৎ কি হোল বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'যদিও এখন তোমার শিখবার সময় হয়নি, তবুও এই কানাড়া গৎটা শিখে রাখ। প্রথমে দরবারী কানাড়া শিখতে হবে। তারপর অষ্টাদশ কানাড়া শিখতে হবে। দরবারী কানাড়ার গান্ধার, ধৈবতের শ্রুতি এবং আন্দোলন শিক্ষা করে কান ঠিক করতে হবে। জীবনের শেষেও এই শ্রুতি ঠিক মত আসতে চায় না। সকলেই তো দরবারী কানাড়া গায় এবং বাজায়। সকলেই দরবারীর বদলে করবারী করে অর্থাৎ বেশি বালু, কম সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি করে।' এই ধরনের রসিকতা করে বাবা নানা কথা বলতেন। এই কথাগুলির মধ্যে তাৎপর্য থাকত। বাবা নিজের হাতে লেখা খাতা দেখে, আমাকে শেখালেন 'মুদ্রিকি কানাড়া।' বাবা নিজের খাতা দেখালেন। খাতায় গান লেখা ছিল। দ্রুৎ গৎটি বোল দিয়ে শেখালেন। অদ্ভুত বন্দেজ গৎটির। শেখাবার পর চলে এলাম নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'আশিসের জন্য এই গৎটি লিখেছি। হয়ত পরে ভুলে যাব।' বাংলাদেশে দণ্ডমাত্রিক এবং আকারমাত্রিক দুই প্রকার মতে 'নোটেশন' লেখা হয়। বাবা দণ্ডমাত্রিক মতেই নোটেশন লিখতেন। বাংলাদেশ ছাড়া, অন্য জায়গায় বেশির ভাগ ভাতখণ্ডেজী এবং বিষ্ণুদিগম্বরজীর মতে লেখা হয়। যেহেতু বাবা প্রথম শিক্ষা কোলকাতায় করেছিলেন সেইজন্য দণ্ডমাত্রিক মতেই নোটেশন লিখতেন। তিনি সব রকম নোটেশনই জানতেন। বাবা গৎটি খাতায় লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখ তো বানানটা ঠিক লিখেছি কিনা?' দেখলাম মুখে 'মুদ্রিকি' বলছেন অথচ লিখেছেন 'মুদরিকি'। তাঁকে বললাম, 'দ' এ রফলা লিখতে হবে। তিনি বললেন, 'লেখা পড়া তো করিনি তুমিই বানানটা ঠিক করে দাও।' ঠিক করে দিলাম। আজ এই কথা লিখতে গিয়ে সব কথা জলের মত মনের মধ্যে ভাসছে। বাবা লেখাপড়া না করলেও, এর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাবার নিজের হাতে লেখা, সব খাতা আলমারীর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আলি আকবর যদি বাবার সেই খাতাটা দেখেন তা হলে দেখবেন লেখা আছে, আমার নাতি আশিসের জন্য এই গৎটি লিখিলাম। এ ছাড়া বানান শুদ্ধ করে লেখা হয়েছে, আমার হাত দিয়ে।

কাশী রওনা হবার আগে বাবা বললেন, 'শরীর ঠিক হলেই সঙ্গে সঙ্গে মৈহারে ফিরে আসবে। কাশীতে গিয়ে কণ্ঠর সঙ্গে দেখা করবে সে আমার সঙ্গে তবলা বাজায়।'

কাশী পৌঁছে দেখলাম মার স্মল পক্স হয়েছে। এর ওষুধ কিছু নেই। আমার শরীরের অবস্থা শুনে আশুতোষ ওষুধ দিলেন। গুল্লুজীর সঙ্গে দেখা হোল। পরদিনই বাবাকে সব সমাচার জানিয়ে চিঠি দিলাম।

মৈহারে যাবার আগে রংপুরের জমিদার সীতেশ চন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সরোদ বাদক উস্তাদ আমীর খাঁর কাছে শিখেছিলেন। তাঁর কাছে একটা মোটা খাতায় বহু রাগ লেখা ছিল। সীতেশ বাবুর উদার চিত্তের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর বাজনা

কয়েকবার শুনেছি। কিন্তু তাঁর বাজনায় আমি আকৃষ্ট হইনি। তবে এককালে জমিদার ছিলেন, শখ ছিল, উস্তাদকে টাকা দিয়েছেন এবং সখের বাজনা বাজাতেন। তাঁর ছেলে রাজেশ মৈত্র শিখত সেই সময়। আমিও বাজাতাম। এ সব মৈহার যাবার আগের কথা। দেশ বিভাগের পর সব জমিদারী ছেড়ে কাশীতে এসে বসবাস করছিলেন। মৈহার থেকে এলেই, রাজেশকে রিয়াজের পদ্ধতি বলতাম। সীতেশ বাবুও খুসী হতেন পদ্ধতি দেখে। এ পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না। মৈহারে যাবার আগে কেউ বাজনাই শোনাতে চাইত না। এই পরিবেশে সীতেশ বাবুর ঔদার্যে মুগ্ধ হতাম। এই কারণেই তাঁর ছেলেকে শেখাতাম। আমাকে গুরুর মত মান্য করত। সরোদ না নিয়ে আসার ফলে সীতেশ বাবুর সরোদে বাজাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু নিজের হাতের জবা না থাকাতে বাজাতে অসুবিধা হ'তো। সরোদ বা সেতারে জবা বা মিজরাপ নিজের না হলে, পরের জবা বা মিজরাপ দিয়ে বাজান কঠিন। আসলে বাজাতে বাজাতে অভ্যাস হয়ে যায় নিজের জবায়। পরের জবায় বাজান কঠিন বলে বাজাই নি। তবে কাশীতে যখনই এসেছি বরাবর শিখিয়েছি।

মহন্তজীর সঙ্গে রোজ দেখা হ'তো। সঙ্কটমোচন এবং তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। মৈহার থেকে কাশীতে এলেই একটা জিনিষ আমার চোখে ঠেকত। কাশীর গাইয়ে বাজিয়েদের প্রায় সকলকেই দেখেছি নিজের হামবড়াই ভাব। এখানে এই রকম বাজিয়েছি, ওখানে এমন বাজিয়েছি যে লোকে হাততালি দিয়েছে। এক কথায় যাকে বলে নিজের ঢাক নিজে পেটান। অথচ বাবার এখানে এ জিনিষ একেবারেই দেখিনি। বাবা তো বাইরে থেকে বাজিয়ে এসে বলতেন, 'বুড়ো বয়সে ভিক্ষার জন্য যাই।' বাজনা সম্বন্ধে আলোচনা কেউ করলে বলতেন, 'ও কি বাজনা, অসুরের লড়াই।' আলি আকবর রবিশঙ্করেরও নাম হয়েছে। কনফারেন্সে সব জায়গায় বাজাচ্ছে। এদের কাছেও কখনও হামবড়াই ভাব দেখিনি। মৈহারে গিয়ে অবধি, একবারই জিজ্ঞাসা করাতে, রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরকে দিল্লীর প্রোগাম সম্বন্ধে দুটো কথাই শুনেছি। কিন্তু কাশীতে যাকেই দেখি, সেই দেখি কালে খাঁ। সকলকেই দেখি সব থেকে বড় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। কাশীতে গিয়েই আশুতোষের দোকানে একদিন গিয়েছি হঠাৎ দেখি লুঙ্গি পরা, কিষণ এল। যেহেতু আশুতোষের গুরুপুত্র সুতরাং খাতির করতে দেখলাম। কিষণকে অনেকে তখন মালিক বলে ডাকত। পরে হঠাৎ দেখলাম নামের সঙ্গে মহারাজ যোগ করেছে। এদের পদবী হল মিশ্র। কিষণকে লুঙ্গি পরা দেখে বিসদৃশ লাগছিল। স্পষ্ট বললাম, 'লুঙ্গি পরে কেউ বাইরে বেরোয়?' আমার কথা শুনে কিষাণ কিছু বলল না। কিষণের চলে যাবার পর আশুতোষ আমাকে বললেন, 'মুখের উপর, এই রকম মনের কথা বলা ভাল নয়। এতে শত্রুতা বাড়ে।' অবশ্য এ কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু কি করব ছোটবেলা থেকে আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে মুখের উপরই স্পষ্ট কথা বলা। আড়ালে নিন্দা করা আর সামনে প্রশংসা করাই হল দুনিয়াদারী। কিন্তু আমার অভ্যাসটা মৈহারে গিয়ে বাবার কাছে দেখেছি। বাবার বৈষ্ণব বিনয় এবং স্পষ্ট কথা বলা, কাশীতে এসে দেখতে পাই না। বাবা বলেছিলেন বলে আশুতোষের সঙ্গে কণ্ঠে মহারাজের বাড়ি একদিন গেলাম। কাশীর গায়ক বাদকদের কথক বলে। কয়েক পুরুষ ধরে যারা

গানবাজনা করে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ কবীর চৌরাতেই থাকে। সকলকেই কথক সম্প্রদায় বলে। অনেককেই চিনি কিন্তু কখনও এই পাড়াতে আগে আসিনি। অনেককে দেখলাম, পানের দোকানের সামনে লুঙ্গি এবং গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ জলসায় বাজাবার সময় এদের বেশভূষা করতে দেখেছি। কণ্ঠে মহারাজও এর ব্যতিক্রম নয়। বাড়িতে দেখলাম একটা লেংটি পরে কাঁধে গামছা নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। অত্যন্ত সহজ সরল আত্মভোলা। সঙ্গীত ছাড়া পৃথিবীর কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই। আমি বাবার কাছে শিখছি শুনে খুব আনন্দিত হলেন। মনে মনে অবাক হচ্ছি, এই কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গেই মৈহারে যাবার আগে বাজিয়েছিলাম। তাঁর একটা কথা শুনে আমার হাসি পেল। আমাকে বললেন, 'তোমার উস্তাদ একটা জিনিষ অমাকে খাবার জন্য বলেছেন। খাবারটা খুব পৌষ্টিক। তার নামটা আমার ঠিক মনে থাকে না। নাম মনে থাকে না বলে, মনে রাখাবার সহজ উপায় আমাকে বলেছেন 'উবালোটিন'। কথাটা শুনে আমার হাসি পেল। বুঝলাম বাবা ওভালটিন খাবার জন্য তাঁকে বলেছেন। যে হেতু তাঁর নাম মনে থাকে না তাই সহজ করে বলেছেন উবালো (অর্থাৎ গরম করা) টিন। উবালো হল হিন্দি কথা। কণ্ঠে মহারাজ কথাটা ঠিক মনে রেখেছেন। তাঁকে সাধু প্রকৃতির লোক বলে মনে হোল। কিন্তু কিষণের কথাবলা এবং দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে বলে রহন সহন, চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকল।

বাবা একটি পত্র লিখলেন,

মাইহার

২৬-২-৫৩

কল্যানবর

শ্রীমান তুমার পত্রের উত্তর দিয়েছি পেয়ে থাকিবে তুমার মায়ের অবস্তা কিরূপ তিনি কেমন আছেন আমাকে জানাবে। এখানের অবস্তা বিশেষ ভাল নয় ধ্যানিসের ঘা এখনও সুখায় নাই ছয়টা ইংজেকসন দেওয়া হয়েছে এরপর কি হয় ভগবান জানেন। ছুট ডাক্তারই ইংজেকাসন করেছে, বড় ডাক্তার মাত্র বাতলি সাজে কিছুই না বিশেষ ধ্যানিসের ধিগে লক্ষ নেই। দুই একদিন দেশের বুধহয় বাহিরেই আমায় যাইতে হবে মনে হয়।

ঐদ্য ছুট ডাক্তারের ছেলে হয়েছে তিনি আছেন ব্যস্ত ডাক্তার আসে নাই পট্যি খুলিবার জন্য, বাতের পা নিয়ে হেটে ২ পাগলের মতন প্রায় হয়ে গিয়েছি। আর যে কি অধৃষ্টে আছে দয়াময় জানেন। আমার জন্য বাতের একটা ঔষধ একজন দিয়েছে ঔষধের নাম পাঠাইলেম, এই ঔষধের ২৫০ সত গুলি কাসীতে কি মূল্যে পাওয়া যায় জেনে সত্তর সিঘ্র জানালে ভাল হবে আর সকলে ভাল আছে। তুমাদের কুশল কামনা করি শ্রীমানকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছি এখন তারনহার জগকরতার বিপদের সাথি। এখন এক ভগবান ছারা কেউ নেই ইতি বাবা আলাউদ্দিন।

পুনঃ বড় ডাক্তার সাহেব তুমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন তুমার মাতা কেমন আছেন তুমি পত্রে যা লিখেছো সব তিনিকে জানালাম, হামের বিষয়ে বল্যেন, ডাক্তার বল্যেন তুমার টিকা নিবার জন্য। যেদিন হতে শীতলা মাতা তুমাদের বাটিতে গেছেন, সেইদিন থেকে ২১ দিন

পর শেষ করে মাইহার আসিবার জন্য এর পূর্ব্বে এসনা। ঔছধের কি মূল্য হবে জেনে আমাকে জানাবে এখানে ঔষধের মূল্য ৩০্ আড়াইশগুলির মূল্য চায়। এজন্য তুমাকে জানালেম ঔষধ পাঠাবে না। বড় ডাক্তার বলেন ছাৎনা হতে আনিয়ে দিবে।

WANDER DUPLO-B Tablets 250

কল্যানবর শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কাশী

চিঠি পেয়ে বুঝলাম ধ্যানেশের জন্য তিনি কিরূপ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মৈহারে আমি না থাকাতে তাঁকেই ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে। আসলে বাবাকে আমি বোঝাতাম। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁর চিঠি পড়ে আমার যাওয়া উচিত, কিন্তু মায়ের স্মল পক্স অর্থাৎ হাম হয়েছে লেখায় বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন যে দিন থেকে হাম হয়েছে তার থেকে একুশ দিন কাটিয়েই মৈহারে যেতে। আমার অবস্থা মৈহারে গেলেও বিপদ, আবার না গেলেও বিপদ। বাবার কুসংস্কার আছে। একুশ দিন না কাটিয়ে যদি যাই, তাহলে তিনি বলবেন মৈহারের বাড়ির জন্য অমঙ্গল। সুতরাং যাত্রার একটা ভাল দিন গুল্লুজীকে দিয়ে দেখিয়ে যাবার দিন স্থির করলাম। এগার দিন পর মৈহার পৌঁছব। বাবার চিঠির উত্তর দিলাম। লিখলাম কিছু নিয়ে যেতে হবে কিনা।

জ্যোতিষ বিজ্ঞানের একটা অঙ্গ। তবে এ বিষয়ে জ্ঞাতা খুব কম লোকই দেখেছি। কাশীতে তিনজন পারদর্শী লোকের বিচারে আমার আস্থা ছিল। এই তিনজনের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন ছিল, 'বাবার কাছে আমার শিক্ষা হবে কিনা।' এমন তো নয়, বাবার যে মেজাজ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। কাশীর দু'জন জ্যোতিষীকে এক নামে সকলেই চেনে। গুল্লুজীর স্ত্রী এক বড় তান্ত্রিকের কন্যা ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র নিজের বাবার কাছেই শিখেছিলেন। গুল্লুজীও নিজের স্ত্রীর কাছে এই বিদ্যা শিখেছিলেন। এ কথা আগেই লেখিছি। গুল্লুজীর স্ত্রীই যাত্রার দিন ঠিক করে দিয়েছিলেন মৈহারে যাবার আগে। সুতরাং গুল্লুজী এবং তাঁর স্ত্রী এবারেও বিচার করে যাত্রার দিন ঠিক করে দিলেন। কুষ্টিও দেখলেন। বললেন, 'সঙ্গীত হতেই হবে, শেষ জীবনে মহাপুরুষের যোগ আছে। আমার বাবার সমসাময়িক যা পাঠক বললেন, 'চার বছর পর্যন্ত কোন ভয় নাই। শিক্ষা হবে, গুরু কৃপা থাকবে। যার শেষ ভাল তার সব ভাল। চার বছরের পর খারাপ যোগ আছে। তবে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।' মনে সান্ত্বনা পেলাম চার বছর পর্যন্ত কোন ভয় নেই। কাশীর আর এক জ্যোতিষী প্রতি বছর পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। তাঁর নাম বরেন জ্যোতিষী। তাঁর কাছেও আশ্বাস পেলাম। নিজের মনে মনে বলি, মৈহারে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে ছয় মাসে উস্তাদ হয়ে চলে আসব, কিন্তু এখন তো বুঝছি কোন তিমিরে ছিলাম। চোখের সামনে এখন কেবল অন্ধকারই দেখি।

ছোটবেলায় আমার এক মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, 'বন্ধুত্ব করবে তার সঙ্গে যে তোমার থেকে বয়সে বড় এবং পারদর্শী।' এ কথা ছাড়া বহু উপদেশ মাষ্টারমশাই দিয়েছিলেন। আমি সে কথাগুলো আজও ভুলিনি। মাষ্টারমশাই এর আদেশ অনুসারে মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, বলদেও উপাধ্যায়, গুল্লুজী, কবিরাজ আশুতোষ এবং মৈহারে আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর

আমার থেকে সকলেই বড়। কিন্তু সকলের সঙ্গেই আমার বন্ধুর মত ব্যবহার ছিল। কাশীতে চারজনই আমার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। সকলেই এক কথা বললেন, 'বাবার মত মহাপুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি থাকা ভাগ্যের কথা। সব কষ্ট সহ্য করে শিক্ষা এবং সাধনা করলে ফল নিশ্চয়ই পাবে।' বাবার চিঠি পেলাম।

মাইহার

৫.৩.৫৩

কল্যানবর

শ্রীমান তুমার পত্র এই মাত্র পাইলাম, তুমার মায়ের শরীর ভালর ধিকে জেনে আশস্ত হলেম ভগবান তিনির মঙ্গল করুন। ঔষধ এখানেই আছে ও পেয়েছি তুমায় আনিতে হবে না। তোমার দুরূন মাঝে, ২-৩ বৎসর সংসার কর্ম্মে কিছু অবহেলা করার দুরূন বদঐভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, এই চুটে এবার হুসিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছি এখন আর কারূর সহায়তার উপর নির্ভর করিব না। পুত্র হয়ে যে পিতার সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত, সেই পিতার মতন দুর্ভ্যাঘা জগতে কয়জন, আমি ছারা বুধ হয় কেহ নাই। পয়গম্বরের কথা আপনারই সম্বল পরের বল কিছু না তুমার যে সময় ইচ্ছা আসিবে আমার অবশ্য কিছু আনতে হবে না সব আছে। মাত্র নতুন পঞ্জিকা একটি পাও যদি আনিতে পার। অত্র মঙ্গল তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

আলাউদ্দিন বাবা

পুন : কল্য কাটনি গিয়েছিলেম হারমনিয়াম মেরামতের বিল চুকাইতে। সেখানে ৬০্ মূল্যের গায়ের চাদর নতুন হারিয়ে এসেছি, ঐদ্য আবার যাইতেছি ব্যাণ্ডের পাইপের জন্য লুহাতরঙ্গ তৈয়ার করার জন্য কোম্পানিতে কাটনি, ফরমাস দিয়ে এসেছিলাম সেগুলির স্বর ভাল হয় নাই। ঐদ্য কাটনি তালাশ করে যদি পাই বেঠিক নচেৎ জব্বলপুর যাইব রেলওয়েতে তালাস করিব ভাল ইষ্টিলের পাইপ পাই কি না। বেণ্ডের বেটারা নিমকহারাম এদের দ্বারায় কিছু হয় না। সব আমায় করিতে হয়।

বাবা

বুঝলাম এবার না গেলে বিপদ।

আজ এগারই মার্চ। আমার অগ্রজ হীরেন ভট্টাচার্যের দুপুরে প্রথম সন্তান হোল এবং পরের দিনই আমি মৈহার প্রস্থান করলাম। মৈহারে রাত্রে পৌঁছবার, পরের দিন সকালে বাবা আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। কাশীর সব সমাচার শুনবার পর বললেন, 'আরো কিছুদিন কাশীতে থেকে শরীর সুস্থ করে তবে আসা উচিত ছিল।' আমি তো বাবার কথার অর্থ বুঝি। তাই চুপ করে রইলাম। কাশী থেকে যে পঞ্জিকা বেরোয় নিয়ে গিয়েছিলাম মৈহারে। বাবাকে নূতন পঞ্জিকা দিলাম। বাবা পঞ্জিকা দেখে খুশী হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কত দাম জিজ্ঞাসা করলেন। পয়সা নেব না বলাতে বাবা বললেন, 'তুমি জান না, কোন ছাত্রের কাছে আমি কোন জিনিষ বিনা মূল্যে নিই না। আমি কারো কাছে কর্জদার হতে চাই না। সুতরাং পয়সা না নিলে পঞ্জিকা ফেলে দেব। এখন কি তুমি টাকা কামাও?' উত্তরে বললাম, 'আমার দাদা পয়সা দিয়ে পঞ্জিকা কিনে দিয়েছেন। তা ছাড়া আপনি যখন আমাকে ছেলে বলেন, তা হলে

কেন নেবেন না? এ সত্ত্বেও যদি পয়সা দিতে চান তা হলে পঞ্জিকা ছিঁড়ে ফেলে দেব।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আরে, কি কর। ঠিক আছে তুমি হলে শিষ্যের মধ্যে ব্যতিক্রম, তাই দাও পঞ্জিকা।' বাবাকে পঞ্জিকার বর্ষফল, মাসিক ফল সব দেখিয়ে ঘরে চলে এলাম। বাবার সংস্পর্শে যারা এসেছে বিশেষ করে ছাত্র, তারা কখনও বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে এ ধরনের কথা বলা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। কিন্তু সত্য এবং ন্যায্য কথা বাবার সামনে কয়েকবার আমি বলেছি, যার মধ্যে এই ঘটনা একটি। বলবার সময় গলার আওয়াজ এবং রাগটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। অন্য কেউ হলে বাবা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সত্য কথা বলার মর্যাদা বাবা বরাবর দিয়েছেন, যদিও রেগে গেছেন এবং নানা কথা বলেছেন। দুপুরে মার কাছে শুনলাম, বাবা মাকে বলেছেন, 'যতীন আমার থেকেও রাগী।' ক্ষণিকের জন্য সব পরিস্থিতি ভুলে রেগে বাবাকে কয়েকবার স্পষ্ট কথা বলেছি বটে, তবে পরমুহূর্তেই সম্বিত ফিরে আসার পর বীরভক্ত হনুমান হয়ে গেছি।

কয়েকদিন বাজনা বাজাই নি। গরমকাল বাইরে শুয়েছি। সুতরাং অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাজনা বাজাবার অসুবিধা হোল না। এখন আর রোজ রাত্রে সিনেমা দেখতে যাব না। কে জানে কবে বাবা ডেকে বসবেন ঠিক নেই। বাজাতে না পারলেই বকুনি খেতে হবে। যা ভেবেছিলাম তাই হোল। পরের দিন শিক্ষার জন্য বাবা ডাকলেন। বাবাকে বললাম, 'কয়েকদিন বাজনা বন্ধ ছিল। কিছুদিন বাজাবার পর শিখব।' বাবা এ কথা শুনে খুশীই হলেন। বললেন, 'বাজনা এতদিন বন্ধ ছিল, সারারাত বাইরে বাজাও। তুমি তো আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী বলে সব জায়গায় পরিচিত হয়ে গিয়েছ। এখন যদি না বাজাতে পার, তাহলে দু'জনেরই বদনাম।' কয়েক দিন পরই বাবা রেওয়া গেলেন। বাবা বাড়িতে থাকলে নিজেকে জেলের কয়েদী বলে মনে হ'তো। তিনি বাড়ির বাইরে কোথাও গেলে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হ'তো। বাবা যাবার পর অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে খাতা দিলেন। খাতা খুলে দেখি, আহির ভৈঁরো এবং শুদ্ধ সারং-এর চলন, আলাপ, জোড় লিখে দিয়েছেন। একদিন বাবার অবর্তমানে সকালে এবং দুপুরে শেখালেন। বাবার কাছে যখন এই রাগ শিখব যাতে বকুনি না খাই তার জন্যই এই অগ্রিম লিখে দেওয়া।

বাবার মাইনে এবং ব্যাণ্ড পার্টির সকলের মাইনে বাড়াবার জন্য চিফ সেক্রেটারিকে বাবার জবানীতে লিখেছিলাম। তার জন্যই বাবাকে রেওয়া যেতে হয়েছিল। বাবাকে যখন এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম তার একটা কারণ ছিল। সেই সময় সরকারী চাকরি যাঁরা করেন, তাঁদের মাইনে, টি.এ., ডি.এ. সব বেড়েছিল। অথচ ব্যাণ্ডের ছেলেদের এবং বাবার মাইনে বাড়েনি। সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে জোর করে বাবাকে সই করিয়ে দরখাস্ত করেছিলাম। বাবা এইসব বুঝতেন না। বাবার কথা হল, যা পাচ্ছি তাই অনেক। বেশি টাকার দরকার নাই। কিন্তু আবেদনের ফলে সকলের মাইনে বেড়েছে। বাবা মৈহারে ফিরে এলেন। মাইনে বেড়েছে সুতরাং মেজাজ ভালই। তা সত্ত্বেও বললেন, 'ব্যাণ্ডের ছেলেদের মাইনে বেড়েছে, এবারে তাদের লাটসাহেবী বাড়বে। বেশি টাকার স্বপ্ন দেখা ভাল নয়। সাধারণ খাওয়া পরার অর্থ পেলেই ভাল।' বাবার টাকার প্রতি সর্বদাই এই মনোভাব দেখেছি।

রবিশঙ্করের চিঠি এল। রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর সন্ধ্যার ট্রেনে আসবেন এবং দুদিন থেকে অন্নপূর্ণা দেবী এবং শুভকে নিয়ে দিল্লী যাবেন। আজ হঠাৎ বাবা রাগে ফেটে পড়লেন। বাবার রাগের কারণ শুনে বুঝতে পারলাম, কোলকাতা থেকে এসে অবধি কেন এত গম্ভীর ছিলেন। এতদিনে মনে মনে রাগ চেপে রেখেছিলেন, যা বাবার স্বভাব বিরুদ্ধ, কিন্তু আজ রাগের কারণ কিছুটা বুঝলাম। বাবাকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না, কিন্তু যতটুকু বলেন তার উপর নিজের মতামত অকপটে বলি।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যেহেতু রবিশঙ্করের বন্ধু সেই জন্য বাবা, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রসঙ্গে গেনু বলতেন। হঠাৎ বাবা চিৎকার করে বললেন, 'আরে, আরে, আরে! রবুই হোল যত নষ্টের মূল। তুমি তো জান না, গেনু রবুর বন্ধু। গেনু আমার নামে কেস করেছিল, তার ছাতার সম্মান নষ্ট করেছি। ঠেকা বাজাতে না পারলে, বলব না। হীরুবাবু আমাকে বলেছিলেন এ কেসে আমার ভাবনার কিছু নাই। গেনুরই বে-ইজ্জতি হবে। কিন্তু রবু নিজের বন্ধু বলে মিটমাট করিয়ে দিল নিজের মতলবে। রবুর প্রোগ্রাম গেনু ঠিক করে দেয়। 'ঝঙ্কার' বলে একটা সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে গেনু বাবু কর্তা ব্যক্তি। রবিশঙ্করের প্রোগ্রাম রাখে। সেইজন্য গেনুকে চটাতে চায় না। এ সব রবুর কারসাজি।' এক নাগাড়ে বাবা এই কথা বলে চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চিঠিতে আগে যতটা জানবার জেনেছি। কোলকাতা থেকে আসবার পর এই বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করেছি। সেই সময় বাবা একাই কথা বলেছেন, রবু সব মিটমাট করে দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত তিন মাস আগে হয়েছে। প্রথমে বাবা চিঠিতে লিখেছিলেন ঘটনাটির কথা। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলেন সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে। মৈহারে এসেও বলেছিলেন, রবু সব মিটমাট করে দিয়েছে। কিন্তু বাবার কথাতে বুঝলাম, যে ভাবে মিটমাট করে দিয়েছে তা বাবার মনঃপূত হয়নি। দীর্ঘ তিনমাস বাবার কি মানসিক যন্ত্রণা গেছে বুঝতে পারছি। অন্নপূর্ণা দেবীর কথা মনে হোল। বলেছিলেন, 'ছোট থেকে দেখছি কোন রাগ হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন। কোন কথা চেপে রাখতে পারেন না। কিন্তু বাবার গম্ভীর ভাব দেখে মনে হচ্ছে বাবা কিছু চেপে যাচ্ছেন।' বাবার কথা শুনে একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। মাথাটা গরম হয়ে গেল। বাবাকে বললাম, 'আপনাকে তো আমিও বলেছিলাম জ্ঞানপ্রকাশ যে কেস করেছেন তার জন্য তিনিই লোকসমাজে হেয় হবেন। হীরু গাঙ্গুলিও আপনাকে সেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু রবিশঙ্কর মিটমাট করিয়ে দিয়েছে আপনি বললেন। রবিশঙ্কর কেন মিটমাট করাতে গেল? আপনি যে কারণ বললেন, তা হলে তো এ কথাই বলতে হবে যে রবিশঙ্কর অন্যায় করেছে। বাবা কিন্তু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিজের মনে তামাক খেতে লাগলেন। আমার মনে হোল বাবার পুঞ্জীভূত রাগ দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। রবিশঙ্করের উপর আমার এই দ্বিতীয়বার ঘৃণা হলো। প্রথমবার ঘৃণা হয়েছিল যখন শুনেছিলাম অন্নপূর্ণাদেবীকে বলছিলেন, 'যতীনকে তুমি খুব শেখাচ্ছ।' সে সময়ে ঘৃণা হয়েছিল আমার সামনে কত শুভানুধ্যায়ীর মত কথা বলে, অথচ পেছনে অন্য রকম কথা। কিন্তু এবারে আসলে কি মিটমাট হল রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করব। দিনরাত বাবার কথাগুলোই আমার মাথায় ঘুরতে লাগল।

সাতাশে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় স্টেশনে গেলাম। আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর এলেন। আমাকে দেখেই আলি আকবর একটা কমলালেবু দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবার মেজাজ কি রকম?' উত্তরে বললাম, 'গেলেই বুঝতে পারবেন।' আলি আকবর প্রত্যেকবার যা বলেন এ বারেও সেই কথাই বললেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে মেজাজ ঠিক নেই।' আমার বুকের ভিতর তো প্যালপিটেশন হচ্ছে।' রবিশঙ্করকে ক্লান্ত মনে হোল। কারণ জানতে চাইলে বলল, 'কাল সারারাত আলি ভাই এবং আমি ডুয়েট বাজিয়ে এসেছি বলে শরীরটা খারাপ দেখাচ্ছে।' এ কথা বলার পরই জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার মেজাজ কি ভাল নয়?' আলি আকবরকে যখন বলেছি বাবার মেজাজ কেমন বাড়িতে গেলেই দেখতে পাবেন, এ কথা শুনেই রবিশঙ্কর বুঝেছে কিছু একটা হয়েছে। রবিশঙ্করকেও সেই একই জবাব দিলাম। মাথার মধ্যে তখন একটাই প্রশ্ন, 'কেন এবং কি ভেবে কেসটা নিজের থেকে মেটাতে গেল?' কিন্তু সে কথা বাড়িতে গিয়ে নিরিবিলিতে জিজ্ঞেস করতে হবে।

আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর যখন মৈহারে এসেছে, বাবাকে প্রণাম করতে যাবার আগে আমি গিয়ে প্রণাম করে এদের আগমন বার্তা জানিয়েছি। বাবার যা কিছু অভিযোগ, আমাকে বলতেন পুত্রকে এবং জামাতাকে বলতে। উত্তরে এঁরা যা বলতেন, বাবাকে গিয়ে বলতাম। বাবা কখনও খেতে বসে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। আমি দীর্ঘ সাত বছর থাকাকালীন এই রকম চলেছে। স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছি আবার স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছি। সুতরাং এবারেও বাবা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন? কিন্তু এবারে একদিন দপ করে জ্বলে উঠে মুখে চাবি এঁটে দিয়েছেন। মিটমাট কি ভাবে রবিশঙ্কর করিয়েছিলেন, সে কথা বাবা কেন আমাকে বলেন নি, সে কথা বুঝেছিলাম অনেক পরে।

আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়ি এসে দেখি বাবা নাতিদের সামনে বসে আছেন। নাতিরা তখন গান গাইছে। বাড়িতে এসেই বাবাকে প্রণাম করলাম। পেছন পেছন আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর এসে প্রণাম করলেন। বাবা কেবল নিজের হাতটা উঠিয়ে নিজের কপালে লাগালেন। আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর এলে বাবার পুলকিতভাব বাইরে প্রকাশ না করলেও বুঝতে পারি। কিন্তু এবারেও তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পেলাম না। বাবা কেবল বললেন, 'তোমার মাকে বল ওদের চা দিতে।' জিনিষপত্র নিয়ে দু'জনেই চুপচাপ ওপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে, দুজনেই নিচে নেমে হাত মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে চুপটি করে বাবার কাছে এসে বসল, যেখানে বাবা নাতিদের শেখাচ্ছেন। সেই সময় ইমন রাগে চতুরঙ্গ গান শুরু হয়েছে। গান শেষ হবার সঙ্গে ২ সুলতালে একটা গান শুরু হল। বাবা বললেন, 'চতুরঙ্গ তো শুনলে, এবার সুলতালে কেমন বন্দিস গান শোন।' বাবা মাথাটা উঁচু করে কথাটা নিক্ষেপ করলেন আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের দিকে না তাকিয়ে। কিন্তু মুখের দিকে না চেয়ে কথা বলাটা আমার কাছে বিসদৃশ ঠেকল। ভাবলাম আজ একটা অঘটন কিছু না ঘটে। আসা অবধি বাবার এই ধরনের আপ্যায়ন দেখিনি। বাবা আজ আশিসকে বাজাতে না বলে ছুটি দিয়ে দিলেন। বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর একটা কথায় আমি অবাক হলাম। তিনি যখন বললেন, 'চতুরঙ্গ এবং সুলতালে নিবদ্ধ গানটি কেমন

শোন।' এ কথার অর্থ আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর নিশ্চই এই দুইটি জিনিষ শেখেনি। আমার এত দিন ধারণা ছিল দুই দিকপাল বাবার কাছে সব শিখেছে। কিন্তু তখন কি জানতাম বাবা ছিলেন সমুদ্র। তাঁর এক চতুর্থাংশও কেউ শিখতে পারে নি। রবিশঙ্কর আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'এ দুইটি গান তুমি শিখেছ?' বললাম শুনে শুনে শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমার উত্তর শুনে মনে হল রবিশঙ্করের ব্যাপারটা মনঃপূত হল না। রবিশঙ্করের মুখে একটা ঈর্ষার ভাব দেখলাম। রবিশঙ্কর আমার কাছ দুটো গান শুনতে চাইল। আমি সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলাম। রবিশঙ্কর আমার প্রশংসা করল। রবিশঙ্করের ভিতর এবং বাহির বোঝা সম্ভব নয়।

রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণাদেবী এবং শুভকে নিয়ে দিল্লী চলে যাবেন। সুতরাং কথা বলবার সময় কম পাব ভেবেই সোজা উপরে উঠে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে দ্বন্দ আমার মাথায় ঘুরছে তার সমাধানের এই উপযুক্ত সময়। উপরে গিয়ে দেখি আলি আকবর রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবী রয়েছেন। দেখলাম সকলেরই মুখ গম্ভীর। আমাকে দেখে যেভাবে রবিশঙ্কর সম্বর্দ্ধনা জানায় আজ তা হল না। আমি সোজাসুজি রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কেস করেছিলেন? আবার সেই ব্যাপারটার মিটমাটই বা হোল কেমন করে?' রবিশঙ্কর বেশ জোর দিয়েই বলল, 'কোলকাতায় জ্ঞানদার একটা সম্মান আছে। বাবার এ রকম করা উচিৎ হয়নি।' একথা শুনে গলার আওয়াজ দ্বিগুণ করে বললাম, 'কি করা উচিৎ হয়নি?' এই কথা বলেই চিঠিতে যা লিখেছিলেন এবং বাবার আসার পর যে কথা হয়েছিল, সব কথা বলে বললাম, 'এতে বাবার কি দোষ দেখলেন? আপনার জ্ঞানদার সম্মান আছে আর বাবার সম্মান নেই। আপনার মুখে জ্ঞানদা বলতে লালা ঝরে, তিনি কি বাজান আমি কখনও শুনি নি। কিন্তু ভারতবর্ষের বড় বড় তবলাবাদকের কয়েকজনকে তো নিজের চোখেই দেখেছি, সাধারণ ত্রিতাল গৎ এর সম ধরতে পারেনা। ঠেকা বলে দিলে, কাউকে কি অপমান করা বলে? এছাড়া আপনার বন্ধু বলে স্নেহবশতঃ তার সঙ্গে বাজিয়েছেন। আপনার কি রকম বন্ধু, যার এতবড় ঔদ্ধত্য যে বাবার নামে কেস করে? যাক, একটা কথা বলুন তো, কি করে মিটমাট হয়ে গেল? বাবার কাছে সব শুনলেও কথাটা শুনিনি।' হঠাৎ রবিশঙ্করের আওয়াজটা যেন ক্ষীণ হল। কেবল হাঁ হাঁ করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিল। খাবারের ডাক পড়ল। কিন্তু আমি মিটমাটের সূত্রটা জানতে পারলাম না।

খাবার সময় বাবা কেবল একটা কথাই বললেন, 'কি খাবে?' এ বাবার এক নূতন রূপ দেখলাম। কি খাবের অর্থটা কি? ভাত না রুটি? এ রকম প্রশ্নতো কখনই করেন না। মৈহারে এসে অবধি দেখেছি দিনে ভাত এবং রাত্রে রুটি। সুতরাং 'কি খাবের' অর্থটা কি? বাবা এই কথা বলেই চুপ করে গেলেন। আলিআকবর এবং রবিশঙ্করও কোন কথা বললেন না। বাবার এই মৌন ভাব দেখে অবাক হলাম। বাবা বরাবরই আলি আকবরকে তিনটে প্রশ্ন ছাড়া কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। রবিশঙ্করের সঙ্গে দুচারটে কথা বলেন। কিন্তু এবারে একেবারে কোন কথাই নেই। যাক খাওয়া হয়ে যাবার পর যে যার আপন ঘরে চলে গেল। আমিও বাইরে শোবার জন্য চলে এলাম। মনটায় যে প্রশ্ন ছিল তার সমাধান না পাওয়ায় মনটা বিচলিত হয়েই রইল।

পর দিন রবিশঙ্করকে বললাম, 'বাবা ভীষণ রেগে আছেন।' রবিশঙ্করও স্বীকার করল, কিন্তু কি করে সমাধান হল সে কথাটা এড়িয়ে গেল। এবারে আলি আকবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই কেসটার সমাধান কি করে হল, আপনি কি জানেন?' উত্তরে আলি আকবর একটি কথাই বললেন, 'রবিশঙ্করই করেছে যা করবার।' তার মানে সমাধান রবিশঙ্করই করেছে। বাবা সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা করেন নি। আলি আকবরের উত্তরে মনে মনে রাগই হল। তাঁর যেন কোন কর্তব্যই নেই। রবিশঙ্কর যা করবার করবে। তাঁর কোন সত্ত্বাই নেই। এ ব্যাপারটা এই ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনার পর বাবার আজ্ঞায় যখন ইংরেজী বইটি লিখবার জন্য নানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, সেই সময় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে প্রশ্নটা করবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে কিছু লিখবেন না।' সে অনুরোধ রক্ষা করলেও ইংরেজি বইতে লিখেছিলাম, 'বাবা যে সময়ে গৎ বাজাবার সময়ে আদ্ধার ঠেকার জন্য তবলাবাদককে বলতেন, তার পরিবর্তে ত্রিতালে ঠেকা বাজানর দরুণ গৎএর আমেজ নষ্ট হয়ে যেত। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছিলাম কণ্ঠে মহারাজকে। এই আদ্ধা ঠেকায় বাবা খুব আনন্দ পেতেন।' কিন্তু যেদিন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই বিষয়ে স্বকপোল কল্পিত ঘটনার রূপটা পড়লাম তার প্রতিবাদ করে মাসিক পত্রিকায় চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রতিবাদ পত্রটি ছাপা হল না। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নানা ভুল তথ্য অনেকে লিখেছেন। এই কারণে আজ বইটা লিখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

আলিআকবরের কাছ থেকেও যখন মিটমাট কি করে হল জানতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। বিকেলে ছেলেদের নিয়ে রোজ বেড়াতে যাই এক ঘণ্টার জন্য। ছেলেরাও খেলে এবং আমিও আলাদা খেলি। কিন্তু আজ খেলা হল না। আলিআকবর, রবিশঙ্কর এবং আমি ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে গেলাম। বাড়ি থেকে কিছুটা যাবার পরই রবিশঙ্কর আলি আকবরকে বলল, 'আলু ভাই, আজ থেকে চেষ্টা করা যাক ইংরেজীতে কথা বলা। বিদেশে তো বটেই, ভারতবর্ষেও বড় বড় জায়গায় সকলেই ইংরেজীতে কথা বলে। নিজেকে বড়ই লজ্জিত হতে হয়। সুতরাং চেষ্টা করলে কোন রকমে কাজ তো চালাতে পারব।' এই কথা বলার পরই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছি কিনা?' রবিশঙ্করের এই কথা শুনে বললাম, 'কথাটা তো ঠিকই। তবে এর জন্য কয়েকটা জিনিষ দরকার। বড় বড় শহরে, ইংরেজীতে কথাবার্তা বলা শেখানর ক্লাস হয়। কয়েক মাস সেখানে যেতে পারেন। এ ছাড়া দুটো কাজ করতে হবে। ইংরেজী বই পড়ুন, না বুঝলে একটা ইংরেজী থেকে বাংলা ডিক্সনারী কিনুন। এ ছাড়া প্রতিটি ভার্ব-এর প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার টেন্স এর বারটা করে ফর্ম মুখস্ত করুন। তা ছাড়া বিদেশে তো আপনারা যাচ্ছেন এবং যাবেন, লোকের সঙ্গে বিদেশে কথা বললেই শিক্ষা হয়ে যাবে। একটা পানওয়ালা যে কিছুই পড়েনি, সে যদি বিদেশে কয়েকটা বছর থাকে সুন্দর ইংরেজী বলতে পারে। আসলে এটা অভ্যাসের ব্যাপার।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'আমি ইংরেজী বই না বুঝলেও পড়ি। এ অভ্যাসটা করেছি। বাই দ্য ওয়ে লেট আস স্টার্ট টু স্পিক ইন ইংলিশ ফ্রম টুডে।' এই কথা

বলেই একজনের নাম করে আমাকে রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াট,—ইস ডুয়িং নাউ এ ডেজ?' উত্তরে বললাম, 'হি ইস মেকিং বিসনেস অব কাইটস।' 'কাইটস' কথাটা শুনেই রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠল, 'কি বললে?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল দেখে বললাম, 'কাইটস' মানে ঘুড়ি তাও জানেন না?' দুজনেই লজ্জিত হল। কিন্তু এ কথা ঠিক, রবিশঙ্কর ইচ্ছাটা যা প্রকাশ করেছিল, চেষ্টা দ্বারা পরবর্তীকালে জলসায় শ্রোতাদের মধ্যে বিদেশী থাকায়, সংক্ষেপে ইংরেজীতে বলত কি রাগ বাজাচ্ছে এবং কোন তালে। আলি আকবর বরাবর কম কথা বলে। সিগারেট খেতে খেতে কেবল ইয়েস, নো বলেই চালাতে দেখেছি। তবে পরে যখন আলি আকবরকে ১৯৭২ সনে দেখি তখন কাজ চালাবার মত ইংরেজী বলতে শুনেছি।

এবারে বাড়িতে ফেরার পালা। হঠাৎ মনে হোল দেখি রবিশঙ্কর জানে কিনা দোতাল। কথাটা অন্য ভাবে বললাম। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলুন তো একতাল, ত্রিতাল, চৌতাল আছে, কিন্তু দোতাল বলে কোন তাল নেই কেন? রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এ সব তালি হিসাবে নাম হয়েছে কিন্তু দোতাল বলে কোন তাল হয়নি।' রবিশঙ্কর জবাব দেবার পর, ডাক্তার গোবিন্দ সিং এর প্রশ্নটা বললাম এবং বাবার উত্তরটাও বললাম। রবিশঙ্কর আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেল। রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, 'পকডিউ করছ না তো?' উত্তরে বললাম, 'ব্যাপারটা সত্য।' এ কথা বলেই ঠেকাটা বললাম। রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে তালটা বুঝল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, বাবার কাছে এত সামগ্রী আছে যা কেউ জানে না। যে যতটা পেরেছে শিখেছে।

বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার পরও কিন্তু বাবার ভাব দেখে মনে হোল, কোন আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। পরের দিন সকালে বাবা আমাকে বললেন, 'তুমি এলাহাবাদ গিয়ে দিল্লীর গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে এস। জিনিষ পত্র আছে, তা ছাড়া অন্নপূর্ণার যন্ত্র আছে সুতরাং তুমি গেলে এদের সুবিধা হবে।' আনন্দে রাজী হলাম। ভাবলাম ট্রেনে আমার মনে যে কৌতূহলটা আছে তার নিরসন করব। রবিশঙ্কর কি ভাবে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ব্যাপারটা মিটমাট করেছে। আজ বাবাও সকালে ব্যাণ্ড নিয়ে রেওয়া রওনা হবেন, কেন না ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ রেওয়া আসছেন। বাবা সকালে যাবার আগেই অন্নপূর্ণা দেবী প্রণাম করতেই ছোটছেলের মত কেঁদে ফেললেন। এই ফাঁকে রবিশঙ্কর এবং শুভ প্রণাম করল। বাবা শুভকে বললেন, 'মার কাছে খুব মন দিয়ে শিখো এবং বাজিও।' রবিশঙ্করকে বাবা কিছুই বললেন না। গাড়ী এসে গিয়েছিল, বাবা রেওয়া চলে গেলেন।

এবারে অন্নপূর্ণাদেবীকে একবছর দুইমাস পেয়েছি। এ কথাটা এখন বুঝি, এখনও শিক্ষার বহু কিছু আছে। ভগবানই জানেন কত দিনে বাজাতে পারব। বাবা যাবার পর উপরে গেলাম জিনিষপত্র গুছিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু উপরে গিয়ে দেখলাম বুদ্ধাকে দিয়ে প্রায় সব জিনিষই অন্নপূর্ণা দেবী ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সাধারণ কয়েকটা জিনিষে সাহায্য করে সকলে খেতে বসে গেলাম।

ট্রেনে উঠলাম ফার্স্ট ক্লাসে। মৈহারের পরই সাতনা। সাতনাতে বাবার ধর্মজামাই সমগ্র

পরিবার সহ দেখা করতে এলেন। এ যেন শকুন্তলার বিদায়। মৈহারে মা এবং জুবেদা খাতুন কাঁদলেন। সাতনাতেও বাবার ধর্মমেয়ে অর্থাৎ সনতের মা, অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। গাড়ী ছাড়ার পর এই কামরার মধ্যে অন্য কোন যাত্রী না থাকার ফলে শয়নের ব্যবস্থা হোল। আমি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথাটা ওঠান মাত্রই অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'জ্ঞানবাবু যেমন লোক, তার সম্বন্ধে আলোচনা করার কিছুই নেই।' এই কথা শুনে রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি জ্ঞানদা না বলে জ্ঞানবাবু বললে!' সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'সকলকে দাদা বলা যায় না।' এই কথা শুনে রবিশঙ্কর চুপ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আমার কাছে অশোভন ঠেকল। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চোখ রুমালে ঢেকে শুলেন কেন?' রবিশঙ্কর বলল, 'চোখে ধূলা পড়লে কষ্ট হয়, সেইজন্য ধুলোর মধ্যে যেতে হলেই চোখে মুখে রুমাল দিয়ে রাখি।' অবাক হলাম, কেননা নাক ঢাকা দিয়ে ঘুমোনো, আমি কল্পনাই করতে পারি না। শুয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙ্গল যখন যমুনার পুলের উপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। এলাহাবাদ স্টেশনে সুপ্রভাত পালকে দেখলাম। তার বাড়িতে সকলে গেলাম। রাত্রের ট্রেনে ওদের উঠিয়ে দিলাম। অন্নপূর্ণাদেবী আমায় ছাবিবশ টাকা দিলেন ট্রেন খরচার জন্য। বাবা আমাকে ট্রেনের ভাড়া দিয়েছিলেন বলাতে, বললেন, 'সংসারে যখন লাগবে তখন খরচা করবেন।' অবাক হলাম। অন্নপূর্ণা দেবীর সব দিকে খেয়াল আছে।

৩২

মৈহারে ফিরে বাবা আমাকে দেখে বললেন, 'আরে আরে তুমি দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলে না কেন?' বাবার কথা শুনে আমি হতভম্ব। বাবা তো এ নির্দেশ দেন নি। বাবাকে বললাম, 'খালি ট্রেনে গেছেন সুতরাং চিন্তার কিছু নাই।' বাবাকে অত্যন্ত ম্রিয়মান মনে হোল। তিনি বললেন, 'আমার মা চলে গেল।' তাঁর গলা ভারী, কন্যার প্রতি স্নেহ আগেও দেখেছি এবারেও দেখলাম। আলি আকবরের সঙ্গে সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ গল্প হল। পরের দিন জুবেদা খাতুন ঘর পরিষ্কার করতে লাগলেন। আলি আকবর রসিকতা করে বলল, 'রোজ কি এই রকম পরিষ্কার কর? মনে হয় আমাকে দেখিয়ে বোঝাতে চাইছে কতই না কাজ কর।' উত্তরে জুবেদা খাতুন বললেন, 'খোঁটা দিয়ে কথা বলতে তোমার জুড়ি নাই।' মৈহারে, বাবার আসবার পর গুলগুলজীর কাছে শুনলাম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবাকে দেখেই গলা জড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছেন। সকলেই অবাক হয়েছে। কিন্তু বাবা এসব কথা কখনও বলেন না।

পরের দিন জব্বলপুর থেকে একটি ছেলে এল। ছেলেটির নাম ভাণ্ডারকর। টেলিগ্রাম বিভাগে কেরানীর চাকরি করে। বাবার কাছে বাঁশি শিখবে বলে এসেছে। লেখাপড়া জানা ছেলে দেখলে বাবা খুসী হন। কিন্তু বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। একদিন হলে চলতে পারে। এক্ষেত্রেও তাই হোল। বাবা ছেলেটিকে সাধনার জন্য কিছু পাল্‌টা বললেন। দম কি করে বাড়বে সে কথাও বোঝালেন। এর পর আমাকে বললেন, 'কালই বিদায় কর।' এই অপ্রিয় কাজটা আমাকেই করতে হল। বেচারা চলে গেল।

এবারে ছয়দিন থাকবার পর আলি আকবর চলে গেল। বাবা মনে মনে খুসী হয়েছেন।

গতকাল খবর এসেছে, চিফ সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, তহশীলদার সস্ত্রীক সকালে এসে, মৈহারের ব্যাণ্ড শুনবেন এবং সারদা দেবী দর্শন করে চলে যাবেন। বাবা সকালেই ব্যাণ্ড পার্টির ছেলেদের আজ বাড়িতে ডেকেছেন। পান, সিগারেট এবং নাস্তা সব ব্যবস্থা করেছেন। সকাল থেকেই বাবা তৈরি হয়ে বসে আছেন। সকালে কোন সময়ে অফিসাররা আসবে জানায় নি, যার জন্য বাবার মেজাজ গরম হচ্ছে। মাঝে মাঝেই বলছেন, 'আরে আরে কি রকম সব লোক, সময় জানায় নি কখন আসবে। এত বড় অফিসার অথচ সময়ের মূল্য বোঝে না।'

দিব্য চোখে দেখলাম ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সময় জানায় নি এই রক্ষে। সময় জানিয়ে যদি, সে যেই হোক না কেন সময় মত না আসেন, তা হলে বাবা কটমট করে তাকিয়ে বলবেন, 'কটা বেজেছে?' দেরীর কারণ দেখালে বলবেন, 'আরে আরে অচরজ কি বাত হয়। সময় কা মূল্য নহিঁ সমজতা। জানতে হয় হমারে বাংলা মে এক কহাবত হয়, যার কথার ঠিক নাই তার বাবার ঠিক নাই।' এ কথা শুনে হিন্দুস্থানী লোকেরা বুঝতে পারতেন না বাবার হিন্দী মেশানো বাংলা। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'নহি সমঝা? জিসকা জুবান কি ঠিক নহিঁ হয় উসকা বাপ কি ঠিক নহিঁ হয়। অচরজ কি বাত হয়, হম তো কিসি কি হিয়া পেসাব করনে কো ভি নহি যাতা, হমারে ইহা ক্যো কোউ আতা হয়? ইহ পূজা কি জগহ হয়, সাধনা করতে হয়, দিল্লগী কি জগহ নহী হয়। বুরা না মানে এইসা আদমী দেখনে সে মিজাজ খারাপ হো যাতা। লেকিন আপকো আনেমে বহুত খুঁস হুঁ। আপ অপনে উপর মত সোচিয়ে।' কথাটা অন্ততঃ তিন চার বার বলবেন। যে আসত তার অবস্থা তখন খারাপ। আগন্তুক বাঙ্গালী হলে বলতেন, 'কটা বেজেছে?' ভদ্রলোক কোন কারণ দেখিয়ে বলতেন, যার ফলে দেরী হয়েছে। এ কথা শুনে বাবা বলতেন, 'এইসানা, এইসানা। বাংলাতে একটা কথা আছে, জানেন না, যার কথার ঠিক নাই, তার বাবার ঠিক নাই। আশ্চর্য হই আমি তো কারো বাড়ি পেসাব করতেও যাই না, অথচ আমার এখানে কেন লোকে আসে? আমার এই স্থান পূজা এবং সাধনার স্থান। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। নিজের গায়ে মাখবেন না। আপনার জন্য বলিনি। আপনার আসাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি কিন্তু এমন সব লোক আছে যারা সময়ের মূল্য বোঝে না।' এ ঘটনা আগেও হয়েছে।

বাবার ঘন ঘন পায়চারি দেখে বললাম, 'যাঁরা আসছেন, কয়েক জায়গায় দেখা করে এখানে আসবেন। সেইজন্য সময় বলেন নি। উচ্চপদস্থ অফিসার আসছেন, মৈহারের থানা এবং কয়েক জায়গায় সব দেখে আসবেন সুতরাং দয়া করে কিছু বলবেন না। ঠিক সময়টা বলা অসুবিধাজনক তাই ওঁরা বলেন নি।'

বাবা বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝলেন, তবুও আমার প্রতি রেগে গিয়ে বললেন, 'যত বড় অফিছারই হোক আর লাট সাহেবই হোক, সময়ের মূল্য বোঝে না? তিন চারটে গাড়ী বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চিফ সেক্রেটারী এবং ডি.এম. দুজনেই বাঙ্গালী। ডি.এম. পূর্ব পরিচিত এবং চিফ সেক্রেটারীকেও বাবা রেওয়াতে দেখেছেন। যে হেতু দুজনেই বাঙ্গালী এবং বাড়িতে এসেই বাবা বলে সম্বোধন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাবার লৌকিকতা শুরু হয়ে গেল। বাড়ির গাছের তাজা কমলা এবং মোসম্বির রস খেয়ে সকলেই খুব খুসী হলেন।

ব্যাণ্ডের বাজনার পর, বাবার বাজনা শুনতে চাইলেন। বাবা আশিসকে নিয়ে বাজালেন। তারপর চিফ সেক্রেটারী এবং ডি.এম. ধন্যবাদ জানিয়ে সারদা দেবীর দর্শন করতে চলে গেলেন। যাবার পর বাবা আমাকে বললেন, 'আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিল। আসার সময়টা কেন বলে নি? তোমার কথায় কিছু বললাম না। না বললে এদের শিক্ষা হবে না।' যাক বাবা কিছু বলেন নি, বাঁচা গেল।

এর পর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক ভাবে কাটতে লাগল। এখন রোজ সকাল, দুপুর এবং রাত্রে বাবা শেখাতে লাগলেন। সকালে ভৈরব তো আছেই তার সঙ্গে রামকেলী শুরু হয়েছে। দুপুরে গৌড় সারং, ভীমপলাসী এবং কাফী। সন্ধ্যায় ইমন তো আছেই, এছাড়া পুরিয়া, পুরিয়া ধ্যানেশ্রী এবং পুরিয়া কল্যাণ শুরু হয়েছে। কোন দিন বকলেই পরে বলবেন, 'এই বকুনিগুলিই কাজ দেবে। এই বকুনি খেয়ে তিন চার বার রবু পালিয়েছিল, আবার এসেছে। তারপর শিখেছে বলেই সব জায়গায় বাজাচ্ছে। সুতরাং ধৈর্য ধরে শিখতে হবে। আসল কথায় বন্ধু ব্যাজার হয়। এক একটা জিনিষ কত কষ্ট করে আমি পেয়েছি অথচ এত সহজে পেয়েও না করতে পারলে দুর্ভাগা ছাড়া আর কি বলব।'

আশিস ও আমাকে এক সঙ্গে শেখালেন সকলে। বাজনা শেখাবার পর বললেন, 'ভাব পৈদা কর। মিষ্টি কমলার রস খেলে কত ভাল লাগে। মিষ্টি আমের রস, দুধ দিয়ে যেমন ভাল লাগে সেই রকম সঙ্গীতের মধ্যেও রস পৈদা কর।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো লেখাপড়া করেছ। নবরস অর্থাৎ নয় রকমের রস হয়, পড়েছ?' মাথা নেড়ে বললাম, 'জানি।' আমি জানি বুঝতে পেরে বাবা আবার বললেন, 'বাবা আমি তো লেখাপড়া করিনি। শাস্ত্রে নয় রকমের রস আছে। কিন্তু বাজাবার সময় আমি তিনটি রসের কথা ভেবে বাজাই। প্রথম করুণ, ভক্তি রস ভেবে আলাপ বাজাই। তারপর জোড়ের মধ্যে শৃঙ্গার রস এবং বীর রসের কথা ভেবেই বাজাই।' আশিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রসের কথা তুই কি বুঝবি? তাহলেও বুঝবার চেষ্টা কর। আলাপ বাজাবার সময় করুণ রস বা ভক্তি রসের কথা ভাবতে হবে। ভক্তি তো বুঝতে পারবি না। করুণ রস কাকে বলে? মনে কর তুই যাকে খুব ভালবাসিস, বাবা, দিদা বাইরে আছে। তোর ভাল লাগছে না, মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিস, ভাবছিস বাবা কোথায় তুমি, দিদা কোথায় তুমি, তোমরা না থাকাতে ভাল লাগছে না। মনে যখন দুঃখ পাস সেই সময় মনটা আনচান করে। সেই দুঃখ ভাবটা নিয়ে আলাপ বাজাবি। আর শৃঙ্গার রসটা কি? মনে কর ঘুড়ি ওড়াবার জন্য লাটাই , সুতো, ঘুড়ি কিনবার আবদার করে দিদাকে বলিস না, ও দিদা, কিছু পয়সা দাও না ঘুড়ি কিনব। তখন দিদা পয়সা না দিলে, কি রকম মন ভুলিয়ে বার বার বলিস, দাওনা দিদা, দাওনা দিদা, পয়সা দিয়ে খুড়ি কিনব। এটাকে বলে শৃঙ্গার রস। জোড়ে মীড় দিয়ে লপেট অঙ্গে দুই তিন সুর দিয়ে যখন বাজাবি, এই আবদার ভাবটা নিয়ে বাজাবি। আর বীর রস? মনে কর তোর দিদা পয়সা দিল না, বার বার বলা সত্ত্বেও, তখন কি রকম রাগ হয়। রাগ করে তখন বলিস না, দরকার, নাই তোমার পয়সা। বাজনায় বোল দিয়ে ছুটতান পাঁচ ছয়টা সুর দিয়ে যেমন বাজাস কিংবা বোল দিয়ে তার পরণের কাজ বাজাস, তাকেই বীর রস বলে। এই কথা বলে বাবা ছুটি দিলেন। যে যার ঘরে চলে এলাম। সবে এসে নিজের ঘরে বাজনা রেখেছি,

বাবা আমার নাম ধরে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, বাবা জানালার দিকে মুখ করে বসে, বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার উপস্থিতি বুঝেই বললেন, 'বসো।' আমি না বসে বললাম, 'কেন ডেকেছেন?' বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই যেমন বসেছিলেন, সেই রকম বসেই বললেন 'আরে বস বস।' অবাক হলাম। বসতে বলছেন অথচ উল্টোদিকে মুখ করে বসে আছেন। সোফাতে বসলাম। আমার দিকে না তাকিয়ে উল্টো দিকে মুখ করেই বললেন, 'আশিসকে কি নব রস বোঝাব? ওর বুদ্ধিই বা কতটুকু হয়েছে। যা বললাম, এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। তুমি তো লেখাপড়া করেছ, তুমি বুঝবে। নয় রকমের রসের মধ্যে তিনটি রসই আমি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। সেই ভেবেই বাজাই। আলাপ যখন বাজাবে তখন করুণ রস পৈদা করতে হবে। যখন আলাপ বাজাবে সেই সময় করুণ রসের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। যদি পার তাহলে দেখবে নিজেও কাঁদছ এবং যে বাজনা শুনছে, সেও কাঁদছে। কি করলে এই করুণ রসের মধ্যে ডোবা যায়? মনে মনে ভগবান কিংবা নিজের প্রিয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী তো পড়েছ, কালী মায়ের কাছে কি রকম মাথা ঠুকে ঠুকে আকুলি বিকুলি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'আজকের দিনটাও চলে গেল তবুও তোমার দর্শন পেলাম না।' এই রকম ভাবে মা সারদার কাছে করুণভাবে প্রার্থনা করবে, কত বড় দুর্ভাগা আমি, ঠিক মত 'সা' সুরটাও লাগাতে পারছি না, তুমি কৃপা না করলে এ জীবন বৃথা। এই আকুতি বিকুতিকেই করুণ রস বলে। আলাপ বাজাবার সময় নিজেকে দীনহীন ভেবে দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে কৃপা চাইছ এই ভাব নিয়ে বাজাবে। এ ছাড়া নিজের প্রিয়তমাকে ভেবেও এই করুণ রসের পৈদা করতে পার। তুমি তো লেখাপড়া করেছ, মেঘদূত পড়নি?' বাবার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। বাবার প্রশ্ন শুনে বললাম, 'পড়েছি।' বাবা মুখ ঘুরিয়ে এখনও বসে বলে যাচ্ছেন। পড়েছি শুনে বাবা বললেন, 'তা হলে তো জান, যক্ষ নিজের প্রিয়ার বিচ্ছেদে কি করুণভাবে নিজেকে কষ্ট এবং যন্ত্রণার কথা, মেঘকে দূত করে নিজের প্রিয়ার কাছে মনের কথা জানাত। প্রিয়া বিরহে কাতর হয়ে যে যন্ত্রণা, সেই ভাব নিয়ে আলাপ বাজাবে। তা হলে করুণ রস পৈদা হবে।

আর শৃঙ্গার রস? যেমন ধর নূতন বিবাহ করে নিজের পত্নীকে কাছে পাবার জন্য কি রকম ভাব হয়? কাছে পাবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করে তাকে ডাকে। এই ডাকবার সময়, যখন জোড় বাজাবে মীড় দিয়ে লপেটের কাজ করবে, সেই সময় এই ভাবটি মনে রেখে বাজালে শৃঙ্গার ভাব পৈদা হবে।

আর বীর রস বাজাবার সময় কি ভাববে? মনে কর নিজের প্রিয়তমাকে বার বার ডাকছ, অথচ সে আসছে না। না আসবার কারণ বলছে, 'বাড়িতে সব গুরুজনরা রয়েছে, কি করে আসব?' এ কথার যুক্তি তোমার মাথায় ঢুকছে না। তুমি অধীর হয়ে আছ। সুতরাং রাগ করে যখন বলবে, 'ঠিক আছে দরকার নাই তোমার আসবার।' রাগের চোটে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে। এই ভাবটা বীর রস। যখন তারপরনে নানা বোল দিয়ে ঝালা বাজাবে, কিংবা বোল দিয়ে পাঁচ ছয়টা সুর দিয়ে ছুট তান দিয়ে তেহাই বাজাবে, তখন যে ভাবটা বললাম, রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে এই ভাব নিয়ে বাজাবে। তা হলে বীর রস বুঝতে পারবে।

নিজের প্রিয়া কিংবা ভগবানকে ভেবে এই তিনটি রস সৃষ্টি করবে। তা হলে দেখবে বাজনার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বুঝলে কিছু?' উত্তরে বললাম, 'বুঝেছি।' এই কথা শুনে বাবা বললেন, 'যাও, তোমার মাকে বল একটু তামাকের কল্কেটা বদলে দিয়ে যাক।' বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে নূতন কল্কে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে দিয়ে এলাম। দেখলাম বাবা তখনও উল্টো মুখ করে বসে আছে। তামাক দিয়েছি বলেই নিজের ঘরে চলে এলাম। ঘরে এসে মনে মনে ভাবলাম, বাবা কত বড় ভাবুক এবং কত গভীর চিন্তা করেন। কিন্তু বাবার মুখে প্রিয়ার উপমা শুনে হাসি পেল। কিন্তু নবরস সম্বন্ধে বিশেষ করে করুণ, শৃঙ্গার এবং বীর রসের সময় কোন অঙ্গ ধ্যান করে বাজাতে হবে শুনে অবাক হলাম। বাবার কত অনুভূতি, আজও যখন ভাবি, বিস্ময় লাগে!

মৈহারে সকাল থেকে রাত অবধি কি ভাবে কেটে যায় বুঝতে পারি না। রেডিওতে প্রত্যেক মাসে বাবা যান। সেই সময় স্বাধীনতার আনন্দ বুঝি। বাবার রেডিওর চিঠি এসেছে। বাবার একটি ফটো চেয়েছে। বাবা ফটো খুঁজে পাচ্ছেন না। নানা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ফটো পেয়ে আমাকে দেখালেন। বিদেশে থাকাকালী একটি মহিলা বাবার সঙ্গে ফটো উঠিয়ে বাবাকে দিয়েছিলেন। মেয়েটির ফটো দেখিয়ে বাবা বললেন, 'ইংলণ্ডে যখন গিয়েছিলাম, সেই সময় এই মেয়েটি আমার ফটো উঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি কাঁচা মাংস খেতো। ভাবতে পারা যায় না।' বাবা সব জিনিষ যত্ন করে রেখে দিতেন। তাঁর কাছে কত জিনিষই দেখেছি। সে সব যদি পেতাম তা হলে আমার বইটা সেই সব তথ্য দিয়ে ভরিয়ে দিতাম। বাবার যত বাজনা এবং অন্যান্য বহু জিনিষ, মিউজিয়ামে রাখলে সকলে দেখতে পেত। কিন্তু এ সবের যে উত্তরাধিকারী তার কি সময় আছে এ সব কথা ভাববার? আসলে সে এ সবের মহত্ত্বই বোঝে না। কিন্তু যে বোঝে, সে ইচ্ছে করলেই উত্তরাধিকারীকে বললেই ব্যবস্থা হ'তো। কিন্তু সেই সবজান্তার ইচ্ছা নয় সব জিনিষ মিউজিয়ামে থাকে। সে চায় না গুরুর জিনিষ সকলে দেখুক কারণ সে নিজেকে দেখাবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করেছে এবং বর্তমানেও নিজেকে অমর করে রাখার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভাবলেও দুঃখ হয়। না কথাটা ভুল বললাম। এখন আর দুঃখ হয় না। হয় করুণা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ নিজের লিখিত একখানা বই বাবাকে পাঠিয়েছেন। বইটির নাম হল 'সংগীত ও সংস্কৃতি'। বাবা কয়েক দিন পরে আমাকে দিলেন পড়বার জন্য। রাত্রে বাবা রেডিও শুনছেন। সেতার বাজছে। আমিও শুনছি। বাজাবার পর ঘোষণা হল বাদকের নাম এবং রাগ পূর্বী। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লিখে আমাকে শোনালেন। বাবা লিখেছেন, 'এই মাত্র রেডিওতে তোমার পূর্বী রাগ শুনলাম। না শিখিয়া এই রকম আতাইয়ের মত কখনও বাজাইবে না। পূর্বী রাগের রূপ লিখিয়া দিলাম। দেখিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিবে। আবোল তাবোল ফের যদি কখনও রেডিওতে শুনি, তাহা হইলে ডাইরেক্টরের নিকট রিপোর্ট করিব যাহাতে তোমাকে বাজনা না দেয়।' বাবার চিঠি পড়ে আমি তো অবাক। আমাদের ঘরের আরো একজনকে, রেডিওতে সরোদে পুরিয়া ধ্যানেশ্রী বাজনা শুনবার পর ঠিক এই কথাই লিখেছিলেন। ডাইরেক্টরকে লিখে দেবেন বাজনা যেন না দেয়। ব্যতিক্রম

একজনের বেলায় হয়েছিল। সেতারে ইমনকল্যাণ শুনে, কেবল শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ ঠিক হয় নি বলে লিখেছিলেন। শুদ্ধ মধ্যম কি ভাবে প্রয়োগ হয় বাবা লিখে দিয়েছিলেন। বাবার ছাত্র বলেই, বাজনা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলেন। আমার মৈহার থাকাকালীন এই তিনটে চিঠিই লিখতে দেখেছি। প্রথম দুইটি চিঠি যাদের লিখেছিলেন তারা এখন প্রয়াত। কিন্তু পরের একটা চিঠি যাকে লিখেছিলেন সে আজও জীবিত। এই ঘটনাটা এই জন্য লিখলাম, কারণ বাবা কতটা কর্মতৎপর তা বোঝাবার জন্য। যে জিনিষটা মনে আসবে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করা চাই। একটু দেরী নিজেও করেন না এবং কেউ যদি আলস্য করে, বলবার সঙ্গে সঙ্গে না করে, তা হলে তারও দুর্গতি অনিবার্য।

শুক্রবার বাজনা বন্ধ। শুক্রবার অসময়ে মাঝে মাঝেই বাবা আমার ঘরে আসতেন। আসতেন কেন পরে বুঝেছি। আসলে বাবা আসতেন, কি করে সময় কাটাচ্ছি দেখতে। শুক্রবার সকালে এবং সন্ধ্যায় বরাবর বই পড়তাম। বাবা একথা জানতেন। বাবার কাছে শুক্রবারে, সঞ্চয়িতা, মেঘদূত, ওমর খৈয়াম এবং রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত বহুবার পড়ে শুনিয়েছি। হঠাৎ বাবা আমার ঘরে এলেন। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। বাবাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালাম। বই পড়ছি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই পড়ছ?' বললাম, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের লেখা বই 'সংগীত ও সংস্কৃতি'। বাবা বললেন, 'সঙ্গীতের এই সব বই পড়া ভাল। জ্ঞান হবে। তবে বই পড়ে সঙ্গীতের রস এবং ভাব বোঝা যায় না। নিজের অন্তর থেকে সাধনা করলে উপলব্ধি করা যায়।'

মৈহারে ব্যাণ্ড কয়েকবার শুনেছি। আজ তিরিশে এপ্রিল। ডাক্তার গোবিন্দ সিং এর এসিস্ট্যান্ট, আমাকে বিকেলে ডেকেছিলেন বাবার জন্য ভিটামিন ট্যাবলেট দেবেন বলে। ঠিক সময়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়েছি। ডাক্তারবাবুর অনুরোধে চা খেয়েছি। বাড়িতে ফিরবার জন্য যে মুহূর্তে বেরিয়েছি দেখি বাবা আসছেন। বাবা ব্যাণ্ড পার্টিতে শুক্রবার ছাড়া রোজ সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচাট অবধি ছেলেদের নিয়ে বাজাবেন। বাবা আমাকে দেখে খুশী হলেন ওষুধ আনবার জন্য এসেছি বলে। এসিস্ট্যান্ট ডাক্তারের বাড়ির লাগোয়া, মৈহারের ব্যাণ্ড পার্টির বাড়ি। বাবা আমাকে বললেন, 'চল দেখবে কি রকম গাধাদের সঙ্গে রোজ এই দেড় ঘণ্টা কাটাই।' বাবার সঙ্গে গেলাম। ছেলে তো নয়, সবই বয়স্ক। বাবা ছেলেদের দেখিয়ে বললেন, 'সব কামচোর। আমি না এলে কেউ বাজাবে না। এই সব গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া করা যায়? জীবনটা নষ্ট করে ফেললাম। যখন ভাবলাম রিয়াজ করব, তখন থেকে মহারাজ থেকে ব্যাণ্ডপার্টি, বাড়ির ছেলে মেয়ে এবং কত ছেলেকে শেখাতে গিয়েই বুড়ো হয়ে গেলাম। সময় কত সহজে চলে যায়। ফেরান যায় না কিছুতেই। ফেরাতে পারলে তোমাদের মত বয়সটা পেলে রিয়াজ করতাম। বৃথাই বেগার খেটে গেলাম। একজনকে শেখাতে গেলে একটা প্রাণ দিতে হয়। হারে দুর্ভাগা।' বাবার এই কথা বহুবার শুনেছি। শেখাবার সময় বাবার বকুনি দেখে ঘাবড়ালাম। বাজনার শেষে বাবার সঙ্গেই বাড়ি ফিরে এলাম। মনে ভাবলাম, এক সঙ্গে সকলেই বাজিয়ে যায়। কিন্তু কথা বলে বুঝেছি, এতদিন এরা বাজাচ্ছে কিন্তু রাগের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। ছোট ছেলেকে কি

ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ভাবতেও অবাক লাগে। এরা দীর্ঘদিন যে সুযোগ পেয়েছে, যদি মাথা থাকত, তাহলে প্রত্যেকেই একজন দিকপাল হয়ে চিহ্নিত হত।

আগেই বলেছি বাবার মনে যখন কোন কাজ করবার ইচ্ছা জাগত, সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করাটা বাবার স্বভাবের একটা অঙ্গ। এবার সেই বিষয়েই একটা ঘটনার কথা বলি। দোসরা মে, মৈহারের তামাক ব্যবসায়ী রহিম বক্স বাড়িতে এসে বাবাকে তামাক দিলেন। কয়েকদিন হল মক্কায় গিয়ে হজ করে ফিরেছেন। মক্কার পবিত্র প্রসাদ হল তবররুক ও আবে জমজম (জল) । রহিম বক্স বাবাকে এই প্রসাদ দিলেন। শ্রদ্ধায় বাবা নিলেন। রহিম বক্স চলে যাবার পরই বাবা বললেন, 'সে কবেকার কথা। উদয়শঙ্করের সঙ্গে যখন বিদেশে গিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম সেই ফাঁকে মক্কা হয়ে আসি। মুসলমান ধর্মে, মক্কাশরীফ দর্শন না করা পাপ' এই কথা বলেই বাবা বললেন, 'মক্কা যাবার জন্য জাহাজ কবে যায় এর খবর নাও তো। এর জন্য তো পাসপোর্ট লাগে। আমার পুরনো পাসপোর্ট আছে। এ বিষয়ে যাবার জন্য ছুটি নিতে হবে। যতই হোক সরকারের কাছ থেকে টাকা পাই ব্যাণ্ডের জন্য। রহিম বক্স হজে গেছে, তার কাছে যাও, যাবার জন্য কি কি দরকার সব কিছু বলে দেবে।' বাবার মনে যখন হয়েছে সুতরাং যাবেনেই। এই বৃদ্ধ বয়সে একলা যাবেন শুনে মা বললেন, 'আমিও যাবো।' মার কথা শুনেই বাবা এক ধমক লাগালেন। বললেন, 'মক্কায় যেতে হলে জাহাজে কত ভিড় হবে। এ ছাড়া মক্কায় লোকে লোকারণ্য। হাঁটতে পার না মক্কায় যাবে।' বাবা এক কথায় মার যাবার পরিকল্পনা বাতিল করলেন। আমি মোটামুটি সব খবর নিয়ে রবিশঙ্করকে বাবার সঙ্কল্প জানালাম। কিন্তু এই যাওয়ার আগে এবং পরে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। মক্কা যাওয়ার সব পরিকল্পনা করেছেন, ঠিক তার কয়েকদিন পরই বর্দ্ধমান থেকে দ্বারিকানাথ দত্তর ছেলে এল। দ্বারিকানাথ হলেন মনোমোহন ফকিরের ছেলে। প্রথমে বাবা বললেন, 'আরে আরে একি বিপদ এল।' কথায় বোঝা গেল ছেলেটা বোকা, বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে। ছেলেটি বাবার কাছে এসরাজ শিখতে এসেছে। ছেলেটির বিদ্যা ক্লাস টেন। এই ছেলেটিও কিন্তু বগুড়ার ছেলেটির মতই। মাসিক পত্রিকায় বাবার জীবনী পড়ে এই বিশ্বাসে এসেছে, এখানে বিনা পয়সায় খাওয়া এবং শিক্ষা হয়। বাবা আমাকে বললেন, ''ছেলেটিকে বিদায় কর।' যেহেতু ছেলেটি মনোমোহন ফকিরের নাতি, সেইজন্য বাবা সঙ্কোচ বোধ করছেন। ছেলেটিকে নিয়ে বাবা প্রথম দিন ব্যাণ্ড শোনাতে গেলেন। ব্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে মাছ কিনে নিয়ে এলেন। পরের দিনই চিঠি এল। দ্বারিকানাথ দত্ত লিখেছেন, 'আমার ছেলে বাড়িতে চিঠি লিখে, পালিয়ে গেছে বাজনা শিখবার জন্য মৈহারে। সুতরাং ছেলেটিকে যেন পত্রপাঠ বাড়িতে ফিরে আসবার জন্য আদেশ করবেন।' বাবা আমাকে বললেন, 'খবর নাও তো ছেলেটির কাছে বাড়ি ফেরৎ যাবার জন্য টাকা আছে কিনা?' ছেলেটির কাছে টাকা ছিল। সুতরাং দুপুর বেলায় খাবার খাইয়ে বিদায় করা হোল। ছেলেটি যাবার পর মনে হোল, মাসিক পত্রে বাবার জীবনীতে যে ভুল তথ্য বেরিয়েছে, তার জন্য এতো এক দুর্ভোগ। কিন্তু যারা কেবল পড়েছে তারা তো সেইটেই সত্য মনে করবে। এই ভুল তথ্যগুলোও তো একদিন ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। এর জন্য দায়ী কে? কে এদের বিচার করবে?

যাক ছেলেটি একদিন থেকে যে বিদায় হয়েছে, সেটা বিশেষ করে আমার জন্যই মঙ্গল। কেননা বাবা রোজই বলবেন, ভেদ লাগাও, অথচ বাবা নিজে কিছুই বলবেন না, অতিথি ভগবান বলে।

ছেলেটি চলে যাবার পর বাবা রাত্রে মারওয়া শেখাবার পর বললেন, 'বাজনা গুরুর মত হবে। অর্থাৎ ছেলের মধ্যে পিতার চেহারা থাকবে, না হলে লোকে জারজ সন্তান বলবে। তবে ছেলেকেও নিজস্ব একটা সৃষ্টি করতে হবে। অবিকল গুরুর মত বাজালে সেটাকে নকল বলা হবে। তাতে বাজনা হয় না। নিজস্ব ভাবমূর্তি দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে। তবেই প্রকৃত সাধনা হয়েছে বুঝতে পারা যাবে।'

রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। রবিশঙ্কর লিখেছে, 'মক্কা জাহাজে এবং প্লেনে যাওয়া যায়। প্লেনে গেলেই সুবিধা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'প্লেনে যাবো না।' প্লেনে চড়ায় বাবার ভীতি ছিল। বাবার পাসপোর্টের জন্য চিফ সেক্রেটারীকে চিঠি দিলাম। প্লেনের নাম শুনেই বাবার মেজাজ গরম। তার জের আশিসের উপর পড়ল রাত্রে শিখবার সময়। বাবার সঙ্গে সঙ্গে, চমৎকার বাজিয়ে যাবে কিন্তু গৎ ভুলে যাবে। তার পরিণাম যে অমানুষিক প্রহার, এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি, ভাবা যায় না।

মক্কায় যাবার এখন সবে ভূমিকা হয়েছে, এর মধ্যেই বাবা আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কোন দোকান থেকে টিন ভর্তি ঘি কেনেন। ভাল মাংসের দোকান একটা দেখালেন। বাড়িতে বাবার অনেক গোপন জিনিষ আছে। বাবা বললেন, 'হজ করতে গিয়ে যদি মারা যাই, তাহলে এইসব গোপন জিনিষগুলি আলিআকবরকে জানিও।' আমি যত বলি, এসব কথা কি বলছেন, বাবাও সেই তালে একই উত্তর দিয়ে বলছেন, 'কোন ঠিক আছে, আল্লার কি মর্জি খুদাই জানে।'

বাবা হজ করতে যাবেন এ কথা কানে কানে মৈহারের সব লোকই জেনে গেছে। অ্যালাবিয়া সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'বাবা এবং রবিশঙ্করকে বলুন, পাঁচ হাজার টাকা দিলে সাড়ে সাত পার্সেন্ট সুদ দেবো।' সুদটা লোভনীয়। টাকা মারা যাবার ভয়ও নেই। কিন্তু বাবাকে এই কথা বলায় বাবা বললেন, 'এই রকম হারামের টাকায় আমার দরকার নেই। স্টেট ব্যাঙ্ক যা সুদ দেয় তাই ভাল।' রবিশঙ্করের টাকা দেবার ক্ষমতা নাই। জানি বলেই, অ্যালাবিয়া সাহেবের টাকার সুদের প্রস্তাব জানালাম না। বাবার মেজাজ খারাপ। কেন এত দেরী হচ্ছে? বাবাকে কি করে বোঝাব একদিনে পাসপোর্ট হয় না। এ ছাড়া জাহাজে টিকিট করতে সময় লাগে। বাবা হলেন ব্যস্তবাগীশ লোক। রোজ কেবল একটাই কথা বাবার মুখে, কেন এত দেরী হচ্ছে? বাবার সারাদিন, মেজাজ খারাপ যার ফলে। অকারণে ছোট মেয়ে মার খেল। বাবা আদরের ছোট নাতনীর নাম রেখেছেন শ্রী। লেখা পড়ায় সব চেয়ে ভাল। অথচ একটা পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে বলে মার খেল। এত ছোট মেয়ে হলেও বাবার কাছে ক্ষমা নেই। এর মধ্যে আশিসের সরোদের চামড়ার উপর টাট বাবার ফটো পড়ে গিয়ে চামড়াটা ছিঁড়ে গিয়েছে। গরম বলে বাজনার উপর ঢাকনা ছিল না, তাই এই অঘটন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা চামড়া কিনে এনে পরিষ্কার করে পরের দিন বিকেলের মধ্যে চামড়া সরোদে লাগিয়ে দিলেন।

যেহেতু আজ ইলেকট্রিক বিল জমা করলাম, তামাকের ব্যবস্থা হল, ন্যাশন্যাল এ্যাকাডেমী থেকে একশ পঁচাশি টাকার চেক জমা দিয়ে টাকা নিয়ে এলাম, তার জন্য বাবা রাত্রে ঝালার নানা অঙ্গ শেখালেন। তারপরনের কাজ, মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজিয়ে বোঝালেন। বললেন, 'হজে যাব সুতরাং রোজ শিখবে। যতটা পার শিখে নাও। কি জানি ফিরব কি না?' বাবার এ কথা শুনে শুনে এখন আর মনে উদ্বেগ হয় না। বাবার মনের জোর এবং কর্মক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে।

এর মধ্যে পাসপোর্টে যে ফটো লাগবে সেটা রবিশঙ্কর পাঠিয়ে দিয়েছে। মৈহারে ওঠান আগেকার ছবি। ছবিটা খুব ডার্ক উঠেছে। ছবি দেখে বাবা বললেন, 'এই ছবি দেখে লোকে আমায় চিনতে পারবে তো।' বাবাকে বোঝালাম পাসপোর্টের জন্য ছবি দেওয়া হল নিয়ম রক্ষা, সুতরাং চিন্তার কিছু নাই। বাবার ছেলেমানুষি দেখে হাসি পায়।

বাবা মক্কায় যাচ্ছেন বলে, দেশে কুমিল্লাতে সকলকে চিঠি দিয়েছেন, এবং অনেককে চিঠি লিখে জানাবার জন্য ভার আমার উপর পড়েছে। এর মধ্যেই চিফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে চিঠি এল, পাসপোর্টের জন্য ডি.সি.-কে আবেদন করার জন্য। সুতরাং ফটো সহিত ডি.সি.-র কাছে চিঠি দিলাম।

এই সময় এলাহাবাদ রেডিওর ডাইরেক্টারের একটা চিঠি এল। বাবাকে অনুরোধ করে লিখেছেন, এ্যাকাডেমির ডাইরেক্টর হবার জন্য। বাবা চিঠি শুনে বললেন, 'লিখে দাও যদি এক হাজার টাকা দেয় তা হোলে যাব। এ ছাড়া তোমাকে টাকা দিতে হবে আমার সেক্রেটারী বলে।' বাবার কথা শুনে হাসি পেল। আমি জানি রেডিওতে একটা সম্মানসূচক পদের জন্য বলেছে। এর জন্য এত টাকা দেবে না।

বাবা যখন হজের জন্য চিন্তায় আছেন সেই সময় দুপুরে অরুণ বাগচী বলে একটি ছেলে এসেছে বাজনা শিখবার জন্য। এ ঘটনাও, মাসিক পত্রিকায় বাবার সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়ে যে সংবাদ বেরিয়েছিল তার পরিণাম। বাবা আমাকে বললেন, 'বলে দাও হজে যাচ্ছি সুতরাং শেখাতে পারব না।' এই অপ্রিয় কাজটা আমাকে করতে হল। ছেলেটি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেটি পরের দিনই চলে গেল। ছেলেটির জন্য কষ্ট হল।

এই সময় আমার সেজ দাদা, যে রেঙ্গুন থেকে চলে এসেছে তার চিঠি পেলাম। সে বরাবরই ব্যবসা করেছে। কিন্তু কাশীতে ব্যবসায় সফলতা পায় নি। একটা ওষুধের কোম্পানীতে চাকরি নিয়েছে। এখন প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাবে। যাক কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

বাবার পাসপোর্টের জন্য সাতনায় গেলাম। ডি.সি.-র সঙ্গে দেখা করলাম। দুপুর বেলায় পিলগ্রিমস পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। ডি.সি. বললেন, 'সাত আট দিন পরে পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেব।' সন্ধ্যার সময় মৈহার ফিরলাম। পিলগ্রিমস পাসপোর্ট হয়ে গিয়েছে শুনে বাবা খুশী। কিন্তু পাসপোর্ট আবার কবে আসবে? বাবাকে বোঝালাম, ডি. সি. লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। পরের দিন গোশালায় রিয়াজ করতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি ছাতের টাইলসের পাশ দিয়ে একটা বড় সাপ যাচ্ছে। ভয়ে বাবাকে ডেকে দেখালাম। লাঠি দিয়ে মারবার জন্য

ভাবছি কিন্তু বাবা লাঠি দেখে বললেন, 'আরে, আরে, কর কি? এ হল বাড়ির লক্ষ্মী।' বাবার কথা শুনে আমি তো অবাক। মনে ভয় হল কি করে বাজাব এই ঘরে? মাকে বললাম। মা বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। প্রায় দেখা যায় ঐ ঘরে কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে কামড়ায় নি।'

আজ বাবা বাড়িটা মার নামে করিয়ে এলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে। বাবা টিনের প্লেটে একজন পেন্টারকে দিয়ে 'মদিনা ভবন' লেখালেন এবং বাড়ির মুখ্য দরজার কাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার সময় কয়েকজন লোক এল। বাড়ি দেখে বাবাকে বললেন, 'বড় সুন্দর আপনার বাড়িটা।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'জী নহিঁ। য়ে মকান হমারা বিবিকা হয়।' লোকগুলি বাবার রসিকতায় বলল, 'একই কথা হল। স্ত্রীর বাড়ি মানেই আপনার বাড়ি।' বাবা সেই এক কথাই আরো গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার আপন বলতে এই বাজনা ছাড়া আর কিছুই নাই। এ বাড়ি আমার স্ত্রীর বাড়ি। আমাকে তাড়িয়ে দিলে চলে যাব।' বাবার কথা শুনে হাসি পায়। আসলে বাবা সব কাজ পাকা করে যাচ্ছেন।

প্রতি শুক্রবার বাবা মসজিদে নমাজ পড়তে যেতেন। তিনি নমাজ পড়তে গেছেন। হঠাৎ আমার ঘরে জুবেদা খাতুন এসে হাজির। আমার ঘরে আসা এই প্রথম। আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। অবশ্য অন্নপূর্ণা দেবী থাকলে, উপরে খুব সহজভাবে কথা বলতাম। কিন্তু আমার ঘরে এসেছেন কেন? ঘরে চেয়ারে বসে নিজের জীবনের অনেক ঘটনা একনাগাড়ে বললেন, 'আলিআকবর একটি ঘরে শুত। বাবা, মা অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করতেন। বাবা সংযমের মধ্যে ছেলেকে রেখেছিলেন।' এ সব কথা এক নাগাড়ে বলার পর বললেন, 'আমাকে বাবা, মা কেউ দেখতে পারেন না। মারের ভয়ে আশিসের বাবা বম্বে চলে গিয়েছিল। দোষ হল আমার, কেননা সরোদ নিয়ে গেল কি করে উপরতলা থেকে? গেটের তালার চাবি বাবা নিজের কাছে যেমন রাখেন সেই সময়ও রাখতেন। আমার সে সময় জ্বর। আশিসের বাবা দড়ি বেয়ে আমাকে না জানিয়ে চলে গেল। অথচ বাবা মার ধারণা, চলে যেতে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করেছি। আমার ভাগ্য খারাপ তাই দিন রাত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এখানে সকলেই মতলববাজ। প্রয়োজন পড়লে সেই সময় ভাল। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কেউ চিনবে না। এই যে আপনি বাড়ির জন্য এত কাজ করেন, ছেলেদের পড়ান বলেই বাবা এত ভালোবাসেন।' নিজের নানা গল্প বললেন যা আমি রবিশঙ্করের কাছে শুনেছি। নিজের গল্প বলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আশিসের বাবা এলে এবার চলে যাব।' সব শুনবার পর বললাম, 'আপনার ছেলে মেয়েরা এখানে মানুষ হচ্ছে। এই সব ছোট ব্যাপারে কিছু না মনে করাই ভাল। আপনি চলে গেলে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।' মনে হোল, আমার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিলেন। আবার মহাভারত শুরু হয়ে গেল। একে একে বাবা, মা, রবিশঙ্কর, আলি আকবর সকলের সম্বন্ধেই নিন্দা করতে লাগলেন। তখন গম্ভীর হয়ে বললাম, 'দেখুন আপনার অনেক অভিযোগ থাকতে পারে সকলের প্রতি, কিন্তু দয়া করে আমার কাছে কখনও নিন্দা করবেন না। আমার একটা দুর্বলতা আছে আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের প্রতি। এদের নিন্দা শুনলে আমার খুব খারাপ লাগে। এ ছাড়া গুরুজনের নিন্দা শোনা পাপ। যতই হোক আপনি বাড়ির বৌ। দয়া করে কখনও আমার ঘরে আসবেন

না। আমার ঘরে গল্প করলে মা ভাল ভাবে দেখবেন না। যদি কোন দরকার হয় তাহলে আশিসকে দিয়ে খবর পাঠাবেন।' আমার কথা শুনে জুবেদা খাতুন যেন ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, 'কেন মা রাগ করবেন? অন্নপূর্ণার কাছে শেখেন, উপরে আমাদের সঙ্গে গল্প করেন তখন তো মা রাগ করেন না।' আমি বলি, 'মেয়ে এবং বাড়ির বৌ এর পার্থক্য থাকেই। আপনার কোন দরকার থাকলে মায়ের সামনে বলবেন। এখন দয়া করে যান। বাবা এসে পড়বেন।' আমার কথা শুনে রাগ করে উঠে যাবার সময় বললেন, 'আমার ভাগ্য খারাপ। আমাকে কেউ চিনতে পারল না।' আমার কাছে উভয় সঙ্কট। রবিশঙ্কর বার বার আমাকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে সহানুভূতি হোল। ছোট থেকে যে লেখাপড়া করেনি, কোন কলাবিদ্যা আয়ত্ত্ব করতে পারে নি, উপরন্তু আলি আকবরের ব্যবহার, সব মিলিয়ে এমন করে দিয়েছে। সাধারণ বাড়ির মেয়েদের মত, পরনিন্দা, পরচর্চা ছাড়া আর কি করতে পারে। কিন্তু যেভাবে আমি কথা বললাম, তার পরিণাম যে এত ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে, কল্পনাও করতে পারি নি।

বাবার হজে যাবার সম্বন্ধে আলি আকবরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, অথচ সে নির্বিকার। তার কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে বাবার মেজাজ গরম। এই রাগের জের চলছে অকারণে, মার উপর। আজ আশিসকে বললাম, 'সব জানিয়ে লেখ তোর বাবাকে।' মুখে মুখে আমি বলে দিলাম। আশিস চিঠি পাঠাল। আজ রহিম বক্স এসে বাবাকে বললেন, 'হজ করতে মাকেও নিয়ে যান।' আপত্তি জানিয়ে বাবা নাকচ করে দিলেন।

আজ পয়লা জুন। বম্বের কলাকেন্দ্র থেকে আজ একটি চিঠি এল। শিল্পীদের তরফ থেকে, আকাশবাণীর ডাইরেক্টর জেনারেলকে একটা পত্র লেখা হয়েছে। কিছু শিল্পীর নাম লেখা হয়েছে এবং বাবাকেও অনুরোধ করেছে দস্তখত দিতে। প্রতিবাদ করে, পত্রে আবেদন করেছেন রেডিওতে শিল্পীর দক্ষিণা বাড়ান উচিত। বর্তমানে, তাঁদের যে দক্ষিণা দেওয়া হয় রেডিওতে বাজাবার দরুণ, সেটা খুবই কম। আবেদন পত্রে যাঁরা সই করেছেন তার মধ্যে অমীর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, আলিআকবর খাঁ এবং অন্যান্য বহু শিল্পীর নাম লেখা আছে। রবিশঙ্করের চিঠি এই সময়েই এল। রবিশঙ্কর বাবাকে লিখেছে, 'দক্ষিণা বাড়ানর যে আবেদন করেছে তার মধ্যে আলি আকবরের অনুমতি না নিয়েই তার নাম লেখা হয়েছে। আপনার কাছে চিঠি এলে সই করবেন না।' বাবা এই চিঠি পেয়ে বললেন, 'আবেদন যারা করেছে তারা তো ঠিকই করেছে। সত্যই তো দুদিন রেডিওতে বাজিয়ে যাওয়া আসা, হোটেল খরচা দিয়ে কটা টাকাই পাওয়া যায়। তবে রবিশঙ্কর যখন মানা করছে এবং আলি আকবর সই করেনি তখন চিঠিতে সই করবার দরকার নাই।' বরাবর দেখেছি রবিশঙ্কর সবক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়। আসা অবধি দেখছি, কনফারেন্সে প্রতি বছর দুই শত টাকা রবিশঙ্করের নির্দেশে সকলেরই বেড়েছে। সকলের অর্থে, বাবা, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর। সঙ্গীতের ট্রেডটা রবিশঙ্কর ভালই বোঝে।

বাবার পাসপোর্ট এসে গেছে সাতনা থেকে। পাসপোর্টে ইউরোপ, পণ্ডিচেরী সহ মক্কার নাম লেখা আছে। পাসপোর্ট এসে গেল কিন্তু জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। প্লেনে টিকিট কাটা হয়েছে এবং সেটা কনফারমড হয়েছে। কিন্তু জাহাজে ওয়েটিং লিস্টে

নাম রয়েছে। রবিশঙ্কর দিল্লীতে খুব চেষ্টা করছে। এবং ঠিক হয়ে গেলেই জানাবে। বাবার মেজাজ গরম হচ্ছে। প্লেনে কিছুতেই যাবেন না। জাহাজে এরা ঠিক না করতে পারলে সোজা কুমিল্লা চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে নিজে চেষ্টা করবেন জাহাজে যাবার। রোজ বাবাকে বোঝাতে হয় চিন্তা না করতে। রবিশঙ্কর ব্যবস্থা করছে, ব্যবস্থা হলেই জানাবে। ইতিমধ্যে রবিশঙ্করের বন্ধু ডোশিজি বম্বে থেকে চিঠি লিখেছে। ডোশিজি লিখেছে, 'মার জন্যও পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছি।' এই চিঠি পেয়ে বাবা রেগে গেলেন আমার উপর, কেননা ভেবেছেন মার যাবার জন্য বোধ হয় আমিই বলেছি। বাবাকে বুঝিয়ে বললাম, 'আমি কেন লিখব? মার পাসপোর্ট করাতে হলে তো মার ছবি নিয়ে সাতনাতে করাতে হবে। বম্বেতে ডোশিজি নিজে থেকে প্রস্তাব দিয়েছে।' বাবা বুঝলেন। বললেন, 'আমার জাহাজের টিকিট করাতে পারছে না আর সরফরাজি করছে তোমার মায়ের জন্য ব্যবস্থা করছে।'

বাবা রমজানে রোজা করছেন। সুতরাং মাথা এমনিতেই গরম। একবার বলছেন, 'এদের দ্বারা কিছু হবে না। রোজা শেষ হয়ে গেলে, হয় কুমিল্লা কিংবা বম্বে গিয়ে আমি নিজেই ব্যবস্থা করবো।' বাবাকে বোঝানো কঠিন, জাহাজের টিকিট কাটা সত্ত্বেও ওয়েটিং লিস্টে কেন নাম রয়েছে। বাবা একথা রোজ বলছেন, 'প্লেনে কি করে কনফারমড্ হয়ে গেল। এরা ইচ্ছা করেই প্লেনে পাঠাবার জন্যই এই রকম বলছে।' সন্ধ্যা বেলায় বাবাকে বলি, চিন্তা করবেন না। ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।' রাত্রে আমার কথা শুনে চুপ করে থাকেন। এই সময় জুবেদা খাতুন থেকে ছেলেরা একে একে অসুখে পড়ছে। টাকা খরচা হচ্ছে কিন্তু আলি আকবর নির্বিকার। মা নিজের বৌমার প্রতি সন্তুষ্ট নন, কারণ নানা প্রকারে আলি আকবরকে অত্যাচার করেছে বম্বেতে। যার জন্য আলিআকবর এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। যত জ্বালা আমার। কোনদিক সামলাব।

বাবা সকালেই হঠাৎ বললেন, 'নাশ হয়ে গেল।' বুঝতে পারলাম না কি হোল। বাবা আমার দৃষ্টি দেখে বললেন, 'বুঝতে পারছ না, লখছন ভাল নয়। এখনো টিকিট হোল না, সকলের অসুখ। আলি আকবর কি ভেবেছে? সকলকে বম্বেতে পাঠিয়ে দাও।' বুঝতে পারলাম এ সব রাগের কথা। উপবাসে তামাক না খাবার পরিণাম। ব্যাপারটা বোঝালাম। বললাম, 'এখন যাওয়ার অনেক দেরী আছে। এ ছাড়া অসুখ তো হবেই। ঋতু পরিবর্তনে সকলের শরীর খারাপ হচ্ছে।' বাবা এবারে চুপ করে গেলেন।

যেহেতু রমজান চলছে সেইজন্য বাবার কাছে বাজনা শিখিনা। এখন ধ্যানেশ বাজাতে আরম্ভ করেছে। বাবা ধ্যানেশের শেখাবার সময় চড় শুরু হয়ে গেল। ধ্যানেশের গ্রহদশা এসেছে। ছোটদের পিস্তল দিয়ে ধ্যানেশ খেলছে। পাথরের কুচি দিয়ে অমরেশের চোখে লাগল। রক্তারক্তি কাণ্ড। ধ্যানেশ মেরেই পালিয়েছে। বাবা ঠিক খুঁজে বার করে বেদম প্রহার করতে লাগলেন। বাবাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'ছেলেমানুষি কাণ্ড। এ সব দিকে লক্ষ্য করবেন না।' অমরেশের চোখ বেঁচে গেছে একটুর জন্য। হাসপাতালে অমরেশকে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে ওষুধ দিলেন। বাড়িতে ফিরে দেখি, বাবা গোশালাতে আমার বাজনার ঘর পরিষ্কার করাচ্ছেন বুদ্ধাকে দিয়ে।

এই সময় বম্বে থেকে একটি ছেলে এল, যে আলি আকবরের কাছে ছিল। ছেলেটি আলি আকবরের একটি চিঠি দেখাল। চিঠি পড়ে শোনালাম। চিঠি শুনেই বাবা ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি এক শয়তানের কাছ থেকে এসেছ, সুতরাং তুমিও শয়তান।' ছেলেটির অবস্থা খারাপ। ছেলেটি বলল, 'আলি আকবরদা আমাকে চল্লিশ টাকা দিয়েছে। শিখবার বাসনা নিয়ে এসেছি।' বাবা বললেন, 'আমার শেখাবার বয়স নাই। আমি এখন হজে যাচ্ছি।' বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'ছেলেটিকে আজই বিদায় কর।' বাবাকে আশ্বস্ত করলাম। ছেলেটি বলল বম্বে মেলে মৈহার এসেছি। বম্বে মেল মৈহার দাঁড়ায় না। মৈহার স্টেশন দেখে লাফিয়ে নেমেছি। আমি আলি আকবরের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজদুলারির জন্য টিকতে পারিনি। কেবল একুশ দিন কোনমতে ছিলাম। অথচ নিখিল ঠিক শিখছে আলি আকবরের কাছে। অনেক রাত অবধি নিখিল শেখে। রাজদুলারি নিখিলকে কিছু বলে না, কারণ মন জুগিয়ে চলে।' ছেলেটিকে জুবেদা খাতুন দেখেছেন দূর থেকে। আমাকে বললেন, 'এই ছেলেটি জ্যোৎস্নার ভাই। ছেলেটি ভাল নয়।' যে হেতু আলি আকবর ছেলেটিকে পাঠিয়েছে সেই জন্য মার মনে দয়া হল। বললেন, 'ছেলেটির কোন ব্যবস্থা করা যায় না?' মার এই কথা শুনে জুবেদা খাতুন বললেন, 'ও কি আপনার ভাই, বাবা, না চাচা? যত দুষ্ট লোক।' মা চুপ করে গেলেন। আমি ছেলেটিকে এখানকার পরিস্থিতি বুঝিয়ে বিদায় করলাম।

ইতিমধ্যে রেভিনিউ সেক্রেটারীর কাছ থেকে বাবার ছুটির মঞ্জুরি এসেছে। যাক বাঁচা গেল। এক দিনে দুটো শুভ সংবাদ। আজ বম্বে থেকে জাহাজের জন্য মোগল লাইন জাহাজে টিকিট রিজার্ভ করার জন্য ফরম পাঠিয়ে দিয়েছেন ডোশিজি। বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

আজ ডাক্তার গোবিন্দ সিং এসেছেন। অমরেশের চোখে রোজ ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে বলে, রাত্রে সরবত এবং আম খাওয়ালেন। যেহেতু ডাক্তারবাবুর তবলার সখ সেইজন্য রাত্রে তবলা এবং মৃদঙ্গ বাজিয়ে শোনালেন। বাবার তবলা বা মৃদঙ্গ বছরে তিন চার বার শুনবার সুযোগ হ'তো। কখনও বাজান না অথচ শুনলে মনে হবে চিরটা কাল তবলা বা মৃদঙ্গই বাজিয়েছেন। তবলা বা মৃদঙ্গে বাবার ছন্দের কঠিন বিবাজন এবং হাত যে কি মিষ্টি, তা যে না শুনেছে সে কল্পনাই করতে পারবে না।

বাড়িতে ছেলেরা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওষুধ এনে দেখলাম বাবা চাকরকে দিয়ে গোশালাতে আমার বাজাবার ঘরের ছাতে টালি লাগাচ্ছেন। বাবা আমাকে দেখে বললেন, 'ঘরে বৃষ্টি পড়বে তাই টালি লাগাচ্ছি।' বাবার সব দিকে খেয়াল আছে। হঠাৎ বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কয়েকটা কথা মনে রেখো। প্রথম হল, জাহাজে কবে যেতে হবে, সেই হিসেবে বম্বের সেকেণ্ড ক্লাসের একটি টিকেট কিনে রিজার্ভ করাবে। যখন যাব কাউকে বলবে না। কোন লোক যখন হজে যায় স্টেশনে সকলে গিয়ে মালা পরায়। ধর্মস্থান দর্শন করতে যাচ্ছে তার জন্য লোককে জানিয়ে যাবার কি আছে? হিন্দুদের যেমন কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, কেদারবদ্রী, ধর্মস্থান দর্শন করতে যায়, সেই রকম মুসলমান ধর্মে মক্কা গেলেই সব দর্শন হয়ে যায়। এই ভেবেই মক্কা যাওয়ার বাসনা অনেক দিনের। এ ছাড়া যখন হজ করে

ফিরব সেই সময়ও কাউকে বলবে না। হজ করে যখন লোকে ফেরে, সকলেই তাকে মালা পরায়। এ সবে অভিমান অহঙ্কার বাড়ে। দর্শন করে এসেছ, এর জন্য লোককে ডেকে সম্বর্ধনা করার কোন অর্থ আছে? আসলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এই তিনটি স্থির করে সাধনা করতে হবে। অথচ হজ করে লোকে অহঙ্কারকে ডেকে আনে।' বাবার কথাগুলি সব মন দিয়ে শুনলাম। কত মূল্যবান কথা বললেন। কিন্তু একটা কথায়, আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'সেকেণ্ড ক্লাসে কেন বম্বে যাবেন? মৈহারে সকলেই জেনে যাবে আপনি হজ করতে যাচ্ছেন। লোকে স্টেশনে যাবেই। সুতরাং প্রথম শ্রেণীতে যাবেন।' এ কথা শুনেই বাবা বললেন, 'আরে আরে, বল কি? ফার্স্ট ক্লাসে যেতে? কোথা থেকে টাকা আসবে?' আমি চুপ। আমি বাবার মেজাজ জানি। বাবা প্রথমে আপত্তি করবেন তারপর যাবেন সেই ফার্স্ট ক্লাসেই। হোলও তাই। কিছুক্ষণ কয়েকবার তাকাতে তাকাতে বললেন, 'ঠিক আছে যা ভাল বোঝ কর। তবে একটা কথা মনে রাখবে, যাবার সময় লোকে জানলেও আসবার সময় তো লোকে জানবে না? সুতরাং আসবার সময় তোমাকেই কেবল জানাব। ভুলেও কাউকে বলবে না। এ কথাটা ভুলে যেও না।'

রাত্রে সিনেমায় গেলাম। সিনেমায় গিয়ে দেখি ডাক্তার গোবিন্দ সিং গেছেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক হলেন নাগোদের মহারাজা। মৈহারে এসে এর কথা কিছু শোনা ছিল। মৈহারের কাছেই নাগোদ স্টেট। মহারাজ মস্ত শিকারী। আমি জানি বাবার সঙ্গে নাগোদের মহারাজের পরিচয় আছে। যদি বাবার কাছে আমাকে দেখিয়ে বলেন, চেনেন, কেননা সিনেমায় পরিচয় হয়েছে; তা হলে বিপদ। মহারাজাকে কথাটা জানালাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে একটি অবিশ্বাস্য গল্প বললেন। বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই বাবাকে আপনার কথা বলব না। বাবার মেজাজ আমি জানি। বাবা ব্যাণ্ডের ছেলেদের খুব মারতেন। বহুদিন আগে মারের ভয়ে ব্যাণ্ডের ছেলেরা একবার আমার এখানে চলে এসেছিল। আমার এখানে কিছুদিন রাখবার পর মৈহারের মহারাজের অনুরোধে ছেলেগুলিকে মৈহারে পাঠিয়ে দিই। বাবাকে অনুরোধ করেছিলাম যেন না মারেন। যে সময় ছেলেগুলি আমার কাছে ছিল, সেই সময় বাবা কুকুর পুষেছিলেন। ব্যাণ্ডের ছেলেদের নাম নিয়ে এক একটা কুকুরের নাম রেখেছিলেন। বাবার ব্যাণ্ডে সেই সময় একটি মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি একদিন আতর লাগিয়ে ব্যাণ্ডে বাজাতে গিয়েছিল। বাবা আতর বুঝতে পেরে প্রথমে বলেছিলেন, 'কোথা থেকে কেরোসিন তেলের গন্ধ আসছে?' মেয়েটি বুঝতে না পেরে সরল ভাবে বলেছিল, 'কেরোসিন তেল নয় আতরের গন্ধ।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা মেয়েটির মাথা মুণ্ডন করে ব্যাণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আর কোন মেয়েকে ব্যাণ্ডে রাখেন নি। এ ঘটনা অবশ্য বহু বছর আগেকার।'

যে হেতু ছেলেদের অসুখ এখন একেবারে ভাল হয়ে গিয়েছে, বাবা সকালেই কোমল ঋষভ আশাবরী শেখাতে লাগলেন। বাজনা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় জব্বলপুর থেকে একটি বাঙ্গালী ছেলে এল। ছেলেটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটি সংবাদপত্রের তরফ থেকে আপনার একটি ইন্টারভিউ নিতে এসেছি। আমার নাম সুব্রত রায়।' ছেলেটি বাবার

একটি ফটো উঠিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। সে প্রশ্নের উত্তর বাবা দিলেন, সেগুলি আমার জানা। শেষ প্রশ্নটার উত্তর, বাবা কি বলবেন জানবার বিশেষ আগ্রহ হল। ছেলেটি যখন বলল, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। শেষ একটি প্রশ্ন করেই যাব। প্রশ্নটা হল, আজকাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, হিন্দু এবং মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক এবং বাদকের সম্বন্ধে, যদি দয়া করে কিছু মতামত প্রকাশ করেন।' উত্তরে বাবা বললেন, 'ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে সাধনা করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল সকলেই, এবং আমি নিজেও সরফরাজ হয়ে গিয়েছি। জনতা দেখতে হয়, পয়সার জন্য তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বাজাতে হয়। সেইজন্য সঙ্গীতও সেইরকম হয়।' বাবা আর কিছু বললেন না। ছেলেটিও হতভম্ব। আর আমি নির্বাক।

মৈহারে আসা অবধি একটা কথা কতবার যে শুনেছি তা গুণে বলা যায় না। নাতিদের মারবেন শিক্ষার সময়, কিন্তু অসুখ করলেই ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে যাবেন। সেই সময় বরাবর একটি কথা বলতে শুনেছি। 'টাকার থেকে টাকার সুদ খুব মিঠে। আমার এই নাতিরা হল টাকার সুদ। টাকার সুদ না পেলে টাকার মূল্যই নাই। সেই রকম আমার নাতিরা যদি ভাল না থাকে, তা হলে কোন সুখে থাকব। একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। পুত্রকে মূত্র ভাবে জ্ঞান করবে তা হলে জীবনে সুখ পাবে। পুত্রের কাছে কখনও কিছু আশা করবে না। তবে নাতি? নাতিদের কাছেও কিছু আশা করবার নাই, তবে তারা হল টাকার সুদ। বড় মিঠে।' বাবা বলতেন বটে পুত্রকে মূত্র জ্ঞান করবে, কিন্তু আমার মনে হয় পুত্রের প্রতি যা দুর্বলতা ছিল তা অকল্পনীয়।

বাবার এক একটি দিন চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাবার নাম এখনও ওয়েটিং লিস্টে আছে কিন্তু প্লেনে রিজারভেশন হয়ে গিয়েছে। কয়েক দিন ধরেই দেখছি জুবেদা খাতুনের মেজাজ খারাপ। সর্বদাই মার কাছে আলিআকবরের নিন্দা। ছেলে হয়ে কেন কিছু করছে না। মা ছেলের নিন্দা শুনতে পারেন না। একদিন ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে দেখি, জুবেদা খাতুন ঘোমটা দিয়ে বাবার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এখানে সুখ নাই, তাই আমাকে বম্বে পাঠিয়ে দিন।' বাবা নিজের বৌমার সাহস করে এই কথা বলা, স্বপ্নেও বোধ হয় কখনও ভাবেন নি। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আরে আরে এ সব কি?' মার মুখে কোন কথা নাই। কিন্তু মা আজ এসে বললেন, 'দেখ সব আমি করি, তবু কথা শোন দারোগার ঝি'র কাণ্ড।' এই কথা বলে মাও কাঁদতে লাগলেন। ব্যাপারটা কিন্তু আর গড়াল না। এই হল পারিবারিক জীবন। এই জীবনের জন্য লোকে স্বপ্ন দেখে। বাবা নিজের ঘরে চলে গেছেন। দেখলাম আশিস তার মাকে বোঝাচ্ছে। আশিস জোর ধমক খেল। আমি তখন বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম, 'যা করছেন তার পরিণাম কি কখনও ভেবেছেন? এ বিষয়ে আগেও আপনাকে বলেছি, অথচ পাঁচ ছেলের মা হয়েও এটা বুঝতে পারেন না।' দেখলাম কাজ হোল। একটা কথা অকপটে স্বীকার করব, অন্যের কথা যেমন এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে দেখেছি, আমার বেলায় তা কখনও হয় নি। আমার কথায় চুপ করে যেতেন। মার কাছে শুনলাম সব কথা। মা পরে বললেন, 'অন্নপূর্ণা থাকাকালীন সব সামলাতো। কিন্তু এখন তো অন্নপূর্ণা নাই, তাই দারোগার ঝি সাপের পাঁচ পা দেখেছে।' বারো মাস ছেলেদের জ্বর

লেগেই আছে। এই সময় আশিসের জ্বর হল। বাবা বললেন, 'সকলকে বম্বে পাঠিয়ে দাও। বৌ-এর মেজাজ দেখেছ? বৌকে তো, শুয়ার কে বচ্চে একটা চিঠি কিংবা টাকাও পাঠায় না। সতীনের সঙ্গে গিয়ে ঘর করতে চায়। এখানে থাকতে ভাল লাগে না। আরে দুর্ভাগা!' বাবাকে বোঝালাম এ সব নিয়ে মাথা না ঘামাতে। হঠাৎ মা এসে ঘরে ঢুকলেন। মা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বেডা এত করে, মক্কা যাবার আগে একে ভাল করে শেখাও না কেন?' বাবা বললেন, 'যা শিখিয়েছি তাতেই হবে। ওর শক্তি আছে। ভগবানের আশীর্বাদে ও ঠিক ফল পাবে।' এই কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করি আলিআকবর এবং রবুর থেকেও বড় হও কিন্তু কখনও অভিমান করো না। সর্বদা মনে রেখ ওপরে একজন আছে। তার চেয়ে কেউ বড় নয়।' এই কথা তিন বছরে বহুবার শুনেছি। মা যখনই আমার প্রশংসা করে শিক্ষার কথা বলেছেন, বাবা বরাবরই এক উত্তর দিয়েছেন। বাবার এই কথায় আমি মনে মনে হেসেছি। এখন তো বুঝতে পারি, শিক্ষার এখনও বহু কিছু আছে। বাবার উপদেশগুলিই মস্ত বড় শিক্ষা।

আজ আচমকা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু সংবাদে হতবাক হয়ে গেলাম। বাবার সঙ্গে বহু আলোচনা হল। বাবা আজ বাজনা শেখালেন না।

পরের দিন বাবা বললেন, 'আগে কর শেষের আয়োজন।' এই কথা বলেই বললেন, 'মক্কায় গিয়ে নিজে রাঁধবো, সুতরাং এক টিন ঘি 'সিল' করিয়ে আনো।' গরু, মহিষের ভুষির সব ব্যবস্থার জন্য টাকা দিলেন। বাবা সকালেই চলে গিয়েছেন ভূষির জন্য, কিন্তু পান নি। আমি গুলগুলজীর সঙ্গে আট মাইল দূরে গিয়ে ভূষি নিয়ে এলাম। বর্ষা আসছে বলে ভূষির চাহিদা এখন। আমি ভূষি কি করে কোথা থেকে নিয়ে এলাম শুনেই রাত্রে বাবা বল্লেন, 'প্রাচীন এক মল্লার শেখ। মীরাবাঈ কি মল্লার। রাগটা খুব ভাল লাগল। একটা জিনিষ মৈহার থাকাকালীন দেখেছি যখনই কোন কাজ বাবার জন্য করেছি সেই দিন রাত্রে জোর করে বাবা আমাকে শিখিয়েছেন। আসলে বাবা কোন উপকার পেলেই সঙ্গীতে শিক্ষা দিয়ে নিজেকে হাল্কা মনে করতেন। বাবা সর্বদাই বলতেন, 'কারও কাছে কর্জদার হতে চাই না।' কয়েকদিন রোজ ভূষির বস্তা আনা হচ্ছে। বাবার এক কথা, 'দুধ খাব অথচ গরুর খাবারের জোগাড় করব না? এ না করলে পাপ হবে।' মক্কা যাবার আগে যে জিনিষটির কথা মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে এক একটির ব্যবস্থা করছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকাতে সাইটিকা রোগের জন্য কিছু আসন করার প্রক্রিয়া বেরিয়েছে। যেহেতু বাবার সাইটিকা আছে, সেইজন্য বাবাকে কাগজটা দেখিয়ে আসন করতে বললাম। বাবা চুপ করে সব শুনলেন। তারপর? তারপর আমার অবাক হবার পালা। বাবা বললেন, 'মৈহারের মহারাজের কাছে এক ইংরেজ থাকতেন। তার কাছে আমি আসন শিখেছিলাম। সে আজ কত বছর আগেকার কথা। রোজ আসন করতাম কিন্তু এখন আর করি না। তবে নমাজ পড়াটাও একটা আসনের পর্যায়ে পড়ে। এই কথা বলে, বাবা আমাকে কয়েকটা আসন করার পদ্ধতি নিজে করে দেখালেন। কি করে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয় এবং বের করতে হয় সব বোঝালেন। কয়েকটি আসন দেখিয়ে বললেন, 'রোজ আসন করবে নইলে বয়স

বাড়লেই কোমরে ব্যথা হবে বাজানর জন্য।' সেই যে আসনের শিক্ষা পেলাম তা আজও অব্যাহত আছে। পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরীতে আসন শিখেছিলাম।

বাবার আসন করার পদ্ধতি দেখেই বুঝলাম, বাবা যে জিনিষটা ধরেছেন সেই জিনিষ ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন।

আজ দুটো চিঠি পেলাম। জাহাজের ডেকে বাবার আসন শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত জানিয়ে ঘিয়াজি জানিয়েছেন। অথচ মোগল কোম্পানী জাহাজের নিশ্চয়তা এখনও দিতে পারছে না। বাবাকে এ কথাটা বললাম না। ঘিয়াজির চিঠিটা বাবাকে দেখালাম। ঘিয়াজি এবং মোগল কোম্পানীকে, অনুরোধ করে চিঠি লিখলাম ব্যবস্থা করার জন্য।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। বাবা নাতিদের জন্য রবারের জুতো কিনে দিলেন। রবিশঙ্করের চিঠি এল এই সময়। যেহেতু জাহাজের ঠিক হয়নি, সেই জন্য লজ্জায় চিঠি দেয় নি। বাবার কিছু রেকর্ড, দিল্লীর রেডিও স্টেশনে করার অনুরোধ করে বাবাকে লিখেছে। বাবা রাগ করে চিঠির উত্তর দিলেন না। কোথায় বাবা স্বপ্ন দেখছেন মক্কা যাবার, সেই সময় রেডিও প্রোগ্রাম। রবিশঙ্করকে বাবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। শুভও চিঠি লিখেছে আশিসকে।

বাবা নিজের পরিচিত সকলকে চিঠি লিখেছেন যে মক্কা যাচ্ছেন। সব জায়গা থেকে চিঠিও আসছে। বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। আমি পোষ্ট অফিস থেকে এসে দেখি, জুবেদা খাতুন আশিসকে বাবার ঘরে ডাকলেন। বাবার ঘরে কখনও কেউ ঢোকে না। গিয়ে দেখলাম জুবেদা খাতুন চিঠি পড়ছেন। বাবাকে যারা চিঠি দিয়েছেন, সেগুলো পড়ছেন এবং আশিসকে শোনাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখেই আশিসকে বললাম, 'যাও সকলকে নিয়ে পড়তে বস।' আশিস পড়তে গেল। গম্ভীরভাবে আশিসের মাকে বললাম, 'লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার চিঠি পড়া অপরাধ। আর জঘন্য অপরাধ হল, নিজের ছেলেকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন। আশিসের পক্ষে এটা কত বড় ক্ষতিকারক। সেও লুকিয়ে লুকিয়ে এই বিদ্যেটা অর্জন করবে। দয়া করে ভবিষ্যতে এটা করবেন না। আমার উপর বাবা ভার দিয়েছেন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার। ভাল হলে তার কৃতিত্ব আপনারা দাবী করবেন। আর খারাপ হলে আমাকে সকলেই দোষারোপ করবে, আমি কিরকম শিক্ষা দিয়েছি।' আর কথা না বাড়িয়ে পড়াতে বসলাম। মনে মনে বুঝতে পারছি সংসারে অশান্তি প্রবেশ করছে।

বাবা কলেরার ইনজেক্শন নিয়েছেন। মক্কা যাবার জন্য এটা প্রয়োজন। বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবা মাকে বললেন, 'এই বৃষ্টিতে খিচুড়ি কর।' কিন্তু খেতে বসে দেখলাম, আমার জন্য ভাত এবং বাবার জন্য রুটি। রুটি দেখে বাবা রেগে গেলেন মার উপর। মা বললেন, 'কেন রুটি হয়েছে জিগাও তোমার বৌমাকে। বৌমা বলেছে কলেরার ইনজেক্শন নিয়েছো, সেইজন্য খিচুড়ি খাওয়া ভাল নয়। এর জন্য রুটি করেছে।' মার এ কথা শুনে আমি হতবাক। বাবা খিচুড়ি করতে বলেছেন অথচ রুটি করবার সাহস কি করে হোল? বাবার গলার আওয়াজটা জোর হল। বাবা বললেন, 'আরে আরে দারোগার ঝি।' বাবা আর কিছু বললেন না। বাবার এই কথায়, আশিস বিনা কারণে মার খেল, তার মায়ের কাছে। বুঝলাম রাগটা আশিসের উপর দিয়েই গেল।

বৃষ্টি হচ্ছে, সুতরাং কয়েকদিন থেকে আশিস এবং আমি গৌড়মল্লার শিখছি। এর মধ্যে বাবা এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে গেলেন। আমার দাদার চিঠি পেলাম। দাদা দিল্লীতে পোস্টেড হয়েছেন। দাদা এখন নিয়মিত মাসে মাসে টাকা পাঠান। আমার বড়দা এবং মেজদা কোলকাতা এবং বম্বেতে থাকেন। যদিও ছোট থেকে আমার বাড়িতে সঙ্গীতের একটা পরিবেশ ছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভাইয়েরা কাশীর বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন বৃত্তি স্বার্থে। কলেজে যখন পড়েছি তখন বাড়িতে কেবল মা আর ছোট এক ভাইপো। আমার বাবা বেদান্তেই কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি জ্যোতিষ গণনায় বুঝতে পেরেছিলেন। মা এবং বাবার এক শিষ্যের কাছে, আমি এ কথা শুনেছি। আমার বাবা ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন, মা জীবনভোর আমার সেবা পাবেন। আমার মায়ের ছিল এইটুকুই সান্ত্বনা। বাবার এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যও হয়েছিল। দাদাদের বরাবর চাকরির জন্য বাইরেই কাটাতে হয়েছে। আমার জীবনে মৈহারে সাতবছর কাটাবার ফলে, মার থেকে আলাদা ছিলাম। কিন্তু তারপর বরাবর মার কাছেই থেকেছি।

পাঠক হয়ত ভাবছেন কোথায় বাবার কাছে গৌড়মল্লার শিখছিলাম, হঠাৎ এ কোন মল্লার শুরু হল। এই মল্লারের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য, যে সময়ে আমি বাজনা শিখতে যাই সেটা কারও মনঃপূত ছিল না। কারণ সঙ্গীত শিখে কি করে অর্থোপার্জন করব এটা জানা ছিল না। আর আমি? টাকা যে জীবনে মানুষের কত প্রয়োজন তা একবারে ভেবেও দেখিনি। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আমার সেজদাই ১৯৫০ সনে রেঙ্গুন থেকে এসে অবধি বরাবর আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আজও দেয়। সেই দাদা যখন দিল্লীতে পোস্টেড হল, আমার জন্য হল গৌড়মল্লার। বাড়ির সকলেই চিন্তিত আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু, আমার বাবার ভবিষ্যৎ বাণীর উপর আস্থা ছিল। যদিও আমার সব দাদারা মাকে টাকা পাঠাত, কিন্তু টাকা থাকলেই কি সুখ কেনা যায়? প্রত্যেক মা নিজের পুত্রকে কাছে পেতে চায়। আমার মা আমাকে কাছে পেয়ে টাকার থেকে বেশি সুখ পেয়েছেন।

বাবা এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে গেলেন। রেডিওতে গৌড়মল্লার এবং ছরজুকি মল্লার শুনলাম।

বাবা এলাহাবাদ যাবার সময় পাঁচ দিনের খরচা দিয়ে গিয়েছেন। জুবেদা খাতুন আমাকে বললেন, 'এতদিন বাড়তি খরচের জোগান অন্নপূর্ণা দিত। এবারে বাবা মক্কা যাচ্ছেন। বেশী টাকা খরচা হয়ে গেলে বাবা চটে যাবেন সুতরাং আপনি আশিসের বাবাকে লিখুন প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে।' উত্তরে বললাম, 'এই টাকার কথা আপনারই লেখা উচিত।'

একটা নূতন জিনিষ লক্ষ্য করেছি। আশিসের কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আগে আশিস, একেবারে শান্ত ছিল। আজকাল আশিস তার মার সঙ্গে সিনেমার গল্প করছে। কথাটা ভুল বললাম। আশিস সিনেমার গল্প করছে না, আসলে তার মা-ই তার সঙ্গে খুব সহজ হয়ে সিনেমার গল্প করছে। আশিস ছোট। সুতরাং তার কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। আশিসের মেজাজটাও দেখছি মায়ের মত হচ্ছে। চাকরের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলল আমার চোখে অশোভনীয় ঠেকল। আশিসকে বললাম, 'চাকর হলেও তোর থেকে বয়সে অনেক

বড়। অন্যকে সম্মান করলে তবেই সম্মান পাওয়া যায়।' আশিস চুপ করে রইল। এবারে জুবেদা খাতুনকে বললাম, 'দয়া করে ভাল ছেলেটির মাথা খারাপ করবেন না। আশিসকে রিয়াজ করতে দিন।' আমার এই বলাটার কারণ ছিল। কয়েকদিন ধরে দেখছি জুবেদা খাতুন সর্বদা ছেলের কাছে তার বাবার নিন্দা করছে। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে? এই ভেবেই বললাম, 'আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি কি জানেন না, ছেলের কাছে তার বাবার নিন্দা করলে, ভবিষ্যতে আপনিও তার চোখে ছোট হয়ে যাবেন।' আমার কথা শুনে জুবেদা খাতুনের সেই এক কথা, 'আমার দুঃখের কথা কাকে বলব?' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'দুঃখের কথা তো মাকে প্রায়ই বলেন। সে বলাটাও ঠিক নয়। একটা কাজ করুন, গাছকে নিজের দুঃখের কথা বলুন। মনটা হালকা হয়ে যাবে।' এ কথা শুনে গুম হয়ে গেলেন।

পরের দিন রেডিওতে বাবার দরবারী শুনলাম। বাজনা শুনছি, হঠাৎ দেখি জুবেদা খাতুন আশিসকে বলছেন, 'তুই কি জানিস কেন আমি বম্বে থেকে চলে এসেছি?' হাত জোড় করে বললাম, 'দয়া করে বাজনা শুনতে দিন। বাজাবার বা বাজনা শুনবার সময়, কেউ কি কথা বলে? অন্য ঘরের মেয়েরা কিছু করলে মনে করতাম না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে শোভা পায় না।' কথায় কাজ হোল। চুপ করে গেলেন। আশিসকে বললাম, 'ভাল করে শোন। গৎ একটু পরেই বাজবে। শুনে শুনে নকল কর।' আশিসও চুপ করে গেল। বাজনা শেষ হয়ে গেল। খুব ভাল লাগল। ঘরে এসে মনে অনুকম্পা জাগল আশিসের মায়ের প্রতি। ভাবলাম আলি আকবর এত দায়িত্বহীন কেন? তার কি কোন কর্তব্য নেই? সে যদি এদিকে একটু লক্ষ্য রাখে, চিঠি লেখে, টাকা পাঠায় এবং মাঝে মাঝে আসে, তা হলে কত সুখের সংসার হতে পারে। কিন্তু এখানে সব কিছুই উল্টো পথে চলছে। এর পরিণাম কী হবে?

বাবা আসবার আগেই মা জ্বরে পড়লেন। মার স্বভাবত জ্বর হয় না। কিন্তু মৈহারে ম্যালেরিয়া হওয়াটা ডাল ভাতের মত। এলাহাবাদ থেকে বাবা এসেই দেখলেন মায়ের জ্বর। দুপুরে জ্বর ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বিকেলে আবার জ্বর এসে গেল। বাবার ইচ্ছে ছিল নাতিদের নিয়ে সিনেমা যাবার, কিন্তু মার জ্বর বলে নিয়ে গেলেন না। ছোট ছেলেদের জন্য এই বই নয়। তবে বইটা দেখলে আনন্দ পাবে ভেবে বাবাকে বললাম, 'যখন ভেবেছিলেন সিনেমায় যাবেন তখন দেখে আসুন।' বাবা বললেন, 'বলছ? দেখে আসব?' এই কথা বলে বাবা একাই সিনেমা গেলেন। বুঝলাম এখনও টিকিট আসছে না বলে বাবার মনটা ঠিক নাই। তাই বাবা সিনেমায় গেলেন। মা হেসে বললেন, 'তোমার বাবা এমন নখড়া দেখাল, যে আমার শরীর খারাপ বলে নাতিদের নিয়ে গেল না অথচ নিজে চলে গেল।' মায়ের কথা শুনে আমারও হাসি পেয়ে গেল। বাবার মতি গতি বোঝা ভার। বাবা সিনেমা দেখে এসে বললেন, 'সিনেমাটা ভাল।' তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি করে জানলে সিনেমটা ভাল।' বাবাকে বললাম, 'কাগজে বেরিয়েছে বইটা ভাল।'

পরের দিন মার শরীর ঠিক হয়ে গেল। রবিশঙ্কর আশিসের পড়ার জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা পড়ার বই দেখে খুশী হলেন। আশিস যাতে মন দিয়ে পড়ে তার জন্য আশিসের ঘরে একটা মারকারি বালব লাগিয়ে দিলেন। যে কাজ আলি আকবরের

করা উচিত সে কাজ রবিশঙ্কর করে। আশ্চর্য! আলিআকবর একেবারে বম ভোলানাথ।

রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। বাবাকে লিখেছে, আশিসকেও নিয়ে যান মক্কাতে। আশিসের একটা পাসপোর্ট করিয়ে নেবেন।' বাবা চটে উঠে বললেন, 'এরা কি দিল্লগি পেয়েছে? আমার টিকিট করতে পারছে না অথচ আশিসকে নিয়ে যাব এই ভিড়ের মধ্যে। তবে এটা ঠিক, আশিসকে বম্বে নিয়ে যাব। বম্বে থেকে পাঠিয়ে দেব অন্নপূর্ণার কাছে। অন্নপূর্ণার কাছে থাকলে ঠিক শিক্ষা হবে। অন্নপূর্ণার কষ্ট হবে, কিন্তু কি করব? আলি আকবরের কাছে, কার ভরসায় আশিসকে রেখে যাব?' বাবা আমাকে এই সব বলছেন, হঠাৎ জুবেদা খাতুন ঘোমটা টেনে বাবাকে বললেন, 'একা একা আপনি যাবেন, আশিস গেলে আপনাকে দেখতে পারবে।' বাবা রেগে উঠে বললেন, 'তুমি কি এই সব লিখেছ নাকি রবুকে? আমার সঙ্গে কারো যাবার দরকার নাই। ঐটুকু ছেলে আমাকে কি দেখবে?'

এই কথা বলে বাবা আশিস ও আমাকে গৌড়মল্লার শেখালেন। বাবা বললেন, 'সারং এবং কানাড়া ভাল ভাবে না শিখলে কোন মল্লারই বাজাতে পারবে না। এক একটা রাগ অনেক দিন ধরে শিখতে হবে। দরবারী এমন রাগ, যে তিরিশ বছর ঠিক মত বাজালে তবে দরবারীর অনুভূতি বুঝতে পারবে।' বলেন কি বাবা? বাবার এক একটা কথা মনে হত অতিরঞ্জিত করে বলেন, কিন্তু পরে বুঝেছি বাবার কত দূরদৃষ্টি ছিল।

বাবা ব্যাণ্ডে যাবার পর, জুবেদা খাতুন আশিসকে নিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'আশিসকে বম্বেতে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?' আশিসও সঙ্গে সঙ্গে বলল 'মা যা বলছে করলে কেমন হয়?' আশিসকে, কি করে বলি, হলে তো খুব ভাল হতো কিন্তু সে ভালটা হবে না। দুজনের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'এ সব কথা বাবাকে আমি বলতে পারব না। যদি গালি খাবার ইচ্ছা হয় তা হলে বাবাকে বলুন। একটা কথা, আশিস বম্বে গিয়ে থাকলে একলা হয়ে পড়বে। আশিসের বাবা বাইরে বাইরে থাকেন। এ ছাড়া সেখানে কি পরিবেশ, আপনি ভাল করে জানেন। আর যখন বাবা নিজে বলেছেন দিল্লীতে পাঠাবেন তখন তো কথাই ওঠেনা, আশিসের ঠিক মত শিক্ষাও হবে।' আমার কথা শুনে জুবেদা খাতুন এবং আশিস দুজনেই বলল, 'ঠিকই বলেছেন।' আজ রাত্রে বাবা মিঁয়া কি মল্লার শেখালেন।

আজ মুঘল লাইনস থেকে টেলিগ্রাম এল জাহাজে ঠিক হয়ে গেছে। রবিশঙ্কর টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে প্লেনের টিকিট বাতিল করে দিয়েছে। মৈহার থেকে ঊনত্রিশ তারিখে বম্বে যেতে বলেছে। বাবা এই সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেন। এই সময়ে দুজন মুসলমান ভদ্রলোক এসে বাবাকে বললেন, তাঁদেরও মক্কা যাওয়ার টিকিট ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাবা তাঁদের মুবারক জানালেন।

সকলে চলে যাবার পর বাবা আমাকে ডাকলেন। বাক্স নিয়ে এসে খুলতে বললেন। বাক্স খুলে দেখলাম টাকা আছে। বাবা বললেন, 'এর থেকে পাঁচশ টাকা নাও এবং ঘিয়াজিকে পাঠিয়ে দাও।' বাবাকে দেখিয়ে দেখিয়ে গুণলাম এবং ঘিয়াঝিকে মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সময় বাবা মিঁয়া কি মল্লার শেখালেন। রাত্রে হঠাৎ রেডিও খুলতেই শোনা গেল রবিশঙ্কর বাজাবে মিঁয়া কি মল্লার। বাজনা শুনবার পর বাবা বললেন, 'আজকাল রবুর বাজনা

হাল্কা হয়ে গেছে। মিঁয়া কি মল্লারের মত রাগে গাম্ভীর্যের অভাব। আলি আকবরের মধ্যে এখনও সেই ভাব আছে।' বাবার মন্তব্য শুনে আমি তো অবাক। সত্যই বাবাকে চেনা ভার।

পরের দিনই পোষ্ট অফিসের বই, মায়ের নামে করে দেবার জন্য পোষ্ট মাষ্টারকে বলা হোল। তিনি বাড়িতে এসে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আজ বাবা নিজের পরিচিত সকলকে হজে যাবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখতে বললেন। বাবা নিজে কুমিল্লায় এবং দক্ষিণারঞ্জনকে চিঠি লিখলেন। জাহাজে রিজারভেশন হয়ে যাবার আনন্দে বাবা আজ নাতিদের নিয়ে 'তিন বাত্তি চার রাস্তা' সিনেমা দেখতে গেলেন। রাত্রে আলি আকবরের টেলিগ্রাম এল, প্রোগ্রাম ফিক্সড এণ্ড টিকেট পারচেসড। রাত্রি এগারটা বেজে গেছে বলে বাবাকে জানালাম না। সকালে বাবাকে টেলিগ্রামের কথা বললাম। বাবা খুসী হলেন কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'এতদিনে মনে পড়েছে।' আলি আকবরকে সব জানিয়ে চিঠি দিলাম। এই সময় তিমিরবরণ ভট্টাচার্যের চিঠি এল। তিমিরবরণ চিঠিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখেছে যে স্ত্রী এবং ছেলে অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবে এবং ছেলে শিখবে। চিঠিটা পড়ে শোনালাম বাবাকে। বাবা বললেন, 'অনেক জ্বালিয়েছে, ছেলেকে পাঠাতে চায়। এই বয়সে দায়িত্ব নেওয়া মুশকিল। যদিও আমার প্রথম ছাত্র, তাহলেও লিখে দাও আমি এখন হজে যাচ্ছি। যদি ফেরৎ আসি তখন দেখা যাবে।' বাবার কথা শুনে বললাম, 'এ কি কথা বলছেন?' বাবা বললেন, 'কোন ভরষা? এর জন্যই তো সব ব্যবস্থা করে গেলাম। দেখ যদি তোমাদের ভাগ্যে ফিরে আসি।' ঠিক এই সময়ে আশিসের গলার মধ্যে ছোট ছোট দানার মত দেখা গেল। বাবা চটলেন। বললেন, 'এ কি জ্বালা? তুমি এখানে এসেছ শিখতে কত আশা নিয়ে, আর দিন রাত এ শুয়ার কে বচ্চেদের জন্য ডাক্তার আর ওষুধ কর।' ডাক্তারের কাছে আশিসকে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন, 'টনসিল বেড়েছে, ভয়ের কিছু নেই।' আশিসের শরীর খারাপ বলে, বাবা আমাকে মিঁয়া কি মল্লার শেখালেন। শেখাবার সময় বাবা বললেন, 'দরবারীয় গান্ধার শুনে শুনে ঠিক করতে হবে।' আশিসকে বললেন, 'বসে শোন।'

আজ গুরু পূর্ণিমা। গুরু পূর্ণিমায় বাবাকে চন্দন এবং মালা পরিয়েছি, জিলিপি খাওয়ালাম। বাবা খুব খুসী। পুজোর পরই বাবা গুর্জরী তোড়ির পুরনো বন্দিশের দ্রুত গৎ শেখালেন। গৎ তো অনেক তৈরী করা যায়। কিন্তু প্রাচীন বন্দিশ শুনলেই বোঝা যায়। এত ভাল গৎ যার তুলনা নেই। তালি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। রিয়াজের নানা পদ্ধতি বাবা শেখালেন। মা খুব আন্তরিক আশীর্বাদ করে বললেন, 'আল্লা তোমার ভাল করুন। যে কষ্ট করে বাজাচ্ছ তাতে যেন ভাল হয়। খুদা করুন খুব বড় হও।' রাত্রে, বাবা আশিস এবং আমাকে শেখাতে লাগলেন। মিঁয়া কি মল্লারই চলছে। তারপরণের সময় বাবার তার ছিঁড়ে গেল। বাবা বললেন, 'আলাদা আলাদা করে দুজনে বাজাও।' আমি ঝোঁকের মাথায় অন্নপূর্ণাদেবী যা শিখিয়েছিলেন বাজাতে লাগলাম। বাবা শুনে খুশী হলেন। কিন্তু পরমুহুর্তেই বললেন, 'এই সব বোলের অঙ্গ শিখিয়েছি?' ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'আপনার বাজনা রেডিওতে শুনে শুনে শিখেছি।' বাবা বললেন, 'ঠিক, অর্দ্ধেক গুরুর কাছে শিক্ষা হয়, অর্দ্ধেক শুনতে শুনতে হয়।' খাবারের ডাক পড়ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরের দিন বাবা নাতিদের নিয়ে সিনেমা গেলেন। খুব ভাল বই 'মা'। বাবা সিনেমাটা দেখে এসে বললেন, 'বইটার প্রথম জীবন তোমার মায়ের সঙ্গে মেলে। তোমার মায়ের ভাগ্যে কি আছে ভগবান জানেন।' আজ ঠিক হয়েছে বাবা আশিসকে বম্বে পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। বম্বে থেকে আশিস দিল্লী যাবে। দিল্লীতে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে ভাল শিক্ষা পাবে।

প্রায় তিন মাস আগে মক্কার প্রসাদ পেয়ে মক্কা যাওয়া স্থির করেছিলেন। তারপর কত কাঠ খড় পুড়ল। শেষকালে যাবার দিন ঠিক হয়েছে আজ। পাঁচটা ফুল নিয়ে এ্যালাবিয়া সাহেব এসে বাবাকে দিলেন যেহেতু বাবা হজে যাচ্ছেন। বাবার যাবার আগে, আচমকা জুবেদা খাতুন কেঁদে উঠলেন। বাবা কান্না দেখলে দুর্বল হন। কিন্তু কেঁদে যদি কেউ নিজের মতলব হাসিল করতে চায়, বাবা বুঝতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চটে ওঠেন। বাড়িতে সকলে বাবাকে প্রণাম করল। স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। সকলের হাতেই মালা। বাবা এক ফাঁকে আমাকে বললেন, 'যখন ফিরে আসব তখন কাউকে বোলো না। যদি কাউকে বলো তা হলে রাগ করব। লোক দেখান জিনিষ আমি পছন্দ করি না।' বাবাকে সম্মতি জানাতে হল। মুসলমানরা কোরাণ শরিফ পাঠ করতে লাগলেন। কোরাণ শরিফ শুনে বাবা কেঁদে ফেললেন। বাবার দেখা দেখি সকলের চোখেই জল। বাবা কখনও মৈহারে কারো বাড়ি যান না। কিন্তু বাবা হজে যাচ্ছেন শুনে কত লোক স্টেশনে উপস্থিত। বাবার প্রতি মৈহারবাসীর কি অপরিসীম শ্রদ্ধা। গাড়ী এল। বাবা আশিসকে নিয়ে চলে গেলেন। বাবা কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেলে স্বাধীনতার আনন্দ পাই। কিন্তু আজ এই প্রথম, বাবার যাবার পর বাড়িতে এসে মনে হোল সব খালি।

মার খুব ইচ্ছা সিনেমা দেখার। মাকে নিয়ে 'মা' সিনেমা দেখিয়ে আনলাম। মা বললেন, 'বেডা তোমার জন্য সিনেমা দেখতে পেলাম। মার মন খারাপ বলেই মাকে সিনেমায় নিয়ে গেলাম। মা বারবার বললেন, 'তোমার বাবা যেন না জানতে পারে।'

৩৩

বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

বোম্বে
গ্রিন হুটেল হইতে

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন জানিবে আমি মঙ্গলমতে বোম্বে পৌঁহুছিয়াছি, আমি গ্রিন হুটেলে উঠেছি, এখানে এসে হজ কুমুটিতে গিয়েছিলেম, শ্রীমান হরিহর আমাকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাসফুট ও দস্তখত দেওয়া হয়ে গেছে। দুইদিন পাইব তারপর টিকেট দিবে। টিকেট পেয়ে গেলেই জাহাজে চরিব, তুমাদের জন্য মন হাহাকার করে, অমরেসকে ও প্রাণেশকে ছড়ে এসে প্রান বড় হাহাকার করে, এদের কে ভুলতে পারি না, এরাই হল আমার প্রাণের প্রিয়বন্ধু। খুদা যেন সকলকে কুশলে রাখেন, এই আসির্ব্বাদ করি।

শ্রীমান বাহাদুরের মুখে শুনিলাম, ছুট বৌয়ের ধিগে সন্তান হবার উম্মেদবার, এজন্য

বৌয়ের মা ও বোন ভাই সকল এখানে এসেছে তুমার দাদার বাসাতে। ২৮ তারিখ দুপ্রহরে তুমার দাদর বাসায় শ্রীমান হরিহর নিমন্ত্রণ করেছে আহার করিবার জন্য। শ্রীশ্রীযুক্ত মহাত্মা টাটবাবা ও এর বাসায় পদধুলি দান করিবেন, এইজন্য আমি সিকৃত হলেম। শ্রীমান বাহাদুর আমার তত্বাবধানেই আছে সমস্তদিন কাটিয়েছি, শ্রীমান নিখিল, শ্রীমান পান্নালাল, শ্রীমান হরিহর, শ্রীমান আলিআকবর, সকলে আমার তত্বাবধানে করে, ৪ টার সময় বাসায় গিয়েছে। হুটেলে বড় আনন্দে আছি।

আশীসের প্রণাম নিবে তুমার মাকে জানাবে কোন রূপ যেন চিন্তা না করে, বৌমা ও নাতি নাতিন নিয়ে আনন্দ করে যেন বাস করে। কুন রূপ চিন্তা না করে, বৌমা সকলকে আমার আসির্ব্বাদ জানাবে।

বৌমাকে জানাবে আনন্দ নিয়ে যেন সংসার চালনা করে আমার জন্য কুনরূপ চিন্তা না করে। আশীসের প্রণাম তুমার মাকে ও বৌমাকে জানাবে সে আনন্দেই আছে, শ্রীমান রবিশঙ্কর আসিলে এর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি, ধ্যানিষ ও শ্রীকে বলিবে এরা যেন রিয়াজে পরিত্যাগ না করে। যদি সাধনা না করে আমি এসে তাদের উপযুক্ত সাস্তী প্রয়োগ করিব আমার, আসির্ব্বাদ দেবে।

ইতি
বাবা আলাউদ্দিন।

চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, বাবা বম্বে গিয়ে, 'গ্রীন হোটলে উঠেছেন। আলি আকবরের বাড়ি গিয়ে ওঠেন নি। হরিহর বাবাকে নিয়ে গিয়েছে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করাতে। রবিশঙ্কর নিজের সঙ্গীতের ট্রেডটা বুঝেছে। বাড়িতে যা নিয়ে অশান্তি, রবিশঙ্করের, সে দিকে খেয়াল নেই। রবিশঙ্কর প্রতিটি শহরেই হাঁতে হাঁ করে, এবং না তে না করার জন্য, কিছু চামচে রেখেছে। যারা তার পাবলিসিটি করে। বাবার চিঠি পড়ে মনে পড়ে গেল। 'টাকার থেকে টাকার সুদ মিঠে।' ছোট দুই নাতির জন্য বাবার মন কেমন করছে। বাবার ভেতরের কোমল প্রাণ প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আলি আকবর 'টাট বাবার' সাহায্যে নূতন স্ত্রীকে দেখাবার ব্যবস্থা করছে। নূতন বৌ সন্তানসম্ভবা। বাবা টাট বাবার কথায় সহজ ভাবেই সব মেনে নিয়েছেন। যাক আলি আকবরের চিন্তা দূর হয়েছে। নূতন বৌকে ছোট বৌ বলে বাবা স্বীকার করে নিয়েছেন। বাহাদুর, নিখিল, পান্নালাল ঘোষ সবাই আছে। বাবা আনন্দেই আছেন। বাবার যাবার পরই জুবেদা খাতুন নূতন বায়না ধরেছেন সিনেমা যাবেন। স্পষ্ট বলে দিলাম, 'আমি নিয়ে যাব না, কারণ বাবার কানে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যদি নিজের দায়িত্বে যান, মার সঙ্গে যেতে পারেন। আমি টিকেট কিনে বসিয়ে দেব।' যাক কাজ হল। সিনেমা যাবার ইচ্ছা স্থগিত রাখলেন। বাবার কথামত বাজার করছি। বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন তরিতরকারি, মাছ, সব জিনিষের দাম, দোকানদার যা বলবে, প্রথমে অর্দ্ধেক দাম বলতে হবে। তারপর একটু বাড়াতে হবে। যদিও বাবার অবর্তমানে সংসারের খরচ করেছি দীর্ঘ তিনমাস, কিন্তু সে সময়

অন্নপূর্ণা দেবী থাকাতে অসুবিধা হয় নি। এখন বাবার একটা আন্দাজ হয়েছে কত খরচা মাসে লাগে। কিন্তু এখন যে খরচা বেড়ে যাবে তার ফলে বাবা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। এখন টাকা যোগান দেবে কে? তাই প্রথমেই খরচার রাশ টানতে হবে। ইতিমধ্যে এ্যালাবিয়া সাহেব এক নিদারুণ সংবাদ জানিয়েছেন। যে প্লেনে বাবার টিকেট কনফারমড ছিল, সেই প্লেন ছাড়ার কিছু পরেই সমুদ্রগর্ভে চলে গেছে। ভগবানের অসীম করুণা বাবা এই প্লেনে যাননি, নইলে রবিশঙ্কর জীবনে নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না এবং সকলের কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেত চিরকালের মত।

বাবা যাবার দশ দিন পরেই বাহাদুর বম্বে চলে গেল। বাহাদুর বম্বেতে, নাচের ব্যালে ট্রুপে, সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করে। বাহাদুরের কথায় জানলাম, নিখিল আলিআকবরের কাছে শিখছে। আশিসের মায়ের কাছে বাহাদুর আলিআকবরের দ্বিতীয় স্ত্রীর গল্প শুরু করল। এই সব পরনিন্দা পরচর্চা আমার ভাল লাগে না। আমার একটা, কি জানি কেন দুর্বলতা আছে আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর সম্পর্কে। এদের সম্বন্ধে আমার নানা অভিযোগ আছে কিন্তু কেউ এদের বিষয়ে বললেই মাথা গরম হয়ে যায়। মনে যা আসে তাই বলে দি। বড় ছোটর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকেনা। আমার এই দুর্বলতাটা মৈহার ছাড়ার বহুদিন পর পর্যন্ত ছিল। আমার এই স্পষ্ট উক্তির জন্য মৈহারেও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং মৈহার ছাড়ার পর আমার যে ক্ষতি হয়েছে গুণে বলা যাবে না।

বাহাদুর পনের দিন মৈহারে থেকে বম্বে চলে গেল। বাবা বলে গিয়েছিলেন সুরদাসের সঙ্গে রিয়াজ করতে। সুরদাস আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তবলায় ঠেকা দিত যখন তারা মৈহারে শিক্ষাকালীন ছিল। বাবার অবর্তমানে সুরদাস সপ্তাহে ছয় দিন আসতে লাগল। রাত্রে রোজ রেডিও শুনি। কোলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গীত সমালোচনা রেডিওতে শুনি। খুব ভাল লাগে। লক্ষ্ণৌ থেকে সাদিক আলি খাঁর বীন, নিসার হুসেন খাঁর তারানা ও দিল্লী থেকে বুন্দু খাঁর সারেঙ্গী এবং মুস্তাক হুসেন খাঁর গান আমাকে আকর্ষণ করে। এ ছাড়া বাবা, আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের বাজনা কোন না কোন স্টেশন থেকে বাজেই। আর প্রতি সপ্তাহে কোলকাতার বাংলা নাটক আমাকে আকর্ষণ করে। অবশ্য রেডিওতে সকলের বাজনা এবং গানই শুনি। বাড়িতে মার কার্যক্রম ঘড়ি ধরে চলে। খাবার পর মা রোজ হারমোনিয়াম বাজান। বাবা মক্কা গিয়ে চিঠি দিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে, কিন্তু চিঠি পেলাম পনের দিন পর। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মক্কাশরিপ
৬-৯-৫৩

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা জিতেন জানিবে খুদার অসিম কৃপা বলে আমার হজ মঙ্গলমতে হয়ে গেছে, এখন হজ কবুল খুদার ইচ্ছা। সংস্কারের সব ভুলে গেছি সময় খুব কম পত্র লিখিবার সময় নেই। আমার স্নেহের বাবা ডাক্তার সাহেব ও পুষ্ট মাষ্টার ঐন্য ২ যাবতিয় সকলকে আমার নমস্কার আসির্ব্বাদ জানাবে তুমরা সকলে দুয়া নিবে।

তুমার মাকে বৌমাকে দুয়া, নাতি নাতিন সকলকে দুয়া, বুদ্ধা বয়রা সকলকে আসির্ব্বাদ জানাবে।

মাইহারের দুইজন হাজিন এরা ভাল আছে কাট্রাতে খবর জানাবে, মাইহারের মুসলমান হিন্দু সকলকে আমার সেলাম দুয়া জানাবে। বেণ্ডের সকলকে আমার দুয়া দেবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা
আলাউদ্দিন।

যাক বাবার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। বাবার হজ হয়ে গিয়েছে। বাবা কবে আসবেন লেখেন নি।

ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে, আশিস এবং শুভর চিঠি পেয়েছি। আশিস লিখেছে, 'পিসিমা সংসারের খরচার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাবে।' এই সংবাদে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এছাড়া এক মাসের মাথায় খবর পেয়েছি আলিআকবরের দ্বিতীয়া স্ত্রীর একটি কন্যা হয়েছে। বাবা যাবার দুই মাস পরে আলিআকবরের চিঠি পেলাম। আমার খুব প্রশংসা করে শেষে 'ইতি হতভাগ্য তোমার দাদা' বলে লিখেছে। কিন্তু টাকা পাঠাবার কোন নাম নেই।

রবিশঙ্করের চিঠিতে জানতে পারলাম বাবা অক্টোবর মাসে আসবেন, কিন্তু কোন জাহাজে আসবেন জানাতে পারেন নি। উত্তরে লিখলাম, 'বাবার হজ যখন হয়ে গিয়েছে, তখন জাহাজ পাচ্ছেন না বলেই আসতে পারছেন না।'

এর মধ্যে পুজো এসে গেছে। পুজোর মধ্যে বাবার তৈরী রাগ 'ভগবতী' বাজালাম। সুরদাসের সঙ্গে নানা তালে, যেমন আড়া চৌতাল, ধামার, জয়মঙ্গল, লীলা বিলাস, লক্ষ্মী তালে বাজাই। ঠেকা বলে দিলে সুরদাস ঠিক বাজিয়ে যায়। পুজো যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারা গেল না। আজ আঠারই অক্টোবর। শুভ বিজয়া। পুজোতে বাবার বাড়ির পাশে যেখানে আমরা ফুটবল গ্রাউণ্ডে খেলা করি, গুলগুলজীর মুখে শুনলাম, সেখানে এবার মহারাজের পুত্র আসবেন। রাজ কুমারের সামনে দশহরার জন্য সকলে প্রসেশন করে আসবে। রাবণের একটি বড় মূর্তি তৈরী করা হবে। গুলগুলজীর কথায় এখানে বিজয়াতে মাঠে রাবণের মূর্তিটা, যা খড় দিয়ে তৈরী করে, সেটা জ্বালান হয়। গুলগুলজী রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজকুমার আমাকে রাজবাড়ীতে যাবার জন্য বললেন। আমারও অনেকদিনের ইচ্ছা রাজমহল দেখবার, বাবা কোথায় বসে মহারাজকে শেখাতেন? সকলকে বিজয়ার চিঠি দিলাম। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকেও একটি চিঠি দিলাম। লিখলাম 'মৈহার ছাড়ার পর আপনার কাছে একটা প্রার্থনা জানাব, আশা করি আমাকে নিরাশ করবেন না। আমার জীবনের একটি স্বপ্ন, যা ছোটবেলা থেকেই আমার অবচেতন মনে স্থান পেয়েছে, সে কথা দেখা হলেই বলব।'

বিজয়ার পর গুলগুলজীর সঙ্গে রাজবাড়ী গেলাম। রাজকুমার সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

দেখালেন। বিরাট রাজবাড়ি সন্দেহ নেই, কিন্তু মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ মনে হোল। রাজদরবার দেখলাম। বাবা মহারাজকে কোন ঘরে বসে শেখাতেন দেখলাম। বিরাট আস্তাবল। একটি ঘোড়াও নেই। সব ঘোড়ার আস্তাবল স্তুপে পরিণত হয়েছে। এক দিনেই রাজকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রাজকুমার আলিআকবরের সমবয়সী। পুনরায় নিমন্ত্রণ করল। বাবার ইচ্ছা নয় কোন জায়গায় যাই। মৈহার ছোট জায়গা এসে অবধি কার্য উপলক্ষে মৈহার দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই রাজবাড়ির দিকে কখনও কাজ পড়েনি বলে দেখিনি। যে হেতু বাবা দীর্ঘদিন এই রাজবাড়িতে এসেছেন, সুতরাং জায়গাটি আমার কাছে তীর্থ স্থান মনে হোল। বাড়ি ফিরেই রবিশঙ্করের টেলিগ্রাম পেলাম। বাবা একুশে অক্টোবর বম্বে পৌঁছবেন এবং বাইশে অক্টোবর বম্বে এক্সপ্রেসে মৈহার পৌঁছবেন। ট্রেন অ্যাটেণ্ড কোরো। টেলিগ্রাম পেয়ে জানি না কেন খুব উত্তেজনা অনুভব করলাম।

হজ করে ফিরলে সকলে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। কিন্তু বার বার বাবা নিষেধ করেছেন কাউকে বলতে, সুতরাং চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। রাত্রের ট্রেন আসবেন সুতরাং কেউ জানতেই পারবে না। বাবা এলেন। ভোরে এলে সকলেই জানতে পারত।

টেলিগ্রাম পাবার দুদিন পর রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। রবিশঙ্কর লিখেছে, 'জাহাজে এলে বাবাকে নামিয়েই, ট্রেন ধরিয়ে দেবো। বাবাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিও।' যাক নিশ্চিন্ত হলাম।

বাবার অবর্তমানে প্রায় তিন মাস কিভাবে কেটে গেল ভাবতেও অবাক লাগে। কথায় আছে, বুঝদিল দোস্তসে দানেদার দুশ্‌মন্‌ অচ্ছা, অর্থাৎ মূর্খ বন্ধু থেকে বুদ্ধিমান শত্রু ভাল। আমার জীবনে এরকম মাল কয়েকটা জুটেছে। নাম করে লিখলে, তাদের অহেতুক গৌরব প্রদান করা হবে, তাই লিখি বিনা নাম দিয়ে। কিছু মূর্খ আছে যারা ভাল বোঝে না, তা নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক। তাদের সংস্কৃততে বলে বলীবর্দমূল্য, অর্থাৎ ষাঁড়ের মত মাথা মোটা। যে হেতু ব্যাপারটা ষাঁড়ের মত, আর আমি বাবা বিশ্বনাথ কাশীর লোক, তাই ষণ্ড গোত্র কোন প্রাণীই হোক দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, তার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। কিন্তু যার দুর্বুদ্ধির একটু উন্মেষ হয়, বোকামীর সাথে, তাকে উর্দুতে বলে 'খতরনাক বুজদিল' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর মূর্খ, সেই রকম একটি ভয়ংকর মূর্খের পাল্লায় পড়েছিলাম।

দোতলায় উঠবার তিনটে পদ্ধতি হতে পারে, প্রথম, প্রচলিত সর্বগম্য সিঁড়িতে প্রতি পদক্ষেপে ওঠা। তার জন্য একটা প্রচেষ্টা থাকতে হয়, সেটি হল ওঠার ইচ্ছা। দ্বিতীয়টা হল কৈবত্যবাদের মেয় অর্থাৎ চাটুকারিতার মই এর সোপানবেয়ে ওঠা। আর তৃতীয়টা হল, অধম পন্থা, মর্কটসুলভ এক লাফে ওঠার ইচ্ছা। পরীক্ষায় প্রথম হবার দুইটি পন্থা আছে, হয় সম্ভাব্য ফাস্টবয় এর থেকে পড়াশোনায় ভাল হওয়া, আর না হলে ফার্ষ্টবয় এর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়া।

এরকম কয়েকটি প্রাণী মৈহার থাকাকালীন এল আমার জীবনে। তারা কেউ চাইল কৈবত্যবাদের মৈতে চাপতে আর কেউ চাইল ঠ্যাং ভাঙ্গতে। তাদের বাহাদুরি বটে। বীর বাহাদুরের মত, তারা বিদ্বেষের বীজ সযত্নে ছড়িয়ে দিয়ে, শ্রীদুর্গা বলল। আর আমার অবস্থা, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মেনশন নট'। বাড়িতে চারটে লোক ভুল বোঝাবুঝিতে স্টাগনেন্ট হয়ে

গিয়েছে। সকলেই দূরে দূরে রয়েছে। এ যেন ঘুমন্ত লোকের বুকে পাথর চাপিয়ে পালিয়ে যাওয়া। আগে দম নেব, তবে তো পুরো দমে পাথরটা তুলে ফেলব। দম নিতে বেশ কয়েক দিন সময় নিল। যাক বাবার ভাষায় 'আপদপানা' বেশিদিন টেকে না। আমাদের পাড়ার ননী পিসির ভাষায়, 'এরা যমের সন্তান'!

রাত্রে বাবা আসবেন। রাত্রে স্টেশনে গেলাম। গিয়ে শুনলাম গাড়ী আড়াই ঘণ্টা লেট। কোথায় গাড়ী আসবে রাত্রি বারোটার সময়, সেই জায়গায় এল রাত্রি আড়াইটের সময়। বাবা এলেন। বাইরে থেকে বাজিয়ে বাবা যখন আসেন, ঠিক সেই সময় কেবল বাড়ির সমাচার জানতে চাইলেন। এক কথায় সারলাম। বাড়ির সকলেই ভাল আছেন। রাত্রে বাড়িতে এসে গরম জলে বার মাস যেমন হাতমুখ ধুয়ে চা খান, সেই রকমই হাতমুখ ধুয়ে ঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে, চা দিতে একটু দেরী হোল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর রেগে গেলেন। আশ্চর্য! হজ করে এসেছেন কিন্তু মেজাজ একটুও বদলায় নি। কিন্তু চা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ ঠিক হয়ে গেল, যখন দেখলেন হুঁকোতে কল্কে লাগিয়ে দিয়েছি। বুঝলাম, বাবা এখন কোন কথা বলতে চান না। বাবাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে এলাম।

পরের দিন শুক্রবার। সকালেই বাবা মসজিদে নমাজ পড়তে গেলেন। পড়তে যাবার পরই ইলেকট্রিক বিল এসে গেল। সকালে বাজার নিয়ে বাড়ি এসেই, পাওয়ার হাউসে গিয়ে ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা করলাম। এসে দেখি বাবা এসে গেছেন। যদিও বাবা কখনও হিসাব দেখেন না, তবুও হিসাব লিখে বালিশের তলায় রেখে দিই। বাবা প্রতিবারই বকেন কিন্তু আমি বরাবরই রাখি। আজকের বাজার এবং ইলেকট্রিক বিলের টাকা যোগ করে, তিন মাসের হিসাব বাবার কাছে দিলাম। তিন মাসের হিসাব, বাবা চটে উঠলেন। বললেন, 'তুমি আমার ছেলে, তোমাকে অবিশ্বাস কখনও করেছি? বার বার বলি তবু হিসাব রাখ।' এই কথা বলেই কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তিন মাসের খরচা বেশি বলেই লিখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'এইসা না, এইসা না, ভবিষ্যতে আর কখনও এ রকম হিসাব লিখে দেবে না।' বাবা এসে গেছেন মৈহারের লোক জেনে গেছে। পরিচিত কয়েকজনকে বলেছিলাম। স্টেশন মাষ্টার, এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার, দারোগা, ডাঃ গোবিন্দ সিং, বাগচীবাবু একে একে সকলেই এলেন। বাবা সকলকেই অভ্যর্থনা করলেন। আজ ব্যাণ্ডে যাবার নেই। শুক্রবার বলে বাজনার ছুটি। বাবাকে কিন্তু খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? আলি আকবর কিংবা রবিশঙ্করের উপর চটে আছেন না কি? না, কারণ এ সব কিছু নয়। কারণটা বুঝলাম সন্ধ্যায় নমাজ পড়বার পর। বাবা নমাজ পড়ে আমাকে ঘরে ডেকে বসতে বললেন। বাবা তামাক খাচ্ছেন। বুঝলাম কিছু একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার হয়েছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললেন, 'একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। মক্কায় সকলে বলেছে, হজের পর গান বাজনা করা হারাম, অর্থাৎ পাপ; সুতরাং আর তো বাজাতে পারব না।' বাবার এ কথা শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোল। প্রথমেই মনে হোল গানবাজনা না করতে পারলে তো আমার শিক্ষা হবে না। এক মিনিট চুপ করে থেকে, পরমুহূর্তেই হাত জোড় করে বললাম, 'বেআদবী ক্ষমা করবেন। যাঁরা হাজি, তাঁরা তো

মসজিদে আজান পড়ে। আজান তো গানই। তা হলে হজ করে এলে গান বাজনা বন্ধ করতে হবে, এ বিধান আপনাকে কে বলেছে?' আমার কথাটা বাবার মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হোল। তবুও বাবা বললেন, 'তোমার কথাটা তো ঠিক কিন্তু সকলে যে বলছে হজ করবার পর গান বাজনা হারাম।' বাবাকে আবার বোঝালাম, নিজের স্বার্থেই শুধু নয়, ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের স্বার্থে বাজাতে। মনে হোল বাবার মনে দ্বন্দ্ব চলছে। একবার বললেন, 'তুমি কথাটা ঠিকই বলেছ,' পর মুহুর্তেই বললেন, 'এইসা না, এইসা না।' কথা আর বাড়ালাম না। খাওয়ার পর বাবাকে যেমন চাম্পি করি, সেই রকম করে দিয়ে ঘরে এসে ভাবতে লাগলাম, কি করে বাবার মন থেকে এই কথাটা হটিয়ে দিতে পারি, হজ করে এলে গান বাজনা করাটা হারাম নয়। মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

পরের দিন বাবার মেজাজ বুঝে সব চিঠি পড়ে শোনালাম। প্রতিটি চিঠির উত্তর দিয়েছি যে বাবা হজ করতে গেছেন। বাবা সব চিঠি শুনে বললেন, 'সকলকে লিখে দাও যে আমি এসে গেছি।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লায় নিজের আত্মীয়দের কাছে এবং দক্ষিণারায় চৌধুরীকে চিঠি লিখলেন। বাবার সব চিঠির উত্তর লিখলাম। চিঠিগুলো পোস্ট করেই এ্যালাবিয়া সাহেব এবং পুরনচন্দ্র শেঠকে বাবার কথাটা বলে বললাম, 'বাবা আপনাদের কথা শুনবেন, যেমন করে হোক, বাবাকে বোঝান, নইলে ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং ভারতীয় সঙ্গীত জগতের সমূহ ক্ষতি।' আমার কথা শুনে এ্যালাবিয়া সাহেব বললেন, 'আমি অনেক হাজিকে জানি, যাঁরা হজ করে এসে শায়রি করে এবং শের শোনাবার সময় গান করে থাকে।' আশার আলোক দেখলাম। দুজনেই এক কথা বললেন। আমি দুজনকে অনুরোধ করলাম সন্ধ্যার সময় গিয়ে, যেন দেখা করতে গেছেন, তারপর বলবেন, 'বহুদিন বাজনা শুনিনি, আজ একটু বাজনা শোনান।' দুজনেই বললেন, 'রাত্রে যাবো এবং বাবাকে বোঝাবো।' আমি বাজার করে বাড়ি ফিরে দেখি, পরমহংসদেবের গলায় মালা পরিয়েছেন। লক্ষণ ভাল। মূর্তিপূজা তো করছেন। আজ আশিসের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'শুভকে সরোদ ছাড়িয়ে পিসিমা সেতার শুরু করিয়েছেন।' এই সংবাদটাই মুখ্য। বাকি মৈহারের খবর জানতে চেয়েছে। খুব আনন্দ হোল। শুভ যদি তার মায়ের এবং বাবার গাইডেন্সে সেতার বাজায় তাহলে এই বংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। শুভর মধ্যে প্রতিভা আছে এই কথাটা বুঝেছি। আশিসেরও প্রতিভা আছে, কিন্তু সব ভুলে যায়। শুভ এবং বেবীর মধ্যে প্রতিভা আছে। এই দুইজন যদি বাজায় তাহলে খুবই ভাল বাজাবে। দু'জনেরই মাথা ভাল। সকলকেই তো পড়িয়েছি, সুতরাং বুঝতে পারি, বেবী এবং শুভ যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে সে রকম বাড়ির আর ছেলেরা নয়। তবে আশিসের ভিত বাবা মজবুত করে দিয়েছেন। বড় হলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

রাত্রে এ্যালাবিয়া এবং পূরণ শেঠ এলেন। বাবা আপ্যায়ন করে বসালেন। আমার কথা মত এ্যালাবিয়া বললেন, 'বাবা আজ আপনার বাজনা শুনব।' এ কথা শুনে বাবা আমাকে যা বলেছিলেন, সেই কথাই বললেন। এ্যালাবিয়া জাতে পার্শী। এ্যালাবিয়া বললেন, 'এ কথা আপনাকে কে বলেছে? আমি বহু মুসলমানকে জানি, যারা হজ করে এসে ঢোলক বাজায়। এই ঢোলকিরা বাজনা বাজিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এ সব বাজে কথা আপনাকে কে

বলেছে?' পূরণ শেঠও শায়রিদের কথা বললেন। বুঝলাম বাবা খুসী হয়েছেন। তবুও বললেন, 'আপনারা বলছেন বাজালে পাপ হবে না? ঠিকই বলেছেন। সঙ্গীত দিয়ে আল্লার সাধনা না করলেই পাপ হবে।' বহু কথার পর একটু বাজালেন। বাজনা শুনে উভয়ে চলে গেলেন। যাবার পর বাবা বললেন, 'জানি না পাপ করলাম কিনা।' যাক বাঁচা গেল। আর বেশি কিছু বলার নেই।

পরের দিন বাবাকে সকালে নিজের ঘরে বসে থাকতে দেখলাম। মৈহারে এসে অবধি সকালে কখনো বাবাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে দেখিনি। বুঝলাম বাবার মনে এখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। গত রাতে রেডিও শুনলেন না। তবে কি বাজনা শোনাও পাপ? কোনো দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক যখন মাথায় ঢুকিয়েছি হজ করার পর গান বাজনা করা পাপ, সুতরাং গান বাজনা শোনাও পাপ। গতকাল বাবা বাজিয়েছেন এটাই সান্ত্বনা। বাবার বাজারে যাবার সময় হয়েছে, কিন্তু ঘরে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বললাম, 'এত পরিশ্রম করে এসেছেন সুতরাং বাজার আমি করব।' যা কখনো হয়নি তাই হোল। আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'ঠিক আছে তুমিই বাজার নিয়ে এসো।' মানিব্যাগ খুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টাকা তো এখনো অনেক আছে। এত কম খরচে চালিয়েছ কি করে?' উত্তরে বললাম, 'খরচা নানা কারণে বেশীই হয়েছে।' বাবা খুশী হয়েছেন বুঝলাম। এমন সময় হুকো কলকে নিয়ে মা ঘরে এসে বাবাকে বললেন, 'চিরটা কালই তো আমাকে কষ্ট দিলা, হজটাও করালে না?' বাবার পুরান স্বভাবটা মোটেই বদলায় নি। মার কথা শুনেই রেগে বললেন, 'ওই ভিড়ের মধ্যে গেলে তুমি হারিয়ে যেতে। আমি নিজেই আসবার জন্য জাহাজে সীট পাচ্ছিলাম না। টিকিট থাকা সত্ত্বেও জাহাজের লোকের যখন দয়া হবে, সেই সময় আসবার সুযোগ হয়। আমি সেই জন্য ঘুরে বেড়াতাম। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে আমার পাশপোর্ট দেখতে চাইল, নাম জিজ্ঞেস করল। তারপর পুলিশেরা সম্মানের সঙ্গে আমাকে জাহাজে চড়বার অনুমতি দিলো। তুমি গেলে কি বিপদে পড়তাম।' আমাকে দেখে মা সাহস করে বাবাকে অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু বাবার মেজাজ এবং কথা শুনেই প্রস্থান। মা যাবার পরই বাবা আমাকে টাকা দিলেন, আমি বাজারে গেলাম। বাজারে যাবার সময় রহিম বক্সের সঙ্গে দেখা হোল। বাবা কবে আসবেন প্রশ্ন করায় বললাম, 'এসে গেছেন।' রহিম বক্স একটু অবাক হয়ে বললেন, 'এসে গেছেন অথচ বাবাকে প্রসেশান করে ঘুরোন নি কেন?' এ কথা শুনে মনে হোল কথাটা তো ঠিক। মুসলমান ধর্মের নিয়মকানুন কাশীতে জানা ছিল না। কাশীতে তাজিয়া নিয়ে প্রসেশান করে যেতে দেখেছি। মৈহারে এসে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। হজ থেকে ফিরে, মুসলমানদের দেখেছি মালা পরে মিছিলের সঙ্গে যেতে। হজ থেকে ফিরলেই দেখেছি সম্বোধন করতে, 'হাজি সাহেব, সেলাম আলেকুম'। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে হাজি রহিম বক্স বলল, 'একটু পরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।' বাজারে যেতে যেতে ভাবলাম বাবার সব বিষয়ে আলাদা এক বৈশিষ্ট্য আছে। সকলে যা করেন বাবা তা করেন না। এখন বুঝলাম, কেন বার বার নিষেধ করেছিলেন, মৈহারের সকলকে বলতে

কবে আসবেন। প্রদর্শন বাতিক বাবার ছিল না। এর জন্য এই প্রথম সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমাকে বাজার করতে দিয়েছেন। এ্যালাবিয়া এবং পূরণচন্দ্র শেঠকে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁদের কথায় বাবা বাজিয়েছেন। বাবা না বাজালে আমার মৈহারে থাকা বৃথা হয়ে যেত। বাড়ীতে এসে দেখি অনেক হিন্দু এবং মুসলমান বাবার বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন। বাবাকে দেখলাম সকলকে মক্কার প্রসাদ তবররুক এবং আবে জমজম (জল) দিচ্ছেন, হিন্দুরাও ঐ প্রসাদ নিচ্ছেন বাবা আমাকেও দিলেন। সকলে চলে যাবার পর আমাকে বললেন, 'ধর্ম এক, লোকে বোঝে না। নাহলে কাশীই বল আর মক্কাই বল সব এক।'

ধ্যানেশ, বেবী এবং অমরেশকে সবে পড়াতে বসেছি, বাবা ডাকলেন। ঘরে গিয়ে দেখি, বাবা সরোদে সব নতুন তার পরাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তোমার জন্যই বাজাব। তোমাকে শেখাবার পর বাজনা ছেড়ে দেব।' বাবার কথা শুনে হাসি পেল, যার প্রতিটি রোমকূপে সঙ্গীত, সে সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে বাঁচবে কি করে? আর আমাকে শেখাবার পর সঙ্গীত ছেড়ে দেবেন এও একটা কথার কথা। বাজনার তার পরাতে গিয়ে বললেন, 'জানিনা ঠিক করছি কি ভুল করছি। মক্কাতে অনেকে বলল, ইংরেজি পড়লে আল্লা রসুলের নাম মুখে আসবে না। ইংরাজি পড়লে শয়তান হয়। ইংরাজি পড়লে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে, সরাব খায়, হালাল হারামে প্রভেদ থাকে না।' বাবার কথা শুনে বললাম, 'লোকে অনেক কিছুই বলে, পৃথিবীতে বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে, সেই সব জায়গায় ইংরেজি পড়ান হয় এবং পৃথিবীর বহুল প্রচারিত ভাষা ইংরেজি, মুসলিম রাষ্ট্রের লোক ইয়ুরোপে গেলে ইংরাজিতে কথা বলে। সুতরাং কে কি বলল এ নিয়ে বৃথা চিন্তা করবেন না।' আমার কথাটা বোধহয় বাবার মনঃপূত হোল, একবার কেবল আমার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু না বলে যন্ত্রের তার পরাতে লাগলেন। বিকেলে চা খাবার সময়, বাবার নজরে পড়েছে একটি কাপ ভেঙ্গে গিয়েছে। ভাঙ্গা কাপ দেখেই রেগে গিয়ে বললেন, 'যেমন ছেলে, তেমনি ছেলের বউ হয়েছে। নাতিরা আর, কি শিক্ষা পাবে?' বিকেলে মার জ্বর হোল। মায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে এলাম। আমার ওষুধ আনা দেখে বাবা বললেন, 'এতদিন বেশ শান্তিতে ছিলাম, এখানে এসেই দেখি জ্বর। এইসব করবার জন্য কি তুমি এসেছ, আর লাটসাহেব হয়ে বসে আছে আলি আকবর। এখানে এসে বুড়া মাকে একবার দেখবার প্রয়োজন মনে করে না। আর সংসার ভাল লাগে না। তোমাকে তাড়াতাড়ি যতটা পারি শিখিয়ে, বাজনার থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিজের মাতৃভূমি কুমিল্লায় গিয়ে শেষ জীবন কাটাব।' বাবা চুপ করলেন। বুঝলাম, আসল কারণ আলি আকবর, মার জ্বরটা হোল উপলক্ষ্য। বাবা মৈহার থেকে নাতিদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না। রাত্রে বাবা শুদ্ধ বসন্ত শেখালেন। বাবার বাজনা শুনে কে বলবে তিন মাস বাজান নি। অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। বছরে তিন চারবার তবলা এবং মৃদঙ্গ শুনে মনে হয়েছে, চিরকাল বুঝি তবলা এবং মৃদঙ্গই বাজিয়েছেন, আর এতো হ'ল সরোদ। সুরশৃঙ্গার, রবাব বা বেহালা শুনে সেকথাই মনে হয়। বাবা শেখাবার সময় আজ একটুও বকলেন না।

পরের দিন থেকে বাবার দৈনন্দিন কাজ আগের মত শুরু হয়ে গেল। মায়ের জ্বর কিন্তু ছাড়বার নাম নেই। ডাক্তার দীওয়ান দেখে বললেন, ভয়ের কিছু নাই, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর

হয়েছে। আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে, মৈহারের সমাচার জানিয়ে চিঠি দিলাম পরের দিন। গোবিন্দ সিং এসে মাকে দেখে বললেন, 'কেসটা মনে হচ্ছে টাইফয়েড।' মার রক্ত নিলেন। বললেন, 'আজই বলে দেব কি হয়েছে।' বাবাকে যদিও টাইফয়েডের কথা বলা হোল না, কিন্তু রক্ত নেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছেন সাধারণ জ্বর নয়। ডাক্তারবাবুর ধারণা সত্য হোল, বিকালে গোবিন্দ সিং বললেন, 'টাইফয়েড হয়েছে। ঘড়ি দেখে চারঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াবেন। এক ফাইল ক্লোরোমাইসেটিন কিনে আনুন।' ঘড়ি দেখে চার ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখতে হবে এবং ওষুধ খাওয়াতে হবে শুনে বাবা ঘাবড়ালেন। ডাক্তার বললেন, 'জ্বর সারতে কয়েক দিন সময় লাগবে।' পরের দিন আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে আবার সব সমাচার জানিয়ে চিঠি দিলাম। আলি আকবরকে লিখলাম, 'পত্রপাঠ মৈহারে আসুন।' চিঠি ফেলতে গিয়ে দুটি চিঠি পেলাম। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের এবং অন্যটি লিখেছে রবিশঙ্কর। খামের উপর বাংলাতে বড় বড় করে রবিশঙ্কর লিখত 'বাবা'। এবারে লিখেছে 'হাজী বাবা'। বাবাকে চিঠি পড়ে শোনালাম। বাবা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে পার্সেল করে তবররুক এবং আবে জমজম পাঠাতে বললেন। বড় বড় হাজীবাবা দেখেই, বাবা রবিশঙ্করের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আরে আরে শুয়ার কে বচ্ছে, একি লিখেছে, 'হাজী বাবা'। যতসব তেল লাগান কাজ, উপাধি দিয়েছে।' বুঝলাম এই বাহ্যিক আড়ম্বর বাবার পছন্দ নয়। সকলে যা করে, বাবা কখনও তা করেননি। নামের আগে বাবাকে লিখতে দেখিনি 'হাজী'।

সকালে এবং রাত্রে বাবা ধ্যানেশ ও বেবীকে শেখাচ্ছেন, এবং আমাকেও দুবেলা শেখান। সবে সাতদিন হোল বাবা এসেছেন। শেখাবার পর বাবা নিজের মনে বাজাতে লাগলেন। পর পর দুটি রাগ বাজালেন। পরিচিত রাগের মধ্যে একটি স্বরের পরিবর্তন করেছেন। পরের দিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে কি রাগ বাজাচ্ছিলেন।' বাবা হেসে বললেন, 'শুনেছিলে?' 'হ্যাঁ' বলাতে বললেন, 'দুটি নূতন রাগ তৈরি হয়েছে। একটি হ'ল কোমল মারওয়া এবং অপরটি হ'ল শ্রী মারওয়া।' মায়ের জ্বর বরাবরই রয়েছে। বাবা চিন্তিত কিন্তু বাইরে প্রকাশ করছেন না, বললেন, 'আলি আকবরকে চিঠি লিখে দাও, ইতিমধ্যে পান্নালাল ঘোষের চিঠি এল। বাবা উত্তর নিজে দিলেন এবং লিখে দিলেন আলি আকবরকে খবর দিতে, তার গর্ভধারিণীর কঠিন অসুখ হয়েছে সুতরাং যেন মৈহারে আসে। পান্নালাল ঘোষকে নিজে লিখলেন, কিন্তু আলি আকবরকে লিখলেন না। বাবার চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য যা আমার নজরে পড়ল। ইতিমধ্যে মাকে ক্লোরোমাইসেটিন ইনজেক্সান দেওয়া হয়েছে। আজ নিয়ে পাঁচদিন হয়ে গেল মা বিছানায় শুয়ে। এসে অবধি মাকে শয্যা নিতে দেখিনি। দিনরাত ঘড়ি দেখে ওষুধ খাওয়াচ্ছি, এবং বাবাও নাছোড়বান্দা হয়ে এক কথা রোজ বলছেন, এখানে শিখতে এসেছ, না সকলকে সেবা করতে?' সকালে রামকেলী, দুপুরে গৌড়সারঙ্গ এবং সন্ধ্যায় পূর্বী শেখাচ্ছেন। কতকম সময়ে অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে শিখিয়ে গিয়েছেন, যার ফলে বাবার কাছে শিখতে এখন অসুবিধা হচ্ছে না। ডাক্তারবাবু আরো এক ফাইল ওষুধ কিনতে বলায়, বাবা এইবার রোগের গুরুত্ব বুঝেছেন। বাবা ডাক্তারবাবুকে দিব্যি দিয়ে বললেন, 'কি রোগ হয়েছে।' ডাক্তারবাবু বাধ্য হয়ে বললেন, 'টাইফয়েড'।

টাইফয়েড রোগটি শুনলে আজকাল কেউ চমকায় না, কিন্তু সেই সময় শুনলে চমকে উঠত। বাবারও হোল সে অবস্থা। বাবা ঘাবড়ালেন কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। পরের দিন পোষ্ট অফিস এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে, বাড়ীতে এসে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি দু'টি আতা রাখা আছে। বাবার কাছে যাওয়া মাত্র বললেন, 'গাছ ভরা আছে আতায় কিন্তু দেবারতো কেউ নাই। তাই তোমার ঘরে আতা রেখে এসেছি। আগে খাও, তারপর অন্যকথা।' বাবার সবদিকে খেয়াল আছে। রাত্রে ব্যাণ্ডের গুলগুলজী এলেন মাকে দেখতে। বাবার কাছে মায়ের টাইফয়েড হয়েছে শুনেই আজ এসেছেন। গুলগুলজী আমাকে বললেন, 'ব্যাণ্ডে গিয়ে আজ আপনার নাম করে বলেছেন, পরের জন্মে যেন আপনার মত সন্তান পান।' গুলগুলজীর কথা শুনে হাসি পেল। আসলে ঘড়ি দেখে দেখে ওষুধ খাওয়াচ্ছি বলে, বাবা উপরোক্ত কথা গুলগুলজীকে বলেছেন। রাত্রে বাবা আমাকে শেখাবার জন্য ডাকলেন কিন্তু আমি গেলাম না। রাত্রে ডাক্তার এসে বললেন, 'মা এখন ভাল আছেন। কোন চিন্তার কারণ নেই। কেবল দুর্বলতা আছে। কিছুদিন টনিক খেতে হবে।' বাবা ডাক্তারবাবুর কাছে আমার প্রশংসা করতে লাগলেন। বাবার একটা স্বভাব ছিলো, কারো কাছে যেন উপকার পেলে, পরিবর্ত্তে তার দশগুণ না দেওয়া পর্য্যন্ত, মনে শান্তি পেতেন না।

শীত বেশ পড়ছে। মা বিছানায় শুয়ে আছেন নয় দিন হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও আলি আকবর তোমাকে কোন উত্তর দিলো না।' হাত কচলে বললাম, চিঠি যেতে আসতে সময় লাগে। তাছাড়া বম্বেতে নাও থাকতে পারেন।' আমার কথা বাবার মনঃপূত হোল না। বাবা বললেন, 'বম্বে না থাকলেও, চাটুকার যারা থাকে তারা চিঠি পড়ে আলিআকবর যেখানেই থাকুক জানাবে না?' রবিশঙ্কর এই সময়ে টি. এম. ও করে একশত টাকা পাঠাল। আমাকে লিখেছে, ফল এবং ওষুধের জন্য পাঠালাম। বেশী খরচা হচ্ছে বলে বাবার রাগ হতে পারে। আশ্চর্য হয়ে যাই। অন্নপূর্ণাদেবীর জানা আছে ইলেকট্রিক বিল একটানা বেশী উঠলেই বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেইজন্য মৈহারে থাকাকালীন যেমন ভরতুকি দিতেন ঠিক সেইরকম দিল্লীতে থেকেও সেটা করে যাচ্ছেন, অথচ আলিআকবর এত নির্বিকার কি করে থাকে? এগারো দিন পরে আলিআকবরের চিঠি এল। আলিআকবর ফল পার্সেল করে পাঠিয়েছে। আমাকে চিঠি লিখেছে, 'যেহেতু আমার শাশুড়ীর ফ্রাক্চার হয়ে গিয়েছে তাই আসতে পারছি না, একটু ঠিক হলেই মৈহারে আসবো।' বাবাকে বলতে হোল একটু ঘুরিয়ে। বললাম, 'যেহেতু, কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়ে নিয়েছে সেই জন্য আসতে পারছে না, প্রোগ্রামগুলো সেরেই আসবে।' বাবা শুনে চুপ করে গেলেন। ছেলে যখন পাঠিয়েছে, বাজনা বাজিয়ে আসবে সুতরাং সাতখুন মাফ। কিন্তু সাতখুন যে মাফ হয়নি বুঝলাম রাত্রে। আলি আকবরের চিঠি পেয়েই লিখলাম, 'তাড়াতাড়ি মৈহারে আসুন, নইলে এখানে টেকা দায় হয়ে পড়েছে সকলের।' দুপুরে চিঠি ফেলতে গিয়ে গুলগুলজীর কাছে শুনলাম, মৈহারে নতুন একটা সিনেমা আসছে 'আঁধিয়া', এই সিনেমার সঙ্গীত নির্দ্দেশনা দিয়েছে আলি আকবর। বিকেলে রোজই, উপস্থিত হকি খেলি। হকি খেলতে গিয়ে পায়ের হাড়ে খুব লেগেছে। বাবা আজকাল রোজ শেখান। সন্ধ্যার সময়

তিলং শেখাচ্ছেন। শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে ঘরে চলে যাই। কিন্তু ব্যথার জন্য আজ উঠতে কষ্ট হতে লাগল। আগেও কয়েকবার বাজাবার পর উঠতে দেরী হয়েছে, তার কারণ পায়ের শিরায় টান পড়ে বলে। বাবাকে একবার বলেছিলাম, 'ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে।' বাবা এই কথাটা রসিকতা করে একটি কথা যোগ করতেন। পায়ের ব্যথার জন্য উঠতে কষ্ট হলেই বাবা বলতেন, 'কি হোল বসো বসো। বুঝেছি তোমার ঝিঁ ঝিঁ পোকা হয়েছে। সঙ্কোচ কোরো না, এই সময় উঠলে সরোদ পড়ে যাবে।' বাবাকে বলতে হোল, 'খেলতে গিয়ে পায়ের হাড়ে লেগেছে বলে ব্যথার জন্য উঠতে কষ্ট হচ্ছে।' বাবা চিন্তিত হলেন, খেলতে গিয়ে পায়ের হাড়ে লেগেছে বলে। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'গরম জলের মধ্যে নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখো।' রাত্রে খেতে বসেছি। হঠাৎ শুনলাম বাবা নিজের মনেই বলছেন, 'হ্যাঁরে শুয়ার কে বচ্চে, দুর্ভাগা এই জন্য আমি সরোদ শিখিয়েছিলাম, যে সিনেমার মেয়েদের পেছনে বসে সরোদ বাজাবে। সিনেমার মধ্যে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে সরোদ বাজাবে। আরে আরে সঙ্গীতের নাশ করে দিল।' বাবার কথা শুনে বুঝলাম 'আঁধিয়া' সিনেমাতে আলি আকবর যে সঙ্গীত নির্দ্দেশকের কাজ করেছে, বাবা শুনেছেন কারো কাছে। বাবাকে বললাম, 'যেহেতু যোধপুরের মহারাজা মারা গিয়েছেন, সেই জন্য চাকরি না থাকার ফলে সিনেমায় সঙ্গীত নির্দ্দেশনা দিয়েছে। পেটতো চালাতে হবে।' বাবা বললেন, 'বেশী টাকার দরকার কি? এখানে তো যাই হোক থাকবার মতো ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' এই তো আলি আকবরের চিঠি পেয়ে বললে যে তোমার মায়ের অসুখের মধ্যে আসতে পারছে না, কেননা অগ্রিম কথা দিয়েছে বলে প্রোগ্রাম কয়েকটা সেরে আসবে। ঠিক আছে আসতে পারেনি। কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। এই যে বাজাবে, তার জন্য টাকা তো পাবে। কোলকাতা, দিল্লী সব জায়গায় বাজাচ্ছে। টাকাও পাচ্ছে, তবু টাকা চাই। টাকার জন্য সঙ্গীত এমন করে বিক্রী করতে হবে। সিনেমার লাইন ভাল নয়। সকলে সরাব খায়। লোক মুখে শুনেছি আলিও সরাব খায়। এ সব কি ভাল? আমার ছেলে হয়ে এই সব করছে? মৈহারে এসে থাকুক। মৈহারে থেকে, বাইরে বাজিয়ে, আবার এখানেই ফিরে আসবে। কথা হোল ছোট বৌ-এর, তাকেও এখানে নিয়ে আসুক। আলি আকবরের আবার চিঠি এল। চিঠিতে লিখেছে, 'শাশুড়ির পা ভেঙ্গে গিয়েছে, ছ সপ্তাহ পর প্লাষ্টার খুললে তারপর মৈহারে আসবো।' বাধ্য হয়ে বাবাকে চিঠি পড়ে শোনাতে হোল। চিঠিটা শুনেই বাবা বললেন, 'আরে আরে শুয়ার কে বচ্চের শাশুড়ির ঠ্যাং ভেঙ্গেছে তার জন্য কষ্ট হয়। আর তোমার মায়ের জন্য কষ্ট হয় না। তুমি না থাকলে, কে তিন চার ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখতো ও ওষুধ খাওয়াত? এতো তারই কাজ। আর টাকার কথা বলছো? টাকার দরকার শাশুড়ির ঠ্যাং ভেঙ্গেছে বলে। এদের কাছে খালি টাকা আর টাকা। টাকা টাকা করলে, সঙ্গীত কি সেই জায়গায় থাকে?'

মার শরীর যদিও দুর্বল কিন্তু সব কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছেন। মা খাবার পরিবেশন করলে বাবা খুশী হন। মা খাবার এবং নাস্তা, দিনে এবং রাতে চারবার দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাবার মেজাজ বোঝা ভার। মা থালা দিচ্ছেন দেখেই বাবা বললেন, 'শরীর খারাপ নিয়েও কেন বিশ্রাম নিচ্ছ না। বৌমা কি করে? বৌমা খাবারটাও দিতে পারে না?' এই হোল বাবার পরীক্ষা।

বৌমা তারপর খাবার দিলে সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলবেন, 'আরে আরে, বৌমা তুমি কেন খাবার দিচ্ছ? তোমার মায়ের কি শরীর খারাপ?' বাবার মন বোঝা ভার। করলেও জ্বালা আবার না করলেও জ্বালা। এর মধ্যেই চিঠি পেলাম আকি আকবের কাছ থেকে। আলি আকবর লিখেছে, 'নিজের গাড়িতে আসবো। সঙ্গে থাকবে হরিহর, নিখিল এবং গাড়ীর মেকানিক।' এছাড়া আলি আকবর লিখেছে, 'বেবীর জন্য সেতারের একটা অর্ডার দিয়েছি মিরাজে।' বাবাকে চিঠি পড়ে শোনালাম। চিঠি শুনেই বললেন, 'নিখিল, হরিহর এরা আসছে কেন? উত্তরে বললাম, 'গাড়ী করে মৈহারে এসে সোজা কোলকাতা যাবে। গাড়ী করে আসছে বলে গাড়ীর মিস্ত্রি, নিখিল এবং হরিহরকে নিয়ে আসছে।' বাবা মনে মনে খুশী হয়েছেন আলি আকবর আসছে বলে। কিন্তু বাবার বাইরে দেখে খুশীর ভাব বুঝবার উপায় নেই।

মক্কা থেকে বাবা প্রায় কুড়িদিন হোল এসেছেন মৈহারে। কিন্তু এসে অবধি বাবা বাজার করলেও, মাংস নিজে কিনতে যান না। ভারটা পড়েছে আমার উপর। মার শরীর খারাপের জন্য ডাক্তার বলেছিল টেংরির জুস রোজ খেতে। সকালেই রোজ আমাকে যেতে হয়। যার জন্য সকালের রেওয়াজে বাধা হয়। আজকাল সেই জন্য ভোর চারটের সময় উঠে রেওয়াজ করি। রেওয়াজ ভোরে না করলে, নানা কাজের জন্য রেওয়াজে বাধা পড়বে। এর মধ্যে টেলিগ্রাম করে রবিশঙ্কর জানতে চেয়েছে মার শরীর কেমন আছে। টেলিগ্রাম করে জবাব দিয়েছি, মার শরীর ঠিক হয়েছে তবে দুর্বল। মায়ের শরীর খারাপ শুনে, বাবার প্রথম ছাত্র যতীন ব্যানার্জি, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার সাতনা থেকে এসেছেন। সনতের মুখেই মায়ের শরীর খারাপ শুনেই এসেছেন। ডাক্তার যতীন ব্যানার্জিকে দেখে বাবা খুশী হ'লেন। কিন্তু সন্ধ্যায় সাতনা যাবার সময় বাবা বললেন, 'সকলে মতলববাজ, কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলেই পাজী।' আলি আকবর এতদিন পরে আসছে বলে বললেন, 'তোমার মায়ের শরীর এত খারাপ কিন্তু কাজের সময় কারো দেখা নেই। ভাল হবার পর সকলে মুখ দেখাতে আসছে। যে যেমন করবে তার ফলও তেমনি পাবে।' বাবা প্রকারান্তরে সনতের বাবাকেও শোনালেন। বাবার মেজাজ, দীর্ঘদিন ধরে তার জানা আছে বলেই বললেন, 'এতদিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। আজ একটু ভাল আছি তাই এসেছি।' একথা শুনেই বাবার উত্তর, 'আরে আরে! শরীর খারাপ নিয়ে আসার কি দরকার ছিল। ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরে যাও।'

সংসার করতে গেলে রোজ কিছু না কিছু লেগেই থাকে। বাছুর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গরুর জন্য ভূষি এবং খড়ের প্রচুর ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। এদিকে আবার একটা গরুর বাঁট থেকে রক্ত পড়ছে বলে কয়েক দিন ধরে বাবার মেজাজ খারাপ। প্রথম গোয়ালাকে দিয়ে নজর ঝাড়ালেন। নিশ্চয় কেউ নজর দিয়েছে। কিন্তু নজর ঝাড়বার পরও বাঁট দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হোল না। বাবাকে বললাম, 'জন্তু জানোয়ারের ডাক্তারকে দেখানো ভালো।' আমার কথা বাবার মনঃপূত হলো। বললেন, 'যা ভাল বোঝ তাই করো।' ডাক্তারকে ডেকে আনলাম। তিনি দেখে বললেন, 'পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশন কিনে আনলাম। বাবা ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছেন। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার যাবার পরই বাবা বললেন, 'কি সব ইনজেকশন দিলো? গুচ্চের

টাকা খরচা হোল। কোথা থেকে এত টাকা আসে? ঝাড়ফুঁকেই এতদিন গরুবাছুর ভাল হয়েছে। জন্তুজানোয়ারের ডাক্তার হয় শুনিনি কখনো।' বাবার উক্তির পেছনে একটাই কারণ। কারণটা হোল আমি ডাক্তার আনতে বলেছি। আমার কথামত বাবা সব কাজই করবেন। কিন্তু, প্রথমে আপত্তি করবেন পরে রাজী হবেন। রাজী হবার পর নানা কথা শোনাবেন। কিন্তু যখন কাজ ঠিক হয়ে যাবে তখন বাবা খুশী হবেন। এখানেও ঠিক তাই হোল। রাত্রে দেখা গেল গরুর বাঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে না। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিন চার বার সেই এক কথা শুনতে হয়েছে। 'বৃথা টাকা খরচা হোল। কোথা থেকে অত টাকা আসে। জন্তু জানোয়ারের আবার ডাক্তার হয় নাকি?' বাবার এই কথায় নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। মনের মধ্যে সংশয় হয়েছে যদি ভাল না হয়? তিনচার দিনে ভাল হলেও চলবে না। ওষুধ পড়েছে সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ভাল হওয়া চাই। মা আমার অবস্থাটা বুঝে বললেন, 'তোমার বাবার কথায় মন খারাপ কোরো না। তোমার বাবার মেজাজতো জান।' যাক রাত্রে যখন গরুর বাঁট দিয়ে রক্ত বেরোল না, বাবার মেজাজ ভালো হোল। একদিন ইনজেকশান দিয়েই ভাল হয়ে গেছে। পরের দিন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, 'পরপর দু'দিন ইনজেকশন আরও দিতে হবে।' এখন ইনজেকশন কিনবার জন্য বাবার আর রাগ নেই। কিন্তু বুঝলাম মনে মনে বাবা অনুতপ্ত হয়েছেন টাকার কথা শোনানর জন্য।

কিছুদিন ধরেই দেখছি ধ্যানেশের পড়ায় মন নেই। ধ্যানেশের মায়ের কাছে শুনেছি, সাতমাসেই ধ্যানেশের জন্ম হয়েছে। মনে হয় সেই জন্য সব ব্যাপারেই অপরিণত। ছেলেদের পড়াতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু ধ্যানেশকে নামতা কিছুতেই মুখস্ত করাতে পারছি না। আজ পড়াতে বসে মাথা গরম হয়ে গেল। আমি সব পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে ধ্যানেশের একটা হাত ধরে সোজা বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'বাবা এই ছেলেকে পড়ান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনাকে বলা প্রয়োজন বলেই বললাম। আপনার ধারণা খুব ভাল পড়ছে। পরে আমারই বদনাম হবে কিছু পড়াই নি, সেইজন্য আপনাকে বলে দিলাম।' ধ্যানেশ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা সব শুনলেন। বাবা আমার কথা শুনে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। পরে বললেন, 'শুয়ার কে বচ্চেকে আর পড়াতে হবে না। খাবার বেলায় চারবার কেবল ভরবে কিন্তু লেখাপড়া গান বাজনায় মন নেই। আরে শুয়ার কে বচ্চে ভিখ মাঙ্গবে।' বাবার কথা শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে বেবী, প্রাণেশ এবং অমরেশকে পড়াতে বসলাম। ধ্যানেশ এল। ধ্যানেশকে বললাম, 'বই নিয়ে চলে যাও, আর পড়াব না।' ভয়ে ভয়ে ধ্যানেশ বইখাতা নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ পরে আমার হুঁস ফিরে পেলাম। রাগের মাথায় একি করলাম? ভেবে ছিলাম বাবাকে গিয়ে বললে ধ্যানেশ ভয় পেয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। কিন্তু এখন বুঝলাম বাবার কুদৃষ্টিতে পড়ব। যতই হোক কথায় বলে নাতি। টাকার থেকেও টাকার সুদ মিঠে। কিন্তু পরিণাম যাই হোক উপায় নেই। রাত্রে বাবা আমাকে 'তিলং' রাগই শেখালেন। রোজ একটাই রাগ শেখাচ্ছেন। ধ্রুপদ অঙ্গে কিরকম ভাবে বাজবে তাই শেখালেন। আজকে শেখাবার সময় নানা অমূল্য জিনিষ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন।

৩৪

আজ আলি আকবর আসবে। পোষ্টঅফিস থেকে ফিরে এসে দেখি, বাবা বুদ্ধা চাকরকে দিয়ে উপরের সব ঘর পরিষ্কার করেছেন। বাইরে যতই রাগ থাকুক আলি আকবরের উপরে, এবং নিজের লোকের কাছে তার নিন্দা করলেও, ভেতরে পুত্র স্নেহের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে। বিকেল থেকেই বাবাকে বিচলিত দেখলাম। সন্ধ্যার সময় বাবা নমাজ পড়ছেন। দূরে দাঁড়িয়ে আছি। নমাজ শেষ হলেই প্রণাম করব। ঠিক এই সময়ে বাড়ীর লাইট চলে গেল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধা এসে বলল, গাড়ী করে আলি আকবর এসেছে এবং আমাকে ডাকছে। তৎক্ষণাৎ বাইরে গেলাম। বাড়ীর সংলগ্ন মাঠের উপর দেখলাম, আলি আকবর দাঁড়িয়ে আছে। আলি আকবরের সঙ্গে নিখিল এবং হরিহরকেও দেখলাম। আলি আকবর আমাকে দেখেই বলল, 'বুকের ভিতর প্যালপিটেশন হচ্ছে। বাবার মেজাজ কেমন?' মৈহারে থাকাকালীন যে কয়েকবার আলি আকবর এসেছে প্রথমেই দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে একই কথা বলে জানতে চেয়েছেন, বাবার মেজাজ কি রকম? আমিও একই উত্তর দিয়েছি, যেহেতু ছেলে আসছে সুতরাং বাবার মেজাজ খুবই ভালো। এবারেও তাই হোল। গুটি গুটি পায়ে তিনজনে বাড়ীতে ঢুকল। বুদ্ধাকে বললাম, জিনিষপত্র রেখে পওয়ার হাউসে গিয়ে কাউকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য। নূতন তিনটি ঘর যা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে নিখিল এবং হরিহরের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাবার ঘরের উপরে আলি আকবরের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, সে যেখানে বরাবরই থাকে। বাবা নমাজ পড়ে ঘরে গিয়েছেন। ঘরে গিয়ে প্রণাম করে, বাবাকে আলি আকবরের আসার সংবাদ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলি আকবর ঘরে ঢুকে প্রণাম করল। বাবার সেই তিনটি প্রশ্ন, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে এবং সঙ্গে যন্ত্র নিয়ে এসেছে কি না। আর আলি আকবরকে তিনটি উত্তর মাথা নীচু করে বলতে দেখলাম। এর পর বাবার সেই এক কথা, 'যা তোর মার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে।' আলি আকবরের পেছনে নিখিল ও হরিহরকে দেখে, নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলি আকবরের কাছে শিখছো তো।' নিখিল 'হ্যাঁ' বলে চুপ করে গেল। বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথা নাড়াওনাতো বাজাবার সময়?' নিখিল চুপ করে রইল। আশ্চর্য, নিখিলকে তাড়া করে মারতে গিয়েছিলেন, সব ভুলে গিয়েছেন। বাবার চিঠির কথা মনে হোল। মক্কা যাবার আগে নিখিল, হরিহর সকলে দেখা করেছে বলে, বম্বে থেকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। হরিহর সেই সময় বাবার সঙ্গে থেকে অনেক কাজ করেছে বলে, নিখিল এবং হরিহরকে বললেন, 'তোমরা যে নূতন ঘর তৈরী হয়েছে তার মধ্যে যাও।' বাবার ঘর থেকে সকলেই বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল। ইতিমধ্যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে সব দেখল। মিটারের ফিউজ ঠিক করতেই আলো জ্বলে উঠলো। বাড়ীতে যেন প্রাণ ফিরে এলো। রাত্রে খাবার সময় বিশেষ কথা হোল না, রাত্রে আলি আকবরের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্ত্তা বলে নীচে চলে এলাম। গাড়ী করে এসেছে, ক্লান্ত বলেই সাংসারিক কথা বললাম না। পরের দিন সকালেই খবর পেলাম বেবীর সেতার এসে গেছে মিরাজ থেকে। ষ্টেশনে গিয়ে সেতার নিয়ে এলাম। বাবা নিখিলকে বললেন, 'সেতারটা মিলিয়ে, বাজাও তো দেখি কি শিখেছো?' সেতার মেলাবার পর বাবা

বললেন, 'অলৈহা বিলাবল বাজাও।' নিখিল সবে বাজাতে শুরু করেছে, বাবা বলে উঠলেন, 'আরে আরে ওটা কি করো? আন্দোলনের বদলে এটা কি করছ? তুমি যা করছ তাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে।' অন্দোলনের বদলে একটা স্বর কম্পন করানোকে বাবা বলতেন ম্যালেরিয়া জ্বর। বাবা বললেন, 'এ হ'ল আতাই-এর মত বাজনা। শ্রুতি শিখে আন্দোলন করতে হবে। তুমি আন্দোলনের বদলে কি আবোল তাবোল বাজাচ্ছ। এই এতদিন শিখেছ। আলি আকবর তোমাকে এই শিখিয়েছে?' আলি আকবর বাবার এই মন্তব্য শুনে লজ্জিত হলেন। বাবা নিখিলকে বললেন, 'আজ এই সেতারে বাজাও, কাল তোমার বাজনা শুনব।'

পরের দিন সকাল বেলা গুলগুলজী এল। সকালে আলি আকবরের গাড়ী করে সকলে সারদা দেবীর দর্শনে গেলাম। আলি আকবর এবং প্রাণেশের কষ্ট হোল পাঁচশো সাতান্ন সিঁড়ি চড়ে। বাকী সকলের কোন অসুবিধা হোল না। সন্ধ্যার সময় বাবা নিখিলকে বাজাতে বললেন। বাবা মীড় দিয়ে খেয়ালের অঙ্গে নিখিলকে মৈহারে থাকাকালীন শিখিয়েছিলেন। বাবার মনে আছে। বাবা প্রথমেই বললেন, 'চার সুরের মীড় করো তো।' নিখিল করতে পারল না। বাবা বললেন, 'তোমাকে যেভাবে রিয়াজ করতে বলেছিলাম তা করো নি। চারসুরের মীড় ঠিক হলে, পাঁচ সুরে মীড় যে দিন বাজাতে পারবে, সে দিন বুঝবে সেতারে প্রবেশ করতে পেরেছ।' এ কথা বলেই আলি আকবরকে বললেন, 'মীড় দিয়ে গায়কী অঙ্গে এবং তন্ত্রকারী, দুইভাবেই নিখিলকে শেখাবি।' আলি আকবর চুপ করে শুনল। কেবল মাথাটা নাড়াল। রাত্রে হরিহরের কাছে শুনলাম, কয়েক মাস পরে আলি আকবর বিলায়েতের সঙ্গে বাজাবে ঠিক করেছে। কিন্তু রবিশঙ্করের ইচ্ছা নয়। রবিশঙ্কর টাট্ বাবাকে দিয়ে বারণ করিয়েছে এবং নিজেও বার বার বারণ করেছে বাজাতে। আসবার আগে তাই ভাইসাহেব অর্থাৎ আলি আকবর বাজাবে না বলেই মনস্থ করেছে। হরিহরের কাছে চুপচাপ কথাগুলো শুনলাম, কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। হরিহরের জন্যই অন্নপূর্ণা দেবীর সংসারে অশান্তি। রবিশঙ্কর বলেছিল, হরিহরকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তাড়ানো'ত দূরের কথা, নিজের চামচাকে দিল্লী থেকে বম্বে পাঠিয়েছিলো, বাবার দেখাশোনা করার জন্য মক্কা যাবার আগে। সেই হরিহর আলি আকবরের সঙ্গেও এসেছে। আলি আকবরের সঙ্গে কোলকাতা যাবে। মনে মনে অবাক হই। যে প্রশ্নের উত্তর সে সময় পাইনি, পরে বুঝেছিলাম। কেবল হরিহরই নয়। হরিহরের মত বহু ছেলে আছে, যাদের কাছে কাজ নিতে হয় রবিশঙ্করকে। এই সব ছেলেরা রবিশঙ্করের কথা বেদবাক্য বলে মনে করে, এবং নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে। রাত্রে আলি আকবরের সঙ্গে বারোটা অবধি নানা বিষয়ে কথা হ'ল। গুরুত্বপূর্ণ কথাটি প্রথমেই আলি আকবরকে বললাম। 'প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠালে বাবার মেজাজ খারাপ হবে না। অবশ্য টাকা পাঠালে বাবা সংসারে খরচা করেন না। পুরো টাকাই নিজের বৌমাকে দিয়ে দেবেন। বাবার মনে একটাই চিন্তা, আপনি, স্ত্রী এবং ছেলেদের টাকা দিচ্ছেন না, তাহলে বাবার অবর্তমানে কি হবে? এই টাকা পাঠালে বাবার মেজাজ ঠিক থাকবে। তার ফলে বাড়ীর সকলের পক্ষে মঙ্গল।' চুপচাপ আমার সব কথা শুনে আলি আকবর বলল, 'কি বলব তোমাকে? আমার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বম্বে থাকায় অনেক খরচ। সেখানেও একটা

সংসার চালাতে হয়। বাবার কাছে এরা সব আছে তাই আমার কোন চিন্তা নেই।' আলি আকবরের কথা শুনে কষ্ট হ'ল। তখন কি জানতাম টাকার কথা ওঠালেই সেই এক উত্তর দেবে। টাকা থাকলেও টাকা দিতে চান না। এই কথাটা বুঝেছিলাম একটা ঘটনার পর।

মৈহারে তিন রাত কাটিয়ে আলি আকবর সকালেই কোলকাতা যাবে। বাবা আমাকে বললেন, 'গাড়ী করে আলি আকবর কোলকাতায় যাচ্ছে,' কাশী হয়ে কোলকাতা যাবে। তুমি কয়েকদিনের জন্য তো কাশী ঘুরে আসতে পার।' বুঝলাম এ কথাটা হ'ল বাবার পরীক্ষা। আলি আকবর যাত্রা করবার পূর্বমুহুর্ত্তে মার সঙ্গে দেখা করতে গেল। মার স্নেহও বুঝলাম। ভেতরের নানা অভিযোগ না বলে, কেবল আলি আকবরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আজ অশিস বাবাকে চিঠি লিখেছে। চিঠিটা পড়ে বুঝলাম কেউ বলে দিয়েছে। সেই মত চিঠিটা লিখেছে দীপাবলির উৎসবের জন্যে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে নানা উপদেশ দিয়ে শেষে লিখলেন, 'তোমার মা কুইন ভিক্টোরিয়া হয়ে রয়েছে।' এ বাবার বিচিত্র রসিকতা। মৈহারে আসবার জন্য লিখলেন না। রাত্রে বাবা আমাকে 'মালশ্রী' শেখালেন। বাবা বললেন, 'এই রাগ হ'ল খুব প্রাচীন। এই রাগটিতে তিনটে স্বর লাগে। কিন্তু ভাতখণ্ডে নিয়ম করেছে একটা রাগে পাঁচটি স্বর লাগান অনিবার্য। আমার গুরু উজির খাঁনের কাছে তিনটে স্বর দিয়েই শিখেছি।' বাবা দুটো মতেই 'মালশ্রী' শেখালেন।

মক্কা থেকে এসে বাবা রোজ বাংলা ভাষায় লিখিত কোরান পড়েন। মক্কাতে পূর্ব বাংলার এক বাঙালী মুসলমান, 'আমাদের নবী' কোরানটি বাবাকে উপহার দিয়েছেন। বইটির লেখক বজলুর রসীদ। মক্কা থেকে ঘুরে আসবার পর বাবার মধ্যে যে বৈরাগ্য দেখেছিলাম, একমাসের মধ্যেই বুঝলাম ঠিক ঘোর সংসারী হয়ে গিয়েছেন। সবকিছুতেই বাবার লক্ষ্য আছে। পান থেকে চুন খসলে আর নিস্তার নেই।

আলি আকবর চলে যাবার দুদিন পর, দুটো চিঠি এল একই দিনে। প্রথমটি, বাহাদুর লিখেছে বাবাকে কিছু কঠিন রাগের চলন এবং গৎ লিখে দিতে। বাবা চিঠি পড়েই চটে উঠলেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গে নিজে লিখলেন, 'রাগ লিখে দিলে শেখা যায় না। কঠিন রাগ শিখতে হলে মৈহারে এসে শিখে যেও।'

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছে জীতেন্দ্র প্রতাপ। জীতেন্দ্র প্রতাপ এর মধ্যে কয়েকবার এসে আবার চলে গেছে। দীর্ঘ আটমাস পরে যোগাযোগ করল। অনুরোধ করে বাবাকে লিখেছে, 'দয়া করে আপনি রবিশঙ্করকে লিখে দিন আমার সঙ্গে যেন ডুয়েট বাজায়।' চিঠি পড়ে বাবা রেগে গেলেন। চিঠিটার উত্তর দিলেন খুব সহজভাবে। যতই হোক গোয়ালিয়রের রাজকুমার। মৈহার ছাড়ার বহুদিন পর গোয়ালিয়রের রাজমাতার কাছে বাজাতে গিয়ে জেনেছিলাম, বহুদূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে জীতেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে, যেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বাবার চোখে জীতেন্দ্র প্রতাপ ছিলো গোয়ালিয়রের রাজকুমার, কারণ জীতেন্দ্র প্রতাপ এই রকম সম্বন্ধই বাবাকে বলেছিলো। বাবা জীতেন্দ্র প্রতাপকে লিখলেন, 'তুমি বাজালে আমার ছাত্র হিসেবেই কাগজে বেরোবে। তুমি যদি সেরকম বাজাতে পারো তাহলে রবিশঙ্করকে বোলো। আমার এই চিঠিটা রবিশঙ্করকে দেখিয়ো। তোমার মধ্যে যদি শক্তি

থাকে তাহলে রবিশঙ্কর নিশ্চই আনন্দের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে বাজাবে।' চিঠি পড়ে আমার হাসি পেল। পাঠকের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগবে, চিঠির বিষয় বস্তু আমি জানলাম কি করে? মৈহারে থাকাকালীন বাবার কাছে যত চিঠি আসত, আমি পড়ে শোনাতাম। বাবার উত্তর আমিই দিতাম, কিন্তু বাবা আত্মীয় ছাড়া কিছু লোককে নিজেই লিখতেন। কিন্তু সেই চিঠিগুলোও আমাকে পড়তে দিতেন বানান শুদ্ধ করে দেবার জন্য। সুতরাং মৈহারে থাকাকালীন বাবা যে পত্র লিখেছেন, তা আমার অজানা নয়। নিজের পুত্র, জামাতা বা আত্মীয়স্বজনকে যা লিখেছেন, সেই সব বহু চিঠির উল্লেখ আমি করব না। যে চিঠি উল্লেখ করলে আত্মসম্মানে লাগবে, তা না প্রকাশ করাই ভালো। কারো কুৎসা রটনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কয়েকটা চিঠির নাম মাত্র উল্লেখ করব এই ভেবে যে, যারা সঙ্গীতের ছাত্র, তারা লাভবান হবেন এই চিঠির বিষয়গুলো পড়ে। বাহাদুর এবং জিতেন্দ্র প্রতাপের চিঠিটা লিখবার উদ্দেশ্যটাও হোল শিক্ষ্যণীয় বলে। বাবাকে চিঠি লিখেছেন দুই তিন জন, সে চিঠিগুলি বাবা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিগুলি তোমার কাছে রাখ। এগুলো কাজে দেবে।' অবশ্য সে সব চিঠিগুলো জানিয়ে দিলে অনেকের মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে। সে চিঠিগুলো আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। বাবার কাছে সঙ্গীতের ভাণ্ডার ছাড়াও বহু অমূল্য জিনিস ছিল। সেই অমূল্যগুলো হোল সত্যিকারের মানুষ হবার শিক্ষা।

মৈহারে আসবার আগে যা দেখেছি মৈহারে এসেও এযাবৎ তাই দেখছি। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখলাম। রেডিওতে বাবার প্রত্যেক মাসে, দুই দিনের বাজনা হতে দেখেছি। আজ চিঠি এল রেডিও থেকে, কার্যক্রম হবে কেবল একদিনের জন্য। সুতরাং দক্ষিণাও কমে গেছে। রেডিওর তরফ থেকে চিঠি দিয়েছে, দেশের নানা সমস্যার জন্য আকাশবাণীর বাজেটে কিছু কম করা হয়েছে। যার জন্য উপস্থিত একদিনের জন্যই কার্যক্রম থাকবে। বাবাকে চিঠির বিষয়বস্তু বললাম। বাবা ব্যাপারটা বুঝে বললেন, 'রেডিওতে লিখে দাও একদিনের জন্য যাব না। রেডিওতে কিছুই টাকা পাওয়া যায় না। লোকে আগ্রহ করে বাজনা শোনে বলে, রেডিওতে বাজাই কিন্তু ছাতার একদিনের জন্য এই বুড়ো বয়সে আর যাব না।' বাবার কথামত আমি রেডিওর ডাইরেকটরকে লিখলাম না। রেডিওতে লিখে দিলাম, 'যে দিনে প্রোগ্রাম হয়েছে, সে সময় বাবা থাকবেন না। উপস্থিত বাইরে গিয়েছেন, পরে প্রোগ্রাম পাঠাতে।'

রাত্রে বাবার কাছে শিখতে গেলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি শিখবে?' ইচ্ছে তো অনেক কিছুর, কিন্তু জানি, এ হল বাবার পরীক্ষা। কিছু বললেই বাবার বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হবে সুতরাং বললাম, 'আপনি যা ভাল মনে করেন তাই শিখব। আমার কথা শুনে বাবা খুশী হলেন। একমিনিট চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে তিলংই শেখ। আজ আলাপের আগে যেমন ছেড় দিয়ে শুরু করো, সেই রকম না করে কৈদ আলাপ বাজাও। ধ্রুপদ অঙ্গে বাজাও। সব অঙ্গ শিখে রাখা ভাল। কৈদ আলাপে 'স' থেকে মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত কেবল বিস্তার কর। কত প্রকারে বিস্তার করতে পার দেখি। এইটুকু বিস্তারে কেউ বুঝতে পারবে না যে তিলং বাজছে।' আজ কেবল আলাপই শেখালেন। কয়েকদিন ধরে এই রাগই চলছে, কিন্তু নিত্য নতুন।

পরের দিন ত্রিপুরা থেকে চিঠি এল। ত্রিপুরাতে সঙ্গীত সম্মেলনে বাজাবার জন্য আমন্ত্রণ। বাবা রাজী হলেন। ইংরেজী সংবাদপত্রে দেখলাম, আলি আকবরের আগামী কাল এলাহাবাদে প্রোগ্রাম হবে। এই সংবাদ পড়ে অবাক হলাম। আলি আকবর কোলকাতায় এখনো যায়নি। সংবাদটা পড়ে মনে হোল, একদিনের জন্য এলাহাবাদে গিয়ে বাজনা শুনে আসি। কিন্তু বাবা হয়ত রাগ করবেন। বাবা হয়ত ভাববেন, এলাহাবাদে এত পরে বাজনা ছিল, তাহলে কোলকাতায় যাবার নাম করে কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল? সুতরাং বাবাকে আলি আকবরের এলাহাবাদে বাজানোর কথা বললাম না।

বাড়ীতে সব সময়, কিছু না কিছু লেগেই আছে। বাড়ীতে একজন দু'জন পালা করে জ্বরে পড়ে। গরুবাছুরদেরও তাই। মনটা নানা কারণে ভারাক্রান্ত। এর মধ্যে সাতনার ডিসির চিঠি পেলাম। বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছেন, রেওয়া ছাড়া মৈহারের ব্যাণ্ডপার্টি কোথাও যাবে না। যদি যেতে হয় তাহলে রেওয়ার চিফ্ সেক্রেটারির অনুমতি নিতে হবে।' এই ধরনের সরকারী চিঠি এলেই বাবার মেজাজ বিগড়োয়। 'মৈহারের ব্যাণ্ড কোথাও যায় না, অথচ বৃথা সরকারী পয়সা খরচা করে খাম লেখার প্রয়োজন কি?' বাবার উত্তর শুনে অবাক। আসলে ফালতু খরচা যেই করুক না কেন, বাবার কাছে অপরাধ।

রাত্রে বাবার কাছে শিখতে গেলাম। বাবা বললেন, 'এতদিন ধরে শিখছ। তিলং রাগে সম্পূর্ণ আলাপ, জোড়, ঠোক ঝালা বাজাও।' বাবা আজ সরোদ বার করলেন না। আজ শুনবার জন্য বসেছেন তামাকের নল মুখে দিয়ে। বাবার কথামত মন দিয়ে বাজালাম। বাবা চুপ করে শুনে বললেন, 'এবারে ধীমাগতের মুখড়াটা প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা করে, কত রকমভাবে বাজাতে পার দেখি। বাবা বলে যাচ্ছেন এবং আমি যন্ত্রচালিতের মত বাজিয়ে যাচ্ছি। বাবার একটি কথা শুনেই বুঝলাম, খুশী হয়েছেন। বললেন, 'করতে যাও, করতে গেলে পাবেই পাবে।' আজ বাবার কাছে কোন ধমক খেলাম না। সুতরাং দিনটা স্মরণীয়।

সকালে পোষ্ট অফিসে যাচ্ছি। হাতে আমার ছেড়া চপ্পল। মুচির কাছে সারাতে হবে। বাবা বাজার করতে বেরিয়েছেন। আমার হাতে ছেঁড়া চপ্পল দেখলেন, কিছু বললেন না। বাড়ীতে এসে ছেলেদের পড়ানোর পালা। ধ্যানেশকে কয়েকদিন পড়াইনি। এখন আবার পড়াতে শুরু করেছি। বাজার থেকে এসেই বাবা জোরে হাঁক মারলেন। মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের কত বড় সাহস ব্রাহ্মণকে চটি সেলাই করতে দিয়েছ।' বাবার এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি বললাম, চটিটা আমারই ছিঁড়ে গিয়েছিল।' আসলে বাবার চোখে পড়েছে আমার হাতে চটি। পায়ে যে চটি নেই তা দেখেন নি। মনে মনে ভেবেছেন বাড়ীর কারো চটি। আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'তাই বলো। এদের তো কোন আক্কেল নাই।' বাবা বাজার রেখেই আবার বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে অবাক হ'লাম, এরকম তো কখনো হয় না। বাজার থেকে এসেই তামাক খাবেন। তামাক না খেয়ে আবার কোথায় গেলেন? পড়ান শেষ করব এমন সময় দেখি, ভেটরেনারী ডাক্তারকে নিয়ে বাবা এসেছেন। ভেটরেনারী ডাক্তারকে দেখে আমি অবাক। বাবা বললেন, 'বাজারে যাবার সময় বুদ্ধার কাছে শুনলাম, একটি গরু মল ত্যাগ করার সময় রক্ত বের হচ্ছে।' অবাক হয়ে বাবাকে বললাম, 'আমাকে

কেন বললেন না। আমি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতাম।' উত্তরে বাবা বললেন, 'বাজার থেকে এসে দেখলাম তুমি পড়াচ্ছ। তাছাড়া কত কাজ তুমি করবে? আসলে গুরু শিষ্যর সম্বন্ধ হোল পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। দু'জনে দু'জনকে না দেখলে কি করে চলবে?' বাবা যেভাবে কথাটা বললেন দ্রবীভূত হয়ে গেলাম। বৃদ্ধ বয়সে বাজার থেকে এসেই, আবার স্টেশনের দিকে অন্য প্রান্তে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছেন। এতদিনে বাবা বুঝেছেন, ঝাড়ফুঁক করলে গরু-বাছুরের রোগ সারে না। বাবা ভেটরেনারী ডাক্তার বলতেন না। বলতেন, 'তোমাদের ঐ সব ইঞ্জিরি নাম মুখে আসে না। জন্তু জানোয়ারের ডাক্তার বলতে পার না।' বাবা ঘরে যাবার পর চিঠি দিলাম। চিঠি লিখেছেন বাবার বড় ভাই আফতাবুদ্দিন এর শালা আলি আহমেদ খাঁ। আলি আহমেদ খাঁ, প্রথম বাবার নামে 'আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজ' খুলেছেন। এই সঙ্গীত সংস্থা খুলে প্রথমে বাবাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। বাবার নামে এই সংস্থা খুলেছে বলে বাবাকে খুশী হতে দেখেছি। আজ আলি আহমেদ খাঁ লিখেছে, 'পাঁচই ডিসেম্বর কনফারেন্স করছি সুতরাং আপনাকে আসতে হবে।' বাবা সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন। বাবা আমাকে বললেন, 'রবিশঙ্করকে টেলিগ্রাম করে দাও যাতে আশিস্‌কে পাঠিয়ে দেয়।' সেই হজের সময় আশিস বাবার সঙ্গে বম্বে গিয়ে দিল্লী চলে গেছে। চারমাস হতে চলল, বুঝলাম বাবার ইচ্ছে আশিসকে নিয়ে বাজাবেন আলি আহমেদ খাঁ কনফারেন্সে। রবিশঙ্করকে টেলিগ্রাম করে দিলাম। এবার আমার একটা কাজ বাড়লো। এতদিন বাড়ীর কারোর অসুখ হলে পোষ্ট অফিসের পাশেই ডাক্তারখানায় যেতাম, এবার রোজ উত্তর দক্ষিণ দু'দিকেই যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়াল। উত্তরে ডাক্তার গোবিন্দ সিং, এবং দক্ষিণে পশুচিকিৎসক।

পরের দিন পোষ্ট অফিসে গিয়ে দেখলাম, একটি হিন্দি মাসিক পত্রিকায় আলি আকবরের জীবনী বেরিয়েছে। আলি আকবরের চিঠিও এসেছে আমার নামে। বাড়ী এসে আলি আকবরের জীবনী পড়ে শোনালাম। বাবা খুব খুশী হয়েছেন বুঝলাম কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। আলি আকবর আমাকে যে চিঠি দিয়েছে, সেই চিঠি পোষ্ট অফিস থেকে আসার আগেই পড়েছি। আলি আকবরের চিঠি পড়ে আকাশ থেকে পড়লাম। কোলকাতায় অল বেঙ্গল এবং অল ইণ্ডিয়া দুই কনফারেন্সেই আলি আকবরের বাজানোর কথা ছিল। প্রথমে অল বেঙ্গল ছিল, তার কিছু দিন পর অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে বাজাবার কথা। কিন্তু একটি বিশেষ কারণ দেখিয়ে বলেছে, অল বেঙ্গল কনফারেন্সে বাজাতে পারবে না। সেইজন্য কোলকাতায় না গিয়ে এলাহাবাদ থেকেই গাড়ী করে বম্বে চলে গিয়েছে। সময় মত অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে বাজাতে যাবে। অল বেঙ্গল কনফারেন্সে বাজাতে না পারার যে কারণ লিখেছে বিশ্বাস হল না। রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'লে বুঝতে পারব। কিন্তু অবাক হ'লাম এই ভেবে, এলাহাবাদ থেকে যখন বম্বে গাড়ী করে গেছে, তখন মৈহারের উপর দিয়েই গিয়েছে, অথচ মৈহারে একদিন থেকে তো যেতে পারতো। আলি আকবরের এই চিঠির কথা বাবাকে বললাম না। বাবা চিঠি পড়ে নানা প্রশ্ন করবেন। বর্তমানে বাবার মনটা খুব প্রসন্ন। প্রফুল্ল মনটাকে অপ্রসন্ন করতে চাই না।

সন্ধ্যার সময় এক মহিলা এসে বাবাকে বললেন, 'হজ করে এসে হাজিন হয়েছি।' বাবা সেই মুসলমান মহিলাটিকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। মহিলাটি বললেন, 'অনেক খরচা হয়ে গিয়েছে। যদি আপনি কিছু সাহায্য করেন তাহলে উপকৃত হবো।'এই সময় ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। গোবিন্দ সিং ভদ্রমহিলাকে দেখেই, বাবাকে বললেন, 'এই মেয়েটি কি আপনার কাছে টাকা চাইছে?' কথা শুনে বাবা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। বাবা মহিলাটির আসার উদ্দেশ্য বললেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'মৈহারে এই মহিলাটি সব জায়গায় এই কথা বলে টাকা আদায় করে।' মেয়েটির প্রতি বাবার যে করুণা হয়েছিল ক্ষণিকের মধ্যে কর্পূরের মতো উড়ে গেল। করুণা ঘৃণায় পর্যবসিত হল। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'হজের নামে এই বেইমানি।' বাবার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ হোল, 'আরে নিকালো, নিকালো, নিকালো। শুয়ার কে বচ্চে কো নিকালো।' মহিলাটি দৌড়ে পালাবার পথ আর পায় না। মহিলাটি এই রুদ্রমূর্ত্তি পূর্বে কখনও দেখেনি বোধ হয়। ধর্মের নামে টাকা চাওয়া একটা প্রফেশনের মধ্যে পড়ে। মহিলাটিও সেই সুযোগ নিয়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু পড় তো পড় ডাক্তারবাবুর সামনে। মেয়েটি কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, ডাক্তারবাবু তার ছলনার কথা জানে। কিন্তু মেয়েটির দৌড় দেখে একদিকে যেমন হাসি পেল আবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হোল। বাবার মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং শিক্ষা 'নৈব নৈব চ'। বাবার মেজাজ কিছুক্ষণ পরে ঠিক হবার পর, আলি আকবরের জীবনীটা ডাক্তারবাবুকে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে কি বেরিয়েছে।' বাবার মুখটা দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কত আনন্দিত হয়েছেন। ডাক্তারবাবু পড়লেন। ডাক্তার আলি আকবরের প্রশংসা করলেন। এই প্রশংসা শুনে বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'প্রশংসা ভাল জিনিস নয়। প্রশংসা হলেই অহংকার হয়। আর অহংকার হলেই পতন।' ডাক্তারবাবু এতদিনে মেজাজ বুঝে নিয়েছেন। তিনি অন্যপ্রসঙ্গে কথা তুলে বললেন, 'আশিস এখানে অনেক দিন নেই।' আশিসের কথা উঠতেই বাবা আমার দিকে তাকালেন। বাবাকে বোঝালাম গতকাল সকালে টেলিগ্রাম করেছি। শীঘ্রই উত্তর আসবে কবে। আশিস মৈহারে আসবে। ডাক্তারবাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। খাবারের সময় হয়ে গিয়েছে দেখে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

পরের দিন রবিশঙ্করের টেলিগ্রাম পেলাম। রবিশঙ্কর জানিয়েছে, টনসিল এবং জ্বর হওয়াতে আশিস যেতে পারবে না। এক ছাত্রকে পাঠিয়েছে সব কথা বলবে, চিন্তার কারণ নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে বুঝলাম, রবিশঙ্করের ছাত্র আজকের রাত্রের ট্রেনে আসবে। এখন বাবাকে আশিসের কথা বলব কি করে? বাবা তো ঘাবড়াবেন কিন্তু বলতেই হবে। বাবাকে টেলিগ্রামের কথা বলে, বাড়তি একটা কথা জুড়ে দিলাম, আশিস শীঘ্রই মৈহারে আসবে। বাবা টেলিগ্রামের সমাচার শুনে বললেন, 'আরে আরে, কেবল অসুখেই ভোগে। রবিশঙ্করের কাছে সবাই থাকে, তাদের জন্য আমার মা অন্নপূর্ণাকে দিনরাত রান্না করে খাওয়াতে হয়। তারপর আশিসের জ্বর, টনসিল হয়েছে। আমার মায়ের না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।' বাবাকে বললাম, টেলিগ্রামে রবিশঙ্কর লিখেছে চিন্তা না করতে। এ ছাড়া রবিশঙ্করের একটি ছাত্র রাত্রেই আসবে, সুতরাং কাল সকালেই জানতে পারবেন।' আজ শুক্রবার বাজনা বন্ধ।

সন্ধ্যার সময় ছ'টা থেকে খাবার আগে পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গে কথা হোল। প্রথমে ধর্ম এবং কোরান সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। বাবার কাছে ধর্ম সম্বন্ধে যা শুনলাম কল্পনা করা যায় না। বাবা এসব কোথায় পড়লেন? বাবা বললেন, 'সত্যযুগে সকলের চারপদ থাকত। সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান। ত্রেতা দ্বাপরে, ধীরে ধীরে সব কমতে লাগল। আর এখন আমরা কলিযুগের মধ্যে বাস করছি। হজের নাম করে হাজিন সেজে কত শত মিথ্যে বলছে। এই পাপের বৃদ্ধির জন্য ধর্ম আর থাকবে না। এই যুগে লোক লোভী, দূরাচারী, ক্রোধী, অকরুণ এবং লম্পট হবে। মায়া, আলস্য, অসত্য, বিবাদ এই সব তমোগুণ দেখা যাবে। মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবে এবং পাপকেই ধর্ম বলবে। কুলিযুগে এত দোষ থাকার জন্য, সঙ্গীতের আরাধনায় সারা আসক্তি চলে যায়। সেই ওম্-এর সাধনা করতে হবে। তিনটে অক্ষর মিলিয়ে 'ওম' শব্দ হয়েছে। অ উ ম। এই তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজ এবং তম।' এই কথা বলেই 'সুরমন্ত্র' বলে, একটি সরগম বললেন, সরগম দিয়ে যে এমন গান হয় আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এই সুরমন্ত্রটি আগেই উল্লেখ করেছি। তারপর ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথার পর বাবা তানসেন, গোপাল নায়ক এবং বৈজু বাওরার নানা কাহিনী বললেন। তানসেনের রচিত রাগ এবং রাগ তৈরি করবার কারণ কি, সেই গল্প বললেন। বাবা আবার প্রসঙ্গ পাল্টে দুটো কথা বললেন যা আমার কাছে বিস্ময়। একটি কথা বললেন, আলি আকবর সম্বন্ধে এবং অপরটি রবিশঙ্কর সম্বন্ধে। বাবা তানসেনের গল্প বলতে বলতে শেষ বংশধরদের নাম বললেন। বাবা বললেন, 'আমার গুরু উজির খাঁর নাতি হলেন দবীর খাঁ। তানসেনের শেষ বংশধর। তুমি যত ছোট দেখছ আশিসকে কিংবা ধ্যানেশকে, আমিও শিক্ষাকালীন দবীর খাঁকে সেই অবস্থায় দেখেছি। আগে নিয়ম ছিলো গুরুগৃহে থেকে গুরুর কাছে গণ্ডা বেঁধে শিখবে। এর জন্যই আলি আকবরকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়ে, নিয়ম রক্ষার জন্য আমার গুরু উজির খাঁর কনিষ্ঠ সন্তান, খলিফা সগীর খাঁ লাল ধাগা ছুঁয়ে দেবার পর, দবীর খাঁকে দিয়ে গণ্ডা বাঁধিয়েছিলাম। যে সময় গণ্ডা বাঁধিয়েছিলাম, আমি আমার সাধ্যমত এক হাজার এক টাকা খরচ করেছিলাম বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বাড়ীতে। দবীর খাঁ সাহেবের বাড়ীতে আলি আকবরকে রেখে চলে এসেছিলাম, কিন্তু কোলকাতায় দবীর খাঁ সাহেবের শরীর ভাল না থাকাতে কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন নি। আলি আকবরকে মৈহারে নিয়ে আসি। তোমার গণ্ডা বাঁধার সময় এই প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে বলেছি। তবে আমি জীবনে গণ্ডা বাঁধতে কোন শিষ্যের নিকট একটা পয়সা নিইনি। আমি জীবনে বড় কষ্ট করে শিক্ষা করেছি। সেই জন্য ছাত্রর নিকট টাকা নেওয়া মানে ছাত্রের পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া। তবে সকলের গণ্ডা বাঁধলেও মেয়েদের আমি কখনো গণ্ডা বাঁধিনি। মেয়েরা হোল মায়ের জাতি। তবে বহু ছেলেকে গণ্ডা বাঁধলেও রবিশঙ্করকে আমি গণ্ডা বাঁধিনি। তার কারণ ছিলো।' আলি আকবরকে যখন গণ্ডা বাঁধার প্রসঙ্গ পরে জিজ্ঞাসা করি, আলি আকবর সব স্বীকার করেছিলো, বাবা যা যা বলেছিলেন। কিন্তু রবিশঙ্কর মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

বাবা রবিশঙ্করের গণ্ডা বন্ধনের কথা যে সময় বলছিলেন, ঠিক সেই সময় খাবারের ডাক পড়লো। খাবার খেয়ে বাবা নিজের ঘরে শুতে গেলেন। রাত্রে রবিশঙ্করের ছাত্র এলো।

ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। যে সময়ে আমার সরোদ আনতে দিল্লীতে গিয়েছিলাম, সেই সময় এই ছেলেটির সঙ্গে রবিশঙ্কর পরিচয় করিয়েছিলো। ছেলেটির নাম অমিয়। অমিয় এসে আমাকে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা আমাকেই লিখেছে রবিশঙ্কর। লিখেছে, 'সব সমাচার অমিয়র কাছে জানতে পারবে। কোলকাতার ঠিকানা দিলাম, চিঠি দিও। তুমি ভাগ্যবান, কেননা বাবার সঙ্গ পাচ্ছ। তাই আমার প্রাণ ভরা ভালবাসা নিও।' রবিশঙ্করের চিঠি পড়ে অভিভূত হলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম, রবিশঙ্কর হল এক জাত অভিনেতা? তখন কি জানতাম, এই সব পট্ট শিষ্য অমিয়, হরিহর এবং অন্য আরো শিষ্যদের কেন বিনা পয়সায় বাড়ীতে সব খরচা দিয়ে লোকদেখানো শিষ্য করে রেখেছে? অমিয় বলল, 'হঠাৎ আশিসের টনসিল বেড়ে গিয়েছে, সেই জন্য আশিসকে আনতে পারলাম না। বাবা পাছে ভয় পান সেই কথা ভেবে গুরুজী পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবাকে সব কথা বলতে।' সে আরো বলল, 'যে গুরুজী অর্থাৎ রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর এক সঙ্গেই অল বেঙ্গল এবং অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে বাজাবার নিমন্ত্রণ পায়। অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সের সেক্রেটারী লালাবাবু কত টাকা দেবে, কবে বাজাতে হবে বলে একটি ফর্ম দিয়েছিল। সেই ফর্মটিতে সই করে স্বীকৃতি জানাতে হবে। সেই ফর্মে ছোট করে লেখা ছিল, অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে বাজাইবার আগে কোলকাতার কোন কনফারেন্সে বাজাইব না। যদি বাজাই তাহলে চুক্তি পত্রের অবমাননা করা হবে। এই লাইনটা রবিশঙ্কর কেটে দিয়েছিল, যার ফলে অল ইণ্ডিয়ার আগে অল বেঙ্গলে বাজাতে পারছেন। কিন্তু যেহেতু আলি আকবর সেই শর্ত কাটে নি, সেই জন্য খবরের কাগজে অল বেঙ্গল কনফারেন্সে, আলি আকবরের নাম দেখে লালাবাবু মামলা করবে বলে আলি আকবরকে জানিয়েছে। তাই আলি আকবর কোলকাতা না গিয়ে বম্বে চলে গিয়েছে। রবিশঙ্কর যেহেতু চুক্তি কেটে দিয়েছিল সেই জন্য অল বেঙ্গলে বাজাতে গেছে।' অমিয় যা যা বলল, আলি আকবর আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে, কিন্তু একটি জায়গায় কথার মিল হচ্ছে না। আলি আকবর দুঃখিত হয়ে জানিয়েছে, 'এই শর্তটা কাটা হবে জানা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটা হয়নি। আমি কেবল সই করে একজনকে দিয়েছিলাম সব ভরে ফেলে দিতে।' এ কি চক্রান্ত। এও কি হয়? কিন্তু পরে জেনেছিলাম ব্যাপারটা সত্যই তাই হয়েছিল। যদিও অপরপক্ষ স্বীকার করেনি। একে রাত্রে অমিয় এসেছে, তারপর আমার ঘরে এই কাহিনী শুনতে সময় লেগেছে সুতরাং চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে অমিয় আমার সামনে বাবাকে আশিসের না আসার কারণ বলল। কথায় কথায় অমিয় বাবাকে বলল, 'আলি আকবর এলাহাবাদ থেকে বম্বে চলে গিয়েছে।' বাবা এ কথা শুনে অবাক। বম্বে ফিরে গিয়েছে মৈহারের উপর দিয়ে অথচ দেখা করেনি। কথাটা ঘুরিয়ে বাধ্য হয়ে বাবাকে বললাম, 'এলাহাবাদের হোটেলে যেহেতু অনেক টাকা খরচা হয়ে গিয়েছিল সেইজন্য বম্বে চলে গিয়েছে।' বাবা চুপকরে শুনলেন। অমিয় শেষে বলল, 'গুরুমা অর্থাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর এখনও হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু হাজার বললে কোন ওষুধ খান না।' গুরুর আদেশে এসে অমিয় এই সব কথা বলেই দুপুরের বাসে সাতনা চলে গেল। সাতনা থেকে মেল ধরে এলাহাবাদ গিয়ে দিল্লীর ট্রেন ধরবে। অমিয় কথা গুছিয়ে বলতে পারে। এই কথাগুলি বলবার জন্য খরচা করে রবিশঙ্কর অমিয়কে পাঠিয়েছে। মনে হোল পাখীকে যেমন পড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে, সেইরকম পাখী কথাগুলো পরের পর সাজিয়ে বলেই চলে গেল। তখন কি জানতাম, এই অমিয়, হরিহর, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ায় রবিশঙ্করের কাজে। সে কতকাল আগের কথা। লিখতে বসে আজ মনে হচ্ছে, রবিশঙ্কর প্রতিটি কাজ, কি নিপুণভাবে আগে থেকে পরিকল্পনা করে, ছবির মত ছকে রাখে। এও এক কলা। এই কলা না জানলে কলিযুগে চলা যায় না। বাবা ঠিকই বলেছেন, কলিযুগে ধর্ম থাকবে না। বাবা সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। সত্যদ্রষ্টা না হলে এ কথা সে সময় কেন বলেছিলেন? রেওয়া থেকে সংবাদ এলো তেসরা ডিসেম্বর ব্যাণ্ড নিয়ে যেতে হবে। ফরেস্ট কনফারেন্স হচ্ছে, সেই উপলক্ষে এই বাজনা। ব্যাণ্ড নিয়ে বাবা কোন জায়গায় গেলে বেহালা বাজাতেন। ব্যাণ্ডে রোজ হারমোনিয়াম বাজাতেন। যেহেতু ব্যাণ্ড নিয়ে যেতে হবে সুতরাং বেহালাটি বার করে দেখলেন কেমন আছে। বহুদিন বাজাননি। কানগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছে। বিকেলে ব্যাণ্ডে চলে গেলেন। ব্যাণ্ড থেকে এসেই নমাজ পড়বার পর বললেন, 'ইমন বাজাওতো।' কৈদ আলাপ দিয়ে শুরু কর, শেষ কর ধুয়ামাঠা এবং পরমাঠা দিয়ে। বাবা শীঘ্র চলে যাবেন কোলকাতায়। মনে মনে ভাবছি বোধ হয় নতুন কিছু শেখাবেন। কিন্তু ঘুরে ফিরে ইমন এখনও চলছে। কমলীকে আমি ছাড়তে চাইলেও কমলী আমায় ছাড়তে চায় না। বাবার কথামত বাজালাম। যখন দ্রুত জোড় বাজাচ্ছি, হঠাৎ বাবা নিজের সরোদ বার করে, ছন্দের নানা কাজ বাজিয়ে শেখাতে লাগলেন। সত্যই, বাবা যে বলতেন, ইমন আর ভৈঁরো ঠিক করে শিখলেই প্রায় সব শেখা হয়ে যায়। নিত্য নূতন নবরূপে নব পরিচয়।

৩৫

শীতকাল। সকালে অসুস্থ জুবেদা খাতুনের ওষুধ আনতে গেছি। পিওন টেলিগ্রাম দিলো। টেলিগ্রাম করেছে আলি আহমেদ, 'ডেট অলটারড লেটার ফলোস।' একি হোল? আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের তরফ থেকে আলি আহমেদ জানিয়ে দিলো পাঁচই ডিসেম্বর সঙ্গীত সম্মেলন হবে। বাবার যাবার সব ঠিক, অথচ এই টেলিগ্রাম। যাক ভালই হোল। কোন কারণে তারিখ পাল্টেছে চিঠিতে সব জানা যাবে। বাবা বাড়ীতে থাকলে সব দিক দিয়ে ভালো। বাবার মেজাজ বুঝে চলতে হয় ঠিকই, কিন্তু শিক্ষা তো হয়। বাবা না থাকলে খরচার পরিমাণ বেড়ে যায়। আমার হয় বিপদ। মক্কা যাবার আগে বাবা বাড়ীর নাম 'মদিনা ভবন' রেখেছিলেন। নাম লিখে বাবার বৈঠকখানার সামনে টাঙ্গিয়েছিলেন। প্রতিমাসের পয়লা তারিখে, যেমন চাকর, গয়লা, ঝিকে টাকা দেওয়া হয়, সেই রকম মাসের প্রথম দিনে ব্রাসো দিয়ে 'মদিনা ভবন' লেখাটি ঘসে পরিষ্কার করা হয়। এই নাম রাখার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। মার নাম মদন্যিনিশা খাতুন। এটা হ'ল মুসলমানি নাম। বাবা হিন্দু নামকরণ করেছিলেন মদনমঞ্জরী। মক্কা যাবার আগে মদনি এবং মদিনা দুটো নামের সমন্বয়ে 'মদিনা ভবন' করেছিলেন। নামকরণের পিছনে আরো একটা কারণ ছিলো। হজ করতে লোকে মক্কা মদিনা যায় সুতরাং মদিনা একটি পবিত্র নাম। সুতরাং নেম প্লেটে পবিত্র নাম মদিনা থাকার জন্য পরিস্কার করা দরকার। বাবাই এটা বলেছিলেন।

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। বাবার সবদিকে খেয়াল আছে। সকলের জন্য একটি লেপ

করতে লাগলেন। প্রথম লেপটি করে আমাকেই দিলেন। মৈহারে এসে অবধি দেখেছি, হাথরস থেকে 'সঙ্গীত' পত্রিকা আসে। আজ হাথরস থেকে একটি পার্সেল এল বাবার নামে। পার্সেল খুলে দেখলাম 'সঙ্গীত' পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ, ভাতখণ্ডেজী লিখিত 'ক্রমিক পুস্তক মালিকার' তিনটি খণ্ড পাঠিয়েছে। বাবাকে একটি চিঠিও লিখেছেন। চিঠিতে লিখেছেন তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আরো তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হলে পাঠাবে। বইটা পড়ে মতামত লিখবার জন্য অনুরোধ করেছে নাতি হিসাবে। যেহেতু রবিশঙ্করের কাছে শেখে, তাই গুরুজী বলে ডাকে। অন্নপূর্ণাদেবীকে মাতাজী বলে সম্বোধন করে। সুতরাং এই সম্পর্কে বাবার নাতি হল। চিঠিটা বাবাকে পড়ে শোনালাম, বাবা খুশী হলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুক্তোর মতো হাতের লেখা দেখে খুব ভাল লাগল। বাবা প্রথমেই বইটা আমাকে পড়তে বললেন। বাবা বললেন, 'তুমি বইটা পড়ে আমার নাতিকে একটা উত্তর দিয়ে দিও খুব ভাল করে। বহুদিন থেকে সঙ্গীত পত্রিকা পাঠায়। কখনো পয়সা নেয় না।' তিনটি খণ্ডই পড়লাম। বইপড়ে বুঝলাম থিওরি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার আছে, কিন্তু বহু রাগের সঙ্গে মেলে না, যা বাবার কাছে শিখেছি। বইগুলো তো বাবাকে দিতে হবে, কিন্তু আমি নিজেও এই বইগুলো রাখতে চাই, অসময়ে পড়ব বলে। রাত্রে, নিজের পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে লিখলাম, আমার নামে তিনখণ্ড বই ভিপি করে পাঠিয়ে দিতে।

পরের দিন আগরতলা থেকে চিঠি এল। পঁচিশে ডিসেম্বর বাজনা ঠিক হয়েছে। আলি আহমেদের চিঠি এল, আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের প্রোগ্রাম পিছিয়েছে কারণ আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের স্বীকৃতিপত্র পায়নি বলে। যে মুহূর্তে তাদের পত্র পাবে বাবাকে জানাবে। ইতিমধ্যে, আকাশবাণী এলাহাবাদের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এসে জানালেন, কলকাতার গভর্নর হাউসে একটি সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। যাতায়াতের খরচা কেবল দেবে। বাবা এই প্রোগ্রাটি নাকচ করে দিলেন। বাবা এলাহাবাদের রেডিওর কর্তাদের বললেন, 'টাকা দিলেও যাবো না। গভর্নর হাউসে লোক দেখানো বাজনা হয়, সেখানে গান বাজনা কেউ বোঝে না। রেওয়াতে বছরে তিনচারবার যেতে হয় গভর্ণর হাউসে। বাধ্য হয়ে যাই কারণ ব্যাণ্ড পার্টির জন্য সরকার টাকা দেন। গভর্নর্ণর হাউসে বাজনার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কোলকাতা থাকাকালীন একবার বাজিয়েছিলাম। আমাকে সম্মানও করেছিলেন। কোলকাতায় ছিলাম বলেই রাজি হয়েছি। মৈহারে থেকে, এই বাজনার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে যাওয়া সম্ভব নয়।'

আসলে টাকাটা বড় কথা নয়, মেজাজ খারাপ থাকলে, সেই সময় কেউ বাজনার কথা বললেই, বাবা এই ধরনের কথা বলে দিতেন; কিন্তু অন্য সময়ে নামমাত্র টাকায় বাজাতেন। যদি দেখতেন প্রকৃতপক্ষে বাজনা শুনবার আগ্রহী, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেতে দেখেছি। টাকার জন্য কখনো দর কষাকষি করতে দেখিনি। মেজাজ খারাপ হবার কারণ ছিলো। গতকাল, নতুন কোতয়াল চব্বিশ ঘণ্টা আগে এসে রেওয়াতে ব্যাণ্ড বাজাবার জন্য বলেছিলেন। বিন্ধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের অনুরোধে কোনও জায়গায় যাবার হলে, বাবা কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি করতেন। ব্যাণ্ড নিয়ে গেলে সকলকে বলতে হবে। সময়মত তারা আসবে কি না তার ঠিক নেই। বাবাতো চারঘণ্টা আগে প্রস্তুত হয়ে বসে

থাকবেন। গতকালের অভিজ্ঞতার জন্যই আজ এলাহাবাদের অফিসারকে কোলকাতার প্রোগ্রাম না করার কথা বলে দিলেন।

ভেটরেনারী হাসপাতালে দুবেলা যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই ডাক্তারকে বাবা নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবার সামনে পশুচিকিৎসক আমাকে বললেন, 'দুবেলা ওষুধ আনতে যান, তাহলে বাজান কখন?' বাবা এ কথা শুনে লজ্জিত হ'লেন। ডাক্তারবাবুর কাছে এই কথা শুনে, পরের দিন বাবা নিজে চলে গেছেন। আমার কাছে বিস্ময় লাগল। বাবা বললেন, 'বৃথা সময় নষ্ট না করে এখন কয়েকদিন রোজ শিক্ষা কর। কেননা আমি কোলকাতায় এবং কুমিল্লায় যাব। সারাদিন আলতু ফালতু কাজ তোমাকে করতে হয়। কি করবে? তোমার আমার ভাগ্য খারাপ।' বুঝলাম বাবার বলার কারণটা কি? আজকাল ধ্যানেশ এবং বেবীকে রোজ শেখাচ্ছেন। আমাকে রাত্রে বেহাগ শেখাচ্ছেন। বললেন, 'জানিনা কবে আল্লাহর ডাক আসবে। সুতরাং যতটা পার তাড়াতাড়ি শিখে নাও।'

কথায় আছে ঝিকে মেরে বৌকে শেখান। বাবা এই নীতিটা পালন করতেন। একজনের উপর রাগ হ'ল সামনে হয়ত বললেন না, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অন্যের উপর পড়ল। এ ধরণের ঘটনা কয়েকবার হয়েছে। এবারে এই ধরনের ঘটনা বলি। বাবার ঘড়ি দেখে কাজ। সকালে উঠে প্রাতঃভ্রমণ, চা খাওয়া, বিশ্রাম, ঘড়ি দেখে হবে। আবার বিকেলে, ব্যাণ্ডে যাবার আগে চা, রাত্রে খাওয়া, সব সময় মত হবে। একটু দেরী হলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ঘড়ি দেখে মা কিন্তু নীরবে সব কিছু সময়মত ব্যবস্থা করেন। মার শরীরটা খারাপ। ব্যাণ্ডে যাবার আগে জুবেদা খাতুন চায়ের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে। ব্যস আর যাবে কোথায়? চা না খেয়েই ব্যাণ্ডে চলে গেলেন। বৌমা ঘোমটা দিয়ে যতই বলুক চা প্রায় হয়ে গেছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা? বুঝলাম আজ বিপদ। ব্যাণ্ড থেকে ফিরে নমাজ সেরে বাবা উপরের ঘরের চাবি চাইলেন। বেবী চাবিটা আনতে একটু দেরী করেছে কোন কারণে। ব্যাস্, বাবা তাকে প্রচণ্ড প্রহার শুরু করলেন। বাবার মারের হাত থেকে মা ও আমি কোনরকমে তাকে উদ্ধার করলাম। বাবার এই রাগ ও প্রহারের কারণ পরে বুঝলাম। গতকাল বাবার চোখে পড়েছিল, বৌমা তাঁর আদরের নাতনিকে মারছেন। ফলে বাবা বৌমার উপর প্রচণ্ড রেগে আছেন এবং সেই রাগের ফলে চা না খেয়েই চলে গিয়েছিলেন। বৌমাকে তো আর মারতে পারেন না। সেজন্য 'বৌকে মেরে ঝিকে শেখানোর' মতোই, বৌমার বদলে নাতনি মার খেল। অদ্ভুত চরিত্রের অদ্ভুত কাণ্ড!

এদিকে খবর এল একদিন পর রেওয়া যেতে হবে। কমিউনিকেশন মিনিষ্টার জগজীবন রাম আসছেন। তার সৌজন্যে ব্যাণ্ড নিয়ে বাবাকে যেতে হবে। রেওয়া যাওয়ার একদিন আগে, বাবা আমাকে দরবারী কানাড়া শেখালেন। বললেন শিখে রাখ। এই রাগের কোমল গান্ধার এবং কোমল ধৈবতের শ্রুতি, শুনে শুনে ভেতরে গেঁথে ফেলতে হবে। জীবনের শেষে, এ রাগ বহু সাধনা করবার পর কিছুটা আয়ত্ত্বে আসবে। যদিও আগে শিখেছি, কিন্তু আজ মনে হোল নিত্য নতুন। সত্যই এ রাগের তুলনা নেই।

পরের দিন পাটনা থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ এল। বাবা রাজী হ'লেন। বললেন, 'দিল্লী,

কোলকাতা, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ফেরৎ তারিখ লিখে দাও। সেই হিসাবে যেন প্রোগ্রাম রাখে। দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি এসেছে কোলকাতা থেকে। কোলকাতায় দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। এ সত্ত্বেও বাবার থাকার সব বন্দোবস্ত করেছেন এই মর্মে চিঠি দিয়েছে। কোলকাতায় কবে পৌঁছবেন জানতে পারলে স্টেশনে থাকবেন। বাবা খুশী হলেন। বাবা যথাসময়ে রেওয়া গেলেন। বাবা বাইরে খুব বিনয়ী। কিন্তু সঙ্গীতের যদি অমর্যাদা হয় তাহলে সহ্য করবেন না। স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যাবেন। রেওয়াতে জগজীবন রামের সামনে ব্যাণ্ড বাজাবার আগেই লেফটেনাণ্ট গভর্নর অনুরোধ করেছেন, যদি কোন ভুল ত্রুটি হয় তাহলে যেন মাফ করে দেন। আগে ডিনারের সময় ব্যান্ড বাজত। সকলে মৃদু আলোচনা করত। সমস্যা সমাধানের জন্যই ডিনারের ব্যবস্থা হয় ডিপ্লোম্যাটদের জন্য। বাবার এইখানে আপত্তি। বাজনা শুনতে হলে, হয় ডিনারের আগে কিংবা ডিনারের পরে। বাবা এই ব্যবস্থা করার জন্য বলাতে, সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। ইংরেজদের থাকবার সময় এবং স্বাধীনতার পরেও ডিনারের সময় ব্যাণ্ডই কেবল হয়, গান বাজনাও হত। বাবা বুঝিয়ে বললেন, 'সঙ্গীত হল মা। খেতে খেতে বাজনা শোনা এবং গল্প করতে করতে বাজনা শুনলে মাকে অপমান করা হয়।'

বাবার রেওয়া যাবার পরই আগরতলা থেকে অগ্রিম টাকা এল। বাবা বাড়ীতে এলেন রেওয়া থেকে বাজিয়ে। বাবা যেহেতু কয়েকদিন পরেই চলে যাবেন সেই জন্য বললেন দরবারী এবং আড়ানা, এই দুটি রাগ কিছুদিন বাজাও।'

কুসংস্কার বাবার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। যেমন যাত্রার আগে যদি কেউ হাঁচে কিংবা পেছন থেকে ডাকে, তাহলে বাবার অমঙ্গলের চিন্তা ছিল, কি হবে? আল্লাই জানে। বারবার পুনরাবৃত্তি করবেন। যেমন হাতের কর, পায়ের পাতা চুলকোন মানেই তার অর্থ আছে। অর্থাৎ একটা কাক কয়েকবার ডেকে চলে গেল। বাবা কাকের ডাক শুনেই বললেন, 'আরে, আরে আবার কে আসবে?' সত্য সত্যই সাতনা থেকে সেইদিন সনৎ এসে হাজির, বাবা বললেন, 'দেখলে তো, তোমরা এই সব বিশ্বাস করনা। পুরোন কালের লোক এই সব কথা বলে গেছেন। সকালে কাক ডেকেছে আর সনৎ এসে হাজির।' সনৎ প্রত্যেক মাসে প্রায় একদিনের জন্য আসত। বাবা সনতকে বলতেন, 'এই বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষাও পাবে না। লেখাপড়া করেছ। সঙ্গীতের পরীক্ষা দিয়ে 'সঙ্গীত নিপুণ' ডিগ্রি নাও। ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষকতার লাইনে গেলে দুবেলা খাবার অভাব হবে না।' সনৎ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পরীক্ষা কয়েকটা দিয়েছি। শেষ পরীক্ষা দিতে গেলে অনেক রাগ শিখতে হবে।' মৈহারে আসা অবধি দেখছি সনৎ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। কলেজে সঙ্গীত বিভাগে চাকরী পেয়ে গেছে, বিবাহও করেছে। বাবা বললেন, 'কি রাগ শিখবি?' সনৎ আব্দার করে বলল, 'রামকেলী শিখব।' বাবা বললেন, 'তোর পরীক্ষার জন্য রামকেলী শেখাচ্ছি। কিন্তু কেলী আর ভাল লাগে না, অনেক তো কেলী হ'ল।' বাবার এই কথা শুনেই আমি হেসে ফেললাম। হাসি যে আমার রোগ। বাবার সামনে হাসা আর সিংহের সামনে দাঁড়ান এক কথা। বাবা আমার উপস্থিতি বুঝে বললেন, 'তুমি এসব কথা শুনো না। ও হ'ল আমার নাতি। ওর সঙ্গে দিল্লগী করছি।' বাবা নাতি সম্বন্ধে ছাত্রের সঙ্গে এই ধরনের ইয়ারকি করতেন, কিন্তু নিজের নাতিদের সঙ্গে কখনো ইয়ারকি করেন নি। অবশ্য

আশিস, ধ্যানেশের বয়স তখন কম ছিল। কিন্তু বড় হয়ে, তাদের ঠিক আলি আকবরের মতো মাথা নিচু করে থাকতে দেখেছি। নাতির সঙ্গে ইয়ারকি করে শেখালেন। শেখাবার সময় বারবার বলা সত্ত্বেও না ওঠাতে পারার জন্য চটে গেলেন। রেগে গিয়ে সনতকে মারলেন না, কিন্ত বেবী এবং ধ্যানেশকে শেখাতে গিয়ে মার পড়লো তাদের উপর।

ইতিমধ্যে আমার মেজদা এবং বৌদি, মার সঙ্গে কাশীতে দেখা করে বম্বে যাবার পথে সাতনাতে দেখা করতে বলেছে। বাবাকে বললাম, এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'তোমার দাদা বৌদিকে মৈহারে নিয়ে এসো।' বললাম, 'দাদার রিজার্ভেশন আছে বলে আসতে পারবেন না।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, সাতনায় গিয়ে দেখা করে এসো।' পরের দিন সনতের সঙ্গেই সাতনা গেলাম সকাল বেলায়। গাড়ী আসবে প্রায় বিকেল চারটে নাগাদ। সুতরাং সনতের সঙ্গে তার বাড়ীতে গেলাম। ইতিমধ্যে সনতের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। বাবার বহু গল্প সনতের বাবা এবং মা বললেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের মৈহারে যাতায়াত। সনতের ছোট ভাই রণজিৎ মাঝে মাঝে বাবার কাছে শিখতে আসে। বাবা একটি নতুন বাজনা তৈরী করেছেন যার নাম চন্দ্রসারং। রণজিৎ সেই বাজনাটা বাজায়। রণজিৎ তার মাকে নিয়ে পরের দিন মৈহারে আসবে বললে। সময়মত স্টেশনে গিয়ে দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করলাম। আমার জন্য সকলেই চিন্তিত। আমার মেজদা বলল, 'আরো কতদিন থাকতে হবে?' দাদাকে বললাম, 'এখনো বলতে পারছি না।' দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করে মৈহারে ফিরে এলাম। পরের দিন রণজিৎ তার মাকে নিয়ে মৈহার ফিরে এল। বাবার ধর্মমেয়ে এসেছে। বাবা মেয়ের মতই ব্যবহার করলেন।

আজ রবিশঙ্করের চিঠি এল। রবিশঙ্কর চিঠিতে জানিয়েছে, 'আশিসের শরীর ভাল না হওয়া পর্যন্ত মৈহারে পাঠাবো না।' চিঠি শুনে বাবা বললেন, 'লিখে দাও কোলকাতায় দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে। তারা চিকিৎসা করাবে।' কি জানি কেন বাবাকে কিছুদিন হল দেখছি রবিশঙ্করের প্রতি রেগে আছেন। এই রাগের জন্যই আশিসকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিতে বললেন। বাবাকে বোঝালাম দিল্লীতে চিকিৎসা হচ্ছে, সুতরাং এখন কোলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাটা ঠিক হবে না। বাবা আমার কথা শুনে বললেন 'ঠিক আছে লিখে দাও ভাল হলেই এখানে পাঠিয়ে দিতে।' রবিশঙ্করকে বাবার মনোভাব জানিয়ে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম। আগে ঝিঁঝিট শিখেছি কিন্তু আজ বাবা হঠাৎ ঝিঁঝিট শুনতে চেয়ে একটা পুরোনো বন্দিসের গৎ শেখালেন। বাবা বললেন, 'লোকে ঝিঁঝিট রাগ খুব সহজ মনে করে, কিন্তু ঝিঁঝিট অত্যন্ত কঠিন রাগ। এই পুরোন বন্দিসের গতে সম না বলে দিলে, যেখানে 'খালি', তবলাবাদক সেই জায়গাটা সম ভেবে বাজাতে দেখেছি। কাশীতে গৎটা বাজিয়েছিলেন। কাশীতে যখন শুনেছিলাম, কি পরদা লাগল কিছুই বুঝতে পারিনি। মৈহারে এসে ঝিঁঝিট শিখেছি। যতবার শিখেছি এক একটি গৎ শিখিয়েছেন। কিন্তু আজ সেই পুরোন বন্দিসটি যখন শেখালেন সঙ্গে সঙ্গে বাজালাম। এই গৎটি যে পুরোন বন্দিস, বাবার মুখেই শুনলাম। বাজনার শেষে বাবা আজকাল প্রায়ই বলেন, 'খোদা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। যেমন কষ্ট করছ তার ফল যেন পাও।'

আজ লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ আমার কথামত, তিনটি ক্রমিক পুস্তকমালিকার তিনটি খণ্ড ভিপি করে, রেজিষ্টার্ড বুক পোষ্ট করে পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়েছে। অনেকে পেন ফ্রেণ্ড করে। অনেকের কাছে এটা হবি। জীবনে কখনো করিনি। কিন্তু এই লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের সঙ্গে যে চিঠি লেখা শুরু হ'ল, তার ফলে দুজনে দুজনকে না দেখলেও খুব পরিচিত হয়ে গেলাম। যদিও সে আমার থেকে আট বছরের ছোট কিন্তু সেই চিঠির পরই জীবনে দুজনে দুজনকে দেখলাম কিছুদিন পর। আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার ছোট ভাইয়ের মত সম্বন্ধ।

বাবা আরো দুটি দিন আছেন, তারপরই কোলকাতা যাবেন। পরের দিন আলি আহমেদের চিঠি এল। 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজে' বাবার প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে এগারই জানুয়ারী। কোলকাতায় বাবা যখনই যান, সাতনা থেকে ক্যালকাটা মেলে যান। সাতনা পর্যন্ত ফকিরচন্দ্র চোপড়ার গাড়ীতে যান। বাবা দুপুর ট্রেনে কাটনি যাবেন। কাটনি থেকে ক্যালকাটা মেল ধরবেন। বাবার মনে যখন যেটা হবে তাই করবেন। এই কাটনি হয়ে গেলে বৃথাই পাঁচঘণ্টা বাবাকে আগে যাত্রা করতে হবে।

আজ শুক্রবার। সারাটা দিন এবং রাত্রি পর্যন্ত ভাতখণ্ডের পুস্তিকা দেখতে দেখতে কখন যে সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। যদিও মৈহারে আসবার আগে সঙ্গীতের থিওরি বই পড়েছি, কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর বই পড়ে বুঝলাম, এই বই দেখেই স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে থিওরি লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সঙ্গীতের একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি এই পুস্তকমালিকা।

বাবা প্রায় একমাসের জন্য যাচ্ছেন মনে হয়। বাবা না থাকলে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হই। শিক্ষাও হয় না, নিজের রিয়াজও হয় না। বাড়ীর পরিবেশটাই বদলে যায়। মনটা কি জানি কেন ভালো লাগে না। বাবা যাবেন একদিন পর, কিন্তু সব বন্দোবস্ত করে রাখলেন আজকেই। বাবার সিদ্ধান্ত, 'আগে কর শেষের আয়োজন।'

আজ সকালে বাড়ীর কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হল। দেরী হয়ে গেল। ছেলেদের পড়ানোর পর বাবা শেখাবার জন্য ডাকলেন। বাবাকে বললাম, 'যা শিখেছি সেগুলো বাজাব, সুতারং আজ আর শিখবো না।' রাত্রেও বাবা শিখবার জন্য ডাকলেন। বললেন 'শিখবে না কি?' তার মানেই মেজাজ নেই। সুতরাং না করে দিলাম। বাবা নিজেই বাজাতে লাগলেন হেমন্ত বেহাগ।' বাবার কথা শুনে বললাম, 'কি ভাবে টাটবাবা যাবার পর রাগটির নামকরণ করেছিলেন 'হেমবেহাগ'। বাবা আমার কথা শুনে খুসী হলেন। বললেন, 'তোমার তো ঠিক মনে আছে। আসলে আজকাল বুড়ো হয়ে গিয়েছি, ভুল হয়ে যায়।'

সকাল বারটার ট্রেনে কাটনি যাবেন। কাটনিতে গিয়ে ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করবেন। সাড়ে তিনটার সময়, ক্যালকাটা মেল ধরবেন। বাবার সঙ্গে কাটনি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা একাই যাবেন। বাবা বললেন, 'এই পৃথিবীতে একলাই এসেছি, একলাই যাবো। আসবার সময় কেউ সঙ্গে আসেনি এবং যাবার সময়ও কেউ সঙ্গে যাবে না। সুতরাং পরনির্ভর না হওয়াই ভালো, যতটা পারা যায়। যেটা পারিনা তার জন্য অন্যের সাহায্য নিতে হয়। এই যে আমায় স্টেশনে পৌঁছে দাও, নিয়ে আস, এই তো অনেক।' বুঝলাম বাবা নিয়ে

যাবেন না। বাবাকে বললাম, 'ঠিক আছে আপনি গাড়িতে বসে গেছেন জানলে নিশ্চিন্ত হবো। মৈহারের উপর দিয়েই গাড়ী যাবে তখন কামরা থেকে রুমাল নেড়ে দেখাবেন।' বাবা বললেন, ঠিক আছে আমি রুমাল নাড়ব।'

বাবাকে দেখেই স্টেশন মাষ্টার ওয়েটিং রুম খুলে দিলেন। ধীরে ধীরে ওয়েটিং রুম ভরে গেল লোকে। অনেকে বেহালার বাক্সটা দেখিয়ে বলল, এটা কি জিনিস বাবা?' বাবা খুলে দেখালেন বাজনাটা। অনেকেই আগ্রহ করল বাবা যদি একটু বাজান। আমি আশ্বস্ত অনুভব করলাম। বাবা অম্লান বদনে জিলা কাফির একটু ছেড় বাজিয়ে রামধুন, রঘুপতি রাঘব রাজারাম গানটি বাজাতে লাগলেন। লোকেরা গানটি বুঝতে পেরে খুব আনন্দিত হল। বাবা কিছুক্ষণ বাজিয়ে বন্ধ করলেন, বললেন, 'বাইরে রামলীলা হচ্ছে সেইজন্য রামধুন বাজালাম।' এ এক ভিন্ন বাবা। ছোট ছেলের মত হেসে কথাটি বললেন। বাবা এই রামধুনটা অন্য রকমভাবে বাজান। এর রেকর্ডও শুনেছি। বাবার কাছে শিখেওছি। কিন্তু বাবা প্রচলিত রামধুনটা বাজাবার সময় গেয়ে গেয়ে বাজালেন। এ যাবৎ কখনো বাবাকে স্টেশনে বাজাতে দেখিনি। লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে, কত সময় চলে গিয়েছে জানি না। চমক ভাঙল ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। কাটনি যাবার প্যাসেঞ্জার আসছে। গাড়ী এল, বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম ষ্টেশনে থাকব। গাড়ী ছেড়ে দিল। ষ্টেশনে চায়ের ভেণ্ডারের মালিকের ছেলে জলির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ফুটবল খেলেন। মুস্তফির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় কেটে গেল। ক্যালকাটা মেল আসছে। মৈহারে সে সময় একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল। মৈহারের উপর দিয়ে গাড়ী যাবার সময় গাড়ীর গতি একটু কমে যেত। মেল দাঁড়াত না। গাড়ী এসে গেল, বাবাকে দেখলাম রুমাল নিয়ে হাত নাড়ছেন। ক্ষণিকের জন্য বাবাকে দেখলাম, বাবাও আমাকে দেখলেন। যাক নিশ্চিন্ত হলাম। মৈহারে থাকাকালীন একবারই এই রকম হয়েছিল। পরে কখনো হয়নি। না হওয়ার কারণ, কোলকাতায় যাবার সময়, এর পর বরাবর চোপড়ার গাড়ীতে করে সাতনায় বাবাকে চড়িয়ে, ঐ গাড়ীতেই মৈহার ফিরে এসেছি।

বাড়ীতে এসেই শুনতে পেলাম থারমোমিটার ভেঙ্গে গিয়েছে। বাবার থাকাকালীন যদি থারমোমিটার ভাঙ্গত তাহলে বিপদ হো'ত। বাবার কুসংস্কার নানারকম ছিল আগেই বলেছি। থারমোমিটার ভেঙ্গে গেলে, বাবার ধারণা ছিল বড় বিপদ আসছে। বাবা যাবার পর জিনিস কিনবার ফরমাইসটাও বেড়ে যায়। বেশী খরচা হয়ে গেলে, আমি কি করে সামলাব? বাবা হিসাব দেখেন না, কিন্তু মনে ভাবতে কতক্ষণ? এত খরচা কি করে হ'ল, এই কয়েকটা দিনের মধ্যে? বাড়ীতে ঢুকেই একটা সমস্যা বাড়ল।

বাবা যাবার সময় বলে গেছেন মাঝে মাঝে ব্যাণ্ডে গিয়ে দেখতে সকলে আসে কি না? বাবা না থাকলেই সকলে ফাঁকি দেবে। সুতরাং কেউ না এলে, বাবাকে যেন বলি। বাবার নির্দেশ পালন করতাম। মানে, রথদেখা কলা বেচার মত। বয়সে ব্যাণ্ডের সকলেই বড় হলেও আমাকে খাতির করত। আমি ব্যাণ্ডও শুনতাম। গল্পও হ'তো। বাবার বিষয়ে নানান কাহিনী শুনতাম। দীর্ঘদিন এরা বাবার সংস্পর্শে আছে। বাবা এসেই জিজ্ঞাসা করবেন, 'গিয়েছিলাম কিনা।' সুতরাং আমি যদি না যাই, তারা বলবে আমি যাইনি, যার ফলে আমি মিথ্যাবাদী

প্রতিপন্ন হব, সুতরাং আমাকে যেতে হ'তো। এ কথাও ঠিক, বাবার অবর্তমানে অনেকেই কামাই করত। যারা কামাই করত, বাড়ীতে এসে আমাকে বলত বাবাকে যেন না বলি।

বাবার যাবার পরের দিন ব্যাণ্ডে গিয়ে দেখি সকলেই চলে গিয়েছে। পাঁচটা অবধি থাকার নিয়ম, আমি সাড়ে চারটের সময় গিয়ে দেখি বাইরে তালা ঝুলছে। মনে মনে ভাবি, ব্যাণ্ডের ছেলেরা কিছুদিন স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করবে। বাবা যেদিন আসবেন, তার আগের দিন খবর দিয়ে আসতাম। এর ফলে, মৈহারে বাবা এসেই বিকেলে যেদিন ব্যাণ্ডে যেতেন, সকলকেই উপস্থিত দেখতেন। ব্যাণ্ডের ছেলেদের সঙ্গে এই অলিখিত চুক্তি ছিল। বাবা যাবার আগে বলে গিয়েছেন, 'ব্যাণ্ডের সুরদাস যেন রোজ তোমার সঙ্গে বাজায়।' সুরদাসের বাড়ী গিয়ে দেখলাম জ্বর হয়েছে। জহর বলে একটা ছেলে মৈহারে সুরদাসের কাছে তবলা শিখত। জহরের খুব ইচ্ছে তাকে তবলায় নিয়ে বসি। জহরকে বললাম তবলা নিয়ে আসতে। জহর মনে মনে খুব খুশী। বাবাও গেলেন আর পরের দিন অমরেশের জ্বর হয়েছে শুনলাম। সুতরাং সকালের বাজনা বাজান মাথায় উঠল। এমনিতে বাজার এবং পোষ্ট অফিস যেতেই হ'ত। সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা রিয়াজ করে যাওয়া যেত। কিন্তু সকালের বাজনাও হবে না, এ ছাড়া একবারের বদলে দুবার যাওয়া আসা করতে হবে। কি আর করব? অগত্যা সকালেই থারমোমিটার কিনতে গেলাম। ওষুধ এনে দিলাম। ভাগ্য ভাল একদিনেই জ্বর ঠিক হয়ে গেল।

বাবা বাইরে সবে দুদিন গেছেন। এর মধ্যে জুবেদা খাতুনের এরকম ফরমাইস হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। সকালেই বললেন, 'মার 'হম সফর' সিনেমাটা দেখবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু সিনেমায় মাকে দেখে যদি কেউ বাবাকে বলে দেয়, তাহলে তো বিপদ, সুতরাং সেকেণ্ড শোতে গেলে কোন ভয় নেই। বহুদিন আমিও সিনেমায় যাইনি সুতরাং মায়ের সঙ্গে আমিও যাব।' কথাটা শুনে চমকালাম। এটা বুঝেছেন যে বাবার কানে গেলে বিপদ, কিন্তু আমি তো দেখেছি আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। বিপদ তো আমার হবে, বাবাতো আমাকেই ধোলাই দেবেন। আমি কোন সাহসে মা এবং তার বৌমাকে সিনেমায় যেতে বলেছি। বাড়ীতে মা এবং পুত্রবধূকে হয়ত বকবেন, কিন্তু আমায়? আমাকেও পত্রপাঠ বিদায় করবেন। আমাকে একটি কথাই বলবেন, 'তোমার উপর ভরসা করে বাড়ী থেকে যাই, আর তুমি কোন সাহসে এদের সিনেমায় যেতে দিয়েছ? জাননা এখানকার লোকেরা খারাপ। প্রথম দিনেই তোমায় বলেছিলাম, মৈহারে কারো বাড়ী যাবে না। তবে কোন সাহসে সিনেমায় পাঠিয়েছ।' এই কথাগুলো বলেই, নিকালো, নিকালো, নিকালো, বলবেন। দিব্য চোখে এই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই বিপদ ভেবেও হাসি পেল। বললাম, ' 'হম সফর' সিনেমা এসেছে মা কি করে জানলেন? আসলে নিজের দেখার ইচ্ছে। নিজের ইচ্ছার কথাটা মার নাম করে কেন বলছেন? সত্য কথা বলতে এত ভয় পান কেন?' মার পুত্রবধূকে এ ভাবে বলাটাও ঠিক হয়নি। দীর্ঘদিন আলি আকবরের কাছে থেকেছেন। যোধপুর এবং বম্বেতেও নিশ্চয়ই সিনেমা দেখতেন। এখানে এসে বন্দী হয়ে আছেন। সব থেকেও কিছু নেই। সাধারণতঃ সব মেয়েই চায় জীবনটা আনন্দে কাটাতে। কিন্তু মা এবং অন্নপূর্ণা দেবীর মত কৃচ্ছসাধন আমার জীবনে দেখিনি। মা চিরটা কালই একভাবে কাটিয়ে দিলেন। মা

সারাটা দিন মুখ বুজে নিজের কাজ করে যান। রোজ বাজনাও বাজান। মার সমসাময়িক অন্য মায়েদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই সব মায়েরাও কখনও তীর্থ করতে বা নিজের সম বয়সীদের সঙ্গে একটু গল্প করেও সময় কাটান। কিন্তু এখানে মা যেভাবে দিন কাটাচ্ছেন, তা আমার চোখে পড়েনি। মার মনে দুঃখ থাকলেও কোন অভিযোগ নেই। বাবাকে সেবা করেই সুখ পান। অন্নপূর্ণা দেবীও তো এতদিন ছিলেন। তার মুখে তো কখনো সিনেমা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ পায়নি। তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। বৃথা গল্প করে সময় কাটানো, পরনিন্দা, পরচর্চা, বিলাসিতা এসব কখনো দেখিনি। সঙ্গীতে এত অসাধারণ বলেই বোধ হয় সাধারণ ভাবে থাকেন। এ এক বিরল চরিত্র। কিন্তু মার পুত্রবধূ তো আর সব মেয়েদের মতই। সে কি নিয়ে থাকবে? তার জীবনটাও কষ্টের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং বিপদ জেনেও বুদ্ধাকে দিয়ে মা এবং তার পুত্রবধূকে সিনেমায় পাঠিয়ে দিলাম। বাড়ীতে বসে রাত্রি অবধি রিয়াজ করলাম। বাড়ী থেকে সিনেমা তিন মিনিটের রাস্তা। সিনেমার কথা রাত্রে বাড়ী থেকে শোনা যায়। বুদ্ধাকে সিনেমা শেষ হবার আগেই পাঠালাম।

বাবা আমাকে ছোট, কিন্তু মোটা রুল দিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের মারবার জন্য। পড়ানো জিনিস যদি ভুলে যায় তাহলে যেন ওই মোটা রুলটি দিয়ে মারি। সেই রুলটি আমার জানালায় রেখে দিয়েছিলাম। ছেলেদের প্রহার করা মনোবিজ্ঞানে মানা। ধমক দেওয়া চলতে পারে, চোখের তাকানোতেও ছেলে ভয় পায়। যাদের মার খাওয়াটা নিয়মিতই হয়, তারা ঐ মার খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যদি মারার দরকারই হয়, তাহলে অন্য ছেলেকে মারা যেতে পারে, কিন্তু বাবার নাতিদের মারব? নাতি নাতনিকে মারবার পর বাবাকে একান্তে কাঁদতে দেখেছি। সেই ক্ষেত্রে মারবার দরকার হলেও, মারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লাঠি দিয়ে আশিসকে মেরে রাত্রে কাঁদতে দেখেছি বাবাকে। ওই লাঠির মার আশিসের উপর পড়েছে বটে, যা আশিসের রেখাপাত করেনি। ঐ লাঠিগুলো বাবার উপরই পড়েছে। আমি পড়াবার সময় বকেছি বটে, তবে কখনো মারিনি। বাবা রাগ করবেন বলে মারিনি তা নয়, মারাটা নীতিগত ভাবে বিশ্বাস করি না, আর তা ছাড়া শিক্ষণ পদ্ধতিতে বারণ। এই গৌরচন্দ্রিকাটি করবার একটি কারণ আছে। এখন সেই কারণটি বলি। লেখাপড়ায় বাবার নাতি নাতনিদের মধ্যে বেবী এবং শুভর মাথা ভাল ছিল। আশিস এবং প্রাণেশ মধ্যম শ্রেণীর ছিল। অমরেশ খুবই ছোট, সুতরাং কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে ওই ছোট বয়সে অক্ষর পরিচয় করাতে দেরী হয়নি। ধ্যানেশ ছিল ব্যতিক্রম। যা পড়াই সব ভুলে যায়। ছোটবেলায় ছিল জড়তা, অর্ধেক কথা বোঝা যেত না। রাগের চোটে বাবার কাছে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম সে কথা আগেই লিখেছি। পড়াবার সময় ভুলে যেতাম বাবা আছেন। কখনো জোরেই বকতাম। বাবা কিন্তু সব লক্ষ্য রাখতেন। মারা প্রয়োজন বলে বাবা মোটা রুলটি দিয়েছিলেন। বাবা যাবার, পাঁচদিনের দিন পড়াতে বসে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ধ্যানেশকে পড়াতে গিয়ে। চিৎকার করে বললাম, আজ তোকে ওই রুল দিয়ে মারব। একথা বলেই রুল আনতে পাশের ঘরে গেলাম। এসে দেখি ধ্যানেশ ভয়ে পালিয়েছে। ধ্যানেশের পালান দেখে আমার

রাগ চলে গিয়ে হাসবার পালা। কিন্তু রাগ দেখিয়ে তাকে সব ঘরে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে কোথাও যখন পেলাম না তখন ভয় হল মনে, কোথায় গেল? বাড়ীর পুরো কম্পাউণ্ড ঘুরে যখন পেলাম না, মনের মধ্যে সংশয় হোল ভয়ের চোটে বাড়ীর বাইরে তো যায়নি। চাকর বুদ্ধাও আমার সঙ্গে খুঁজছে। একথা মনে হতেই বাড়ীর ছাতের উপর উঠলাম। বাড়ীর যে দিকটা নূতন হয়েছে, তার ছাতের উপর উঠলে মৈহারের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সেই ছাতের উপরে উঠে দেখি, খোলামাঠের উপর দিয়ে ধ্যানেশ দৌড়াচ্ছে। মাঠের পাশে একটা বড় পুকুর আছে। আমার অবস্থা শোচনীয়। বুদ্ধা এবং বহরাকে ডেকে বললাম, দৌড়ে গিয়ে ধ্যানেশকে ধরতে। যদি দৌড়তে দৌড়তে পুকুরে গিয়ে পড়ে যায়, আমি কি করে মুখ দেখাব সকলকে? আমিও চাকরদের সঙ্গে দৌড়তে লাগলাম। 'ধ্যানেশ, ধ্যানেশ' বলে চিৎকার করে দৌড়চ্ছি। এদিকে ধ্যানেশও দৌড়চ্ছে। প্রথমে বুদ্ধা, তার পেছন চাকর বহরা এবং সর্বশেষে আমি। শেষ পর্যন্ত আমিই দৌড় গিয়ে ধরে, কিছুক্ষণ দম নিলাম। রাগের চোটে মাথার চুল এবং হাত ধরে বাড়ি এসে তার মায়ের সামনে গিয়ে বললাম, 'এবার আপনি আপনার ছেলেকে সামলান। এরকম মূর্খ ছেলেকে আর পড়াব না। নদীতে পড়ে গেলে আমার অবস্থা কি হতো?' ধ্যানেশের মায়ের কাছে একটা ছোট পিঁড়ি ছিল বসবার জন্য হঠাৎ সেই পিঁড়িটা দিয়ে ধ্যানেশকে মারলেন এমন জোরে, যার ফলে পিঁড়িটার একটা পায়া ভেঙ্গে গেল। এই রকম মার মারবেন আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বার বার, ধ্যানেশের মা ধ্যানেশকে বললেন, 'ক্ষমা চা তোর কাকার কাছে।' আমি কোন কথা না বলে ঘরে চলে এলাম।

আজ বছরের শেষ। মৈহারে, আমার আসার তিন বছর দুই মাসের উপর শেষ হয়ে গেল। কোথায় ভেবেছিলাম ছয় মাসের মধ্যে উস্তাদ হয়ে চলে যাব, কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কতদিন লাগবে। এখন মনে হচ্ছে বহু কিছু শিখবার আছে। আমার ধারণা ছিল, সাঁতার যখন জানি পুকুর পার হতে কত দেরী লাগবে? কিন্তু এখন তো সামনে সমুদ্র দেখছি। সমুদ্র কি পার হওয়া যায়? হতাশ হয়ে পড়ি। আবার মনে হয়, যদি বারো চৌদ্দ ঘণ্টা বাজাতে পারি, তাহলে হয়ত কিছুটা নিশ্চয়ই হবে।

৩৭

পিতৃভূমি 'জুডিয়া থেকে নির্বাসিত ইহুদীরা যখন মিশর থেকে আবার ফিরে আসছেন আপন দেশে, ক্যাননের সমুদ্র উপকূলে তারা সমবেত। সহসা দেববানী ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশে 'পুট অফদাই স্যু ফ্রম দাই ফুট ফরদি প্লেস হোয়ার অন্ দাউ ষ্টানডেষ্ট ইস হোলী।'

সেই বাণীর অনুসরণে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই '...দি প্লেস হোয়ার অন দাউ ষ্টানডেষ্ট ইজ হোলী।' আজ আমরা এসেছি সেই পুন্যভূমিতে।'

পয়লা জানুয়ারী। সকালে শুনি আমার পরিচিত স্বর। বাবা গেছেন কোলকাতায় তাই একটু বেলা করেই উঠেছি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। বাইরে গিয়ে দেখি বাগানের মাটিতে হাত বোলাচ্ছেন এক ভদ্রলোক। তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত যুবক। আর তারপাশে বুদ্ধা দাঁড়িয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। বুঝলাম আমাকে ডাকার সুযোগ না পাওয়ার

আতান্তরে পড়েছে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, মাটিকে আদর করছেন যিনি তিনি আর কেউ নন, আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক বঙ্কিম ভট্টাচার্য। আমাকে কোন সম্ভাষণের সুযোগ না দিয়ে সাথের যুবকদের বললেন, 'এ মাটিকে প্রণাম কর।' সকলেই করল।

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আবার এলাম। মাইহারের মা আর তোমার বাবা বোধ হয় চুম্বক। আমার মত জং পড়া লোহাকেও টানেন।' প্রণাম করলাম। আবার চমক। একি! পায়ের চটি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে, আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলেন গেটের বাইরে। সাথের সকলে সেখানে ছেড়ে এসেছে।

পরিচয় করিয়ে বললেন, 'এরা সবাই আমার ছাত্র। ভেবেছিলাম এদের জীবন ধন্য করিয়ে নিয়ে যাব তোমার উস্তাদজীর দর্শন করিয়ে। কিন্তু এর কাছে শুনলাম তিনি প্রবাসে। জান আমাদের সংস্কৃতে আছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা, এই নাকি দুই তত্ত্ব। তোমার উস্তাদজী নিজে এক অপূর্ব সৃষ্টি, এক অশ্রুতপূর্ব স্রষ্টা, তাই ভাবলাম, সাহিত্য অধ্যয়ন অপূর্ণই থেকে যাবে, এদের যদি না এই বিরল মণিকাঞ্চন যোগ দেখাই।' বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু বা বক্তা, এর আগে মাত্র তিন রকমের দেখেছি। আত্মীয়, আশ্রিত ছাত্ররা আর তৃতীয় সঙ্গীত রসিকরা। কিন্তু বঙ্কিমবাবু এই তিনটে পরিভাষার কোনটার মধ্যেই পড়েন না। তিনি ভিন্ন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিয়ে বাবাকে দেখেন, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ সময় না দিয়ে, তার উদাত্ত কণ্ঠ ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করে বললেন, 'এই সেই বাড়ী, যাকে তোমরা বশিষ্ঠের আশ্রমের মত শ্রদ্ধা করতে পার। এই সেই মাটি যাকে তপোভূমি বলতে পার। এখানেই ভারতের সঙ্গীত রেণেসাঁর জ্বালামুখী বিস্ফারিত হয়েছে। বিস্ফোরণের মাধ্যমে শত ধারায় নেমে এসেছে অসংখ্য লাভাপুঞ্জ, অনন্ত রত্ন প্রভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর বীজ এখানেই এসে মহীরুহ হয়েছে। অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছে। সেই দিগন্ত বিস্তারী মহীরুহের নাম উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।'

'এই ভবন থেকে নিঃসৃত হয়েছে নবযুগের ভাবধারা, সঞ্জীবিত হয়েছে বহু শতাব্দীর উদার চিত্ত। দিকে দিকে বিস্তৃত করেছে তার সঙ্গীত প্রবাহকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে। বাংলাদেশে কি ভারতবর্ষে, কোন একটি ভবনে এত বড় ঐতিহ্য আছে কিনা জানি না। যেমন এ বাড়ীতে এসেছেন ভারতের মনীষীরা, তেমনি এ বাড়ী দিয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতের এক বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। এই বাড়ীর আঙ্গিনায় অন্নপূর্ণা দেবী এবং আলি আকবরের মত যুগান্তকারী প্রতিভা লালিত পালিত। এই বাড়ী থেকেই প্রভাত সন্ধ্যা সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়েছে কড়ি ও কোমলে। এ বাড়ী থেকে খাঁ সাহেব ভাসিয়েছেন তাঁর সোনার তরী। কান পেতে শোন। নিশ্চয়ই শুনতে পাবে কখনও বিহঙ্গমধুর, কখনো মৃদঙ্গঘাত গম্ভীর, কখনো চন্দ্রকিরণস্নাত সুরমঞ্জরী ধ্বনিত হচ্ছে। 'ধন্য এই গৃহপ্রাঙ্গন। এর ধুলোতে আজ আমরা রেখে যাই প্রণতি, সমস্ত পদধূলির সঙ্গে মিশিয়ে।'

তিনি বেশী কিছু উপকার করতে সুযোগ দিলেন না এবং মানসিকতাও ছিলো না। গাছের কয়েকটা ফল দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। ওঁরা চলে গেলেন। কানে শুধু ওঁর কথাগুলি ভাসছিল। মনে হল সার্থক জনম আমার। আজ পর্যন্ত দেখে এসেছি সকলেই বাবার কাছে

আসে কিছু নিতে। কিন্তু বাবাকে কিছু দেবার জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে দেখলাম না। নিতে জানে অনেক লোক, কিন্তু দিতে জানে ক'জন? বাবা সঙ্গীত শিক্ষার জন্য, প্রথম জীবনে সকলের কাছে গিয়ে কেবল নিয়েছেন, কিন্তু তারপর কেবল দিয়েই গেছেন। মৈহারে আসা অবধি দেখলাম, বাবার কাছে সকলেই কিছু নেবার বাসনা নিয়ে আসে, কিন্তু কিছু দেবার জন্য কাউকে আসতে দেখলাম না। ইংরেজি নূতন বছরের প্রথমদিনে দেখলাম, একজন মানুষের মত মানুষ। যার সঙ্গীতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, সেই কাশীর পণ্ডিত, ছাত্রদের নিয়ে এসেছেন বাবাকে দিতে! কি দিতে? নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা। এ জিনিস আজকের দিনে অচল। তাই মাষ্টারমশাই চলে যাওয়ার পর, একটা কথাই বারবার মনে হতে লাগল, আমরা নিতে জানি, কিন্তু দিতে জানি না। দেবার কিছু হলেই আসবে স্বার্থ। শ্রদ্ধা হোল মাষ্টারমশাইয়ের কথায়। মনে হোল গুণীই গুণীকে চেনে।

পোষ্টঅফিসে গিয়ে তিনটে চিঠি পেলাম। আশিস এবং শুভ গ্রিটিংস কার্ড পাঠিয়েছে। হাথরস থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে জানিয়েছে ভাতখণ্ডের পুস্তকমালিকা আরও তিনটে খণ্ড ছাপছে। ছাপা হলেই পাঠাবে। সকলকে চিঠির উত্তর দিলাম।

গতকাল, আজ আর আগামী কালের কথা ভেবে মনে হোল, বাতি জ্বলে আর নেভে। সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়। মানুষ হাসে আর কাঁদে। এই করতে করতে একদিন গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু আমি গন্তব্যে কবে পৌঁছব? মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে।

গুলগুলজীর কাছে শুনলাম, এক মহাত্মা এসে উঠেছেন উত্তমচাঁদের বাড়ী। এই উত্তমচাঁদের বাড়ী গুলগুলজীর যাওয়া আসা ছিল। গুলগুলজীর কথায় মহাত্মার দর্শন করতে গেলাম। মহাত্মা বাঙ্গালী। চোপড়া সস্ত্রীক মহাত্মার প্রবচন শুনছেন। মৈহারের পরিচিত বহু প্রতিষ্ঠিত লোককেই দেখলাম। সকলকেই দেখলাম ভাবে বিভোর হয়ে উপদেশ শুনছেন। গুলগুলজী আমার কথা মহাত্মাকে বলেছিলেন। বয়স বেশী নয় মহাত্মার। খুব বেশী হলে চল্লিশ হবে। গুলগুলজীর সঙ্গে আমাকে দেখেই সামনের সারিতে গিয়ে বসতে বললেন। গিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বললেন 'আলাউদ্দিনকে আমি চিনি। তোমার কথা শুনেছি।' নিজের বুকটা দেখিয়ে বললেন, 'বাজনা শোনাও একদিন।'

কলেজে পড়বার সময় থেকে আমি শিখেছি, 'গুরু করো জানকে, পানি পিও ছানকে'। গুরু কিংবা মহাত্মা দেখেই প্রথম দৃষ্টিতে যাচাই করবার একটা প্রবৃত্তি জাগে। মহাত্মা অনেক দেখেছি। মৈহারে এসে অলৌকিক টাট বাবাকে দেখেছি। কিন্তু আমার জীবনে কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এই মহাত্মা বাবার নাম নিয়ে সম্বোধন করা মাত্র মনে হ'ল, 'দুদিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন।' মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মহাত্মা সকলের সামনে, বাবার নাম ধরে বলায় মনটা কেবল বিষণ্ণই হল না, রাগও হ'ল। বাবা মৈহারে সকলের পূজ্য। প্রত্যেককে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতে দেখেছি। কিন্তু এই প্রথম ব্যতিক্রম। বললাম, 'শিক্ষাকালীন কোথাও বাজাবার নিষেধ আছে। বাবা যেদিন অনুমতি দেবেন সেইদিন বাজাব।' মহাত্মার বোধ হয় কথাটা মনঃপূত হোল না। ভক্তদের সামনে বোধ হয় অহং ভাবটায় আঘাত লাগল। বললেন, 'নিষেধ আছে এটা ভালো, কিন্তু আমার জন্যও নিষেধ আছে?' এ কথা শুনে বললাম, 'আপনার শুনবার

যদি ইচ্ছে হয়, একলা আমার বাড়ীতে আসবেন, নিশ্চয়ই শোনাব।' এই কথার পর কাজ আছে বলে বাড়ী চলে এলাম। গুলগুলজীর এবং চোপড়া সাহেবের স্ত্রী আমাকে এসে বললেন, 'বাজনা না বাজালেও মহাত্মার উপদেশ তো শুনতে আসতে পারেন।' এ দু'জনকেই গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বাজনা ছেড়ে কোন উপদেশ শুনে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

এক সপ্তাহ পরে আলি আকবরের রেজিষ্টার্ড চিঠি পেলাম। আলি আকবর লিখেছে, 'যেহেতু টাকা পাঠাতে বলেছিলে সেইজন্য চারশত টাকা পাঠালাম।' চিঠির ভাষা বক্র মনে হোল। আমি যেহেতু বলেছি সেইজন্য টাকা পাঠিয়েছে। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা রয়েছে, তাদের প্রতি যেন কোন কর্ত্তব্য নেই। টাকা যথাস্থানে দিয়ে বললাম, 'প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে।' এ কথার সোজা উত্তর পেলাম, 'চিঠি দেবার দরকার নেই।' অবাক হ'লাম। বাধ্য হয়ে আলি আকবরকে চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'বাবা এখন কোলকাতায় আছেন। বাবাকে বলবেন টাকা পাঠিয়েছেন। বাবা এ কথা শুনে খুশী হবেন। বাবা মৈহারে এলে মেজাজ প্রসন্ন থাকবে।'

অসময়ে এই প্রচণ্ড শীতে বৃষ্টি এলো। চোপড়ার স্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠালেন গাড়ী দিয়ে। গাড়ী করে বাড়ী গিয়ে দেখি বাঙ্গালী মহাত্মা বসে আছেন। স্বর্ণলতা চোপড়া বাবার ধর্মকন্যা। যাবার সঙ্গে সঙ্গে চা জলখাবার দিলেন। আমাকে ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শুনলাম মহাত্মা আজ আমার বাড়ীতে বাজনা শুনতে যাবেন। বৃষ্টি হওয়ার ফলে বাজনার চামড়া বসে গেছে বলে এককথায় নাকচ করে দিলাম। কিছুক্ষণ কথা বলে বাড়ী চলে এলাম। বাবা আজ কুড়ি দিন হয়ে গেল কোলকাতায় গেছেন, এ যাবৎ কোন চিঠি দেন নি। বাবা তো এরকম কখনো করেন না। বাবার শরীরের কথা ভেবে চিন্তা হ'ল। পরের দিন ঘুম ভেঙ্গে গেল সেতারের আওয়াজে। বাবার ঘরে কে সেতার বাজাচ্ছে। গিয়ে দেখি মা একমনে সেতার বাজাচ্ছেন। ঘড়িতে দেখলাম পাঁচটা বেজেছে। মা আমাকে দেকে হেসে বললেন, 'তোমার বাবার ঘরে আজ কতদিন হ'ল বাজনা বাজছে না, সেই জন্য তোমার বাবার ঘরে বাজাচ্ছি।' মার কথা শুনে অবাক হ'লাম। সত্যই মা হলেন মা। মায়ের তুলনা হয় না। আজ এগারই জানুয়ারী। মৈহারের ব্যাণ্ডের জন্য, চিফ সেক্রেটারিকে লেখা হয়েছিল কয়েকটি নতুন যন্ত্র কিনতে হবে। সকালে সাতনা থেকে লোক এসে ডি.এম.-এর একটি পত্র দিলো। চিঠিতে জানিয়েছেন, ব্যাণ্ডের বাজনার জন্য আঠারশ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। পত্রবাহকের হাতেই চিঠি দিলাম। চিঠিতে জানলাম, অবিলম্বে টাকা পাঠিয়ে দিতে, কোলকাতায় বাবাকে পাঠিয়ে দেব। সন্ধ্যার সময় ডিসির একজন প্রতিনিধি টাকা নিয়ে এল। ডিসির প্রতিনিধির কাছে বললাম 'টাকা আগামীকাল কলকাতায় বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। বাবা এলে সব রসিদ পাঠিয়ে দেব।'

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের কনফারেন্সে আজ ত্রয়ী যন্ত্র সঙ্গীত হবার কথা। রেডিও খুললাম, যদি বাজনা রিলে করে শোনায়, কিন্তু হ'ল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরের দিন বাজনা বাজাচ্ছি, এমন সময় চোপড়ার স্ত্রী বাড়িতে এলেন। বললেন, 'মহাত্মা রোজ ভাল উপদেশ দেন, রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলেন ও ব্যাখ্যা করেন। আপনি তো লেখাপড়া করেছেন। আপনার ভাল লাগবে।'

চোপড়ার স্ত্রী স্বর্ণলতা চোপড়া দীর্ঘদিন বাবার সঙ্গে পরিচিত। সে সময় অন্নপূর্ণাদেবী

সেতার শুরু করেছেন সেই সময় থেকে এই বাড়ীতে যাতায়াত। ধনী, নিরহঙ্কারি আভিজাত্যপূর্ণ মহিলাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কোন চিঠি টাইপ করাবার হলে চোপড়া সাহেবের অফিসে যাই। গাড়ীর দরকার হলে গাড়ী দেন। আমাকে স্নেহ করেন এবং আমিও শ্রদ্ধা করি। আমাকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে মনে করেন। আজ মহাত্মার উপদেশ শুনতে যাবার জন্য যখন বললেন, তখন সত্য কথাই বললাম। এতদিন কোন কথা বলতে পারিনি তার একটা কারণ ছিলো। একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ভক্তকে, যদি তার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তা শুনতে নিশ্চয় ভাল লাগবে না। বাবার নাম ধরে মহাত্মা সম্বোধন করেছিলেন বলে যেমন আমার ভাল লাগেনি, সেই রকম এই মহাত্মাকে যাঁরা মনের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললে মিসেস চোপড়ার হয়ত ভাল লাগবে না। মনে হ'ল, আজ বাজনা বাজাচ্ছি দেখে হয়ত বলে বসবেন, সরোদের চামড়া ঠিক হয়ে গেছে সুতরাং মহাত্মাজী আসবেন। কিন্তু কি করব আমি? মন একবার কারো প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে আর শ্রদ্ধা করতে পারিনা। আজ স্পষ্ট এবং সব সত্য কথাই বলে দিলাম। আমার এই কথার যুক্তি আছে বলে স্বর্ণলতা চোপড়া আর আমাকে অনুরোধ করেন নি। মিসেস চোপড়া বাবাকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বাবার নাম ধরে সম্বোধন তিনি শুনতে পাননি। এই ঘটনার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরেও স্বর্ণলতা চোপড়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে সময়েও একই আতিথ্য পেয়েছি। বাবার পরিবারবর্গের একজন বলে মনে হয়েছে।

কোলকাতা থেকে আজ বাবার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কলিকাতা হতে
১২-১-৫৪

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্রে সব জানিলেম আগরতলা, কুমিল্লা, ঢাকা এই তিন জাগাতে আথিত্ব করেই দিনগুলি কর্ত্তন হয়ে যায় কলিকাতা আসার দুরূন, এজন্য জন্ম ভিটায় যাইতে পারি নাই। এখানে আর ৮ দিন থেকে ১৯ তারিখ এলাহাবাদ যাত্রা করিব সেখান থেকে মাইহার আসিব। তারপর যা হয় করিব শরির বিশেষ ভাল নয় দুর্ব্বল হয়ে পরেছি চিন্তার কিছু নেই। শ্রীমান বাবা দক্ষিনারঞ্জন আমার সেবা করিতেছে এর মা ও ভগ্নী সকলে যত্ন সেবা করিতেছে, ৮-৯ দিন এখানে থেকে সুস্ত হয়ে তুমাদের কাছে আসিব। একপ্রকার সকলের কুশল কামনা করি।

তুমার সব কাগজ দস্তখৎ করে দিয়েছি, আমার বাবা যথা সময় তুমার কাছে পাঠাবে।

ইতি—
বাবা

বাবা আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজে বাজাবার পরের দিনই চিঠি লিখেছেন বুঝলাম। চিঠিটা তিনদিনের মধ্যেই এসেছে। চিঠির কথা বাড়ীতে জানালাম। মা খবর শুনে খুশী হলেন। বাবা বাড়ীতে পাঁচদিন পরে আসবেন। বাবা এলে সব দিক দিয়ে সুবিধা।

মা আমার কাছে সব মনের কথা বলতেন। মা লেখাপড়া না করলেও উপমা দিয়ে এত

সুন্দর উপদেশমূলক গল্প বলতেন, যা শুনে বরাবর অবাক হয়েছি। এমন কবিতা বলতেন, যা আমি এ যাবৎ কোথাও পড়িনি বা কারোর মুখে শুনিনি। বাবার কাছে বহু ছাত্র গেছে শিখতে, কিন্তু বাবার বাড়িতে দু'তিন দিনের বেশী কেউ থাকতে পারে নি। অবশ্য দুজন মহিলা ছাত্রী ছাড়া। মৈহারের মত জায়গায় মেয়েরা কোথায় থাকবে। তবে মেয়ে ছাত্রীরাও ছিল সীমাবদ্ধ। আমার থাকালাকীন একমাত্র শিপ্রা ব্যানার্জিকেই আসতে দেখেছি কয়েকবার। অন্য একজন হল শরণরানী, যিনি আমার মৈহার ছাড়ার পর, মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য গিয়ে থেকেছেন বলে শুনেছি। মা কোন ছাত্রকেই আমার মত একই বাড়িতে নিকটে পাননি। তাই আমি মায়ের অতি প্রিয় ছিলাম। বাড়ির সব ব্যাপার আমাকেই সামলাতে হত। মা এর জন্য বাবার মত কৃতজ্ঞ বোধ করতেন। অন্যের সঙ্গে মা বিশেষ কথা বলতেন না। আসলে মার কথা বলার সময়ই বা কোথায়? কিন্তু বাবার অবর্তমানে মা আমাকে নিজের জীবনের সব কথা বলতেন। ঘরের কথাও বলতেন। অন্নপূর্ণা দেবীর হিষ্টিরিয়া রোগের কারণটা বুঝবার জন্যই রবিশঙ্করকে যেমন বলেছি, সেই সময় রবিশঙ্কর একতরফা কিছু কাহিনী বলেছে। জুবেদা খাতুনকে না জিজ্ঞাসা করলেও নিজের থেকে অনেক কিছু বলেছে। যেহেতু আমার এম. এ. ক্লাসে এ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি একটি বিষয় ছিল, সেইজন্য অন্নপূর্ণা দেবীর হিষ্টিরিয়া হবার কারণটা জানবার জন্যই কয়েকবার অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রশ্ন করেছি। একটাই উত্তর পেয়েছি, 'এই সব বাজে কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে করে না।' সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়েছি, বাবার বিষয়ে বই লিখছি, এ সত্ত্বেও পরনিন্দাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। উনিশশ' সাতাশি পর্যন্ত এই বই লিখবার জন্যও অনেক প্রশ্ন করেছি। সেই ঊনিশশ' ঊনপঞ্চাশ থেকে, ঊনিশশ' তিরানব্বইয়ের মধ্য পর্য্যন্ত এক রকম দেখে গেলাম। দীর্ঘ ৪৪ বছর দেখেছি, অন্নপূর্ণা দেবীকে। হিস্টিরিয়া যদি না হত, কিংবা বই লিখবার প্রয়োজন না হত, তা হলে আমার প্রশ্ন করবার সুযোগ হত না। এই না বলার জন্যই বোধ হয় অন্নপূর্ণা দেবীকে আমি এত শ্রদ্ধা করি। আমার চোখে নানা কারণে তিনি অনন্যা। মার কথা বলার সাথী বোধহয় একমাত্র আমিই ছিলাম। মার জীবনীও অত্যন্ত দুঃখদায়ক। যে যে কথা মা আমাকে বলেছেন, আমার স্থির বিশ্বাস, সে কথা মার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র আলি আকবর এবং কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীও জানেন না। অবশ্য সে কথা আমার বিষয়বস্তু নয়। সে তো মা ছেলের গল্প। কিন্তু এককথায় বলতে গেলে, রবিশঙ্কর এবং জুবেদা খাতুন যা বলেছেন, সেই কথাটা মাও বলেছেন। তবে কয়েকটা কথা আরও বলেছেন। মার কথা শুনে মনে হয়েছে এ কি বিচিত্র কাহিনী! এই কাহিনী যদি কোন ভাল সাহিত্যিক শুনতেন, তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস, যে তাঁর হাত দিয়ে একটি অমর উপন্যাস সৃষ্টি হত। নিয়তির কি অভিসম্পাত। সেই মা যদিও জীবিত ছিলেন, কিন্তু ১৯৭৮-এর পর অদম্য ইচ্ছা থাকলেও দেখা করতে পারি নি, কারণ যে অশোক কাননে মা বন্দী, সেখানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি জোর করে যেতাম তাহলে আর একটা সোনার লঙ্কা জ্বলত। যাক এতদিনে আলি আকবরের মনে পড়েছে বাড়ির কথা। চিঠি লিখেছে নিজের স্ত্রীকে। জানতে পারলাম দু'দিন পরেই কোলকাতা থেকে বম্বে যাবে। হঠাৎ বাড়িতে সব গরু ও মোষগুলি অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তার দেখে বললেন, 'এক ধরনের রোগ হয়েছে একটি মোষের।'

সঙ্গে সঙ্গে মোষটিকে ইনজেক্শন্ দিলেন। বললেন, রোগটি খুব ছোঁয়াচে। সুতরাং সব মোষকেই ইনজেক্শন্ দিতে হবে।' এক ঘণ্টা ধরে সব গরু এবং মোষকে ইন্‌জেকশন্ দেওয়া হল। ডাক্তার যে মোষটিকে প্রথম ইন্‌জেকশন্ দিয়ে বলেছিলেন এক ধরনের রোগ হয়েছে, সেটি রাত্রে মারা গেল। বাবার আসবার সময় হয়ে আসছে, সেই সময়ে এই অঘটন। মোষ মারা গেছে শুনলেই বাবার মন খারাপ হয়ে যাবে। এ দিকে মোষ মারা গেল আর ব্যাণ্ড পার্টির ছেলেরা চার দিনের পর ফিরে এল। ডি. সি. বাবার নামে বিন্ধ্য প্রদেশের তরফ থেকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। একমাস পরে বাবা ফিরবেন। আমার রক্তশূন্যতা রোগ আছে, তাছাড়া আমাশয় রোগ তো আছেই, তার জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু রক্তশূন্যতা? মাথাঘোরে। এই অবস্থায় কি করে বাবার কাছে শিখব? কেন এই রোগ হয় বুঝিনা। কাশীতে এই রোগ নিরাময়ের জন্য গিয়েছি। কিছুদিন ঠিক থাকি আবার হয়। ডাক্তার বলল, 'টেন্‌সানের জন্যই এই রক্তশূন্যতা রোগ হচ্ছে।' টেনসান তো আছেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি আমি সেন্টিমেন্টাল ফুল না হতাম তা হলে হয়তো টেনসান হ'তো না। যাই হোক ডাক্তারকে বললাম, 'যেমন করে পারেন আমাকে ঠিক করে দিন। বাবা এসে যে সময় শুনবেন মোষ মারা গেছে, তারপর আমার মাথা ঘুরছে শুনলে তো সোনায় সোহাগা হবে। বাজনাও বাজাতে, পারছি না।' অনেক দিন পর রেডিও খুলতেই বাবার উজিরখানী গৎ, 'পাহাড়ী ঝিঁঝিঁট শুনলাম।'

পরের দিন ডাক্তার এসে গরু মোষগুলিকে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে বললেন, 'আর ইনফেক্শনের ভয় নেই।' আজ কয়েক দিন পরে একটু বাজালাম।

আজ লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের চিঠিতে জানলাম, এলাহাবাদ আকাশবাণী থেকে সঙ্গীতসভা হবে জানুয়ারীতে। সঙ্গীতসভায় রবিশঙ্কর এবং বাবার বাজনা আছে। বাজনা বাজিয়ে রবিশঙ্কর বাবার সঙ্গে পরের দিন মৈহারে ফিরবে। রবিশঙ্কর রাত্রে পৌঁছে পরের দিন সকালের ট্রেনে দিল্লীর যাত্রা করবে। চিঠি পড়েই বুঝলাম রবিশঙ্কর চিঠিটা লিখতে বলেছে। যাক, রবিশঙ্কর বাবার সঙ্গে মৈহার আসছে শুনে ভাল লাগল। একটা রাত রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলে মনটা হাল্কা করব।

পরের দিন রেডিওর সঙ্গীতসভা শুনবার জন্য সকলেই ঘরে বসেছি। কিন্তু রেডিওতে এত আওয়াজ হচ্ছে কেন? আজকের দিনেই রেডিওর মধ্যে কি গোলমাল হল? সকলে ঘরে বসে শুনতে লাগল। আমি ডাক্তার গোবিন্দ সিং-এর বাড়ি চলে গেলাম। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে খুব ভাল শুনতে পেলাম। রবিশঙ্করের 'হমীর' শুনলাম তারপর বিসমিল্লার সানাই। শেষে বাবার 'হেম বেহাগ' শুনলাম। বাবা এত তৈরী বাজালেন, যে কে বলবে বাবার এত বয়স হয়েছে? ডাক্তারের কাছে শুনলাম, সন্ধ্যাবেলায় বাবার পুরিয়া ধ্যানেশ্রীর রেকর্ড বেজেছিল। রাত্রি বারটার সময় শেষ হল। বাড়ি এসে শুনলাম, আমার যাবার কিছু পরে রেডিওতে পরিষ্কার আওয়াজ এসেছিল।

আজ বাবা, রবিশঙ্কর এবং আশিস আসবে। বাড়ি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হোল। আশিস প্রায় ছয় মাস পরে আসছে। মৈহারে একটাই টাঙ্গা। সুতরাং দুবার টাঙ্গাকে যেতে হবে। গাড়ী এল। বাবা, রবিশঙ্কর এবং আশিস এল। ঠিক হল রবিশঙ্কর আর আশিস হেঁটে

আসবে বাড়ি। সব জিনিষপত্র নিয়ে বাবাকে নিয়ে বাড়ি এলাম। আমরা বাড়িতে পৌঁছবার পর, মা চা করে দিয়েছেন। রবিশঙ্কর ও আশিস বাড়ি এসে পৌঁছল। রাত্রে রবিশঙ্কর নিজে থেকে বলল, 'বাজে রটান হয়েছে যে, আমি, আলুভাই যাতে অলবেঙ্গল কনফারেন্সে বাজাতে না পারে তার জন চক্রান্ত করেছি। আসলে অল ইণ্ডিয়াতে একটা শর্ত ছিল, সেই জিনিষটা আলুভাই না দেখে সই করে দিয়েছিল।' রবিশঙ্কর যে কথা বলল সেই কথা তার শিষ্য অমিয়র কাছে শুনেছি আগেই। তবে আলি আকবর কেন অন্য কথা লিখেছিল? ঘটনার থেকে রটনা বেশী? কি জানি। ঘড়িতে দেখি, সাড়ে তিনটে বাজতে দেরী নেই। সকালের ট্রেনেই রবিশঙ্কর দিল্লী চলে যাবে সুতরাং অদ্য শেষ রজনী।

রবিশঙ্কর যাবে। আশিসকে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। ওয়েটিং রুমে আশিসকে বসিয়ে রবিশঙ্কর প্ল্যাটফরমে আমাকে নিজের জীবনের অনেক ঘটনা এবং ভুলের কথা বলল। এ কথাও বলল, 'ভুল আমি করেছি, তা বলে কি তার ক্ষমা নেই? আসলে, অন্নপূর্ণা নিজের জীবন শেষ করবার জন্য কোন ওষুধ খায় না।' রবিশঙ্করকে বললাম, 'বার বার বলেছি, তবুও কোন সাইকিয়াট্রিষ্টকে দেখাচ্ছেন না কেন?' উত্তরে রবিশঙ্কর কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কত করে বলেছি, কিন্তু কোন ডাক্তারকে দেখাবে না। জেদ করে যদি বলে ডাক্তারকে দেখাব না, তাহলে আমার কি ক্ষমতা ডাক্তার ডাকি?' সব শুনলাম। বললাম, 'ডাক্তার দেখাবেন না, তা হলে ভাল হবেন কি করে? আমার যতদূর মনে হয় শুভর মায়ের ইচ্ছার বিপরীত কাজ আপনি করছেন। আগের বারেও কথা হয়েছিল। আপনাকে বলেছিলাম, আপনার চেলা চামুণ্ডাদের হটিয়ে দিন। দিন রাত তাদের চা এবং খাবার করাটা বড় কথা নয়। বড় কথা হোল, আপনি যাদের পুষে রেখেছেন নিজের স্বার্থে তাদের দুটো রূপ আছে। আপনার সামনে এক রকম এবং বাইরে অন্য রকম। এ বিষয়ে গতবারে কথা হয়েছিল। আপনি বলেছিলেন ওদের হটিয়ে দেবেন। কিন্তু হটিয়ে দিয়েছেন কি? আসলে কি জানেন, এই টেনসানই হল হিস্টিরিয়ার কারণ। যে করে পারুন কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।' রবিশঙ্কর চুপ করে আমার কথা শুনল। এবারেও সেই এক কথা, 'দেখি কি করতে পারি?' আমার কথাটা বোধ হয় রবিশঙ্করের মনঃপূত হোল না। আসলে রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর, সকলের কাছে প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। এদের ভুল যদি কেউ দেখিয়ে দেয় তাহলে এদের ভ্রূ কুঁচকে যায়। আমায় কিছু বলতে পারে না কারণ বুঝতে পারে, আমার থাকায় বাবার এবং ছেলেদের জন্য ভাল। যদিও আমি জানি (The rich man despises those who flatter him too much and hates them who do not flatter him at all.) আমার অন্যমনস্কতা দেখে রবিশঙ্কর হঠাৎ ঘুরিয়ে বাবার কাছে কি শিখেছি জিজ্ঞেস করল। সব বললাম। আমার কথা শুনে বলল, 'বাবা তোমাকে খুবই ভালোবাসেন। বাবার সব কাজ তুমি কর। তুমি বাবার ডান হাত। বাবা তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।' যদিও গাড়ী এক ঘণ্টা লেট কিন্তু কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল বুঝতে পারলাম না। রবিশঙ্কর চলে গেল। ফিরবার পথে আশিসের মুখে শুনলাম, দিল্লী থাকাকালীন কয়েকদিন তার পিসিমার ফিট হতে দেখেছে। অবাক হয়ে যাই। রবিশঙ্করের কথাগুলোই মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। জেনে শুনে মৃত্যুকে ডাকা ছাড়া আর কি

বলতে পারি? কোথায় যেন পড়েছি—'ডেথ ইজ দ্য লিবারেটর অব হার হুম ফ্রিডম ক্যান নট রিলিজ, দ্য ফিসিসিয়ান অব হার হুম মেডিসিন ক্যান নট কিওর, দ্য কমফরটার অব হার হুম টাইম ক্যান নট কনসোল।'

বাবার অবর্তমানে অনেক কাজ করেছি শুনে, রাত্রে বাবা 'সাহানা' শেখালেন। পরদিন তহশীলদার এসে বাবাকে টাকা এবং মানপত্র দিলেন। বাবা টাকা এবং মানপত্র দেখে অবাক হলেন। তহশীলদার আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার অবর্তমানে সাহাডোলে ব্যাণ্ডপার্টির যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।' সাহাডোলের রাজা মান পত্র এবং টাকা দিয়েছেন। বাবা খুশী হলেন। বাবার কথায় বুঝলাম, মা আমার খুব প্রশংসা করেছেন। তহশীলদার চলে যাবার পরই বাবা 'কোমল ঋষভ আশাবরী' শেখালেন। বললেন, 'এবারে আন্দোলন শুনে শুনে মাথার মধ্যে রাখতে হবে।' রাত্রে দরবারী কান্থাড়ার শ্রুতি এবং আন্দোলন বুঝিয়ে, শেখাবার পর সাহানার অন্য দ্রুত গৎ শেখালেন।

মৈহারে এসে অবধি যে জিনিষ প্রত্যেকবার দেখেছি, সে কথার পুনরাবৃত্তি করব না আগেই লিখেছি। কিন্তু ১৯৫৪ এর রিপাবলিক ডে অর্থাৎ ছাব্বিশে জানুয়ারীতে রাজভবনে একটা অঘটন ঘটল যা কেউ আশা করেনি। সকালে রেওয়া থেকে গাড়ী এল। বাবা ব্যাণ্ডের সব ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করলেন। সকালেই বাজার করে নিয়ে এলাম। বাড়িতে দেখলাম আশিস বাজাচ্ছে। বাজনা শুনে মনে হল, তার পিসিমা কড়া শাসনের মধ্যে রিয়াজ করিয়েছেন। সামনে প্রশংসা করলাম না। বাজনা ভাল লাগল। সন্ধ্যার পর বাবা ফিরে এলেন। বাড়ির সামনে গাড়ি দেখেই গেলাম। ব্যাণ্ডের ছেলেরা, বাবা নামবার আগেই গাড়ী থেকে নেমে গেছে। ব্যাণ্ডের ছেলেদের জন্য একটা বিরাট ভ্যানগাড়ী। এবং বাবার জন্য আলাদা গাড়ী। ব্যাণ্ডের ছেলেরা গাড়ী থেকে আগেই নামল, হাত জোড় করে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। গুলগুলজী বাবার বেহালা নিয়ে নেমে এল। বলল, 'প্রয়োজনীয় কথা আছে।' মনে ভাবলাম কি প্রয়োজনীয় কথা? বাবা বাড়িতে ঢুকেই, মুখ হাত গরম জল দিয়ে ধোওয়ার পর ঘরে গেলেন। এই ফাঁকে গুলগুলজীর কাছে শুনলাম আজ গভর্ণর হাউসে, যা অঘটন ঘটেছে। বললেন, 'আজ লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ভি. সান্থানাম, রাজ্যের মন্ত্রী, এবং রাজ্যের বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে ব্যাণ্ড বাজছিল। বাবা বেহালা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি তার ছিঁড়ে যায়। বাবার কণ্ঠে 'বন্ধ কর, বন্ধ কর' আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেহালার ছড়ি দিয়ে আমাদের বাজাতে মানা করেন। তারপরেই বাবা গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুঢ়, কুঢ়, কুঢ়, হমলোগ মা সরস্বতী কা সেবা কর রহেঁ হঁয়, আউর আপলোগ দিল্লগী কর রহে হঁয়। বৈঠ বৈঠ কর গপ কর রহেঁ হঁয়। মাকে সামনে গপ করনা বদতমিজি। মা নীচে বৈঠে হঁয়, আউর লড়কা চেয়ার মে বৈঠকর পৈর হিলায়ে তো কিতনা বড়া বদতমিজি। আপ লোগো ভি ওহি কর রঁহে হঁয়। আপ লোগ তো ইস সময় রাজা, আপকা বন্দুকধারী যো খড়ে হঁয়—হমকো মারনে বোলিয়ে।' বাবার এই কথা শুনে সভা নিস্তব্ধ। বাবা হিন্দি এভাবেই অর্দ্ধেক হিন্দি এবং অর্দ্ধেক বাংলা মিশ্রণ করে বলতেন। বাজাবার সময় কয়েকজনকে কথা বলতে দেখেছেন, তারই প্রতিক্রিয়া উপরের কথাগুলি। বাবার এই রুদ্ররূপ পূর্বে কেউ

দেখেনি। বাবার বৈষ্ণব বিনয় এতদিন দেখে আসছেন সকলে। কিন্তু আজ কি হোল? গভর্ণর বাবার রুদ্র মূর্তি দেখে এবং ভাষণ শুনে বলেছেন, 'আপনার যা যা বলরার তা বলুন।' এই কথাতেই বাবার রাগ পড়ে গিয়েছে। বেহালার তার যদি না ছিঁড়ত, তা হলে বোধ হয় বাবার চোখে পড়ত না কথোপকথন। গভর্ণরের কথা শুনে বাবার আওয়াজ কোমল হয়ে গিয়েছে। গভর্ণর উপরি উক্ত কথা বলাতে, বাবা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, 'আপনাদের সেবাতে বছরে দু'বার ছাড়া আরো অসতে হয়। আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, এই সব বাজনা মেরামত করতে পয়সা লাগে। বাজনার তারের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এসব খরচা আমি নিজে করে থাকি। রাজার রাজত্ব যাবার পর আপনারাই এখন রাজা। বাজনা শুনতে চান কিন্তু বাজনার উপকরণ ঠিক রাখবার জন্য যে খরচ লাগে তা বুঝতে পারেন না।' বাবার কথা শুনে চিফ্ সেক্রেটারী এবং ডি.সি. উভয়েই বাঙ্গালী, বাবাকে বিনীতভাবে বলেছেন, 'মৈহারে এসে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো।' বাবা শান্ত হয়ে গিয়েছেন। গুলগুলজীর কাছে শুনে বুঝলাম বাবার মেজাজ আজ তুঙ্গে ছিল। বাবা ওখানে শান্ত হলেও বাড়িতে আজ বিপদ আছে। বাবা বাইরে বাজিয়ে এসে কোন আলোচনা করেন না। কিন্তু আজ খেতে বসে বললেন, 'সব লাট হয়ে গিয়েছে। আজ সকলকে কথা শুনিয়ে দিয়েছি। সঙ্গীতের সভ্যতাও জানে না, অথচ বাজনা শুনতে চায়। এ হোল লোক দেখানো ব্যাপার যে বাজনা শুনছে।' এর বেশী আর কিছু বললেন না। খাবার পর বললেন, 'মনের মধ্যে একটাই ইচ্ছা আছে। হজ করে এসেছি। একবার নিজের গ্রাম শিবপুরে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেশে কিছু করবার আছে। দেখ আল্লা কি করেন।' বাবার এই কথা শুনে বুঝলাম, ইচ্ছা যখন হয়েছে তখন যাবেন। আমার শিক্ষা হয়ে যাবে বন্ধ।

পরের দিন সকালে বাবা 'কোমল ঋষভ আশাবরী' শেখালেন। দুপুরে ঘরে খাওয়া হয়েছে, এমন সময় খবর এল, বিকেলে ডি. এম. এবং কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার বাবার কাছে আসবেন। বিকেলে পি. ডি. চ্যাটার্জি এবং গুহ এলেন। উচ্চপদস্থ দু'জনেই বাঙ্গালী। বাবার এবং আমার পূর্ব পরিচিত। কথায় কথায় তাঁরা বললেন, 'আপনি যে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন তা কি খাতায় লেখা আছে?' বাবা সম্মতি জানালে ডি. এম. প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'সরকারী খরচায় মূল্যবান খাতাগুলি ছাপালে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উপকার হবে।' উত্তরে বাবা বললেন, 'ছাপিয়ে কোন লাভ হবে না। এ হল করতব বিদ্যা। কর তব পাওয়ে। না শিখলে, লেখা দেখে গায়ক বা বাদক হওয়া যায় না। এ হল গুরুমুখী বিদ্যা।' বাবার এই কথা শুনে ডি. এম. বললেন, 'একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খুললে ছেলেরা শিখতে পারবে।' উত্তরে বাবা বললেন, 'এখানে বিদ্যালয়ে কে শিখবে?' বাবার কথা শুনে ডি.এম. বললেন, 'চিফ সেক্রেটারীর নির্দেশে আপনার কাছে এসেছি। যদি একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা হয়, তা হলে বিন্ধ্যপ্রদেশের ছেলেরা শিখবার সুযোগ পাবে। আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করবেন। বিস্তারিত চিঠি দু'দিনের মধ্যেই পাবেন।' এই কথা বলে দু'জনে চলে গেলেন। রাত্রে বাবা আমাকে শেখাবার সময় বললেন, 'অনেকদিন তুমি শিক্ষা পাও নি। এবারে একলা শিখবে। আগে যেমন আশিস এবং তুমি একসঙ্গে শিখতে সেভাবে শেখাব না। আশিস কিছু মনে

রাখতে পারে না। সুতরাং তোমাকে উপস্থিত নিত্য নূতন রাগ শেখাব। তারপর একসঙ্গে শুনব। রাগাধ্যায়, তালাধ্যায় এবং রাগ ভেদ শিখতে হবে।' হেম কল্যাণ শেখালেন। পরের দিন রাত্রে সাঁঝগিরি শেখালেন। এ যাবৎ রাগের নামগুলি আমার জানা ছিল, কিন্তু রাগের কোন ধারণাই ছিল না। মনে হোল এত দিনের নূতনের সন্ধান পাচ্ছি।

ডি.এম. ঠিকই বলে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবার দুদিন পরেই চিফ সেক্রেটারীর চিঠি এল। চিঠিতে প্রস্তাব দিয়ে লিখেছেন, 'মৈহারে সঙ্গীতের জন্য রাজকীয় বিদ্যালয় খোলা হবে। ছাত্রদের জন্য পঁচিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হবে। ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা সরকার করবে। ছাত্ররা বিন্ধ্যপ্রদেশেরই হবে। পঁচিশটি ছাত্র পরীক্ষা করে, আপনাকেই নির্বাচন করতে হবে। অধ্যাপকদের নিযুক্তি আপনি করবেন। অধ্যাপক এবং আপনাকে কত টাকা দিতে হবে জানাবেন। বাবা রাজী থাকলেই সরকার কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন।' চিফ সেক্রেটারীর চিঠি বাবাকে পড়ে শোনালাম। বাবা আমাকে বললেন, 'কি করব?' বললাম, 'ব্যাণ্ডের ছেলেদের মাইনে বাড়াবার জন্য আবেদন করুন। এ ছাড়া ব্যাণ্ডে আপনি যে মাইনে পান সেটা বাড়াতে হবে। এইটা প্রথমে করা ভাল। এরপর স্কুলের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করা যাবে। এখানে স্কুলের ছাত্ররা খেলে আমার সঙ্গে। এ যাবৎ কারো সঙ্গীতে রুচি আছে বলে মনে হয় নি। সঙ্গীত বিদ্যালয় খুললে ব্যাণ্ডের মাইনে এবং বিদ্যালয়ের মাইনে পেলে আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়বে।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'যা ভালো বোঝ কর।' বুঝলাম বাবার ইচ্ছা আছে।

সারা দিনরাত মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা। ভবিষ্যতে কি করব? সারাজীবন কোলকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে কাটাব স্থির করেছি। যাবার আগে এখনও শিক্ষার অনেক বাকী। কিন্তু এ কোন প্রস্তাব এল? বুঝতে পারছি বাবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমার নিজস্ব ইচ্ছা মোটেই নেই স্কুলের জন্য। বিন্ধ্যপ্রদেশের ছাত্ররা শিক্ষা করবে। তাদের স্ট্যানডার্ড কি হবে জানা আছে। আমার অনিচ্ছার কারণ একটাই। সব কাজ আমাকেই করতে হবে, যার ফলে শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুল হলে একটাই সুবিধা। আর সেই সুবিধাটা হবে বাবার। বাবার ব্যাণ্ডের মাইনে দরখাস্ত করলে নিশ্চয় বাড়বে। উপরন্তু স্কুলের মাইনে হলে বাবার মেজাজ ঠিক থাকবে। চিন্তাটা অনেক রাত অবধি মাথায় ঘুরতে লাগল।

রাত্রে আশিসকে আলাদা শেখাবার পর বাবা আমাকে দরবারী কান্থাড়া শেখালেন। বাজাতে বাজাতে বাবা কেঁদে বললেন, 'এতদিনে তোমার মধ্যে ভাব এসেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, 'তুমি যেন আমার গুরুর নাম রাখতে পারো।'

দিন এবং রাত কোথা দিয়ে যে চলে যায় বুঝি না। একদিন মৈহারের রাজকুমার এল। যতই হোক মৈহারের মহারাজের ছেলে। বাবা রাজকুমারকে আপ্যায়ন করে বসালেন। রাজকুমার বাজনা শুনতে চাইল। বাবা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবা জোর করে নিজের সঙ্গে আমাকে বাজাতে বললেন। বাবার সঙ্গে দরবারী কান্থাড়া বাজালাম।

বাবার মুখে আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। একবার বলছেন কুমিল্লা যাবেন আবার পরমুহূর্তে বলছেন, সারদা দেবীর স্থানে মৈহার ছেড়ে, কোথাও আর এই বুড়া বয়সে

যাবেন না। কিন্তু এতদিন থেকে এইটুকু বুঝেছি, বাবার মাথায় যে মুহূর্তে কুমিল্লায় যাবার পরিকল্পনা এসেছে, সুতরাং কুমিল্লায় যাবেন। কিন্তু মৈহারে সঙ্গীতের বিদ্যালয় যদি খুলা যায়, তাহলে হয়তো কুমিল্লা যাবেন না। আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট। রাত্রে এখন দরবারী শিখছি। একটা জিনিষ দেখে অবাক হয়ে যাই। যে সময়ে আমার শিক্ষা শুরু হোল, সেই সময় কেউ না কেউ অসুখে পড়বে। বাজাবার পর খাবার খেতে গিয়ে মার কাছে শুনলাম, পুত্রবধূর জ্বর হয়েছে।

পরের দিন যথারীতি ওষুধ নিয়ে এলাম। বিকেলে রোজকার মত হকি খেলে, ছেলেদের নিয়ে বাড়ি আসছি। দেখলাম রাজকুমারের গাড়ী থেকে বাবা নামলেন। বাবা নাতিদের বললেন, 'রাজকুমারকে প্রণাম কর।' রাজকুমার ছেলেদের প্রণাম গ্রহণ করে রাজবাড়ি চলে গেলেন। রাত্রে বাবা আজ অতি বিলম্বিত গৎ শেখালেন দরবারী। গৎ আগেও শিখিয়েছেন, কিন্তু আজকের মুখড়া এবং গৎটির তুলনা নেই।

৩৭

একদিন আশিস আবদার করল নদীতে মাছ ধরবে। মৈহারে দেবী দর্শন করতে গেলে একটা পুকুর পড়ে। সেই পুকুরে ছেলেরা একটা লম্বা বাঁশের মধ্যে সুতো লাগিয়ে মাছ ধরে। আশিসের ইচ্ছা হয়েছে মাছ ধরবার, সুতরাং বিকেলে খেলতে না গিয়ে মাছ ধরতে গেলাম। প্রথমদিন আমি ও আশিস ছোট মাছ ধরলাম। আশিসের আনন্দ দেখবার মত। সেই মাছ ভাজা করে খাওয়া হোল। পরের দিন আবার সেই আব্দার। কিন্তু পরের দিন মাছ, আটার গুলি খেয়ে নেয়, ধরা দেয় না। সুতরাং দুই দিন যাবার পরেই মাছ ধরা বন্ধ করে আবার হকি খেলা শুরু হয়ে গেল। মাঠের এক ধারে আশিস, ধ্যানেশ, প্রানেশ ছোট রবারের বল খেলে। আজ চার দিন হয়ে গেল জ্বর আর কমছে না জুবেদা খাতুনের। বাবা প্রথমে কিছু বলেন নি। চতুর্থ দিনেও ওষুধ আনতে দেখে বাবা জোরে জোরে শুনিয়ে বললেন, 'জ্বর না নখড়া? কাজ যাতে না করতে হয়, তার জন্য জ্বর বলে পড়ে আছে, অথচ খাবারও খায়।' এ কথা শুনবার পর মার কাছে শুনলাম, পুত্রবধূ বাবার কথায় রাগ করে খাবার পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং আমাকে যেতে হল। বুঝিয়ে বললাম, 'বাবার কথা এতদিনেও বুঝতে পারেন না। অসুখ দেখলেই বাবা বিচলিত হয়ে পড়েন। খাবার না খেলে নিজেই কষ্ট পাবেন। আমার বৃথা ওষুধ আনতে যাবার দরকার কি?' এ কথা শুনে ওষুধ খেলেন। রাত্রে দেখি উঠে কাজ করছেন। বাবার ভয়ে জ্বরও ঠিক হয়ে যায়। কথাটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও কিন্তু কথাটা সত্যি। একটা কথাই মনে হয়, মনের জোরে মানুষ সাধারণ কষ্ট বা জ্বর ঠিক করতে পারে। কিন্তু তা বলে টাইফয়েড হলে, মনের জোরে কি ভাল করা যায়? তবে এটা ঠিক, যে সাধারণ অসুখ হলে মানুষ যেমন বিচলিত হয়, সেই বিচলিত ভাবটা মনের জোর থাকলে জয় করা যায়। এর প্রমাণ আমি নিজে। বাবা চিন্তিত হবেন বলে মনের জোরে বাবাকে কখনও বুঝতে দিইনি শরীর খারাপ। তবে একশ চার ডিগ্রি জ্বর হলে, কিংবা প্রতি পদক্ষেপে যখন মনে হচ্ছে মাটির উপর দিয়ে হাঁটছি না, সেই অবস্থায় বাবার কাছে ধরা পড়ে গেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ থেকে বাবাকে প্রধান অতিথি হবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি এসেছে। বাবা বললেন, 'টাকার কথা কিছু লেখেনি।' বাবাকে বুঝিয়ে বললাম, 'যাওয়া আসা

এবং থাকার সব খরচা নিশ্চয়ই দেবে। প্রধান অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুতরাং সম্মানের ব্যাপার।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'সম্মান নিয়ে কি ধুয়ে খাব?' এ বিষয়ে বিশদভাবে বোঝাবার পর বাবা বললেন, 'ঠিক আছে যা ভাল বোঝ তাই কর।' আশ্চর্য বাবার মেজাজ। বাবাকে যা করতে বলব তাই করবেন, কিন্তু প্রথমে 'না' করাটা বাবার স্বভাব। এতদিন দেখে আসছি, সুতরাং সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখে দিলাম। বাবা বললেন, 'আশিসকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।' রাত্রে মধ্য লয়ে দরবারী গৎ শিখিয়ে বললেন, দরবারীতে দ্রুত গৎ বাজান ঠিক নয়। রাগের মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়।'

পরের দিন খবর এল যে চিফ মিনিষ্টার এবং ডি.সি. মৈহারে আসবেন। ডি. এম. অনুরোধ করেছেন বিকেলে গেষ্ট হাউসে গাড়ী করে বাবাকে নিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে চিফ্ মিনিষ্টার হাইস্কুল এবং প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করবেন এবং রাত্রে বাবার বাজনা শুনবেন। সেই সময় মৈহারে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিষয়ে আলোচনা হবে। বাবা আমাকে নিয়ে গেষ্ট হাউসে গেলেন। হাই স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুল দেখবার পর, চিফ্ মিনিষ্টার বললেন, 'রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আপনার এখানে আসবো।' রাত্রে তাঁরা এলেন। আপ্যায়নের পর, বাবা আমাকে এবং আশিসকে নিয়ে বসলেন। বাবা প্রথমে হরি ওঁ-এর অর্থ বুঝিয়ে বাজালেন। বাজনা চলাকালীন চিফ মিনিষ্টারকে দেখে বুঝলাম গান বাজনা বোঝেন না। কিন্তু বাঙ্গালী ডি. সি. সঙ্গীতপ্রেমী। পৌনে দশটায় বাজনা শেষ হোল। যাবার আগে, চিফ মিনিষ্টার স্কুলের কথা ওঠাতেই বাবা বললেন, 'এখন আমি কুমিল্লায় যাব। কুমিল্লা থেকে এলে এ বিষয়ে কথা হবে।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক। কুমিল্লা থেকে এ যাবৎ প্রোগ্রামের তো কোন কথা হয় নি। তার মানে, যাবেন যখন মনস্থ করেছেন তখন যাবেনই। বাবার কথা শুনে ডি. সি. বললেন, 'স্কুলের জন্য, কোন বাড়ি নিকটে কি পাওয়া যেতে পারে?' 'বিদ্যালয়ের জন্য দুই জায়গায় বাড়ি আছে।' বাবা ডি. সি.-কে বললেন 'আপনি দুই জায়গায় কথা বলে, যে জায়গা উপযুক্ত মনে করেন, সেই জায়গায় ব্যবস্থা করুন।'

সকালে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'ভাতখণ্ডের ক্রমিক শেষ তিন ভাগ রেজিষ্ট্রি করে পাঠাচ্ছি। যদিও রবিশঙ্করের কাছে গণ্ডা বেঁধেছি, কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে না। হাথরস থেকে দিল্লী যাই শিখতে। রবিশঙ্কর নিজের বাজান প্রোগ্রাম, সঙ্গীতে ছাপাবার জন্য বলে। সেইজন্য সঙ্গীতে প্রায় তার সঙ্গীত কার্যক্রম লিখি। কিন্তু দিল্লীতে অনেক ছাত্র থাকে বলে শিক্ষা হয় না।'

বঙ্গীয় সংস্কৃতি থেকে অগ্রিম টাকা টি.এম.ও. করে এল। বাবা সতেরই ফেব্রুয়ারী আশিসকে নিয়ে কোলকাতায় যাবেন। বাবা পাঁচদিন পরেই যাবেন বলে বললেন, 'এই কয়েক দিন সকাল এবং রাত্রে রোজ শেখ।' গতকাল বসন্ত পঞ্চমী গেছে। সুতরাং আজ সকালে হিন্দোল শেখালেন। নূতন বোল এবং তারপরণের অনেক জিনিষ শেখালেন। যেহেতু এগুলো বেশীর ভাগ, আমি আগেই শিখেছি অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে, সেইজন্য বাবার সঙ্গে বাজাতে অসুবিধা হোল না। বাবা খুশী হলেন। রাত্রে শুদ্ধ বসন্ত শেখালেন। ঝালার কিছু কাজ বীন্ এর অঙ্গে শেখালেন। পাঁচদিন এই দুইটি রাগই সকাল সন্ধ্যায় শিখলাম।

এর মধ্যে, নূতন সিনেমা হলে 'আনারকলি' সিনেমা এসেছে। সিনেমা হলটা শহরের মধ্যে অর্থাৎ বাবার বাড়ি থেকে দূরে। মৈহারের লোকেদের মুখে 'আনারকলি'র প্রশংসা শুনলাম। বইটা দেখে এলাম। বইটা সত্যই ভাল। আমার ভাল লাগল। বুঝতে পারিনা, বাইরে না বেরোলেও কি করে বাবার পুত্রবধূ সিনেমার সংবাদ পেয়ে যান। মার খুব ইচ্ছা সিনেমাটা দেখার। আকবরের পুত্রের কাহিনী সুতরাং বইটার ভিত্তি ধর্ম। মা আমাকে সিনেমার কথা বললেন। মা চিরটাকালই গৃহে বন্দী। মাকে বললাম, 'বাবাকে বলুন। বাবা অনুমতি দিলে, আপনাকে বসিয়ে দিয়ে আসব।' যা এ যাবৎ দেখিনি তাই হোল। সাহস করে মা বাবাকে বললেন, 'আল্লার উপর একটি সিনেমা 'আনারকলি' এসেছে। অনুমতি দিলে বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখে আসি।' বাবা এ কথা শুনে চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। বিকেলে বাবা আমাকে বললেন, 'তোমার মা সিনেমা যাবে নাকি?' মাকে গিয়ে বললাম। মা যেন ভগবান দর্শন করেছেন। বাবার কাছে বললেন 'বৌমা তো শহরে সিনেমা দেখত। এখানে এসে কিছুই দেখতে পায় না। বৌমা এবং নাতিদের জন্যই সিনেমা দেখতে আমারও মন চাইছে, কেন না আল্লার উপর বই।' এ কথার উত্তরে বাবা যা বললেন আমার কাছে তা অকল্পনীয়। বাবা বললেন, 'এ বই ছোট ছেলেদের জন্য নয়।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক! বাবা কি করে জানলেন? সত্যই তো এ বইটি আকবর পুত্র সেলিম এবং আনারকলির প্রেমের উপাখ্যান। বাবার কাছে এ কথা শুনে মা বললেন, 'আপনি নাতিদের নিয়ে প্রায়ই সিনেমা যান। সে সময় দোষ হয় না। অথচ এই ধার্মিক বই নাতিদের সঙ্গে আমি যেতে চেয়েছি বলেই দোষের হোল।' বাবা এক কথায় না করে দিয়ে ব্যাণ্ডে চলে গেলেন। আসলে বাবা পছন্দ করেন না, বাড়ির বাইরে স্ত্রী কিংবা পুত্রবধূ যাবে। তবে বাবা আমাকে দিয়ে মায়ের কাছে বলালেন কেন, যে 'মা সিনেমা যাবে নাকি?' বাবার এও এক পরীক্ষা। বাবার মৈহারে থাকাকালীন মা এবং পুত্রবধূ কখনও সিনেমা যান নি। সিনেমা যাবার কথা যেদিন মা বললেন, তার পর থেকেই রোজই একবার বাবা কথা শোনান মাকে। বাবা একটি কথা বলেন, 'আরে আরে নাতিদের নিয়ে এই সিনেমা যেতে চায়? সখের বলিহারি।' মা সাহস করে, কি করে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু বাবার রোজ একবার টিট্‌কারি শুনবার পর মার মুখে কোন কথা নাই। ভাগ্য ভাল, মার কথামত আমি বাবাকে সিনেমা যাওয়ার কথা বলিনি। না হলে একথা আমাকেই শুনতে হ'তো। বাবা বাড়ির মেয়েদের সিনেমা যাওয়া, কিংবা বাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না জানি বলেই, বাবাকে বলিনি সিনেমার কথা।

ইতিমধ্যে বহুদিন আলি আকবরের চিঠি আসেনি। আমি একটি চিঠি দিয়েছিলাম মৈহার আসবার জন্য। সেইজন্য বোধ হয় আলি আকবর চিঠি লিখেছে নিজের স্ত্রীর কাছে। শুনলাম, প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আছে একমাস। তার পর সময় হলে আসবে। বাবাকে এ সংবাদ বললাম না। বললে আমারই বিপদ। কোথা থেকে জানলাম? বাবার পুত্রবধূর কাছে থেকে জেনেছি, এ কথা বাবার মনঃপূত হবে না। তাছাড়া নিজের মাকে একটাও চিঠি লেখেনা, অথচ নিজের স্ত্রীকে লিখেছে এ এক অপরাধ। মাকে চিঠি লিখলে বাবাকে দেখাতে পারতাম। ছেলের সংবাদ পেলে বাবা মনে মনে খুশী হতেন।

কোলকাতা যাবার আগের রাত্রে, 'শুদ্ধ বসন্ত' এবং খেয়াল অঙ্গের 'বসন্তও' শেখালেন। বাবা বললেন, 'ধ্রুপদিয়ারা 'শুদ্ধ বসন্ত' গাইতেন এবং বাজাতেন। পরে খেয়াল গানের প্রচলন হয়। সেই সময় 'বসন্ত' বলে যা গাওয়া বা বাজান হত সেই 'বসন্তের' সঙ্গে 'শুদ্ধ বসন্ত' বা 'আদি বসন্তের' কোন মিল নাই। কিন্তু 'বসন্ত' বলে যা আজকাল শুনতে পাওয়া যায়, সেটাকে সহজ করে নেওয়া হয়েছে। ভাতখণ্ডেও সেই সহজ প্রথা করে দিয়েছেন। আরোহীতে শুদ্ধ নি না লাগালে সহজ হয়, কেননা 'পরজ' সহজে বোঝা যায়। কিন্তু আমার গুরুদেব 'বসন্তের' আরোহীতে শুদ্ধ 'নি' লাগিয়ে পরজকে একেবারে আলাদা করে দিতেন।' কোলকাতা যাবার আগে, খেয়াল অঙ্গের বসন্ত কয়েকদিন শেখালেন। শুদ্ধ বসন্ত এবং বসন্ত শিখতে লাগলাম।

এর মধ্যে এলাহাবাদ থেকে সন্তোষ প্রামানিক এল। আগেও কিছুদিনের জন্য মঠে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। পরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আজ না জানিয়ে আসার জন্য বাবা রেগে বললেন, 'আরে নাপতে আমি এখন কোলকাতায় যাব। এ সময়ে শেখাতে পারব না।' বাবা আমাকে বললেন, 'নাপতেকে বুঝিয়ে দাও।' সন্তোষ প্রামানিক জাতে নাপিত বলে, বাবা আদর করে নাপতে বলতেন। বাবা যখন লক্ষ্ণৌ যেতেন, সন্তোষ হুঁকো সেজে দিয়ে চাম্পি করে দিত। বাবা ছেলেটিকে স্নেহ করলেও, এই সময়ে আসার জন্য চলে যাবার কথা বলতে, আমার উপরেই ভার দিলেন। সন্তোষ জানত, বাবা আমার কথা সব শোনেন। সুতরাং আমারও হাত পা টিপতে লাগল। ছেলেটির সঙ্গীত শিখবার অত্যন্ত আগ্রহ। সন্তোষের জন্য দুঃখ হোল কিন্তু উপায় নেই। সন্তোষকে বললাম, 'বাবাকে জানিয়ে তারপর এসো।' সন্তোষ আলি আকবর সম্বন্ধে অনেক গল্প বলল। বুঝলাম, আলি আকবর লক্ষ্ণৌ রেডিওতে থাকাকালীন পরিচয় হয়েছে। এই সব গল্প পরনিন্দা পরচর্চার মধ্যে পড়ে। ছেলেটিকে বললাম, 'এই সব পরনিন্দা পরচর্চা না করে মন দিয়ে গান করো।' একদিন পরেই ছেলেটা চলে গেল। ছেলেটা যাবার পরদিনই বাবা নাতিদের নিয়ে সিনেমা গেলেন। হিন্দী বই, 'ওয়ান থাউজেণ্ড এ্যাণ্ড ওয়ান নাইট।' বাবা এই বই দেখতে কি করে নিয়ে যাচ্ছেন? তাঁকে কিছু বলতে পারি না। বাবা যাবার একদিন আগেই দুটি রেজিস্টার্ড পার্সেল এল। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ বাবা এবং আমাকে ভাতখণ্ডের শেষ তিন ভাগ পাঠিয়েছে। আমাকে পাঠান বই আমার কাছে রেখে দিয়ে, বাবার বই বাবাকে দিলাম। তিনি সেগুলি দেখে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখতে বললেন। বাবা বইগুলো দেখেছেন। দুই দিন পরে বললেন, 'এর মধ্যে বহু রাগ আমি আমার গুরুর কাছে যা শিখেছি, তার সঙ্গে মিল নাই। যদিও ভাতখণ্ড বিদ্বান লোক এবং আমার গুরুর কাছেও গিয়ে নানা জিনিষ সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কয়েকটা গান গুরুর কাছে যে রাগে শিখেছি, সেই গান অন্য রাগে ভাতখণ্ড লিখেছে। এই বইয়ে থিওরি যা লেখা আছে, সেইগুলো পড়লে জ্ঞান হবে। তবে রাগ রাগিনী এখন দেখো না, কারণ গুলিয়ে ফেলবে। আগে আমার গুরুর কাছে যা শিখেছি শেখ, তারপর ভাতখণ্ডর বইতে যে মত লেখা আছে দেখো। নানা মুনির নানা মত। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক জানি না। গুরুর কাছে আমি যে ভাবে শিখেছি, সেই আমার কাছে ঠিক।' বাবার কথা শুনে অবাক হলাম।

বইটি সবে দুদিন এসেছে। বাবা এর মধ্যে একবার চোখ বুলিয়েছেন। ষষ্ঠ ভাগটি গুজরাটিতে লেখা হলেও হরফে হিন্দি। বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু বাবা বইগুলো পড়েছেন। তিনটি খণ্ড, মোটা বই কিন্তু দুই দিনে, বাবা দিন রাত্রি পড়েছেন সব কাজের মধ্যেও।

মৈহারে প্রতিষ্ঠিত যে কয়েকজন আছেন তার মধ্যে পালবাবু একজন। মৌখিক আলাপ আছে। চুনের ভাট্টা আছে। রায় লাইম কোম্পানীর মালিক। বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। মৈহার আসার পর আজ প্রথম স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে এলেন। বাবা মেয়েদের বেটি বলে সম্বোধন করেন। পালবাবুকে বাবা খুব আপ্যায়ন করে বসালেন। শুনতে পেলাম পালবাবু বাবাকে বলছেন, 'অনেক আগ্রহ নিয়ে এসেছি। আপনি যদি আমার মেয়েকে সেতার শেখান তাহলে সঙ্গীতের কিছু জ্ঞান হবে।' পালবাবুর কথায় বাবা বললেন, এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি। তাছাড়া নাতনির কিছুদিন পর বিয়ে হয়ে যাবে। সুতরাং বাজনা না শিখিয়ে বাড়ির যাবতীয় কাজ, রান্না সেলাই থেকে, চণ্ডীপাঠ সব শেখান। সেতার শিখতে গেলে কম করেও দশ বৎসর সময় লাগবে। সুতরাং নাতনির জন্য ভাল পাত্র দেখে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। যতদিন বিবাহ না হচ্ছে ততদিন বাড়ির কাজ শেখানই ভাল।' বাবার কথা শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পালবাবু বললেন, 'যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন বাজাবে। উপস্থিত একটা খারাপ সেতার বাজাচ্ছে। আপনি কোলকাতায় গেলে আমার জন্য একটা সেতার দেখে পারসেল করে পাঠিয়ে দেবেন।' অগত্যা বাবা রাজী হলেন। পাল বাবু স্ত্রী এবং মেয়ে নিয়ে এসেছেন, সেইজন্য নিজের ঘর থেকেই কথাগুলি শুনলাম। বাবা মেয়েদের সামনে যাওয়া পছন্দ করেন না, জানি বলেই এড়িয়ে চলি।

আজ সতেরই ফেব্রুয়ারী। বাবা আশিসকে নিয়ে কোলকাতায় যাবেন। ট্রেনে যাবার দুঘণ্টা আগে থেকে তৈরী হয়ে তামাক খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে টিকে উল্টে দেন। এই টিকে উল্টে দিয়ে গড়গড়ার নল টানতে গিয়েই অঘটন ঘটল। আগুনের ফুলকি বাবার জামায় পড়েই কালো দাগ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার আওয়াজ, 'আরে শুয়ার কে বচ্চে। এমন ভাবে টিকে দেয় যে আগুনের ফুলকি পাঞ্জাবীতে এসে পড়ে।' যত দোষ নন্দ ঘোষ। এর মধ্যে মায়ের দোষ কোথায়? কিছু হলেই মায়ের উপর তার প্রতিক্রিয়া। বাবার কাছে যেতেই বললেন, 'লখছন ভাল নয়। যাত্রার আগে আগুনে কিছু পুড়ে গেলে বুঝতে হবে কোন অমঙ্গল হবে। এখন দেখ ভালোয় ভালোয় তোমাদের ভাগ্যে যদি ফিরতে পারি। আশিসকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখ কি হয়।' আশিসকে নিয়ে ট্রেনে চলে গেলেন। বাড়ি ফিরছি বিষণ্ণ মন নিয়ে। বাবা চলে গেলেই নানা সমস্যা। স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরবার পথে পালবাবুর বাড়ি পড়ে। পালবাবু আমাকে ডেকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গতকালের কথাগুলো বলে বললেন, 'ব্যাণ্ড পার্টিতে আনার খাঁ বলে যে সেতার বাজায়, তার কাছেই আমার মেয়ে মুন্নি শেখে। আনার খাঁ শেখাতে পারে না। বাবা যা বলেছেন সে কথা সত্যি। কিন্তু যতদিন না বিয়ে হয়, ততদিন একটু শিখলে মেয়ের একটা বাড়তি গুণ হবে। বিয়ে তো এখন ঠিক হয়নি। বিয়ে হলেও আমাদের নিয়ম, এক বছর পরে বিদায় করি। সুতরাং আপনি যদি দয়া করে ওখে শেখান। আপনি এখানে বাবার কাছে শিখছেন। আপনারও হাতখরচা

আছে। আমি আপনাকে যৎসামান্য কিছু শেখাবার জন্য দেবো। দয়া করে না করবেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার মেয়ে সেতার বাজাক। মেয়ে আমার লেখাপড়া করছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বই পড়েছে। কিন্তু কোন বিষয় জানতে চাইলে আনার খাঁ বলতে পারে না।' পালবাবুর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে মায়া হল। না বলতে সঙ্কোচ হল। কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন তা হলে তো চিত্তির। ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন যে কিছু টাকা দেবেন। উপরি কিছু টাকা হলে আমারই সুবিধা, যদিও আমার দাদা প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। কিন্তু নানা কারণে আমাকে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং উপরি টাকাটা কাজে আসবে বলে রাজী হয়ে গেলাম একটা শর্তে। পালবাবুকে বললাম, 'বাবাকে কিছু বলবেন না। যদি কোন মতে বাবার কানে যায় তাহলে বাবা রেগে যাবেন, যার ফলে আমার শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। বাবার অবর্তমানে এসে শিখিয়ে যাব।' পালবাবু বাবার মেজাজ জানেন। আমাকে আশ্বাস দিলেন যে কাউকে বলবেন না, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। পালবাবুর কন্যা মুন্নিকে আজ থেকে শেখাতে লাগলাম। বললাম, 'এখন কয়েকদিন রোজ আসব। তারপর একমাসের মত পাঠ দিয়ে দেব। সাধনা করতে হবে অন্ততঃ চার ঘণ্টা ধরে। বাবা এসে গেলে মাসে একদিনে যা দেখাব, একমাস ধরে তাই বাজাবে।' মুন্নির মাথা ভাল। বাড়ির পরিবেশ ভাল লাগল। পালবাবুর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। মুন্নিই বড়। বাড়ির শিক্ষা খুব ভাল। প্রাচীনপন্থী হলেও মেয়েকে বাজনা শেখাবার আগ্রহ আছে। মুন্নির সেতার দেখলাম কোলকাতা থেকে আনিয়েছে। প্রথম দিন শিখিয়ে বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জুবেদা খাতুন বললেন, 'মায়ের খুব ইচ্ছা আনারকলি দেখবার, সুতরাং আজ মা এবং আমাকে সিনেমাটা দেখাতে হবে।' মৈহারে তিন দিনের বেশী কোন সিনেমা চলে না। কিন্তু এ বইটা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলছে। বইটা এখনও চলবে। কিন্তু সিনেমাটা এখনও চলছে জানলেন কি করে? বুঝলাম, চাকরের মাধ্যমে সব খবর রাখেন। ইতিমধ্যে মা এসে নিজের ইচ্ছের কথা বলেন। মায়ের কথা এড়ান সম্ভব নয়। কত আশা নিয়ে সাহস করে বাবাকে বলেছিলেন। কিন্তু বাবা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এই সিনেমাটা শহরের শেষ সীমায়। সিনেমা থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত মৈহার হল ঘনবসতি এলাকা। কেউ দেখে যদি বাবাকে বলে তা হলে আমার পক্ষে বিপদ। মায়ের ইচ্ছার জন্য বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিলাম। রাত্রি নয়টার সময় যাবেন; সে সময় লোক কম থাকবে। বুদ্ধার জিম্মায় পাঠাতে পারি না। মনে মনে ঠিক করলাম, বাবার অবর্তমানে যদি বারবার এ রকম ফরমাস্ হয় তাহলে আমি যাব না। জানি মায়ের ইচ্ছা থেকে, মায়ের পুত্রবধূর ইচ্ছাই প্রবল। মৈহারের সিনেমায় মেশিন ভাল নয়। মাঝে মাঝেই কার্বন শেষ হয়ে যায়। যার ফলে একটা শো শেষ হতে কিছু বাড়তি সময় লাগে। সিনেমাটা বড়, সুতরাং শেষ হোল রাত্রি আড়াইটের সময়। মা খুব খুশী হলেন সিনেমাটা দেখে। মা বললেন, 'তোমার কৃপায় এমন আচ্ছা বই দেখলাম।' মার খুশীভাব দেখে ভাল লাগল।

বাবার যাবার পর সুরদাস তবলা বাজাতে আসে। মাঝে মাঝে জহর আসে বাজাতে। সিনেমা দেখে আসবার চারদিন পর, মা বললেন, 'বৌমার বইটা খুব ভাল লেগেছে। সেইজন্য একদিন আমাকে নিয়ে আবার যেতে চায়।' মাকে বুঝিয়ে বললাম, 'মৈহার ছোট

জায়গা। যদি কেউ বাবাকে বলে দেয় তাহলে বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। বাড়ির লোক বাড়িতেই থাকবে।' মা আমার পরিস্থিতি বুঝে বললেন, 'ঠিক আছে বেডা, দরকার নাই আবার সিনেমা যাবার।' আমি এ এক আচ্ছা বিপদে পড়লাম। বুঝলাম জুবেদা বেগম চটেছেন। চটুন ক্ষতি নেই কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

গুলগুলজীর বহুদিন থেকে ইচ্ছা সরোদ শিখবার। একটি সরোদ জোগাড় করেছে রাজকুমারের অনুগ্রহে। বাবা একটি সরোদ তৈরী করে দিয়েছিলেন মহারাজকে। রাজত্ব যাবার পরই মহারাজ জব্বলপুরে বিরাট প্রাসাদ বানিয়ে চলে গিয়েছেন। সরোদটা রেখে গেছেন। এখন সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন রাজকুমার। রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ থাকায় গুলগুলজী সরোদটি যোগাড় করেছে। গুলগুলজীকে সরোদ শেখাতে লাগলাম।

আলি আকবর এতদিন পরে চিঠি লিখেছে জুবেদা খাতুনকে। চিঠি দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার তলব হোল। কি ব্যাপার? বেগম সাহেবার কথা শুনে আমি অবাক। বললেন, 'নখড়ার চিঠি। চিঠিটা পড়ুন।' আমি কেন পড়ব? কিন্তু কে শোনে কার কথা। বললেন, 'আমি নিজের থেকে আপনাকে পড়তে দিচ্ছি। এ চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন, আশিসের বাবা কত বড় মন ভোলানো নেকা।' আলি আকবর সম্বন্ধে এই মন্তব্য শ্রুতিকটু লাগল। বললাম, 'ভবিষ্যতে দয়া করে এই ধরনের মন্তব্য আমার সামনে করবেন না।' আমার কথা শুনেই বেগম সাহিবা বললেন, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' কথাটা শোনামাত্র যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, 'যা বললেন, তার মানে বোঝেন? কথাটা কত অপমানসূচক তা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ভবিষ্যতে কখনও এ রকম কথা বলবেন না।' কথাটায় জোর দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারলাম। আর কোন কথা না বলে ঘরে চলে এলাম। মার সামনেই এ কথাটা হোল। যাবার সময় মা বললেন, 'চিরকাল আলি আকবরকে এই রকম ভাবে জ্বালিয়েছে। দারোগার ঝির কথার জন্যই, আলি আকবর এখানে আসতে চায় না।' মার এ কথা শুনে ফোঁস করে উঠলেন জুবেদা বেগম। বললেন, 'এ বাড়ির ছেলে আর জামাই দুই সমান। জামাই সরস্বতীর সঙ্গে কত কাণ্ড করেছে। দুজনেরই বাইরে এবং ভেতরে আলাদা। আমি স্পষ্ট কথা বলি বলেই খারাপ।' আমার মাথায় একটা নাম আটকে গেছে। রবিশঙ্করের জীবনে এই সরস্বতী আবার কে? মনে মনে অবাক হই। সেই সময় কল্পনাও করতে পারিনি সরস্বতী, যার আর এক নাম কমলা, রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর মনোমালিন্যের মুখ্য কারণ। অবশ্য এ কথা অনেক পরে জেনেছিলাম। আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শুনতে পাই, কিন্তু সামনে এলে তো অন্যরূপ দেখি। যতই এই ধরনের কথার মধ্যে থাকতে চাই না, ততই এই ধরনের নানা কথা আমাকে শুনতে হয়।

ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হতে তিন দিন বাকী। অথচ বাবার কোন চিঠি এখনও পেলাম না। এ রকম তো কখনও হয় না। এলাহাবাদে গেলে চিঠির প্রয়োজন হয় না। আমার জানা থাকে পাঁচ দিনে ফেরৎ চলে আসবেন। কিন্তু কোলকাতা, দিল্লী বা অন্য জায়গায় গেলে, গিয়েই চিঠি দেন। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম। দক্ষিণারঞ্জনকে চিঠি দিলাম, বাবার সমাচার জানিয়ে চিঠি দিতে। ইতিমধ্যে আমার সেজদা দিল্লী থেকে লিখেছে, 'মার্চ' মাসের শেষের দিকে দিল্লীতে

সঙ্গীতের কনফারেন্স হবে। দিল্লী এলে কনফারেন্স দেখতে পাবে।' উপরি লাভ হবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে এবং সেই ফাঁকে কিছু শিখে আসব অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলাম, বাবা এর মধ্যে এসে গেলেও কনফারেন্স শুনতে যাব শুনলে রাজী হবেন না। এই ভেবে সেজদাকে কারণ জানিয়ে লিখে দিলাম, 'যাওয়া সম্ভব হবে না।'

পরের দিন জুবেদা খাতুন আমাকে একটা খাম দিয়ে ঠিকানা লিখতে বললেন। চিঠিটা লিখেছেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি চিঠি লিখবেন না?' আমি চিঠি দিয়ে কি করব? চিঠি দিলে এখানকার মানসিক অশান্তির কথা লিখতে হয়। সেই চিঠি পেয়ে যদি কিছু লেখেন বেগম সাহেবাকে, তা হলে অশান্তি বাড়বে। এ ছাড়া অন্নপূর্ণা দেবীকে চিঠি লিখতে দেখিনি। মাসে মাসে তিনি সংসার খরচের জন্য টাকা পাঠিয়ে দেন। যদি চিঠি লিখি, উত্তর পাব না। চিঠি দিয়ে যদি উত্তর না পাই, আমার অহমিকাতে লাগে। তাই চিঠি লেখার পরিবর্তে বললাম, 'দিল্লীতে মার্চ মাসের শেষে কনফারেন্স হবে জানতে পেরেছি আমার দাদার কাছে। চিঠি যখন লিখছেন, তখন লিখুন মার্চ মাসের কবে থেকে কনফারেন্স হবে এবং রেডিওতে রিলে হবে কিনা?' আমার কথা শুনে বেগম সাহেবা বললেন, 'এত জিনিষ যার কাছে শিখলেন, তাঁকে একটা চিঠিও দেন না। এই আপনার গুরুভক্তি?' এর উত্তর আমার জানা ছিল কিন্তু চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। রবিশঙ্করকে টেলিগ্রাম করে, দিল্লীর কনফারেন্স কবে থেকে হবে জানতে চাইলাম। দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি পেলাম। বাবার আদেশে চিঠিতে জানিয়েছে যে বাবার জন্য চিন্তা না করতে। দক্ষিণারঞ্জনের বোন প্রতিমা রায়চৌধুরী বাবার কাছে রোজ শেখে। সময় মত ওরা জানাবে, কবে কোন গাড়িতে বাবা সাতনায় পৌঁছবেন, মৈহার আসবার জন্য। বাহাদুর চৌঠা মার্চ মৈহার আসবে। বাবা নিজে চিঠি দেন নি। মনে হয় বাবার শরীর ভাল নেই। বাবা কখনও তো এরকম করেন না। নিজে চিঠি না লিখে দক্ষিণারঞ্জনকে আদেশ করেছেন চিঠি লিখে জানাতে। পরের দিনই বাবার নিম্নলিখিত পত্রটি পেলাম ঃ

কলিকাতা
২৪-২-৫৪

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার প্রেরিত পত্র পাইলাম ঐদ্য আমি পাট্‌না যাইতেছি। দিল্লী একাডেমি কুমিটিতে জানাবে, কুমিটিতে এবার যাকে পুরস্কৃত করিবার মননিত করা হয়েছে সেই মত্‌ই আমার মৎ। এখানের গণ্ডগুল নিবারন হয়ে গেছে কুন চিন্তার কারন নেই।

বাহাদুর মাইহার আসিতেছে, তাহাকে যত্ন করে রাখিবে, আশীষকে এখানেই রেখে গেলাম, সে আনন্দে আছে তুমার মাকে জানাবে। এখানে যা যত্ন পায় বাটিতে তা পায় না আশীষ অতি যত্নে আছে।

আমি এবং সকলে ভাল আছি পালবাবুকে জানাবে তিনির মেয়ের জন্য সেতারের ফরমাইস দিয়েছি ১৫০্ মূল্যে। ১৫ দিনের মদ্ধে তৈয়ার করে পাঠাবে। বাজারের তৈয়ারি সেতার বেসি মূল্যে পাওয়া যায় ৪-সত ৫-সত টাকা মূল্যে। এত মূল্যে সেতার কেনা সম্ভব

নয় মনে করে আমার পরম আত্যিয় শিস্বের দ্বারা সেতার তৈয়ার করে পাঠাইতেছি ১৫-২০ দিন লাগিবে, পালবাবুকে বলিবে সেতার যেন ফেরত না আসে। দেরসত টাকার মদ্ধে যতটুকু পারা যায় সেইরূপ সেতার করে পাঠান হবে। খারাপ হবে না, ২ শ আড়াইশ মূল্যের সেতারের মতন হবে।

ইতি
বাবা
আলাউদ্দিন

রাত্রে রোজ রেডিও শুনি। আজ কোলকাতা রেডিও স্টেশন থেকে বাবার পঞ্চম এবং মাঝখাম্বাজ শুনলাম। সকলের গান বাজনা রেডিওতে শুনি, অনেক রাগ না শিখলেও নামের সঙ্গে পরিচিত। বাবাকে কখনও বাড়িতে বাজাতে দেখি না, অথচ রেডিওতে শুনলাম। এখন অবশ্য বাবার নূতন রাগ শুনলেও বুঝতে পারি এবং গৎটাও নকল করতে পারি। মনে মনে ভাবি যে এখনও কত শিখতে হবে! ভাতখণ্ডেজীর বইগুলো পড়ি। বহু রাগ শিখেছি, যার চলনের সঙ্গে ভাতখণ্ডেজীর কিছু কিছু মিললেও, বেশির ভাগের সঙ্গে চলন মেলে না। বাবা কোলকাতা যাবার আগে একদিন বলেছিলেন, এখন রাগাধ্যায় তালাধ্যায় এবং রাগের বিচার শিখতে হবে।

রবিশঙ্করের টেলিগ্রাম পেলাম। রবিশঙ্কর জানিয়েছে যে দিল্লীর সঙ্গীত কনফারেনন্স হবে সাতাশে মার্চ থেকে পাঁচদিন। এখন দেখি বাবা কি মেজাজে থাকেন। যদি বাবার ভাল মেজাজ থাকে, তাহলে বলব, 'আমার দাদা ডেকেছে।'

বাহাদুর এল মৈহারে। বাহাদুর দেখলাম ভয় পায় তার বৌদিকে। জুবেদা বেগম বাহাদুরকে ছোট থেকে দেখছেন। সুতরাং বাক্যবাণ প্রয়োগ করলে, বাহাদুর চুপ করে শুনে যায়। আজ পালবাবু বললেন, 'মুন্নির বিয়ে ঠিক হয়েছে নয়ই মার্চ। আপনাকে সে দিন বাজাতে হবে।' আমি নাকচ করে দিয়ে বললাম, 'বাবার অনুমতি পাই নি বাজাবার। তবে বাহাদুরের বাজনার ব্যবস্থা করে দেব। বাহাদুরকে কিছু টাকা দিতে হবে।' পালবাবু রাজী হলেন। বাহাদুরকে বললাম। বাহাদুর কিছু টাকা পাবে শুনে সানন্দে রাজী হোল। মুন্নি আমাকে দেখে কাঁদতে লাগল, বাজনা শেখা হবে না বলে। মুন্নিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'এক বছর পাঁচ ছয় ঘণ্টা রোজ রিয়াজ কর। বিয়ে হবার পর মৈহারে এলে বাবার কাছে শিখবে। বিয়ে তো মেয়েদের হবেই, এর মধ্যে কাঁদবার কিছু নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পাত্র সঙ্গীত ভালবাসে কিনা। পাত্রকে বলে দেব যেন সেতার বন্ধ না হয়।'

সংসারের খরচা বেড়ে গেছে। রবিশঙ্কর মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠায়। আলি আকবরকে লিখলাম, 'মাসে কম করে ষাট টাকা পাঠালে আশিসের মা নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে পারেন। বাবা টাকা রেখে গেছেন, কিন্তু বেশি খরচা হয়ে গেলে তিনি প্রথমে কিছু বলবেন না। কয়েকদিন পরেই তার জের পড়বে বাড়ির সকলের উপর। শেষকালে জের পড়বে আপনার চুপ চাপ থাকাতে।'

দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। আজ দিল্লী সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির চিঠিতে জানতে

পারলাম যে বাবাকে ফেলোসিপ দিয়ে সম্মান জানাবে। বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম। রবিশঙ্কর তিরিশ টাকা সংসারের খরচার জন্য পাঠিয়েছে। আজ পাল বাবুর মেয়ে মুন্নির বিয়ে। বাড়ির লোকেরা পর্দানশীন হলেও আমার অবারিত দ্বার। বরযাত্রী এল। ছেলেটি খুবই ভাল। ছেলেটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন কি জানতাম যে মুন্নির স্বামী কয়েকবছর পরেই জজ হবে, এবং সেই জজ বাবার বাড়ির উইল তৈরি করে দেবে। মুন্নির বিয়ের পর বাহাদূরের বাজনা হোল। তবলায় সহযোগিতা করল সুরদাস। পালবাবু বাহাদূরকে দুইশত টাকা দিলেন। তাঁর জামাইকে দেখে মনে হোল সঙ্গীতপ্রেমী। পালবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন জামাইয়ের। জামাইকে বললাম, 'মুন্নির প্রতিভা আছে, সঙ্গীতেও রুচি আছে, সুতরাং তার বাজনা বন্ধ করবেন না।' জামাই বললেন, 'আমাদের বাড়িতে সকলেই সঙ্গীতপ্রেমী। অতএব সঙ্গীত সাধনা বিঘ্নিত হবে না।' রবিশঙ্করের টাকাটা ভাল সময়েই এসেছে। রবিশঙ্কর টাকা পাঠালেই মার হাতে দিয়ে দিই। মা টাকাটা বৌমার হাতে দেন। পালবাবু বাড়িতে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। মা আমাকে শাড়ী দিয়েছিলেন মুন্নিকে দেবার জন্য। বেগমসাহেবা পাঁচ টাকা দিয়ে বললেন, 'মার নাম করে আর্শীবাদ হিসাবে দিয়ে দেবেন।'

মেগাফোন কোম্পানী থেকে বাবার রেকর্ডের জন্য রয়ালটির ছত্রিশ টাকা এল। বছরে দুই বার টাকা আসে। অবাক হয়ে যাই আলি আকবরের নির্লিপ্ত ভাব দেখে। বাড়িতে তার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের হাতখরচার জন্য টাকার কথা লিখেছিলাম। কিন্তু এ যাবৎ কোন উত্তর নেই। টাকার ব্যাপার নিয়ে জুবেদা বেগম কিন্তু বাহাদূরকে যে অনুযোগ করে তার দাদার সম্বন্ধে, তা শুনতে খারাপ লাগে।

আজ শরণ রানীর একটা চিঠি পেলাম। আলি আকবরের কাছে গণ্ডা বাঁধবে বলে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে পাঠিয়েছে। বাহাদূর আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজায়। বাবার কাছে কি শিখেছি জানতে চায়। বাহাদূরকে দেখে বুঝেছি, সকলের মন জুগিয়ে চলে। অন্যের সম্বন্ধে, পেছনে নানা অভিযোগ, কিন্তু সামনে অভিযোগের লেশমাত্র নাই। সারা দিন রাত মা এবং তার বৌদির সঙ্গে গল্প করে। এর ফাঁকে বাহাদূর, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করল। জানিনা কেন, এঁদের সম্বন্ধে আমার নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য কেউ যদি এদের সম্বন্ধে কিছু বলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। এই স্বভাবটা আমার মৈহারে যাবার পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত ছিল, যার জন্য বহু লোকের কাছে অপ্রিয় হয়েছি এবং নিজেই বিপদ ডেকে এনেছি। আজ লিখতে বসে সেই পুরোনো কথাগুলো মনের মধ্যে নড়াচাড়া করছে। আমি কি করেছি এবং এরা কি করছে। ইংরেজী বই লিখতে গিয়ে বহু লোকের সাথে কথা বলেছিলাম। ইংরেজী বই বেরোবার নয় বছর পরেই বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি। উপস্থিত যখন বাংলা বই লিখছি, একজনের কাছে শুনলাম, সে বরাবর শুনে এসেছে বাবার চিঠি লেখা এবং বাজার আমি করতাম। বাবার কাছে কোন শিক্ষা পাই নি। যারা এই কথা বলেছে তাদের কথা ভাবতেও দুঃখ লাগে। তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এটুকু বোঝেনি, যে এ কথা বলে তাদের গুরু উস্তাদ বাবাকে সংকীর্ণ মনের মানুষ বলে

প্রমাণ করেছে। যাক তার জন্য আমার দুঃখ নেই। বরাবর কবিগুরুর একটা কথা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কথাটা হল 'শত্রু সৃষ্টিই শক্তির লক্ষণ। যারা নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের বিষয়ে নানা কথা বলে তারা বলুক। স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই। তাতে বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু আরাম নেই।'

আমার হয়েছে বিপদ। বই লেখার ভাবনা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সর্বদা। কখন কোন ভাবনা এক সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে, আগে থেকে টের পাই না বিছানায় গভীর রাত্রে গা ঠেকিয়ে চোখ বুজতে না বুজতে দেখা মেলে। আবার সব সময় যে দেখা মেলে তাও নয়। আধ ঘুমের, এমন কি প্রায় জাগা অবস্থাতেও, মাথার মধ্যে একটানা কি সব হিজিবিজি চলতে থাকে। সচেতন মাত্র সেগুলো মিলিয়ে যায়। এক মুহূর্ত আগে কি ভাবছিলাম, চেষ্টা করেও মনে করতে পারি নি। এই পরিস্থিতিতে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে। ফলে সকালের দিকে মাথাটা অনেকক্ষণ ভার হয়ে থাকে। চা খাবার পর, হাত মুখ ধুয়ে স্নানটা সেরে উঠতে পারলে তবে সুস্থ বোধ করি। এটা উপস্থিত অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে আজকাল। কিন্তু এ সব তো অনেক পরের কথা। পরের কথা আগে বলছি কেন?

থাক যে কথা বলছিলাম। বাহাদূরের কাছে আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনবার পর, রাগ করে বললাম, 'ওদের সব বলে দেব।' আমার কথা শুনে বাহাদূরের অবস্থা খারাপ। বাহাদূর ঘাবড়ে গেল। বাহাদূর ক্ষমা চেয়ে বলল, 'এ সব কথা বলেছি, তা যেন বলবেন না।' বললাম, 'তার মানে মিথ্যা কথা বলছেন। সত্য হলে ভয়ের কি আছে?' বাহাদূর চুপ। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে এ সব কথা বলি নি। কিন্তু বই লিখতে গিয়ে আজ পুরোনো দিনের কথাগুলো চোখের সামনে ভাসছে। মনে হচ্ছে ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল।

আজ বিশে মার্চ। এতদিন পরে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

দিল্লী হইতে
১৮-৩-৫৪

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন জানিবে তুমার সব পত্র ও রসিদ পেয়ে যথাস্থানে পাঠিয়েছি। দিল্লীর প্রগ্রাম শেষ করেই মাইহার চৈলে আসিব, কলিকাতায় জামুনা। কলিকাতায় খুব মৎস্ব খেয়েছি, এখানে এসে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়েছে এজন্য বেস দুর্ব্বল হয়ে পরেছি, অর্শ রূগে রক্ত পরিতেছে, চিন্তার কারণ নেই, ২-১ দিনের মদ্ধেই সেরে যাবে।

একাডেমিতে যদি যোগদান করিতে হয়, তবে ২-৪ দিন দেরি হবে, তারপর আসিব। চেষ্টা করে দেখিব যদি একাডেমিতে যোগদান না করিলেও চলিবে কল্য ১৯ তাং প্রগ্রাম বাজিয়ে চৈলে আসিব। কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন রেডিওতে যা হয়েছে তাই, খরচ করে হাতে বিশেষ কিছু নেই। কলিকাতায় বড় একজন ডাক্তারের দ্বারায় আমাশয়ের চিকিৎসা আরম্ভ করেছি, শ্রীমান আশীষের, যাতে তার রূগ একে বারে নিম্মুল হয়ে যায়, প্রথম ইংজেকসন হয়ে গেছে সঙ্গে ঔষধ দিয়েছে দুই মাস সেবনের জন্য। আশীষ ভাল আছে।

এর আদাব তুমরা সকলে গ্রহণ করিবে। একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি, বাহাদুরকে যত্নে রেখ। ইতি—

বাবা আলাউদ্দিন।

পুনঃ : মাইহার আসার পূর্ব্বে টেলি করিব।

বাবার চিঠি পেয়ে বুঝলাম কোলকাতায় আরো প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু শরীর খারাপের জন্য দিল্লী থেকে সোজা মৈহারে চলে আসবেন। বাড়ীর পরিস্থিতি কি রকম যেন বদলে গেছে। বাড়ীর আবহাওয়া আমার কাছে অসহ্য লাগছে। ঠিক মত রিয়াজ হচ্ছে না। আলি আকবরের চিঠি এবং টেলিগ্রাম পেলাম। ছাব্বিশে মার্চ মৈহার আসছে। যাক এতদিন পরে বাড়ীর কথা মনে হয়েছে। বাবা মৈহার এসে, আলি আকবর এসেছিল শুনলেই মেজাজ ভাল হয়ে যাবে।

প্রত্যেক সংসারেই কিছু না কিছু সমস্যা আছে। বাবার সংসারেও সমস্যা আছে। বাবার সমস্যার কথা অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু বাবার অবর্তমানে যে সব সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয় তা বিচিত্র ধরনের। বাবার অবর্ত্তমানে সংসারের কয়েকটা ঘটনার সামান্য উল্লেখ করব।

বাবা লিখেছেন 'বাহাদুরকে যত্নে রেখ।' কিন্তু যত্নে রাখার বিভাগ তো আমার নয়। সে কাজ তো হোম ডিপারমেন্টের। কিন্তু আমার হয়েছে জ্বালা। সব বিভাগেই আমাকে বাধ্য হয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। একদিন সবে সকালে উঠে কলে মুখ হাত ধোবার জন্য যাচ্ছি, কানে এল গলার আওয়াজ। বুঝলাম, জুবেদা বেগম মাকে কিছু বলছেন। মায়ের গলার আওয়াজ শোনা যায় না। রেগে গেলেও মায়ের যে আওয়াজ বেরোবে, তা কাছে না গেলে বোঝা যাবে না। বাবা রেগে গেলে দূর থেকে আওয়াজ শোনা যায়। বাবা এবং মায়ের ভাষায়, দারোগার ঝি অর্থাৎ জুবেদা বেগমের আওয়াজ দূর থেকে শোনা যায়। জোর আওয়াজ শুনে বুঝলাম কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আমাকে দেখেই মা আমার কাছে এসে বললেন, 'গুলগুলকে ডেকে আন। তার সঙ্গে আমি দিল্লীতে অন্নপূর্ণার কাছে চলে যাব।' দূরে দেখলাম বাহাদূর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোন রকমে ব্যাপারটার সুরাহা করে দিলাম। সকালে নাস্তার সময় মা একটা রুমাল দিলেন। সত্যই মা কত সহজ এবং সরল। থমথম অবস্থায় সারা দিন গেল। সন্ধ্যার সময় সকালের কথা বেগম সাহেবা উত্থাপন করাতে, সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, 'আপনার এতবড় দুঃসাহস হয় কি করে, যার ফলে মার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করেন? ভুলে যাবেন না, আপনার মুখে যে খাবারটা আছে সেটা মায়ের পয়সায় সম্ভব হয়েছে। মার পয়সায় সব চলছে অথচ মার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করতে আপনার কোন রকমের সঙ্কোচ বা লজ্জা কিছুই হয় না। মাকে এ ধরনের কথা কি করে বলেন?' দূরে দেখলাম বাহাদূর দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদূরকে বললাম, 'আপনি এখানে থেকে নীরব হয়ে সব শুনছেন। এর প্রতিকার করতে পারেন না।' বাহাদূর মিনমিনে গলায় বলল, 'আমি এ সবের মধ্যে থাকি না।' আমি আর কথা বাড়ালাম না। পরের দিন শুনলাম, যেহেতু আমি কড়া কথা বলেছি, তার জন্য জুবেদা বেগম

খাবার খান নি। ভাল কথা বলায় যদি কারো রাগ হয়, আমার বলার কিছুই নাই। যে যা ইচ্ছা করুন, আমি তা বলে সাধতে যাব না। আমি কিছু বললাম না দেখে, বাহাদূর, মা এবং তার বৌদিকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি ঠিক করল। বাড়ীর সব কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি দেখে, আচমকা জুবেদা বেগম কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে, মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। মনে মনে ভেবেছেন আলি আকবর এলে যদি বলে দি। যে মুহুর্ত্তে তিনি ক্ষমা চাইলেন, আমি চুপ করে গেলাম।

আজ ছাব্বিশে মার্চ। সকালে বাবার চিঠি এল। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

দিল্লী হতে—

কল্যানবর,

শ্রীমানবাবা যতিন জানিবে দিল্লীতে যে একাডেমি নাটকে পরিতুসিক গুনিধিগকে দেওয়া হবে, সেই কুমুটিতে আমায় যোগদান করিতে হবে, এজন্য আমি আসিতে পারিব না, কুমুটির কার্য্য শেষ করে আসিব ৩১ তাং কুমুটি আরম্ভ হবে। আমার শরির একটু ভাল আছে চিন্তার কিছু নেই, আশীষের চিকিৎস্বা চলছে দুইমাস সমানে চিকিৎস্বা হবে, ঔষধপত্র কলিকাতা হতে এনেছি, মাত্র সপ্তাহে একটা করে ইংজেক্সন নিতে হয়, রূজ ঐষধ সেবন করে একটু কাহিল হয়ে গেছে চিন্তার কিছু নেই তুমর মাকে এর বিশয় জানাবে। আমার মা শ্রীমতি অন্নপূর্ণা খুব সেবা যত্ন করিতেছে, এরা সব ভাল আছে, সকলের প্রণাম তুমার মাকে জানাবে। এই সব শেষ করেই আসিব, বেণ্ডে যদি আমার দস্তখতের আবস্বক হয় তবে পাঠিয়ে দিবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি

বাবা

বাবার চিঠি পড়ে বুঝলাম বাবার এখন আসতে দেরী হবে। আলি আকবর রাত্রে মৈহার আসবে। সকালের ট্রেনে বাহাদূর জব্বলপুরে চলে গেল। গুলগুলের ভাই কাশী, জব্বলপুরে থাকে। কাশী একটা প্রোগ্রাম ঠিক করেছে বাহাদূরের জন্য। কাশী মাঝে মাঝে মৈহারে আসে। সিগারেট কোম্পানিতে চাকরি করে। মৈহারে এলেই বাবার জন্য চারমিনার সিগারেট কিনে নিয়ে আসে। বাবা এবং বাড়ীর সকলেই কাশীকে ভালবাসে।

রাত্রে আলি আকবর এল। আমি এসে অবধি এই প্রথম দেখলাম, আলি আকবর বাড়ির সকলের জন্য শাড়ী এনেছেন। ছেলেদের জন্য পায়জামা এবং জামার কাপড় এনেছেন। আমাকে একটা চাদর দিলেন। আলি আকবরের কিছু নিয়ে আসা, আমার মৈহারে থাকাকালীন এই প্রথম এবং শেষ। বাবা শুনলে খুশী হবেন। অবাক হলাম বেগমের ব্যবহারে। আমার সামনে সাধারণ কথার পর জুবেদা বেগম বললেন, 'আমি নীচে যাচ্ছি।' আলি আকবর রসিকতা করে বললেন, 'দেখ এবারে নখড়া।' পুরোনো বন্দিসের গতের মত 'নখড়া' শব্দটি, বাবার পরিবারে একচেটিয়া কথা। আলি আকবরের সঙ্গে নানা গল্প হল। কিন্তু বাড়ীর কোন ঝগড়ার কথা বললাম না। কোন কালেই বলি নি। মনান্তর, মতান্তর সমাধান বরাবর করেছি, কিন্তু চুকলী খেয়ে কারো মন কখনও ভারাক্রান্ত করিনি।

পরের দিনই জুবেদা বেগম বললেন, 'শরীর খারাপ।' মুখে আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে লাগলেন। তারপর শুরু হোল, আলি আকবরকে অকথ্য ভাষায় দোষারোপ। আলি আকবর নির্বিকার। মুখে কোন কথা নেই। আমি অবাক। আলি আকবর আমাকে বলল, 'শরীর খারাপ, ইচ্ছে করে বমি, এ সব হল নখড়া।' একরাত কাটয়ে দ্বিতীয় দিন রাত্রে তিনি বম্বে চলে গেলেন। পরের দিনই দুপুরে কাশীর সঙ্গে বাহাদুর মৈহারে এল। বাহাদুর ছেলেদের জন্য খেলনা এবং লাট্টু কিনে নিয়ে এসেছে দেখলাম।

আজ একত্রিসে মার্চ দিল্লীর কনফারেন্সের রিলে করে শোনাল। প্রথমে আহম্মদ জান খিরকুআর লহরা, তারপর রজব আলির গান হল। এরপর বাবা ও আশিসের একত্রে বাজনা শুনলাম। রাগ দেশ বাজালেন। আশিস পনের বছর বয়সে যা বাজাল, সর্বসাধারণের জন্য তা বিস্ময়। বাবার প্রহার আশিসের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আশিসের বাজনা শুনে মনে খুব আনন্দ হল। যতই হোক সে একাধারে ছাত্র এবং সম্পর্কে ভাইপো। এই বাজনার পর রোশনারার গান শুরু হল। বাবার ঘরে মা, ধ্যানেশ, বাহাদুর, জুবেদা বেগম এবং আমি প্রোগ্রাম গুলো শুনলাম।

৩৮

তেসরা এপ্রিল সকালেই টেলিগ্রাম পেলাম। বাবা রাত্রের ট্রেনে আসছেন আশিসকে নিয়ে। গাড়ী চার ঘণ্টা লেট। ষ্টেশনে এসে আমাকে দেখে খুশী হলেন। বাবার মেজাজ ভালই মনে হোল।

পরের দিন আশিসের কাছে শুনলাম যে কোলকাতায় আলি আকবর বাবাকে কোন টাকা দেন নি। দিল্লীতে অন্নপূর্ণা দেবীর অ্যানিমিয়া হয়েছে। রবিশঙ্কর চিকিৎসা করাচ্ছে। সকালে পোষ্ট অফিস যাবার আগে মা আমায় ডেকে বললেন, 'তোমার বাবা দেশের অর্থাৎ কুমিল্লার একটী মেয়ে, যে বর্তমানে কোলকাতায় থাকে, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন। তুমি বড়ো হয়েছো। বিবাহ করা প্রয়োজন।' এই কথা বলে মা আমাকে ফটো দেখালেন। মা বললেন, 'মেয়েটির বাবা মারা গিয়েছেন। মেয়েটি খুব কাজের মেয়ে। মেয়ের মা, তোমার বাবাকে অনুরোধ করেছে একটা ব্রাহ্মণ ছেলের সন্ধান দিতে। সেইজন্য তোমার বাবা আমাকে বলেছেন তোমার মতামত জানতে। এখন তুমি যা বলবে, তোমার বাবাকে গিয়ে বলব। যদি কোন কারণে এই মেয়েকে পছন্দ না হয়, তাহলে একটী সুন্দরী মেয়ে আছে যে গান বাজনা জানে। সেই মেয়েটির বাবাও অনুরোধ করেছেন, একটা ব্রাহ্মণ ছেলের খোঁজ করতে। তোমার বাবা তোমাকেই উপযুক্ত মনে করেছে।' মার কথায় বুঝলাম দুটি মেয়েকেই আমি জানি। প্রথম যে মেয়েটির ফটো দেখলাম, তাকে চোখে না দেখলেও তার কথা বহুবার বাবা এবং মার কাছে শুনেছি। দ্বিতীয় যে মেয়েটির কথা বললেন, তাকে আমি চিনি। মায়ের কথা শুনে, আমি হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারলাম না। মাকে বললাম, 'বাবাকে বলে দেবেন আমি ঠিক করেছি বিবাহ করব না।' সন্ধ্যায় বাবা নমাজ পড়ে আমাকে ডাকলেন। বাবার কাছে যেতেই মুখটা উল্টো করে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন তুমি বিবাহ করবে না? যে সময় বাইরে বাজাবে, নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হবে। ঋষি

মুনিরাও নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন নি, তা তুমি তো মানুষ। পুরুষের জন্য বিবাহের প্রয়োজন। প্রথম যে পাত্রীর ফটো তোমার মাকে দিয়েছিলাম, তার বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মেয়েটির বাবা বড় চিকিৎসক ছিলেন। তোমার মায়ের একবার মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছিল। মেয়েটির বাবা তোমার মাকে চিকিৎসা করে ভাল করেন। যদি কোন কারণে মেয়েটিকে পছন্দ না হয়, তাহলে দ্বিতীয় যে মেয়েটির কথা বলেছি, সে রূপে গুণে দেবী। শিক্ষিতা, গান বাজনা জানা মেয়েকে বিবাহ করলে, একসঙ্গে দুজনে বাজাবে। বিদেশে গিয়েও বাজাবে। ভাল বাজালে আমার গুরুর নাম হবে। আমি তোমার ধর্মপিতা। তোমার প্রতি আমার তো একটা কর্তব্য আছে।' বাবা হয়ত আরো কিছু বলতেন, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে প্রণাম করে বললাম, 'আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা নেই। আমি স্থির করেছি জীবনে বিবাহ করব না। আমার জীবনের স্বপ্ন আলাদা। কথার মাঝখানে বাবার পা ধরে আমার কথা বলাতে বোধ হয় বুঝলেন, সত্যিই আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে আমার কথাটা ভেবো।' প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে এলাম। এই ঘটনার পর বাবা আর কখনও আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন নি। আজও কোন বিবাহের কথা উঠলে, বাবার প্রস্তাবের ভঙ্গিটার কথা ভেবে আমার হাসি পায়। আমি ঘরে চলে আসবার পর, বাবা বাহাদূরকে 'শ্রী' রাগ শেখালেন। আমি বসে শুনলাম।

বাবা মৈহারে সবে দুইদিন এসেছেন। রাত্রে ডেকে আমাকে বললেন, 'একবার দেশে যেতে হবে। কতদিন আছি ঠিক নাই। দেশে গিয়ে সকলের স্বার্থের কথা ভেবে কিছু করবার আছে। এ ছাড়া বড়মেয়ে এবং বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করতে হবে। কোলকাতায় গেলে দেশে যাব। উপস্থিত যাবার দেরী আছে। সুতরাং যে কদিন আছি রোজ একটী রাগ শেখাব। উপস্থিত দুটি রাগ মা আমাকে দিয়ে সৃষ্টি করিয়েছেন। রাগ দুইটির নাম রেখেছি 'সুরসতি' ও 'শুভাবতী'। বাবা রাগ দুইটির চলন বলে সুরসতি শেখালেন। দুটি রাগই রাগশ্রীর সঙ্গে মিল আছে। বাবা বললেন, 'আগে সব রাগ শেখো তারপর রাগ তৈরী করবে।'

উপস্থিত বাহাদুর এসেছে। এক জন করে শেখাতে সময় লাগে। সুতরাং বাহাদূর থাকাকালীন কখনও আশিস এবং আমাকে একসঙ্গে শিখিয়েছেন, আবার কখনও একলা শিখিয়েছেন। সকালে আশিস এবং আমাকে গুণকলী শেখালেন। দুপুরে বসন্তের টিকে আশিসকে দেওয়া হলো। আশিসের হাতে ব্যথা। রাত্রে বাহাদূর এবং আমাকে শ্রী শেখালেন।

পরের দিন বাবা বললেন যোগিয়া না শিখিয়েই গুণকেলী শিখিয়েছি। আগে যোগিয়া শেখ তাহলে গুণকেলি বুঝতে পারবে। এরপর বাবা নিজের রচিত প্রভাকেলী শেখালেন। বাবা আজ আমাকে আলাদা 'শ্রী' শেখালেন। শ্রী রাগের কথা উঠলেই বাবা বলতেন 'শ্রী' রাগ অত্যন্ত কঠিন। বাজাতে পারলে 'শ্রী' ফুটে উঠবে আর নাহলে বিশ্রি। 'শ্রী' রাগের কোমল ঋষভ হল সাকারাত্মক ঋষভ।' হাত জোড় করে সাকারাত্মক ঋষভের অর্থ জানতে চাইলাম। বাবা হেসে বললেন, 'স' এর কাছেই কোমল ঋষভ আছে। এই শ্রুতি শুনে মাথায় গেঁথে ফেলতে হবে। এই শ্রুতি অত্যন্ত কঠিন। 'শ্রী'রাগ সকলেই গায় এবং বাজায়। কিন্তু 'শ্রী'রাগের কোমল ঋষভ শিক্ষা এবং শুনে, তবে আসে। সত্যই মারওার কেমল ঋষভ এবং শ্রীর কোমল ঋষভে আকাশ

পাতাল তফাৎ। এখন মনে হচ্ছে সঙ্গীতের মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ আছে। বুঝতে পারি না, কি নিয়ে মানুষ গান বাজনার এত অভিমান করে। মনে হয় সঙ্গীত হল মহা সমুদ্র।

বাড়ীতে অসুখ লেগেই আছে। হাসপাতালে যেতে হয়। একজনের পর একজন অসুখে পড়ে, আর আমার শিক্ষাও রোজ চলে। এক এক সময়ে মনে হয় বাড়ীতে এই যে বার মাস অসুখ আমার জন্য কারস্ না ব্লেশিং ইন ডিসগাইশ। বাবা 'ভাটিয়ার' শিখিয়েই বাজারে চলে গেলেন। বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। আমি ছেলেদের পড়াচ্ছি। আচমকা বাবা বললেন, 'আমার ঘরে যন্ত্র নিয়ে এসো।' আমি অবাক হলাম। সকালে শিখিয়েছেন আবার ডাকছেন কেন? এরকম তো হয় না। যাই হোক তার ঘরে গিয়ে দেখি, বাবা নিজের হাতে লেখা খাতা বার করে দেখছেন। বাবা বললেন, 'আজকাল মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। বাজারে যাবার সময় মনে হোল বোধহয় ভুল হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে এসে খাতা খুলে দেখলাম ভুল শিখিয়েছি। একটু তফাৎ আছে।' বাবা আবার ঠিক করে শেখালেন। অবাক হলাম। বাজারে যেতে যেতে রাগটির চিন্তা করে মনে হয়েছে, বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন। বাড়ীতে ফিরে এসেই খাতা দেখেছেন। এই বয়সে এত চিন্তা করেন কি করে?

রাত্রে বাহাদুরকে বললেন, 'পূর্বী রাগ জানস?' বাহাদুর জানে বলে মাথা নাড়াল। বাবা বাজাতে বললেন। বাজনা শুনেই বাবা বললেন 'এ হল আতাইয়ের বাজনা। প্রচলিত এই পূর্বীকে সহজ করে সকলেই বাজায়। আসল পূর্বীর চলন আলাদা।' বাবার কাছে আগেই শিখেছিলাম সুতারং বুঝতে পারলাম। অবাক হয়ে ভাবি, একটা রাগের কত রকম মত প্রচলন আছে।

আশিসের কাছে শুনলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বাজাবার সময় বাবা বকেছেন। আশিসকে বুঝিয়ে বললাম, 'এর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই। এত কম বয়সে বাবার সঙ্গে বাজাচ্ছিস এটা বড় কথা। বাবার বকুনি আর্শীবাদ বলে ভাববি। এবারে বাজাবার সময় আরো মনোযোগ দিয়ে বাজাবি, তা হলে দেখবি বাবা প্রশংসা করবেন। মনের মধ্যে জিদ আন।' আমার কথা শুনে আশিস চুপ করে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে বাবার কাছে যে রাগগুলো শিখলাম সেগুলো লিখবার কারণ আছে। কারণটা হল এই যে যারা সঙ্গীতের মধ্যে আছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, যে দীর্ঘদিন ইমন, ভৈরো এবং কাফি শেখবার পর, এক একটা রাগ তাড়াতাড়ি শেখা যায়। বাবার কাছে ছয় মাস শিক্ষা করেছি নিয়মিত।

আজ বাবা পুরিয়া ধ্যানেশ্রী শেখালেন। তিনি নূতন রাগ শেখাতে শেখাতে হঠাৎ আগে যা শিখিয়েছেন বাজাতে বলেন। পরীক্ষা করেন মনে আছে কি না। বাজনা শেখাবার সময়,একটা কথা বছরে চার পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যার জন্য কাশী না চলে যাই। আজ বাবা সেই কথাটি বললেন, 'আরে আরে, কাশীতে তুমি তো আমাকে আলাপ, ঝালা, শুনিয়েছিলে। এখন তো বুঝতে পারো আগে কি বাজাতে এবং এখন কি বাজাচ্ছ।' বাবা অক্টোবর মাসে যাবার আগে আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন, আনন্দ ভৈরো, যোগিয়া, শুদ্ধ সারং, মারবা, পুরিয়া, আশা, শ্যামকল্যান, বৃন্দাবনী সারং, ললিতা গৌরী, পরজ, পলাসী, সোহিনি, হামীর, কেদারা, মালুহা কেদারা, পঞ্চম, নারায়নী, কুলঙ্গ কাম্বাড়া, নাগধ্বনি

কাম্বাড়া, পটমঞ্জরী, খাম্বাবতী কাম্বড়া, আহির তোড়ি, ললিত পঞ্চম, সুরদাসী মল্লার, রামদাসী মল্লার, মঞ্জুরী মল্লার, ধুন্দুকি মল্লার, কুকুভ, অলকগুর্জরী। বেহাগের তরানা, ছর্জুকি মল্লার, ছায়া, মিঁয়াকি সারং, মধ্যমা সারং, বড়হংস সারং, সুর মল্লার, সাবনি কল্যাণ, ভগবতি। বাবা সকালে, বিকেলে এবং রাত্রে সময় অনুসারে ছয় মাস শিখিয়ে। তারপর নিজের লিখিত দুটো খাতা দিলেন। খাতা দিয়ে বললেন, 'এগুলো লিখে রাখো।' একটা খাতায় বহু অপ্রচলিত রাগ এবং একটি খাতায় কেবল নানা তালের ঠেকা এবং তবলা এবং মৃদঙ্গের বোল। বাবা বললেন, 'যদি দেশ থেকে ফিরে আসি, সেই সময় এইসব রাগ এবং তাল শেখাব। অবশ্য এ ঘটনা তো অক্টোবরের শেষে। বাজনা ছাড়া যে বিশেষ ঘটনা সেই কথা এখন বলি। কয়েকদিন পরেই প্রতি বছরের মত কোলকাতা থেকে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা এবং কাশীর থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা এল। বর্ষ ফল বাবা খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেন। বাবার যে সিংহ রাশি এ কথা, দেশের কে বলেছেন জানি না। সিংহ রাশির বর্ষ ফল দেখে বললেন, 'এ বছর ভাল নয়।' আমি পড়ে বললাম, 'ভাল এবং মন্দ দুই আছে।' পত্রিকার বর্ষফল বিচারে বাবার অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস আমি ভঙ্গ করতে চাই না কেননা আমার নিজস্ব আলাদা একটি মত আছে। বাবা আমার রাশিফল জিজ্ঞাসা করেন। নিজে পড়েন এবং তারপর আমাকে পড়ে শোনাতে বলেন। আমার রাশিফলের বার্ষিক ফলাফলে লেখা আছে, শিক্ষার্থীর জন্য বছরটি খুবই ভালো। বাবা এ কথা শুনে খুশী হলেন। কাশী থেকে আমি প্রত্যেক বছর তিনটি পঞ্চিকা আনাই। একটা বাবা এবং অপরটি জুবেদা বেগমকে দিই। আর একটা পঞ্জিকা রবিশঙ্করকে পাঠিয়ে দিই। যেহেতু আমার বাৎসরিক ফলাফলে লেখা আছে শিক্ষার্থীর জন্য বৎসরটি শুভ, সেইজন্য বাবা আমাকে রোজ শেখবার জন্য বললেন। মৈহারে একজিবিসান, সার্কাস প্রতিবছরই আসে। ছেলেদের এবারে দেখিয়ে আনলাম। বাহাদুরও আমার সঙ্গে গেল।

আজ বাংলা নববর্ষ। যেহেতু আলি আকবরের জন্মদিন সুতরাং বাবা সকালেই মাংস এবং জিলিপি কিনে আনলেন। বাবার মেজাজ আজ খুব ভালো। বাজার থেকে এসে শেখালেন। ভৈঁরো শেখাতে গিয়ে বললেন, 'আজ আলি আকবরের জন্মদিন। সুতরাং ভৈঁরো বাজাও।' ভৈঁরোর মসিদখানি, উজিরখানি এবং কয়েকটা দ্রুত গৎ শিখিয়েছেন। আলাপের পর বললেন 'কি গৎ শিখেছ শোনাও তো।' এক একটা করে শোনালাম। দুনী গৎ কয়েকটা শোনাবার পর একটা গৎ শেখালেন। গৎটি শিখিয়ে বললেন, 'আলি আকবরের জন্মদিনে এই গৎটা তৈরী করলাম।' ছেলের প্রতি বাৎসল্য কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। দুপুরে খাবার সময় বাবা বললেন, 'আলি আকবরের বয়স হল তিরিশ।' আসলে আলি আকবর বত্রিশ পূর্ণ করে তেত্রিশে পড়ল।

মজার কথা বাবা প্রতিবছর আলি আকবরের বয়স কম বলেন। বাবার হিসাবে ভুল হয়। কিন্তু আমি যে মুহুর্তে প্রকৃত বয়স বলি, বাবা বলেন, 'মনে থাকে না।' আর দুটো ব্যাপারে বাবার বছরের ভুল হয়। এক নিজের বয়স প্রতি বছর দুই বৎসর বেড়ে যায়। এ ছাড়া যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমি কতদিন শিক্ষা করছি, ভুলক্রমে বাবা বাড়িয়ে বলবেন। আজ বাংলা

নববর্ষে এই তিনটে ভুলই বাবা করলেন ডাক্তার গোবিন্দ সিং এর কাছে। সন্ধ্যার সময় বাবা পুরিয়া শেখালেন। আজ পুরোন বন্দিসের কঠিন দ্রুত গত শেখালেন। বাজনা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। ডাক্তার আসাতে বাবা আনন্দিত। বাবা বললেন, 'আজ তোমার ভাইয়ের জন্মদিন।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলি আকবরের বয়স কত হোল?' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তিরিস।' বাবাকে সকালে বলেছি, কিন্তু ভুলে গেছেন। শুধরে যখন বললাম তেত্রিশে পড়েছে, তখন বাবা বললেন, 'আরে আরে, ভুল হয়ে যায়।' এরপরই ডাক্তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা আপনার বয়স কত হোল?' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দুর্গা পূজার অষ্টমির দিন আমার জন্ম। আমার বয়স হল অষ্টআশী।' বাবা বয়সটা বাংলাতে বলে, তারপর বলতেন, 'আট কে পিঠে আট। নহি সমঝে।' অবাঙ্গালীরা বুঝত না। কিন্তু বাবার হিসাব অনুযায়ী বয়সটা আমি সংশোধন করে বলতাম, উপস্থিত বয়স চলছে পঁচাশী। বাবা সঙ্গে সঙ্গে দুই কানে দুটো আঙ্গুল দিয়ে বলতেন, 'আরে তোবা তোবা, হম মিথ্যা বোলা, হম মিথ্যা বোলা। হমরা উমর পাঁচাশি। নহি সমঝেঁ। আট কে পিঠে পাঁচ।'

ডাক্তারবাবু আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যতীন দাদা কত বছর আপনার কাছে শিখছে?' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সাত আট সাল হো গয়া।' বাবাকে সংশোধন করে দিয়ে বললাম, 'আমি পাঁচ বছর আপনার কাছে আছি।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আরে ভুল হো গয়া।' মৈহারে থাকাকালীন বাবার এই অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রতি বছর দেখতাম। বাবার প্রকৃত বয়স আমার মতে এখন তিয়াত্তর। কিন্তু বাবার মতে বার বছর এগিয়ে আছেন। বাবার মতে এখন পঁচাশি চলছে। মৈহারে থাকাকালীন, বাবার এই অনিচ্ছাকৃত বয়স বাড়িয়ে বলাটা সংশোধন করেছি। কিন্তু আমি মৈহার ছাড়বার পর বাবা নিজের বয়স বাড়িয়ে বলতেন। সেই ভুল সংশোধন করার সাহস বাড়ির পরিবারবর্গের ছিল না। এর পরিণামে ১৯৬২ সনেই বাবার শতবার্ষিকী পালিত হয়েছিল।

আলি আকবরের জন্ম দিন বলে, সারা দিন রাত বাবার মেজাজ খুব ভাল। কয়েকদিন পর বাবা বললেন, 'ধ্যানেশ ও বেবীর জন্য নূতন বই লাগবে না?' উত্তরে বললাম, 'ভেবেছিলাম কিছুদিন পরে বলব। যদি অনুমতি করেন তাহলে কাশীতে একবার গিয়ে বই কিনে আনি।' বাবা বললেন, 'কবে যাবে?' উত্তরে বললাম 'কিছুদিন পরে গিয়ে নিয়ে আসব।'

প্রায় পাঁচ মাস আগে বাবার রেডিও প্রোগ্রাম একদিনের জন্য এসেছিল। বাবা বাজাতে চান নি। আমি লিখে দিয়েছিলাম, বাবা কিছুদিন বাইরে থাকবেন সেইজন্য প্রোগ্রাম করবেন না। সত্যই বাবা বাইরে গিয়েছিলেন। পাঁচ মাস আগে এলাহাবাদ সঙ্গীত সভায় বাজিয়েছিলেন। পাঁচ মাস পরে আবার এলাহাবাদে রেডিও প্রোগ্রামে যাচ্ছেন। দু'দিনের প্রোগ্রাম, আগে মত দিয়েছেন বলে বাবা আজ যাচ্ছেন। স্টেশনে বাবার সঙ্গে গিয়েছি। ট্রেন আসার আগে, প্রতিটি জিনিষের রিয়াজ কি করে করতে হয় দৃষ্টান্ত দিয়ে গান গেয়ে বোঝালেন। বাবা এতটুকুও সময় নষ্ট করতে চান না, যে হেতু বাবার অনুপস্থিতিতে শিক্ষা হয়নি। এ ছাড়া আবার কিছুদিনের জন্য শিবপুর গ্রামে নিজের দেশে যাবেন, সেইজন্য সঙ্গীত শিক্ষার অবসরে সঙ্গীত নিয়েই আলোচনা।

বাবা যাবার পরই জুবেদা বেগম সিনেমায় নিয়ে যাবার জন্য আবদার করলেন। সিনেমার নাম 'জলপরী'। একটা কথাই বললাম, 'বাবা নাতিদের সিনেমায় নিয়ে যান। বাবাকে কিছু বলতে পারি না। এই বয়সে ছেলেদের এইসব সিনেমা দেখা ভাল নয়। আসলে একটা সিনেমা দেখলে পুনরায় দেখবার ঝোঁক বেড়ে যায়। সিনেমার দিকে ঝোঁক না বেড়ে সঙ্গীতে ঝোঁক বাড়লে মঙ্গল। এ ছাড়া আপনি কোন সাহসে সিনেমায় যেতে চান? বাবা যদি জানতে পারেন, তার পরিণাম আমার জানা আছে। যদিও বাড়ীর কাছেই 'জলপরী' এসেছে কিন্তু আমি নিয়ে যাব না।' আমার কথাটা শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে বাহাদূর এলো। বেগম সাহেবা আমার কথা শুনে চটেছেন। আমাকে কিছু বলতে না পেরে রাগটা পড়ল বাহাদূরের উপর। বাহাদূরকে বললেন, 'কয়েকদিন ধরে দেখে যাচ্ছি ছেলেদের সামনে নেশা করো। এত বড় হয়েছো অথচ বুঝতে পারনা, ছোটছেলে বড়দের দেখে শেখে। সুতরাং ভবিষ্যতে কখনও ছেলেদের সামনে নেশা করবে না।' জুবেদা বেগমের কথা বাহাদূর চুপ করে শুনে গেল। মুখে একটি কথা নেই। বেগম সাহেবা উপদেশ দেন বটে, কিন্তু যেহেতু আমি নিয়ে গেলাম না, সেইজন্য রাগ করে, ধ্যানেশকে নিয়ে 'জলপরী' দেখতে গেলেন।

সন্ধ্যে হয়েছে। মার একটি আওয়াজ পেলাম। গিয়ে দেখি ঘরে ধুনো দেবার সময় আগুন পড়ে গেছে। চাদর ধীরে ধীরে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে নেভালাম। মা বললেন, 'তোমার বাবা বাইরে গেছেন। ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে হয়। এভাবে আগুনে পুড়ে যাওয়া, খারাপ লক্ষণ। ধুনুচির থেকে যখন আগুন পড়ে গেছে বুঝতে পারিনি।' বাড়ীর আবহাওয়াটা কি রকম যেন বদলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি আমার থাকাটা একজনের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়েছে। যে বাবার সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না, সেই বাবা আমার পরামর্শ নিয়ে চলেন, এ জিনিষ এ যাবৎ কারো দেখা ছিলো না। এ ছাড়া বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন সেটা সুনজরে দেখছে না। সেইজন্য তলায় তলায় যে চক্রান্ত হচ্ছে বুঝলেও কিছু বলি না। বাড়ীর সকলের আচরণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেখাই যাক কতদূর গড়ায়। রেডিওতে বাবার 'ললিতাগৌরী' এবং 'শ্রী' শুনলাম। সকালে ভাটিয়ার শুনলাম, অন্য দিন কারেন্ট না থাকায় তিনটি কার্যক্রম শুনতে পেলাম না।

পাঁচদিন পর বাবা এলেন এলাহাবাদ থেকে। ট্রেন থেকে ধীরে ধীরে নেমে বললেন, 'এলাহাবাদে গিয়ে হোটেলে যাবার সময়, এক পাণ্ডার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কতার জন্য, একটি ছোট গর্তে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট লেগে ব্যথা করছে, যার জন্য চলতে কষ্ট হচ্ছে।' বাবা পায়জামার কাপড় উঠিয়ে দেখালেন। দেখলাম, কালসিটের দাগ পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বাবা বাজালেন কি করে? বাজনা শুনে তো মোটেই মনে হয় নি কিছু। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। বাবার অবর্তমানে আগুনে চাদর পুড়ে যাওয়া দেখে মা বলেছিলেন, 'অমঙ্গলের চিহ্ন। ভালোয় ভালোয় তোমার বাবা ফিরে এলে হয়।' বিজ্ঞান কুসংস্কার মানে না।

আজ সাতাশে এপ্রিল, সকালে গায়ে হাত পড়াতে জেগে উঠেই দেখি, একজন লম্বা ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক। অবাক হলাম। আমার ঘরে সকালে কে এই লোক? ভদ্রলোক নিজের

পরিচয় দিয়ে নাম বলে, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য। বাবার প্রথম ছাত্র। সাতনার যতীন ব্যানার্জি এবং তিমিরবরণ সমসাময়িক। যতীন ব্যানার্জির যদিও সঙ্গীতকে পেশা না করে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করে কিন্তু তিমিরবরণ বাংলাদেশে বাঙালীর মধ্যে প্রথম সরোদ বাদক। বাবার কাছে অনেক কথা শুনেছি। কোন চিঠি না দিয়ে আসাতে বাবার মেজাজ কি রকম বুঝলাম না। তিমিরবরণের কাছে শুনলাম, নিজের স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। এক বছরের চুক্তিতে পাকিস্থান যাচ্ছেন সিনেমার সঙ্গীত নির্দেশনার জন্য। বললাম, 'বাবা তো কুমিল্লা যাবেন।' আমার কথা শুনে বললেন, 'ভাই কোন রকমে বাবাকে একটু ম্যানেজ করো।' এই কথা বলেই আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন। উপরে গিয়ে দেখলাম তিমিরবরণের স্ত্রী ও ছেলেকে। তিমিরবরণের ছেলের বয়স কমই মনে হোল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদূর পড়েছো?' তিমিরবরণের স্ত্রী মণিকা দেবী বললেন, 'পড়াশোনায় মন নেই। নবম শ্রেণী অবধি পড়েছে। ছোট থেকে সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক আছে। ছোটবেলায় নিজের জ্যাঠতুতো ভাই ভোম্বল এবং নিজের বাবার কাছে শিখেছে। বাবা বোধ হয় শেখাবেন না। যেমন করে পার ভাই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করো।' মনিকা দেবীর কথা শুনে সমস্যায় পড়লাম। আমি উপরে এসেছি জানতে পারলে বাবার দৃষ্টিতে পড়ে যাব। একটি কথাই বললাম, 'বাবাকে বলবেন ছেলেকে নিয়ে অন্যত্র বাস করবেন, তাহলে হয়ত বাবা রাজী হয়ে যাবেন। বাবা নিজের বাড়িতে কাউকে রাখা পছন্দ করেন না।' এই কথা বলেই নীচে এসে হাত মুখ ধুতে চলে গেলাম। বাবা সকালেই বেরিয়ে গেছেন মাংস কিনতে। তিমিরবরণের কাছে শুনলাম বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাবা প্রথম দিন আপ্যায়ন করবেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন কি হবে? বাবা এলেন। তিমিরবরণকে দেখলাম বাবার সামনে ঠিক বলির পাঁঠার মত। বাজার থেকে ফিরে এসেই সব কিছু শুনে বাবা স্পষ্ট বললেন, 'চিরটা কাল জ্বালিয়েছ, আবার এখন ছেলেকে নিয়ে এসেছ? আমি কিছুদিনের মধ্যেই কুমিল্লা যাব। কবে ফিরব তার ঠিক নেই, সুতরাং এখন যাও।' তিমিরবরণের মুখে কোন কথা নাই। বাবা বললেন, 'ছেলেকে ডাক তো। কি বাজায় শুনি।' তিমিরবরণ ছেলেকে ফুটু বলে ডাকলেন। ফুটু এল। একটু বাজনা শুনেই তিমিরবরণকে বললেন, 'এই ছাতার বাজনা শিখিয়েছো?' বাবা আমার পরিচয় দিয়ে আকাশে ওঠালেন। মণিকা দেবী বাবার পা ধরে কেঁদে বললেন, 'আপনার ছেলে লাহোরে চলে যাবে কয়েক বছরের জন্য। আপনি যদি আশ্রয় না দেন তাহলে ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে.।' বাবা মেয়েদের সামনে কঠিন হতে পারেন না। বাবা একটু নরম হলেন। বাবা পরে আমাকে বললেন, 'এ কি জ্বালা? এদের বাড়িতে রেখে শেখান সম্ভব নয়।' সুযোগ পেয়ে বললাম, 'তিমিরবরণ নিজের ছেলে বউকে অন্য বাড়ী ভাড়া করে রাখবে।' মনে হোল, অন্য বাড়ীতে ছেলে বউ থাকবে শুনে বাবা একটু নরম হয়েছেন। বাবা বললেন, 'আমার প্রথম ছাত্র তিমিরবরণ। মৈহারে আলাদা বাড়ীতে থেকে শিক্ষা করত। তবে বৌমা কেঁদে বলছে, তিমিরবরণ পাকিস্থান যাবে। তবে বৌমাদের কি হবে? ঠিক আছে যত শীঘ্র পার এদের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে দাও।' বুঝলাম মণিকা দেবীর কান্নাই বাবাকে নরম করে দিয়েছে। তিমিরবরণ আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, নিজের মৈহার থাকাকালীন গল্প বললেন। তিমিরবরণের

কাছে কথায় কথায় জানলাম, উদয়শঙ্কর থেকে এক দুই বছরের ছোট। উপস্থিত বয়স বাহান্ন তিপান্ন হবে। অবাক হলাম, নিজের জন্ম সাল ঠিক মত জানেন না। নিজের ছেলের সম্বন্ধে বললেন, ভাল নাম ইন্দ্রনীল। আমাকে বারবার অনুরোধ করে বললেন, 'বাবার অবর্তমানে আমার ছেলেকে তুমি দয়া করে শিখিও।'

পরের দিন তিমিরবরণ বম্বে চলে গেল। আমার এখন বাড়ী খোঁজার পালা। বাবা বারবার বলছেন বাড়ী ঠিক করে দাও। কয়েক জায়গায় বাড়ী দেখলাম। পরে বাবার বাড়ীর কাছেই সিনেমার সামনে একটা বাড়ী পেলাম। বাড়ীটা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর পাশেই। কথা হোল চুনকাম করিয়ে দুইদিন পরে ভাড়া দেবে। বাবাকে বললাম। বাবা এ কথা শুনে খুশী হলেন। মণিকা দেবীর কাছে তাঁর নিজের জীবনের গল্প শুনলাম। সব কথা শুনে মনে হোল, শিল্পীর স্ত্রী হওয়া এক বিড়ম্বনা। বড়ই দুঃখের জীবন। সারা জীবন মুখ বুজে কষ্টকেই জীবনের সাথী বলে মেনে নিয়েছেন। জীবনের শেষ ইচ্ছা, ছেলে যদি মানুষ হয়। কথায় কথায় জানলাম, ছেলের বয়স আঠার বৎসর। আমাকে বারবার বললেন, 'তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি ভাই একটু কষ্ট করে ফুটুকে শিখিও।' মণিকাদেবীর আন্তরিক কথা শুনে বললাম, 'আমি শেখালে বাবা রাগ করবেন। বাবার অবর্তমানে যতটা পারি শেখাব।' বাড়ীতে কোন লোক একদিনের বেশী থাকলেই বাবার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সামনে মণিকাদেবীর পাছে কষ্ট হয়, সেইজন্য বারবার বৌমা বলে অভ্যর্থনা করছেন, কিন্তু রাত্রে রাগটা প্রকাশ পেল। বেবীকে শেখাবার সময় অকারণে প্রহার করলেন।

আজ মণিকা দেবীর তৃতীয় রাত্রিবাস হবে। সকালেই বাবা মাংস এবং জিলিপি কিনে আনলেন। এ দিকে বাহাদূরকে প্রায়ই দেখছি আশিসকে নিয়ে সিনেমায় যায়। বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। অনেকের স্বভাব দেখছি কারো সঙ্গে সদভাব দেখলে পছন্দ করে না। তার ফলে দু'পক্ষের মন ভারি করে। বাড়ীতেও সেই জিনিষটা হচ্ছে কিছুদিন ধরে বুঝতে পারছি। জুবেদা বেগম এবং মার মত শান্তপ্রকৃতির মধ্যেও পরিবর্তন দেখছি। মনে মনে বুঝতে পারলেও কিছু বলি না। আলি আকবর এলেই এর প্রতিকার হবে। চুপ থাকাই ভাল। কয়েকদিন নিয়মিত বাবার চোখ বাঁচিয়ে, আশিসকে নিয়ে বাহাদূরের সিনেমা যাওয়া ভাল লাগছে না। বাহাদূরকে বললাম, 'নিজে কাকা হয়ে ভাইপোকে নিয়ে এই সব সিনেমা দেখছেন?' বাহাদূরের উত্তর শুনে অবাক। বাহাদূর বলল, 'আশিসের মায়ের নির্দেশেই সিনেমায় নিয়ে যাই।'

বাহাদূরকে বললাম, 'বাবা জানতে পারলে পরিণাম কি হবে ভাবতে পারেন? পত্রপাঠ আপনাকে বিদায় করবেন।' বাহাদূর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আর সিনেমায় নিয়ে যাব না।' বুঝলাম সিনেমা যেতে বারণ করেছিলাম বলেই জুবেদা বেগম জোর করে সিনেমায় পাঠাচ্ছে। অকারণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছে। মনটা ভারাক্রান্ত। বিকেলে মার কথা শুনে অবাক হলাম। মা বললেন, 'তোমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল 'যতীন এত গম্ভীর কেন? কি হয়েছে? ওর মুখ দেখে বুঝেছি কিছু হয়েছে।' তোমার বাবার উত্তরে বলেছি, 'বেডা তো বরাবরই গম্ভীর।' মার কথা শুনে বাবার দূরদৃষ্টি দেখে অবাক হলাম।

আজ মণিকা দেবী সকালেই ছেলেকে নিয়ে নূতন ভাড়া বাড়ীতে চলে গেলেন। তারপরেই সুপারিণটেন্ডেন্ট অফ এডুকেশন এলেন। মৈহার ব্যাণ্ডের জন্য কি কি জিনিষ লাগবে জানতে চাইলেন। বুঝলাম লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে বাবার ভাষণের পর, সকলে একের পর এক আসছেন। কখনও ব্যাণ্ডের জন্য এবং কখনও সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলার জন্য। দুপুরবেলা বাবা মাকে বললেন, 'আজ সবে বৌমা নাতিকে নিয়ে নূতন বাড়ীতে গেছে। কি রান্না হয়েছে ভগবান জানেন। তুমি মাংস যে রেঁধেছ, তার থেকে কিছু আশিসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দাও।' বাবার কথা শুনে হাসি পেল। মহিলা যে কোন বয়সেরই হোক না কেন, আমার তার সামনে যাওয়া কিংবা কথা বলা পছন্দ করেন না। এতদিন জানতাম পথে নারী বিবর্জিতা। কিন্তু বাবার কাছে এসে বুঝেছি, নারীর কাছে যাওয়া বা কথা বলাও নিষিদ্ধ। বাবার এই স্বভাব জানি বলেই, বাড়িই হোক, বাবার সামনে আর বাইরেই হোক কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলতাম না।

অন্যের কথা শুনে বাড়ীতে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, জুবেদা বেগম এবং মায়ের মধ্যে, তার ইঙ্গিত বুঝলাম একটি কথায়। যদিও মা কোন কথা বলেন না। কিন্তু সরল মাকে যদি কেউ ভুল বোঝায় তাহলে মা সহজেই বিশ্বাস করবেন। কিন্তু মাকে যে সময়ে আমি কিছু বোঝাই, সঙ্গে সঙ্গে মার মন পরিবর্তন হয়ে যায়।

দু'দিন হল মণিকা দেবী চলে গেছেন ভাড়া বাড়ীতে। পোষ্ট অফিসে যেতেই বাড়ীটা পড়ে। পোষ্ট অফিস থেকে ফিরছি। মণিকা দেবীকে দেখলাম ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ডেকে বললেন, 'ঠিকানাটা পোষ্টমাষ্টারকে বলে দিও যার ফলে চিঠি পেতে অসুবিধা না হয়।' খুব আপনজনের মত ভেতরে ডাকলেন। বললেন, 'ফুটুকে একটু সময় করে শিখিও।' এই কথা বলে আমাকে একটা প্লেটে চচ্চড়ি দিয়ে বললেন, 'দেখতো কেমন হয়েছে।' এই সহজ সরল ব্যবহার খুব ভাল লাগল। চচ্চড়ি খেয়েছি, সুতরাং ঋণী হয়ে থাকতে চাইনা। বাবার কাছে থেকে শিখেছি। সহজে কারো কোন উপকার নিতে চাই না, কিন্তু তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে যখন সাধারণ খাবার খেতে দিলেন, না করতে পারলাম না। ফুটুকে বললাম, 'মূর্চ্ছনা বাজাও তো।' ফুটু আকাশ থেকে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'মূর্চ্ছনা কি?' এবারে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তিমিরবরণ বাবার কাছে শিখেছেন, অথচ ছেলে মূর্চ্ছনা জানে না। মূর্চ্ছনা বললাম। মণিকা দেবীর অগ্রহে বললাম, 'রাত্রে এসে একটু একটু শেখাব। বাবাকে শেখাবার কথা বলবেন না।' ছেলের চেয়ে, ছেলের মায়ের আগ্রহ বেশী দেখলাম। ছেলের মা, ছেলের জন্য সব কিছু ছেড়ে এসেছেন। যাবার সময় ফুটু আমাকে বলল, 'যতীনদা, আমি আমার দাদা ভোম্বলদার কাছে প্রথম শিখেছি। পরে বাবার কাছে শিখেছি, কিন্তু এই জিনিষ তো কেউ বলে নি।' ছেলের কথা শুনে মণিকা দেবী ছেলেকে ধমকে বললেন, 'কাকে কি বলে ডাকতে হয় তাও শিখিস নি? কাকাকে দাদা বলে ডাকছিস।' ব্যাপারটা আমি সহজ করে বললাম, 'মৈহারে এতদিন আছি, অথচ দুইএকজন ছাড়া আমার নাম কেউ জানে না। সকলেই আমাকে দাদা বলে ডাকে।' ফুটুকে বললাম, 'দাদা আর কাকাই বল, আসলে বাজাতে হবে। যা শেখাব তা যদি না বাজাও তা হলে শেখাব না।' সেইদিন

থেকে ফুটু অর্থাৎ ইন্দ্রনীলের 'দাদা' ডাকই চালু হোল এবং বরাবরের জন্য ওই ডাকই বহাল রইল, এবং আমার শিক্ষা দেওয়া শুরু হোল। একটা জিনিষ দেখলাম, মণিকা দেবী ইন্দ্রনীলকে শাসনের মধ্যে রাখেন। মৈহার থাকাকালীন দু'বছরের বেশী ওকে শিখিয়েছি। কিন্তু আজ লিখতে বসে সেই পুরনো দিনের কথা ভেবে কত কথাই মনে আসছে। ইন্দ্রনীল সে সময় আঠারো বছরের ছেলে। মাকে ভয় পায়। প্রথম দিন শিখিয়ে বাড়ী চলে এলাম। কিন্তু যে মা তার ছেলের জন্য এত স্বার্থত্যাগ করে মৈহারে গেলেন, এত কষ্ট করলেন, শেষ জীবনে ছেলের কাছে কি পেলেন?

বাবার কাছে ইন্দ্রনীলের শিক্ষা এখনও শুরু হয়নি। তার মধ্যে রমজান পড়ল। সুতরাং বাজনা বন্ধ। বাবার মেজাজ এবার সপ্তমে চড়বে। ছোট একটা ঘটনা দিয়েই রমজান পর্ব শেষ করব। সারাদিন উপবাস। সকালে আমায় বললেন, 'আজ তুমি ফল কিনে আনো।' পরমুহূর্তেই বললেন, 'ফল কিনবার দরকার নেই।' বুঝলাম, আলি আকবরের উপর রাগ। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় জল খাবেন। গরম কাল। আমি বরফ কিনে নিয়ে এলাম। বাবা বরফ দিয়ে সরবৎ খেয়ে খুব আনন্দিত হলেন, কিন্তু পরমুহুর্তেই বললেন, 'বরফ কোথা থেকে এল।' আমি বললাম, 'বাজার থেকে নিয়ে এসেছি যেহেতু সারাদিন উপোস ছিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা চটে গিয়ে বললেন, 'কে তোমাকে বরফ আনতে বলেছে?' আমি চুপ, বাবা সরবৎ খেয়ে তামাক খেতে লাগলেন। তামাক খেয়ে বাবার মেজাজ বদলে গেল। যতই হোক তামাকের নেশা। সারাদিন বাবা তামাক খান অথচ আজ সারাদিন খেতে পারেন নি। সারাদিনের পর তামাক খেয়ে আমাকে বললেন, 'যে রকম সুখ তুমি দিলে, খুদা যেন তোমাকে সেই রকম সুখ দেন। তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ করেন। বাহাদূরকে ডেকে বললেন, 'তুই ও আলি আকবর আমার কাছে কেবল নিজের মতলবে শিক্ষা নিয়েছিস, কিন্তু সেবা? দেখ যতীন সংসারের পুরো ভার নিয়েছে।' বাবা অনেক কথা বলে গেলেন। মাথা নীচু করে বাহাদূর শুনল। রাত্রে ইন্দ্রনীলকে গিয়ে বললাম, 'এক মাস বাবা শেখাবেন না। এই এক মাস খুব রিয়াজ করো। এই একমাসে যা শেখাব, ঠিক যদি রিয়াজ করতে পারো, তাহলে বাবার কাছে বকুনি কম খাবে।' ইন্দ্রনীলকে কয়েকটা পালটা বললাম। তারপর বাড়ীতে এসে নিজের রিয়াজ করলাম।

আজ অবস্থা বেগতিক দেখে, প্রায় দুই মাস থাকবার পর বাহাদূর চলে গেল। দিল্লীর থেকে শুভর পৈতের জন্য চিঠি এল। বাবা বললেন, 'একশো টাকা পাঠিয়ে দাও।' বাবার মেজাজ খারাপ দেখে আলি আকবরকে চিঠি দিলাম। আলি আকবরকে টাকা পাঠাবার জন্য লিখলাম। রোজার সময় টাকা পেলে, যদিও বাবা টাকা নিজের বৌমাকে দেবেন, তাহলেও মনে মনে খুশী হবেন। শুভর পৈতের জন্য, আমার পক্ষ থেকে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

পরের দিন, মনে হোল আমি যেন লটারির টিকিট পেলাম। যে ছেলেটা আমার সঙ্গে তবলা বাজায়, সেই জহরের সঙ্গে দেখা হল পোষ্ট অফিসে। আমাকে হঠাৎ প্রণাম করে একশো টাকা দিয়ে বলল, 'আমার দাদা খুব খুশী হয়েছে, কেননা তবলা বাজাচ্ছি বলে, এবং এর জন্য তিনি প্রণামী হিসাবে এই টাকা দিতে বলেছেন।' একশো টাকা আমার কাছে

আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত। মনে হোল হাতে স্বর্গ পেয়েছি। পাঞ্জাবী, পায়জামা ছিঁড়ে গিয়েছে। একটা পায়জামা এবং পাঞ্জাবী তৈরি করতে দিলাম। রোজা চলছে। হঠাৎ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ, বাবা পায়জামা পাঞ্জাবী পরে বেরোলেন। অবাক হলাম, এ সময় কোথায় যাচ্ছেন।' সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যায় সরবত খাবেন। বোধ হয় কিছু কিনতে যাবার জন্য বেরোচ্ছেন ভেবে বললাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছেন? কিছু আনবার হলে আমাকে দিন নিয়ে আসব।' উত্তরে বাবা বললেন, 'ব্যাণ্ডে গিয়ে দেখি সকলে এসেছে কিনা। রোজার জন্য একমাসের ছুটি দিই। কেবল অনার খাঁকে। অন্য সকলে জানে আমি যাব না, সুতরাং হয়ত সকলে ফাঁকি দিচ্ছে। সব তো কামচোর। তাই দেখতে যাচ্ছি সকলে আসে কি না।' বাবার সব দিকে খেয়াল আছে। বাবার কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ পরেই বাবা ফিরে এলেন।

এখন শিক্ষা বন্ধ। দিন চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রনীলকে রোজ রাত্রে শেখাই। মনে মনে ভাবি কতদিনে শিক্ষা শেষ হবে। এখন বুঝতে পারি শেখবার অনেক কিছু আছে। সঙ্গীত কতটা হয়েছে জানি না, কিন্তু বাবার মত কয়েকটা অভ্যাস আমি গ্রহণ করেছি। বাবা মৈহারে এতদিন আছেন অথচ কোন জায়গায় যান না। পরনিন্দা, পরচর্চা কখনও শুনতে পাই না। সত্য কথা বলা এবং মনের কথা মুখের উপর বলা, এইসব গুণগুলো যদিও ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল, কিন্তু মৈহারে আসবার পর আমার দৈনন্দিন জীবন যেভাবে কাটে, ভাবলেও অবাক লাগে। একদম ঘরকুনো হয়ে গিয়েছি। মৈহার ছাড়ার পর এই অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারিনি, যার ফলে আজকের যুগে অপাংক্তেয়ের দলে গণনা করা যায়। আজকের যুগে সত্য কথা বলা, মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলা অচল। আজকাল দেখি যে মৌন থাকে—হাঁতে হাঁ করে, এবং নাতে 'না' করে, তারাই সকলের কাছে প্রশংসার পাত্র। অবশ্য এ জ্ঞানটা মৈহার ছাড়ার পর হয়েছে। বাবার কাছে থাকাকালীন বুঝতে পারিনি কত সুন্দর আশ্রমের মধ্যে ছিলাম। আমাকে অতীতটাই প্রেরণা দেয়, কিন্তু বর্ত্তমান? আজকাল কেউ অতীতকে ভাববার সময় পায় না। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত। আমার মত সকলে তো আর আহাম্মক নয়।

রোজার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল সেই কথাই বলি। আমার চিঠি পেয়ে আলি আকবর চিঠি দিয়েছে। চিঠি খুলে অবাক। আলি আকবরের দ্বিতীয় স্ত্রীর অপারেশন হবে, সেইজন্য ইচ্ছা থাকলেও আসতে পারছে না। টাকা সম্বন্ধে নীরব। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এদিকে রোজা চলছে। রোজার জন্য সকালে বাজাই না। আশিসদের এক মাস বাজনা বন্ধ। রাত্রে আমি বাজনা বাজাই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সঙ্গীতের বই, কবিতার বই, কথামৃত পড়ি। দুপুর বেলায় আশিস এসে বলল, 'মা সঞ্চয়িতা চাইছে পড়বার জন্য।' চিরকালই বই আমার কাছে যক্ষের ধনের মত। বই কাউকে পড়তে দিয়ে, আর ফিরে পাই নি। এমন আগে হয়েছে। সেইজন্য আমার প্রিয় বই কাউকে দিই না পড়বার জন্য। উপযুক্ত সমঝদার যদি কেউ চায় তবে তাকে সামনে পড়তে দিতে পারি। কিন্তু এখানে সেই রকম কেউ নেই। মৈহারে একমাত্র বাবা এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছি। কিন্তু এই বই কখনও বাবা বা

অন্নপূর্ণা দেবী চান নি। অবশ্য এরা যদি চাইতেন, না করতাম না। কিন্তু জুবেদা বেগম সঞ্চয়িতা পড়বে? তার বিদ্যা তো আমার অজানা নয়। সেই জন্য আশিসকে বললাম, 'তোর মাকে গিয়ে বল সঞ্চয়িতা ভাল লাগবে না, মানে বোঝা শক্ত।'

প্রফেসার রাধাকৃষ্ণন্ যেমন দার্শনিক ছিলেন তেমনি অসাধারণ বাগ্মী। তিনি মদনমোহন মালব্যের স্মৃতিসভার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'বড়কে নকল করা ভাল, তবে একটা কিন্তু আছে। এই কিন্তুটা হলো নকলটা যেন ঈর্ষাবশত না হয়, উন্নতির জন্য হয়।' জুবেদা বেগমও অন্নপূর্ণা দেবীকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া কঠিন। ভাল গৃহিনী হতে পারতেন। কিন্তু তার জন্য সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। রবিভ্রমরের বিষ জ্বালা সহ্য করে অন্নপূর্ণা দেবী বিবর্ণ হন। কিন্তু নীলকণ্ঠ শিব স্বরূপ স্বামী, আলির নিন্দায় যেভাবে তিনি মুখর হন তাতে খারাপ লাগে। কিন্তু সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যাপারটা তখন হয়, যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাটানি হতে দেখি। প্রতিদিন সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটার মতো জীবন আরম্ভ হ'তো, শেষ হ'তো ঘুরে ফিরে আবার সেই সকাল বেলাতেই এসে। চব্বিশ ঘণ্টা ঘূর্ণমান দিনকে চোখে দেখতে না পেলেও, নিজের ধান্ধাতেই ঘুরে চলেছে। কিসের জন্য অমন করে ঘুরছে তা নিজেও কোনদিন জানতে পারি নি। আমার বেলায় তাই হয়েছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটা না একটা কাজ লেগেই আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘুমোবার সময়টা ছাড়া। একটু যে পড়ব আপন মনে, তারও উপায় নেই। কিন্তু তার মধ্যেও মাথা খারাপ হয়ে যায়, যখন দেখি পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য সঞ্চয়িতা চেয়ে বসে পড়বার জন্য।

যে শ্রদ্ধা নিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী সঞ্চয়িতার কবিতা শোনেন, তার অনুকরণে পাতা উল্টে সঞ্চয়িতাকে বিবর্ণ করার জন্য জুবেদা বেগমের ওটি চাই। কেন রে বাবা? তাঁতির তো তাঁতই ভালো। এঁড়ে বাছুর নিয়ে কি হবে? কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

কিছুক্ষণ পরে আশিস এসে বলল, 'মা অত্যন্ত চটে গেছেন আপনার কথায়।' মা বলেছেন, 'আপনি কি নিজেকে খুব পণ্ডিত বলে মনে করেন?' আশিসকে কিছু বললাম না। আজ রাত্রে রোজা শেষ হবে। বাবা এলাহাবাদ রেডিওতে বাজাতে যাবেন। সকালে তিনি চলে গেলেন। বাড়ী ফিরবার সময় মনে হোল, গতকাল যে কথা আশিসকে বলেছি তার প্রতিক্রিয়া আজ কি হবে ভগবানই জানেন। থাক তার জন্য আমার চিন্তা নাই। যা হবার তা হবে। আমার বিবেক যা বলে তাই আমি বলি। যা সত্য তা বলবো। বাবা যাবার পরই মণিকা দেবীর কথায়, বাড়ীর সকলকেই সিনেমা দেখাতে পাঠালাম। সিনেমার নাম 'চৈতন্য মহাপ্রভু'। হিন্দি সিনেমা। একমাস রোজা গেছে বলেই সিনেমায় যাবার নামে আপত্তি করলাম না।

একমাস রোজার সময়ে, ইন্দ্রনীল, দ্যুতিকিশোর এবং মুন্নিকে শিখিয়েছি। মণিকা দেবীর কড়া শাসনেই ইন্দ্রনীল বাজিয়েছে। মণিকা দেবী যদি ছেলেকে কড়া শাসনের মধ্যে না রাখতেন তাহলে ইন্দ্রনীল বিপথে চলে যেত। ইন্দ্রনীল রিয়াজ কম করলে কিংবা কোন বেচাল হলেই আমাকে বলতেন। কোন কথা লুকোতেন না, যার ফলে আমি বকেছি। ইন্দ্রনীলকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করে বলেছি, 'তোমার মা সারাজীবন সুখের মুখ দেখতে পেলেন না। সব কিছু পরিত্যাগ করে তোমাকে মানুষ করবার আশা নিয়ে এসেছেন। অথচ

তুমি যদি উড়ে উড়ে বেড়াও তার চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? এই ধরনের কথা যদি শুনি, তা হলে আর শেখাব না।' আমার কথা শুনে তারপর ইন্দ্রনীল ধাতস্থ হয়েছে। আমার কথামত রিয়াজ করেছে। দ্যুতিকিশোর, ইন্দ্রনীল এবং মুন্নিকে শেখানোর ফলে আমার সিনেমা দেখা বন্ধ হয়েছে।

বাবা এলাহাবাদ যাবার দুদিন পরেই বাড়ীর আবহাওয়া বদলেছে। সহজ, সরল মায়ের কথাতে বুঝলাম, ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে একজন মিথ্যা করে বলেছে, আমি নাকি মা এবং জুবেদা বেগম সম্বন্ধে নানা কুকথা বলেছি। অথচ আমার কাছে ঠিক উল্টো কথাই বলেছে। আমাকে বলেছে মা এবং জুবেদা বেগম আমার সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন। দুষ্টের ঈর্ষার কথা আমি বুঝেছিলাম। নিজের থেকে কেন আমি কিছু বলতে যাব? ভেবেছিলাম মা এবং জুবেদা বেগম কিছু বললে ভুল বুঝিয়ে দেব। আজ মায়ের কথা শুনে মাকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু জুবেদা বেগম অযথা আমার বিষয়ে ভুল ধারণাই পুষে রাখলেন। আমাকে কিছুই বললেন না। মনে মনে বলি, আলি আকবর এলে এর ফয়সালা করব।

পাঁচদিন পরে বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন। বাবা আসবার পর বললাম, 'আমার দ্বারা সঙ্গীত হবে না। কাশী গিয়ে কোন একটা কাজ করব।' বাবা বললেন, 'আরে আরে বল কি? এখন তো তোমার সবে রাগাধ্যায় শুরু করেছি। রোজার জন্য শেখাই নি। এবারে রোজ শিখবে। রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়, রাগ বিচার শিখবার যখন সময় হয়েছে, সেই সময় বলছ চলে যাবে? নিজে আগের তুলনায় কি বাজাচ্ছ বুঝতে পার না?' বাবার কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম। এরপর রোজ বাবা মৈহার থাকাকালীন যে রাগ শেখালেন তা আগেই শিখেছি।

মে মাস শেষ হতে আর চারদিন বাকী আছে। বাবা দরজীর উপর রেগে 'বম'। রাগের কারণ জামার মাপ ঠিকমত নেওয়া হয়নি। সেই রাগটা শেষ পর্যন্ত আমার উপর পড়ল। মৈহারে এসে অবধি দেখছি দুটো মাসিক পত্রিকা বাবা রাখেন। একটা বসুমতি, অপরটা হোল ভারতবর্ষ। বাবাকে অনেক সময় প্রবন্ধ পড়ে শোনাই যা বুঝতে পারেন না। সেই সময় ধারাবাহিক পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বেরোত, যার লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বাবা নিজে মন দিয়ে পড়েন এবং বিশেষ করে এই প্রবন্ধটি আমাকে পড়ে শোনাতে বলতেন। যাক যে কথা বলছিলাম। দর্জির উপর বাবা রেগে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, 'তোমার জন্যই বসুমতি ও ভারতবর্ষ কিনি। বৃথা খরচা হয়।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক। মনে মনে ভাবলাম, বাবা যেহেতু কয়েকমাসের জন্য দেশে যাবেন, সেই জন্য আর বই রাখতে চান না। কিন্তু বই না রাখতে চাইলেও দুটি মাসিক পত্রিকার, এক বছরের অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বই তো আসবেই। একটু পরেই বাবা আমাকে ডাকলেন। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, ধারাবাহিক যা বেরিয়েছে সেটা পড়তে বললেন। আমার আগেই পড়া হয়ে গিয়েছে। এবারের সংখ্যায় রামকৃষ্ণদেব, গুরু সম্বন্ধে যা বলেছেন সেই জায়গাটা পড়ে শোনাতে বললেন। গুরুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা কথা শিষ্যদের বলছেন রামকৃষ্ণদেব। এক জায়গায় রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'গুরু হয় একজন, কিন্তু উপগুরু অনেকে হয়। যে কোন লোকের কাছে যদি কিছু শিক্ষা করো, সেও তোমার উপগুরু। এমন কি পশু পক্ষীর কোন

আচরণ দেখে যদি কিছু শিক্ষা পাও, তাহলে সেই পশু পক্ষীকেও উপগুরু হিসাবে শ্রদ্ধা করবে।' কথাটা হুবহু আমি লিখে রাখি নি। ভাবার্থটাই বললাম। গুরুর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। বাবা শুনে বারবার মাথায় হাত ঠেকাতে লাগলেন। বাবা বললেন, 'কারো কাছে কোন জ্ঞান পেলে সশ্রদ্ধ চিত্তে তাকে মনে রাখবে। বেইমানি করলে গুণ চলে যায় জাননা, 'দিয়ে ধন বুঝি মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' বাবার কাছে কথাটা বহুবার শুনেছি। বাবা বলতেন, 'কোন জিনিষে অহংকার করবে না।' তারপরই বলতেন, 'ভগবান সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করেন। অহংকার হলেই দর্পহারী, দর্পচূর্ণ করে দেন।' এই কথা বলেই উপরি উক্ত কথাটি বলতেন।

ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট খবর পেয়েছেন যে ইন্দ্রনীলকে রোজ রাত্রে শেখাই। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বললেন, 'আমার মেয়েকে শেখান। মেয়েকে শেখালে আপনাকে প্রতি মাসে একশত টাকা দেবো।' একশত টাকা আমার কাছে আশাতীত। কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন, তাহলে পত্রপাঠ মৈহার থেকে বিদায় নিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজের পরিস্থিতির কথা বললাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পরিচিত। অনুরোধ করে বললাম, 'বাবাকে বলবেন না।' ম্যাজিষ্ট্রেট আমার কথা বুঝলেন এবং বাবাকে কখনও বলেন নি। ইন্দ্রনীল সবে একমাস হল এসেছে। বাবা মৈহারে আসবার আগেই মুহররম পড়েছে। তারপর এখানে এসেই তিনি এলাহাবাদে গেছেন। ইন্দ্রনীলকে বাবা প্রথম থেকে শিক্ষা শুরু করিয়েছেন। ইন্দ্রনীলকে আগেই বলে দিয়েছিলাম, 'বাবা যখন শেখাবেন, ভাল করে শুনবার পর বাজিও।' বাবা এক সপ্তাহ শেখাবার পর খুশী হলেন। বললেন, 'বা রে দাদু, প্রথম দিন তো আতাইয়ের বাজনা বাজালি। প্রথম দিনে দুই সুরের পালটা বলেছিলাম। আরোহীতে যেমন বাজিয়েছিলি, ঠিক সেইরকম অবরোহীতে বাজিয়েছিলি। কিন্তু এখন দেখছি বলবার সঙ্গে সঙ্গে বাজাচ্ছিস। প্রথম দিন, অবরোহীতে উল্টো কি করে বাজাতে হয়, তা বার বার বলা সত্ত্বেও পারিস নি। কিছুই শিক্ষা দেয়নি তোর বাবা। কিন্তু এখনি দেখছি মা সারদার কৃপা হয়েছে। খুব রিয়াজ কর। এইরকম করে বাজাতে পারলে তোকেও আশিসের সঙ্গে নিয়ে বসব।' আর যায় কোথায়? বাবা এ কথা বলেছেন শুনেই, ইন্দ্রনীল নিজের বাবা তিমিরবরণকে লিখেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তিমিরবরণের চিঠি এল। তিমিরবরণ লিখেছে, 'ছয়মাসের মধ্যে যদি তুমি বাবার সঙ্গে বাজাতে পার, তাহলে তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।' রাত্রে যেমন শেখাতে যাই সেইরকম গেলাম। ইন্দ্রনীল তার বাবার চিঠিটা পড়তে দিলো। চিঠিটা পড়ে আমি অবাক। মনে পড়ে গেল বাবার কথা। এ যাবৎ বহুবার বাবার কাছে একটা কথা শুনেছি। বাবা বারবার বলতেন, 'কোলকাতায় এমন প্রতিভাধর ছেলে এবং মেয়ে আছে যারা গান কিংবা বাজনা বাজায়, কিন্তু তাদের নষ্ট করে দেয়, ছেলে মেয়েদের বাবা, মা এবং প্রতিবেশী। একটু বাজাতে পারলেই, শিক্ষার্থীর বাবা মা বাড়ীতে কেউ এলেই শত মুখে প্রশংসা করবে। প্রশংসা হল সর্বনেশে জিনিষ। প্রশংসায় ছেলে মেয়েদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। অপরিপক্ক অবস্থায় ছাত্ররা বোঝে, তারা খুব ভাল বাজাচ্ছে। নিজেকেই উস্তাদ ভাবতে আরম্ভ করে। এর ফলেই বহু প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। এরজন্যই শিক্ষার সময় কারো সামনে বাজান উচিত নয়। মূর্খ লোকের প্রশংসায় অহঙ্কার হয়। আর অহঙ্কার হলেই শিক্ষা আর

অগ্রসর হয় না। সত্য শিক্ষা হলে দেখবে, বরাবর নিজের মনে অতৃপ্তি আসবে। যে দিন ভাববে খুব ভাল বাজাচ্ছ, সেইদিন বুঝবে তোমার অধঃপতন শুরু হল।' বাবার এই কথাটি, এতবার এ যাবৎ মৈহারে এসে শুনেছি যে তা গুণে বলা সম্ভব নয়। মনে হয় এর জন্যই, বাবা আমাকে কাশীতে সরোদ নিয়ে যেতে দেন না, পাছে লোকে প্রশংসা করে। নাতি হল স্নেহের সম্বন্ধ। সেইজন্য আশিসকে নিয়ে এর মধ্যে কয়েক জায়গায় বাজিয়েছেন। কিন্তু বরাবর আশিসকে বলেছেন, 'এই বাজনায় ডাল গলবে না। তুই ভাবিস আমার সঙ্গে বাজাচ্ছিস, কিন্তু তুই যে ডাল পরিবেশন করিস, সেই ডাল দড়কচা। এই ডাল সিদ্ধ না হওয়ার জন্য, কুত্তাও এই ডাল খাবে না। মানুষ তো কোন ছার। এখনও ডাল সেদ্ধ হতে অনেক দেরী। ডাল যেদিন সেদ্ধ হবে, তখন নিজেও খেয়ে আনন্দ পাবি এবং যাকে খাওয়াবি সেও আনন্দ পাবে।' বাবার এই কথাও এ যাবৎ বহুবার শুনেছি। বাবা ওই রকম উপমা দিয়ে সুন্দর কথা বলতেন। তিমিরবরণের চিঠি পড়ে অবাক হলাম। যারা গান বাজনা বোঝে না তারা প্রশংসা করে করুক। কিন্তু তিমিরবরণ এ কথা, কি করে লিখলেন? সে কি জানে না তার ছেলে কতটুকু বাজায়। তিনি কি করে ভাবলেন, যে ছয় মাসের মধ্যে বাবার সঙ্গে জলসায় বাজাবে? এ কোন পুত্র স্নেহ? চিঠিটা পড়বার পর মণিকাদেবী এবং ইন্দ্রনীলকে বাবার কাছে যা শুনেছি সব বললাম। শেষে ইন্দ্রনীলকে একটা কথাই বললাম, উপস্থিত স্বরবর্ণের একটা 'অ' লিখতে পারছ না অথচ ছয় মাসের মধ্যে সাহিত্যিক হতে চাও।' মণিকা দেবীকে বললাম, 'এই চিঠি যদি বাবা দেখেন, তাহলে পত্রপাঠ দূর করে দেবেন। উৎসাহ দেবার জন্য বাবা এই কথা বলেছেন। অবাক হয়ে যাই তিমিরবরণ এই ভুল কি করে করল?' আমার কথা শুনবার পর মণিকা দেবী কপাল চাপড়ে বললেন, 'চিঠি লিখে দেব যাতে এই ধরণের কথা বাবাকে না লেখেন।' মণিকা দেবী আমার কথার গুরুত্বটা বুঝলেন। বাজনা শিখিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

পরের দিন সকালে পালবাবুর বাড়ীর সকলে এল। মেয়ের বিয়ের সময়, বাবা ছিলেন না বলে আশীর্বাদ নিতে এসেছে। পালবাবু আমাকে বলল, 'আজ আমার কয়েকজন আত্মীয় এসে মুন্নীর বাজনা শুনে খুব প্রশংসা করেছে। দাদা সবই আপনার দয়া।' এ কথা শুনে তো আমার ধাত ছাড়াবার উপক্রম। ভাগ্য ভাল সরল মনে বাবার কাছে ভুলক্রমে এ সব কথা বলে নি। পালবাবুকে ইসারায় মানা করলাম, এই সব কথা না বলতে। পালবাবু বুঝলেন। মনে হয় তিমিরবরণ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে যদি এই ভুল করে, তাহলে পালবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। পালবাবুর পূর্বপুরুষ, কেউ গান বাজনা করে নি। একমাত্র মেয়ে বাজাচ্ছে সুতরাং লোকের প্রশংসায় আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার গোবিন্দ সিং নিজের কয়েকজন পরিচিত লোক নিয়ে বাড়ীতে এসেই, বাবাকে বাজনা শোনাবার প্রার্থনা জানালেন। সারা বছর বাড়ীতে অসুখ লেগেই আছে। ডাক্তার গোবিন্দ সিং একমাত্র ভরসা। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য গাছের ফল পাঠান, মাঝে মাঝে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান এবং কখনও রান্না মাংস, বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। ডাক্তার বাজনা শুনতে চাইছে, সুতরাং বাবা খুব আনন্দিত চিত্তে প্রথমে সকলকে ভোজ্য বস্তু দিয়ে আপ্যায়িত

করলেন। আজ বাবা জোর করে আমাকে, বাবার সঙ্গে বাজাতে বললেন। কেউ এলে বাবা অনেকবার বলেছেন, কিন্তু আমি কখনো বাজাই না। কেননা বাবার পরীক্ষা। যখন আমি বাজাইনা তখন বাবা আশিসকে নিয়ে বসেন। কিন্তু আজ বুঝলাম বাবার আন্তরিক ইচ্ছা। সুতরাং ভয়ে ভয়ে বসলাম। সকলের সামনে, বাবা বকলে লজ্জা পাই। শিক্ষাকালীন একলা যে সময় বকুনি খাই, সেটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে, লোকের সামনে কুঢ় কুঢ় বললেই তো প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে। বাবার কথায় পুরিয়া বাজালাম। অবাক হলাম, যখন বাবা নিজেই আমার প্রশংসা করতে লাগলেন বার বার। যে মুহুর্তে ডাক্তার নিজের মিত্রদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বাবা আমাকে বললেন, 'সারা জীবন বাজিয়ে যদি কিছু পার তবেই ভগবানের দয়া ভাববে। লোকের সামনে তোমার তারিফ করলাম বলে, ভেবো না খুব ভাল বাজিয়েছ।' বাবার কথা শুনে মনে মনে হাসলাম। ডাক্তারের সামনে বকুনি খেলাম না বলে ধড়ে প্রাণ এল।

আজ ঈদ। বাবা ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য আমাকে বললেন। বাবা সকালে মাংস নিয়ে এলেন। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় কেবল পোলাও দেওয়া হল। পোলাও এর মধ্যে যদিও মাংস ছিলো, কিন্তু আলাদা মাংস শেষ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার চলে যাবার পর, বাবা চটে গিয়ে মাকে বললেন, 'আরে আরে, এত মাংস এনে দিলাম অথচ আলাদা মাংসের ঝোল দিলে না।' এ কথা শুনে মা বললেন, 'তোমার বউমাকে জিগাও।' বাবাকে বোঝালাম, পোলাও এর মধ্যে বেশী মাংস থাকায়, কম পড়ে গেছে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আগামীকাল বাটি ভর্তি মাংস দিয়ে খাওয়াবে। আগামীকাল আবার খেতে বলবে। ডাক্তার মাছ মাংস ভালবাসে অথচ বাড়ীতে খেতে পারে না। নেমতন্ন করে ডেকে, মাংস কম পড়ে কেন? এত মাংস এনে দিয়েছি।' পরের দিন ডাক্তারকে খাবার জন্য বলা হল। ব্যাণ্ড থেকে আসবার সময় বাবাকে দেখলাম একজনকে নিয়ে এসেছেন। বাবা মাছ কিনে এনেছেন। ভদ্রলোক বাঙালী। কোন বাঙালীকে বাড়ীতে ডেকে মাছ খাওয়ান, বাবার নূতন নয়। এর আগেও কয়েকবার দেখেছি। আসলে মৈহারের কাছে কাটনিতে বহু বাঙালী থাকেন। যেহেতু কাটনিতে গান ফ্যাক্টরি আছে, সেই জন্য পশ্চিমবাংলার বহু বাঙালী চাকরী করেন। এ ছাড়া বিরাট এলাকা জুড়ে রেলকর্মী থাকেন। রেলকর্মীদের মধ্যেও বহু বাঙালী থাকেন। এই সব বাঙ্গালীরা কখনও মৈহারে এলে, রাত্রের ট্রেনে বারোটার সময় কাটনি ফিরে যান। মৈহারে পুরি এবং মিষ্টির সাধারণ দোকান আছে। কোন হোটেল নেই, উপরন্তু আমিষের কোন রেষ্টুরেন্ট নাই। সুতরাং, বাঙালী মৈহারে এসেছে সকালে, হয়ত, সারাদিন খাওয়া হয়নি। বাড়ী যেতে কত রাত হবে কে জানে, কেননা গাড়ী তো চিরকালই লেট থাকে। সুতরাং অতিথি নিয়ে এসেছেন। রাত্রে ডাক্তার এলেন। ডাক্তার এবং বাঙালী ভদ্রলোককে মাছ এবং মাংস খাইয়ে, বাবার আনন্দ ভাব দেখবার মত। বারবার সেই এক কথা, 'এ খাবার বোধ হয় ভাল লাগছে না।'

মৈহারে আসা অবধি দেখেছি, বাবা কোন জায়গায় কিছু খান না। এই প্রথম জুডিশিয়াল কমিশনার মৈহারে এসে বাবাকে, আমাকে এবং আশিসকে নিমন্ত্রণ করলেন গেষ্ট হাউসে, রাত্রে খাবার জন্য। আশিসের শরীর ভাল নেই। সুতরাং আশিসের, যাবার প্রশ্ন নেই। নিজের সম্বন্ধে বাবা বললেন, 'মশলাযুক্ত খাবার সহ্য হয় না।' আমি অগত্যা কাজ আছে বলে

কাটিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত জুডিশিয়াল কমিশনারের অনুরোধে চা খাবার জন্য বাবা এবং আমাকে যেতেই হোল বিকেলে। চা খেয়ে আসবার সময় কমিশনার আমার হাতে বাড়ীর জন্য চার প্যাকেট মিষ্টি জোর করে দিলেন। বাবা বাড়ী আসবার পর বললেন, 'এই মিষ্টি চাকরদের দিয়ে দাও। কোন কারণ নেই অথচ কেন চায়ের নিমন্ত্রণ? সঙ্গে আবার মিষ্টি। এ সব মিষ্টি ভাল নয়। কি ভাবে বানিয়েছে আল্লাই জানে।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক। আসলে বাবা অকারণ কারো কাছে কিছু নিতে পছন্দ করতেন না। বাবা বাজনা শুনিয়ে কোন রকম আতিথ্য পেলে সহজভাবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু অকারণ এই চা খাওয়া, বাবার বিবেকে বোধ হয় লাগত। বাবার মনে হ'তো, মুখর না হলেও নিশ্চই কোন নীরব স্বার্থ আছে। বাবা কিছু দিয়েই আনন্দ পেতেন। এ এক বিরল চরিত্র।

মৈহারে আসা অবধি দেখেছি, নাতি সম্বন্ধ যাদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বহু অশ্লীল মন্তব্য করতে দেখেছি। প্রথমে নিখিল, তারপরে সনতের সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য করতে দেখেছি। কিন্তু ইন্দ্রনীলের সঙ্গে হাসতে হাসতে যখন অশ্লীল কথা আমার সামনে বললেন, হাসি পেয়ে গেল। প্রতিবারের মত আমাকে বললেন, 'আরে আরে, তুমি শুনো না। নাতির সঙ্গে দিল্লগী করছি। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের নাতিদের সঙ্গে, এ ধরনের কথা কখনও শুনি নি। বাবার এ এক আলাদা রূপ।

বাবার কয়েকটা প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে, দিল্লী, কাশী, কোলকাতা এবং কুমিল্লায়। যাবার এখনও প্রায় চার মাস দেরী আছে। বাবার খুব ইচ্ছা কুমিল্লায় গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। হজ করে আসবার পর দেশে গিয়ে কয়েকটা জিনিষ করবার বাসনা আছে। কিন্তু বাবার কি ইচ্ছা আছে, সে কথা বলেন না। আজ বাবা আমাকে ঘরে ডাকলেন। বললেন, 'কে জানে কুমিল্লায় গিয়ে আর যদি না ফিরি? কে জানে কতদিন আছি। এই বলে বাবা কয়েকটা খাতা আমাকে দিয়ে বললেন, 'খাতার মধ্যে কঠিন তাল, অর্দ্ধ মাত্রার তাল, মৃদঙ্গ এবং তবলার টুকড়ো আছে। অন্য খাতায়, অপ্রচলিত এবং প্রচলিত রাগের ধ্রুপদ ধামার আছে। এর মধ্যে অনেক রাগ তোমাকে শিখিয়েছি এবং যাবার আগে কিছু শেখাব। তাল সম্বন্ধেও কিছু বলব। তোমাদের ভাগ্যে যদি মৈহার ফিরে আসি তাহলে সেই সময় শেখাব। এই খাতাগুলো লিখে আমাকে ফেরৎ দিয়ে দেবে।' মোটা মোটা লম্বা খাতা নিয়ে ঘরে এলাম। ভাতখণ্ডের বই পড়ে অনেক রাগের নাম জেনেছি। কিন্তু বাবার এই খাতায় যা দেখলাম তা আমার কল্পনার বাইরে। বুঝলাম এখনও কত শিখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো মোটা লম্বা খাতা কিনে এনেই লিখতে শুরু করে দিলাম। বাবার যাবার কথা, আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আলি আকবরকে লিখেছি অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু কোন খবর দেন না কেন।' রবিশঙ্করকেও এখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তারও কোন জবাব পাই নি। রবিশঙ্কর কিন্তু কখনও চিঠি দিতে দেরী করে না। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম।

আজ একসঙ্গে দুটো টেলিগ্রাম এল। আলি আকবরের টেলিগ্রামে জানলাম, আগামীকাল সকালের প্যাসেঞ্জারে মৈহার আসছে জব্বলপুর থেকে। অপর টেলিগ্রামে রবিশঙ্কর জানিয়েছে, আগামীকাল রাত্রে অন্নপূর্ণা এবং শুভকে নিয়ে আসছে। টেলিগ্রামের খবর পেয়ে

বাবার খুসী দেখবার মত। টেলিগ্রাম পেয়েই উপরের ঘর পরিষ্কার করালেন। পরদিন সকালেই বাবা মাংস কিনতে গেলেন। এ ছাড়া বুদ্ধাকে বললেন, মুরগী কাটিয়ে আনতে। বাবার পুত্র এবং কন্যার প্রতি কি অপরিসীম ভালবাসা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু ভেতরের ভাব দেখলে বুঝতে পারি। যদিও ছেলের সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু মেয়েকে মা, মা বলে ডাকতে, দিনের মধ্যে চার পাঁচবার শোনা যাবে। অন্নপূর্ণা দেবী এলে, সকালে এবং রাত্রে খাবার পরিবেশন নিজের হাতে করেন। জোর করে বাবাকে বেশী খাওয়াবেন। বাবার খাবার পরিমিত। কিন্তু কন্যার কথায় খাবার বেশী নিতে হয়। যা অন্যের দ্বারা অসম্ভব।

দুপুরে ষ্টেশনে গেলাম। আলি আকবর এল। আলি আকবরের কোন পরিবর্তন নেই। ট্রেন থেকে নেবেই প্রথম কথা, 'বুকের মধ্যে প্যালপিটেশন হচ্ছে। বাবার মেজাজ কেমন?' প্রতিবারের মত বললাম, 'না আসার জন্যই বাবার মেজাজ খারাপ থাকে, তবে ছেলে আসছে শুনেই মাংস, মুরগী হয়েছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।' প্রতিবারের মত আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম, পেছনে আলি আকবর। বাবা বই পড়ছিলেন। বাবাকে প্রণাম করে, আলি আকবরের আসার সমাচার দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা উঠে বসলেন। আলি আকবর প্রণাম করল। প্রতিবারের মত বাবা বসতে বললেন। অলি আকবর হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। তিনবার বলবার পর কোনরকমে আলি আকবর বসল। বাবার সেই তিন প্রশ্ন এবং আলি আকবর বাবার পায়ের দিকে মুখ করে যেমন ঢুকেছিল সেইভাবে পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে ঘর থেকে চলে এল। আলি আকবরের জগৎজোড়া নাম, কিন্তু বাবার কাছে এই আদব আজ পর্যন্ত কখনও অন্যদের দেখিনি। পিতা এবং গুরুর প্রতি এমন ভক্তি কেউ কল্পনা করতে পারে না। আলি আকবরের কাছেই শুনেছি যে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আজ পর্যন্ত কখনও কথা বলেন নি। দুপুর বেলায় খাবারের পর, আলি আকবর বাড়ীর সব সমাচার জানতে চাইল। আলি আকবরকে সংক্ষেপে একজনের মিথ্যা চক্রান্তের কথা বললাম। বাড়ীতে 'শনির' প্রবেশ হয়েছিল। কথায় বলে 'শনির দশা চলছে।' সেই শনিকে আমার পুরোনো সরোদটা আলি আকবরকে দিতে বলেছিলাম। আলি আকবর বিক্রি করে টাকা দিয়েছিল। অথচ সেই শনি, নিজে টাকাটা খরচ করে বলেছে, আলি আকবরকে টাকা ফেরত দিয়েছে, এ ছাড়া আলি আকবরকে মাঝে মাঝে ধার দেয়। আমি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম সেই কুগ্রহকে। জানি না, কুগ্রহ বাড়ীতে জুবেদা বেগম এবং মাকে আমার নামে কি লাগিয়েছে। এ চরিত্র আমার জানা আছে বলেই আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু মা এবং তার বৌমা বিশ্বাস করেছিল। যার জন্য আকাশে মেঘ জমেছে। আলি আকবর একটু শুনেই বলল, 'ও একনম্বরের মিথ্যাবাদী ঘরের শত্রু। আসলে তুমি বাবার স্নেহ পেয়েছ এবং শিক্ষা ভালভাবে পাচ্ছো বলে ঈর্ষায়, সকলের সঙ্গে মনকষাকষির রাস্তা বেছে নিয়েছে।'

দুপুরে আবার স্টেশনে গেলাম। গাড়ী পাঁচ ঘণ্টা লেট। বিকেল পাঁচটার সময় গাড়ী এসে পৌঁছল। রবিশঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে মন ভোলানো হাসি হেসে অভ্যর্থনা করল। অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে মনে হল ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছেন। খুব রোগা হয়ে গেছেন দেখলাম। শুভ একটু লম্বা হয়েছে। রবিশঙ্কর বলল, 'ট্রেনের সব ভাল করে দেখ, যেন কোন

জিনিষ ছেড়ে না যায়।' রবিশঙ্করকে জনান্তিকে বললাম, 'সব জিনিস দেখা আমার স্বভাব নয়।' রবিশঙ্কর মুচকি হাসল। টাঙ্গায় বাড়ীতে আসতে আসতে আমার মানসিক অশান্তির কথা বললাম। রবিশঙ্কর সব শুনে বলল, 'আমার কাছে দিল্লীতে চলে এস।' উত্তরে বললাম, 'গেলে তো খুবই ভাল হ'তো, কিন্তু আমি গেলে আপনি বাবার কুনজরে পড়ে যাবেন। বাবা ভাববেন আপনি আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। আমি চাই না আমার জন্য বাবা আপনার উপরে চটে যান।' অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে বললাম, 'শরীর এত খারাপ হয়ে গিয়েছে কেন?' রবিশঙ্কর বলল, 'ওষুধ যদি না খায়, তাহলে আমি কি করব?'

বাবার এরকম আনন্দ অনেকদিন দেখিনি। বাবা নমাজ পড়বার পর আলি আকবর এবং রবিশঙ্করকে বললেন, 'মায়ের নামে একটা রাগ করেছি। রাগ 'ভগবতী'। তিনটি রাগের সংশ্রিণে।' রাগটি গাইতে লাগলেন।

স্থায়ী

'হম তোম এক হি স্বরূপ
হমারা তুমারা এক হি রূপ।

অন্তরা

যব আয়া কায়া মে শ্বাস
তুম ভয়ে ঠাকুর, হম ভয়ে দাস।'

রাগটি গাইবার পর বললেন, 'তোমরা হেমন্ত, হেমবেহাগ এবং মাঝখাম্বাজ খুব চালু করে দিয়েছ। এবারে এই রাগটা বাজাও।' আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর চুপ করে বসে শুনল। নূতন রাগটির গান আমি আগেই শিখেছি। রাত্রে অনেকক্ষণ গল্প হোল। রবিশঙ্কর বলল, 'পাঁচদিন থেকে, অন্নপূর্ণা এবং শুভকে নিয়ে চলে যাবো। বাবা কুমিল্লা যাবেন বলেই দেখা করতে এসেছি।'

পরের দিন সকালেই ডি.সি. এবং কমিশনার এলেন। বাবা বললেন, 'ছেলে এবং জামাই এসেছে।' দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওদের দু'জনের সঙ্গেই আমি পূর্বপরিচিত। কমিশনার এবং ডি.সি. বাবাকে বললেন, 'সন্ধ্যার সময় এসে বাজনা শুনবো।' বাবা আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানালেন। সন্ধ্যার সময় কর্তাব্যক্তিরা এলেন। বাবা আশিসকে নিয়ে মিঁয়া কি মল্লার বাজালেন। রাত্রে খাবার পর উপরে গেলাম। মার নীচের ঘরের উপর বিরাট ছাত হয়েছে। রবিশঙ্কর আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'বাড়ীর একজন অন্নপূর্ণাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে, যার জন্য মনে হয় খুব রেগে গেছে। তুমি কথা বলে ঠিক করে নাও।' রবিশঙ্করের কথা শুনে আমি অবাক। আমার সম্বন্ধে, এমন কি কথা কেউ বলবে যার জন্য চটে গেছেন। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা দেবী আমার কাছে এলেন। রবিশঙ্কর চুপচাপ ছাতের এক কোণে চলে গেল। অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে বললেন, 'যতীন বাবু, আপনাকে অন্ততঃ এ রকম ভাবিনি। অন্য কেউ হলে আমি অবাক হতাম না। কিন্তু আপনি?' অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ দেখে মনে হোল খুব রেগে গেছেন। বাজনা শিখবার সময় রাগ দেখেছি, কিন্তু অন্য সময়ে কখনও তো এরকম রূপ দেখিনি। একে নানা কারণে মানসিক অশান্তিতে মাথা খারাপ হবার উপক্রম

তাই ভাবলাম, এ ধরনের কথা বলার কি অর্থ? কয়েক সেকেণ্ড এই চিন্তা করেই বললাম, 'কিন্তু আপনি, বলে থেমে গেলেন কেন? আমি কি করেছি?' এবারে যে কথা শুনলাম তা আমার কাছে অকল্পনীয় এবং স্বপ্ন দেখছিলাম বলে মনে হোল। না স্বপ্ন দেখছিলাম না, বাস্তব সত্য। কিন্তু এ কি হীন চক্রান্ত। মনে মনে বুঝলাম মানুষ কত নীচে নামতে পারে। কার দ্বারা এবং কেন এই সব মিথ্যা, অন্নপূর্ণা দেবীর কানে লাগিয়েছে, চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'কি উত্তর দিচ্ছেন না কেন?' অন্নপূর্ণা দেবীর প্রশ্নটা শুনে মনে হলো, রাগ করে বলছেন। ঘৃণায় প্রশ্নটা করছেন। রাগ সহ্য করা যায়, কিন্তু ঘৃণা সহ্য করা বড় কঠিন। বললাম, 'একমাত্র আপনাকেই বাড়ীর মধ্যে ভাবতাম কান পাতলা নন। পরের মুখে ঝাল খান না। এখন দেখছি আপনিও তেমনি। আমার এতদিনের ধারণা এবং শ্রদ্ধা আজ নষ্ট হয়ে গেল। এতদিনে আমাকে আপনি চিনতে পারেন নি। আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, কেননা আপনার জন্যই আমি আজ মৈহারে বাবার মেজাজ বুঝে টিকে আছি, এবং আপনার কাছে শিক্ষা পেয়েছি বলেও কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আপনাকেও কিছুদিন আমি পড়িয়েছি। সেই অধিকারে বলছি, আপনার কাছে আর শিখব না এবং কথাও বলব না। আগামী কালই আমি বাবাকে বলে মৈহার ছেড়ে চলে যাব। তবে যাবার আগে একটা কথাই বলব আত্মসমর্থনে, কোন কথা বলাই আমার কাছে ঘৃণ্য ব্যাপার। তার জন্য আমি কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। তার চেয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ। এ কথা তো ঠিক, যে দুধ আর আম মিলে যায় আর আঁঠীর খায় গড়াগড়ি। কিন্তু ভুলে যাবেন না ওই আঁটীর জন্যই আমের অস্তিত্ব।' এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগ দুঃখ এবং অভিমানে যে কথাগুলো বললাম, সেই সময় আমার মুখের চেহারাটা কিরকম হয়েছিল জানি না। আমার এ মূর্তি অন্নপূর্ণা দেবীও বোধ হয় দেখেন নি। কথাগুলো বলেই সোজা নিচে এসে বাবার কাছে বললাম, 'আপনি চিন্তা করবেন বলে কিছু বলি নি। আজ সকালে মার চিঠিতে জানতে পেরেছি, মার শরীর ভাল নেই, সুতরাং আমি কাশী যেতে চাই।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আরে, তোমার মায়ের শরীর খারাপ তাহলে তো যেতেই হবে। তোমার মায়ের কি হয়েছে?' বাবার চিন্তিত ভাব দেখে মিথ্যা কথা বলতে সঙ্কোচ হলেও বললাম, 'কি হয়েছে কিছু লেখে নি। যদি কয়েক দিনের জন্য যাই, তাহলে ভাল হয় বলে মা লিখেছেন।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আকবর এবং রবু কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবে। ওরা চলে গেলে কাশী যেও।' আমি বাবার কথায় সম্মতি জানিয়ে ঘরে চলে এলাম। নানা চিন্তায় কি করে রাত কাটল জানি না। শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোর হতে দেরী আছে। মাথা দপদপ করছে।

সকালে নাস্তার পর রবিশঙ্কর আমাকে বললেন, 'অন্নপূর্ণা তোমাকে ডাকছে।' ভাবলাম যাব না, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর সম্মান রক্ষার জন্য গেলাম। গতকাল রাত্রে যে মূর্তি দেখেছিলাম আজ মনে হোলো সে ভাবটা নাই। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য অভিযোগের কারণ কি?' মনে মনে ভাবলাম, যখন চলেই যাব তখন সব

বলে যাওয়াই ভাল। মৈহারের যে পরিবেশে আমাকে দিন কাটাতে হয়েছে এক বছরের উপর, সব কথা গড়গড় করে বলে গেলাম। সব কথা বলে মনটা একটা হাল্কা লাগল। অন্নপূর্ণা দেবী বুঝলেন। আমার কথা শুনে বললেন, 'আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে। বুঝতে পেরেছি কার চক্রান্তে এবং স্বার্থে এইসব হয়েছে।' এই একটা কথা শুনেই সমস্ত অভিমান দুঃখ এবং রাগ কর্পূরের মত উড়ে গেল। মনে হোল সত্য চিরকালই সত্য। মিথ্যা বেশী দিন টেকে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মিথ্যার স্বরূপ বুঝেছেন এ কথা ভেবে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। রাত্রে রবিশঙ্কর বলল, 'অন্নপূর্ণা বুঝতে পেরেছে কার চক্রান্ত। সব ভুলধারণা চলে গিয়েছে, তবে এ ব্যাপারে আলি আকবরকেও সব কথা খুলে বল। আলি আকবরকে একান্তে গিয়ে সব ব্যাপার না বললে, আলু ভাই মনে দুঃখ পাবে। আলু ভাই কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।' রবিশঙ্করের কথা শুনে অবাক হলাম। অন্নপূর্ণা দেবী সব শুনেছেন, অথচ রবিশঙ্কর কেন জিজ্ঞেস করে নি নিজের স্ত্রীকে? অন্নপূর্ণা দেবী খুব চাপা। রবিশঙ্কর সাহস করে হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেনি, অথচ আমাকে বলছে, আলি আকবরকে সব বলতে। এ বাড়ীর সকলেই কানপাতলা, সুতরাং আলি আকবরকে সব ঘটনা বলাই স্থির করলাম। আলি আকবরকে সব বললাম। সব শুনে আলি আকবর যা বলল, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও এ সব কথা, আমি এ সব কিছু বিশ্বাস করি না। তুমি বাবার ডান হাত। তুমি যদি চলে যাও বাবা দুঃখ পাবেন। এই বয়সে বাবা সহ্য করতে পারবেন না, যদি তুমি চলে যাও। তোমার প্রশংসা সব জায়গায় করেন। তুমি কি চাও, বাবা দুঃখে মারা যান?' এ কথা শোনার পর মৈহার থেকে চলে যাবার ইচ্ছা মন থেকে হটিয়ে দিলাম। কিন্তু আজ আলি আকবরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

যেহেতু আলি আকবর, রবিশঙ্কর আগামীকাল চলে যাবে, সেইজন্য মণিকা দেবী সকলকে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বাবার মেজাজ আমি জানি। বাবা পছন্দ করেন না, আমার কোন জায়গায় যাওয়া। নিমন্ত্রণটা কাটালাম পেট খারাপের অজুহাতে। মণিকা দেবীর অনুরোধে বাবা সকলকে পাঠালেন খাবার জন্য। বাড়ীতে রইলাম, কেবল বাবা, মা আর আমি।

আজ রবিশঙ্কর, শুভ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে স্টেশনে গেলাম। স্টেশনে গিয়ে দেখি গাড়ী লেট। রবিশঙ্কর ভুলে নিজের গগল্‌স্ ফেলে এসেছে বাড়ীতে। বাড়ী গিয়ে নিয়ে এলাম। রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'এ সব বাজে কথায় মন খারাপ না করে নিজের সাধনা নিয়ে থাক।'

অন্নপূর্ণা দেবী আমায় বললেন, 'এক ধরনের লোক আছে যারা চুকলী খেয়ে অন্যের মন ভারী করে। এর ফলেই বাড়ীতে অশান্তি হয়েছে।' যাক এ কথা যে তিনি বুঝেছেন সেটা শুভ লক্ষণ। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন 'কাশী কবে যাবেন?' বললাম, 'পরশুদিন পরেই কাশী যাব।' আমি একদিন পরে কাশী যাব শুনে, অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে একশো টাকা দিলেন। কিসের জন্য টাকা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'কাশী থেকে মৈহারে আসবার সময়

বাড়ীর জন্য কিছু কিনে নিয়ে আসবেন।' যদিও কাশী থেকে মৈহারে আসবার সময়, আতর ও জরদা বাবা, মা এবং জুবেদা বেগমের জন্য নিয়ে আসি, কিন্তু তার জন্য এত টাকা কেন? বুঝলাম মৈহারে বাড়তি খরচার জন্য আমাকে যে বিপদে পড়তে হয় তার জন্যই টাকা। দু'দিন আগে নানা অশান্তির মধ্যে টাকার চিন্তার কথা বলেছিলাম। বুঝলাম সব দিকেই লক্ষ্য আছে। নিজের মনের সব কথা বলার ফলে নিজেকে হালকা লাগছে। রবিশঙ্কররা চলে গেল। এক ঘণ্টা পরে আলি আকবরের ট্রেন। আলি আকবর দুদিন আগে যা বলেছিল, ষ্টেশনে সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। আলি আকবর জব্বলপুর চলে গেল। জব্বলপুর থেকে বম্বে যাবে। আলি আকবর বম্বে থেকে আসবার সময় এবং যাবার সময়, জব্বলপুরের সঙ্গীতপ্রেমী ডাক্তার হারসের ওখানে বাজনা বাজায়। যার জন্য মৈহারে আসবার সময় সরোদ রেখে আসে জব্বলপুরে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ভিজতে ভিজতে বাড়ী এলাম। আমাকে ভেজা অবস্থায় দেখে বাবা বললেন, 'আরে আরে ভিজে গিয়েছ। কি দরকার ছিল যাবার?' বাড়িতে এসে বুঝলাম আলি আকবর, স্ত্রী এবং মাকে কিছু বলেছে। বাড়ীর আবহাওয়া বদলেছে। কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে রইলাম। রাত্রে বাবার দেওয়া দুটো সঙ্গীতের খাতা ফেরৎ দিলাম। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কি করে এত বড় দুটো খাতা লিখেছ? সব লিখেছ?' উত্তর হাঁ বলাতে বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'দেশে যাবার আগে যত তাড়াতাড়ি পার কিছু শিখে নাও। তোমাদের ভাগ্যে যদি ফিরি তা হলে আবার শেখাব।' বাবার এই কথা প্রায় শুনেছি। খাতাগুলো দেখে মনে জিদ চাপল যেমন করেই হোক সব শিখতেই হবে।

আজ বিকেলের ট্রেনে কাশী যাব। সকাল বেলায় বাবা বললেন, 'কাশীতে যদি গান্ধীজির একটা হাসি খুশী ভাবের ফটো পাওয়া যায়, তাহলে বাঁধিয়ে নিয়ে এসো।' বাবা মনে প্রাণে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। বাবাকে আমি সর্বদাই গান্ধীটুপি পরতে দেখেছি। খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবী এবং পায়জামা ছিল বাবার পরিধেয় বস্ত্র। শীতকালে খদ্দরের বণ্ডি পরতেন এবং শাল রাখতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার আগে মৈহারের রাজার জন্য, খদ্দর এবং গান্ধী টুপি পরতেন না। কিন্তু গোপনে কংগ্রেসের সেবকদের আর্থিক সাহায্য করতেন। বাবাকে প্রথম যখন কাশীতে দেখি, খদ্দরের বস্ত্র পরা অবস্থায় দেখেছি। সেইজন্য গান্ধীজির ফটোর কথা যখন বললেন, সেইসময় আশ্চর্য হইনি। কিন্তু হাসি খুশী ভাবের ফটো তো দেখি নি। হাত জোড় করা অবস্থায় ফটো দেখেছি। কাশীতে গিয়ে যেমন করে হোক যোগাড় করতে হবে। পরের দিন সকালে কাশী পৌঁছলাম। কাশীতে এসে নিজের পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুবই ভালো লাগল, কিন্তু মৈহারের প্রাকৃতিক শোভা এবং বাবার বাড়ীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাশী থেকে আকাশপাতাল তফাৎ মনে হয়। কাশীতে পৌঁছে মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, গুল্লুজী এবং কবিরাজ আশুতোষের সঙ্গে প্রথম দিনেই দেখা করলাম। গুল্লুজীকে মনের অশান্তির কথা বললাম। গুল্লুজী কুষ্টি দেখে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।' মহন্ত অমরনাথ মিশ্র বললেন, 'দুঃখের পর সুখ এলে ভাল। সুখের পর দুঃখ কষ্টকর। সব ত্যাগ করে যখন গিয়েছ, খুব মন দিয়ে শেখ।' আমার মায়ের শরীরটা ভাল নেই। কাশীতে এসে সব সমাচার জানিয়ে মৈহারে চিঠি দিলাম। গুল্লুজী এবং

আশুতোষের কয়েক দিন বাজনা শুনেছি। আশুতোষ অ্যামেচার তবলাবাদক। কোলকাতার শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর তানসেন কনফারেন্সে ডাকেন। যেহেতু আশুতোষ, রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরের দীর্ঘদিনের বন্ধু, সেইজন্য বাবার অতি প্রিয় নাতি সম্বন্ধ। আশুতোষের কাছে কোলকাতার কনফারেন্সের বহু গল্প শুনি। দেখা হলেই ঘুরে ফিরে কার কার সঙ্গে কত ভাল বাজিয়েছে এই সব ঘটনা বলে। কিন্তু অবাক হই, বাবা, আলি আকবর বা রবিশঙ্করের কাছে নিজের বাজনার প্রশংসা বা আলোচনা কখনও শুনিনি। আশুতোষের ডিসপেনসারিতে মহন্ত অমরনাথ মিশ্র এবং গুল্লুজী আসে। কাশীর কত্থক সম্প্রদায়ের অনেকেই আসে। কি জানি কেন এই সব গাইয়ে বাজিয়েদের চাল চলন, কথাবার্তা আমার কাছে অন্য রকম লাগে। কাশীতে পৌঁছে ফটোর দোকানে বাবার মনোমত গান্ধীজির একটা বড় ফটো দেখলাম। কৌপিন পরে, ফোকলা দাঁতের হাসি ভাব নিয়ে, একটা একতারা বাজাচ্ছেন। ফটোটা কিনে বাঁধাতে দিলাম। এ ধরনের ফটো কখনও দেখিনি। কাশীতে রাজেশ মৈত্রকে সরোদে হাত সাধবার জিনিষ এবং একটা গৎ শেখালাম। বললাম, 'মৈহারে সময় করে সাত আটদিন থেকে, শিখে যেও।' কাশীতে এসে মৈহারের ঘটনাগুলো ভুলতে পারছি না। কুচক্রীরা কি রকম মিথ্যা কথা বলে দু'পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। এই সব ভাবলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
২-৭-৫৪

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যোতিন তুমার পত্র এই মাত্র পাইলাম সব অবগত হলেম। আশীষ ভাল আছে কিন্তু তাহার উৎসাহের সারা পাই না। যন্ত্র নিয়ে যে দিন বসিবে তবেই মনে করিব তার রূগ নাই, বাজাবার জন্য আমিও কিছু বলিনা। শ্রীমান তিমিরের ছেলে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে তিমিরের ছেলে তিমিরেই হাবুডুবু হাডুডুডু খেলছে। শিখে যায় কিন্তু পরের দিন এসে সব ভুলে গিয়ে যা তা বাজিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দেয়। এই জন্যই তার নাম রেখেছি ননি গোপাল। এর মায় ননী খাইয়ে ২ তার জিবন নষ্ট করেছে, যেমন ধ্যানেশ সেও তাই। এখানে কল্য একটু বৃষ্টী হয়েছে ভয়ানক গরম। আর সব ভাল, আরেকটি ননী গোপাল এসেছে এলাহাবাদ হতে সেতার শিক্ষার জন্য। তাকে বুকে টকে বিদায় করেছি বেটারা আমাকে পাগল করে তুলেছে। এখন চাই একা থাকিতে। লোক দেখলেই পাগল হয়ে যাই ছাৎনা হতে একজন ইনস্পেকটার পুলিশ এসেছিল সে বলে গেল ১০-১২ দিন পরেই কেশ হবে, তুমায় থাকিতে হবে এখন আমার কাছে সমন আসে নাই এলে জানাব। তুমি আবার কি লোক লাগিয়ে গিয়েছ, এও আমার মহাযন্ত্রণা। এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা

সাতদিন থাকবার পর মৈহারের জন্য ইলিস মাছ ভেজে, মিষ্টি, জর্দা, সিঁদুর, ছেলেদের পড়ার বই এবং গান্ধীজির ফটো নিয়ে মৈহার পৌঁছলাম। বাবাকে প্রতিবারের মত আতর দিলাম এবং একটু আতর লাগিয়ে দিলাম। বাবা আতরের প্রশংসা করে নিজের বাক্সে রেখে দিলেন। তারপর গান্ধীজির ফটো দেখালাম। গান্ধীজির ফটো দেখে বাবা অত্যন্ত খুশী। বাবা প্রতিবার যা করেন এবারেও তাই করলেন। বললেন, 'পয়সা না নিলে আমি কিছুই নেবো না, কারণ তুমি তো কামাও না।' আর আমারও সেই এক উত্তর, 'আমার দাদা কিনে দিয়েছে।' তারপর বাবার সেই এক কথা, 'ছাত্রের কাছে কখনও কোন জিনিষ বিনামূল্যে গ্রহণ করি না।' আমারও সেই এক উত্তর, 'আমি তো বুড়ো বয়সের ছেলে, সুতরাং প্রথম পুত্র পরে ছাত্র।' এরপর বাবা আর কোন কথা বলেন না। ইলিস মাছ খেয়ে বলেন, 'দেশের ইলিস আর কাশীর ইলিসে আকাশ পাতাল তফাৎ। তবে ইলিশ মাছ তো বটে। মৈহারে চোখে দেখা যায় না।' খুব পরিতৃপ্ত হয়ে ইলিশ মাছ খান। মা আতর এবং জর্দা পেয়ে প্রাণখোলা আশীর্বাদ করেছেন। বেগমের কথামত সিঁদুর নিয়ে গিয়েছি। উপরন্তু জর্দা এবং আতর দেওয়াতে প্রসন্ন। কিন্তু যে পর্যন্ত সামনা সামনি সব ভুল না ভাঙ্গে, ততদিন আমি সহজ হতে পারব না। বাবা বাড়ী ছিলেন বলে, আলি আকবর, রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণা দেবী আসা সত্ত্বেও সামনা সামনি কথা বলা হয়নি। যদিও বুঝেছি কার চক্রান্তে এই সব হয়েছে, তবু আলি আকবর এবারে যখন আসবে বাবার কুমিল্লা যাবার পর, সেইসময় সামনা সামনি কথা বলার পরই মনটা হাল্কা হবে। সুতরাং নীতিকথার আশ্রয় নিলাম। কোথায় যেন পড়েছিলাম 'কথা কম কও, কিন্তু হও সাবধান, তাতেই বাড়িবে তব গৌরব সম্মান।'

মৈহারে এসে চারটে মাস দেখতে দেখতে কিভাবে কেটে গেল। বাবার কুমিল্লা যাবার আগে কয়েকটা বিশেষ ঘটনার কথাই মনে হচ্ছে। মৈহারে এসে নিয়মিত দ্যুতিকিশোর, ইন্দ্রনীল এবং মুন্নিকে শিখিয়েছি। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীলের সম্পর্কে এক মামাতো ভাই সস্ত্রীক এসেছেন বার্ণপুর থেকে। সেই নোনা দাদা, ইনজিনিয়ার এবং সংগীত প্রেমী। ইন্দ্রনীলকে শেখাবার সময় রোজ তিনি বসে শুনতেন। একদিন শেখাচ্ছি এবং স্থান কাল পাত্র ভুলে, বকছি। শিক্ষার পর ইন্দ্রনীলকে বলল, 'পিসির কাছে তো শুনলাম, কটা দিন মাত্র তোর দাদুর কাছে শিখেছিস। এসে অবধি যতীন বাবুর কাছে শিখছিস। না বাজাতে পারলেও গান বাজনা একটু বুঝি। যেভাবে যতীন বাবু এই কয় মাসের মধ্যে তোকে শিখিয়েছেন এবং রোজ এসে শিক্ষা দেন, তার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবি। আর তা যদি না থেকে নিজেকে দিগ্‌গজ ভাবিস, তাহলে পাপ হবে এ কথাটা কখনও ভুলিস না।' এর মধ্যে কয়েকদিন মণিকা দেবী নিজের বোনপো এবং সকলকে নিয়ে, বাবার এখানে এসে আশিস এবং আমার বাজনা শুনেছে। নোনার কাছে আমার প্রশংসা করে বাবা বললেন, 'আলি আকবর, রবিশঙ্করকে যা শিখিয়েছি সেই রকম যতীনকেও সব শিখিয়েছি।' বাবার কথা শুনে মনে মনে হাসি।

মৈহারে আসার পর, এই প্রথম মৈহারের মহারাজা জব্বলপুরে বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে। ঠিক এই সময় আলি আকবর এসেছে। সঙ্গে এসেছে রবিশঙ্করের সম্পর্কে ভাই জগু। মৈহারে আসবার প্রায় তিন বছর আগে, কবিরাজ আশুতোষ

কাশীতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো জগুর সঙ্গে। আশুতোষের দোকানেও মাঝে মাঝে যেত।

জগু রবিশঙ্করের থেকে বড়। আগে জগু কাশীতে আমাদের পাড়াতেই থাকত। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও দোষের মধ্যে ছিল, রোজ দেশী মাল খেয়ে, গালাগালি করত গয়লাকে এবং রাস্তায় শেষ পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো। কাশীতে মুখ চেনা ছিল। কিন্তু আলি আকবরের সঙ্গে জগুকে আসতে দেখে অবাক হলাম। জগুর কাছে শুনলাম উপস্থিত সে কোলকাতায় থাকে এবং রবিশঙ্করের পি.এ।

এই সব চামচেরা যতই লোকের কাছে বলে বেড়াক কারও পি. এ অর্থাৎ পারসোনাল এসিসট্যান্ট, আসলে কিন্তু এরা হচ্ছে টি.সি. অর্থাৎ টাইপিং ক্লার্ক। এদের কাজ, সবকিছু দেখাশোনা করা, এবং প্রভুর মন জুগিয়ে চলা। কোলকাতায় রবিশঙ্করের যাবতীয় কাজ জগু করে দেয়। জগুর ভাল নাম জগদীশ চ্যাটার্জি। জগদীশকে ইয়ারকি করে বললাম, রবিশঙ্করের পিএ না টিসি? জগদীশ এমনিতে চালাক চতুর, কিন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, টিসি মানে? সহজ ভাবে বললাম, 'টিসি মানে টাইপিং ক্লার্ক। যেহেতু সব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন সুতরাং টাইপ করে চিঠি লেখেন। সুতরাং পিএর থেকে টিসির ডেসিগনেশনটা বড়।' জগু আমার রসিকতাটা খুব সহজ ভাবে নিলো। আমার ঘরে জগদীশ এল। জগদীশের কথায় বুঝলাম, সে সব খবর রাখে। জগদীশ বলল, 'রবু, আলি আকবরকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি বেগম সম্বন্ধে কি কথা আলি আকবরকে বলেছ?' এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম। রবিশঙ্কর নিজে, আমাকে আলি আকবরকে সব বলতে বলেছিল। তবে রবিশঙ্কর আবার আলি আকবরকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন, যে আলি আকবরকে আমি কি বলেছি? রবিশঙ্করের মেয়েদের মত স্বভাব। এ কি বলল, ও কি বলল নিয়ে আলোচনা আমার কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হোল। এ কথার পর জগদীশ বলল, 'দিল্লীতে রবুর চামচেদের হীন চক্রান্তের ঠেলায় বেচারি অন্নপূর্ণা খুব মনকষ্টে আছে।' জগদীশের কাছে এ সব কথা শুনে আলি আকবরের কাছে গিয়ে রাগে ফেটে পড়লাম। বললাম, 'কোন সাহসে শনিঠাকুরের কথা শুনে এ কথা আশিসের মা বিশ্বাস করে, যে আমি বাবাকে তেল লাগিয়ে মন যোগান কথা বলি। বাড়ীর কোন কাজ থাকলে করতে চাই না। যা মানা করে তাই করি। ছেলেদের সিনেমায় নিয়ে যাই।' এ কথা শুনে ঝড়ের বেগে জুবেদা বেগম কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, 'মা এবং আমি আপনাকে এত আপন মনে করি, আর আপনি বলেছেন, বাবা আপনাকে শেখাতে চায় না এবং আমরা আপনাকে খাবার কম করে দি।' এ কথা শুনে আমি অবাক। যাক সব ব্যাপার বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আলি আকবর চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে। জগদীশ ব্যাপারটা বুঝেছে। জগদীশ বলল, 'যে শনিঠাকুর এসেছিল, সেই দুই পক্ষকে উলটো উলটো কথা বলে মন কষাকষি করিয়েছে।' এ কথা শুনে বললাম, 'এইখানেই তো আমার যত রাগ। আমি প্রথম থেকেই সেই শনিঠাকুর যে এক নম্বরের মিথ্যাবাদী বুঝেছিলাম। তার কথা শুনে আমি তো কোন কথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছে, সে কথা শুনে আমাকে যদি এত আপনই ভাবতেন, তাহলে তো জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেই, শনিঠাকুরের কাপড় খুলে মাথায়

ঘোল ঢেলে দিতাম। এ সব কথা আমি বাবাকে এবারে বলব, কেননা সেই শনিঠাকুর বাবার অবর্তমানে আবার আসবে।' কিন্তু শনির বাহাদুরিকে তারিফ না করে পারলাম না। মনে হোল এ বেটা যমের নীল মোষ। সুকুমার রায় থাকলে, নিশ্চয় লিখতেন, 'বাপরে কি ডানপিটে ছেলে...খুন হত টম চাচা সেই রুটি খেলে।' প্রায় মেরেই এনেছিল।' আমি তো পরের পো। নিজের বৌদিকেই প্রায় বলি দিয়ে ফেলেছিল।

একথা শুনে বেগম বললেন, 'এবারে সেই কেউটে শনিঠাকুরটা এলে জুতিয়ে লম্বা করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।' এ কথা শুনে মনে পড়ে গেল একটা কথা। আমাকে বারবার বলেছিল, 'যে হেতু ছেলেদের পড়ান, এবং বাবার এত প্রিয় বলে আপনাকে বেগম কিছু বলে না।' আপনি যেভাবে কথা বলেন, অন্য কেউ বললে মার খেত। বেগম সাহিবা, আলি আকবরের একটি ছাত্রকে মদ খাওয়া দেখে, যোধপুরে মারতে মারতে বাড়ীর বাইরে বের করে দিয়েছিল।' দেখলাম সেই মারমূর্তি। সত্যই এবারে শনিঠাকুর এলে তার ভালভাবে ধোলাই হবে। যাক জগদীশ চ্যাটার্জির মধ্যস্থতায় সব ভুল ভাঙল। সেই, এই ব্যাপারটার সমাধান করল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাই জগদীশের কথায়। সত্যই মানুষ চেনা বড় কঠিন। মা একটা দামী কথা কয়েকবার বলেছেন। মা কথায় কথায় দুষ্ট লোক দেখলে বলতেন, 'বেডা সেই সব মালী থেকে সাবধানে থাকবে। তোমাকে দেখিয়ে দিনের বেলায় গাছে জল দেবে, আর রাতের বেলায় সব ঘুমিয়ে পড়লে, গাছের জড় কাটবে। তুমি মালির গাছে জল দেওয়া দেখলে, কিন্তু আড়ালে যে রাত্রে জড় কাটছে, টেরও পেলে না। একদিন দেখলে বিরাট গাছ, জড় থেকে ভেঙে পড়ে গিয়েছে। সুতরাং যারা মুখের উপর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তাদের থেকে সাবধানে থেকো।'

যাক যে কথা বলছিলাম। এর পর আলি আকবর কাবুল বাজাতে গেছে। ইতিমধ্যে বাবা জব্বলপুর থেকে মৈহারের মহারাজার গাড়ীতেই ফিরে এসেছেন। মৈহারের মহারাজকে কঞ্জুসই বলব। কঞ্জুস না হলে বাবাকে কেবল একটা ধুতি এবং মায়ের জন্য একটা শাড়ী দিয়েছে। অবশ্য খুব একটা দোষ দেওয়া চলে না। অধিকাংশ রাজাদের রাজত্ব যাবার পর, বাইরে ঠাঁট বজায় রাখতে, ভেতরের জমা, শূন্যতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবা আসার পর মৈহারের তরফ থেকে ফুটবল খেলেছি কাটনির খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে। ফুটবল ফেডারেশনের তরফ থেকে বাবাকে অনুরোধ করেছে, খেলোয়াড়দের হাতে প্রাইজ দেবার জন্য। বাবা খেলা দেখেছেন এবং পরে বাবার হাতে প্রাইজ নিয়েছি। বাবা বাড়ীতে এসে আমাকে বললেন, 'খেল তো ভাল, কিন্তু ভাল বাজাতে পার না কেন খেলার মত?' কাটনির বাঙালী খেলোয়াড়দের অনুরোধে, বাবা বাড়ীতে ডেকে, আমাকে এবং আশিসকে নিয়ে বাজনা বাজিয়েছেন।

আগামীকাল দীপাবলি। আজ বাবা দিল্লী যাবেন। বাবা চলে যাবেন বলে মণিকা দেবী ইন্দ্রনীলকে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মণিকা দেবীকে দেখে, বাবার মনে কি হোল জানি না, আমাকে ডেকে পাঠালেন। মণিকা দেবীকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার এই বৌমা কত আশা নিয়ে এসেছে নিজের ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু আমি তো কিছু শেখাতে পারলাম

না। আমি যতদিন না আসি তুমি ইন্দ্রনীল নাতিকে রোজ শিখিও।' মনে মনে ভাবলাম, বাবার এ কি পরীক্ষা। যদি বলি শেখাব, তাহলে বাবা বলবেন, 'খুব বড় উস্তাদ হয়ে গিয়েছ?' সুতরাং বাবাকে বললাম, 'আমি কি শেখাব? আমি জানিই বা কি?' আমার কথার মাঝে বাবা বললেন, 'আরে না, না, তুমি ইন্দ্রনীল এবং দ্যুতি কিশোরকে শেখাবে। তুমি ওদের তৈরি কর। আবোল তাবোল বাজায়। প্রথম থেকে সিলসিলা ভাবে শেখাবে। তারপর আমি এলে যাতে আমার মাথা খারাপ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।' বুঝলাম বাবা আন্তরিক ভাবেই বলছেন। সুতরাং সম্মতি জানালাম। সংসার খরচার জন্য বাবা পাঁচশো টাকা দিয়ে গেলেন।

মনে হচ্ছে বাবা বেশ কয়েক মাসের জন্য গেলেন। বাবা গেলেন দিল্লী রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনে। বাবা দিল্লীতে ছায়ানট বাজিয়েছেন। এ বাজনা শুনে মনে হয়েছে বাড়ীতে একলা যেমন বাজান সেইরকম বাজিয়েছেন। সুরশৃঙ্গার বাজিয়েছেন, আসলে তবলাবাদক ছিলো না বলে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ জোড় বাজিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ান ডেলিগেশনে রবিশঙ্কর রাশিয়া গিয়েছে।

আজ দীপাবলী। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালান হয়েছে। হঠাৎ একটি গাড়ী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখি গাড়ী থেকে নামছে আলি আকবর। আলি আকবরের সঙ্গে রয়েছে নিখিল এবং এক ছাত্র। ছাত্রটির নাম দেবদাস। বম্বে থেকে সোজা গাড়ী করেই আলি আকবর এসেছে। বাড়ীতে এসে মুখ ধুয়ে, উপরে আমাকে ডাকলেন। নিখিল এবং দেবদাস নূতন যে ঘর হয়েছে তার মধ্যে গেল। এ দিকে আলি আকবর বোতল এবং গ্লাস নিয়ে বসেছে। নানা বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং গ্লাস খালি হয়ে আবার গ্লাস ভরছে। মেজাজে আসবার পর, আলি আকবর খুব সহজ ভাবে বলল, 'রবিশঙ্কর জুবেদা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছে।' আলি আকবরের কাছে রবিশঙ্করের মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এ কি ধরনের কথা। রবিশঙ্করের এ কোন রণনীতি? এ নীতি তো শনিঠাকুর থেকেও গর্হিত। রবিশঙ্কর কি নিজেকে অত্যন্ত চতুর মনে করে? আলি আকবরকে ঠিক হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছে। সর্বদাই আলি আকবরকে দেখি, রবিশঙ্করের পরামর্শে সব কাজ করে। কিন্তু আমাকে কি হাতের পুতুল ভাবে? মনে পড়ে যায় বাবার কথা। বাবার কাছে একটা কথা এ যাবৎ বহুবার শুনেছি। কেউ চালাকি কিংবা কেউ যদি বোকা বানাতে যায়, বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান, আর সব গরু, জান না যে যারে ঠকাতে চায়, সে তার গুরু।' কয়েকটা ঘটনার পর বুঝতে পেরেছি, রবিশঙ্কর সকলের সঙ্গে বাইরে সরলতার ভান করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেবারে ভিন্ন। যদিও কেন জানি না, রবিশঙ্করের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে, কিন্তু তার মুখোশ খুলে দিতে পারি নি একটি মাত্র কারণে। কারণটি হল অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী। একে তাদের মধ্যে বনিবনা নেই তারপর যদি আমি এইসব কথা বলি, তাহলে যেটুকু বনিবনা আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। এই একটা কারণেই কেবল আজ নয়, এর পরেও দীর্ঘকাল চুপ করে থেকেছি যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু চুপ করে থাকারও তো একটা সীমা আছে। আজকের এই ঘটনার পর দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর একটি কারণেই মুখ খুলিনি। দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়। আমার চোখ মুখের ভাব দেখে বোধ হয় আলি আকবর কি বুঝল জানি না, হঠাৎ বলে বসল, 'আরে

কি ভাবছ তুমি? আমি একটা জোক করলাম।' এ কথা শুনে আমি অবাক। এ কি ধরনের জোক? আলি আকবরের স্ত্রীর সম্বন্ধে রবিশঙ্কর এ ধরনের নিকৃষ্ট কথা বললেও, আলি আকবর কখনও এ ধরনের কথা বলতে পারে না। এর পরেই আলি আকবর আমাকে বলল, 'তুমি মৈহারে আছ বলেই নিশ্চিন্ত আছি।' আলি আকবরের কথা শুনে মনে হোল, আলি আকবরের তুলনা আলি আকবরই। রাত্রে খাবার পর আলি আকবর দুটো ট্যাবলেট খেয়ে বলল, 'আজকাল পেটে খুব ব্যথা হয়, যার জন্য ডাক্তার ঔষধ খেতে বলেছে।' এ কথা শুনে বললাম 'পেটে ব্যথা হওয়া ভাল নয়। গেলাসটি খাওয়া বন্ধ করুন।' দার্শনিকের মত উত্তর পেলাম, 'একদিন তো মরতেই হবে, সুতরাং ভোগ করে মরাই ভালো।' এ কথার আর কি উত্তর দেব? চলে এলাম নিজের ঘরে।

পরের দিন, সকালে আলি আকবর বাড়ীর সকলকে নিজের গাড়ীতে সাতনায় নিয়ে গেল, বাবার প্রথম ছাত্র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যতীন ব্যানার্জির বাড়ী। মা, ছেলের গাড়ীতে বাইরে যাবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী। বাড়ীতে রইলাম আমি, নিখিল আর আলি আকবরের ছাত্র দেবদাস। নিখিলের মুখে শুনলাম, আলি আকবর তার বাজনা ঠিক করে দিয়েছে। এবারে তানসেনে সে বাজাবে। আমার সঙ্গে বাজাল। প্রথম যখন মৈহারে আসে সে সময় মনে হয়েছিল রবিশঙ্করের ঢঙ্গে বাজাচ্ছে। যতই হোক ছোট থেকে বাজাচ্ছে। কিন্তু আজ একসঙ্গে বাজিয়ে মনে হোল বাবার কৃপায় আমি খুব খারাপ বাজাই না। নিখিল বলল, ' মৈহার থেকে আপনি গেলে আমরা দুজনে ডুয়েট বাজাব। যেমন ডুয়েট বাজায় দাদা আর রবুদা।' আলি আকবর আমাকে বলল, 'আশিসকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব কোলকাতায়। কোলকাতায় তানসেন কনফারেন্সে রবিশঙ্কর এলে, তার সঙ্গে দিল্লীতে আশিসকে পাঠিয়ে দেবো। দিল্লীতে অন্নপূর্ণার কাছে শিখবে এবং শাসনের মধ্যে থাকবে।' কথাটা আমি সমর্থন করলাম। মৈহারে দুদিন থেকে আলি আকবর আশিস, নিখিল এবং দেবদাসকে নিয়ে সকাল বেলায় কোলকাতায় রওনা হোল।

আলি আকবর যাবার কিছুদিন পর কাশী থেকে চিঠি পেলাম। কবিরাজ আশুতোষ জানিয়েছে যে বাবা কাশীতে গুল্লুজীর গুরুভাই বিমলাকান্ত চ্যাটার্জির বাড়ীতে ছিলেন। বিমলাকান্ত বাবার কাছে গণ্ডা বেঁধেছে। যেহেতু বিমলাকান্তর বাবা কালীসাধক ছিলেন এবং বাড়ীতে রোজ কালীপুজো হয়, সেই জন্য বাবা তার বাড়ীতে থাকতে সম্মত হয়েছেন। এ ছাড়া সঙ্গীত পরিষদের মাসিক অনুষ্ঠানে কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে বাজনা হয়েছে। কাশীর সঙ্গীত প্রেমীরা মুগ্ধ হয়েছে বাজনা শুনে। নূতন খবরের মধ্যে, গিরিজা দেবীর অনুরোধে তার বাড়ীতে কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে বাজিয়েছেন। গিরিজা দেবীর সঙ্গে এক বছর আগে কোলকাতায় আলাপ হয়েছিল। গিরিজা দেবী কন্যা হিসাবে বাবাকে, বাবা বলাতে আপত্তি করেন নি। গিরিজা দেবীর কন্যার জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। বাজাবার পর গিরিজা দেবী টাকা, ধুতি এবং চাদর দিতে গেলে, বাবা নিতে অস্বীকার করেন। কণ্ঠে মহারাজ বাবাকে গিরিজাদেবীর তুচ্ছ ভেট শ্রদ্ধার সঙ্গে দিচ্ছে বলে, গ্রহণ করতে অনুরোধ করাতে বাবা বলেছেন, 'নিজের মেয়ের কাছে কোন জিনিষ নেওয়া যায় না।' কাশীতে

বাজিয়ে বাবা কোলকাতায় তানসেন কনফারেন্সে বাজিয়েছেন। আশুতোষও প্রতিবারের মত তানসেনে এবারে নিখিলের সঙ্গে বাজিয়েছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে ফিরে রবিশঙ্কর কোলকাতায় এক রাজবাড়ীতে ছিল। রবিশঙ্কর পেটের ব্যথায় কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিল। রবিশঙ্করের এক বন্ধু দুর্গার শুশ্রূষায় এখন ভাল আছে। বাবা বাইশে নভেম্বর ঢাকা পৌঁছবেন। আশুতোষের দীর্ঘ চিঠি পড়ে সব জানতে পারলাম। বাবা আজ কুড়ি দিনের উপর চলে গেছেন মৈহার থেকে। কিন্তু বাবার কোন চিঠি ইতিমধ্যে আসে নি। বাবা চিঠি না লিখলেও, পরের দিন দক্ষিণারঞ্জনের চিঠিতে বাবার সংবাদ পেলাম এবং জানতে পারলাম আশিস দিল্লী চলে গিয়েছে। বাবা দুইমাসের ছুটির দরখাস্ত করতে বলেছেন চিফ সেক্রেটারিকে। বাবার দুই মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করলাম। বাবা সংসার খরচের জন্য উনিশশো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মার কাছে টাকা দিলাম।

মৈহারে দ্যুতি এবং ইন্দ্রনীলকে শেখাবার সময় মাথা গরম হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই বলি, 'রিয়াজ না করলে আর শেখাব না।' মাঝে মাঝে দ্যুতি এবং ইন্দ্রনীলের ছেলেমানুষি দেখে হাসি পায়। পালবাবুর মেয়ে মুন্নির মাথা ভাল। রিয়াজ করে, কিন্তু বৃথাই পরিশ্রম হবে। কেননা সময় হলেই শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে। বাবা না থাকায় মৈহারে জীবনযাত্রা সবই অনিয়মে চলে।

আজ ঢাকা থেকে মোবারকের টেলিগ্রামে জানলাম, বাবা ভালভাবে কুমিল্লা পৌঁছে গেছেন। মোবারক হল বাহাদুরের ছোট ভাই। কয়েকদিন পরেই মা বললেন, 'তোমার বাবা এলে তো সিনেমা দেখতে পারব না। বৌমা এবং নাতিদের নিয়ে একটা নতুন ভাল সিনেমায় আজ যাব।' বুঝলাম মাকে দিয়ে বলান হোল সিনেমার কথা। মা কি করে জানবেন ভাল সিনেমা এসেছে। মাঝে মাঝে নাতিদের এবং বৌমার জন্য যেতে চান। পোষ্ট অফিসে যাবার সময় দেখেছি, ছবির নাম 'শাহেনসা'। সকলে সিনেমা দেখতে চলে গেল। আমি বাড়ীতে বসে নিশ্চিন্ত মনে বাজালাম। সিনেমা দেখে এসে বেগম বললেন, 'শাহেনসা' বইটির পরিচালক কমলার স্বামী অমিয় চক্রবর্তী। এই কমলার জন্যই অন্নপূর্ণার জীবনে অশান্তি এসেছে। রবিশঙ্করের ভাই রাজেন্দ্রশঙ্কর বইটির সিনারিওগুলি লিখেছে। রাজেন্দ্র শঙ্করের স্ত্রী লক্ষ্মী শঙ্করের আপন বোন হল কমলা।' কমলা নামটা আগেও একবার শুনেছিলাম জুবেদা বেগমের মুখে, কিন্তু এ কথা রবিশঙ্কর বা অন্নপূর্ণা দেবীকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি। বহুদিন আগে যখন কমলার নাম শুনেছিলাম, সেই সময় ভেবেছিলাম রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু রবিশঙ্কর যখন এসেছে তখন মনে ছিলো না। চুপচাপ শুনে গেলাম সিনেমার গল্প। পরের দিন বইটি দেখতে গেলাম। বইটি গ্যাভাকালারের। নৃত্যের পরিচালনা করেছে মৈহারের ছেলে বিনোদ চোপড়া। মৈহারে তার বাবা ফকিরচাঁদ চোপড়ার সঙ্গে দেখা হল। খুব খুশী ভাব, কেননা ছেলে নাচের নির্দেশক।

আজ মাসের শেষ। হঠাৎ মৈহারের রাজকুমার গাড়ী পাঠিয়েছে। ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, রাজকুমার অনুরোধ করেছে একবার রাজবাড়ীতে যাবার জন্য। রাজকুমারের কাছে গেলাম। রাজকুমার জোর করে লুচি মাংস খাওয়ালেন। তারপর বললেন, 'আমি যখন রাজ কলেজে পড়তাম সেই সময় সঙ্গীতের যে অধ্যাপক ছিলেন, মৈহারে আসছেন কিছুদিনের

মধ্যে। আমার অনুরোধ এখানে তাঁর সামনে একদিন আপনি বাজান।' এ কথা শুনে বুঝলাম কেন লুচি মাংস জোর করে খাইয়েছে। বললাম, 'অধ্যাপককে বাড়ীতে নিয়ে এলে শোনাব। কিন্তু রাজবাড়ীতে গিয়ে বাজাব না।' বহু বলার পরও রাজী হলাম না দেখে রাজকুমার বাড়ীতে আসবে বলল। বাড়ীতে এসে ঘরে দেখলাম, আমার বই এবং চিঠি সব অগোছাল হয়ে রয়েছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার ঘরে কে ঢুকে বই এদিক ওদিক করেছে?' জুবেদা খাতুন বললেন, 'প্রাণেশ ঢুকেছিল।' একটু পরে ধ্যানেশ আমাকে বলল, 'মা আপনার ঘরে গিয়েছিল।' আমি হতবাক। বাবার অবর্তমানে এ ধরনের বহু ঘটনা আমার মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সে সব ঘটনার কথা না বলাই ভাল। রাগ হলেও করুণা হয় জুবেদা খাতুনের উপর। কি অভিশপ্ত জীবন তাঁর। সব থেকেও কিছু নেই। কি করে কাটাবে? কিছু তো একটা করতে হবে। সংসারের মধ্যে মাঝে মাঝেই অশান্তির সৃষ্টি করেন, যার ফলে ছেলেদের নির্যাতন হয়। বাবার মত আদর্শ চরিত্রর সান্নিধ্যে এসেও, কি করে সকলে অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলে, এবং মিথ্যা কথা বলতে শেখায় এ আমার বোধগম্যের বাইরে। বাবার পরিবারে, বাবা ছাড়া দুজন কেবল এর ব্যতিক্রম। কিন্তু অন্যরা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দ্যুতির বাড়ী থেকে চিঠি এল। জমিদারি চলে গেলেও, এখনও তার বাবা পাকিস্থানে মুক্তাগাছায় আছেন। কোন বিশেষ কারণে কাশী হয়ে কোলকাতায় যেতে হবে। দ্যুতির মন খারাপ, শিক্ষা হবে না বলে। দ্যুতিকে বললাম, 'সব কাজ সেরে মৈহারে এসো।' সত্যই দ্যুতির জন্য দুঃখ হয়। এত বড় জমিদারের ছেলে হয়ে, মৈহারে এসে কি সাধারণ জীবন যাপন করছে। দ্যুতির ঠাকুরদা গান গাইতেন। জন্মসূত্রে সেইজন্য সঙ্গীতের প্রতি দ্যুতির আকর্ষণ।

দিল্লি থেকে আশিসের চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানিয়েছে, গত তেসরা ডিসেম্বর রবিশঙ্কর কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ী ফিরেছে। কিসের জন্য হাসপাতাল গিয়েছিল কিছুই লেখে নি। আশিসকে সব বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখতে বললাম। দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানিয়েছে, বাবার ফিরতে হয়ত দেরী হতে পারে। অবাক হলাম। বাবা এ যাবৎ কোন চিঠি, কেন দিচ্ছেন না? মা বাবার জন্য চিন্তিত হয়ে আছেন। মা আমাকে বললেন, 'বেডা আমার নাম করে একটা চিঠি দাও। শেখ আলি আমেদ তোমার বাবার নামে কনফারেন্স করছে, তাতেও আসছে না। দেশে এতদিন কি করছে?' মার কথামত মার জবানীতে একটি চিঠি লিখলাম। রেডিও থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে বাজাবার চিঠি এল। বাবাকে রেডিওর চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। পরের দিন বাবার চিঠি পেলাম। চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

শিবপুর হইতে
১-১২-৫৪

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার দুইখানা পত্রই পাইলাম, উত্তর দেওয়ার সময় পাই নাই। মর্জ্জিদের জিনিসপত্র জুগার করিতে সময় গেছে সিমেন্ট পেয়েছি, সব এনে মর্জ্জিদের কার্য্য

আরম্ভ করেছি, কতদিন লাগিবে তাহা বলতে পারি না যতদিন লাগে আমার বাদ্ধ হয়ে থাকিতে হবে এরজন্য তুমরা চিন্তা করিবে না। এসব খাটনিতে ও এখানের জল খাওয়ার দুরূন শরির দুর্ব্বল হয়ে পরেছে চিন্তার কারণ নেই, নিজে হাতে রান্না করি, এখানে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল সব চুরি করে নিয়ে গেছে, নতুন জিনিষপত্র কিনে এনেছি রান্না করার জন্য, এর জন্য চিন্তা করি না। রিবাতে একটা দরখাস্ত করে দিবে গবরনরের কাছে, দুই মাস চেয়ে আর ১৫ দিন দেরি হতে পারে, মর্জ্জিদের কার্য্য শেষ না করে কিছুতেই আসিতে পারিব না।

টাকা পয়সার অনটন হলে তুমার দাদাকে জানাবে সে পাঠাবে। সকলকেই আমার দুয়া আর্সিব্বাদ জানাবে, একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি। ইতি—

বাবা
আলাউদ্দিন

পুঃ : ঢাকাতে ডাক্তার টাইটেল পাকিস্তানে দিয়েছে—
ঠিকানা—ডাঃ আলাউদ্দিন খান
পোঃ আঃ শিবপুর, গ্রাম-শিবপুর, ভায়া ব্রাহ্মণ বারিয়া
জিলা-ত্রিপুরা, পাকিস্থান।

পাঁচদিন হলো আশিসকে চিঠি দিয়েছি। আজ আলি আকবর একশো টাকা পাঠিয়েছে মায়ের নামে। মাকে টাকা দিলাম। মা টাকাটা নিজের বৌমাকে দিলেন। মানসিক চিন্তার মধ্যে দিন কাটছে। বাজনা বাজাচ্ছি। একটা বিকট চিৎকার শুনে দেখি প্রাণেশের কপাল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। হঠাৎ কি হল? শুনলাম প্রাণেশকে ডাকা সত্ত্বেও আসে নি, বলে, জুবেদা খাতুন রুটি বেলার বেলুন দিয়ে মেরেছেন। যার ফলে রক্ত বেরোচ্ছে। বাবার অবর্তমানে, রোজ একটা না একটা অঘটন লেগেই আছে। কিন্তু আজ রাগের চোটে প্রাণেশের মাকে বললাম, 'যেমন মেরেছেন সেই রকম নিজে হাসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আনুন।' আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমার কথা শুনে আর মুখে কথা নেই। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আনলাম। বাড়ীতে আসবার কিছু পরেই কপির সিঙ্গাড়া পেলাম। আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আয়োজন। মনে দুঃখও লাগে আবার হাসি পায়।

ডি.এম. মৈহারে এসে, আমাকে বললেন, 'বাবা কবে আসবেন? দু'মাসের ছুটিতো, প্রায় শেষ হয়ে এলো। মৈহারে সঙ্গীত বিদ্যালয় কি করে হবে, যদি বাবা না আসেন।' বললাম, 'খবর পেয়েছি বাবার আসতে দেরী হবে।' ডি.এম. আমাকে বললেন, 'একটা চিঠি লিখে দিন চিফ সেক্রেটারির নামে। বাবার শরীর খারাপ হয়েছে, সুতরাং চিঠি পেলেই জানাব বাবা কবে আসবেন।' ডি.এম.-এর কথামত, বাবার শরীর খারাপ বলে চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে কোলকাতা থেকে দ্যুতির চিঠি পেলাম। দ্যুতির মোটরের ধাক্কায় একসিডেন্ট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন পরে বাড়ীর কাজে কুলটি যাবে। তারপর মৈহার আসবে।

এতদিনে আশিস এবং শুভর চিঠি পেলাম। আশিস লিখেছে, দাদু তাকে ঢাকাতে ডেকেছে। শীঘ্রই যাবে। নূতন বছরের জন্য একটা ডাইরি পাঠিয়েছে। শুভর চিঠিটা পড়ে

হাসি পেল। ছেলেমানুষী ভরা চিঠি। আশিস চিঠি লিখেছে, কিন্তু কিসের জন্য রবিশঙ্কর হাসপাতালে গিয়েছিল কিছু লেখে নি। আশিস কি আমার চিঠি পায় নি?

আজ খ্রিষ্টমাস ডে। অ্যালাবিয়া আমাকে কেক খাওয়ালেন। দুপুরে, খাবার সময়ে দেখি মা অনেক রকমের রান্না করেছেন। কি ব্যাপার? মাকে জিজ্ঞাসা করাতে হেসে বললেন, 'আজকের দিনে শুনলাম সকলে খুব আনন্দ করে। সেই জন্য কয়েক রকমের রান্না করেছি।' মার কথা শুনে হাসি পেল। বুঝলাম মণিকা দেবীর কাছে মা শুনেছেন খ্রীষ্টমাস ডে'র কথা।

পরের দিন জব্বলপুর থেকে একটা বাঙালী ভদ্রলোক এলেন একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটি সেতার বাজায়। বাবার কাছে এসেছিলেন মেয়েটি, যদি বাবার আশীর্বাদ পায়। ভদ্রলোক জব্বলপুরের কাছে খামারিয়াতে থাকেন। মেয়েটি জব্বলপুরে শিখেছে, কিন্তু বুঝতে পারছে, এই ধরনের শিক্ষায় কোন দিন জলসায় বাজাতে পারবে না। ভদ্রলোকের উপাধি কর। অরডিনেন্স ফ্যাকটারিতে কাজ করেন। বাবা নেই জেনে, আমার পরিচয় পেয়ে অনুরোধ করল প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য। আগ্রহ দেখে বাধ্য হয়ে রাজী হলাম। খুশী হয়ে কর চলে গেলেন।

প্রায় কুড়িদিন পর বাবার, দুটি পত্র একসঙ্গে পেলাম। আমাকে ও মাকে লেখা পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

শিবপুর হইতে
পোঃ শিবপুর
শিবপুর

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্রে প্রগ্রাম লিষ্ট পাইলাম দস্তখত করে এলাহাবাদ রেডিওতে পাঠিয়েছি। মর্জ্জিদের কার্য্য সারিতে আর ১ মাস লাগিবে, এই সঙ্গে পিতামাতার কবরস্থান পাকা করা আরম্ভ হয়ে গেছে। এরপর সম্পতি যা আছে তাহা দেবত্তর করিতে হবে। তারপর ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার বাটিতে আলাউদ্দিন সঙ্গীত কলেজ স্থাপন করার বাসনা করি। তারপর শিবপুর গ্রামে মায়য়ার স্কুল খুলিবার বাসনা আছে, এসব করিতে বহু টাকার দরকার। এসব বিসয় নিয়ে রাত্রদিন চিন্তা করি কি যে হবে, কি করিব তাহার নিচ্চয় নেই। মাইহারের সংস্বারের চালাবার মালিক হল তুমার দাদা সে এখন চালাবে, এখানে এসে পরেছি এজন্য সেখানের চিন্তা আর আমার নেই, আমার যথাসাদ্ধ চালিয়ে এসেছি এখন আমার অসাদ্ধ আমি আর মাইহারের ভার বহন করিতে পারিব না। তুমার বড়দিদি ও তার ছেলে আমার কাছে এসেছে, তুমার দিদির শরির ভাল নয় তার সেবা করি, ও ভিক্ষা করিতেছি যা পাই মর্জ্জিদে লাগাইতেছি। মাইহারের সংসারের খরচের জন্য তুমার দাদাকে লিখিবে, আমাকে জানালে কিছু হবে না এক কর্দ্দপ সাহায্য করিতে পারিব না, মাইহারের সেবা পরিত্যাগ করিলাম, কবে আসিব তারও নির্চ্চয় নেই, সংসার খরচের জন্য তুমার দাদার কাছে চাহিবে আমার কাছে নয়, আমি এখন সব দায় হতে মুক্ত হয়ে এসেছি, এখন যার সংস্বার সে চালাবে।

তুমার শিক্ষার ভারও তুমার দাদার কাছে, আমি যদি এ সব কর্ম্ম করে ফিরে আসি তবে

আমার কাছে শিক্ষা পাইবে এই হল আমার মনের ইচ্ছা, এক পেট কুনরকমে ভিক্ষা করে চালাব। এসব কথা কারূর কাছে বলিবে না, রিবাতে বলিবে গবরনরের কাছে মর্জ্জিদের কায শেস হয় নাই, শেষ হলেই আসিবে। একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা
আলাউদ্দিন।

পুঃ : শ্রীমান বাবা যতীন শ্রীহট্টের দিষ্ট্রিক ম্যাজেষ্ট্রেট, এসডিও, আমাকে ধরেছে কাশী হতে শ্রীযুক্ত কণ্ঠে মহারাজকে এখানে এনে আমরা দুজনের বাদ্য একসঙ্গে শুনিতে চাহেন, শ্রীমান আশু দাদুকে ধরে এই সম্বন্ধে তিনির সঙ্গে কথা বাত্তা বলে ঠিক করাবে। কণ্ঠে মহারাজ পাকিস্থানে আসিতে সিকৃত আছেন কিনা ও আসিবেন কি না, যদি সিকৃত হয় তবে, এক ২টি মুজরা, আইটেমে কত করে নিবেন, সব পরিস্কার করে ঠিক করে, আমাকে ব্রাম্মন বাড়িয়ার ঠিকানায় সত্তর জানাবে, নচেৎ রামপুর নবাবকে লিখে থেরেকুয়া আহাম্মদজানকে আনাবে। আমি বলেছি কণ্ঠে মহারাজকে আনবার জন্য। তিনি আসতে সিকৃত হলে পাসফুট এবং টাকা পয়সা হিন্দুস্থানে পাইবার বন্দবস্ত করা যাইবে, যাতায়াৎ খরচ পাইবে খাওয়া দাওয়া সব পাহিবে। রূজার ইদের পর জলসাকরিতে চায়, আসতে যদি সিকৃত হয় তবে সিঘ্র আমাকে জানাবে। শ্রীমান আশুদাদুর মারফতে ঠিক করিবে, দাদুকে স্নেহ নববর্সের আসির্ব্বাদ জানাবে। তুমরাও নববর্ষের আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। আমি এসিডিউর সঙ্গে কথা দিয়েছি কন্টে মহারাজকে জানাবার জন্য এজন্য পত্রে জানালেম যদি সিকৃত হয় ঠিক, না হলেও ঠিক, এ বিসয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাহি না, মাত্র এদের ইচ্ছা জানালেম।

ইতি—
বাবা

পুঃ : আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে কিছু সহায়তা করিবে না যা কর সত্য কথা দিয়ে করিবে। এজন্য আমি দুঃখিত হলেম। এদের যদি কলেজ হয় তবে যাইব নচেৎ এখানেই ইচ্ছা করি বাকি জিবন কাটাইতে এই কথাটুকু মনে রাখিবে। মাইহারে আমার জিবন নষ্ট করেছি কুপাত্রে সঙ্গীৎ দান করে, এখন আর ইচ্ছা করে না অসৎ সঙ্গ করিতে, এখন শান্তী চাই মিথ্যা কথা আমার কাছে বলিবে না

ইতি—
বাবা

ব্রাম্মন বাড়িয়া
পোঃ ব্লিজঃ ব্রাম্মন বাড়িয়া
জিলাঃ ত্রিপুরা

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পূর্বের্বর পেয়ে শিবপুর হইতে চেক ও পত্র রেজিষ্টারি করে পাঠিয়েছি বুধ হয় পেয়ে থাকিবে। মর্জ্জিদের খরচের জন্য না না জায়গায় বিক্ষা করিতে হয়েছে

এজন্য আমি খুব অস্থীর ছিলাম ভগবত কৃপায় মর্জ্জিদের ও আমার পিতা মাতার কবরের কার্য্য সুন্দর মতে সমাধা হয়েছে। ৫ দিন হল আমি তুমার দিদিকে নিয়ে ব্রাম্মন বাড়িয়া এসেছি তাহার চিকিৎসা রিতিমত করিতে হবে। তাহার শরির ভাল হইলেই আসিবার চেষ্টা করিব, মাইহারে শিক্ষার্থী যারা আছে তুমি তাহা ধিগকে শিক্ষা দিবে, তুমার মায়ের চিঠিতে বিস্তারিত অবগত হবে, তুমার দাদা মাইহারে এসে যতদিন বাস করিবে তাহার কাছে ততদিন শিক্ষালাভ করিবে, এখন তুমার কটুর সাধনার প্রয়োজন সাধনা করিলে সিদ্ধ হবে আমার শিক্ষা আমি দিয়ে এসেছি কুনরূপ ত্রোটি করি নাই। বিশেষ করে কি জানাব একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি—

ইতি—
বাবা

ব্রাম্মন বাড়িয়া হইতে

কল্যানিয়াবর,

তুমার পত্র পাইলাম, আমি একরকম ভালই আছি মর্জ্জিদ ও পিতা মাতার কবর স্থান কার্য্য শেষ করে তুমার মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে ব্রাম্মন বাড়িয়ার বাসাতে এসেছি, মেয়ের চিকিৎস্বার জন্য আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি ঔষধ কিনে এনেছিলেম সেইগুলি এতদিন সেবন করিয়েছি এর দ্বারায় অনেকটা আরূজ্ঞের দিয়ে যাইতেছে, তুমার মেয়েই আমাকে রান্না করে খাওয়াইতেছে মানা করি রান্না করিতে সে কিছুতেই আমার কথা শুনে না, জুর করে রান্না করে, চমৎকার রান্না করে। আমাকে বলে, বাবা সেখানে ভাল খাওয়া খেতে পাইনাই এজন্য আমি খাওয়া ছেরে দিয়েছি, বাবার কাছে এসে আমি ভাল খেতে পাইতেছি, এমোন খাওয়া পেলে আমি ভাল হয়ে যাব এসব তুমার মেয়ে বলে, আমাকে ছেরে জামাতার ঘরে জাবে না বলিতেছে এখন কি করা যায় তুমি আমাকে জানবে। শ্রীমান দক্ষিনা বাবার ৯০০্ সত টাকা দিয়ে এসেছি ঐ টাকা তুমি পেয়েছ কিনা শ্রীমান জিতেনের পত্রে জানাবে। মর্জ্জিদের পচ্ছিমের কাটা পুকরটা বন্দবস্ত নিতেছি সেটা পেলে কাটিয়ে মর্জ্জিদের জায়গার পারটা আর চৌরা করিব বাড়ি ও স্কুল মাদরসা করার জন্য, মর্জ্জিদের পুকুর রিজাব করে দিয়েছি, কাটা পুকুর কাটাতে পারিলে এ পুকুরে স্নান করিবে মর্জ্জিদের পুকুরে জল পান করিবে। অনেক কার্য্য আমার বেরে গেছে, বিক্ষা করে যদি টাকা পাই এসব কার্য্য শেষ করে তবে মাইহার আসিব। শিবপুরের জমা জমি বাড়ি সব আলি আকবরের নামে দানপত্র করিতে হবে সরিজাকে জা দিতে হয় নগদ দিয়ে দিব অন্নপূর্নাকে মাইহারের জায়গা দেওয়া হইয়াছে, এসব ঠিক করে তবে আসিব যদি পরম আয়ো থাকে তবে। তুমার মেয়ে তুমাকে আদাব সেলাম বলিয়াছে নাতির সেলাম সকলে নিবে। সকলে আমার আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

শ্রীমতি মদিনা খাতুন
মাইহার

ইতি
তুমার স্যামি

বাবার চিঠি পড়ে অবাক হলাম। বাবার এখন অনেক দিন লাগবে শিবপুরে। নানা পরিকল্পনা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা মার জবানী হয়ে যে চিঠি লিখেছিলাম, বাবা তার উত্তর দিয়েছেন মাকে। মা জীবনে এই প্রথম চিঠি পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে। মা চিঠিটা শুনে বললেন, 'বেডা এই চিঠিটা তোমার কাছে রেখে দাও। নাতিরা এই চিঠিটা কোন দিন যদি দেখে, তাহলে কি বলবে? তোমার কাছে চিঠিটা থাকলে পরে আবার তোমার কাছে এসে শুনব।' মার কথা শুনে আমি তো অবাক। মা কত সহজ, সরল এবং লাজুক। আশিসের মাকে বাবার চিঠিটা পড়তে দিয়ে বললাম, 'আলি আকবরকে লিখুন, বাবা না আসা পর্যন্ত যেন টাকা পাঠায়।' চিঠিটা পড়ে আমাকে বললেন, 'বাবা আপনাকে লিখেছেন সুতরাং দায় আপনার।' বাধ্য হয়ে আলি আকবরকে চিঠি দিয়ে সব জানালাম।

বছরের শেষ দিনে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের চিঠি পেলাম। শিক্ষা মনমত হচ্ছে না বলে দুঃখ করে লিখেছে। দিল্লিতে ছাত্রদের ভীড়ে সে কলকে পাচ্ছে না। ভেবেছিলাম ছয়মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়ে ছয় বছর মৈহারে থাকা হল। এখন মনে হচ্ছে শিক্ষার অনেক বাকী।

৩৯

চসার বলতেন, 'মনেতে অনেক কথা আছে। গুছিয়ে লিখতে পারি না। মনের কথাটা যেমন আবশ্যক, তেমনি লিখতে পারাটাই শিল্প।'

আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। মনেও কথা আছে, লিখতেও পারছি, কিন্তু ভীতিটা অন্য জায়গায়। আর সেটা হলো আমার উপাদান প্রাচুর্য। ইংরেজিতে একটা কথা আছে সেগগ্রিগেসন। আমার সমস্যাটাও তাই। কত লিখি। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, 'মশাই আপনার উস্তাদের জীবনী আমাদের পড়ে কি হবে?' কথাটা হয়ত ঠিক। থালায় পরিবেশিত ব্যঞ্জনের প্রশংসা আর পাচকের জীবনী জানা, দুটো ভিন্ন কথা। তাই পরিসর বৃদ্ধি অপরাধ হবে না।

চিরকালই বড়রা ছোটদের গল্প শোনায়। বাবার এখানে এ প্রচলিত পদ্ধতি চলত না, আর সেইখানেই হলো বিপর্যয়। আমাকে গল্প শোনাতে হতো। আর শোনানর ষ্টক বাড়াতে কিনতাম বই। বসুমতি প্রকাশনে বাংলার কালিদাস সমগ্র কেনা হয়েছে। একটা একটা করে পড়ে শোনাই। কুমার সম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ আর শকুন্তলা।

এই শকুন্তলাই বাবাকে সকলের বেশী ব্যথিত করেছে। 'হিষ্ট্রি রিপিটস্' বলে একটা কথা আছে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। 'দু'একটা চরিত্র থাকে না, আর দুই একটা পরিণতি ঘটে না। বাকীটা হুবহু।

শকুন্তলা গল্প, এ যেন স্থান কাল ভিন্ন বাবার পারিবারিক জীবনী। সেকালের কন্ব, এ কালের বাবা। মৈহারের বাড়ী সেকালের আশ্রম। অন্নপূর্ণা এ কালের শকুন্তলা। শুধু একালের দুর্বাসার চরিত্রটা নেই। কিন্তু আছে। দুষ্মন্ত রবিশঙ্কর। আছে মুনিপুত্র শাঙ্গরব যতীন ভট্টাচার্য। রয়েছে ভরত শুভেন্দ্রশংকর। কিন্তু! ওই একটা 'কিন্তু' আছে। এ কালের দুষ্মন্ত কি জম্বুদ্বীপের নাম ভারতবর্ষ হতে দেবে ভরতের নামে? জানি না। দুষ্মন্তের যুগে পুত্রদ্রোহিতা ছিল না, কিন্তু এ যুগে একটা শব্দ চলে। মাঝে মাঝে ঘটেও—মিরাশি। অর্থাৎ যে সঙ্গীতজ্ঞ

পিতা, সন্তানকেও সঙ্গীতে বিপথে চালনা করে। যাক চালু জায়গায় জল পড়েছে, নিজের গতিতেই এগিয়ে যাবে। দেখাই যাক না, কোথায় যায়?

ইংরেজির নববর্ষ। ১৯৫৫ সালের প্রথম দিন বলে মা ডিম দিয়ে পরোটা করেছেন। নববর্ষ পড়েছে, মণিকা দেবীর কাছে জানতে পেরেছেন। মা আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে, বললেন, 'সকলকে চিঠি দাও। তোমার বাবাকেও একটা চিঠি লেখো আমার জবানী দিয়ে। পোষ্ট অফিস থেকে ফিরবার সময় মণিকা দেবীও ডিম, কড়াইসুটি, টমাট দিয়ে, শুকনো একটা পদ করে খাওয়ালেন। বাবা থাকলে চিঠি লিখি ভয়ে। বাবার অবর্তমানে চিঠি লিখতে আলস্য লাগে, অনেক চিঠি আসছে সুতরাং সকলকে চিঠি দিলাম। সুরদাস তবলা বাজাতে এল। সন্ধ্যার সময় বছরের প্রথম দিনে, ইমন বাজালাম। মনেমনে প্রার্থনা করলাম, অসুখে না ভুগে, মৃত্যুর দিনেও যেন বাজাতে বাজাতেই মৃত্যু বরণ করতে পারি।

পরের দিন, জব্বলপুর থেকে গুলগুলজীর ভাই কাশী, রেজিষ্ট্রি করে আশিসের মাকে গল্পের বই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং আলি আকবর তাকে দেড়শো টাকা পাঠিয়েছে। এতদিনে যদি বা টাকা পাঠাল কিন্তু এত কম কেন? যাক তবুও তো পাঠিয়েছে। আলি পত্নী যে বই আনিয়েছেন তার মধ্যে হিন্দি দেবদাস ছাড়া কোন বই পড়বার মত নয়। রুমানি দুনিয়ার কয়েকটা খণ্ড বই এসেছে। হিন্দি নভেল পড়বার সুযোগ হয় নি। তবে দেবদাস বাংলায় পড়া থাকলেও, হিন্দি দেবদাস বইটা কেবল পড়লাম। শরৎচন্দ্রের এমন একটা নভেল যা পুরোনো মনে হয় না।

বাবা না থাকলে বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যায়। আমার বাজনাও ঠিকমত হয় না। নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোথা দিয়ে যে দিন এবং রাত কেটে যায় বুঝতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সবে বাজাতে বসব, এমন সময়ে দেখি মৈহারের রাজকুমার গাড়ী করে এল। সঙ্গে এক বয়স্ক লোককে নিয়ে ঘরে এসে পরিচয় দিলো, রায়পুর রাজ কলেজের সঙ্গীতের প্রোফেসার। রাজকুমার বললো, 'মৈহারের ব্যাণ্ড পার্টিকে আগামীকাল রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন।' রাজকুমারকে বললাম, 'রেওয়া থেকে অনুমতি না পেলে ব্যাণ্ড পার্টির কোন জায়গায় বাজাবার জন্য নিষেধ আছে।' রাজকুমারের সম্মানে বোধহয় লাগল। রাজকুমার বলল, 'আজ সঙ্গীতের অধ্যাপককে নিয়ে এক জায়গায় যাবার আছে। আগামীকাল আপনার বাজনা শুনতে আসব রাজ কলেজের সঙ্গীতের অধ্যাপককে নিয়ে।'

পরের দিন সকালে রাজকুমার গাড়ী পাঠিয়ে, রাজবাড়ী যাবার অনুরোধ করে একটা চিঠি পাঠাল। রাজবাড়ীতে গিয়ে দেখি একটি বন্য বিড়াল পড়ে আছে। ভোর বেলায় শিকার করেছে। রাজকুমারের শিকারের গল্প শুনে হাসি পেল। মৈহারের মহারাজা বাঘ থেকে বহু বন্যজন্তু শিকার করে দরবার হলে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন, কিন্তু কুমার শেষ পর্যন্ত একটা বনবিড়াল শিকার করল। কথায় কথায় সেই এক আবদার, রাজবাড়ীতে ব্যাণ্ড পার্টিকে নিয়ে যাবার জন্য, এ ছাড়া আমিও যেন রাজবাড়ীতে গিয়ে বাজাই। দুটো প্রস্তাবই নাকচ করে দিলাম, যেহেতু রেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে কোন জায়গায় ব্যাণ্ড বাজাতে পারবে না বিনা অনুমতিতে; সুতরাং আমি এ দায়িত্ব নিতে পারবো না। এর ফলে বাবার কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে

হবে। আর আমি কখনও অনুমতি পাইনি কোথাও বাজাবার, বাড়ীতে এলে আমি বাজাতে পারি। রাজকলেজের প্রফেসারের, ব্যাণ্ড শুনবার ইচ্ছা জেনে বললাম, বিকেলে সকলে বাজায়, সেই জায়গায় গিয়ে ব্যাণ্ড শুনে আসতে পারেন।' রাজকুমারের আভিজাত্যে লাগছে। বারবার অনুরোধ করার পর বললাম, 'ঠিক আছে সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ড পার্টিকে বাড়ীতে ডেকে শোনাবার বন্দ্যোবস্ত করতে পারি।' রাজকুমার সম্মত হলো। দুপুরে ব্যাণ্ড পার্টির গুলগুলজীকে বললাম, 'রাজকুমার গাড়ী পাঠিয়ে দেবে। সন্ধ্যার সময়, সকলকে নিয়ে এখানে আসবেন।'

সন্ধ্যার সময় রাজকুমার এবং সেই প্রবীণ অধ্যাপক এলেন। মাকে বলে রেখেছিলাম রাজকুমারের কথা। রাজকুমার আসাতে চা, বিস্কুট, পান এবং সিগারেট দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম। এর পর ব্যাণ্ড শুরু হল। ব্যাণ্ড শুনে অধ্যাপক খুশী হলেন। এরপর আমার বাজাবার পালা। সুরদাস তবলা নিয়ে বসল। বাজনা শুনে অধ্যাপক প্রশংসা করলেন। প্রশংসা শুনে বললাম, 'আপনি সংগীতের প্রবীন অধ্যাপক। আপনার কাছে প্রশংসা শুনতে চাই না। আমার বাজনায় কি জিনিষ কম মনে হোল সেই দোষগুলি দয়া করে বলুন।' এ কথা শুনে অধ্যাপক হেসে বললেন, 'বৃটিশ রাজত্বের সময় রাজাদের ছেলের জন্য, রায়পুরে রাজকলেজের সঙ্গীত শেখাতাম। উপস্থিত সেই কলেজ সর্বসাধারণের জন্য হয়ে গিয়েছে। আমি রিটায়ার করেছি। দীর্ঘ দশবছর ধরে আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের বাজনা শুনেছি। এদের বাজনায় অনেক পরিবর্তন দেখেছি। আপনি যেহেতু জিজ্ঞাসা করলেন, সেই হেতু বলছি, 'আপনার বাজনার মধ্যে একটি জিনিষ কম মনে হয়েছে। আপনি ভাল শিক্ষা পেয়েছেন। উপস্থিত আপনার সব জায়গায় ঘুরে বাজান উচিত। শ্রোতাদের সামনে বাজাতে বাজাতে অভিজ্ঞতা বাড়বে, এই অভিজ্ঞতা বাড়াবার জন্য পূর্বের উস্তাদরা শিষ্যকে শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষার জন্য পাঠাতেন। সকলের গান বাজনা শুনবেন, নিজে বাজাবেন সর্বসমক্ষে, তার ফলে আপনার অভিজ্ঞতা বাড়বে। সুতরাং গুরুর অনুমতি নিয়ে ভারতের সব জায়গায় এখন বাজান উচিত। এই অভিজ্ঞতাটাই আপনার মধ্যে কম মনে হয়েছে।' রায়পুরের রাজকলেজের প্রবীন অধ্যাপকের কথাটা শুনে মনের মধ্যে উৎসাহ পেলাম। দেখি বাবা কবে অনুমতি দেন বাজাবার জন্য।

বাবার চিঠি পেলাম। মাকেও আলাদা চিঠি দিয়েছেন। আমাকে এবং মাকে লেখা পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

শিবপুর হইতে
পোঃ আঃ শিবপুর
গ্রামঃ শিবপুর
জিলাঃ ত্রিপুরা

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র ও প্রগ্রামের রেকডের রসিদ পাইলাম দস্তখত করে দিলেম। আমি কলিকাতা ১৩ জানুয়ারি যাইতেছি ১৪-১৫-১৬-১৭ আলাউদ্দিন সমাজে কনফ্রেন্সে যাইব ১৮-১৯ চৈলে আসিব শিবপুর। এখানে কাজ এখনও শেষ হয় নাই এসব কার্য্য শেষ করিতে আর ছয় মাস লাগিবে আর ছয়মাস ছুটির জন্য দরখাস্ত করিবে। তুমার

দিদিকে ব্রাম্মন বাড়িয়া নিয়ে গিয়ে চিকিৎস্বা করাতে হবে এর জন্য ছয়টি মাস আমার ছুটি চাই। সব বিসয় ভাল করে লিখে গবরনরকে জানাবে আমি এসব কায শেষ না করে কিছুতেই আসিতে পারিব না। তুমার দিদি আমাকে বলে তুমার মায়ের কাছে না গিয়ে আমার কাছে থাকিতে চায়, এজন্য তাহার চিকিৎস্বা ভাল রূপ না করে কিছুতেই আমি যেতে পারিব না। তুমার দাদার কাছে পত্র লিখ তুমাদের সংস্বার খরচের জন্য টাকা পাঠাইতে, সে যদি টাকা পয়সা না পাঠায় তবে, এর সন্তান ও স্ত্রী পুত্র উপবাস করে মরিবে। এখন যদি সে তার সংস্বার না দেখে, এর সন্তান সব বিক্ষা করিবে। আমি এসব করে আমার জিবন নষ্ট করেছি আর পারি না, এজন্য সব ছেরে চৈলে এসেছি। মাইহারে থাকিতে যা যন্ত্রণা ভুগ করেছি তার চেয়ে সত গুন যন্ত্রণা ভূগ করিতেছি, এখন আমি আমার জন্মস্থানে মির্ত্তু কামনা করি, করি তা যদি খুদা করেন তবে সব চিন্তা হতে মুক্তী পাইব, আর জানাবার কিছু নেই এই আমার শেষ বাসনা। একপ্রকার তুমার মঙ্গল চাই।

ইতি—
বাবা

কল্যানিয়াবর,

শ্রীমতি মদিনা খাতুন তুমার পত্র পাইলাম, তুমাদের কুশল মঙ্গল জেনে শুখি হইলেম খুদা তুমাধিগকে সুখে রাখুন এই প্রার্থনা। এতদিন পুত্র, নাতি, নাতিন নিয়ে আনন্দে সংস্বার করে এসেছি আমার সাদ্ধানুসারে করেছি, এখন আমার সর্ব্ব জেষ্ট কন্যা অতি আদরের, তাহার সেবা করাও আমার কর্ত্তব্ব, না করিলে খুদার কাছে দুসি হব, সেজন্য জানাইতেছি, মেয়ের সাস্ত ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত কিচুতেই তুমার কাছে আসিতে পারিব না। তুমার ছেলেকে পত্র লিখে জানাও তুমাদের সংস্বারের খরচ পত্র নিয়ম মত পাঠাইতে, যদি না পাঠায় তুমরা উপবাস করিবে, এখন তার সংস্বার সে চালাবে আমি অক্ষম, তুমার মেয়ে রাত্রে দিনে, দুই গ্রাস ভাৎ খায়, রাত্রে দিনে কিছু খায় না, আমি জুর করে দুধ সেবন করাই চলতে ফিরতে পারে সক্তি নেই দুয়া করিবে। আমার জন্য রান্নাও করে, চিন্তার কারন নাই আমার সাদ্ধাতিত দেখিব তার সাস্ত ভাল হয় কিনা তারপর তুমাকে জানাব, এর জন্য চিন্তাতেই আসিব না।

খুদার কাছে দুয়া করিবে তার জন্য। একপ্রকার আছি, তুমাদের কুশল চাই—

ইতি
তুমার স্যামি
আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। বাবা ছয় মাস এখনও শিবপুরে থাকবেন। গভর্ণরের কাছে দরখাস্ত করতে লিখেছেন। আলি আকবরকে সংসার খরচার টাকা পাঠাবার জন্য লিখেছেন। বাবা আর টাকা পাঠাবেন না। বাবার বড় মেয়ের শরীর ভাল নেই। বাবার চিঠি মাকে পড়িয়ে শোনালাম। মার জবানীতে চিঠি লিখতে বললেন। সেইভাবেই চিঠি দিলাম। গভর্ণরকে ছুটির

দরখাস্ত দিয়ে চিঠি লিখলাম। আলি আকবরকেও, বাবার চিঠির বক্তব্য জানিয়ে চিঠি লিখলাম। এ এক বিরাট সমস্যা আমার সামনে দেখা দিল। আশিস জননী, দক্ষিণারঞ্জনের ঠিকানায় আলি আকবরকে চিঠি লিখল টাকার জন্য।

ইতিমধ্যে রেবতীরঞ্জন দেবনাথের চিঠি পেলাম। রেবতীরঞ্জন দেবনাথ মৈহারে বাবার কাছে শিক্ষা করেছে। রবিশঙ্করের নির্দেশে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে যে শীঘ্রই রবু কোলকাতায় যাবে এবং কিছুদিন পরে ফিরবে। যদি কিছু প্রয়োজন হয় জানাতে। যেহেতু রবিশঙ্কর নিজে চিঠি দেয়নি সেইজন্য উত্তর দিলাম না। নানা সমস্যার মধ্যে বাবার আসা চিঠির উত্তর লিখছি ইতিমধ্যে শুনলাম বেবীর সেতার পড়ে ভেঙ্গে গেছে। খাটের উপর বিড়াল উঠেছিল। বিড়ালের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে অঘটন ঘটেছে। মঙ্গল মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে এলাম। আগামীকাল এসে সেতার মেরামত করে দেবে বলল। কিছুদিন খেলা বন্ধ ছিল। উপস্থিত সানডারসান কোম্পানীর নূতন ম্যানেজার হয়েছেন কালিয়া সাহেব। অফিসের বিরাট বাংলোয় ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস খেলবার জায়গা আছে। আজ ব্যাডমিন্টন খেললাম।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনে পেলাম দুইটি রেজিষ্টার্ড বুক পোষ্ট। হাথরস থেকে সঙ্গীতের বই পাঠিয়েছে লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ। এ যাবৎ চিঠির আদান প্রদান চলছে। অপর বুক পোষ্টে শুভ দিল্লি থেকে একটা সুন্দর ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছে।

আজ মিউনিসিপ্যালটির ভোট হবে। ভোট গণনার কাজ আমাকে দেওয়া হোল। বহু পদস্থ কর্মচারী থাকলেও ডি.এম.-এর অনুরোধে আমাকে যেতেই হোল। পান, চা এবং মিষ্টি খাওয়াল। এও এক আমার জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা। আজ প্রথম টেনিস খেললাম কালিয়ার অনুরোধে। খেলবার পর দেখলাম হাতটা ভারি লাগছে। মৈহারে এসে অবধি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল খেলেছি। ভলিবল কিছুদিন খেলবার পর আর খেলি নি। খেলবার পর হাতটা ভারি হয়ে যায়। যার ফলে বাজাতে কষ্ট হয়। আজ প্রথম টেনিস খেলতে, সেই অভিজ্ঞতা হোল। আজই প্রথম খেললাম এবং এই শেষ খেলা।

পরের দিন ভোট গণনায় সারাদিন কেটে গেল। রাত্রে কিছুক্ষণ বাজাবার পর রেডিও শুনলাম। ইদানিং আলি পত্নীর দুইটি অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। বহু বলার পর আজকাল রেডিও শুনবার সময় কথা বলেন না। আগে রেডিও শুনবার সময় যত রাজ্যের কথা শুরু হত। যার ফলে প্রোগ্রাম ঠিক মত শোনা যেত না। এর ফলে মন কষাকষি হ'তো। দীর্ঘদিন রাগ করে রেডিও শোনা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তিনি ছেলেদের নিয়ে রেডিও শুনতেন, আমি যেতাম না। কিন্তু ইদানীং আমার রেডিও না শোনার কারণ উপলব্ধি করেছেন। উপস্থিত কথা বলেন না রেডিও শুনবার সময়, সেইজন্য রেডিও শুনি। এ ছাড়া বাজনা বাজাবার সময় মাঝে মাঝেই এসে বসতেন, কিংবা কোন জিনিষ আনবার জন্য ফরমাস করতেন। প্রবল আপত্তি জানানর ফলে ইদানীং বাজাবার সময় আসেন না। বহুদিন পরে ধ্যানেশকে কিছুদিন হল পড়াচ্ছি বলে মেজাজটা ভাল।

হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির। আশিস টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে কোলকাতায় যাচ্ছে, সুতরাং এলাহাবাদে গিয়ে যেন দেখা করি। কি ব্যাপার? আশিস লিখেছে ঢাকায় বাবা

ডেকেছেন। সেইজন্য কি আশিস যাচ্ছে? পরের দিন এলাহাবাদে যাব বলে মণিকা দেবী এবং আশিসের মা এলাহাবাদ থেকে মূর্তি কিনে আনবার জন্য টাকা দিলেন। এলাহাবাদ গিয়ে সুপ্রভাত পালের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। পালের মা এবং দিদির কাছে জানতে পারলাম, রবিশঙ্কর পালের জন্য জলন্ধর রেডিওতে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে স্টাফ আর্টিষ্ট হিসাবে। ইতিমধ্যে পালের বাড়ী কয়েকবার গিয়েছি। পালের মা এবং দিদির কাছে যে আন্তরিক ব্যবহার পেলাম তা ভুলব না। পালের বাড়ীর আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। চাকরি না করলেও রাজার হালে চলতে পারে। কিন্তু সখ করে চাকরি করছে। মনে মনে ভাবলাম এবারে বাবার এলাহাবাদে গেলে কষ্ট হবে। সুপ্রভাত পাল, বাবার জন্য সব ব্যবস্থা করে এবং বেশীর ভাগ সময় বাবার কাছেই থাকে। আমার এলাহাবাদ যাওয়া ব্যর্থ হল। বিকেলে দিল্লী কালকা মেলে আশিসকে দেখতে পেলাম না। গাড়ীতে খুব ভীড়। মনে চিন্তা হলো, আশিস একা নিশ্চয় যাচ্ছে না। সঙ্গে বড় কেউ একজন নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু দুবার ট্রেন পরিক্রমা করেও আশিসের দেখা পেলাম না। পরের দিন চিন্তা নিয়ে দুপুরে মৈহার ফিরলাম।

মৈহারে ফিরে গভর্ণরের চিঠি পেলাম। বাবার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পরের দিন গভর্ণর এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে চিঠি দিলাম। পোষ্ট অফিসে গিয়ে দেখি আলি আকবরকে লেখা আলি পত্নীর চিঠি ফেরৎ এসেছে। তার মানে আলি আকবর কোলকাতায় নাই। তিনি বললেন, 'বাবা নাই বলে বাড়ীর প্রতি তার কোন কর্তব্যও নেই।' এলাহাবাদ থেকে ফেরার কয়েকদিন পরে, আশিসের চিঠিতে জানতে পারলাম জ্বর হবার জন্য কোলকাতায় যেতে পারে নি। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দিল্লী থেকে প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা অন্নপূর্ণা দেবী পাঠিয়ে দেন সংসারের খরচার জন্য, অথচ আলি আকবরের টাকা পাঠানোর নাম নাই। বাবা এলে কি জবাব দেব?

পরের দিন নাগপুরের দত্ত, কোলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছে। দত্ত চিঠিতে জানিয়েছে, বাবা তেরোই জানুয়ারী ঢাকা থেকে কোলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। আলি আকবর জানতে চেয়েছে মৈহারে কত টাকা পাঠাতে হবে। চিঠি পড়ে বুঝলাম বাবার সঙ্গে আলি আকবরের দেখা হয়েছে। বাবা হয়ত কিছু বলেছেন। সেইজন্য এতদিনে আলি আকবরের টনক নড়েছে। কত টাকার দরকার, সংসার খরচার জন্য, আলি আকবর কি বোঝে না?

বাবা কোলকাতায় পৌঁছবার পর চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠি আজ পেলাম। আমাকে ও মাকে লেখা পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কলিকাতা
শ্রীদক্ষিনাবাবুর বাসা হতে
১৪-১-৫৫

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতিন আমি কলিকাতা আলাউদ্দিন সঙ্গীৎ সমাজে এসেছি, ১৪-১৫-১৬-১৭ প্রগ্রাম করে শিবপুর চেলে যাইব, মাইহার আসিতে পারিব না। তার কারন তুমার বড় দিদিকে অসুখে ফেলে এসেছি তাহাকে ব্রাম্মন বাড়িয়াতে রেখে চিকিৎস্বা করাতে হবে,

তাহার সুস্ত সরির না হওয়া পর্য্যন্ত মাইহারে আসিতে পারিবনা। গবরনরকে এসব কথা জানাবে তুমি নিজে যেয়ে গবরনরকে আমার আদাব জানিয়ে সব বলিবে। মর্জ্জিদের কার্য্য শেষ হয় নাই আর দুমাস লাগিবে এসব কথা জানাবে, আমার সরিরও বিশেষ ভাল নয় সব জানাবে। শ্রীমান দক্ষিনা রঞ্জন রায়ের বন্ধু শ্রীমান আরেন ঘোষ উরফে মাখন বাবু তিনি যাইবেন মাইহারের পাওয়ার হাওজ ইলেকট্রিক ফিট করবার জন্য, তিনি যখন তুমাদের সঙ্গে দেখা করিবেন তিনিকে অতি খাতির যত্ন সেবা করিবে তিনি আমার পুত্রবৎ সন্তান মনে করে সেবা করিবে। তুমার মাকে বলিবে শ্রীমাখন বাবুকে ঠিক নিজ সন্তানের মতন সেবাযত্ন যেন করে। এলাহাবাদের প্রাগ্রাম বুধ হয় করিতে পারিব না, তাদের জানিয়ে দিব সরির ভাল নয়। বিশেষ আর কি লিখব একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি

ইতি
বাবা

কলিকাতা হইতে

কল্যানিয়াবর,

শ্রীমতি মদিনা খাতুন জানিবে আমি কলিকাতা এসে ছুট বৌমা এবং নাতি নাতিনকে ঐদ্য দেখিলাম। নাতিটা একেবারে প্রানেসের মতন হয়েছে, নাতিনটি তুমার মতন সাদাসিধা বরসান্ত, এদের দেখে বড় আনন্দ পাইলাম তুমি দেখলে এদের ছেরে দিবে না, তুমার কাছেই রেখে দিও। আলিআকবরকে বলেছি মাইহারে তুমার কাছে এদের নিয়ে জাওয়ার জন্য। যদি যায় এদের রেখে দিও, ছুট বৌমার নাকি অসুখ চিকিৎস্বা করাবার জন্য কলিকাতা এসেছে। বড় বৌমাকে বলিতেছি এরা জেন সওদর বনের মতন মিলেমিসে থাকে। তুমার বড় মেয়ের জন্য ও মর্জ্জিদের জন্য ও জমা জমির জন্য ফিরে যাইতেছি। এসব ভালরূপ বন্ধবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আসিতে পারিবনা। আমার শরির ভাল নয়, তবুও খুদার মন বল নিয়ে করিতেছি, তিনি যা করিবেন তাহাই করিব, আশা করি তুমি সুখে আছ, যদি কুন রূপ কষ্ট মনে কর আমার কাছে চৈলে আসিবে, একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি, ইতি—

তুমার স্যামি
আলম

বাবা আরো দু'মাস ছুটির জন্য গভর্ণরের কাছে গিয়ে বলবার জন্য লিখেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে মাখনবাবু আসছেন মেসিন লাগাবার জন্য, ফলে জল ট্যাঙ্কিতে এসে যাবে। এখন আর বুদ্ধাকে কুয়োর জল টেনে ট্যাঙ্কিতে ভরতে হবে না। কিন্তু মাকে যে চিঠি দিয়েছেন তা পড়ে অবাক হলাম। চিঠিতে লিখেছেন কোলকাতায় তার ছোট বৌমা এবং তার ছেলে মেয়ে দেখেছেন। নাতি নাতনিকে দেখে আনন্দিত হয়েছেন। আলি আকবরকে বলেছেন মৈহারে নিয়ে গিয়ে রাখতে। এ ছাড়া বড় বৌমা এবং ছোট বৌমা যেন মিলে মিশে থাকে। শেষে লিখেছেন, মৈহারে কোন কষ্ট মনে করলে দেশে বাবার কাছে চলে যেতে। এ যাবৎ মাকে

বাবা তিনটি চিঠি লিখেছেন। দুটি চিঠির শেষে ইতি তোমার স্বামী আলাউদ্দিন লিখেছেন। কিন্তু এবার ইতি করে নিজের ডাক নাম লিখেছেন। লিখেছেন ইতি তোমার স্বামি আলম। সারাজীবন বাবার কাছ থেকে মা তিনটি চিঠি পেয়েছেন। বাবার চিঠি পড়ে অবাক হলাম। মানে চিঠির শেষে লিখেছেন কষ্ট মনে করলে দেশে চলে যেতে। আবার লিখেছেন, আলি আকবরকে বলেছেন, ছোট বৌমা এবং নাতি নাতনিকে নিয়ে যেন মৈহারে যায়। বাবার ছোট বৌমা সম্বন্ধে এ যাবৎ আলি আকবর এবং জুবেদা খাতুনের কাছে যা শুনেছি সে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু যদি আসে তাহলে কুরুক্ষেত্রের লড়াই শুরু হবে এবং মৈহারে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। বাবা কিছু বোঝেন না তা নয়। সেইজন্য মাকে দেশে যেতে বলেছেন। প্রথমে মাকে লেখা চিঠি পড়ে, মনে মনে ঘাবড়ালেও পরে হাসি পেয়ে গেল। আলি আকবর ভুলেও এ কাজ করবে না। জুবেদা খাতুন চিঠি পড়ে গুম হয়ে গেলেন।

বাবার কথামত গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করা বিধিসম্মত নয়। সেই জন্য ডি.এম.-কে চিঠি দিলাম। গভর্ণরের সঙ্গে কি উপায়ে দেখা করে বাবার কথা জানাব। উপস্থিত মৈহারে সবচেয়ে বড় সমস্যা টাকা। যেভাবে জিনিষ কিনবার ফরমাইস হয়, সেই হিসাবে খরচা করলে টাকার টান পড়বে। আমার তো এত টাকা নেই যে পূরণ করবো।

বাবার চিঠি পাবার তিন দিন পরেই দক্ষিণারঞ্জনের চিঠি পেলাম। বাবা পাঁচশো টাকা দিয়ে গিয়েছেন পাঠিয়ে দেবার জন্য। বাবা বাইশে জানুয়ারী ঢাকায় চলে যাবেন কোলকাতা থেকে। মণিকা দেবীর কাছে জানলাম, আশিসের মা তাকে দিয়ে দিল্লীতে চিঠি লিখিয়েছে, আলি আকবর কবে দিল্লি যাবে জানতে চেয়ে? দিল্লি যাবার সংবাদ পেলে আশিসের মা ইন্দ্রনীলকে নিয়ে আলি আকবরের কাছে চলে যাবেন। এ কথা শুনে মনে হল মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই সার। আলি আকবরের কথা ভেবে দুঃখ হলো। কি ভুলই না করেছে। মাথায় বোধহয় আর একটাও চুল থাকবে না। বেচারা! ডি. এম. এর চিঠি পেলাম। জানিয়েছে যে গভর্ণরের কাছে গিয়ে বাবার ছুটির জন্য বলতে।

পরের দিন গভর্ণরের কাছে, তারিখ এবং সময় চেয়ে দেখা করবার ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিলাম। বাবার বিষয়ে কিছু গোপন কথা বলবার আছে বলেই এই সময় চাওয়া। চিঠি ফেলে আসতেই অসময়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাড়ীতে ফিরবার পথেই জোরে বৃষ্টি সুতরাং মণিকা দেবীর বাড়ীতে চলে গেলাম। বৃষ্টির গতি বেড়েই চলেছে। সুতরাং খিচুড়ি এবং কয়েক রকমের ভাজা খেয়ে, ইন্দ্রনীলকে অনেকক্ষণ শেখালাম। ইন্দ্রনীল আজকাল ওঠাতে পারে, কিন্তু আশিসের মত সব ভুলে যায়।

বাবার চিঠি আসার পর থেকেই বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে। উপস্থিত চুপচাপ থাকাই ভালো। বৃষ্টির আর বিরাম নেই। রাত্রেও বৃষ্টি হতে লাগলো। বাজনা বাজিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়েছি। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাজ পড়ার আওয়াজে। ঘড়িতে দেখলাম মাঝ রাত। বাজ পড়ে যেন ইঙ্গিত করছে, সাবধান হও। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালেও দেখি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এত বৃষ্টির মধ্যেও রাজকুমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার? রাজকুমার বলল, 'রায়পুরে রাজ কলেজের ভূতপূর্ব সঙ্গীতের

প্রফেসর আপনার বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে রায়পুর রাজকলেজে বাজাবার জন্য প্রস্তাব করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাজালে ভালই টাকা দেবে।' টাকা পাব বাজনা বাজিয়ে, এ তো ভাল কথা। কিন্তু? পরিণামের কথা ভেবে রাজকুমারকে বললাম, 'বাব এ কথা শুনলে রেগে যাবেন।' রাজকুমার আশ্বাস দিলেন বাবাকে কিছু বলবেন না। কিন্তু বাবা জানতে পারলে আমাকে একদিন অন্তর কথা শুনিয়ে বলবেন, 'হায়, হায়, বাজাবার সখ হয়েছে। খুব উস্তাদ হয়ে গিয়েছ।' বাবার আরও কথা, তানের মত ক্রমাগত নিত্য নূতন তৈরি করে বলবেন, যার ফলে আমি বেতালা হয়ে যাব। রাজকুমার নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

আজ আশিসের চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। আশিসকে তার মা ধোঁকাবাজ বলে লিখেছে। উপরন্তু আমার বিষয়েও লিখেছে ধোঁকাবাজ। আশিস তার মাকে চিঠির উত্তর না দিয়ে, আমাকে তার মাকে বলতে বলেছে, 'আমরা ধোঁকাবাজ নই।' চিঠিটা পড়ে মাথা গরম হয়ে গেল। সোজা গেলাম ওর মায়ের কাছে। জোরে জোরে বললাম, 'অশিসের চিঠি এসেছে। তিনি চিঠি শুনবার জন্য এলেন। চিঠিটা পড়ে শোনালাম। তারপর ওকে বললাম, 'আশিস দিল্লিতে ভালভাবে শিখছে। এরজন্য আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত। পরিবর্তে তাকে ধোঁকাবাজ কি কারণে লিখেছেন? এ ছাড়া আমি হলাম ধোঁকাবাজ? আমি কাকে ধোঁকা দিলাম? আমি বুঝতে পারি না, কোন সাহসে আমাকে ধোঁকাবাজ কেউ বলে। এই চিঠিটা রেখে দিচ্ছি। বাবা এলে দেখাব।' আমার রাগ দেখে ভয় পেয়ে আশিসের মা বলল, 'আশিস চিঠি দেয় না বলে ধোঁকাবাজ লিখেছিলাম।' বললাম, 'আশিসের না হয় একটা কারণ বুঝলাম, কিন্তু আমাকে ওই ঘৃণ্য অপশব্দ বলার কারণ কি?' উত্তরে বললেন, 'কথার কথা লিখেছিলাম। আশিস কিংবা তার বাবাকে চিঠি দেন না বলে কথার কথা হয়ত লিখেছিলাম।' কথার মধ্যে তবুও! হয়ত? যাক কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে এলাম। আজ দ্যুতি কোলকাতা থেকে এল। দ্যুতির এক সম্পর্কে বোন পনেরা দিন আগে মারা গিয়েছে। এর জন্য মৈহারে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে মা এবং আশিসের মায়ের জন্য ভাল জর্দা নিয়ে এসেছে।

রাত্রে বাজাবার পর খেয়ে, নিজের ঘরে বই পড়তে লাগলাম। রোজ রেডিও শুনি কিন্তু আজ শুনতে গেলাম না। রোজকার মতো সকলে রেডিও শুনতে লাগল। হঠাৎ প্রাণেশ আমার ঘরে এসে বলল, 'বাবা এবং পিসেমশাইয়ের যুগলবন্দী বাজনা হবে দিল্লী থেকে।' এ কথা শুনে বাজনা শুনতে গেলাম। ঘরে গিয়ে দেখি ওর মা বসে আছে। চুপ করে, কোন কথা না বলে বসলাম। আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের 'পাহাড়ি ঝিঁঝিঁটে' আলাপ এবং 'ইমনি মাঁঝে' গৎ শুনলাম বাজনা শুনে নিজের ঘরে চলে এলাম।

মৈহারের রাজকুমার মাঝে মাঝেই গাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কোন কাজ নেই, সুতরাং অযথা গল্প এবং আমাকে কিছু খাওয়াতে, যেমন বিদেশ থেকে আনান টিনফিস্। আজ ডাকার কারণ বুঝলাম। প্রথমে আমাকে বলল, 'রায়পুরের রাজ কলেজে আপনার চাকরি করে দিতে চান, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।' একথা শুনে এক কথায় না করে দিলাম। এতদিন বাবার ভাষায়, ভেদ খুলল। আমার কাছে সরোদ শিখতে চায়। রাজকুমারের কাছে, বাবার দেওয়া একটা সরোদ আছে। অনেক বলবার পর প্রথমে শিক্ষা দিয়ে তার গাড়ীতে চলে এলাম।

দ্যুতি দুদিন হল এসেছে, এর মধ্যেই টেলিগ্রাম পেল তার মায়ের অবস্থা সঙ্গীন। সুতরাং দ্যুতি কোলকাতা চলে গেল। দ্যুতির জন্য দুঃখ হয়। বেচারার সময় ভাল যাচ্ছে না।

পরের দিনই, দক্ষিণারঞ্জনের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা মনি অর্ডারে এল। দক্ষিণারঞ্জন লিখেছে, 'বাবা দেশে যাবার আগে টাকা দিয়ে গিয়েছেন। বাবা সংসার খরচের জন্য টাকা দিয়ে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাবার আগে বাবার আদেশে তোমাকে জানাই, যে মৈহারে শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের শিক্ষা দিতে। এ ছাড়া বাবা যে টাকা আমার মাধ্যমে তোমাকে পাঠিয়েছেন তার প্রাপ্তি সংবাদ দিও।' বুঝতে পারলাম বাবা নানা কাজে ব্যস্ত আছেন। মসজিদের এবং কবরের কাজ সুন্দরভাবে করেছেন। বাবার ধারণা আলি আকবর মৈহারে এসে থাকবে। কি অলীক কল্পনা বাবার। বাবার চিঠি পড়ে শোনালাম মাকে। মায়ের পুত্রবধূ কয়েকবার বলেছেন, 'সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন অথচ ধ্যানেশ, বেবীকে কেন শেখান না?' বাবা হয়ত কিছু মনে করতে পারেন। কিন্তু আজ যখন বললেন, 'বাবার কথায় সব শিষ্যকে শিখান, তাহলে ধ্যানেশ বেবী কি দোষ করল?' সুতরাং আজ থেকে ধ্যানেশ ও বেবীকে নিয়ে বসলাম। বেবীর মাথা ভাল। কিন্তু ধ্যানেশ ভুলে যায়।

সরস্বতী পূজা এসে গেল। কথায় কথায় মণিকা দেবীকে বললাম, 'বাবার আদেশে মৈহারে আসবার পর, বম বম করে পাঁচ বছর সরস্বতী পুজোর মন্ত্র না জেনে পাপ করেছি। সেই পাপ আবার আগামীকাল করে ছয় বছর পূর্ণ করব।' আমার কথা শুনে মণিকা দেবী হেসে বললেন, 'বম বম করে তো শিবের পুজো হয়।' বুঝতে পারলাম পূজার সব বিধি মণিকা দেবী জানেন। মণিকা দেবী সব মন্ত্র এবং বিধি শিখিয়ে দিলেন।

আজ সরস্বতী পুজো। মৈহারে আসার পাঁচ বছর পরে, এই প্রথম আমার পাপ খণ্ডন হলো বিধিবহ পুজো করে। অনেক দিন ধ্যানেশকে পড়াই নি। আজ ধ্যানেশ যখন ক্ষমা চেয়ে বলল, মন দিয়ে পড়বে তখন পড়ালাম। শিবমন্দিরে আজ খুব বড় মেলা হয়। ধ্যানেশ, প্রাণেশ, অমরেশ এবং বেবীকে নিয়ে গেলাম মেলা দেখাতে।

পরের দিন, নাগপুর থেকে দত্তবাবুর টেলিগ্রামে জানতে পারলাম আলি আকবরের প্রোগ্রাম ছয় ফেব্রুয়ারীতে ঠিক হয়েছে। বাড়ীতে খবর দিতেই আলি-পত্নী বললেন, 'নাগপুরে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিন যে আগে মৈহারে এসে, তারপর যেন নাগপুরে বাজাতে যায়।' এ কথার কোন অর্থ হয়? যদি বম্বে থেকে আসে তাহলে নাগপুরে বাজিয়ে তবে মৈহারে আসবে। তাকে বললাম, 'এ সব ছেলেমানুষি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করুন।' কারণ জানাবার পর তিনি গুম হয়ে গেলেন। কোন কথা বললেন না।

আজ সকালেই আলি আকবরের টেলিগ্রাম এল। তিরিশে জানুয়ারী দিল্লী থেকে মৈহারে এসে পৌঁছবে নিজের গাড়ী করে। তার মানে আজই কোন সময়ে এসে পৌঁছবে। এ খবর পেয়ে মার আনন্দ দেখে বুঝলাম পুত্রস্নেহ কি জিনিষ। দুপুর বেলায় আলি আকবর গাড়ী করে এসে পৌঁছল। সঙ্গে রয়েছে জগু অর্থাৎ জগদীশ চ্যাটার্জি এবং অনিল নামে একটি ছাত্র। আলি আকবরের কাছে শুনলাম, চৌঠা ফেব্রুয়ারী সকালে মৈহার থেকে নাগপুরের

জন্য রওনা হবে। তার মানে পাঁচদিন থাকবে। দিল্লী থেকে গাড়ী করে এসে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। ভাবলাম আজ বিশ্রাম করুক, পরের দিন সব কথা হবে। টেলিগ্রাম এল লেফটেনান্ট গভর্ণরের কাছ থেকে যে দোসরা ফেব্রুয়ারী আমাকে দেখা করতে হবে।

দেখতে দেখতে দুইদিন কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝলাম না। আলি আকবর, নিজের গাড়ীতে গুলগুলজী, জগু এবং আমাকে নিয়ে কাটনির রাস্তায় অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। গ্রাম এবং পাহাড়ের শোভা সব ভুলিয়ে দেয়। মনটা হাল্কা লাগছে।

দুদিন পরে রেওয়ার লেফটেনান্ট গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বাবার সম্বন্ধে সব কথা হল। তিনি বললেন, 'বাবাকে লিখুন, সব জানিয়ে একটা দরখাস্ত করলেই ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে।' মৈহারে সঙ্গীতের বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথা হল। বললাম, 'বাবার আসতে দেরী হবে। বাবা এলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হবে।' রাত্রে মৈহার ফিরে এলাম। এসে দেখলাম বাবার চিঠি এসেছে। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাহ্মন বাড়িয়া
মাইজপারা
জিলা-ত্রিপুরা
৬-৩-৫৫

কল্যানবর—

শ্রীমান বাবা যোতিন তুমার সব পত্র পেয়েছি ও যথা সময় পাঠ মাত্র উত্তর রেজেষ্টারি করে, দরকারি কাগজাৎ দস্তখত করে ইয়ার মেলে পাঠাইয়েছি না পাবার কারণ কি বুঝিতে পারি না। এখানে থেকে আমার সাংস্বারিক বিষয় আসয় যাকিছু সম্পত্তি আছে তাহার শুবন্দবস্ত করিতেছি, একদিনে দুদিনে এসব কাজ হয় না। এক একটি দরখাস্ত দিলে তাহা মঞ্জুর হয়ে আসিতে ৩-৪ মাস লাগে এজন্য কত যে বেগ পাইতেছি তাহা যদি তুম করিতে তবে বুজতে পারতে। মাসের মদ্ধে দুইবার চারিবার কুমিল্লা চিটাগাং দরখাস্তের তদারক করিতে ও হাকিমদের খুসামিদি করিতে হয়। ভাগ্ন ভাল পাকিস্থানের অফিসার ও জনতা ভদ্র মণ্ডলি সকলে আমাকে বড় আদর যত্ন করে, ওরা খেটে খুটে আমার কার্য্য যত সিগ্র হয় তাহা করে দিতেছেন, এদের কাজে আমি চিরকৃতগ্ন। আমি যে সব কাজ করিতেছি তাহা করিতে ১ বৎসর দুই বৎসর সময় লাগবার কথা, বড় বড় হাকিমদের কাছে যখন যাই সকলেই আমাকে আদর সৎকার করে, আমার কার্য্য জেটা হতে পারে না সেটাও নিজের উপর সম্পূর্ণ দাইত্ত নিয়ে করে দিতেছেন, পাকিস্থানের অফিসারগন অতি ভদ্র, তাদের সদব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে পরেছি বেশি আর কি লিখিব এতেই বুঝে নিবে। দিল্লির প্রগ্রাম টেলির দ্বারায় নিষেধ করে দিয়েছি, কার্য্যে ব্যস্ত আছি প্রগ্রাম করতে পারিব না। সিপ্রার পত্র পাইলাম এর প্রগ্রামও করিতে পারিবনা, যে সময় দেসে যাইব ঐসময় জানাব। পাসফুটের ভিসা দুইমাস থাকার মিয়াদ কর্ত্তন হয়ে গেচে পাকিস্থানের বড় ২ অফিসার তিনিরা বলেন, যতদিন ইচ্ছা পাকিস্থানে থাকিবার নিচ্চিন্ত হয়ে থাকুন আপনাকে আমরা তারিয়ে দিব না, কেহ ২ বলেন বাকি জিবন টুকুন জন্মস্থানে থেকে কর্ত্তন করুন সাদরে আপনাকে আমরা

রাখব। আর বলেন ইন্ডিয়া গবরমেন্ট আপনাকে যা সম্মান দান করেছেন এজন্য আমরা গৌরবান্নিত, এজন্য আপনাকে আমরা জুর করে আবদ্ধ করিব না। এসব কারণে আমি আনন্দ নিয়ে এখানের কার্য্য যা কিছু করিবার তাহা নিচ্চিন্ত মনে করিতেছি, আমার জন্য তুমরা কোনরূপ চিন্তা করিও না ঈশ্বরের চরনে প্রার্থনা করি সুস্ত সরির নিয়ে যেন, এখানের কর্ম্ম সমধা করে তুমাদের কাছে এসে পোহুছিতে পারি। এখানে ভিক্ষা করে সব কর্ম্ম করিতেছি কেবল খুদার কৃপা বলে, আমার হাতে একটি পয়সা নেই ও থাকে না, যাকিছু দরকার তাহা খুদা দান করেন, সেই দানের দারায় কর্ম্ম করি ও খাই। প্রথম জিবন আমার যেমন ছিল এখন আবার তাহাই আরম্ভ হয়েছে, বড় আনন্দে আছি চিন্তার কারন নেই। দিল্লিতে এফ্রেলের প্রগ্রামও নিষেধ করে দিবে, যদি জিবন থাকে বর্সা নাগাদ তুমাদের কাছে আসিব আশা করি। তুমার দিদি ভালর ধিগে যাইতেছে, সেই আমাকে রান্না করে খাওয়াইতেছে, সম্পূর্ণ সুস্ত এখন হয় নাই, তাহার সরিরে রক্ত নেই ঔষধ পত্র শেবন করাইতেছি তাহার অবস্তা যে সময় ভাল দেখিব নিচ্চিন্ত হয়ে তুমাদের কাছে আসিব গবরনরকে সব জানাবে, তিনি যদি রাগ করেন কি করিব সব মাথায় পেতে গ্রহণ করিব। কাগজ পত্রগুলি পেয়েছ কি না, যে গুলি দস্তখৎ করে পাঠিয়েছি, সেই সংবাদ জানিয়ে নিচ্চিন্ত করিবে।

পাকিস্থানে এই আমার জিবনের শেষ চেষ্টা, করে সব বিষয় আস্রয় ঠিক করে আসার চেষ্টা করিতেছি আর পারিব কিনা খোদার হাতে নির্ভর করি। তুমাকে আমি শিক্ষা দিয়ে এসেছি, এখন তুমার সাধনা হল মূল, ঠিক মত যদি সাধনা করিতে পার তবেই সিদ্ধ হবে নচেৎ নয়। স্থির মন সংযম, ধৃড়তা, বিশ্বাষ, দুশ, গুন, সব ধিগকে যদি আয়ত্বাধিন করিতে পার তবেই নাদ ব্রহ্মকে পাইবে। তুমার মাকে বলিবে তাহার সাধনায় যেন গাফিলতি না হয় খুদা যেন না ভুলে, নমাজ রূজা বন্দিগি এবাদৎ যেন করে তাহলেই তাহার পরকাল ভাল হবে। মেয়ের শরির ভালর ধিগে যাইতেছে চিন্তার কারন নেই, মেয়ে যা কিছু খাইতে চায় ভিক্ষা করে এনে তাকে দিই, আমার সাদ্ধাতিত। মেয়ের প্রণাম তুমার মাকে জানাবে, মেয়ে তাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, জামাতা বাবু মেয়েকে মাইহার নিয়ে জেতে মানা করেন, এজন্য মেয়েকে বুঝিয়ে সান্ত করি। নাতিটিও আমার কাছে আছে মহামূর্খ্য খাওয়া, সুয়া, রোনা ছারা কিছুই জানে না এজন্য আমি মহা দুঃখিত, আর কি জানাব এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা

রাত্রে বাবার সব চিঠি আলি আকবরকে দেখালাম। সব চিঠি পড়ে শোনালাম। কোন বিকার নেই। চুপ করে সব শুনে গেল। সব চিঠি পড়ার পর সহজভাবে এড়িয়ে গেল। চিঠির কোন গুরুত্ব নেই।

যদিও ইতিমধ্যে কিছু কথা হয়েছে। যে সময় মৈহারের পরিস্থিতির কথা বললাম, সঙ্গে সঙ্গে আলি আকবরের দার্শনিক উত্তর, 'তুমি হলে বাবার সব কিছু। সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আসল লোক চিনে রাখো।' টাকার কথা ওঠালেই সেই এক

কথা 'বহু খরচা হয়ে গিয়েছে। বাবা তো এখন টাকা পাঠিয়েছে। সময়মত টাকা পাঠাবো।'

আজ আলি আকবর, জগদীশ চ্যাটার্জি এবং ছাত্রকে নিয়ে চলে গেল। বাবাকে দরখাস্ত লিখে দিলাম। আলি আকবরের যাবার পরে কি করে যে দিন রাত কেটে যেতে লাগল, যাকে বলে দিনগত পাপক্ষয়। বাবা না থাকায় মৈহারে সব শূন্য মনে হয়। দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারী শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ কাশী থেকে চিঠি এল মায়ের শরীর ভাল নেই। এখনও বাবার কোন চিঠি আসছে না। এরকম তো কখনো হয় না। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী কাশীতে গেলাম। মায়ের জ্বর কিছুদিন থেকে হয়েছিল। চিন্তা করব বলে খবর দেয়নি। যে সময় জ্বর বেড়ে কাহিল হয়েছে সেই সময় চিঠি দিয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হল কাশী এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মার শরীর ঠিক হয়ে গেল। দোসরা মার্চ মৈহার যাত্রা করলাম। মৈহারে এসে শুনলাম দ্যুতি মানসিক অশান্তির জন্য রিয়াজ করতে পারে নি। মনে হয় মৈহারের আবহাওয়া দূষিত হয়ে গিয়েছে।

দেখতে দেখতে হোলী এসে গেল। হোলীর দিন রাত্রে দ্যুতির অনুরোধে তার বাড়ীতে খেলাম। দ্যুতি রান্না করে খুব ভাল। মৈহারে চারদিন রংখেলা হয়। পালবাবুর জামাই হোলী উপলক্ষে এসেছে। বাড়ীতে এসে জোর করে আমাকে বের করল। আমি কখনও রং খেলি না। কিন্তু আমাকে রং এ চান করিয়ে দিল। হোলীর দিনে আবীর নিয়ে এলাম। মা আমাকে হোলী উপলক্ষে দু'টাকা দিলেন। জুবেদা বেগম, আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন। আমি আপত্তি করলাম না।

হোলী উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের চিঠি পেলাম। বাজনা শিখবার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু শিক্ষা পাচ্ছে না। আজ পূরণচন্দ্র শেঠের ছেলের বিয়ে। বাবা বাড়ীর যাবতীয় কাপড় শাড়ী সব কেনেন পূরণচন্দ্র শেঠের দোকান থেকে। বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূরণচন্দ্রের বাড়ীর সকলে বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। পূরণচন্দ্র বললেন, 'বাড়ীর সকলের ইচ্ছা, বিবাহের পর মৈহার ব্যাণ্ড পার্টি বাজাবে এবং শেষে আপনি বাজাবেন।' ব্যাণ্ডের অনুমতির ব্যাপার তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, 'কেবল বাড়ীর লোক এবং কন্যাপক্ষর লোকের সামনে বাজনা হবে।' পূরণচন্দ্র পরিস্থিতি বুঝে ঠিক ঘরোয়া আসর করলেন। ব্যাণ্ডের বাজনার পর আমি বাজালাম। বাজাবার সময় চোপড়া এবং তার স্ত্রী ছিলেন। স্বর্ণলতা চোপড়া বাবার ঠিকানা জানতে চাইলেন চিঠি দেবেন বলে। বাবার ঠিকানা দিলাম।

বাবার চিঠি পাবার পর থেকে মা রোজ বাজান। কিন্তু মার সেতার একবার মেরামত করা দরকার। গুলগুলজীকে নিয়ে কাটনি গেলাম সর্দারজীর দোকানে। কারিগর ছুটি নিয়েছে। মৈহারে মিস্ত্রি পাঠিয়ে দেবে বলল। পরের দিনই মিস্ত্রি এসে মার সেতার ঠিক করে দিল। উপস্থিত রোজ পাঁচজনকে শেখাতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার উপক্রম। এদিকে বাড়ীতে ধ্যানেশ এবং বেবীকে শেখাতে হয়। ওদিকে দ্যুতিকিশোর, ইন্দ্রনীল এবং মুন্নিকে শেখাই। বাবার আসতে মনে হয় এখনও দুই মাস লাগবে। বাড়ীর যাবতীয় কাজ এবং সকলকে শিক্ষা দিয়ে, নিজে রোজ নিয়মিত রিয়াজ করি।

সারাদিন সব কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাজাতে বসেছি। ইতিমধ্যে মনে হল কালবৈশাখির ঝড়

উঠেছে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ। লাইট চলে গেল। ইতিমধ্যে একটা লোক চিঠি নিয়ে এল। এ.ডি.এম. চিঠিতে লিখেছেন আগামীকাল সাতনায় গিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করবার জন্য।

পরের দিন গুলগুলজীকে নিয়ে সাতনা গেলাম। এ.ডি.এম. বললেন, 'আগামীকাল সাতনাতে একজিবিসান হবে। মৈহারে গাড়ী যাবে। ব্যাণ্ড পার্টি সকালে পাঠিয়ে দেবেন।' গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমার সময়ের মূল্য আছে। এই খবরটা পত্র মারফৎই পাঠাতে পারতেন। এরজন্য আমাকে ডাকার কি প্রয়োজন ছিল? ডি.সি. আমার পূর্বপরিচিত। ডি.সি. হেসে বললেন, 'এই ফাঁকে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' ডি.সি. এর পর বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বাবার সমাচার বললাম। রাত্রের ট্রেনে মৈহার ফিরলাম। বাড়ীতে এসে শুনলাম আলি আকবর জুবেদা বেগমকে চিঠি দিয়েছে। আজ মাদ্রাজ থেকে বাজনা হবে। মাদ্রাজ থেকে দিল্লী গিয়ে মৈহার আসবে।

আশিসের চিঠি পেলাম অনেকদিন পর। আশিস লিখেছে বাইশে মার্চ দিল্লী থেকে ডুয়েট শুনতে। আমার নামে পঞ্চাশ টাকার মনিঅর্ডার দেখে অবাক হলাম। খামারিয়া থেকে কর প্রণামি হিসাবে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। টাকা পেয়ে মনের মধ্যে সঙ্কোচ হলেও, টাকাটা লোভনীয় সন্দেহ নেই। আলি আকবরের একটা চিঠি এসেছে জুবেদা বেগমের কাছে। জানতে পারলাম, ছোট বৌর জন্য আলি আকবর খুব হতাশায় ভুগছেন, যার জন্য মৈহারে উপস্থিত আসতে পারবে না। মনে মনে ভাবলাম বেচারা। দু'পক্ষের মন জুগিয়ে চলা বড়ই কঠিন। রাত্রে ডুয়েট শুনলাম। রাগ দেশ এবং পিলু। সঙ্গত করল চতুরলাল।

বাবার অবর্তমানে গুলগুলজী প্রায় আসে। বাড়ীর খবরাখবর নেয়। ব্যাণ্ডে যারা বাজায়, সকলেই ছোটবয়স থেকে বাজিয়ে বয়স্থ হয়ে গিয়েছে। সকলেই ক অক্ষর গোমাংস। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম গুলগুলজী। ছোটবেলায় নিজের বাবার কাছে লেখাপড়া যৎসামান্য করেছে। আগে গান শিখত ঘুর্‌রে মহারাজের কাছে। বেশ বড় বয়সে ব্যাণ্ডে বাবার কাছে আসে। ব্যাণ্ডে হারমোনিয়াম বাজায়। যেহেতু সাধারণ হিসাব এবং বিষয় বুদ্ধি আছে সেইজন্য বাবার প্রিয়। বাবা না থাকলে ব্যাণ্ডের পরিচালনা সেই করে। আজও এসেছে বাড়ীতে। কথায় কথায় গুলগুলজীর কাছে আলি অকবর এবং রবিশঙ্কর সম্বন্ধে যা শুনলাম তা অবিশ্বাস্য। আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবিশঙ্কর মৈহারে যে সময় শিক্ষা করতে আসে সেই সময় থেকে পরিচয়। অবশ্য এ সকল কথা গুলগুলজীর বাবার কাছেও আমি আগে শুনেছি। আলি আকবর ও রবিশঙ্কর তার বাড়ীতে অনেক গিয়েছে, গল্প করেছে এবং খাবার খেয়েছে বাবার অবর্তমানে। আলি আকবর সম্বন্ধে বলল, 'ছোট থেকে ছিল একেবারে গোবেচারী। বাজনা ছাড়া পৃথিবীর কিছুই জানত না। বাবার কড়া শাসনে গৃহে বন্দী থাকত। কিন্তু রবিশঙ্কর আসার পর রোজ দুপুরবেলায় গিয়ে রবিশঙ্করকে বাজনা শেখাত এবং তার পরিবর্তে রবিশঙ্কর আলি আকবরকে পাকিয়ে দিল।' বাংলা নববর্ষের পঞ্জিকা কাশী এবং কোলকাতা থেকে এসেছে। বাড়ীতে এসে বর্ষফল দেখলাম। নিজের রাশি মিলিয়ে দেখলাম বর্ষফল ভাল নয়। ভগবান জানে বছরটা কেমন যাবে।

চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে বাবার প্রোগ্রামের জন্য। এ ছাড়া ডি.এম. জানতে চেয়েছেন বাবা কবে আসবেন। সেইভাবে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম। একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম বাবার কাছে।

দুপুরে খাবার পরে সংসারের খরচা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল মা এবং জুবেদা বেগমের সঙ্গে। কথায় কথায় রবিশঙ্করের প্রশংসা করে বললাম, 'যতই হোক দিল্লী থেকে প্রতি মাসে সংসারের খরচার জন্য টাকা তো পাঠায়।' আজ জুবেদা বেগমের কিরকম মেজাজ ছিলো জানি না। আমার কাছে প্রশংসা শুনেই রবিশঙ্করের সম্বন্ধে যা বলল তা অকল্পনীয়।

বাবার চিঠি পেলাম।

পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাম্মন বাড়িয়া, মদ্ধপারা
জিলা-ত্রিপুরা, পাকিস্থান
১৯-৩-৫৫

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পেয়ে আমি নিচ্চিন্ত হলেম তুমি বড় অলস, আমার প্রেরিত, তুমি যে কাগজগুলি পাটিয়ে ছিলে তাহা পেয়েছ কিনা, তাহার প্রাপ্য সংবাদ এতদিন না পাওয়াতে বড়ই মহা চিন্তায় ফেলে ছিলে ঐদ্য তুমার পত্র পেয়ে সব বিষয় জেনে নির্চ্চিন্ত হলেম। তুমি দরকারি কাগজ পত্র যা পাঠাবে ও পত্র এসব পাওয়া মাত্র টেলি কিম্বা রেজেষ্টারি মারফৎ আমায় জানাবে তার ঐন্যথা করিবে না। এজন্য তুমাকে অলস বলে জানালেম সঙ্গীত সাধনাতেও তুমি অলস, প্রথম কষ্ট করিবে, পরে আনন্দ সুখ পাইবে, প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে, সুখে যারা থাকে পরে তাহারা কষ্ট পায়। এখানের চিন্তাতেই অস্থীর থাকি, তার উপর তুমি ও তুমাদের চিন্তা যে না করি, তাহা মনে করিবেনা। এখানে যে কত অভাব আমার, জিনি চিন্তময় তিনি জানেন, আমার জিবনই হল কর্ম্মাধিন ভগবান এরজন্য ভাবনার কিছু নেই যার কর্ম্ম সেই করে আমি নই। আরও দুইমাস বুধ হয় আমায় পাকিস্থানে থাকিতে হবে, তার কারণ শিবপুরের জমাজমি বাটি ঘর, পুকুর তুমার দাদার নামে রেজেষ্টার করেছি, সেই দলিলগুলি না পাওয়া পর্যন্ত ব্রাম্মনবাড়িয়াতে বাস করিতে হবে। এই সম্পত্তি আমার পুত্র ও নাতিদের, তাদের নামেই সব করেছি, যাতে আমার বংশধর তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করতে পারে এজন্য এসব করিতে আমায় অনেক বেগ পেতে হতেছে জানিবে। পাকিস্থানের আইন কানুনের অনেক নিয়ম আছে, সেই সব জানতে ঢাকা কুমিল্যা ব্রাম্মবাড়িয়া ডিষ্টিক ম্যায্যষ্টট্ কমিসনার এস ডিও এদের কাছে ঘুরাফেরা করিতে হইতেছে, তুমি যদি এসব দেখতে ও করিতে, সব ছেরে চলে আসতে হত। পাকিস্থানের হাকিমরা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করে বলে, অল্প কষ্টেই আমার কাজ হয়ে গেছে। এখনই ঐ দলিল গুলি আমার হাতে না আসা পর্যন্ত ব্রাম্মনবাড়িয়াতে কিছুদিন থেকে দলিলগুলি বের করে আনলেই আমি চৈলে আসিব। এখানে আমি থাকিব না মনে রেখ যদি মরে যাই তবে আসা অসম্ভব তাহা খুদার ইচ্ছার উপর। তুমার দিদি অনেকটা খুদার কৃপায়

সেরেছে আর বাকি আছে, যেটা খুদায় পূর্ণসাস্থ করে দিয়ে। আমি আনন্দ নিয়ে আসতে পারিবে গবরনরসাহেবের কাছে যেয়ে বলিবে মর্জ্জিদের পলেস্তর করা হতেছে আর একমাস লাগিবে, সিমেন্ট দুসপ্রাপ্প অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করিতেছি, ও বড় মেয়ের অসুখ। নানা কারনে আমায় আসতে দেরি হতেছে। এসব কার্য্যাদি হয়ে গেলে তবে আর করিতে পাইব না এরূপ ভাবে গবরনরকে জানাবে। আমি বুড়া মানোষ বড় কষ্ট করেছি, যাতে আমার কার্য্য শেষ করে আসতে পারি তার জন্য অনুমতিদান করুন, এই কর্ম আমার শেষ জিবনের সৎ কার্য্য। শ্রীমান দক্ষিনারঞ্জন বাবাকে টাকার জন্য কিছু লিখিবে না সে নিজে এসে তুমার মাকে বাকি টাকা দিয়ে যাইবে। তুমরা আমার জন্য চিন্তা করিওনা খোদায় কুন রকম চালিয়ে নিবেন তুমার মাকে বলিবে বাৎরূগের হাড্যি যদি কিছু যুগার করে পাঠাতে পার তবে বিশেষ লোকের ও আমার উপকার হবে। তুমার মা আমাকে যে কয়টা পরিয়ে দিয়েছিল তাহা হতে দুইটি দুজন লোককে দিয়ে ফেলেছি তাদের উপকার হয়েছে, কিন্তু আমি কষ্ট পাইতেছি ঔষধে যারা উপকার পেয়েছে তাদের ধন্নবাদ তুমার মাকে জানাবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি
বাবা

এবারের চিঠি পেয়ে বুঝলাম বাবা আমার প্রথম চিঠি পান নি। যার জন্য আমাকে লিখেছেন অলস। যাক চিঠি পেয়েছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। বাবা লিখেছেন যে প্রত্যেকটি কাজে বাধার সম্মুখীন হয়েও কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। আরও বাবা লিখেছেন, বাত রোগের জন্য হাড্ডি পাঠাতে। এই ওষুধ পাঠালে অনেকের উপকার হবে। বাবার চিঠি মাকে পড়ে শোনালাম। মৈহারে আসার পর দেখেছি, মা অনেক টোটকা ওষুধ জানতেন। কুমিল্লা যাবার সময় বাবাকে কয়েকটা দিয়েছিলেন। বাবা বাদুড়ের হাড় দেশে কয়েকজনকে দিয়েছেন, যার ফলে তারা উপকার পেয়েছে। সেইজন্য কয়েকটি পাঠাবার জন্য লিখেছেন। বাবা বাইরে দেখাতেন এ সব কুসংস্কার, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতেন। মা বাবাকে যে সময়ে বাদুড়ের হাড় পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলে উপকার পেয়ে রসিকতা করে আমার সামনে মাকে বলেছিলেন, 'আরে আরে তুমি তো ডাক্তার। ডাক্তারি করলে তোমার পশার খুব হতো।' কিন্তু বাবাকে যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম তার উত্তর এখনও কেন পেলাম না। আজকাল চিঠির খুব গোলমাল হচ্ছে। বাদুড়ের ছোট দশটি হাড় কিনে বাবাকে রেজিষ্টারড পারসেল করে পাঠিয়ে দিলাম।

মৈহারে গুলগুলজীর ভাই কাশী এসেছে জব্বলপুর থেকে। কাশীর কাছে শুনলাম দিল্লীর সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির মধ্যেও রাজনীতি ঢুকেছে। কথা উঠেছে আলি আকবর এবং রবিশঙ্করের মধ্যে কে প্রথম পদ্মভূষণ পাবে? কাশী এ সব খবর পায় কোথা থেকে? এ ছাড়া বলল, 'অমরাবতীতে এক জায়গায় আলি আকবর বাজিয়েছে। আলি আকবর সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে। এই বিরূপ সমালোচনার কারণ আছে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ কাগজের রিপোর্টারকে দিয়ে এই ধরনের সমালোচনা করিয়েছে। সঙ্গীতের মধ্যে

কি ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। একজনের কথায় খবরের কাগজে আলি আকবর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য কোন সাহসে লেখে বুঝতে পারি না। এই সব কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাম্মনবাড়িয়া
ব্লিজ ব্রাম্মন বাড়িয়া, মদ্ধপাড়া
জিলা-ত্রিপুরা

কল্যানবর ২৩-৩-৫৫

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পাইলাম দিল্লীর প্রগ্রাম বিসয় জানিয়েছ সে সময় এসে পৌঁহুছিতে পারিব কিনা চিন্তার বিসয়, তুমার দিদিকে নিয়ে সমস্বায় পরেছি তাহার রূগ আরূজ্ঞ না হওয়া পযন্ত কি করে আসি চিন্তার বিসয়। আমি মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে আসিবার ইচ্ছাকরি, এখন সমস্বা হল তুমার দিদিকে নিয়ে ভগবত কৃপায় যদি ভাল হয়ে যায় তবেই চৈলে আসিব। পুর্ব্ব হতে এখন কিছু কিছু আরূজ্ঞের ধিগে চলছে এখন ভগবত কৃপায় যদি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায় তবেই চৈলে আসিব। এজন্যই বলি দিল্লীর প্রগ্রাম নিষেধ করে দেও যদি সময় মতো না আসতে পারি এজন্য। শিবপুরের সম্পত্বিগুলির তুমার দাদার নামে দান পত্র করিবার উকিলদের সঙ্গে পরামর্স করিতেছি, সম্পত্তির দাগ নম্বর এসবগুলি এনেছি, যত সিঘ্র হয় এর প্রতিবিধান করিব। শিবপুরে গ্রাম্ম ছেলে মেয়েদের ধর্ম্মসম্বন্ধ শিক্ষা পাবার জন্য গত শুক্রবারে বড় একজন আলিম এনে আরম্ভ করে দিয়েছি এসব করিতে বেগ পাইতে হয়েছে, শিবপুরের সম্পত্বির আয়ের দ্বারা মর্জ্জিদ ও মাদ্রাসার খরচ করা হবে। ঐ সম্পত্বির দুই বৎসরের খাজনা বাকি ছিল সব দিয়ে পরিস্কার করেছি আর কিছু বাকি আছে, মেয়ের সেবা করে আবার ভিক্ষা করিতে হয়, তখন আমার ভাই নায়েবালি তুমার দিদির সেবাযত্ন করে। এসব কারনে সময় খুব কম পাই পত্রলিখার সময় পাইনা আমার সরিরও বিশেষ ভাল নয় মনের বলে চলি তিনি চালান। দেসের সকলে আদর যত্নখুব করিতেছে, সমরাটের মতন সনমান পাইতেছি, আমার প্রাপ্যর অতিরিক্ত দেস এমন জেগেছে সঙ্গীতের জন্য এখন সকলেই লালাইত, মুসলমানরা সকলেই সঙ্গীৎ পৃয় হয়েছে। শ্রীমান দক্ষিন রঞ্জন বাবার কাছে সারে নয়সত টাকা রেখে এসেছি তুমার মাকে দেবার জন্য সেই টাকা পেয়েছ কিনা জানাবে।

তুমার মাকে বলিবে তুমার দিদির আরূজ্ঞের জন্য যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। চিন্তার কারন নেই আশাকরি সিঘ্রই খুদা আরূজ্ঞ করিবেন গবরমেন্টের কাছে জেয়ে আমার কথা জানাবে মেয়েটি ভাল হলেই আমি চৈলে আসিব। সঙ্গীৎ বিদ্যালয় যদি খুলা হয় সব যেন প্রস্তোৎ করে রাখেন, আমি এসে যেমোন তাতে যোগদান করিতে পারি। প্রথম হল বিদ্যালয়ের স্থান তারপর শিক্ষা আরম্ভ, ছাত্রদের থাকার স্থান তবেই বিদ্যালয় হবে। স্টেটে আমি ৩০ বৎসর ছুটি নেইনি, সে জন্য আমার অনেক ছুটি প্রাপ্য গভরনকে জানাবে আমার আদাব জানাবে। সবঠিক করে আমাকে জানাও তবেই আমি চৈলে আসিব। এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি, তুমার দিদির আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে ইতি

বাবা

বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। বাবাকে বহুদিন আগে লিখেছি, দক্ষিণারঞ্জন পাঁচশত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার কেন বাবা লিখেছেন সেই এক কথা। এ ছাড়া, বাবার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে বাবার আসতে এখনও দেরী হবে। বিদ্যালয়ের কথা লিখেছেন যে সব ব্যবস্থা হলেই তবে আসবেন। অথচ ছুটি বহুদিনের প্রাপ্য আছে বলে বাবা আরও কিছুদিন থাকবেন মনে হয়। বাবার চিঠি পেয়ে দিল্লীর প্রোগ্রাম সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলাম।

মৈহারে বাবার না থাকার ফলে সমস্যার পর সমস্যা বেড়েই চলেছে। রেওয়া থেকে চিফ সেক্রেটারির চিঠি পেলাম। মৈহার ব্যাণ্ডের জন্য সব যন্ত্র কেনা হয়েছিল এবং মেরামত করা হয়েছিল, সেই খরচার রসিদ পাঠাতে হবে। বাবা যা খরচা করেছেন তার রসিদ আমাকে দেন নি। মনে হয় বাবার কাছেও নেই। গুলগুলজীকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। কোলকাতায় বাবা যে সময় যন্ত্র কিনেছিলেন রবিশঙ্কর সেই সময় কোলকাতায় ছিলো। সুতরাং রবিশঙ্করকে সব জানিয়ে টাকার হিসেব করে পাঠালাম যদি রসিদ পাঠিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্যও চিঠি এসেছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছে বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার মৈহারে সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলছে যার অধ্যক্ষ হবেন বাবা। বাবাকে চিঠি দিলাম সব কথা জানিয়ে।

আজ রবিশঙ্কর মায়ের নামে সাড়ে তিনশো টাকা পাঠিয়েছে। এত টাকা কেন পাঠিয়েছেন? টাকা দেখে জুবেদা বেগম বললেন, 'এ টাকা আশিসের বাবা পাঠিয়েছে। ছোট বউ বোধ হয় দিল্লীতে আছে, সেইজন্য তার ভয়ে রবিশঙ্করের নামে পাঠিয়েছে। এ কথা শুনে অবাক হলাম। বাড়ীতে মায়ের কাছে টাকা পাঠাবে তার মধ্যে ভয়ের কি আছে?

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ হতে চলল। রবিশঙ্কর ব্যাণ্ডের যন্ত্র কিনবার রসিদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ রসিদের অর্থ কি? কোন চিঠি লেখে নি। বাবাকে চিঠি দিলাম।

পোষ্টঅফিসে গিয়ে দেখি রবিশঙ্কর একটা পার্সেল পাঠিয়েছে। পার্সেল খুলে দেখি ভিটামিনের ট্যাবলেট এবং লিকুয়িড ভিটামিন। অবাক হলাম কোন চিঠি নেই দেখে। ওষুধ কেন পাঠিয়েছে? মার কাছে জানতে পারলাম যে মা একটা চিঠি লিখেছিলেন অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। শরীর ভাল নেই লিখেছিলেন। এরজন্য রবিশঙ্কর ভিটামিন ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিয়েছে। মা বললেন, প্রাপ্তি সংবাদ লিখে দিতে। মনটা ভাল নেই, এমন সময় একটি ছেলে এলো। পরিচয় দিয়ে বলল সে সিলোন নিবাসী। নাম ডেভিড। সে সেতার শিখবার আগ্রহ নিয়ে মৈহারে এসেছে। ডেভিডকে বললাম, 'বাবা উপস্থিত মৈহারে নেই। এ ছাড়া বাবা এখন কাউকে শেখাতে চান না বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বলে।' ছেলেটি আমরা পরিচয় জানতে পেরে পা ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'বড় আশা নিয়ে এসেছি। সেতার, বেহালা এবং তবলা একটু বাজাতে পারি। সঙ্গে একটি সরোদও রয়েছে। আপনার কাছেই উপস্থিত শিখবো।' তার সেতার শুনলাম। তার মাথা ভালো কিন্তু শিক্ষা পায় নি। বহু জায়গায় ঘুরে বাবার কাছে এসেছে। তাকে দেখে মায়া হল। মনে হলো ছেলেটিকে বাবার অবর্তমানে শিক্ষা দিলে যদি পরিশ্রম করে বাজায়, তাহলে বাবা শিক্ষা দেবেন। ছেলেটিকে থাকবার জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে দিলাম। তাকে শিক্ষা দিতে লাগলাম। সরোদ শেখাতে লাগলাম। দেখলাম সে দিনরাত রেয়াজ করে।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু বাবার আসবার এখনও দেরী হচ্ছে। মৈহারের জীবনটা একঘেয়ে লাগছে।

বাবার ছুটির দরখাস্ত টাইপ করিয়ে, কুমিল্লায় পাঠিয়ে দিলাম। আলি আকবরের কোন চিঠি আসছে না। বাড়ীর আবহাওয়া ভাল নয়। মৈহারে মেলা এসেছে। গ্রামে মেয়েদের ভীড়। জুবেদা বেগম নিজের হাতের কাঁচের চুড়ি দিয়ে বললেন, 'চুড়ি কিনে আনুন আমার জন্য।' জীবনে কখনও চুড়ি কিনি নি। এ কোন ঝামেলার মধ্যে পড়লাম। বললাম, 'চুড়ির ভালমন্দ বুঝি না।' তবুও আনতে হবে। চুড়ি কিনে আনলাম। চুড়ি দেখেই বললেন, 'বাজে'। বললাম, 'ভবিষ্যতে কখনও এই সব বাজে জিনিস আনতে বলবেন না।' এ কথা বলেই চুড়ি ফেরত দিয়ে পোষ্ট অফিস গেলাম। পোষ্ট অফিস গিয়ে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাহ্মন বাড়িয়া
মদ্ধপারা
জিলা ত্রিপুরা
পুর্ব্ব পাকিস্থান
১০-৪-৫৫

কল্যানবর—

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র পাইলাম সব বিসয় অবগত হইলাম, বুধ হয় আর কিছুদিন থাকিতে হবে, তুমার দাদার নামে যে দান পত্র করেছি তাহার রেজেষ্টারি করা হইয়াছে সেই কাগজাৎ পাইতে আর দুই মাস লাগিবে। আরেকটি পুকুর কাটা পুকুর খনন করার জন্য দরখাস্ত করেছি গ্রাম্ম জনগনের সেবার জন্য তাহার মঞ্জুরি কাগজাৎ পাই নাই এজন্য আমার আসতে দেরি হবে। আরেকটা ছুটির দরখাস্ত তুমি লিখে আমার কাছে পাঠাবে, অসুখ হয়েছে বৈলে ডাঃ ছাটটীপিকেট নিয়ে তুমার কাছে পাঠাবে। যদি এর মদ্ধে কাগজাৎগুলি পেয়ে যাই তবে মে মাসের শেষ ভাগে চৈলে আসিব। কলেজ হবে ও আমাকে তাহার উচ্চপদ দান করিবেন তাহা খবরের কাগজে দেখেছ, তাহা বুধ হয় আমার অভ্যাস করিবার পথ ও লালসার শুবন্দোবস্ত করিতেছেন। যদি উচ্চ পদই দান করেন, খাওয়া পরার উচ্চপদের সঙ্গে দান করিবেন কিনা, তাহা কিছু জানান নাই, সেটা যদি দয়া করে যদি জানান তাহা হলে এখানের, সব কার্য্য ছেরে চলে আসিতে প্রস্তোৎ, তাহা জানার শুযোগ হবে কি। যা হক বুজেশুনে যা হয় করিবে, এখানে কুন প্রকারে ভীক্ষা করে এখানে কর্ম্ম করা হতেছে, বেস আনন্দ পাইতেছি। তুমার দিদি ১৫-২০ দিন হল আপন ঘরে চৈলে গিয়েছে, জামাতা বাবাই লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছে এর নাকি সংস্বার অচল হয়ে পরেছে, এই নিজের বহু কষ্ট হয়, এই উজুহাৎ দিয়ে তুমার দিদিকে জামাতা বাবু লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছে, তুমার দিদিও আনন্দ দিতে আপনার ঘরে গিয়েছে। আমি এখন একা আকুপাকি, ছুট শ্রীমান নায়েব আলি আমার সঙ্গে আছে, লক্ষন ভাইকে নিয়ে দিন যাপন করি, বেস সুখে আছি কুন ঝঞ্ঝাট নেই। ভালই আছি চিন্তার কারণ নেই এক প্রকার সকলকে আমার আসীর্ব্বাদ জানাবে, তুমার কুশল কামনা করি

ইতি—
বাবা

বাবার আসতে এখনো দুই মাস লাগবে। নানা কাজে হাত দিয়েছেন বাবা। একবার লিখছেন কাজ হয়ে গেলে এই মাসের শেষে আসবেন, আবার লিখেছেন অসুস্থ হয়েছেন বলে দরখাস্ত করবেন। বাবার বড় মেয়ে, জামাতার সঙ্গে চলে গেছেন। মার কথামত লিখেছিলাম শুঁটকি মাছ আনবার জন্য। বাবা জানতে চেয়েছেন উচ্চ পদে থাকিবেন বলে খবরের কাগজে বেরিয়েছে কিন্তু উচ্চপদের জন্য কত টাকা পাবেন। বাবা এলে সামনাসামনি কথা হবে। আমি যে চিঠি দিয়েছি সে চিঠি বোধ হয় এতদিনে পেয়েছেন। ব্যাণ্ডের বাজনা কেনবার রসিদ সম্বন্ধে বাবার নির্দেশ পেলেই বাবাকে চিঠি দেব। বাবার বহু চিঠি জমে গেছে। প্রোগ্রাম আসছে, কিন্তু সব নাকচ করে দিই।

মার সেতার কাটনিতে দিয়ে সারিয়ে, রসিদ নিয়ে এলাম। এবং তার কথামত কিছু কমলালেবু কিনে আনলাম। মা সেতার পেয়ে খুসী হয়ে দইবড়া এবং পান খাওয়ালেন। মা কত অল্পেই খুশী। বাজনা কত ভালবাসেন এতেই বোঝা যায়। মা কিছু শেখেন নি। কিন্তু নিজের মনে বাজিয়ে যান। কখনও হারমোনিয়াম বাজান। নূতন কোন রাগ বাজালেই শুনে শুনে কিছুটা বাজান। এই বয়সে সারাদিন কাজ নিয়ে থাকেন। ঘুম সেই রাত্রে, আবার ভোরেই উঠে পড়বেন। কখনও এর ব্যতিক্রম নেই। এই বয়সে এত কর্মদক্ষতা কল্পনা করা যায় না।

মৈহারে বাবা থাকলে প্রায় রোজই চিঠি আসতো। কিন্তু বাবার অবর্তমানে দ্বিগুণ চিঠি আসতে আরম্ভ করেছে। চিঠি লিখতে আলস্য লাগে। কিন্তু এবারে চিঠি না দিলে আর উপায় নেই। অনেক চিঠি জমে গেছে। যদিও চিঠির উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত। উপস্থিত বাবার আসবার দেরী আছে, সুতরাং দুই মাস পরে চিঠি দিতে। কুমিল্লার ঠিকানা কাউকে দিইনা, কারণ চিঠি দেশে গেলে বাবাকে উত্তর দিতে হবে। বাবা যে পরিমাণে ঘোরাঘুরি করছেন সেই অবস্থায় যদি চিঠির উত্তর দিতে হয়, তাহলে বাবার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।

চিফ সেক্রেটারীর চিঠি পেলাম। লিখেছেন, গভর্ণর সাহেবকে বাবা যেন সত্ত্বর জানান কবে নাগাদ আসতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা দরখাস্ত লিখে বাবাকে পাঠালাম। যেহেতু দেশে কিছু কাজ আছে সেইজন্য কত তারিখ নাগাদ বাবা আসতে পারবেন। তারিখের জায়গাটা ছেড়ে দিলাম। বাবাকে এই মর্মে চিঠি দিলাম। বাবাকে চিঠি দিচ্ছি শুনে মা বললেন, আমার জবানীতে তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দাও, সারা জীবন কষ্ট দিয়েছেন। শেষ জীবনেও কষ্ট দেবেন। শীঘ্র চলে আসতে। যদি না আসেন তাহলে মৈহারে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।' মার কথা শুনে কষ্ট হল। মার জবানীতে বাবাকে একটা চিঠি দিলাম।

মৈহারে নূতন খবরের মধ্যে মাঝে মাঝে রাজকুমার এবং গুলগুলজীকে শেখাতে হয়। প্রতি মাসে দুই দিনের জন্য খামারিয়া থেকে কর, মেয়েটিকে নিয়ে আসে শিক্ষার জন্য। যদিও শেখাবার সময় অতিষ্ট হয়ে পড়ি, কিন্তু একটি কথা ভেবে কাউকে না করতে পারি না। নিজের জীবনে শিক্ষার জন্য কত উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, কিন্তু শিখবার কোন সুযোগ পাই নি। সেইজন্য যদি শেখার বাসনা নিয়ে কেউ আসে, তাহলে না করতে বিবেকে বাধে।

আজ হঠাৎ বিদেশী খামে আলি আকবরের চিঠি দেখে অবাক হলাম। চিঠি লিখেছে

জুবেদা বেগমকে। দীর্ঘদিন কোন খবর পাই নি। কবে আলি আকবর আমেরিকা গেল? জুবেদা বেগম চিঠিটা পড়ে বললেন, 'এতদিনে নখড়া করে মার কথা লিখেছেন। যেহেতু বাবার অবর্তমানে নিজের মৈহারে থাকার কথা অথচ তার বদলে আমি আছি বলে, নখড়া করে আমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখেছে।' এ কথা শুনে মনে হল এ আচ্ছা রূপক। কাকে দেখব? আলি আকবরের ঠিকানায় একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'আমেরিকা থেকে ফিরে একবার যেন অতি অবশ্যই মৈহারে আসবেন।' বাবার আসার আগে একবার এখানে এলে বাবা খুশী হবেন।' অন্যান্য সব চিঠির আজ জবাব দিলাম।

পরের দিন বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

পোঃ ব্রাম্মন বাড়িয়া
ব্লিজ ব্রাম্মন বাড়িয়া
জিলা ত্রিপুরা
২১-৪-৫৫

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা তুমার পত্রে সব বিসয় জানিলেম, বেন্ডের যে ৪০০, সত টাকা পেয়েছ তাহার হিসাব যন্ত্রগুলি মেরামৎ করাবে। হারমনি গুলি খারাপ হয়ে গেছে সেইগুলি মেরামৎ করিয়া রেখ। সেতারের এবং সেতার বেঞ্জুরতা বুম্বে হতে এনেছিলাম তার রসিদ হারিয়ে ফেলেছি, আন্দাজ করে তার মূল্য লাগিয়ে হিসাব পুরা করে দিবে। বেহালা ও দুইটি সেতার তার সব কলিকাতা হইতে এনেছিলাম তাহারও রসিদ কথায়য় রেখেছি তাহা সরন নেই। এরও এক বৎস্বরের কত লাগে হিসাব করে পুর্ন করিবে। লৌহ তরঙ্গের মেরামত খরচ যা কিছু লেগেছে হিসাব করে লাগাবে। তবলা ও ঢোলকের ছাওনি বৎসরে কত বার লেগেছে তার হিসাব করে ঠিক করিবে, সব ঠিক করে রেওয়া পাঠাবে। এর ভিতর যদি আমি আসিতে পারি কলিকাতা হতে সব যন্ত্রের তার নিয়ে আসিব। গুলগুলকে সঙ্গে নিয়ে সব যন্ত্র মেরামৎ ভাল করে করাবে, ঐন্য একটা পুরান হারমনি কাটনি সরদার সিংঙ্গের কাছে নতুন করে তৈয়ার করিতে দিয়েছি সটাও তৈয়ার করিয়ে হিসাবে লাগাবে। ঐ হারমনি সরদার সিঙ্গের কাছে নিজে সেখানে গিয়ে তাগাদা করিবে। এসরাজের তারও নিয়ে এসেছি বুম্বের তার হতে দুইটি এসরাজের তারের এক বৎস্বরের হিসাব লাগাবে, এদের যদি তার না থাকে তবে ছুট কামরার সামনের আলমারিতে তারের বাণ্ডিল খুলা আছে সেখান হতে একগুচ্ছা তার দিয়ে দেবে, ছয় বৎস্বর পর্য্যন্ত আমি নিজের খরচ দিয়ে বেগু চালিয়েছি। ছয় বৎস্বরের চারিসত টাকা করে বৎস্বরে ২৪০০্ সত টাকা আমার গবরমেন্টের কাছে প্রাপ্য এর জন্য দরখাস্ত করিতে হবে। এ বৎস্বরের হিসাবের সঙ্গে আমার প্রাপ্য টাকারও উল্লেখ করে দিবে। পত্রপাঠ যন্ত্রগুলি মেরামতের জন্য গুলগুলের দ্বারায় পাঠাবে কাটনি সরদারজির কাছে, যা উচিৎ তাহাই সরদারজিকে দিবে রসিদ আনতে হবে। শ্রীমান দক্ষিনারঞ্জন রায় যে টাকা কলিকাতা হতে পাঠিয়েছে তাহা হতে, বেণ্ডের চারিসতের হিসাবের টাকার খরচ পূরণ করিবে। শ্রীমান দক্ষিনারঞ্জন রায়ের কাছে ১০০০্ হাজার টাকা দিয়েছিলেম তাহা হতে কিছু টাকা পাকিস্থানে

আমার জন্য ১ খরচ করেছে এবং আর জিনিসপত্র কিনেছিল বাকি বাদ দিয়ে সারে নয়সত টাকা বলেছিল তুমার মাকে পাঠাবে সেই টাকা পেয়েছ কিনা, যদি পেয়ে থাক ঐ টাকা হতে বেণ্ডের যন্ত্রের মেরামতের জন্য খরচ করিবে। তুমার দিদিকে নিয়ে পরেছি বিসমগুনে, তাহার ভাল না দেখে আমি কি করে আসি, চিন্তা করিবে আমি সন্তানের পিতা হয়ে সন্তানকে বেয়রাম দেখে কি করে আসি, গবরনরকে জানাবে তিনিও সন্তানের পিতা। একে ত আমি মর্জ্জিদের জন্য খেটে ২ অর্দ্ধমর হয়ে গেছি, তিনমাস যাবত বিক্ষা করেছি, না আছে খাওয়া না আছে নিদ্রা, এর উপর তুমরা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ, কুনধিগকে রক্ষা করিব ভেবে দেখিবে। মাইহারের চাকরির জন্য আমার মাথা ব্যথা করিবার কিছু নেই, আমি সব করে এসেছি, এখন আমার জন্মস্থানের জন্য যতটুকু করতে পারি তাবাই চিন্তা করি।

মাইহারের চাকরিতে আমার কি লাভ হয়, আমার খরচের মত টাকাও পাই না, এজন্য আমার মন ভেঙ্গে গেছে, কাহাতক এর জন্য চিন্তা করিব। নিজে চিন্তাও করিতে পারি না এই হল আমার কর্ম্মের ফল। এখন এই চিন্তা করি যা ভাঙ্গে আছে তাহাই হবে।

শ্রীমান গুলগুলকে আমার আসির্ব্বাদ জানাবে, বেণ্ডের সকল ছেলেধিগকে আমার আসির্ব্বাদ জানাবে। যা একপ্রকার কর চিন্তা করে করিবে, একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি

ইতি
বাবা

বাবার চিঠি তাড়াতাড়ি এল। যা ভেবেছিলাম তাই হল। বাবার কাছে কোন রসিদ নেই। কিন্তু রবিশঙ্কর যে রসিদ পাঠিয়েছে তার কোন অর্থই হয় না। দক্ষিণারঞ্জনকে চিঠি দিলাম। বাবা যে স্থান থেকে যন্ত্র এবং তার কিনেছেন সেই জায়গা থেকে রসিদ পাঠাতে। বাবার কথা মত ইতিমধ্যে কাটনি থেকে হারমোনিয়াম এবং সব রসিদ নিয়ে এসেছি। যে টাকার রসিদ নেই তা এডুকেশন মিনিষ্টারকে সত্য কথা লিখে জানাব। গুলগুলজীকে ডেকে সব কথা জানালাম। গুলগুলজীকে একটা খরচার লিষ্ট করতে বললাম।

গভর্ণর সাহেবের আদেশে, শিক্ষামন্ত্রী মাথুর সাহেবের চিঠি পেলাম। জুন মাসে রাজকীয় বিদ্যালয় খুলবার কথা লিখেছেন। কিন্তু বাবা কি আসতে পারবেন জুন মাসে? জুন মাসের আর তো বিশেষ সময় নেই। শিক্ষা মন্ত্রীকে বাবার ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'বাবাকে সব বিস্তারিত জানান। বাবা যদি আসেন তবে বিদ্যালয় খুলবে। বাবার আসার দিন জানতে পারলে সব কথা হবে। ব্যাণ্ড পার্টি এবং বিদ্যালয়ের বেতন প্রথমে ঠিক করতে হবে তবে সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। যন্ত্র, এবং বাজনার তার ক্রয়ের রসিদের কথা ইঙ্গিতে জানালাম। যে কটা রসিদ পাব শীঘ্রই পাঠাব।' বাবাকে চিঠির জবাব দেওয়া বৃথা। দেখি দক্ষিণারঞ্জনের নিকট থেকে কি উত্তর আসে।

মৈহারে রাজকীয় বিদ্যালয় খুলবে বলে সকলের কাছে জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গীত বিদ্যালয় খুললে সেটা হবে আমার কাছে অভিশাপ। বাবার অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য

বাড়লে, বাবার মেজাজ ভাল থাকবে। কিন্তু এর ফলে আমার শিক্ষার বারোটা বেজে যাবে। আবার এসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন গোপালশরণ সিং এসে বললেন, 'বাবাকে লিখে দিন তাড়াতাড়ি করে আসতে।' উত্তরে বললাম, 'সময় হলেই আসবেন।' মৈহারের মত জায়গায় কি ছাতার বিদ্যালয় খুলবে তা জানা আছে। বিন্ধ্য প্রদেশের ছাত্ররাই শিখবে, সুতরাং ছাত্ররা কি পর্য্যায়ের হবে কল্পনাই করা যায়। আজ পর্যন্ত দূর দূর থেকে ছেলেরা এসেছে শিক্ষার আশায়, কিন্তু বিন্ধ্যপ্রদেশের একটি ছেলেও আসেনি। যাক যা হবার হবে। যতটা সময় পাই মন দিয়ে বাজালে কাজ দেবে। ভবিষ্যৎ ভেবে কোন লাভ নেই। সুতরাং সন্ধ্যের থেকে খাবার বাদ দিয়ে রাত্রি দুটো অবধি একনাগাড়ে বাজালাম।

সকালে বাজার যাব। রমজান চলছে। আর পাঁচদিন পরেই ঈদ। মা রোজা করছেন। তার মানে শেষ রাত্রে কিছু ফল মিষ্টি খান এবং সারাদিন উপবাস। সন্ধ্যার সময় সরবত খেয়ে রোজা ভঙ্গ হয়। মার জন্য সন্ধ্যায় বরফ এনে দি। কি জানি কেন মনে খেয়াল চাপল একদিন আমিও উপবাস করব। এই গরমে সারাদিন জল না খেয়ে, উপবাস করে দেখিনা, কি রকম মনের অবস্থা হয়? এই সময়ে বাবার মেজাজ দেখেছি। দেখি না, একদিন উপবাস করে আমার মেজাজ কেমন থাকে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মাকে বললাম, 'আমিও আগামীকাল রোজা করব। ভোর রাত্রে ডেকে আমাকে চা এবং খাবার দেবেন।' মা আমার কথা শুনে বললেন, 'এটা কি বল বেডা! তুমি রোজা করবে? ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছা তাহলে করো।'

পরের দিন ভোর চারটের সময় মা আমাকে উঠিয়ে দিলেন। চা এবং নাস্তা করলাম। তারপর ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল দশটার সময় বাজার এবং ওষুধ নিয়ে এলাম। গরম জলের অভাব অনুভব করলাম। চুপ চাপ নিজের ঘরে পড়তে লাগলাম। দুপুরে রোজ খাবার পরই দু ঘণ্টা ঘুমোনর অভ্যাস। কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। গলা শুকিয়ে মনে হচ্ছে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরম তো রোজই পড়ে। কিন্তু আজকের গরমটা যেন বেশী অনুভব হচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একটা বই পড়ছি। ঘুমও আসছে না এবং বই পড়েও সময় যেন কাটতে চাইছে না। তিন চার বার বাড়ীর বাইরে লনের মধ্যে ঘুরে এলাম। পাঁচটা বাজবার আগেই একটু বেশী করে বরফ নিয়ে এলাম। তবুও সন্ধ্যে হতে দেরী। অবশেষে সন্ধ্যা হোল। আমার আর তর সইছে না। অবশেষে দুই গেলাস বরফজল খেলাম। বরফ দিয়ে সরবৎ খেলাম। সরবৎটা বিস্বাদ লাগল। তারপর খাবার খেয়ে মনে হোল ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। মাকে দেখে কোন কিছু বুঝতে পারলাম না। মা বললেন, 'রোজা করে কেমন লাগল? সকালে আবার উঠিয়ে দেব তো?' মাকে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললাম, 'আজ বুঝতে পারলাম বাবার মেজাজ কেন গরম হয়।'

আমার কথা শুনে মা বললেন, 'বেডা তোমার আর উপোস করবার দরকার নেই।' দুপুরে ভাত না খেয়ে, বিকেলে চা জলখাবার এবং জল না খেয়ে যে এত কষ্ট হয় তা জানতাম না। একদিন রোজা করেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

বাবার মেজাজ গরম হওয়ার আর একটা কারণ ছিলো। যাদের পান কিংবা সিগারেটের

নেশা থাকে, তাদের যদি নেশার বস্তু না দেওয়া হয় তাহলে তার পরিণাম যে কি ভয়ানক হয়, মৈহার ছাড়বার পর বুঝেছিলাম। বাবা সারাদিন বাড়িতে তামাক এবং বাইরে চুরুট খেতেন। তামাক না খাওয়ার জন্যই মেজাজ গরম হ'তো। আজ পর্যন্ত জল না খেয়ে উপবাস জীবনে দুইবার করেছি। আজকের উপবাস আমার জীবনে দ্বিতীয় বার করলাম। তারপর আর কখনও উপবাস করিনি। আমার জীবনের প্রথম উপবাসের অভিজ্ঞতার গল্পটা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এ ঘটনাটা কাশীতে হয়েছিল। সে সময় আমার বয়স কতই বা হবে। সবে বারো বছরে পড়েছি। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, শিবরাত্রির দিন আমার মা সারারাত জেগে, বাড়ীতে শিবের মন্দিরে চার প্রহর পূজা করতেন এবং পরের দিন সকালে দেখতাম একটা পাথরের বাটিতে সাবু, কলা, দই, চিনি দিয়ে খেতেন। সকালে মা আমাদের সেই প্রসাদ দিতেন। বড়ই উপাদেয় হ'তো। মা শিবরাত্রির দিন, চব্বিশঘণ্টা উপোস করে পরেরদিন খেতেন। একবার মনে হলো উপোস করলে পরের দিন বড় পাথর বাটির একবাটি এই উপাদেয় প্রসাদ পাব। এই ভেবে মাকে বললাম, 'শিবরাত্রির দিন উপবাস করব।' মায়ের বারণ করা সত্ত্বেও উপবাস করেছিলাম। কিন্তু দিন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জলতেষ্টায় কষ্ট হতে লাগল। আমার উপবাস দেখে দিদি এবং দাদারা হাসবে বলে, মাঝে মাঝে লুকিয়ে গিয়ে সারাদিন কয়েকবার জল খেয়েছিলাম। জিদ করে সারারাত কাটিয়েছিলাম। রাত্রেও লুকিয়ে জল খেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, সকালে মা যখন একবাটি প্রসাদ দিলেন খুব ভাল লাগল। প্রতি শিবরাত্রের পরের দিন যে প্রসাদ উপাদেয় মনে হ'তো, এবার সেই প্রসাদ এক গ্লাস মুখে দিয়ে যে কি বিস্বাদ লেগেছিল সে কথা আমার আজও মনে আছে। তারপর আর কখনও শিবরাত্রির উপবাস করি নি। মৈহারে এসে অবধি রোজার সময়ে বাবার সঙ্গে সরবৎ খেতাম। ভালই লাগত। কিন্তু আজ এই সরবৎ যে কি বিস্বাদ লাগল সে কথা আজও মনে আছে। বরফ জলটাই অমৃত মনে হয়েছিল। দিল্লী থেকে চিঠি এসেছে। লিখেছে অমিয়, অর্থাৎ রবিশঙ্করের টাইপিং ক্লার্ক। চিঠি পড়ে আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ আশিসের এপেনডিসাইটিস অপারেশন হয়েছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে, অপারেশন করাতে হবে, নইলে বার্স্ট হয়ে যাবে। সুতরাং অপারেশন হয়েছে। যদিও হাসপাতালে আছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। ভাল আছে। মা এবং জুবেদা বেগমকে চিঠি পড়ে শোনালাম। মাকে, জুবেদা বেগম রোগটার জন্য যে অযৌক্তিক কারণ বলতে লাগল, সে কথা শুনে রাগে ফেটে পড়লাম। বললাম, 'দিল্লীতে ছিল বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে ভগবানের আশীর্বাদে। এ রোগে যে অবস্থা হয়েছিল তা অন্য জায়গা হলে বাঁচান কঠিন হয়ে যেত।' আমার কথা শুনে জুবেদা বেগম বললেন, 'আজই দিল্লী যান।' উত্তরে বললাম, 'প্রাণেশের জ্বরটা ভাল হয়ে গেলেই যাব। আশিসের অপারেশন ভালভাবে হয়ে গিয়েছে সুতরাং ভাবনার কিছু নেই।'

পরের দিন আশিসের চিঠি পেলাম। আশিস তার মা, দিদা এবং আমাকে বিশদভাবে রোগের অবস্থা জানিয়ে আলাদা করে চিঠি লিখেছে। চিঠি পড়েই জুবেদা বেগম কাঁদতে কাঁদতে আমাকে দিল্লী যাবার জন্য বললেন। মা চিঠি শুনে বললেন, 'বেডা তুমি আমার

নাতিকে দিল্লীতে গিয়ে দেখে এসো।' বাড়ীতে এখনও ধ্যানেশ এবং বেবীর জ্বর ছাড়ে নি। উপরন্তু প্রাণেশের জ্বর। অথচ দিল্লীতে যাওয়ার দরকার। বাড়ীর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের কাছে সব বললাম। ডাক্তারকে বললাম, 'আজ রাত্রের ট্রেনে দিল্লী যাব, প্রথমে ধ্যানেশ এবং বেবীর ওষুধ দিন, এছাড়া আগামীকাল থেকে, আমি দিল্লী থেকে না ফেরা পর্যন্ত, দয়া করে একবার রোজ বাড়ীতে যাবেন।' ডাক্তার আমার কথায় সম্মত হয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে দিল্লী যেতে বললেন। ওষুধ নিয়ে বাড়ী এসে বললাম, 'রাত্রের ট্রেনেই দিল্লী যাব।' আমার কথা শুনে জুবেদা বেগম পঞ্চান্ন টাকা দিলেন। রাত্রে যাবার আগে বললেন, 'দিল্লী থেকে আসবার সময় একটা সুন্নি কিনে নিয়ে আসবেন।' রাত্রে মৈহার থেকে যাত্রা করে ভোরবেলায় এলাহাবাদে পৌঁছলাম। অসহ্য গরম। এলাহাবাদ থেকে কাল্কা মেলে যাব। গাড়ীতে এত ভীড় যে থার্ড ক্লাসে ওঠা সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে গেলাম। সেকেণ্ড ক্লাসেও এত ভীড় যে কোন রকমে বসবার একটা জায়গা পেলাম। টুনড্‌লায় গাড়ী পৌঁছবার পর কোন রকমে উপরের বার্থে জায়গা পেলাম। কিছু লোক নামল সন্ধ্যার সময়। স্টেশনের নাম শুনলাম হাথরস। লোকেদের কাছে শুনলাম হাথরস থেকে দিল্লী কাছেই। মনে মনে ভাবলাম ফিরবার পথে তাহলে হাথরসে নেমে, লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের সঙ্গে দেখা করে মৈহার যাব। সন্ধ্যার পর রাত্র নয়টা নাগাদ পৌঁছলাম। বাড়ী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্কর বলল, 'আর একটু আগে এলে নজাকত সলামতের গান শুনতে পেতে।' কে এই নজাকত সলামৎ? এদের নাম কখনো শুনিনি। রেডিওতেও কখনও শুনিনি। রবিশঙ্করের কথায় বুঝলাম, নিজের বাড়ীতে প্রত্যেক মাসে একটি গান কিংবা বাজনার আয়োজন করেন, কিছু সদস্য মাসে একবার সঙ্গীত শুনতে আসে। ঘরে সে সময় চাদর বিছান রয়েছে দেখলাম। হঠাৎ রবিশঙ্করের গলার দিকে নজর গেলো। দেখলাম সোনার চেন পরেছে। আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার এই হাসির রোগ রবিশঙ্কর জানে। জিজ্ঞেস করল 'হাসছ কেন?' উত্তরে গলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'অলঙ্কার তো নারীর ভূষণ। আপনি দেখছি অর্ধনারীশ্বর হ'তে চাইছেন।' রবিশঙ্করের সঙ্গে সর্বদাই আমার এই ধরনের ইয়ারকি চলে। রবিশঙ্কর আমার কথা শুনে একটু থতমত খেলো। ঘরে দেখলাম উমাশঙ্কর, অমিয় এবং হরিহর রয়েছে। আর একজনকেও দেখলাম। রবিশঙ্কর পরিচয় করিয়ে দিলো। বয়সে রবিশঙ্করের থেকে বড়ই মনে হোল। নাম নদেরচাঁদ মল্লিক। রবিশঙ্করের সেতারের জোয়ারী করে এবং যন্ত্রও তৈরী করে। যন্ত্র তৈরি করা পেশা নয়। অবিবাহিত, সেইজন্য রবিশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। রবিশঙ্করের সঙ্গে বাড়ীতে তবলাও বাজায়। সকলেই নদুদা বলছে। আমি কোন গুরুত্ব না দেওয়ায়, নদেরচাঁদ গম্ভীরভাবে আমাকে বললে, 'সিনেমায় যে শ্যাম লাহা অভিনয় করে, সম্পর্কে আমার ভাই হয়।' আমি বললাম, 'সেই শ্যাম লাহা, যে ভাঁড়ের অভিনয় করে।' নদেরচাঁদের মুখটা দেখে মনে হল যে এ ধরনের কথা তার সামনে কেউ বলে নি, কারণ যতই হোক সে রবিশঙ্করের ডান হাত। বাড়ীর পরিবেশটা আমার চোখে বিসদৃশ ঠেকল। মৈহারের পরিবেশে বাবাকে একলা থাকতে দেখেছি। কিন্তু এখান মনে হোল গুরুকে সকলে ঘিরে রয়েছে। নূতন স্বরোদ আনবার জন্য যখন প্রথম মাননগরের

ফ্লাটে এসেছিলাম, সেই ফ্লাট থেকে এ জায়গা ভাল মনে হোল না। আশিসকে বাড়ীতেই দেখলাম।

চা খেতে খেতে রবিশঙ্কর বলল, 'যদি একটু দেরী হ'তো তাহলে আশিসকে বাঁচাতে পারতাম না। ব্যথা হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বাঙ্গালী সার্জেনের কাছে নিয়ে যাওয়া মাত্রই বলল, এই মুহূর্তে অপারেশন করতে হবে নইলে বার্স্ট হয়ে যাবে। বোঝ আমার অবস্থা। কিছু হলে বাবা এবং আলু ভাইয়ের কাছে কি করে মুখ দেখাব।' রবিশঙ্করের কথা শুনে বললাম, 'ভগবান এর জন্যই আশিসকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন।' অন্নপূর্ণা দেবীর শরীর খারাপ দেখে রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর কারণ কি?' উত্তরে রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'জানই তো তুমি সব কিছু। কিছুতেই ওষুধ খাবে না। প্লিজ তুমি একটু বোঝাও। তোমার কথা শোনে।' কিছুক্ষণ থাকার পর মনে হোল রবিশঙ্করের পার্ষদগুলো সব চামচে। কেবল হাঁতে হাঁ করে, এবং না তে না করে, যা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আশিসের কাছে সব শুনলাম। হঠাৎ অমানুষিক ব্যথা, তারপরেই হাসপাতালে যাবার পরই আর কিছু জানে না।

এতক্ষণে শুভকে দেখলাম। নিজের আঁকা ছবি দেখাল। শুভর মধ্যে প্রতিভা আছে। কিছু না শিখে এত ভাল ছবি এঁকেছে। বাজনার পরে ছবি এঁকে সময় কেটে যায়। একদিকে ভাল। লেখাপড়াও করছে। একটু আরও লম্বা হয়েছে। মনে হয় শুভো লম্বা হবে। চেহারার মধ্যে সরলতার প্রতিমূর্তি। খাবার সময় রবিশঙ্করকে বললাম, 'আমার সেজদা দিল্লীতে আছে। সকালে তার সঙ্গে দেখা করেই যে ট্রেন পাব, সেই ট্রেনেই মৈহারের জন্য রওনা হব।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'এক সপ্তাহ থেকে তারপর যাবে।' মৈহারের পরিস্থিতি বললাম। যে কোন সময় রাজকীয় বিদ্যালয়ের জন্য ডাক আসতে পারে। এ ছাড়া বাবার চিঠি এলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিলে বাবা ঘাবড়ে যান। বাবার দেশে থাকবার কারণ সব বললাম। সব শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে কয়েকদিন থেকে যেও। কিছু হবে না।' খাওয়া সারতে রাত্রি হয়ে গেল। গল্প না করে শুয়ে পড়লাম কেননা সকালেই আমার সেজদার কাছে যেতে হবে। সকাল সকাল না গেলে যদি বেরিয়ে পড়ে। সকালে উঠে তৈরি হলাম। রবিশঙ্করও তৈরি হয়ে আমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে খেয়ে রেডিও স্টেশনে চলো।' বললাম, 'রেডিওতে গেলে দেরী হয়ে যাবে, কেননা আমার সেজদা যদি বাড়ী থেকে অফিস চলে যায়।' রবিশঙ্কর বলল, 'আরে যাবে দাদার কাছে। চলো আজ রেডিও স্টেশনে তোমাকে সব দেখাব। অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে। আজ একটা অর্কেস্ট্রা তৈরি করব, এ ছাড়া আমি কোথায় বসি সে ঘরটাও দেখবে।' রবিশঙ্করের কথায় আপত্তি করতে পারলাম না। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন, 'যতীনকে খাবার দিয়ে দাও।' অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'তুমি খেয়ে রেডিও স্টেশনে যাও, যতীনবাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এক ঘণ্টা পরে খাবার খেয়ে রেডিওতে যাবে।'

অন্নপূর্ণাদেবী গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন। আমি তো হতভম্ব। এমন কি কথা আছে? এরকম গম্ভীর মূর্তি তো মৈহারে দেখেছিলাম, যে সময় আমাকে পরের কথায় ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু আমার ভাববার সময় না দিয়ে রবিশঙ্কর বলল, 'ছেড়ে দাও ও সব কথা। ওই সব বাজে

কথা বলে কি লাভ? ও সব কথার কোন মানেই হয় না, যতীনকে খেতে দাও।' অন্নপূর্ণা দেবী আরোও গম্ভীরভাবে কেবল একটাই কথা বললেন, 'না'। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'যতীনবাবু পরে যাবে।' উভয়ের কথোপকথন শুনে আমি অবাক। অন্নপূর্ণা দেবীর গম্ভীর মূর্তির দিকে দেখে মনে হোল রবিশঙ্করের ঘাড় একেবারে টেবিলের খাবার প্লেটের কাছে চলে গিয়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'এ সবের কোন দরকার ছিলো না। ঠিক আছে যতীন পরেই খেয়ে দেয়ে রেডিওতে যাবে।' বুঝলাম কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। তবে কি চামচেদের বিরুদ্ধে কোন কথা। রবিশঙ্কর মৈহারে দু'বার বলেছিল, চেষ্টা করবে চামচেগুলোকে হঠাতে। কিন্তু এখানে এসে তো দেখছি ড্রয়িংরুমটা তো একটা আড্ডার জায়গা। রবিশঙ্কর খেয়ে উঠে আমাকে বললো, 'রেডিও রিসেপসন রুমে বললে, আমার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে।' রবিশঙ্কর চলে গেল। এবারে অন্নপূর্ণা দেবী আমাকে খেতে দিলেন। যে অন্নপূর্ণা দেবীকে আমি জানতাম, এ যেন সে নয়। মনে হল ঝড়ের পূর্বাভাষ। খেতে বসে বললাম, 'ইচ্ছে করে কেন রাগ পুষে রাখেন। ওষুধ কেন খান না?' আমার কথা এক ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কিসের জন্য ওষুধ খাবো? ভয় নেই আমি এত সহজে মরব না। মরবার হলে অনেক আগেই মরে যেতাম। এ সব বাজে কথা ছেড়ে আগে খেয়ে নিন।' আমার খাওয়া তো মাথায় উঠলো। যেভাবে রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা হল, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গুরু গম্ভীর। কিন্তু রবিশঙ্করের কথায় তো সে রকম কিছু মনে হোল না। কোন জিনিষ চুরি গেলে, মানুষ নিজের লোককে সন্দেহ করে। চোর একজনই হয় কিন্তু চোরের অপবাদ অনেকের উপর পড়ে। আমারও মনের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। ব্যাপারটা এমন কি হতে পারে? মনের মধ্যে নানা কারণ ঘোরাঘুরি করছে। একবার মনে হচ্ছে বাড়ীর এই তথাকথিত ছাত্রগুলির জন্য কি কোন অশান্তি হয়েছে? কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। ছাত্রদের চেহারায় তার কোন চিহ্ন নেই। ছাত্রদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন হোষ্টেলে ছাত্রদের মত বেশ আনন্দেই আছে। পরমুহুর্তেই মনে হচ্ছে মৈহারে যে কান ভারি করেছিল, যার জন্য অন্নপূর্ণাদেবী ভুল বুঝেছিলেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় তো? কি এমন হতে পারে? আমার চিন্তায় বাধা পড়ল যখন কানে এল, খাচ্ছেন না কেন?

সত্যই তো! আমার হাত প্লেটের মধ্যেই আছে। আমার খাওয়া মাথায় চড়েছে। মনের তলায় অনাগত অশুভ ছায়া ঘন হচ্ছে। তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে খেয়ে নিতে বললাম। কিন্তু শুনলাম তার খাবার এখন অনেক দেরী আছে। সুতরাং তৈরি হলাম ঘটনা শুনবার জন্য, যার জন্য আমি রেডিও স্টেশনে গেলাম না রবিশঙ্করের সঙ্গে। অবশেষ শুনলাম সেই ঘটনা। সব শুনবার পর একটা আচমকা আঘাতে আমি বজ্রাহত। ঠিক শুনেছি কি না জানি না। সব ঠিক দেখছি কিনা জানি না। সব কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অন্নপূর্ণাদেবী সঙ্গীত ছাড়া দুনিয়াদারির কিছুই জানেন না। মনে হল দাম্পত্য জীবনে কেবল প্রেম থাকলেই চলে না, কূট বুদ্ধিরও প্রয়োজন। রবিশঙ্করের সে কূট বুদ্ধির সামনে খুব সহজ সরলভাবে অন্নপূর্ণা দেবী একটা অলীক কথা বলেছেন। রবিশঙ্কর সেটা বুঝলেও, গলার মধ্যে ঢোঁক গিলতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন ছোট একটা মাছের কাঁটা তার গলায় লাগছে। কিন্তু রবিশঙ্কর ছলনা করে এ ধরনের প্রশ্ন কেন করেছেন? যেমন করেছেন তেমন উত্তর পেয়েছেন।

আসলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। অন্নপূর্ণাদেবী রবিশঙ্করের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ যা শুনেছেন, সত্য কি না জিজ্ঞাসা করেছেন। রবিশঙ্কর প্রশ্নটা শুনে বেকায়দায় পড়ে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে বলেছে, সত্য কথাই স্বীকার করবে যদি তার পরিবর্তে অন্নপূর্ণা দেবী একটা অলীক জিজ্ঞাসার সত্য উত্তর দেয়। অন্নপূর্ণা দেবী রাজী হন। অন্নপূর্ণাদেবী স্বীকারোক্তি করবে শুনে, রবিশঙ্কর একটা ভিত্তিহীন অলীক সন্দেহের কথা বলে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি চাঁদে গিয়েছ কি না? তার উত্তরে কেউ যদি সম্মতি জানায়, সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এখানেও ব্যাপারটা তাই ঘটেছে। যাক, অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে এই ঘটনার কথা শুনে প্রথমে আমি সহজ ভাবেই বলি, রবিশঙ্কর এই অলীক কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তার কারণ আপনি যখন বললেন আমার সঙ্গে কথা আছে, সেই সময় রবিশঙ্কর খুব সহজভাবেই বলেছিল, ওই সব বাজে কথা বলে কি লাভ? ও সব কথার কোন মানেই হয় না। আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'আপনার সামনে সাধু সাজল, কিন্তু যদি বিশ্বাস না করবে, তা হলে রোজ আমাকে অযথা কথায় কথায় খোঁটা দিচ্ছে কেন?'

কথাটার গুরুত্ব এবারে বুঝলাম। অন্নপূর্ণাদেবীর কথা শুনে একটা আচমকা আঘাতে আমি বিমূঢ় হলাম। এখন আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় শির শির করছে। কি জঘন্য প্রবৃত্তি। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠেই অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, 'আমি চললাম রেডিও স্টেশনে।' কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মৈহারে প্রায় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দাঁড়াতে হয়। মানুষের জীবন ঝঞ্ঝাটের শিকল। এক ঝঞ্ঝাট গেলে সেটাই সব নয়। দেখা যায় সামনে আছে, আরও বড় ঝঞ্ঝাট। মনে মনে বলি, বাইরের চোখে এই সংসার মঞ্চের নাটক সবই তো ঠিক চলছে, লোকে জোর দেখবে না কেন? কিন্তু এই জোরের ঠাট বজায় রাখতে বুকের তলায় কত কি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তাকে মেরে রাখেনি অন্যদের মত, অথচ এও এক বিচিত্র মার। পায়ের তলায় মাটি নড়ে যায়, সরে যায় এমন মার। কত সুন্দর হতে পারত, কত অকৃত্তিম হতে পারত, হৃদয়ের স্পর্শে কত পুষ্ট হতে পারত এই জোরের দিকটাই। না হবার তো কিছু ছিলো না। এত বড় শূন্য থেকে, কেড়ে কেড়ে জোড় সঞ্চয় কি যে প্রাণান্তকর, তা যেন আবার নূতন করে উপলব্ধি করলাম। খেয়াল হল ট্যাক্সি দাঁড়ান দেখে। সামনেই আকাশবাণী। পাঁচ বছর পরে আবার দেখলাম আকাশবাণী। কাশী থেকে পাঁচ বছর আগে যে সময় চাকরির জন্য এসেছিলাম মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। রেডিও স্টেশনে রিসেপসনের লোক আমাকে রবিশঙ্করের ঘরে নিয়ে গেল। রবিশঙ্কর হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে ষ্টুডিওতে নিয়ে গেল। অর্কেষ্ট্রার সেই সব পুরোনো পরিচিত লোকদের দেখলাম, যাদের পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম। বাবার পুরোনো ছাত্র রেবতীরঞ্জন দেবনাথকে দেখলাম। রেবতীরঞ্জন দেবনাথ সরল প্রকৃতির লোক। বাবার দেশের লোক। আমাকে তার বাড়ী থাকবার অনুরোধ করল। সে আজ বাড়ী যাচ্ছে একটু পরেই ছুটি নিয়ে। বললাম, 'দেখা করব।' এর পর রবিশঙ্কর একটা স্টুডিওর বাইরে, গোল কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে বলল। প্রত্যেক স্টুডিওর মধ্যে চোখ লাগিয়ে দেখলাম একটি বিদেশী মহিলা। আমার অবাকভাব দেখে রবিশঙ্কর বললো, 'মেয়েটির নাম সিমকি।'

সিমকি নামটা আমার অজানা নয়। বহু গল্প শুনেছি তার বিষয়ে। উদয়শঙ্করের পার্টিতে আগে নাচত। তার পর, আমাদের কাশীর পাড়ায় জিমন্যাস্টিক ট্রেনার, প্রভাত গাঙ্গুলী (যে উদয়শঙ্করের পার্টিতে নাচত) বিয়ে করেছিল সিমকিকে। শুনলাম একসটারনাল সারভিসে কাজ করে। রবিশঙ্কর আমাকে রেডিও ষ্টেশন দেখাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে ভাবছি রবিশঙ্কর তো জিজ্ঞাসা করছে না, কি কথা হল আমার অন্নপূর্ণা দেবীর সাথে? রেডিও স্টেশন দেখাবার পরও আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি না দেখে, রবিশঙ্কর আমাকে একান্তে ডেকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল। তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা হোল তোমার সঙ্গে?' ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'ফেস ইজ দি ইনডেক্স অফ মাইণ্ড।' কথাটা আংশিক সত্য হলেও সকলের জন্য নয়। এর ব্যতিক্রম আছে। যেমন ব্যতিক্রম দেখলাম রবিশঙ্করের মুখ দেখে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি মানুষের চেহারা, তার আকৃতি, গঠন এবং মুখের গড়ন দেখে কি, একটা মানুষকে চেনা যায়? রবিশঙ্করের মুখ দেখে মনেই হোল না ব্যাপারটার মধ্যে এতটা গুরুত্ব আছে? অথচ অন্নপূর্ণা দেবী যা বললেন, তাই বা অবিশ্বাস করি কি করে। তাই রবিশঙ্কর যে সময় জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা হোল তোমার সঙ্গে।' উত্তর দিতে চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। খেয়াল হল রবিশঙ্করের প্রশ্নে, কি হোল? বেশ গম্ভীরভাবে বললাম, 'এতদিন ধরে ঘর করছেন অথচ নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারলেন না।' আমার কথা শুনে, তার হাসিমুখ কর্পূরের মত উড়ে গিয়ে কুটিল দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অন্নপূর্ণা তাহলে এ ধরনের কাল্পনিক কাহিনী বলল কেন?' উত্তরে বললাম, 'আপনার কাছে অভিযোগটা সত্য কি না জানবার লোভে কমেডি অফ এররস হয়ে গিয়েছে।' রবিশঙ্করের রূপটা এতক্ষণে প্রকাশ হয়েছে। বেশ জোর দিয়েই বললো, 'তুমি তো সর্বদাই আমার দোষ দেখ, কিন্তু অন্নপূর্ণার দোষ দেখ না।' এ কথা শুনে বললাম, 'আপনি নিজেকে অত্যন্ত চতুর মনে করেন। আপনি চালাকি করে অন্যের সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজে হাজারো দোষ করবেন, আর কিছু বলতে গেলেই স্ত্রীর উপর দোষারোপ করে নিজের দোষ ঢাকবেন। ধন্য আপনি!' আমার কথাটা বোধ হয় মনঃপুত হোল না। যাকে বলে উভয় পক্ষের গলার আওয়াজটা একটু জোরেই হোল। শেষে বললাম, 'একটা কথা ভুলে যাবেন না, আমি বাবার বুড়ো বয়সের ছেলে। যতক্ষণ না আপনাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঠিক না হয়ে যায় ততক্ষণ আমি দিল্লী থেকে মৈহার যাব না। আমার একটা নৈতিক কর্তব্য আছে। আপনি বোকা বানাতে পারেন সরল অন্নপূর্ণা দেবীকে, কিন্তু আমাকে অত বোকা ভাববেন না।' রবিশঙ্কর বলল, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি অন্নপূর্ণার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। একটা কথা, প্লিজ এ সব কথা তুমি বাড়ী গিয়ে যেন অন্নপূর্ণাকে বোলো না।' রবিশঙ্করের কথা শুনে আমি অবাক? ঝড়ের পর শান্ত মূর্তি, কত বড় অভিনেতা? আমি আর কোন কথা না বলে বললাম, 'চললাম আমার সেজদার সঙ্গে দেখা করতে।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে তাড়াতাড়ি চলে এসো বাড়ীতে, আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ী যাব। জরুরি কাজ আছে।' আমি কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলাম দাদার বাড়ীতে।

দাদার বাড়ীতে টেম্পোতে যাবার সময় আমার মনে হল রবিশঙ্কর কেন নিজের স্ত্রীকে

অত ভয় করে? যে সব কথা হোল কেন বলতে বারণ করলো বাড়ীতে গিয়ে। মনে হোল যে সর্বদা প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত, সে কিন্তু প্রশংসা শুনতে পায় না স্ত্রীর কাছে। যদি সে প্রশংসা কিংবা অহংকারের সুড়সুড়ি একটু পেতো তাহলে হয়ত ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগতো না। কিছু না থাকলে, মিথ্যা করে প্রশংসা কি অন্নপূর্ণা দেবীর মত মেয়ে করতে পারে? তাহলে চামচেদের সঙ্গে প্রভেদ কোথায়। যারা সর্বত্র মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে, তাদের গৃহিণীর জন্য বাড়ীতে থাকলে বেশী ত্রাস, বাড়ী ছেড়ে বেরোলে ত্রাস এবং বাড়ীতে ফিরে এলেও ত্রাস।

দাদার বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম দাদা বাইরে কাজে বেরিয়েছে। বৌদি আমাকে দেখে অবাক। বৌদিকে আমার দিল্লীতে আসার কারণ বলে, দুই ভাইপোর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে, রবিশঙ্করের ঠিকানায় দাদাকে দেখা করার জন্য লিখে, রেবতীরঞ্জন দেবনাথের বাড়ি গেলাম।

রেবতীরঞ্জনের বাড়ীতে কিছুক্ষণ গল্প হোল। কথা শুনে বুঝলাম বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক মনে হোল। এবার বিদায়ের পালা। বাড়ীতে ফিরবার পথে মনে হোল রবিশঙ্কর বোধহয় অনুতপ্ত হয়েছে। আসলে যুক্তিবাদী মানুষকে সব সময়েই লোকে বোধ হয় ভুল বোঝে। বাড়ীতে গিয়ে বুঝব আমার কথার গুরুত্ব দিয়েছে কিনা। বাড়ীতে গিয়ে দেখি রবিশঙ্কর এসে গেছে। দুজন নূতন লোককে দেখলাম। রবিশঙ্কর পরিচয় করিয়ে দিল। একজনের নাম দুলাল এবং অপরজনের নাম শান্তি। এই দুইটি নাম শুনে মনে পড়ে গেল জুবেদা বেগমের কথা। কথাচ্ছলে এদের নাম, তার কাছে শুনেছিলাম। এতদিন রবিশঙ্করের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু জানিনা কেন আজ আমার অকারণ ঘৃণা হল। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। বুঝতে পারি না, আলি আকবর কেন রবিশঙ্করকে কিছু বলে না। অবাক হলাম রবিশঙ্করের কথা শুনে। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে বলল, 'চল আজ একটা ইংরেজি হাসির বই এসেছে দেখে আসা যাক।' সরাসরি প্রত্যাক্ষান করলেন, অন্নপূর্ণা দেবী। রবিশঙ্কর অনুরোধ করে বলল, 'যতীন এসেছে, ওর অনারে চল।' অন্নপূর্ণা দেবী অনেক পরে রাজী হলেন। রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে উমাশঙ্করকে টাকা দিয়ে বলল, 'ব্যালকনির টিকিট কেটে আন।' সন্ধ্যার সময় রবিশঙ্কর, অন্নপূর্ণা দেবী, নদু মল্লিক এবং আমি 'দি ওয়াল টারন' দেখতে গেলাম। সিনেমা দেখে এসে দেখি আমার সেজদা বসে আছে। সেজদার সঙ্গে রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। মৈহারে অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে আমার দাদার আগেই পরিচয় হয়েছিল। রবিশঙ্করের সঙ্গে আমার দাদার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রবিশঙ্কর আমার দাদার বয়স জিজ্ঞাসা করল। যে মুহূর্তে জানল আমার দাদা এক বছরের ছোট, সঙ্গে সঙ্গে তুমি বলে গল্প শুরু হল। মনে হোল কতদিনের চেনা।

কথায় কথায় আমার সেজদা রবিশঙ্করকে বলল, 'একজন প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা রেডিও স্টেশন দেখতে চায়।' একথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'নিঃসংকোচে আগামীকাল রেডিওতে নিয়ে এসো। রেডিওতে এলে ঘুরিয়ে সব কিছু ভাল করে দেখাবো।'

পরের দিন আমি দাদার বাড়ী গেলাম। দাদা নিজের প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা মিসেস সোমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রমহিলা সাগর ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেছেন। যেহেতু আমার বিষয় ছিল দর্শন শাস্ত্র, সুতরাং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে ফিলসফি নিয়ে চায়ের আসরে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। তারপর আমার দাদা এবং মিসেস সোমকে নিয়ে রেডিও গেলাম। রবিশঙ্কর একজন ভদ্রলোককে, আমার পরিচয় দিতে গিয়ে আকাশে উঠিয়ে দিলো। সেই ভদ্রলোকের নাম বিমান ঘোষ। রবিশঙ্করের পারিবারিক বন্ধু। বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচয় আছে। রেডিওতে চাকরি করেন।

রবিশঙ্কর বললো, 'যদিও আমার বাড়ীতে ছাত্ররা থাকে তবুও আমি বাইরে গেলে, বিমানদা রোজ একবার বাড়ীতে এসে খবর নিয়ে যায়। এর উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে আমি বাইরে যাই।' বিমান ঘোষের নানা প্রশংসা করে রবিশঙ্কর বলল, 'বিমান ঘোষের সঙ্গে গল্প করো।' এই কথা বলে রবিশঙ্কর আমার দাদা এবং মিসেস সোমকে রেডিও দেখাতে নিয়ে গেল। বিমান ঘোষের কথায় বুঝলাম, বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। প্রায় কুড়ি বছর আগে তিমিরবরণের মাধ্যমে বাবার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশে সবেমাত্র রেডিওর চাকরিতে ঢুকবার পর, বাবার সঙ্গে রেডিও প্রোগ্রামে সর্বদা সঙ্গে থাকতেন। বাবা ছেলের মত স্নেহ করেন। উনিশশো চুয়ান্ন সনে বাবা যে সময়ে দিল্লীতে এসেছিলেন, বিমান ঘোষকে দেখিয়ে অন্নপূর্ণাকে বলেছিলেন, 'এ হল তোমার বড় ভাই। বক্তার ভূমিকায় বিমান ঘোষকে দেখলাম 'রবু' বলে রবিশঙ্করের অনেক কথা বলল। বোনটি বলে অন্নপূর্ণাদেবীর প্রশংসা করল। বুঝলাম আমার বিষয়ে সব কথাই শুনেছে। ইতিমধ্যে রবিশঙ্কর আমার দাদাকে নিয়ে ফিরে এল। দাদাকে বললাম, 'আগামীকাল সকালেই চলে যাব মৈহার, সুতরাং আর দেখা হবে না।' দাদা আমাকে বলল, 'মিসেস সোমকে বাড়ীতে পৌঁছে দাও।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'মিসেস সোমকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে একবার রেডিওতে এসো, কেননা কিছু বিশেষ কথা আছে।' কি আবার বিশেষ কথা যার জন্য আবার রেডিওতে আসতে হবে? যাক রবিশঙ্করকে সম্মতি জানিয়ে রেডিওর বাইরে এলাম। দাদা চলে গেল নিজের কাজে। মিসেস সোমকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আবার আমি রেডিও স্টেশনে ফিরে গেলাম। এসে দেখলাম রবিশঙ্কর বিমান ঘোষের সঙ্গে গল্প করছে। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই চায়ের জন্য বেয়ারাকে বলল। চা খাবার পর রবিশঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে বলল, 'তুমি তো কাল সকালে চলে যাচ্ছ। উপস্থিত বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণাকে একটু বুঝিয়ে বোলো, ঐ সব ছোট ব্যাপারে আমি কিছুই মনে করিনি।' এককথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার পর আমার যে অভিজ্ঞতা হল, সেটা বিস্ময়কর। মনে হোল এ কোন ভেকধরা সন্ন্যাসী। যেখানে আমার বিশ্বাস পৌঁছচ্ছে না, সেখানে আমি ভক্তির ভান করতে পারি না। অথচ চাটুকারদের আমি ভক্তির ভান করতে দেখেছি, বিশ্বাস না করলেও। আর এই স্পষ্ট কথাটা বলাতে লজ্জিত হতে দেখিনি। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে, তখন ক্ষুদ্র ঘটনাও বড়ো হয়ে ওঠে। স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলায় ভবিষ্যৎ খোয়াতে হয়েছে। তার জন্য দুঃখ নেই কেননা সত্যের কাছে মিথ্যার স্থান নেই। রবিশঙ্করের কথার উত্তর না দিয়ে

বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরেই দেখি মৈহার থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। আশিসের জন্য বাড়ীতে সব চিন্তিত আছে, সুতরাং শীঘ্র যেন মৈহারে ফিরে যাই। বিকেলে রবিশঙ্কর ও বিমান ঘোষ বাড়ীতে এল। বিমান ঘোষকে দেখলাম মিতবাক। রবিশঙ্কর বিমান ঘোষের প্রশংসা করল। দেখে মনে হোল এ বাড়ীর একজন সদস্য। কিছুক্ষণ গল্প করে বিমান ঘোষ চলে গেল।

পরের দিন, যাত্রার আগে অন্নপূর্ণা দেবীকে বললাম, 'সব জীবনেই কিছু না কিছু গোপন কষ্ট থাকে। আর এটা আছে বলেই বেঁচে থাকার মহিমা বাড়ে। কোন লোকই কোন লোককে সুখ দুঃখ দিতে পারে না। সবই নিজের কর্মের ফল ভোগে। সব পরিস্থিতিতে যে এডজাষ্ট করে নিতে পারে তার কাছে কোন দুঃখ অসহনীয় হতে পারে না। সুতরাং তুচ্ছ জিনিষকে বড় করে না দেখাই ভালো। রবিশঙ্কর আপনাকে ভাল করেই চেনে। তার মনের মধ্যে কিছুই নেই। 'কথায় আছে, বিপত্তি হল প্রকৃত সম্পত্তি। অযথা এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না।' আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণা দেবী কিছু বললেন না। কিন্তু মুখ দেখে মনে হোল, মনের মধ্যে এখনও দ্বিধা আছে। অনেক পরে বুঝেছিলাম তার দ্বিধাটা ঠিক ছিলো। যতই হোক, এতদিন যার সঙ্গে ঘর করছেন সেই লোককে তার চেয়ে বেশী আর কে চিনবে? মনে মনে বলি, ভালো আর মন্দ দুটোর মধ্যে কত তফাৎ, অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু পরে বুঝেছি বাইরের চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করতে যাওয়ার মত ভুল আর নেই। যাক এবারে মৈহারে যাবার পালা।

গাড়ীতে চড়ে মনে হোল একদিনের জন্য হাথরসে নেবে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের সঙ্গে দেখা করে যাই। এতোদিন ধরে চিঠিপত্র চলছে যার ফলে অতি আপন মনে হয়েছে। এ ছাড়া বহু সঙ্গীতের বই নিয়ে আমাকে ঋণী করে রেখেছে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হাথরস স্টেশন দেখেই নেমে পড়লাম। শুনলাম হাথরস কিলাতে যেতে হলে, হয় ট্রেনে নয় টাঙ্গায় যেতে হবে। হাথরস ষ্টেশন থেকে শহরটা দূরে। ট্রেনের দেরী আছে দেখে টাঙ্গায় চলে গেলাম। হাথরসের লোকেরা সকলেই চেনে হাস্য-কবি কাকা হাথরসিকে। বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম। দুজনেই দুজনকে কেউ দেখিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। মনে হোল যেন দীর্ঘদিনের পরিচয়। বাড়ীর হলঘরে আলমারীর মধ্যে কেবল বই। সঙ্গীত কার্যালয় থেকে এই সব বই প্রকাশিত হয়েছে। কাকা হাথরসি কেবল হাস্য রসের কবিই নন, একজন উঁচুদরের চিত্রকারও। নিজের হাতে সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি এঁকেছেন। অনেকের ছবির মধ্যে বাবার ছবিও দেখলাম। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে সকলেই লল্লা বলে ডাকে। আমরা যেমন ছোট ছেলেকে আদর করে খোকা বলে ডাকি। আমার কাছেও লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ লল্লা হল। আজও তাকে লল্লা বলেই ডাকি। বয়সে কম হলেও, একদিনে আমার ঘনিষ্ট বন্ধুর মতো হয়ে গেল। যে ব্যবহার বাড়ীর সকলের কাছে পেলাম, নিজের আত্মীয়ের কাছেও বোধ হয় সেরকম আন্তরিক ব্যবহার পাওয়া যায় না। সেই ব্যবহার আজও অব্যাহত আছে। যদিও রবিশঙ্করের কাছে লল্লা শেখে তা সত্ত্বেও রিয়াজ করবার অনেক জিনিষ শেখালাম। বললাম, 'ধীরে ধীরে সাধনা করো।' রাত্রি প্রায় তিনটে অবধি নানা

বিষয়ে গল্প হল। দিল্লীর নানা সমাচার শুনে অবাক হলাম। নানা ধরনের পর্ণোগ্রাফির ছবি হরিহর রাখতে দিয়েছে লল্লার কাছে। হরিহরের গুরুরা বাড়ীতে রাখতে ভয় পায় সেইজন্য হরিহর মারফৎ লল্লার কাছে রাখতে দিয়েছে। দিল্লীর নানা গল্প শুনলাম। ভাবলাম, মৈহারের দৈনন্দিন জীবন থেকে দিল্লীর কত প্রভেদ। ভাল করেছি রবিশঙ্করের আগ্রহে দিল্লী যাইনি। দিল্লী গেলে শিক্ষা হ'তো না। রাত্রে লল্লা আমাকে বলল, 'ভাতখণ্ডের প্রথম ভাগ যদি তুমি বাংলাতে অনুবাদ করো তাহলে তিরিশ টাকা তোমাকে পারিশ্রমিক দেবো। যদিও বাংলা বইয়ের গ্রাহক কম, কিন্তু যদি চলে তাহলে ভাতখণ্ডের ছয়টি ভাগ বাংলাতে অনুবাদ করব।' লল্লার অনুরোধে, প্রথম ভাগ বাংলাতে অনুবাদ করব কথা দিলাম। তিরিশ টাকা পেলে আমার আর্থিক সহায়তা হবে। পরের দিনই কালকা মেল ধরে এলাহাবাদ পৌঁছে বম্বে এক্সপ্রেসে মৈহার পৌঁছলাম। রাত্রে পৌঁছে শুনলাম, কোলকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন মৈহারে এসেছে। আসলে দক্ষিণারঞ্জনই দিল্লীতে টেলিগ্রাম করেছিল। রাত্রেই সকলকে আশিসের রোগের সব ঘটনা বললাম। সকলে নিশ্চিন্ত হলেন। রাত্রে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বাবার সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনলাম। রাত্রে নিজের ঘরে দেখলাম এই কয়দিনে বহু চিঠি এসেছে। বাবারও চিঠি এসেছে। মা এবং আমাকে চিঠি দিয়েছেন। এ ছাড়া গভর্নরকে একটি চিঠি দিয়েছেন। পত্রগুলি উদ্ধৃত করে দিলাম।

From : Ustad Allauddin Khan (Doctor of Music)
P. O. & Village : Shivpur, via : Brahmanbaria.
Comilla, (Distt : Tripperah) Eastern Pakistan.

To : The Hon'ble Lt. Governor,
Vindhya Pradesh,
Rewa.

Dear Sir,

First of all I pay my deep gratitude to your goodself for granting leave for three months upto 2-5-1955.

I was determined to start for Maihar by the last week of April, 1955 but to my bad luck all of a sudden I have been attacked with typhoid for which the reputed doctor of this place advises to stay here for two months for complete cure. By the way I pray to goodself if I think to be cured to some extent I will reach before June, 1955. But due to Doctor's repeated sayings I pray to your goodself to sanction leave for further two months i.e. from 2nd May, 1955 to 2nd July, 1955.

By the way I assure you if the proposed Music College is to be opend by this time I will come at any cost for which you will have not to face any difficulty.

Lastly it is humble request to sanction leave at your earliest. I have never taken such a long leave since my service more than 35 years. So I can expect at my old age of 86 this mercy from you. I am obliged to the climax to your goodself for sanctioning leave for so many days and it is my hope that your

goodself will allow more two months. I will be much obliged if you inform my secretary Shri J. N. Bhattachary M.A., at Maihar about your decision at your earliest.

Hope you are in good health.

Thanking you,

Yours faithfully,
(Allauddin Khan)

Dated 25th April, 1955.

পোঃ গ্রাঃ শিবপুর
ভায়া ব্রাম্মন বাড়িয়া
২৫-৪-৫৫

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন জানিবে তুমার লিখা মিথ্যা দরখাস্ত পাঠাই নাই, আমি সবলিখে পাঠিয়েছি, আমার বাতের রূগ হয়েছে। ঐদ্য পাঠাইলাম রেজিষ্টারি করে ইয়্যার মেলে, আর সব বিসয় জানিলেম, আমি ভাল আছি তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা

কল্যানিয়বর,

শ্রীমতিজি তুমার পত্র পাইলাম, ঐদ্য মঙ্গলবার তুমার ঔষধ ধারন করিলাম। নায়েবালিকে দিয়েছি, ইসমাইলের সাশরিকে একটা দিয়েছি, তুমার মামাকে একটা দিলেম। এখানে বেস আছি, তুমাদের কুশল কামনা করি একপ্রকার, এখন রূজায় আছি, বেসি লিখবার সময় নেই, বিশ্রাম করে রান্না করিব। ইতি—

স্যামি
আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম, চিঠি আসতে অনেক দেরী হয়েছে। কিন্তু বাবা এ কি দরখাস্ত করেছেন গভর্ণরের কাছে। বাবার কথা মত আমি দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু বাবা দরখাস্ত লিখেছেন টাইফয়েড হয়েছে বলে, এছাড়া দোসরা জুলাই পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত করেছেন। দরখাস্তর ট্রু কপি দেখে যতটা না অবাক হলাম তার থেকেও বেশী অবাক হলাম দরখাস্তর উল্টো পিঠে আমাকে ও মাকে যে চিঠি লিখেছেন। আমাকে লিখেছেন, আমি মিথ্যা দরখাস্ত লিখেছি। কি জানি কেন ছোট থেকে কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী বললেই ক্ষেপে উঠি। বাবা যদি সামনে থাকতেন তাহলে বলতাম, মিথ্যা লিখেছি এ কথা কেন লিখেছেন? কিন্তু দরখাস্তে বাবা লিখেছেন টাইফয়েড হয়েছে। এ কথা দরখাস্তে লেখা পড়ে চিন্তিত হলাম। তার মানে, বাবা আমার চিঠি পাবার আগেই তার টাইফয়েড হয়েছিল। সেইজন্য লিখেছেন তোমার মিথ্যা দরখাস্ত পাঠালাম না। যাক আমার পারসেল পেয়েছেন।

মার জবানীতে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তরে বাবা মাকে লিখেছেন। মার অভিমানপূর্বক

চিঠির উত্তরে মাকে যাইহোক চিঠি দিয়েছেন। মার পাঠান বাদুড়ের হাড় পেয়ে জানিয়েছেন যে ওষুধ ধারণ করেছেন। বাবা নিজের ভাই নায়েব আলী ছাড়া অন্যকেও হাড় ধারণ করতে দিয়েছেন।

বাবার চিঠি পড়ে বুঝলাম ব্যাণ্ড এবং কলেজের মাহিনার যে চিঠি দিয়েছিলাম সে চিঠি পান নি। সে চিঠি তো পারসেল পাঠাবার আগে পাঠিয়েছিলাম। না পাবার কারণ কি? পরের দিন সকালে দক্ষিণারঞ্জনকে চিঠির কথা বললাম। দক্ষিণারঞ্জন আমাকে বললেন, 'বাবা বলেছেন কলেজ হলে তোমাকেই সব সামলাতে হবে। সুতরাং সব কাজ গুছিয়ে রাখো। বাবা এলেই যেন কলেজ শুরু হয়ে যায়।' উত্তরে দক্ষিণারঞ্জনকে বললাম, 'গভরর্ণমেন্টের কাজ। অনেকদিন আগে প্রস্তাব এসেছিল। তারপর বহু চিঠির আদান প্রদান হয়েছে। কিন্তু বাবা যতদিন না আসেন ততদিন কিছুই হবে না। বাবা বরাবর আসতে দেরী করছেন। উপস্থিত আবার দোসরা জুলাই পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত করেছেন। বাবার জন্যই এই সব করছি। আমার থাকার ইচ্ছা নেই। কারণ কলেজ হলে আমার শিক্ষায় বাধা হবে। যাই হোক আপনি বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন।' আমার কথায় সম্মত হয়ে দক্ষিণারঞ্জন দুপুরে নিজের ব্যবসা উপলক্ষে জব্বলপুর চলে গেলেন।

পোষ্টঅফিসে গিয়ে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাম্মন বাড়িয়া
মদ্ধ পারা, ত্রিপুরা
১-৫-৫৫

কল্যানবর,

শ্রীমান যোতীন তুমাকে পত্র লিখেছি ১ মাস হল উত্তর এখন পর্য্যন্ত পাই নাই, পত্র পাঠ উত্তর লিখিবে। শিক্ষামন্ত্রি মাথুরের পত্র পেয়েছি জুন মাসে কলেজ খুলিবে আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখেছেন, আমি জানিয়েছি সময় মতো উপস্থিত হইব। ৫০০্ টাকা বেতন দিবে দেখা শুনার জন্য। তুমাকে জানিয়ে ছিলেম বেণ্ড পারটিতে যে ২০০্ টাকা বেতন তাহা সহ ৫০০্ টাকা বেতন দিবে না শুধু কলেজের জন্য ৫০০্ সত টাকা দিবে তাহা ত কিছু জানতে পারলাম না, এ সম্বন্ধে জানবার জন্য তুমাকে লিখেছিলেম তাহার কি করিলে আমাকে জানাও। এখানে আমি ভিক্ষা করে ৮০০০্ টাকা পেয়েছি ঐ টাকা দিয়ে একটা বাটি খরিদ করিবার জন্য বায়না ৫০০্ টাকা দিয়েছি, পাকিস্থানে বাটি খরিদ করিতে হলে পাকিস্থান গবরমেন্টের পারমিসেন না পাওয়া পর্য্যন্ত বাটি বিক্রি করিতে পারে না। ১ মাস হল বায়না দিয়েছি এখন পর্য্যন্ত পারমিসেন আসে নাই, এজন্য কতদিন এখানে থাকতে হয় তার নির্চ্চয় নেই, পাকিস্থানের টাকা রেখে আসিব বলে বাটি খরিদ করিতেছি। এজন্য তুমাকে জানাইতেছি কলেজ খুলিবার সময় তুমার দাদা আলি আকবরকে এনে কলেজ খুলাবে, এর ভিতর আমি যদি আসতে পারি তার চেষ্টা করিব, যদি আসতে না পারি তবে তুমার দাদাকে এনে কলেজ খুলাবে, আমি যতদিন পর্য্যন্ত না আসি আমার জাগায় তুমি দেখাশুনা শিক্ষা দিবে। যাহাতক হয় জুলাই মাসে আসিবার চেষ্টা করিব, তুমি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রি মহাশয়ের

কাছে গিয়ে আমার বিসয় জানাবে, আমি পুকুর খনন করাতেছি এ জন্য আসতে দেরি হতে পারে, কেননা ভিক্ষা করে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি। জন্মস্থানে, আর শেষ জিবনে দেশে আসতে পারব কিনা যা কিছু পারি, জনতার সেবা জৎ সামান্য করিতেছি। আপনি হিন্দু আপনি দয়াবান ব্যক্তি আমার প্রার্থনা নির্চ্চয়ই গ্রহন করিবেন। আমি এখানে এসেবধি বসে থাকি নাই মর্জ্জিদের কার্য্য ভিক্ষা করে শেষ করেছি, একটি স্কুল মাদ্রাসা গ্রামে শিক্ষার জন্য স্থাপন করেছি, একটি জলাসয় খনন পূর্বে করেছিলেম, তাহার জল খুব ভাল হয়েছে এজন্য ১০০০ হাজার লোকের জল পানের জন্য রিজাপ করা হয়েছে যাতে পুকুরে নেমে স্নান না করিতে পারে। আরেকটি জলাসয় খননের জন্য পাকিস্থান গবরমেন্টের নিকট বন্দবস্ত নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছি এখনও তাহার মঞ্জুরি পাই নাই। এ বৎসর আর হবে না যদি বাচি তবে সামনের বৎস্বর এসে তাহা খনন করাব এসব কারনে আমার আসতে দেরি হতেছে এজন্য ধর্ম্মমতে আমার উপর বিচার করিবেন। কুন কারনে আমি যদি না আসতে পারি আমার পুত্র আলি আকবরকে কিম্বা আমার রাজা মাইহার তিনিকে আনিয়ে কলেজ খুলিবেন সেইত আমাদের গবরমেন্ট তিনি এসে কলেজ খুলিবেন। আমার স্থানে আমার সেক্রেটারি আমার শিক্ষা দিবে। একজন গান শিক্ষার জন্য মেরিজ কলেজ বিদ্যাপিট ভাৎখণ্ড পৃন্সিপাল সাহেব লিখে একজন গায়ক তিনির কাচ হতে আনিবেন। না হয়, আমি এসে, আনিব এর জন্য চিন্তা নেই, এসব বিসয় মন্ত্রিকে জানিয়ে তিনি কি বলেন সব আমাকে জানাবে। ইদের আসির্ব্বাদ সকলে গ্রহন করিবে, একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি
বাবা

বাবার চিঠি পড়ে অবাক হলাম।

বুঝতে পারছি চিঠির গোলমাল হয়েছে। আমার এ যাবৎ দুটো চিঠি কি বাবা এতদিনেও পান নি। বাবা এত অল্প টাকায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। অথচ আমি যা স্থির করেছি, বাবা এলেই, মাথুর সাহেব ডাইরেক্টর অব এডুকেশনের সামনেই কথা বলব। অথচ বাবা যে কাজ হাতে নিয়েছেন সে সব শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে ভগবানই জানেন। বাবা কোন অন্ধকারে আছেন বুঝতে পারি না। আলিআকবর নিজের টাকা খরচা করে কলেজ উদঘাটন করতে আসবে না। মৈহারের মহারাজেরও সেই অবস্থা। উপস্থিত শিক্ষকই ঠিক হয়নি, বিদ্যালয়ের স্থান এবং ছাত্রনিবাস কিছুই হয় নি। ছাত্রদের নির্বাচন করা ঠিক হয় নি। অথচ বাবা ভাবছেন সব হয়ে যাবে। বাবা না এলে কিছুই হবে না। সুতরাং বাবা এবং মাথুর সাহেবকে চিঠি দিলাম। বাবাকে কয়েকবার লিখেছি, তবুও আবার চিঠিতে জানালাম বাবা মাত্র সাতশত টাকা চাইছেন ব্যাণ্ড এবং বিদ্যালয় মিলিয়ে। অথচ বাবা এলে সবশুদ্ধ অনেক বেশী হবে, কিন্তু বাবা চিঠি পড়ে সেই এক কথাই বারবার লিখছেন। অনেক চিঠি এসেছে আমার দিল্লী থাকাকালীন। সব চিঠির জবাব আজ দিলাম।

৪০

দিল্লী থেকে এসে অবধি বাজনা বাজাতে পারছি না। দিল্লীতে যা শুনে এবং দেখে এলাম তাতে মনে হচ্ছে ঘোর অমঙ্গলের পূর্বাভাস। মৈহারে প্রথম যে সময় এসেছিলাম সেই সময় খুবই ভাল ছিল। দেখতে দেখতে কত শিক্ষার্থীই এল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, প্রায় সকলেই অপরের বিরুদ্ধে মন ভাঙ্গানর চেষ্টা করে মিথ্যা কথা বলে। যার ফলে একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি, সামনা সামনি জিজ্ঞাসা করে বুঝব কথাটা সত্য কিনা। কাশীতে গুল্লুজী এই চুকলি খাওয়ার একটা নামকরণ করেছিলেন। গুল্লুজী বলতেন 'নারদপনা'। নারদ মুনি যেমন দুজনকে কথা বলে ঝগড়া বাঁধিয়ে আনন্দ পেতেন, সেই নারদপনা এ যাবৎ দেখেছি। কিন্তু দিল্লীতে এবারে নূতন অভিজ্ঞতা হল। খোসামোদের যুগ এটা। খোসামোদের বহর দেখলেই বাবা ভয় পেতেন এবং বলতেন, 'এত বিলাই দন্তবত কেন?' অর্থাৎ বিড়ালের মত স্বভাব কেন? খুন করতে এসেছ নাকি? বাবার কাছে এ যাবৎ বহুবার বহু লোকের শ্রদ্ধার অভিনয় দেখলেই বলতে শুনেছি। অথচ আজকাল খোসামোদ করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য আকাশে চড়ায় এবং পেছনে ষড়যন্ত্র করে। মনে হল মূর্খেরা মানুষের বাইরেটা দিয়ে বিচার করে। তারা বোঝেনা যে মুখের কথার কোন মূল্য নেই, মন এবং মুখ তাদের ভেখ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভেখটাই তাদের কাছে প্রিয়, প্রশংসা শুনে শুনে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হোল কত বড়ো দুর্ভাগ্য তারা। বাবার বিলাই দণ্ডবতই এদের বিপথে চালিত করছে। তাই দিল্লী থেকে এসে অবধি মনে হচ্ছে ঝড়ের পূর্বাভাস। এই ঝড় ঘর বাড়ী যেন ভেঙ্গে না দেয়। হঠাৎ কি মনে হল, দেবীর পাণ্ডাকে দুটো টাকা দিলাম পুজো দেবার জন্য, যাতে সকলের মতিগতি ঠিক থাকে এবং সকলে সুখে থাকে। এখন আমার মনে হচ্ছে বাবার কাছে যেন স্বর্গে আছি। দিল্লীতে যে সব চামচেদের দেখলাম, মনে হোল এরা কি শিখবে? এদের চামচেগিরিই কাজ।

মনের যখন এই অবস্থা, দুদিন পরেই জব্বলপুর থেকে মহিলা স্কুলের সেতারের এক শিক্ষক নিজের স্ত্রীকে নিয়ে মৈহারে এল। তাঁর কাছে শুনলাম বাবা যে সময় জব্বলপুর গিয়েছিলেন সেইসময়, বাবার কাছে শিখবার আগ্রহ করায় বাবা আসতে বলেছিলেন। তিনি জানেন যে বাবা উপস্থিত মৈহারে নেই তা সত্ত্বেও এসেছেন, এবং একটা চিঠি দিলেন আমাকে। দেখলাম মৈহারের মহারাজা লিখেছেন বাবাকে, 'যদিও জানি আপনি উপস্থিত নেই কিন্তু আপনার ছাত্রকে বলবেন একে শেখাতে।' মহারাজাকে এ যাবৎ মৈহারে আসতে দেখি নি, কিন্তু বুঝলাম আমার কথা বাবার কাছে শুনেছেন। ছেলেটির বাবা একজন জ্যোতিষী। এদের উপাধি কুলকার্ণি। অনুরোধ এড়াতে না পেরে গুলগুলজীকে বললাম, 'আখড়াতে কুলকার্ণি এবং তার স্ত্রীর থাকবার জন্য ব্যবস্থা করে দিন। একে শেখালে বাবা রাগ করবেন না, কারণ মহারাজ লিখেছেন।' যে সময় বেশী রিয়াজ করব, সেইসময় বাধা আসে। কথায় আছে 'শ্রেয়ংসি বহু বিঘ্নানি।' আমার দেখছি তাই হয়েছে। নানা কারণে মানসিক অশান্তি। এই সময় আবার কি উৎপাত এলো। যাইহোক তাকে বললাম, 'আগামীকাল সকালে সেতার নিয়ে আসবেন।' কাশী থাকাকালীন শুনতাম, পণ্ডিতরা সূর্যোদয় দেখে গঙ্গাস্নান করত। সূর্যোদয় দেখে গঙ্গাস্নান একটা

বিরাট সাধনা। সূর্যোদয় দেখে গঙ্গাস্নান আমার কখনও সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু মৈহারে সূর্যাস্ত রোজ দেখি। সূর্যাস্ত দেখবার সময়, কেন জানি না মনে হয়, আজকের দিনটাও বৃথা চলে গেল। জানি না কবে আমার জীবনে সূর্যোদয় হবে।

পরের দিন কুলকার্ণি সেতার নিয়ে এল প্রথমে বাজনা শোনাতে। বাজনা শুনে অবাক হলাম। এই বাজনা বাজিয়ে কি করে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেতারের অধ্যাপক হয়েছে। এ ছাড়া জব্বলপুরে এবং সন্নিকট শহরে জলসা করে। সঙ্গীত নিপুণ পরীক্ষা দেবে এবারে। কলেজে কেবল সঙ্গীতের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষার কিছু হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি বলে দিয়ে বিদায় করলাম। তার কাছে শুনলাম সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে শিখতে। সাতদিন পরে চলে যাবে এবং পরে আবার আসবে। নানা চিন্তায় বিপর্যস্ত। কি করব বুঝতে পারছি না। বাবাকে চিঠি লিখলাম, 'দেশের কাজ যথাশীঘ্র শেষ করে মৈহারে চলে আসুন। সাতনা এবং রেওয়া থেকে ঘন ঘন চিঠি আসছে বিদ্যালয় খুলবার জন্য। মৈহারে নানা চিন্তার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। সকলকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজের রিয়াজ ঠিক মত হচ্ছে না। তারপর বিদ্যালয় খুললে তো শিক্ষার সুযোগ পাব না এবং নিজের রিয়াজ করতে পারব না।'

সারাদিনের ক্লান্তির মধ্যেও ভাতখণ্ডের বইয়ের প্রথম ভাগের বাংলায় অনুবাদ করে যাচ্ছি। নানা চিন্তার জন্য, শেখাবার সময় সকলকেই কেবল মারতে বাকী রাখছি। কুলকার্ণিকে শেখাবার সময় বললাম, 'তোমার বাজনা আতাইপানায় ভরা। যা দিয়েছি ঠিক মত রিয়াজ করোনি। এরকম করলে শেখাব না। বাবার কাছে পরের বারে শিখতে এসে মার খাবে। সুতরাং দিন রাত ভাল করে বাজাও।' সাতদিন থাকার পর কুলকার্ণি সস্ত্রীক জব্বলপুর চলে গেল। ইতিমধ্যে ভাতখণ্ডের শাস্ত্রীয় সংগীত মালিকার প্রথম ভাগ বাংলায় অনুবাদ করে, লল্লাকে হাথরসে পাঠিয়ে দিলাম।

কাশি থেকে আশুতোষের এবং বাবার চিঠি পেলাম। বাবার চিঠিটা উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাম্মন বাড়িয়া
মদ্ধ পাড়া
জিলা ত্রিপুরা
১৬-৫-৫৫

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তুমার পত্র এই মাত্র পেয়ে লিখিলেম, পত্রে সব বিসয় অবগত হলেম। আমার ছুটির মঞ্জুর হয়েছে জানিলাম। গবরনর সাহেবকে জানাবে আমার আদাব, বলিবে আমার জন্ম পাকিস্থানে অনেক শৎ কর্ম্ম করিবার আমার কামনা, গ্রামে আমার জন্ম সেখানে রাজা জমিদার সব হিন্দুস্থানে চৈলে এসেছে, এই সময় জলের বড় অভাব, একটি খনন হয়ে গেছে আরেকটি খনন করবার জন্য দরখাস্ত করেছি এখনও মঞ্জুর হয়ে আসে নাই। মর্জ্জিদের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেছে, এর খরচ পত্র জা লেগেছে সব বিক্ষার দ্বারায়। হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্থানে জাওয়ার সময় মাত্র ৫০্ টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেম যা কিছু

মর্জ্জিদে এবং পুকুরে খরচ হয়েছে সব পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দু মুসলমান সকলে আমাকে দান করেছেন বিক্ষা দিয়েছেন। এখন যে সব কায বাকি আছে সেগুলি শেষ করিতে আর ছ মাস লাগিবে। হাতে যদি নগদ পয়সা থাকিত তাহলে এতদিন লাগিত না। সব ভিক্ষার উপর, এজন্য গবরনর সাহেবের কাছে বিনতি করিতে আমার শেষ জিবনের কামনাগুলি যাতে পুর্ন করে আসিতে পারি তার জন্য কৃপা দান করিতে হবে। মাইহারে আসিলে পর আর দেশে যাওয়া অসম্ভব হবে। এজন্য নিবেদন করিতেছি যাতে আমার কার্য্যগুলি সেরে আসতে পারি তার প্রবন্ধ করে দিলে বাধিত হব। আমাকে অবিশ্বাষ করিবেন না আমি, খেটে শরির বড় ক্লান্ত হয়ে পরেছে, তার উপর বাতের ব্যারাম, বাংলা দেশে বাৎ রূগে অনেক ব্যক্তি পায়ে, হাতে সেঁক দিয়ে থাকে আমার এখনও এসব করিতে হয় নাই, নিজ হাতে রান্না করি, রান্না করিবার লোক রাখতে হলে মাসেক ৮০-৯০্ টাকা মায়েনা বলে চাকর রাখিবার অর্থ নেই, কারন যা অর্থ পাই সব সৎ কার্য্যে লাগান হয়।

কলেজ যতদিন না খুলা হয় ততদিন আমাকে ডাকবেন না, কলেজ খুলবার পুর্ব্বে আমাকে টেলি করে দিলেই আমি চৈলে আসিব। আরেক বিসয় নিবেদন, আমার বেতন খুব কম রাখা হয়েছে এই বেতনে আমার সংস্বার চলবে না, চিন্তা করে দেখিবেন, আমার সংস্বারে বহু খরচ এই বেতনের দ্বারা ব্যেন্ড্ পারটিতে ও আমার কায করিতে হবে কিনা, দিতিয় ব্যেন্ড্ পারটির জন্য যা দেওয়া হয় সেটা কলেজের বেতনের সঙ্গে যেন মিসান না হয়। ৭০০্ টাকা বেতন পাইলে আমার সংস্বার খরচ চলিতে পারে। আমার বেতনের ধিগে যেন দৃষ্টি থাকে। রেডিওতে, ও বর জলসায়, কনফ্রেন্সে যাইতে আবদ্ধ না করা হয়, তার দুরূন বেতন কেটে রাখা তাহা করিতে পারিবে না। রেডিও, জলসায় না গেলে আমার সংস্বার খরচ চলতে পারে না, শিক্ষার্থীর জন্য ও আমার বাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন এতে তাদের অনেক শিক্ষা হয়, রাগ শিক্ষা, বাদ্য শিক্ষা, লয় শিক্ষা যাবতিয় এর জন্য আমায় রেডিওতে বাজাতেই হবে এসব প্রথম থেকেই ঠিক করে আমাকে ৭০০্ টাকা মাসিক দিতে হবে। একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি,

ইতি
বাবা

পুনঃ : ব্রাম্মন বাড়িয়াতে এই গানটি রচনা হয়েছে। শিক্ষা করিবে।

নটবিহাগ-ত্রিতাল

০ ১ +
গামাপাধা মা । গামা রাগা সানা সা । গা গা রেগা পম গ ।।
ছুম ছা না না না না বা জে পায়েলি য়া

সা সা গামা । পা নধ ন । সন ধ প । মাধা পা মা গা ।
পি য়া কে আ য় ন সু ঘন্ ভ ই লো য়া —

। । । । । । । । । । । । । । । ।
পা পা না না । ন স স স । ন স র স । ন র স ন ।
ব হু দি ন বি ভ ত - ও র প ত জি য়া রা

। । । । ১ । । । + । । । । ৩ । । । ।
স স গ ম । প - নধন - । স ন ধ প । ম ধ প ম গ ।।
দ র শ পা ও পিয়া - কে ভা ই ল য়া

বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। বাবার সময়ের বোধ হয় খেয়াল নাই। লিখেছেন এখনও সব কাজ শেষ হতে ছয় মাস লাগবে। অথচ এও লিখেছেন কলেজ খুলবার আগে যেন না ডাকি, কলেজ খুলবার দিন ঠিক হলে টেলি করলেই তিনি চলে আসবেন। বাবা এত কাজের মধ্যেও নটবেহাগে একটি গান রচনা করে পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াতে এই গানটি রচনা হয়েছে। শিক্ষা করিবে।' বাবার চিঠি পেয়ে উত্তর দিলাম। বাবা না আসা পর্যন্ত কোন কাজই সম্ভব নয়। ছাত্রদের নির্বাচন, শিক্ষকদের নির্বাচন, স্কুলের পাঠ্যক্রম এবং নানা জিনিষ বাবার বিনা পরামর্শে সম্ভব নয়। বাবা যে টাকা চেয়েছেন তা অতি স্বল্প। বাবা এলে বাবার মাইনে আরও বাড়িয়ে দেব। বাবার সেই এক কথা। সব সমেত মাত্র সাতশত টাকা হলেই হয়ে যাবে। বাবাকে লিখলাম, রেডিও জলসায় বাজানর অনুমতি সহজেই পাবেন। তারজন্য কোন চিন্তা নাই। এই মর্মে গভর্ণরকে একটা চিঠি লিখে আবেদন লিখে দিলাম। আশুতোষের চিঠিতে জানলাম কণ্ঠে মহারাজ কুমিল্লাতে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। এ চিঠি পেয়ে বাবাকে লিখে দিলাম, 'আপনার বাজনাই প্রধান। আপনি লিখেছিলেন কণ্ঠে মহারাজকে বলতে। যদি কোন কারণে না যান তাহলে আহমদ জান খিরকুয়াকে বলবেন। আমার মনে হয় কুমিল্লার স্থানীয় কোন তবলা বাদককে নিয়ে বাজানই শ্রেয়।'

দুপুরে পালবাবু এসে বললেন, 'আজ আমার জামাই এসেছে। জামাই হায়দ্রাবাদে এ.ডি.এম. নিযুক্ত হয়েছে। কয়েকদিন থেকে এবারে মুন্নিকে নিয়ে যাবে।'

জামাইয়ের খুব ইচ্ছা যে আপনি রাত্রে বাজনা শোনান। পালবাবুকে বললাম, 'জামাইকে সন্ধ্যায় বাড়ী নিয়ে আসুন।' সন্ধ্যায় পালবাবুর বাড়ীর সকলেই এলো। জামাই খুব ভালো। বাজাবার পর জামাইকে বললাম, 'মুন্নিকে বাজাবার সুযোগ দেবেন। পরে যখন মৈহারে আসবে, সেই সময় আমি যদি থাকি তাহলে শেখাব। যদি আমি চলে যাই তাহলে বাবার কাছে শিখবে।' জামাই সানন্দে রাজী হয়ে বলল, 'মুন্নিকে বাজাবার সুযোগ দেবো। অফুরন্ত সময় হায়দ্রাবাদে, সুতরাং সাধনার যথেষ্ট সময় পাবে।'

পালবাবুর মেয়ে মুন্নির মাথা ভাল ছিল। পালবাবুর অনুরোধে বাবা সেতার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোলকাতা থেকে। সেতারের আওয়াজ এতদিনে খুব ভাল হয়েছিল। এত কম সময়ে যা বাজিয়েছে তা অকল্পনীয়। বাবা ঠিকই বলেছিলেন, মেয়েকে বাজনা না শিখিয়ে ঘরের কাজ শেখাতে। মেয়েদের শেখান এইজন্য বাবা সমর্থন করতেন না। শ্বশুর বাড়ীতে

সঙ্গীতের পরিবেশ না থাকলে সব শিক্ষা বিফল হয়ে যায়। যদিও আমার আর্থিক ক্ষতি হল, কিন্তু একটা প্রতিভার মৃত্যু দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। খামারিয়া থেকে, করবাবু মেয়ে নিয়ে প্রত্যেক মাসে আসে। যদিও তার মেয়ের বয়স কম, তা সত্ত্বেও তাকে শেখাবার ইচ্ছা মন থেকে হঠিয়ে দিলাম। জানি না কবে শুনব বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

মৈহারে নূতনত্ব কিছু নেই। নিয়মিত ডেভিড, দ্যুতিকিশোর এবং ইন্দ্রনীলকে শেখাই। মাঝে মাঝে রাজকুমার এবং গুলগুলজীকে শেখাতে হয়। ইতিমধ্যে, আলিআকবর চতুরলালকে নিয়ে আমেরিকা গিয়েছেন এই প্রথম। আমেরিকাতে সুনাম হয়েছে। আলিআকবর চিঠি দিয়ে জানিয়েছে জুবেদা বেগমকে। ইতিমধ্যে দুইবার রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্য রেওয়া গিয়েছি। গভর্ণরের কাছে ব্যাণ্ডের মাইনে বাড়ানর জন্য বলেছি। এই মর্মে বাবাকে চিঠিতে সব জানিয়েছি। গভর্ণর এবং এডুকেশন সেক্রেটারির কাছে, বাবার দরখাস্ত, টাইপ করে কুমিল্লায় পাঠালাম।

বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার লিখা অনুসারে মাননীয় গবরনর মহাসয়কে ও সেক্রেটারি মহাসয়কে দরখাস্ত পাঠাইলাম, তুমাকে ও একটি পাঠালেম পাঠ করে দেখিবে। মাননিয় গবরনর মহাসয়কে জানাবে আমার বেতন যা ধার্য্য করেছেন তাহাতে আমি সিকৃত আছি। কিন্তু ৪০ বৎস্বর যাবত আমি প্রান দিয়ে রাজষ্টেটে চাকরি করেছি, স্টেট হইতে যে ২০০্ পাই সেটা আমার পেন্সেন স্বরূপ, ঐ ২০০্ সত টাকা আমি যতদিন বেচে থাকিব গবরমেন্ট আমাকে দিতে হবে। কলেজ ও ব্যেন্ড পারটিতে দুই জাগাতে যদি আমায় খাটতে হয় এর বিনিময় বেতন কি পাইতে পারি সেটা গবরনর সাহেব বিচার করিবেন। গবরনর সাহেবকে জানাবে আপনার আদেস পালনার্থে আমি আসিব ঐন্যথা হবে না। কলেজ খুলার ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে টেলি করে জানান মাত্র সব কার্য্য ফেলে আমি চৈলে আসিব ঐন্যথা হবে না কলেজের বাড়িঘর প্রথম ঠিক হওয়া চাই, কলেজের শিক্ষকের জন্য বেতন যা নির্ধারিত করা হয়েছে সেই বেতন দেওয়া হবে পত্রিকায় এডবেটাইজ করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। গান পদ্ধতি শিক্ষা ভাৎখণ্ডের পদ্ধতিতে হবে, যন্ত্রশিক্ষা আমার পদ্ধতিতে হবে। যন্ত্র শিক্ষার জন্য বই ছাপাতে হবে, সেটা আমি এলে পরে হবে প্রথম সিক্ষার্থী ধিগকে মুখে স্বর সাধনার নিয়ম পদ্ধতি ও বাজাবার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হবে, ক্রমে ক্রমে ছাপাইলেও চলিবে। গায়ক একজন ভালচাই, বেহালা বাদক একজন ঠিক করে রেখেছি। আমি এসে সেতার বাদক ঠিক করিব। শ্রীমান নিখিল যদি থাকতে চায় তাকে দেওয়া হবে, নচেৎ ঐন্য ঠিক করা যাবে। গান শিক্ষার পদ্ধতি সর সাধনার ও রাগ সাধনার, গানশিক্ষার যাবতিয় বহি ভাতখন্ডের লিখিত সব বহি আনিতে হবে। সেই নিয়ম অনুসারে ছাত্র ছাত্রি সকলকে শিক্ষা দেওয়া হবে। যবিতিয় নিয়ম টাইটেল সেখানের নিয়মে দেওয়া হবে। এসব যেয়ে তুমি গবরনরের সঙ্গে আলাপ করিবে। গবরনর সাহেব আমাকে যা আদেস করিবেন তাই সিরধার্য্য করিব। সবঠিক হয়ে গেলে আমাকে ডাকবে আর বলবার কিছুনেই তুমি শিক্ষার্থী বলে তোমার বেতন ধার্য্য

করিলেম ১৫০্ সেক্রেটারির পদের জন্য। সব কাগজে পরিবে এবং সকলকে জানিয়ে দেবে।

এখানে আমার অনেক কাজ, আর জেন আমাকে তেক্ত না করা হয় কলেজ যে সময় খুলিবে তার পূর্ব্বে জানাইলে আমি চৈলে আসিব আমার বেতন যা ধার্য্য করেছেন তাতেই আমি সিকৃত আছি জানাবে। বাতে কষ্ট পাইতেছি আর কিছু বাতের হার তুমার মার থেকে নিয়ে সত্তর পাঠিয়ে দিবে এখানের অনেক লোকে এই ঔষধ চায়। একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি

বাবা

বাবা চিঠিতে তারিখ লেখেন নি। বাবা বাতের জন্য বাদুড়ের হাড় চেয়ে পাঠিয়েছেন। অনেকের উপকার হয়েছে। বাবা একই কথা বারবার লিখেছেন। এবারে সেই এককথা ছাড়া কয়েকটি নূতন কথা লিখেছেন। যন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি বাবার মতে হবে। কিন্তু গায়ন শিক্ষা ভাতখণ্ডের পদ্ধতির মতো হবে। যন্ত্র শিক্ষার জন্য বই ছাপাতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন। বেহালা বাদক ঠিক করেছেন। একজন সেতার শিক্ষক এসে ঠিক করবেন। নিখিল যদি চায় তাকে শিক্ষক করা যেতে পারে। বাবার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারছি না বাবা কবে আসবেন। ইতিমধ্যে মিনিষ্টার অফ্ এডুকেশনের চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানিয়েছেন জুলাই মাসে বিদ্যালয় খুলতে হবে। মৈহারের মহারাজের একটি বাংলো খালি আছে। সেই বাড়ীটিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মিনিষ্টার অফ এডুকেশনকে বাবার প্রস্তাবের কথা জানিয়ে চিঠির উত্তরে লিখলাম, 'বাবাকে এই বিষয়ে বিস্তারিত সব জানিয়ে চিঠি লিখতে।' আজ আবার বাবার লেখা অনুযায়ী বাদুড়ের হাড় পারসেল করে পাঠিয়ে দিলাম।

ঘন ঘন সাতনা এবং রেওয়া থেকে লোক আসছে মৈহার বিদ্যালয়ের জন্য। মহারাজের যে বাড়ীটা খালি আছে সেই বাড়ীটা বিদ্যালয়ের জন্য ছোট। সুতরাং অন্য জায়গা দেখা হতে লাগল। মৈহার স্টেশনের কাছে সরকারি একটা বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীটার জন্য শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে লিখলাম।

আবার বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মদ্ধপাড়া ত্রিপুড়া

অদ্দরূজার ২৮

কল্যাণবর

শ্রীমান বাবা যতিন জানিবে, ২ দিন হল আমাদের বিন্ধ্যপ্রদেশ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি মাথুর মহাশয়ের পত্র পেয়েছি, তাতে লিখেছেন জুলাই মাসে কলেজ খুলিবে, আমার আসার খুব প্রয়োজন. কলেজ দেখা শুনার জন্য আমায় ৫০০্ টাকা বেতন দিবেন। যা হক বেন্ডপারটিতেও কি তার মদ্ধে নয় পৃথক তাহা জানিবে। পূর্ব্বের পত্রখানা বুধ হয় পেয়ে থাকিব তাহাতে যে সব বিসয় লিখেছি তাহা মাথুর মন্ত্রি মহাশয়কে জানাবে। আমার জন্য

একজন হেট্‌ক্লার্ক রাখিতে হবে কারণ কলেজ বিসয়ে লিখা পরার কাজ সে যেন করিতে পারে, বেস জ্ঞানি লোক হওয়া চাই, তাহা তুমি করিবে কি ঐন্য লোক রাখিবে নিজের মনের সঙ্গে বিচার করেও বুজাপরা করে যা হয় করিবে, বেতন ঠিক করিবে। গায়ক একজন ভাল পাসকরা ভাৎখণ্ড বিদ্বাপিট হতে রাখতে হবে, একজন তবলাবাদক রাখিতে হবে। সেতার বাদক শিক্ষক ও বেহালা বাদক শিক্ষক আমি এসে সব ঠিক করিব। আমার কায শেষ করিতে আর দুই মাস লাগিবে, এজন্য মাথুর সাহেবকে বলিবে সে সময় সব ঠিক করে কলেজ খুলা হবে সেই সময় যেন আমাকে ডাকে। এখন পর্য্যন্ত কলেজের বাটিই ঠিক হয় নাই, কি করে কলেজ হবে, আমাকে তিনি লিখেছেন মহারাজার কাছ থেকে বাটি আদায় করিতে, আমি কি করে পারিব, মন্ত্রিকে জানাবে মহারাজা বাটি দিতে প্রস্তোৎ আছেন কিন্তু বটির কেরায়া দিতে হবে, এজন্য মহারাজার কাছে গিয়ে কিম্বা পত্রে প্রথম বাটি ঠিক করুন তারপর সব ঠিক করে আমাকে জানাবে। সব ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমায় যেন না ডাকে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ছুটি নেই নাই এজন্য আমি জুর করে কয় মাস দেশে থেকে আমার সব ঠিক করে আসিব মন্ত্রিমহাশয়কে জানাবে।

তুমি নিজে থেকে গবরনরের কাছে আমার লিখা মত সব আরম্ভ করিবে। ১০০০ টাকা বেতন চাহিনা, বেণ্ড পারটির বেতন যা পাই তাহার সঙ্গে পাঁচশত মিলিয়ে দিতে হবে, বেণ্ডের বেতন আমার পেন্সন চিরদিনের জন্য, কলেজের বেতন ৫০০্ দুই মিলিয়ে ৭০০্ সত হলেই আমার সান্তি নিয়ে আমি সংসার চালাতে পারবো। এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি

বাবা

বাবা মাথুর সাহেবের চিঠি পেয়েছেন। বাবা লিখেছেন, 'স্কুলের জন্য একজন হেড ক্লার্ক রাখিতে হবে, কারণ কলেজের বিষয় লেখাপড়ার কাজ যেন করিতে পারে। বিদ্বান লোক হওয়া চাই, তাহা তুমি করিবে, না অন্য লোক রাখিবে। নিজের মনের সঙ্গে বিচার করে বোঝাপড়া করে যা হয় করিবে। বেতন ঠিক করবে। গায়ক, তবলা, বেহালা বাদক এসে ঠিক করিব। আমার কাজ শেষ করিতে দুই মাস লাগিবে। এরজন্য মাথুর সাহেবকে বলিবে সব ঠিক করিয়া যেন আমাকে ডাকে। এখন পর্যন্ত কলেজের বাটি ঠিক হয় নাই। আমাকে লিখেছেন মহারাজের কাছ থেকে বাটি আদায় করিতে। আমি কি করে পারিব? মন্ত্রীকে জানাবে মহারাজ বাটি দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু বাটির কিরায়া দিতে হইবে। মাইহারের চাকরির জন্য আমার মাথা ব্যথা করিবার কিছু নাই। মাইহারের চাকরিতে আমার কী লাভ হয়। আমার খরচের টাকা পাইনা, এজন্য আমার মন ভেঙ্গে গেছে। কাহাতক এর জন্য চিন্তা করিব।'

বাবার চিঠি পেয়ে দুঃখিত হলাম কিন্তু হাসিও পেল। বাবাকে সব খবর দিয়ে স্পষ্ট করে এবারে লিখলাম, 'কলেজে কাজ করার জন্য আমার আদৌ কোন ইচ্ছা নাই। আপনার মাইনে বাড়বে বলেই এই বিদ্যালয়ের জন্য আমি সব কিছু করছি। আপনি মৈহারে এসে, পনেরোশো টাকা ব্যাণ্ড এবং স্কুলের জন্য যাহাতে পান, তাহার চেষ্টা করিব। আপনি ব্যাণ্ড এবং স্কুলের জন্য মাত্র সাতশো টাকাতেই রাজী হবেন না। সর্বশেষে আবার বলি, আমি

স্কুলের চাকরি করবার জন্য মৈহারে আসি নি। চাকরি করার আমার ইচ্ছা নাই। আমার জীবনের উদ্দেশ্য আপনি মৈহারে এলেই জানাব।'

প্রত্যেকেরই অর্থের চাহিদা থাকে। ইচ্ছা করলে বাবা নিজের মাইনে অনেক বাড়াতে পারতেন। মৈহারের মহারাজের নিকট প্রথম সেই যে সাড়ে তিনশো টাকায় রাজী হয়েছিলেন আজও সেই মাইনে আছে। মহারাজকে শেখাতেন, ব্যাণ্ডের ছেলেদের তৈরি করেছেন নামমাত্র টাকায়। এর জন্য বাবার কোন অভিযোগ ছিলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকারও সাড়ে তিনশত টাকা দিতেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। কোন প্রোগ্রামে বাবাকে যে টাকা দিতে চাইত, তাতেই রাজী হয়ে যেতেন। বাবার এই মাইনে দেখেই আমি চেষ্টা করেছি ব্যাণ্ডে যাতে বাবা সর্বসাকুল্যে পাঁচশত টাকা আজীবন পান এবং স্কুলের জন্য একহাজার টাকা পান। স্কুল কতদিন চলবে তার স্থিরতা নাই। স্কুল না চললেও বাবা ব্যাণ্ডের জন্য পেনশান হিসাবে যাতে পাঁচশত টাকা পান তার জন্যই চেষ্টা করছি। কিন্তু বাবা এসে কি করবেন ভগবানই জানেন। এত কম টাকা ব্যাণ্ডে পেয়েও বাবা কি করে রাজার হালে সংসার চালাতেন কল্পনা করা যায় না। নানা ষ্টেটে এবং কনফারেন্সে বাজিয়ে টাকা পেয়েছেন, সেই টাকাই ছিল প্রকৃত সম্বল। ব্যাণ্ডের মাইনে তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও বাবার কোন জিনিষের অভাব ছিলো না। বাবা মিতব্যয়ী ছিলেন এবং কি করে টাকা সঞ্চয় করেছিলেন তা জেনেছিলাম পরে।

ইতিমধ্যে দ্যুতি কোলকাতায় গেছে। আমাকে প্রণামী হিসাবে একশো টাকা দিয়ে গেছে। বাবার আসবার দেরী দেখে মণিকা দেবী এবং ইন্দ্রনীলও কোলকাতায় গিয়ে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবে মৈহারে। দ্যুতি এবং ইন্দ্রনীলের কোলকাতায় যাবার ফলে আমার রিয়াজ হয়েছে। বাবার কাছে যাতে ভালভাবে শিখতে পারি তারজন্য দিন রাত বাজিয়েছি।

অবশেষে বাবা বম্বে মেলে মৈহার আসছেন বলে সংবাদ পাঠালেন। যাক এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। প্রায় আট মাস পরে বাবা দেশে ফিরছেন। সাতনাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে বললাম, 'বাবার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করে রাখবেন।' গাড়ীর ব্যবস্থা হল। বাবা সাতনাতে এসে পৌঁছে গাড়ীর ব্যবস্থা দেখে খুশী হলেন। গাড়ী করে মৈহারে যাবার সময় সব খবরাখবর নিলেন। বাবার কোন পরিবর্তন নেই। মৈহারে এসেই আগেকার মূর্তি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ডেভিডের বাজনার উন্নতি হয়েছে। ডেভিডকে বলেছিলাম, 'বাবা এলে বাবার সঙ্গে দেখা করে প্রার্থনা কোরো শিক্ষার জন্য।' বাবা আসার পর ডেভিড বাবার সঙ্গে দেখা করল। সিংহলবাসী ডেভিডের ভক্তি এবং নম্র ব্যবহারে, তুষ্ট বাবা প্রথমে বাজনা শুনতে চাইলেন। ডেভিড বাজাল। বাবাকে বললাম, 'ছেলেটি বড় আশা নিয়ে এসেছে কিছুদিন হোল এবং শিক্ষার আশায় মৈহারে রয়েছে।' ছেলেটির ভাগ্য ভাল। বাবা রাজী হলেন শেখাতে। আমাকে বললেন, 'আমার অবর্তমানে ছেলেটিকে শিখিও।' রাত্রে বাবাকে চাম্পি করতে গেলাম। আচমকা বাবা বললেন, 'আরে না না আমাকে টিপতে হবে না।' মনে মনে ভাবলাম কি হল? বাবা কোন কারণে চটে গেলেন নাকি? জোর করে বাবাকে বললাম, 'ক্লান্ত হয়ে এসেছেন একটু টিপে দিলে আরাম পাবেন। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আরে

না না! তুমি আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছ। কুমিল্লায় গিয়ে দীর্ঘদিন থেকে রোজ তোমার কথা ভেবেছি। মনে হ'তো কেউ যদি তোমার মতো চাম্পি করে দেয়। কিন্তু কে করবে? সুতরাং অভ্যাসের দাস হওয়া উচিৎ নয়। আজ থেকে আর কখনও টিপবে না। বসো, কি করে এতদিন কষ্ট করে কাটিয়েছি শুনলে অবাক হবে।' দুই তিনবার বলার পরও বাবা আমাকে চাম্পি করতে দিলেন না। মৈহারে আসা অবধি রোজ দুপুরে এবং রাত্রে কিছুক্ষণ চাম্পি করে এসেছি। যদিও মা আলাদা ভাবে বাবাকে টিপে দিতেন দুবেলা, কিন্তু আজ এই প্রথম আমাকে টিপতে দিলেন না। পরে বহু বলা সত্ত্বেও, মৈহার থাকাকালীন আর টিপতে দেন নি। মৈহার ছাড়ার বহুদিন পরে, বাবার শরীর খারাপের সময় যতবার মৈহার গিয়েছি, সেই সময় চাম্পি করেছি। সেই সময় বাবা অসুস্থ। সুতরাং তখন আর না করেন নি। যাক, বাবা আসার পর দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আজ গুরুপূর্ণিমা। প্রতিবারের মত বাবাকে চন্দন, মালা এবং সকালে জিলিপি এনে খাওয়ালাম। বাবা খুশী হলেন। আজ আমার কাছে একটা খাতা চাইলেন। খাতা দিলাম। বাবা নিজের হাতে স্বরচিত গান পুরিয়াধানেশ্রী লিখে দিলেন। কুমিল্লায় নিজের রচিত গান লিখেছেন। বললেন, 'এগুলো লিখে রাখো। পরে এগুলো শেখাবো।' কিছুক্ষণ তামাক খাবার পর বললেন, 'সঙ্গীত নাদ বিদ্যা অপরংপার। সারাজীবন একাগ্র হয়ে সাধনা করতে হবে। পিতলের তালায় মরচে পড়ে গেছে। চাবি দিয়ে তালা খুলছে না। তাহলে কি করবে? প্রথমে শিরিষকাগজ দিয়ে ঘসতে ঘসতে মরচে ছাড়াতে হবে। তালার মধ্যে তেল দিয়ে মরচেও ছাড়াতে হবে। তারপর তালা খুলবে। সেইরকম বাজনার মধ্যেও মরচে পড়ে আছে। একাগ্র মন দিয়ে সাধনা করলে মরচে ছেড়ে চকচকে হবে। তারপর তালাখুলে ঘরে প্রবেশ করলে দেখবে রূপো, সোনা, মোহর, হীরে, পান্না, মোতি এইসব অলঙ্কার পাবে। তারজন্য কি করতে হবে? আগে কর শেষের আয়োজন। পিতলে মরচে পড়ে গেছে, ঘসতে যাও। তার মানে ঠিক ঠিক স্বরে আঙ্গুলের টিপ বসাও। অভ্যাস করতে করতে হঠাৎ চোখের সামনে দেখবে মরচে পড়া তালার ফুটোর মধ্যে চাবি লেগে খুলে গেছে। তখন যে ঐশ্বর্য দেখবে তাতে অলৌকিক অনন্ত "হরি-ওঁম" এর মহিমার স্বাদে বিভোর হয়ে যাবে।' বাবার এই কথাগুলোর অর্থ সেই সময় না বুঝলেও অনেক পরে উপলব্ধি করেছি। কথাটা অনেকের কাছে হয়ত হাস্যকর বলে মনে হবে, কিন্তু এই কথাটা আমার কাছে বেদান্তের দর্শনের মতই মনে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা বললেন, 'মন্ত্রের সাধন আর না হয় শরীর পতন। ধর্মগুরুর মন্ত্র অন্য। কয়েকটি কথা নিরন্তর জপ করা। কিন্তু সঙ্গীতের মন্ত্র "ওঁম" এর সাধনায়, সিদ্ধি না হয়ে শরীর পতন অর্থাৎ মৃত্যু হলেও দুঃখ নাই। মনের সান্ত্বনা থাকবে। ভালো কাজ করতে গিয়ে জীবন নাশ হোল। সঙ্গীত হল অনন্ত সমুদ্র। এতবছর হয়ে গেল অথচ জীবনে তিন চারবার প্রকৃত 'স' লেগেছে।' বাবার কাছে এই কথাটা বহুবার শুনেছি। মনে হয়েছে বাবা বিনয় করছেন। পরক্ষণেই মনে হয়েছে বাবা তো মিথ্যা বলেন না। তাহলে এই প্রকৃত 'সা'-এর অর্থ কি? রোজই তো আলাপ বাজাবার সময়, মীড়ে ওঁম এর দুইটি স্বর লাগাই। তবে বাবা কেন বলেন, জীবনে তিন চারবার 'সা' লেগেছে। বাবার এই কথাটা কিন্তু

আমার কাছে বিরাট জিজ্ঞাস্য হয়ে রয়েছে। বাবাকে বেশী কথা বলতে পারিনি। আজ জিজ্ঞাসা করেই বসলাম। হেসে বাবা বললেন, 'সময় হলে বুঝবে। এটা বোঝানো যায় না। এটা উপলব্ধির জিনিষ।' বাবার এই কথাটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। অনেক অলৌকিক পুরুষের উক্তির মধ্যে সত্য আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা শক্তির উৎস কোথাও নিশ্চয় আছে। সেটা কোথায়, কত বড়, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই বা কেমন, উপলব্ধি করার জিনিষ, এ বোঝান যায় না। যেমন সারা বৎসর কিছু নাঙ্গা মহাপুরুষ, শীততাপের অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান থেকে, নিজেকে অনায়াসে একান্তে সরিয়ে রাখতে পারেন কোন শক্তির জোরে? লজ্জা, ভয়ই বা তার কাছে ঘেঁসে না কেন? কে এর উত্তর দেবে? বাবার এই কথাটার প্রকৃত মর্ম বুঝিয়েছিলেন পণ্ডিচারির মাদার। অবশ্য সেকথা অনেক পরে।

আজ গুরুপূর্ণিমার দিন সকালে বাবা নানা উপদেশ দিলেন। এক নাগাড়ে সব বলবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলতো, সঙ্গীত সাধনায় মানুষের দুর্বলতা কিসে হয়, যার জন্য সঙ্গীত রসাতলে যায়?' কি উত্তর দেব, চুপ করে রইলাম। কিছু বলাও বিপদ। বাবা বললেন, 'তুমি তো বিরাট পণ্ডিত। আমি তো লেখাপড়া করিনি। আমার মনে হয়, যে কোন সাধনাতে চারটে দুর্বলতা প্রায় দেখা যায়। নারী, শরাব, অর্থ আর আত্মপ্রচার প্রবণতা। এই চারটে দুর্বলতা বেশীরভাগ প্রতিভাধর সাধককে, সাধনায় পথভ্রষ্ট করে। এই চারটে দুর্বলতা হতে যে দূরে থাকবে, সেই অমৃতের সন্ধান পেতে পারে, এই কথাটি সারাজীবন মনে রাখবে। যতই কাজ থাক, সাধনা ঘড়ি ধরে নিয়ম করে করতে হবে। সাধনা না করলে হাতে মরচে পড়ে যাবে। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে। যারা সত্যকারের সাধক, তাদের বরাবরই আড়ালে থাকতে হবে। সর্বদা শয়নে স্বপনে সঙ্গীতের চিন্তা করতে হবে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে লোকেদের সঙ্গে দিল্লাগি করলে সঙ্গীত হবে না। তার জন্যই বলেছি খোসমেজাজ থেকে, আড়ালে থেকে নিরন্তর সাধনা করবে। ঠিকমত সাধনা করলে তবে যন্ত্র কথা বলবে। যেজন্য সব ছেড়ে এখানে এসেছ, তা পূর্ণ হোক খুদার কাছে প্রার্থনা করি। ঠিক আছে এখন যাও, রাত্রে বাজনা শুনব।' নিজের ঘরে এসে, বাবার কথাগুলো মনে আলোড়নের সৃষ্টি করল। রাত্রে বললেন, 'বাজাও তো দেশ মল্লার।' বাজালাম। বাবা চুপ করে আলাপ, জোড় এবং ঠোক ঝোলা শুনবার পর, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি ভয়ে সারা। বাবা বললেন, 'এমন বাজাতে হবে যাতে চোখে জল আসে। তাহলে বুঝবে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছ।' এরপর বাবা হঠাৎ বললেন, 'এতদিন তো শিখলে, বলতো কোন জিনিষ শিখবার জন্য তোমার মন চায়? কি জিনিষ মনে হয় এখনও বুঝতে পারছ না?' বাবার কথা শুনে মনে হোল, এ হোল বাবার পরীক্ষা। মনে মনে তো অনেক জিনিষ শিখবার জন্য মন চায়, কিন্তু বাবাকে বলতে সাহস হয় না। আমি চুপ করে আছি দেখে বাবা আবার বললেন, 'কি হোল? কিছু বলছ না কেন? আমার কসম সত্যি করে বলো কি জিনিষ তুমি শিখতে চাও?' বাবার কথা শুনে বুঝলাম আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করছেন। এ পরীক্ষা নয়। হাতজোড় করে বাবাকে বললাম, 'যদি অনুমতি করেন তাহলে মনের কথা বলি।' এ কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বললেন, 'জরুর জরুর, নিশ্চয়ই সত্য করে বলো।' জানি না বাবা কি ভাবে কথাটা নেবেন। হাতজোড় করে বললাম, 'কিছু কঠিন বন্দিশের গৎ

এবং কঠিন তালে কিছু গৎ।' আমার কথা শুনে বাবা হেসে বললেন, 'আরে-আরে-আরে, তবলা বাদককে বিপাকে ফেলবার জন্য কঠিন বন্দিস এবং তাল শিখতে চাইছ? ঠিক আছে আমি খুশী হয়েছি তোমার কথা শুনে। কোন কিছু জানার লোভ থাকা ভাল। লোভ না থাকলে লাভ হয় না। লোভ তিন প্রকারে। প্রথম লোভ ভালো, কেননা লোভ না থাকলে সঙ্গীত কি করে শিখবে? তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লোভ ভাল নয়। দ্বিতীয় লোভ যারা করে, তাদের মনোবৃত্তি অন্যের ক্ষতি হোক এবং নিজের লাভ হোক। কিন্তু তৃতীয় লোভ অতি ঘৃণ্য। তৃতীয় লোভের বশবর্তী যারা, তারা কামনা করে নিজের লাভ হোক বা না হোক, অন্যের ক্ষতি যেন হয়। এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের লোভী অনেক দেখতে পাবে। প্রথম লোভ ভালো, তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লোভ কখনও করবে না। আজীবন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের লোভী অনেক দেখে অবাক হয়েছি। বাইরের এবং ভেতরের খোলসে কত প্রভেদ, মনকে সর্বদা সচ্চা রাখবে।

সঙ্গীতের প্রধান লক্ষ্যটা সর্বদা মনে রেখো। সঙ্গীত মনোরঞ্জন এবং মহফিলবাজির জন্য নয়। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ভক্তি, সুতরাং রাজনীতির পেছনে না চলে সত্যের আদর্শের পথে চলতে হবে। সঙ্গীত সৌন্দর্য, সুরুচি, আত্মসম্মান এবং মনুষ্যত্বের বিসর্জন দেওয়া নয়। কিন্তু আজকালকার যুগে যেহেতু সংগীতের দ্বারাই ভরণ পোষণ করতে হবে সুতরাং জলসাতে বাজাতেও হবে। জলসাতে বাজাতে গেলে, কোন তবলাবাদক তোমার উপর যাতে চড়ে না বাজাতেও পারে, তার জন্য এবারে সেই সব ব্রহ্মবাণ শেখাব। রামায়ণ, মহাভারত তো পড়েছ। বালি, রাবণ, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধনদের মত বীরদের কি করে বধ করতে হয়। প্রথম প্রথম যখন বাজাবে, বড় তবলাবাদকরা তোমাকে ছোট ভেবে, দুমদাম বাজাতেই থাকবে। কঠিন বন্দিস শেখার আগে, গৎ শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন বাণ মারতে হবে যে প্রথমেই ধুরন্ধর তবলাবাদকরা উঠান ওঠাতেই চিন্তায় পড়বে। গৎ শুনেই বাদক বুঝবে তুমি ছোট ছেলে নও। এরপর সাথসঙ্গতে কি ভাবে লড়ন্ত করবে সেটা শিখতে হবে। তারপর কঠিন বন্দিশের সম দেখিয়ে দিলেও, ঠেকা লাগাতে তবলা বাদকের কালঘাম ছুটে যাবে। তারপর নানা তালে এবং অর্দ্ধমাত্রার তালে গৎ শিখতে হবে। তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। তবে একটা কথা স্মরণ রেখো, বিনয়ী তবলাবাদকের সঙ্গে কখনও এ ধরনের জিনিষ বাজাবে না। সভার মাঝে কাউকে ছোট করবে না। তবে, যদি অভিমানী তবলাবাদক তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, তাহলে এই সব ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করবে। সঙ্গে সঙ্গে তবলাবাদক রাস্তায় এসে যাবে। এই কথা বলে সাতই জুলাই থেকে চৌঠা আগষ্ট পর্যন্ত বাবা আমাকে যে শিক্ষা দিলেন, আমার কাছে মনে হোল কোটি টাকার সম্পত্তি পেলাম। কথায় আছে অনেস্টি নেভার কাম টু লস। অর্থাৎ সততার পুরস্কার একদিন না একদিন পাবেই। মনে হোল, মৈহারে আসা সার্থক হোল এতদিন পর। মনে পড়লো বিবেকানন্দর বাণী। জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটা কথা মনে হল, মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কষ্ট না করলে কিছু পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দ বাণীর কয়েকটা কথা নিজের মনে মনে বলি—লাইফ ইজ এ সরো ওভার কাম ইট, লাইফ ইজ এ ট্রাজডি ফেস ইট, লাইফ ইজ এ ডিউটি পারফরম ইট, লাইফ ইজ এ সং

সিং ইট, লাইফ ইজ এ প্রমিস, ফুলফিল ইট, লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল ফাইট ইট; লাইফ ইজ এ গোল এচিভ ইট। বিবেকানন্দের বাণীর কিছু অংশ মনে করে ভাবলাম, এতদিনে সততার পুরস্কার আমি পেলাম। যেমন করেই হোক বাবার কাছে শিক্ষা করতেই হবে। নইলে লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? প্রায় একমাস শেখবার পর একদিন বাবা বললেন, 'আগেকার উস্তাদরা নিজের ছেলেকেও পুরো বিদ্যা শেখাতো না। যদি ছেলে বা ছাত্র অভিমানবশতঃ গুরুকেই টেক্কা দেবার চেষ্টা করে, সেই সময় গুরুরা সেই না শেখানো বিদ্যা বাজিয়ে, ছেলে বা ছাত্রকে জব্দ করতো। এই সব গুরুকে সেই জন্য 'মিরাশি' বলা হ'তো। আল্লার কসম নিয়ে বলছি, আমার কখনও তা মনে হয় নি, কেননা আমার সব জিনিষ দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে কেউই শিখতে পারেনি। অন্ততঃ আজ যদি আমার নাতি, ছেলে বা তোমাদের সঙ্গে বাজাতে না পারতাম, তাহলে আমার চেয়ে কেউ বেশী সুখী হ'তো না, কেননা শিষ্য এবং পুত্রের কাছে পরাজয় কাম্য। খুদার কাছে প্রার্থনা করি, জগতে সবচেয়ে বড় হও, কিন্তু কখনও অহংকার করবে না। সর্বদা মনে রাখবে, তোমার উপরে একজন উপরওয়ালা আছে, যার কাছে তুমি তার একটি চুলের সমান নও। বাবা, আমি মিরাশি নই। যে নিতে পারবে তাকে উজাড় করে দেবো। দিতে তো চাই কিন্তু বাবা তোমরা হজম করতে পারো না। উগলিয়ে বমি করে দাও।' একনাগাড়ে বাবা কথাগুলো বললেন এবং আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলাম। বাবা এবারে কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে অন্য প্রসঙ্গে যে অমূল্য উপদেশগুলি দিলেন সে কথাগুলি সঙ্গীতের মতই মূল্যবান। বাবা বললেন, 'আজকাল প্রায় দেখতে পাই, ছোট থেকে কত গুনীজনদের কাছে শিখল, কিন্তু নাম কা বাস্তে একজন নামকরা উস্তাদের কাছে গণ্ডা বেঁধে জাতে উঠতে চায়। সেই বড় উস্তাদেরই কেবল নাম করে। যাদের কাছে প্রথমে শিখেছে তাদের নাম পর্যন্ত করে না। যাদের নাম করতে লজ্জাবোধ করে, সেই সব গায়ক বাদককে কাফের বলে। এরকম কাফের চারদিকে দেখতে পাবে। যদি কারো কাছে সামান্যও শিক্ষা পাও, শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম স্মরণ করবে এবং লোকের কাছে তার নাম বলতে সঙ্কোচ করবে না। ভগবান সকলকে সব কিছুই দেন এবং পরীক্ষা করেন। অহংকার হলেই ভগবান কেড়ে নেন। তাইতো বলি, 'দিয়ে ধন বুঝি মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ। আজকাল এও দেখি গুরুর উপর টেক্কা দিতে চায় ছাত্ররা। গুরু হল সাক্ষাৎ ভগবান। আমি যে সময় রামপুরে ছিলাম, এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাকে গুরু সম্বন্ধে দুটো কথা বলেছিলেন। আমি তো লেখাপড়া করিনি, কিন্তু কোন ভাল জিনিষ শুনলে কিংবা সঙ্গীতের কোন জিনিষ কারো কাছে শিখলে, আমি তা ভুলি না। সেই হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরু সম্বন্ধে একটা ছড়া বলতেন।

'গুরুর কথা যে শোনে না কানে
প্রাণটা যাবে তার হেঁচকা টানে
গুরুছেড়ে যে গোবিন্দ ভজে
সে জন নরকে মজে
গুরু নাম সত্য
যে জানে মাহাত্ম্য।'

এ ছাড়া বলেছিলেন 'গুরু' শব্দের অর্থ। গ কারের অর্থ সিদ্ধিদাতা, রে-কারের অর্থ পাপনাশক, আর উকারের অর্থ শম্ভু। সব মিলিয়ে গুরু মানে অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা পাপনাশক শম্ভু। তার মানে গুরু সিদ্ধিদান করতে পারেন, পাপ বিনাশ করবার ক্ষমতা রাখেন এবং মঙ্গল করেন।' এই কথা বলে দুই হাত জোড় করে বাবা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'বাবা আমি তো সে গুরু হতে পারিনি। সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে যা ক্ষুদকুঁড়ো আমি সংগ্রহ করেছি তাই আমি দিতে পারি। একটা কথা সর্বদা মনে রেখো। সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য, একমাত্র প্রেম সৃষ্টি করাই হল আসল কাজ। না হলেই সে একা, সে অসুখী। পরিবেশ ছাড়া সঙ্গীত হয় না। বাজাতে না পারলে তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।' এই কথা বলতে বলতে বাবার গলার স্বর ভারি হয়ে গেল। চোখটা দেখে মনে হলো ছলছল করছে।

এ এক আলাদা বাবা। আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত। গুরুর উপর এই ধরনের ছড়া তো এ যাবৎ কখনও শুনিনি এবং কোন বইতেও পড়িনি। গুরুর বুৎপত্তি যদিও আমার জানা ছিল, কিন্তু বাবার কাছে এই নূতন বুৎপত্তি শুনে আমি মুগ্ধ। বাবাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে এলাম।

বাবার কাছে একমাস যে অমূল্য শিক্ষা পেলাম সেই কথা আগেই লিখেছি, কিন্তু এই একমাস শিক্ষার মধ্যে কিছু বিশেষ ঘটনার কথা বলা দরকার। দিল্লী থেকে আসা অবধি রবিশঙ্করের কোন চিঠি পাইনি। রবিশঙ্করের প্রতি এতদিন যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, দুই তিনবার আমার মন বিষণ্ণ হয়েছে তার ব্যবহারে, কিন্তু আমার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও যেহেতু অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী, সেইজন্য সহজ ভাবে সব কিছু সহ্য করেছি। কিন্তু এবারে দিল্লী গিয়ে দেখলাম, মানুষের বাইরে এবং ভিতরে কত তফাৎ থাকতে পারে, তা আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। বিশেষ করে রবিশঙ্করের ক্ষেত্রে। মনটা কি জানি এবার ঘৃণায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে, যতই অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকি না কেন। আমাকে যদি তিনি বাবার মেজাজ না বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে আমি মৈহারে থাকতে পারতাম না। এ ছাড়া তার কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছি। গুরুর জন্য আমি সব কিছুই ছাড়তে পারি, কিন্তু গুরুকে ছাড়ব কি করে? তারপরে সেই গুরুকে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে আমি মরে গেলেও ক্ষমা করতে পারব না। এই কারণেই রবিশঙ্করের প্রতি আমার মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছে। বাবা এসে যাবার প্রায় একমাস পর রবিশঙ্করের চিঠি পেলাম। রবিশঙ্কর চতুর। আমি মৈহারে আসার পর কোন চিঠি দিইনি, তার জন্য কোন অভিযোগ নেই। কেবল লিখেছে, 'যেহেতু আমার আঙ্গুলে ফ্রাক্‌চার হয়ে গিয়েছিল তার জন্য তোমাকে কোন চিঠি দিতে পারিনি।' বুঝলাম সব খবরই সে রাখে। বাবা যে এসে গেছেন তা তার অজানা নয়। ইতিমধ্যে আলি আকবর জানিয়েছে, যে কোলকাতায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে শুরু করেছে। সংস্থার নাম দিয়েছে 'আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক'। এ সংবাদ শুনে একদিকে যেমন আনন্দ হোল অপরদিকে বিস্মিত হলাম। আনন্দের কারণ কোলকাতার ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। আর বিস্মিত হবার কারণ, বাবার নামে কলেজ না খুলে নিজের আত্মপ্রচারের জন্য নিজের নামে স্কুল করেছে। অথচ বাবার ভাইয়ের শ্যালক আলিআহমেদ, বাবার নামে

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ খুলেছে। বাবা তার জন্য খুশীও হয়েছেন। এ ছাড়া দেশে বাবার নামে একটা সংগীত সংস্থা খুলেছে। অথচ আলি আকবর নিজের নামে কলেজ খুলেছে শুনে বিস্মিত এবং দুঃখিত হলাম।

আজ সনৎ এবং তার মা মৈহারে এল। বাবার মেজাজ কখন যে কেমন থাকে বোঝা ভার। বাবার ধর্মমেয়ে সনতের মা, প্রণাম করতে গেলে, এই প্রথম প্রণাম করতে দিলেন না। বললেন, 'সকলের জন্য প্রণাম করবার জন্য এ পা নয়।' বাবার কথা শুনে তো আমি অবাক। বাবা তার ধর্মমেয়ের সঙ্গে কখনও এ ব্যবহার করেন না। সনতের মা বাবাকে বললেন, "সনৎ স্কুলের সঙ্গীত বিভাগে চাকরি পেয়েছে।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'স্কুলে ঢুকে ভালই করেছে, নইলে এই বাজনা বাজালে কেউ ভিক্ষাও দেবে না।' বুঝলাম বাবার মেজাজ খুবই খারাপ। আশিসের সব খবর শুনে বাবা বিচলিত হয়েছেন। তাছাড়া রবিশঙ্করের কোন চিঠি না পেয়ে আরও মনে মনে চটেছেন। রবিশঙ্করের আঙ্গুলে ফ্রাকচার হয়েছে বলতে পারতাম, কিন্তু বাবা তাতে আরও চটে যেতেন কারণ সে আমাকে লিখেছে, অথচ বাবাকে লেখেনি। সেইজন্য আশিসকে চিঠি দিলাম এবং বাবাকে চিঠি লিখতে বললাম। রবিশঙ্কর যেন বাবাকে চিঠি দেয় সে কথাও লিখলাম।

আজ গভর্নর সাহেবের কাছ থেকে খবর এল, খবরের কাগজে অধ্যাপকদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, যারা দরখাস্ত করেছে তাদের মনোনীত করতে হবে রেওয়াতে গিয়ে। দিন নির্ধারিত হয়েছে সাতই আগষ্ট। শিক্ষক মনোনয়নের জন্য বাবা আমাকেও যেতে বললেন। বাবা আমাকে সরোদ নিয়ে যেতে বললেন। বাবার এই কথা শুনে আমি অবাক। কেন আমাকে সরোদ নিয়ে যেতে বলছেন। ভেবেছিলাম শিক্ষক মনোনয়নের জন্য কিছু লিখতে হবে বলে বাবা আমাকে হয়তো যেতে বলছেন। কিন্তু সরোদ নিয়ে যেতে কেন বলেছেন এ আমার বোধগম্যের বাইরে। অবাক হলাম যাত্রাকালীন যখন দেখলাম, বাবা নিজের সরোদ এবং বেহালা নিয়ে যাচ্ছেন। রেওয়া যাবার পর শিক্ষামন্ত্রী মাথুর সাহেব বললেন, 'শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিয়ে যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাকেই নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের একটা নিয়ম আছে। পরীক্ষক হিসাবে তিনজনের থাকা আবশ্যক। দুজনের মতে যে উপযুক্ত বিবেচিত হবে, নির্বাচন তাকেই করা হবে। বাবা বললেন, 'নিয়ম রক্ষার জন্য, আমার সেক্রেটারি এবং আপনি নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে থাকবেন।' অবশ্য বাবার কথাই শিরোধার্য। পরীক্ষা নেওয়া হল। কিন্তু বাবা সকলের বাজনা শুনে বললেন, 'শেখাবার উপযুক্ত এরা কেউ নয়। সুতরাং কাগজে আবার এডভারটাইজ করতে হবে। তবে গানের জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষককে আগেই ঠিক করেছি। গানের শিক্ষক হলেন, আমার স্বরোদের গুরু আহমদ আলির ভাগনে সলামৎ খাঁ।' মাথুর সাহেব বললেন, 'গভর্ণর সাহেব বিকেলে আপনাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন।' বাবা রাজী হলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'সরোদের জন্য একে নিযুক্ত করবো।' গভর্ণর সাহেবের সামনে এর বাজনার ইনটারভিউ হবে। কারণ এর বাজনার ইন্টারভিউ আমি ছাড়া আর কে নেবে? কেননা আমার কাছে এ দীর্ঘদিন শিখেছে।' বাবা মাথুর সাহেবকে বললেন, 'স্থানীয় কলেজের একজন তবলা বাদককে বাজাবার জন্য ঠিক করুন।' এ

কথা শুনে মাথুর সাহেব খুশী হয়ে বললেন, 'এ তো উত্তম প্রস্তাব। আপনি যখন বলছেন, তখন সরোদের শিক্ষকের জন্য আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারিকেই নিযুক্ত করা হবে। এই বাজনা শোনাটা হবে আমাদের উপরি লাভ।' এই কথা শুনে আমার মাথায় বাজ পড়লো। বাবা এ কি কথা বলছেন? গভর্ণর সাহেবের সামনে বিশিষ্ট অতিথি থাকবেন। তাদের সামনে বাবা আমার ইন্টারভিউ নেবেন। ভয়ে আমার অবস্থা সঙ্গীন। তখন কি জানতাম, বাবা মনে মনে কি ঠিক করে রেখেছিলেন? সেই সময় কোলকাতা থেকে শিক্ষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় রেওয়ার মহারাজের কাছে, কিছু গবেষণার কাজে তার লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাবাকে চিনতেন। বাবা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এতদিন নামই শোনা ছিল, কিন্তু বিদ্বান হয়েও তার অমায়িক ব্যবহার এবং সাধারণ বেশভূষা দেখে মুগ্ধ হলাম। সন্ধ্যার সময় বাবা এবং মাথুর সাহেবের সঙ্গে গভর্ণর হাউসে গেলাম। একটি ঘরে সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। বাবা গভর্ণর সাহেবকে আদাব জানিয়ে বললেন, 'আজ শিক্ষকদের পরীক্ষা নিয়ে কোন শিক্ষকই উপযুক্ত মনে হয় নি। গানের জন্য একজন শিক্ষক আমি ঠিক করেছি।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'সরোদের জন্য একে ঠিক করেছি। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি কেমন বাজায় তার বিচার আপনারা করুন।' এই কথা বলে বাবা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'কাশীর ব্রাহ্মণ, এম.এ., ল. এবং জজিয়তি পাস। এছাড়া দীর্ঘদিন আমার কাছে শিখেছে। এর ইন্টারভিউ আমি ছাড়া আর কে নেবে? ইচ্ছা করলে যা লেখাপড়া করেছে, তাতে আপনাদের মতই আজ আপনাদের স্থানে বসত।' এ কথা বলে যেমন বলে থাকেন, আমাকে পৈতে দেখাতে বললেন। আমি মৈহারে এযাবৎ অনেকবার যা করেছি তাই করলাম। জামার ভিতর থেকে পৈতে বার করে দেখালাম। বাবার কথা শুনে আমি হতভম্ব। বাবা একি বললেন। এম.এ., ল, জজিয়তি। এ ছাড়া, এই বিদ্যায় ইচ্ছা করলে গভর্ণর হতে পারতাম। লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম। গভর্ণর সাহেব কিন্তু কিছুই বললেন না। তারপর বাবা নিজের সরোদ বার করে বললেন, 'আমি যা বাজাব, আপনারা দেখুন ঠিক সেইরকম কিভাবে আমার সেক্রেটারি বাজায়।' তবলা বাদককে তবলা মেলাতে বললেন। তবলাবাদক, বাবাকে দেখেই বুঝলাম ভয় পেয়েছে। তবলা মেলাতে পারছে না। বাবা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, 'এখন বর্ষা, সেইজন্য দেশ মল্লার বাজাব। বর্ষাকালীন রাগের ভাব বুঝিয়ে বাবা শুরু করলেন। বাড়ীতে যেভাবে শেখান সেভাবে বাবা বাজাতে লাগলেন। আমিও বাবার বাজাবার পরই বাজালাম। আলাপ জোড় শেষ হবার পর গৎ শুরু হল। কিছুক্ষণ বাজাবার পরই, তবলাবাদক ভয়ে ঠেকা ছাড়া আর কিছুই বাজাতে পারছে না দেখে, বাবা তবলা বাদককে বললেন, 'বেটা কিছু মনে কোরো না। আমি তবলা বাজাই।' বাবা তবলা নিয়ে আমার সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। বাবা কিছুক্ষণ বাজাবার পর বললেন, 'এযাবৎ আমি সঙ্গত করেছি। এবারে আপনারা দেখুন, আমি তবলাতে যা বাজাব সেই জিনিষের জবাব আমার সেক্রেটারি দেবে।' এই কথা বলেই বাবা বোল পরণের বোল বাজিয়ে বললেন, 'জবাব দাও।' এ শিক্ষা ছিল বলেই ভয়ে ভয়ে বাজালাম। এবারে বাবা তবলাবাদককে তবলা দিয়ে বাজাতে বললেন। দ্রুত গৎ বাবার সঙ্গে বাজালাম এবং তবলাবাদক ঠেকা লাগাতে লাগল। ঝালা বাজাবার একটু পরেই

বাবার তার ছিঁড়ে গেল। বাবা তার লাগাবার সময় আমাকে বাজাতে বললেন। আমার সেইসময় কি হল, তারপরণের কাজ দ্রুত বাজাতে লাগলাম। বাবা তার পরিয়ে আবার বাজাতে লাগলেন। বাজনা শেষ হলে, সকলেই আমার খুব তারিফ করলেন। এরপর বাবা একক বেহালা বাজালেন। সকলেই প্রশংসা করলেন। সরোদের শিক্ষক হিসাবে আমাকে মনোনীত করা হল। এবারে বাবা বললেন, 'কেবল সেতার, বেহালা এবং তবলার শিক্ষকদের জন্য আবেদন করার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।' মাথুর সাহেব বললেন, 'আপনার কথামতই কাজ হবে।' এরপরই চা এবং জলযোগের ব্যবস্থা হল। চা পানের সময়, এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলেন, সাতনার সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ বলে। উপাধি যোশী। উপাধি শুনেই বুঝলাম কেননা যোশীজীকে বাবাই প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করেছিলেন। এই যোশীজী বাবাকে একবার সাতনায় বাজাবার জন্য ডেকেছিলেন। বাবার কাছে এ কথা আগে শুনেছিলাম। যোশীজী আমাকে বললেন, 'আপনার নাম তো কখনও শুনি নি। আপনি এত ভাল বাজান জানা ছিলো না। কেন সব জায়গায় বাজান না।' উত্তরে বললাম, 'উপস্থিত বাবার কাছে শিখছি। বাইরে বাজাবার অনুমতি পাইনি। এই প্রথম জনতার সামনে বাজালাম।' যোশীজীর সঙ্গে আরো কিছু কথার আদান প্রদান হল এবং আমাকে সাতনায় বাজাবার জন্য অনুরোধ করলেন। এক কথায় নাকচ করে দিলাম বাবার অনুমতি নেই বলে, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম তাহলে ভালই বাজাই। কথায় কথায় তিনি বললেন, যে সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা সমালোচনা লেখেন। যোশীজীর সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা বলছিলাম। বাবা দুইতিনবার আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমাদের কথোপকথন বাবা শুনতে পেলেন না। বাবার সঙ্গে জনতার সামনে এই প্রথম গভর্ণর হাউসে বাজালাম। এই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয়। এবারে মৈহারে ফেরার পালা। মাথুর সাহেব গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলেন। গাড়ীতে চড়ে মৈহারে আসছি। বাবা একটা চুরুট ধরিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'তোমার বাজনা শুনে সকলেই তারিফ করছিলো। ভেবো না খুব ভাল বাজিয়েছ। তোমাকে সরোদের শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্যই, এত প্রশংসা করেছি। এখন অনেক শিক্ষা করতে হবে। যারা প্রশংসা করছিলো, তারা সঙ্গীতের মহামূর্খ।' বাবার কথা শুনে আমার হাসি পেল, কেননা বাবা মুখ খুললেই বুঝতে পারি বাবা কি বলতে চাইছেন। বাবার কথা শুনে বললাম, 'এতদিনে এটা বুঝেছি এখন অনেক শিখতে হবে।' বাবা আমাকে সরোদ সহ কেন নিয়ে এসেছিলেন, এতক্ষণে বুঝতে পেরে অবাক হলাম। রাত্রে মৈহার ফিরলাম। খেতে বসবার আগে মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেডা এই প্রথম বাজাল। কিরকম বাজিয়েছে?' মার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে আমি তো বুড়া হয়েছি। ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে বাজিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু তোমার বেডা তো আমার উপরে চড়ে বাজিয়ে গেল।' বুঝলাম বাবা কেন এ কথা বললেন। আসলে বাবার তার ছেঁড়ার পর, আমাকে বাজাতে বলায়, তারপরণের কাজ খুব দ্রুত বাজিয়েছিলাম বলেই, বাবা বললেন, 'আমার উপরে চড়ে বাজিয়ে গেল।' বাবার এই কথাশুনে, বাবার পা ধরে বললাম, 'আমি বাজাব আপনার সঙ্গে? আপনি শিক্ষকের নিযুক্তির জন্য আমাকে বাজাবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তো জানি আমি কি বাজাই।' আমার এ কথা শুনে বাবা খুশীই হলেন। বললেন, 'ঠিক,

খুব মন দিয়ে সাধনা করো তাহলে বাজাতে পারবে।' আমি আর কোন কথা না বলে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম। মনটা খুশীতে ভরপুর। বাবার সঙ্গে এই প্রথম বাজালাম। এ দিন কখনও ভুলব না।

কয়েকদিন পর শিক্ষামন্ত্রী মাথুর সাহেব ডেকে পাঠালেন বাবাকে। বাবার সঙ্গে আমিও সাতনা গেলাম। বাবাকে বললেন, 'ব্যাণ্ড এবং রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের খরচা কত টাকা বার্ষিক বরাদ্দ করা উচিৎ।' আমি বললাম, 'ব্যাণ্ডে বাবা পান মাত্র সাড়ে তিন শত টাকা। এটাকে পাঁচশত টাকা করতে এবং কলেজের জন্য মাসিক একহাজার টাকা করতে হবে। বাবার সহকারী সঙ্গীত শিক্ষকদের বেতন আটশো টাকা করতে হবে। ব্যাণ্ডের ছেলেরা মাইনে পায় মাথাপিছু পঁচিশ টাকা। তাদের মধ্যে সকলে জীবন ভোর এই করে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাদের সর্বনিম্ন দেড়শত টাকা করা উচিত। এ ছাড়া যে ছাত্ররা শিখবে তাদের মাসিক একশত টাকা বৃত্তি দিতে হবে।' বাবা চুপ করে আমার কথা শুনছিলেন। আমার কথা শুনে মাথুর সাহেব বললেন, 'প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত।' হঠাৎ বাবা বললেন, 'না, না, এত কেন?' বাবা আমার প্রস্তাব এক কথায় বানচাল করে দিলেন। যেহেতু জীবনভোর মৈহারের রাজার কাছে মাসিক সাড়ে তিনশত টাকা পেয়েছেন, সেইজন্য ব্যাণ্ডের ছেলেরা মাসিক দেড়শত টাকা করে বেতন পাবে, এটা বাবার কাছে ছিল অকল্পনীয়। এ ছাড়া সঙ্গীতের অধ্যাপকরা সকলেই বাবার কাছে শিখবে সুতরাং তাদের অত মাইনের কি দরকার? বাবার কথা শুনে বাংলায় বাবাকে বললাম, 'জীবনে মহারাজ কৃপণতা করে আপনাকে কিছু দেননি। এ ছাড়া আপনি বলেছিলেন, ভাতখণ্ডে কলেজের প্রফেসরদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, মৈহারের শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে। সেখানে শিক্ষকরা কত মাইনে পান জানি না, কিন্তু যে টাকাটার প্রস্তাব আমি দিয়েছি সেটা কিছুই নয়; সুতরাং আপনি কিছু কম করবেন না।' কে কার কথা শোনে। বাবা আমার কথা শুনে মাথুর সাহেবকে বললেন, 'বিন্ধ্য প্রদেশ সরকার গরীব। ছাত্রদের কেন এক শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে? ছাত্রদের থাকবার জন্য ব্যাণ্ডের বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং তাদের মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি দিলেই যথেষ্ট। সঙ্গীত শিক্ষকদের বেতন, একশত টাকা থেকে শুরু করে, জীবনের শেষে দুইশত টাকা করলে যথেষ্ট। সলামৎ খাঁ এবং আমার সেক্রেটারি সরোদ শিক্ষক হিসাবে একশো আশি টাকা প্রথমেই পাবে। পরে দুইশত টাকা হবে। ব্যাণ্ডের ছেলেদের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিলেই যথেষ্ট। রইল আমার কথা। আমাকে ব্যাণ্ডের জন্য একশত বেশী দিলেই যথেষ্ট। এছাড়া কলেজের জন্য তিনশত টাকা দিলেই আমার জন্য যথেষ্ট।' বাবার কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি মাথুর সাহেবকে রাজি করিয়েছিলাম, বাবা ব্যাণ্ড এবং কলেজ মিলিয়ে প্রথমেই পনেরোশো টাকা পাবেন। মাষ্টাররা পাবে তিনশত টাকা থেকে আটশত টাকায় গ্রেড। ছাত্ররা দেড়শত টাকা এবং ব্যাণ্ডের ছেলেরা পাবে সর্বনিম্ন দেড়শো টাকা। কিন্তু বাবার এ কি মতিভ্রম হল। কুমিল্লা থেকে বাবা নিজের বিষয়ে যে টাকার কথা বলেছিলেন সেটাও কমিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! অল্প টাকাতেই বাবা সন্তুষ্ট যেহেতু বাবা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, সুতরাং মাথুর সাহেব বাবার কথাই মঞ্জুর করলেন। বাবার উপর

কথা বলার সাহস মাথুর সাহেবেরও ছিলো না। এ ছাড়া বাবা নিজেই যখন বলছেন, মাথুর সাহেবের কোন গরজ পড়েছে টাকা বাড়াবার? সব ঠিক হয়ে গেল। আমি চুপ করে গেলাম। আমর মাথা গরম হয়ে গেল। এবার আমাদের মৈহার ফিরবার পালা। মাথুর সাহেবের সামনে যেহেতু বাবা বলেছেন, সেইজন্য কিছু বলতে পারিনি। ফিরবার পথে রাগ সামলাতে না পেরে, হাত জোড় করে বেশ জোরেই বললাম, 'বাবা বেয়াদপি ক্ষমা করবেন। জীবনভোর মহারাজ আপনাকে নামমাত্র টাকা দিয়েছেন। আপনার জন্যই আমার এই সব করা, নইলে বিশেষ করে আমি, রাজকীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি নেবার জন্য মৈহারে আসিনি। আমি ব্যাণ্ডের ছেলেদের, ছাত্রদের, শিক্ষক এবং আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। মাথুর সাহেব রাজীও হয়েছিলেন। আমি যে টাকার কথা বলেছিলাম তা অতি সামান্য, অথচ আপনি সব নাকচ করে দিলেন। ঠিক আছে, রাজকীয় বিদ্যালয় শুরু করিয়ে দিয়েই আমি মৈহার ছেড়ে চলে যাব।' বাবা আমার কথা শুনে চটে উঠলেন। বললেন, 'ব্যাণ্ডের ছেলেদের পঁচিশ টাকা মাইনে থেকে দেড়শো টাকা করে দিলে তারা বিগড়ে যাবে। এ ছাড়া কলেজ তো তোমার জন্যই করলাম। আর তুমি বলছ মৈহার ছেড়ে চলে যাবে। তুমি গেলে কে এই সব সামলাবে?' বাবার কথা শুনে বললাম, 'বাবা, কলেজের প্রতি আমার কোন মোহ নেই। চাকরি করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল আপনার জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলাম। যাতে আপনি মাসিক পনেরোশো টাকা পান।' বাবা বোধ হয় আমার কাছে এ ধরনের জোর গলার প্রতিবাদ আশা করেন নি। এর ফাঁকে বাবা চুপ করে চুরুট বের করে খেতে লাগলেন। আমিও নির্বাক হয়ে গুম হয়ে বসে রইলাম। মৈহারে ফিরে এলাম। পরের দিন সাতনা থেকে ডি. সি. এলেন। ডি. সি. বাবাকে বললেন, 'ছাত্রদের জন্য সেতার, স্বরোদ, ভায়োলীন, তবলা এবং তানপুরা কোথা থেকে কেনা হবে?' উত্তরে বাবা বললেন, 'যন্ত্র কিনবার জন্য কোলকাতায় যেতে হবে। কোলকাতা ছাড়া ভাল যন্ত্র কোথাও পাওয়া যাবে না। ডি. সি. বাবাকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি দয়া করে কোলকাতায় গিয়ে বাজনা কিনে আনুন।' এতক্ষণ সব চুপচাপ শুনছিলাম। আর নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। ডি.সি.কে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। বাবার বয়স হয়েছে। বাবার সঙ্গে সরকারি পদস্থ একজনকে সঙ্গে যেতে হবে। বাবা কি এই বৃদ্ধ বয়সে দোকান দোকান গিয়ে যন্ত্র কিনবেন? বাবার সঙ্গে যাওয়া আসার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে বাবাকে দিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া বাবার টি.এ. এবং ডি.এ. সমেত যন্ত্রের দাম সব দিতে হবে। উপরন্তু যন্ত্র নিয়ে বাবা যখন সাতনা ফিরবেন, সেই সময় সাতনায় যেন গাড়ীর ব্যবস্থা থাকে। সব যন্ত্র নিয়ে, একজন লোককে দিয়ে বাবাকে মৈহারে পৌঁছে দিতে হবে।' আমার কথায় ডি.সি. বললেন, 'নিশ্চয়ই এ সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।' আমার কথা শুনে বাবার মুখ দেখে মনে হোল খুশী হয়েছেন। এরপর একজন সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারকে নিয়ে বাবা কোলকাতায় যাত্রা করলেন। প্রায় দশদিন পর সব যন্ত্র কিনে ফিরলেন। সাতনাতে ডি.সি. একটি বড় গাড়ীর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে, স্টেশনের কাছে একটি বাড়ী বিদ্যালয়ের জন্য ঠিক হল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, সেতার, ভায়োলিন, তবলা শিক্ষাদানের

জন্য লেকচারার পদের প্রার্থীদের আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। কলেজের বাবা হবেন প্রিন্সিপাল এবং আমি হব ভাইস প্রিন্সিপাল।

ইতিমধ্যে হাথরসের, সঙ্গীত মাসিক পত্রিকা এসে পৌঁছল। বাড়ী আসতে আসতে পাতা উলটিয়ে দেখলাম, গভর্নর হাউসের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমার বিষয়ে বড় হেডলাইন দিয়ে প্রশংসা বেরিয়েছে। বারবার পড়লাম। বাড়ীতে এসে বাবাকে সঙ্গীত মাসিক পত্রিকা দিলাম। বাবা সঙ্গীত ম্যাগাজিনটা পড়েছেন। খাবার সময় আমাকে বললেন, 'সঙ্গীত পত্রিকাতে তো তোমার বিষয়ে খুব প্রশংসা লিখেছে। কি ছাতার বাজিয়েছ যে এত প্রশংসা করে লিখেছে।' প্রতি বার সঙ্গীত পত্রিকা পড়ে, বাবা আমাকে পড়বার জন্য দিতেন। কিন্তু এবারে আমাকে পড়তে দিলেন না। জীবনে এই প্রথম, আমার বিষয়ে এত প্রশংসা করে জলসার সমগ্র ঘটনাটা এক পাতা লিখেছে, সুতরাং আমার আবার পড়বার আগ্রহ হল। বাবা ব্যাণ্ডে চলে যাবার পর, বাবার ঘরে গিয়ে পত্রিকাটা দেখতে পেলাম না। ব্যাপারটা কি হল আমার বোধগম্য হল না। কোন ম্যাগাজিন কিংবা চিঠি এলেই, বাবার টেবিলে থাকত। বাবার টেবিলে সবই আছে, কিন্তু ম্যাগাজিনটা কোথাও পেলাম না। অবাক হলাম। বুঝলাম বাবা কোথাও রেখে দিয়েছেন। পাছে পড়ে আমার অহংকার হয়, সেইজন্য বোধহয় এই ব্যবস্থা। তিন চারদিন হয়ে গেল, কিন্তু এই প্রথম আমাকে ম্যাগাজিনটা দিলেন না। অগত্যা আমি লল্লাকে হাথরসে লিখলাম, একটা ম্যাগাজিন আমাকে পাঠিয়ে দিতে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার নামে একটি পত্রিকা চলে এলো। আমি নিজের কাছে সেটি রেখে দিলাম।

কাশী থেকে একটা চিঠি এল। চিঠি পড়ে বুঝলাম, মায়ের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে। কয়েক দিনের জন্য আমাকে যেতে বলেছে। বাবাকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম। বললাম, 'যে হেতু কাশীতে কেউ নেই সেইজন্য আমাকে কয়েকদিনের জন্য কাশী যেতে হবে।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'তোমার জন্যই কলেজ, আর এই সময়ে তুমি কাশী যাবে। কাশীতে যেতে চাও, কেননা সেখানে গেলে কলেজে এক হাজার টাকা মাইনে পাবে?' বাবা ভেবেছেন, বোধ হয় মিথ্যা করে মায়ের অসুখের নাম করে চিঠি এসেছে। বাবাকে বললাম, 'কলেজ আপনার জন্যই করেছি। আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয় শিক্ষকতা করা। আমার জীবনের মনোবাঞ্ছা অন্য। মায়ের অসুখের জন্য কাশী যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই চলে আসব।' বাবা শান্ত হলেন। আমি কাশী চলে যাব শুনে, বুঝলাম বাবা মনে মনে চিন্তিত হয়েছেন। কিছুদিন পরেই শিক্ষকদের আবেদন এলেই শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। উপস্থিত কলেজের জন্য সাতনা এবং রেওয়া থেকে চিঠি আসছে। হঠাৎ বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

পরের দিন ডি.সি.র চিঠি এবং শিপ্রা ব্যানার্জির টেলিগ্রাম এল। ডি.সি. জানিয়েছেন, কলেজের জন্য সাতনা থেকে লোক পাঠাচ্ছে। বিদ্যালয়ের ভবনটি চুনকাম করাতে হবে। এ ছাড়া জানতে চেয়েছেন প্রিন্সিপাল এবং ভাইস প্রিন্সিপালের ঘরের জন্য কয়টি চেয়ার, টেবিল সাইনবোর্ড ইত্যাদি কি লাগবে দয়া করে জানাতে। বাবাকে চিঠি পড়ে শোনালাম। বাবা বললেন, 'এ সবের আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর?' বাবার কথা শুনে বললাম, 'আপনি চিন্তা করবেন না, যা লিখবার আমি লিখে দেব।' বাবা বললেন, 'এই সময়ে

এত কাজ, অথচ তুমি কাশীতে যাবে। কি করে সব হবে? মা যখন অসুস্থ সুতরাং যেতেই হবে। এই সব ব্যবস্থা করে কাশীতে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।' শিপ্রা ব্যানার্জির টেলিগ্রাম শুনে বাবার মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললেন, 'উপস্থিত নানা কাজে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর এই সময়ে শিখতে আসছে।' দুপুরে আসছে, সুতরাং বাবা বুদ্ধাকে বললেন, 'স্টেশনে গিয়ে শিপ্রাকে নিয়ে এসো।' বাবার মেজাজ গরম। রাগটা অকারণ জুবেদা বেগমের উপর পড়ল। মা রান্না করছেন এবং জুবেদা বেগমকে ঘরে চুপ করে বসে থাকতে দেখেই, বাবা রেগে আমাকে বললেন, 'দেখ দারোগার ঝি, মাখন ঘি খেয়ে কেবল মোটা হচ্ছে, কামচোর। আর এই বুড়ো বয়সে তোমার মা সারাদিন কাজ করছে। তোমার মার সঙ্গে এই ব্যবহার বৌমা কেন করে?' আমি কিছু বলবার আগেই, এ যাবৎ যা কখনও হয়নি তাই হোল। জুবেদা বেগম, যে বাবার সামনে দেড় হাত ঘোমটা দিয়ে চুপ করে থাকে, তার আজ এ কি হল? কি করে এত সাহস হল? হঠাৎ বাবার কথা শুনে জুবেদা বেগম বলল, 'দেখিয়ে কাজ করা আমি জানি না।' এই কথা বলেই জুবেদা বেগম চুপ করে গেল।

এ কথার কি অর্থ হয়? তার মনে, মা বাবাকে দেখিয়ে কাজ করেন। বাবা এক মিনিটের জন্য চুপ করে থেকেই বললেন, 'কি বলল? এত বড় কথা।' আমাকে বললেন, 'এখনি আলি আকবরকে টেলিগ্রাম করে দাও, যেন টেলি পেয়েই মৈহারে এসে নিজের বৌকে এখান থেকে নিয়ে যায়।' বাবাকে অনেক যুক্তি দিয়েই নিরস্ত করলাম। মা বাবাকে বললেন, 'বাইরে থেকে শিপ্রা আসছে। তোমার মাথা গরম, এ সব কি কর?' বুঝলাম শিপ্রার কথা ভেবেই বাবা নিজের রাগ দমন করলেন। এরপর শিপ্রা ব্যানার্জির কপালে দুঃখ আছে। ঠিক খাবার সময়েই শিপ্রা এল। এ যাবৎ আমার সামনে দুবার শিপ্রা এসেছে শিখতে। বাবাকে প্রতিবারই কন্যার মত আপ্যায়ন করতে দেখেছি। কিন্তু এবারে হল ব্যতিক্রম। শিপ্রা এসে প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম বাবা বলছেন, 'আরে আরে, দীর্ঘদিন খেটে কুমিল্লা থেকে ফিরেছি। এ ছাড়া এখন মৈহারে সঙ্গীতের বিদ্যালয় খুলছে। খবর দিয়ে তো আসবে? আমি যদি না থাকতাম তাহলে কি করতে।' উত্তরে শিপ্রা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আপনি মৈহারে এসেছেন, খবর পেয়েই এসেছি।' বাবা বললেন, 'তাড়াতাড়ি স্নান করে বিশ্রাম করো।' আমি আমার ঘরে চুপ করে বই পড়তে লাগলাম। খাবারের ডাক এলো, বাবা এবং আমি খেতে বসলাম। খেয়েই নিজের ঘরে চলে এলাম। শিপ্রা, মা এবং জুবেদা বেগমের সঙ্গেই খাবে। ইতিমধ্যে ডি.সি.কে চিঠি দিলাম। বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে লিখলাম, 'আপনার চিঠি পেয়ে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আপনাকে জানাতে বলেছেন চেয়ার, টেবিল, সাইনবোর্ড ইত্যাদি এ সব আপনাদেরই করতে হবে। বিদ্যালয়ের ক্লার্ক পাঠাতে হবে। শিক্ষা দেওয়া তাঁর কাজ। বিদ্যালয় ভবনের চুনকাম হয়ে গেলেই এই সব ব্যবস্থা করতে হবে।' চিঠি লিখে ফেলে এলাম। চিঠি ফেলে বাড়ীতে আসতেই বাবা বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' বাবা জানেন চিঠি ফেলতে রোজ যেমন যাই সেরকম গেছি, তবুও বাবার পরীক্ষা। বাবাকে চিঠির বিষয় সবিস্তারে বললাম। বাবা শুনে বললেন, 'ঠিক করেছ। এ সব কাজ কি আমাদের? তুমি যদি কাশী চলে যেতে তাহলে কি হ'তো। যাই হোক কাশী তো তোমাকে যেতেই হবে।

পুজোর সময় কাশী গিয়ে আনন্দ করে এসো। আট দিন পরেই তো পুজো। সেই সময় যেয়ো। যাও এখন বিশ্রাম করো।' বাবার কথা শুনে নিজের ঘরে চলে এলাম। সন্ধ্যার সময় শিপ্রা শিখতে গেল। নিজের ঘর থেকে শুনতে পেলাম, বাবা শিপ্রাকে বলছেন, 'আগের বার বিশ্রী রাগ শ্রী শিখেছিলে। বাজাও তো দেখি। শ্রী রাগ কত কঠিন। কি করে এই রাগ বাজাও বুঝি না। শ্রীরাগের কোমল রে-এর শ্রুতি অত্যন্ত কঠিন। বহুদিন শিক্ষা করলে এই শ্রুতি বোঝা যায়। তবেই রাগের শ্রী ফুটে ওঠে।' যাই হোক দুই দিন থেকে তৃতীয় দিনে শিপ্রা চলে গেল দেরাদুন। রাত্রে মা যথারীতি বাবাকে ম্যাসাজ করতে গেলেন। নিজের ঘর থেকে শুনলাম, মা বাবাকে বলছেন, 'তোমার বেডা এত কাজ করে তাকে শেখাবার সময় পাও না, অথচ মাইয়া এলে তো শেখাতে পারো।' মার কথা শুনে আমি অবাক। বাবাকে বলতে শুনলাম 'কি করব? এত দূর থেকে এসেছে তাই বাধ্য হয়ে শেখাতে হল। তোমার বেডাকে সব শিখিয়েছি। এখন তার সাধনা দরকার। সাধনা করলেই সব হবে।'

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। আজ রাত্রের ট্রেনে কাশী যাব। সকালেই ডি.সি.র চিঠি পেলাম। ডি.সি. বাবাকে লিখেছেন, আমাকে একবার সাতনায় যেতে। আমার সঙ্গে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করবে। ডি.সি.কে লিখে দিলাম, 'আমি আজ রাত্রে কয়েকদিনের জন্য বেনারস যাচ্ছি, কারণ আমার মায়ের শরীর খারাপ। কাশী থেকে এসে দেখা করব।'

ছয় বছর পূর্ণ হয়ে গেল মৈহারে এসেছি। এ যাবৎ কয়বার কাশীতে গিয়েছি বাবা বরাবর কাশী যাবার সময় বলেছেন, সরোদ নিয়ে যাচ্ছ নাকি? বাবার কথায় বুঝেছি এটা হল পরীক্ষা। ইচ্ছা থাকলেও বিনা সরোদে কাশী গিয়েছি। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম হল। সকালে নাস্তার পর বাবা বললেন, 'এবারে সরোদ নিয়ে কাশীতে যাও। তোমার শুভার্থী সকলের সামনে গিয়ে বাজাও। কবিরাজ আশু নাতির বাড়ীতে বাজাবে। তোমার গুল্লুজী, মহন্তজী এবং আত্মীয় স্বজনদের সামনে, ঘরোয়া আসরেও আশু নাতির সঙ্গে বাজাবে। সকলকে জিজ্ঞাসা করবে কি রকম বাজালে?' এ কি আমি ভুল শুনছি? এও কি বাবার পরীক্ষা। বললাম, 'এখন আমি কি বাজাব।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে না না, এবারে যন্ত্র নিয়ে গিয়ে সকলকে শোনাও। এই প্রথম সকলের সামনে কাশীতে বাজাবে। সারা জীবন একটা কথা মনে রাখবে। উপরওয়ালার স্বভাব, ছোটকে বড় করেন এবং পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয় সেই সার্থক, নইলেই পতন। সব সময় যখন বাইরে বাজাবে তোমাকে উপরে বসতে দেবে এবং শ্রোতারা নীচে বসে শুনবে। যখন উপরে আসনে বসে বাজাবে, সেই সময় অভিমান না করে ভাববে, ভগবনের কৃপায় নিমিত্তমাত্র হয়ে শ্রেষ্ঠ লোকের সামনে বসার সুযোগ পেয়েছো। শ্রোতার এবং বাদকের সামঞ্জস্য হলেই শ্রেষ্ঠ ভাবনার উৎপত্তি হবে। যেহেতু শ্রোতারা নিচে বসে তোমার বাজনা শুনছে, তার মানে এ নয় যে তুমি বিরাট একটা কিছু। তোমাকে উপরে বসান হয়েছে, তার কারণ তুমি মা সরস্বতীর পূজা করছ বলে। যে দিন তোমার মনে হবে তুমি খুব ভাল বাজিয়েছ এবং সাফল্য অর্জন করেছ, সেইদিন বুঝবে তোমার অধঃপতন শুরু হল। সাধনা করলে বুঝতে পারবে

নিজের দোষ। সর্বদাই মনে হবে যা বাজাতে চাইছিলে তা বাজাতে পারলাম না। সঙ্গীত এমনই জিনিষ যাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি আসে না। সর্বদাই মনে হয় যা চেয়েছিলাম তা বাজাতে পারলাম না। সত্যিকারের বাদক হলে সর্বদাই এই মনোভাব থাকবে। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখবে, ব্যর্থতার যন্ত্রণার চেয়ে সাফল্যের যন্ত্রণা হাজারো গুণ কষ্টদায়ক।' বাবা বলছেন, ইতিমধ্যে মা এসে কল্কে লাগিয়ে পুরনো কল্কেটি নিয়ে গেলেন। বাবা কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, 'দেখ সকলেই গান বাজনা করে, কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীত কি বলো তো।' বাবার প্রশ্নে আমি কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে থাকাই ভালো। আমি কিছু বললাম না দেখ বাবা নিজেই বললেন, 'বলতে পারলে না তো প্রকৃত সঙ্গীত কি? একজন গয়লা যে সঙ্গীতের 'স' জানে না, সে যদি তোমার বাজনা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে, তার দুচোখ বেয়ে যদি ঝরে পড়ে জলের ধারা তাহলে সেই হল আসল ভাবের অশ্রু। অথচ মহাপণ্ডিত সঙ্গীতের সুর, লয়, রাগ, রাগভেদ, সব জানে, বাজাতে হয় বলে বাজিয়ে যাচ্ছে এবং নিখুঁত নিয়মের কোন ত্রুটি নেই—তা সত্ত্বেও সে বাজনা অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছে না। আসলে অন্তরের সুর যখন বেরোবে যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা গায়কের গলায়, তখনই কান্না ফল্গুধারার মত ঝরে পড়বে। সেই হল প্রকৃত সঙ্গীত। ভব সাগরে ডুব দিলেই তবে এর মাহাত্ম বোঝা যায়।' এ কথা যে কত সত্য, যারা অনুভব করেছেন, তারাই বুঝবেন, এর ভিতর গভীর সত্য লুকান আছে। একনাগাড়ে বাবা যে কথাগুলি বলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম। বাবার এই কথাগুলো আমার কাছে মন্ত্রের মত, এবং আজও সেকথা ভুলিনি। যাক, এবারে বুঝলাম যে তিনি সত্য সত্যই সরোদ নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। মনে আনন্দ হল। যাক এতদিনে বাবা অনুমতি দিয়েছেন। মৈহারে ছাত্রদের মধ্যে দেখেছি মনোমালিন্য চলছে। সকলকে রিয়াজ করতে বললাম। এর পরে রাত্রে কাশী যাত্রা করলাম। কাশীতে পৌঁছে দেখলাম আমার মা চোখের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলাম। তিনদিন চোখে ওষুধ দেওয়ার পর মার চোখের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হল। দেখতে দেখতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমী কোথা দিয়ে যে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। কাশীতে এসে অন্য জগৎ মনে হোল। মৈহার ও কাশীর মধ্যে আসমান জমিনের তফাৎ মনে হোল। মৈহারে নানা অসুবিধা হলেও, মনে হয় যেন সঙ্গীতের তীর্থক্ষেত্র।

কবিরাজ আশুতোষের বাড়ীতে আমার বাজনা হল। মৈহার বাজাতে যাবার আগে, বাজাতে ভয় হ'তো না। কিন্তু আজ প্রথম, মনে বাবার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যদি খারাপ বাজাই তাহলে বাবার বদনাম হবে। যদি ভাল বাজাই তাহলে বাবার সুনাম হবে। শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, গুল্লুজী, জামশেদপুরের সঙ্গীত শিক্ষক নুটু চ্যাটার্জি, আমার ছাত্র রাজেশ, সেজদার এক শালিকা এবং দুই ভায়রাভাই। এ ছাড়া কবিরাজ আশুতোষের বাড়ীর লোকেরা। হঠাৎ দেখি দ্যুতিকিশোর এসে উপস্থিত। কয়েকদিনের জন্য কাশীতে এসেছে এবং আমার সঙ্গেই মৈহারে ফিরে যাবে। বাজনা শুনে সকলেই খুশী হল। আমার দাদার বড় ভায়রাভাই রাণীগঞ্জের ডাক্তার, খুশী হয়ে আমাকে তিরিশ টাকা দিলেন। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমী

ছিলেন। বহু বাজনা শুনেছেন তিনি। অবশ্য প্রশংসায় আমি মোটেই অভিভূত হলাম না, কেননা বাবার কাছে বারবার শুনেছি, প্রশংসা এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বার করে দেবে। পরের দিন দ্যুতি আমার বাড়ী এসে একটা বই দিলো পড়বার জন্য। বললো বইটি খুব ভালো। দ্যুতি বরাবরই মৈহার থেকে কাশী গেলে একটা গল্পের বই আমার জন্য নিয়ে আসত। এবারে দ্যুতি যে বইটা দিলো, দেখলাম বেশ মোটা বই। বইটার নাম সাহেব বিবি গোলাম। লেখক বিমল মিত্র। লেখকের নামটা নূতন মনে হল আমার কাছে। এ যাবৎ বহু লেখকের বই পড়েছি কিন্তু এই লেখকের বই তো আগে পড়িনি। মোটা বই দেখে মনে হোল কয়েকদিনের খোরাক পেলাম। সকালে আমার পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার মায়ের চোখের যন্ত্রণা একটু কম আছে। ডাক্তার বলল, ঠিক হতে কয়েকদিন লাগবে। মাকে একটা চশমা নিতে হবে। রাত্রে, সাহেব বিবি গোলাম পড়তে শুরু করলাম। বইটা চুম্বকের মতো আমায় টানতে লাগল। এ ধরনের বই তো কখনও পড়িনি। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে বইটা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সকালে খাবার এবং স্নান করেই বইটা পড়তে শুরু করলাম। সকলের সঙ্গে দেখা করবার ছিলো, কিন্তু কোথাও গেলাম না। বইটা পড়তে লাগলাম। মৈহারে দিবানিদ্রার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। খাওয়ার পর বইটা পড়তে পড়তে কখন শুয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম থেকে উঠেই সন্ধ্যার মধ্যে বইটা শেষ করলাম। বইটা পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ হলাম। তখন কি জানতাম, এই বইটির লেখক বিমল মিত্রের সঙ্গে, কাশীতে সত্তর দশকের এক সংবর্দ্ধনা সভায় আকস্মিক আলাপ হয়ে যাবে? সেই আলাপ আত্মীয় থেকেও বড় হয়ে উঠবে এবং পরেও থাকবে। তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। যেহেতু বিমল মিত্র সঙ্গীতবোদ্ধা সেইজন্য আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও ধীরে ধীরে গভীর হয়ে উঠল। এর কৃতিত্ব কিন্তু বাবারই। যদি বাবার কাছে সঙ্গীত না শিখতাম তাহলে বোধহয় কখনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'তো না। দেখতে দেখতে দশ দিন কেটে গেল কাশীতে। মৈহারে যাবার পর কাশীতে কখনও এত দীর্ঘ দিন থাকি নি। মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে মৈহার যাত্রা করলাম। দ্যুতিকিশোরও আমার সঙ্গে মৈহার গেল। মৈহারে গিয়ে বুঝলাম, বাবার মেজাজ খারাপ কেননা আমার অবর্তমানে অনেক কাজ জমে রয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে বাবাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সব ব্যবস্থা করলাম। পরের দিনই প্রার্থী হয়ে বহু শিক্ষক এসেছিল। বাবা, মাথুর সাহেব এবং আমি প্রার্থীদের বিচারক হলাম। বিচারে সিলোন নিবাসী ডেভিডকে সেতারে এবং কিছুদিন পরে ভায়োলিনে রবীন ঘোষকে নিযুক্ত করা হল। এছাড়া তবলায়, এলাহাবাদের একজনকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হল। ভায়োলীনে তিনচার জন ছাড়া একটি বাঙ্গালী এসেছিল প্রার্থী হিসাবে কোলকাতা থেকে। তাকে বাবা চিনতেন। মোটামুটি বাজায়। কিন্তু বাবা শুনেছিলেন সে মদ্য পান করে সেইজন্য তাকে নাকচ করা হল। রবীন ঘোষ কোলকাতায় বাবার সঙ্গে কোন প্রকারে যোগাযোগ করেছিল। বাবা রবীন ঘোষকে দরখাস্ত করতে বলেছিলেন। সিলোন নিবাসি পেরেরা নামে একটি ছেলেও এসেছিল বাবার কাছে সরোদ শিখবে বলে। বাবা এককথায় নাকচ করে দিলেন, যেহেতু বয়স হয়ে গেছে

এবং সময়ের অভাব। পেরেরা ছেলেটিকে দেখে মায়া হল। বাবাকে বললাম, 'ছেলেটি, সুদূর সিলোন থেকে সরকারি বৃত্তি পেয়ে সরোদ শিখতে এসেছে অনেক আশা নিয়ে। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে আপনার নাম করে আলি আকবরকে লিখে দিলে, তার কলেজে নিখরচায় ভর্তি করে নেবে।' বাবা বললেন, 'যা ভাল বোঝ তাই করো।' পেরেরা ছেলেটিকে দেখলাম বাইরে করুণ মুখে বসে আছে। আলি আকবরকে পেরেরার পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি লিখলাম, যাতে নিখরচায় তার কলেজে ভর্তি করে শিক্ষা দেয়। পেরেরাকে চিঠি দিয়ে বললাম, 'এই চিঠিটা কোলকাতায় গিয়ে আলি আকবরকে দিলেই তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' পেরেরা চলে গেল কোলকাতায়। কিছুদিন পরে পেরেরার চিঠিতে জানতে পারলাম, বিনা বেতনে আলি আকবর নিজের কলেজে তাকে ভর্তি করে নিয়েছে। এই চিঠি পেয়ে আলি আকবরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। কিন্তু তখন কি জানতাম, সেই পেরেরা দীর্ঘদিন পরে আলি আকবরের জামাই হবে?

ডেভিড যখন শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেল, তখন বললাম, 'সব বাজনা ছেড়ে এখন বাবার কাছে সেতার শেখ। বাবার কাছে সরোদ কিংবা বেহালা, তবলা শিক্ষার কথা বোলো না। আমার কাছে সরোদ শিখো।' আমি এত নম্র ও ভাল ছাত্র আর পাইনি। মাথা খুবই ভাল। স্মরণশক্তি প্রশংসনীয়।

রবীন ঘোষ এবং তবলা বাদককে বললাম, বিদ্যালয় খুলবার আগে তাদের ডাকা হবে। ওদের বেতন নির্দ্ধারিত হল মাসিক একশো টাকা থেকে দুইশত টাকা পর্যন্ত। উপস্থিত একশত টাকা পাবে। কলেজ শুরু হতে তখনও দেরী, তাই নির্বাচিত রবীন ঘোষ এবং তবলাবাদক মৈহার থেকে কোলকাতা এবং এলাহাবাদে চলে গেল। সলামত খাঁ এবং আমার জন্য একশো আশী টাকা নির্দ্ধারিত হল। সলামত খাঁও কোলকাতায় চলে গেলেন। ডেভিডকে নিয়মিত শিক্ষা দিতে লাগলাম। এবারে বাবার মেজাজ ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমার কাজ বেড়ে গেল। সাতনায় গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিদ্যলয়ের জন্য চেয়ার, সাইন বোর্ড, ফটো এবং নানা জিনিষের ব্যবস্থার জন্য লিষ্ট করে দিলাম। শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধে এখন মাঝে মাঝেই সাতনা এবং রেওয়া যাওয়া শুরু হল। আমার রিয়াজের ঘর, বাবা খুব ভাল করে আবার সারিয়ে দিলেন। এবার বাবার একটি সঙ্গীতের অনুষ্ঠান দিল্লীতে চোদ্দই নভেম্বর ঠিক হল। বাবা সেই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এগারোই নভেম্বর মৈহার থেকে রওনা হবেন এবং দিল্লীর অনুষ্ঠানের শেষে আশিসকে নিয়ে মৈহার ফিরবেন। যথাসময়ে বাবা দিল্লী গেলেন। কেন জানি না, জুবেদা বেগম উপস্থিত আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, কারণ আশিসকে এপেনডিক্স অপারেশনের পর দেখে এসেছি। উপরন্তু বাবা তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য যখন বলেছিলেন সেই সময় বাবাকে বুঝিয়ে মত পরিবর্তন করিয়েছি, এর জন্যই হয়ত আমার প্রতি সদয় হয়েছেন।

দিল্লীর অনুষ্ঠান শেষ করে বাবা আশিসকে নিয়ে মৈহারে এলেন। মৈহারে প্রায় আটমাস পরে আশিস এল। আশিসের চেহারা ভাল হয়েছে এবং একটু লম্বাও হয়েছে। এর কয়েকদিন পর আলি আকবর মৈহারে এলো। মৈহারের সব সমাচার আলি আকবরকে

বললাম। তিন দিন থাকবার পর মাকে দুই শত টাকা দিয়ে বলল, 'বম্বে যাবার পর আরও টাকা পাঠাবো।' আমি অবাক হলাম। আলি আকবরকে বললাম, 'দেশে বাবা কত কষ্ট করে এসেছেন। এতদিন কোন জায়গায় বাজাননি, সুতরাং কম করেও পাঁচশো টাকা দিয়ে যান। বাবা একটা টাকাও নেবেন না। বলবেন, বৌমাকে দিতে। পাঁচশো টাকা দিয়েছেন শুনলে বাবা খুশী হবেন। কিন্তু দুশো টাকা দিয়েছেন শুনলে বাবা চটবেন।' উত্তরে আলি আকবর বলল, 'বিশ্বাস করো, উপস্থিত আমার কাছে নাগপুরে যাবার মত টাকা আছে। নাগপুরে গিয়ে বাজাবার পর টাকা পাব, টাকা থাকলে নিশ্চয় পাঁচশত দিয়ে যেতাম।' এ কথা শোনার পর আর কথা বলা চলে না। আলি আকবরের সঙ্গে ষ্টেশন গেলাম। ব্যাণ্ডের গুলগুলজী ছাড়া কয়েকজন গেছে স্টেশনে দেখা করবার জন্য। সকলের সঙ্গেই আলি আকবর কথা বলছে। গাড়ী ছাড়বার মুহুর্তে, আলি আকবরের পকেট থেকে মানি ব্যাগটা নিয়ে একটা চোর দৌড় লাগাল। গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। আলি আকবর বলল, 'ষ্টেশন মাষ্টারকে বলো, নাগপুরের টিকিট নম্বরটা নাগপুরের ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে দিতে কারণ আমার টিকিট এবং ব্যাগ চুরি গেছে। ব্যাগে এক হাজার টাকা ছিল।' যে মুহূর্তে আলি আকবর বলেছে টাকা ও টিকিট চুরি গেছে, সে কথা শুনে সকলে দৌড়েছে চোরকে ধরবার জন্য। চোর ধরা পড়ল। ষ্টেশন মাষ্টার নাগপুরে জানিয়ে দিল, যাতে আলি আকবরের কাছে টিকিট নেই বলে ফাইন না করে। চোরটিকে জেলে দেওয়া হল। চোরের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করতে হবে। এরজন্য উকিলকে টাকা দিতে হবে। বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে বললাম, বাবা বললেন, 'আমি কেন টাকা দেবো?' বাবাকে বুঝিয়ে বললাম, 'কেস হয়ে যাবার পর টাকা পেলেই আপনাকে টাকা দিয়ে দেবো। এই কেসের জন্য আলি আকবরকেও আসতে হবে।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে তোমাকে টাকা দিচ্ছি, টাকা ফেরৎ পেলে আমার টাকা দিয়ে দেবে।' সম্মতি জানিয়ে উকিলকে টাকা দিলাম। আশ্চর্য হলাম আলি আকবরের কথা ভেবে। আমাকে বলেছিল যে নাগপুর যাবার মত টাকা অছে, অথচ প্রায় হাজার টাকা ছিল। যাক যথাসময়ে কোর্টে কেস উঠবার আগে আলি আকবরকে জানালাম। আলি আকবর এল। টাকা পাওয়া গেল। বাবার কাছে যে টাকা নিয়েছিলাম বাবাকে দিয়ে দিলাম। বাবা টাকা পেয়ে খুশী। আলি আকবর বলল, 'এই টাকা পাবার জন্য, আমার আসা যাওয়া বাবদ বেশী খরচা হয়ে গেল।' উত্তরে বললাম, 'মিথ্যা কথা বলার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল।' দুদিন থাকবার পর আলি আকবর বম্বে চলে গেল। আলি আকবরের থাকাকালিন বাবার মেজাজ খুব ভাল দেখলাম। কিন্তু যে মুহুর্তে সে চলে গেল, বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

ডিসেম্বরের প্রথমেই কলেজ খুলে গেল। শিক্ষা এবং নিজের রিয়াজ মাথায় উঠল। রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদঘাটনের দিনে শিক্ষামন্ত্রী এলেন। বাবা শিক্ষক এবং ছাত্রদের সামনে বললেন, 'একটা প্রাণ দিলে তবে একটা প্রাণের সঞ্চার হয়। বার্দ্ধক্য যদি না থাকত, তবে একশো বছর বাজাবার পর সঙ্গীত হয়ত কিছুটা হত। শিক্ষার শেষ নেই। যারা শিক্ষা দেবে, বা যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাদের দু'জনের মধ্যেই একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে তবেই দুই পক্ষের ভালো হয়। আর যেখানে লেনদেনের সম্পর্ক থাকে, যেখানে বাণিজ্যের

গন্ধ থাকে, সেটার পরিণাম সর্বনাশ ডেকে আনে। বিলাসিতা হল সঙ্গীতের শত্রু। সেটা যেমন ছাত্রদের জন্য সেই রকম শিক্ষকদের জন্যও প্রযোজ্য। সংসারে বেঁচে থাকবার জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। তার জন্য সাধারণভাবে জীবনযাপন করাই ভালো। বিলাসিতার মধ্যে গেলেই টাকার বেশী প্রয়োজন। এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বাণিজ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এর ফলে প্রকৃত সঙ্গীত অনেক দূরে চলে যায়। সেই সময় যে সংগীত থাকে সেটা হল ভড়ং। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না। সঙ্গীত হল ভগবানের আরাধনা করা। আরাধনা করার জন্য ভড়ং এবং বিলাসিতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আজকাল সঙ্গীতের সাধক না হয়ে, সঙ্গীতের প্রদর্শন বাতিক হয়ে পড়ছে। এর ফলে সঙ্গীত নিম্নগামী হচ্ছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের বললাম। এখন তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।' বাবার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে শুনছিল। বাবার কথা শেষ হবার পরেই, শিক্ষামন্ত্রী মাথুর সাহেব বাবার হাত ধরে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'বাবা, আপনার মতো সাধকের সংস্পর্শে এসে ছেলেরা নিশ্চয়ই সঙ্গীতের রাস্তা খুঁজে পাবে।' বাবা যেমন বলেন সেই কথাই বললেন, 'আমি তো কিছুই জীবনে করতে পারলাম না। উপস্থিত যদি তোমাদের মত বয়স পেতাম, তাহলে রিয়াজ করতাম। কিন্তু আর কি করব, এখন তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি।'

কলেজের কাজ পুরো দমে চলছে। বাবা এবারে দেশ থেকে আসার পর নাতিদের নিয়ে সিনেমা যান না। দিল্লিতে আশিস সিনেমা দেখতে পায়নি। আশিস এসে অবধি প্রায়ই আমাকে বলছে, 'দাদু আজকাল আর একদিনও সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছেন না। কতদিন সিনেমা দেখিনি।' আশিসকে বললাম, 'বাবা ব্যাণ্ড এবং কলেজ গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান। সেইজন্য সিনেমায় নিয়ে যান না।' আশিসের সিনেমা দেখার কৌতূহল শুনে মনে হল, এ সংসারে যা সহজে পাওয়া যায় না, তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, যেখানে অসংখ্য বিধিনিষেধ, তাদের সবার প্রতি মানুষের সহজাত আগ্রহ থাকে। যেখানে বিধি নিষেধ, যেখানে রহস্য, সেখানেই তো মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

উপস্থিত বাবার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। মৈহারে প্রথমে আসার পর, কয়েক বছর নাতিদের সঙ্গে নিজের বিছানায় বসিয়ে, রেডিও শুনতে শুনতে কতই না রসিকতা করতে দেখেছি। নাতিরাও খুব সহজ সরল ভাবে হাসত, কথা বলত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ছয়বছরের শেষে নাতিদের সঙ্গে বাবার একটু দূরত্বের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। নাতিরাও আগের মত তাদের দাদুর সঙ্গে হাসতে বা কথা বলতে ভয় পায়। বিশেষ করে আশিস এবং ধ্যানেশ বাবার কাছে ঠিক আলি আকবরের মতোই মাথা নীচু করে থাকে, প্রয়োজন হলে শিক্ষার সময় হাঁ কিংবা না বলেই কথা সারে।

বাবার কথা লিখতে বসে কত কথাই মনে আসছে। উনিশশো পঞ্চান্নর শেষ এবং উনিশশো ছাপ্পান্নর প্রথমটা বাবার জন্য বিধাতা যেন বেঢপেই তৈরি করেছিলেন। বছরের শেষে এবং আগামী বছরের প্রথমে দুটো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল।

চব্বিশে ডিসেম্বর, বাড়ীতে যেন বজ্রাঘাত হোল। মায়ের সঙ্গে জানিনা কি কারণে জুবেদা

বেগম ঝগড়াই করতে লাগলেন। আমি আওয়াজ শুনে, ঘরের বাইরে আসতেই দেখি, বাবাও আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছেন নিজের ঘর থেকে। জুবেদা বেগম জোর গলায় মাকে কিছু বলেছেন। বাবা কিছুদিন থেকে চটে ছিলেন। আজ মায়ের উপর চোটপাট দেখেই বাবা রাগে ফেটে পড়লেন। আমি নির্বাক। আমাকে দেখেই বাবা বললেন, 'এই মুহূর্তে আলি আকবরকে টেলি করে দাও। তার কাছে সকলকে পাঠিয়ে দাও। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি এতদিন। ছেলের জীবন নষ্ট করে এখানে এসেছিল, আবার এখানেও অশান্তি।' হাতজোড় করে বাবাকে বললাম, 'আলি আকবর উপস্থিত কোথায় আছে কে জানে? কি করে যাবে তাহলে?' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'রবুর কাছে টেলি করে এদের দিল্লীতে পাঠিয়ে দাও। রবু সময় করে এদের আলি আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেবে।' বাবার এ মূর্তি খুব কমই দেখেছি। নাতিদের কথা ভেবে মা বললেন, 'এটা কি কর?' জুবেদা বেগমের মুখে কথা নেই। গুম হয়ে রয়েছে। বাবা বললেন, 'দারোগার ঝির দেমাক দেখ।' বাবাকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু বাবা আমার উপরও রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বাবা বললেন, 'তুমি যদি এদের পাঠাতে আর বারণ কর, তাহলে তোমাকেও তাড়িয়ে দেব।' এই কথা বলেই ঘরে গেলেন। মুহুর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে টাকা দিয়ে বললেন, 'টেলি করে এসো। আজ রাত্রে ওদের নিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। এলাহাবাদ থেকে দ্যুতি ওদের নিয়ে দিল্লী পর্যন্ত দিয়ে আসবে।' বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি জুবেদা বেগম জিনিষ গোছাতে আরম্ভ করেছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'বাবার কাছে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এ কথা কেন ভুলছেন ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।' আমার কথা শুনে জুবেদা বেগম বললেন, 'আজকেই ছেলেদের নিয়ে আমি চলে যাব।' এ এক বিষম পরিস্থিতি। বাধ্য হয়ে রবিশঙ্করকে টেলিগ্রাম করতে গেলাম। শেষ পর্যন্ত, সন্ধ্যার ট্রেনে দ্যুতি, জুবেদা বেগম, আশিস, ধ্যানেশ, প্রাণেশ, অমরেশ, বেবীকে নিয়ে যাত্রা করলাম। পরের দিন সকালে এলাহাবাদে পৌঁছলাম। সুপ্রভাত পালের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। প্রাত্যহিক কর্ম সেরে দিল্লী কালকা মেলে উঠিয়ে দিয়েই আমি মৈহার ফিরে এলাম। মৈহারে এসে দেখি বাবার গলা বসে গেছে। বুঝলাম নাতিদের কথা ভেবে কেঁদেছেন। মায়ের অবস্থা আরো খারাপ। নাতিদের ছেড়ে কি করে থাকবেন? কি একটা অঘটন ঘটে গেল। নিজের ঘরে এসে দেখলাম আমার সঞ্চয়িতা, রামকৃষ্ণকথামৃত, ওমর খৈয়াম কোনটাই নেই। অবাক হলাম। বুঝলাম জুবেদা বেগম নিয়ে গিয়েছে। সে ছাড়া আর কে নিতে পারে? হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। এই বইগুলো আমার কাছে অমূল্য। কেননা যে সময় আমার মন খারাপ হ'তো, এই বইগুলো পড়লেই আমার দুঃখ কষ্ট অনেকটা ভুলে যেতাম। মনে পড়ে গেল, আশিস একদিন এসে বলেছিল, তার মা সঞ্চয়িতা বইটা চাইছে পড়বার জন্য। এ কথা শুনে আশিসকে বলেছিলাম, তার মাকে গিয়ে বলতে সঞ্চয়িতা বুঝবার বিদ্যা তার নেই। পরে আশিস এসে আমাকে বলেছিল, 'আপনার কথা শুনে মা খুব রেগে গিয়েছে এবং বলেছে যে আপনি নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করেন।' সরল আশিস দূতের কাজ করেছিল। কতদিন আগের কথা। সেই জন্যই এই প্রতিশোধ। যাক যে দিন দেখা যাবে জিজ্ঞাসা করব, কোন সাহসে আমাকে না বলে বইগুলো

নিয়ে গিয়েছে? অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোলকাতায় প্রথম দর্শনেই। কিন্তু সেতো অনেক পরের কথা। সে কথা যথাস্থানে বলব। মৈহারে এসে আলি আকবরকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম। বিস্তারিত সব জানিয়ে চিঠিও লিখলাম। তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। বাড়ীটা যেন খালি মনে হচ্ছে। বাবা এবং মায়ের মুখে কোন কথা নেই। বুঝতে পারছি, কি মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন। চতুর্থ দিনে, দ্যুতি সকালে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে বলল, 'দিল্লীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।' বাবা কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। দ্যুতি আমার কাছে এসে বলল, 'রবিশঙ্কর সব সংবাদ শোনার পর, আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশীর পণ্ডিতের কি খবর?' রবিশঙ্করের এ মন্তব্য সোজা না বাঁকা, বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাসা না তিরস্কার বুঝলাম না।

বছরের শেষ দিনে কোলকাতা থেকে মণিকা দেবী ইন্দ্রনীলকে নিয়ে মৈহারে ফিরে এসেছেন। যে বাড়ীতে আগে ছিল, তারা অন্য লোককে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে, সুতরাং সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অগত্যা রাজবাড়ীর কাছে একটা বাসা ঠিক করে দিলাম। সেখানেই মণিকা দেবী চলে গেলেন। এই বছরটা কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হল কি ভাবে, ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। জানি না এখন বাবার মেজাজ কি রকম হবে। বাবার বাইরে কঠিন, কিন্তু ভেতরে কত কোমল আমি তা জানি। ভয় হচ্ছে বাবা অসুখে না পড়ে যান। কিন্তু না। বাবার বাইরে দেখে বুঝবার উপায় নাই। যথারীতি দৈনন্দিন কাজ ঘড়ি দেখে চলতে লাগল। কারোর জন্যই কোনও কাজ থেমে থাকে না সংসারে। যথারীতি ব্যাণ্ডেও যাচ্ছেন এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়েও যাচ্ছেন। ব্যতিক্রম কেবল একটাই দেখছি। বাবা যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন বাড়ীতে থাকাকালীন। চিঠির জবাব, কাকে কি দিতে হবে, এ ছাড়া আর কোন কথা নেই। মানুষের জীবনে উত্থান পতন যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার সুখ দুঃখ। কিন্তু সুখকে আমরা যত সহজে স্বীকার করি, দুঃখকে স্বীকার করতে আমাদের তেমনি সংকোচ হয় কেন? যেন সুখটা আমাদের ন্যায্য পাওনা আর দুঃখটা একটা ব্যতিক্রম।

বাবা যে সময় মানসিক অবস্থায় আক্রান্ত, ঠিক সেই সময় একদিন সকালে বাক্স বেডিং নিয়ে এক সুন্দর, লম্বা ব্যক্তিত্বপূর্ণ বাঙ্গালি ভদ্রলোক এসে হাজির। বাবা সেই ভদ্রলোককে দেখামাত্র বললেন, 'আরে আরে দিওয়ান সাহেব যে। আমার পরম সৌভাগ্য এতদিন পরে আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়েছে।' ভদ্রলোক বাবাকে বললেন, 'এসেছি নিজের গরজে দু'দিনের জন্য। তাই গেষ্ট হাউসে না উঠে আপনার কাছেই এলাম।' বাবা বললেন, 'দুদিন কেন? এখন কিছুদিন থাকতে হবে।' এই কথা বলেই বুদ্ধাকে ডাকলেন। বুদ্ধাকে বললেন, 'উপরের ঘরে দিওয়ান সাহেবের জিনিষ নিয়ে রাখ। অতিথি মানে নারায়ণ।' বাবা কি করবেন বুঝতে পারছেন না। বাবা প্রথমে আমার পরিচয় দিলেন বিশদভাবে, তারপরে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'রায়সাহেব, মহারাজার প্রাইম মিনিষ্টার ছিলেন। যে সময়ে এসেছিলেন তখন এক হাজার টাকা বেতন পেতেন।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'উপরের ঘরের চাবিটা নিয়ে বুদ্ধাকে দিয়ে সব পরিষ্কার করিয়ে খাবারের জলের ব্যবস্থা করো। এছাড়া, তোমার মাকে বলো চা নাস্তার ব্যবস্থা করতে।' আমি বাবার নির্দেশ

মতো সব ব্যবস্থা করে নীচে এলাম। দেখি বাবা গল্প করছেন ভদ্রলোকের সঙ্গে, ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললেন, 'এখানে ডি.এম. কোথায় থাকে?' বললাম, 'ডি. এম. সাতনাতে থাকেন।' ভদ্রলোক বাবাকে বললেন, 'আসলে, আমার পেনশন তিন মাস পাচ্ছি না। চিঠি লিখে জবাব না দেওয়ায় এখানে এসেছি। ডি.এম. যখন এখানে থাকেন না, তখন আগামীকাল সাতনায় গিয়ে পাকা ব্যবস্থা করে কোলকাতায় চলে যাব যদিও পেনশান মৈহার থেকে যায়, কিন্তু এদের বলে কিছু হবে না।' বাবা সব কথা শুনে বললেন, 'আপনার কথা কে শুনবে। এখানে কিছুদিন থাকতে হবে।' ভদ্রলোক বললেন, 'কোলকাতায় নানা কাজ ফেলে এসেছি, সেইজন্য আপনি যে সময় কোলকাতায় যাবেন সেই সময় দেখা করব।'

এই কথা বলে ভদ্রলোক উপরে গেলেন। বাবা আমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে যেতে বললেন, পাছে তার কোন কষ্ট হয়। কথায় কথায় জানতে পারলাম ভদ্রলোকের নাম রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ মজুমদার। এম.এস.সি, বি.এল. পাস করে কাশী হয়ে মৈহারে এসে গডফ্রে স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি নেন। ছয় মাস পরে ম্যাজিস্ট্রেট হন. এর পরে মহারাজের দিওয়ান পদে নিযুক্ত হন।

আমার মৈহারে আসার সব কারণ শুনে বললেন, 'তোমাকে তুমিই বলছি বলে রাগ কোরো না, কেননা আমার ছেলে শেলী তোমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়।' বললাম, 'নিশ্চয়ই তুমি বলবেন। এর মধ্যে মনে করবার কিছু নেই।' দিওয়ান সাহেব হেসে বললেন, '১৯১৮ সনের শেষের দিকে আমি মৈহারে আসি। আমার মৈহার আসবার ছয় মাস আগে তোমার উস্তাদ বাবা এসেছিলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। সে সময় তো একেবারে গ্রাম্য জায়গা ছিলো। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, কেননা তুমি আমার পুত্রের মত। আলি আকবর, অন্নপূর্ণা আমার থাকাকালীন জন্মগ্রহণ করেছে। ছোট থেকে বড় অবধি সকলকে দেখেছি। তুমি লেখাপড়া করে দেরীতে এসেছ। শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে সঙ্গীতের লাইনে নাম করতে সময় লাগবে, এ লাইনটা বড়ো প্রলোভনের। তাই তোমাকে বলছি, যে মুহূর্তে বুঝতে পারবে যে সংসার কোন রকমে চালাতে পারবে, সেই সময়ে বিবাহ করে নেবে।' এক নাগাড়ে সব শুনছিলাম। এই প্রথম বললাম, 'আমি স্থির করেছি বিবাহ করব না।' আমার কথা শুনেই বললেন, 'যদি সত্যই স্থির করে থাক বিবাহ করবে না, তাহলে ওয়েল এনড গুড। বেটার গো টু প্রস কোয়ার্টার, বাট ডোন্ট ম্যারি। কিন্তু অনেককে দেখেছি, প্রথমে বলে বিবাহ করবে না, তারপর বেশি বয়সে বিয়ে করে। তার মত ভুল আর নেই। সে বড় ট্র্যাজেডির জীবন। এ ছাড়া তুমি তো সাইকোলজি পড়েছ তোমাকে বলার কিছু নেই। আসলে আলি আকবর, রবিশঙ্করকে তো দেখলাম। এ ছাড়া বহু শিল্পী দেখলাম। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখলাম তোমার উস্তাদ বাবাকে। এ লাইনে বড় প্রলোভন বলেই এ কথা বললাম। আমার কথায় কিছু মনে কোরো না।'

একদিন থেকেই দিওয়ান সাহেব চলে গেলেন। মৈহারে আসা অবধি এত ভাল লোক কমই দেখেছি।

৪১

ইতিহাসের যেমন অগ্রগতি আছে, মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি। ইতিহাসের মত মানুষও এক জায়গায় স্থানুর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাকে নড়তে হয়, চলতে হয়। কখনও সে পেছিয়ে পড়ে বটে, কিন্তু এগোতেও তো হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এগিয়ে গিয়ে বদলে যায়। খুব কম লোকই আছে যারা নিজেকে সংযম দিয়ে বেঁধে রাখে। একসময় ভাবি কেন এমন পরিবর্তন হয়? যারা এগিয়ে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়, বাবা তার মধ্যে পড়েন না। বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। বাবা নিজেকে সংযম দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

বাড়ীতে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, কিন্তু মেজাজ গরম হলেও বাবা নির্বাক। উপস্থিত বাড়িতে শুধু বাবা, মা ও আমি। বাবা হঠাৎ ডেকে পাঠালেন বুদ্ধাকে দিয়ে। রিয়াজ ছেড়ে গেলাম। বাবা বললেন, 'বসো।' আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশের পতন কেন হয়, কারণ জান কি?' এ প্রশ্নের উত্তর সত্যিই জানতাম না। উত্তর দিতে গেলে এর জন্য সময় নিতে হবে। সুতরাং চুপ করেই থাকলাম। যদিও আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে, বাবাই বললেন, 'তিনটে কারণ। প্রথম, যদি বাপ এবং ছেলের একই সময় সন্তান হয়। দ্বিতীয়, যদি গুরু সন্তানতুল্য শিষ্যকে বিবাহ করে। তৃতীয়, যদি সন্তান সম্ভবাকে পতির কাম আক্রমণ করে তাহলে পতন হয়।' প্রসঙ্গটা আমার কাছে ল্যাটিন মনে হোল। বাবা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝতে পারলে না? যাক বোঝাব না। স্বজন চেন। তোমার আশেপাশে এরকম অনেক দেখতে পাবে।' এর পরই চলে এলাম ঘর থেকে।

বাবা লেখা পড়া করেননি। কিন্তু এক একসময় এমন কথা বলেন যা পরমহংস দেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবার কথাটা সারাদিন আমার মনে আলোড়নের সৃষ্টি করল। বাবার মুখে এই ধরনের অনেক কথাই শুনেছি, যা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাবার উপরিউক্ত কথার মর্মার্থ পরবর্তী জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। রাত্রে বাবা কিছু খেলেন না। বাবার কষ্টটা বুঝতে পারছি। বাবা ভাঙ্গলেও মচকাবেন না। শোবার আগে তামাক খেতে খেতে বললেন, 'সারা জীবন কষ্টই করে গেলাম। জীবনে সুখ পেলাম না। শেষ জীবনে ভেবেছিলাম ছেলে নাতিদের নিয়ে থাকব। এরা টাকার মোহে পড়ে আছে। অভাবকে ভাল বলি না, কিন্তু অভাবের কষ্টকে সহ্য করে জীবনের লড়াইকে ভাল বলি। সব কষ্ট যদি সঙ্গীতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই সঙ্গীত কথা বলবে। প্রাচীন কালে, এক গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে ছাত্র যখন চলে যাচ্ছে, ছাত্র গুরুকে বলল, 'আশীর্বাদ করুন যেন আপনার নাম রাখতে পারি।' গুরু বললেন, 'এই আশীর্বাদ করি, যেন সারাজীবন কষ্ট পাও।' ছাত্র অবাক। গুরু বললেন, 'কষ্ট পেলেই, সেই কষ্ট সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে বেরোবে। তবেই সেই সঙ্গীতের মধ্যে নিজেও কাঁদবে এবং শ্রোতাকেও কাঁদাবে।'

অসময়ে সকাল থেকেই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রে গোবিন্দ সিং এসে হাজির। এত রাত্রে তাকে দেখে, বাবা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি বললেন, বাবা আজ ইংরেজি উনিশশো ছাপ্পান্নর প্রথম দিন বলে আশীর্বাদ নিতে এলাম। ছুটি নিয়ে কিছুদিন বাড়ী

গিয়েছিলাম, আজই ফিরেছি। বাবার মনের খবর ডাক্তারের জানা নেই। ডাক্তারকে আপ্যায়ন করেই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তার বাবা, আপনি তো পণ্ডিত লোক। বলুন তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী মানুষ কে?' উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'শিবের এক নাম নীলকণ্ঠ। অন্যদের অমৃতের অধিকার দিয়ে তিনি হলাহল পান করে হলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর কপালে উজ্জ্বল চন্দ্র আর তাঁর মাথায় পবিত্র গঙ্গা, আর গলায় বিষের জ্বালা। সেই রকম, আমাদের সমাজেও এমন দয়ালু, এমন পরোপকারী মানুষ আছে, যারা পরের কষ্ট, পরের দুঃখ, নিজের কষ্ট, নিজের দুঃখ করে নিয়ে নীলকণ্ঠ হয়েছে। সেই মহর্ষিরাই সবচেয়ে দুঃখী। আমি আপনাকে সেই মহর্ষিদের মধ্যেই গণনা করি।' কথাটা শুনে বাবা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। ডাক্তারের উত্তরে বাবা যে কাঁদলেন তা একদিক দিয়ে ভালোই হলো। দুঃখ পেয়ে মানুষ কাঁদতে পারে, তাহলে কিছুটা হালকা হয়। বাবার কান্নার প্রয়োজন ছিলো। ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

উনিশশো ছাপান্ন সনটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় বছর। এই নূতন বছরের ঘটনাবলীর রোজনামচা লেখা আমার বন্ধ হয়ে গেল। কেন লেখা বন্ধ হল, সেই কথাই এবার বলি। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পরের দিন, বাবা আমার ঘরে ঢুকলেন বন্ধুর মতো। সঙ্কোচে পড়লাম। আমার খাটেতে বসলেন। আমার খাটের কাছে টেবিলে সাতবছরের ডাইরিগুলো দেখে বললেন, 'এই জাবদা খাতা কোথায় পেলে, প্রতিদিনের হিসেব লেখো নাকি?' বললাম, 'না বাবা, ডাইরি লিখি। রোজকার ঘটনা লিখে রাখি।' বাবা বললেন, 'বুঝেছি আমার নিন্দে লিখে রাখো। রোজনামচায় কি গুরু নিন্দা হয়?' সসঙ্কোচে ডাইরি খুলে দেখাই। পাতার দিকে চোখ না দিয়ে একটু হেসে বললেন, 'মনের কথা লিখে রেখো না। মনের কথা মনেই থাক। আরও বললেন, 'তোমার ঘরে অন্য কেউ এলে তো এই ডায়েরী তার হাতেও পড়তে পারে।' আর সেই থেকে ডাইরি লেখার অভ্যাস ত্যাগ করলাম। কারণ ভবিষ্যতে ডাইরী বাবার হাতে পড়লে অনর্থ ঘটতে পারে, যদি বাবা দেখেন যে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছি। তাই এর পর থেকে প্রতিমাসের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার লিখে রাখতাম।

বাবার মনের অবস্থা দেখে ওদের মতো আমিও দুঃখ পেয়েছি, যত না বাবা মা দুঃখ পেয়েছেন।। নাতিরা বাবা মার প্রাণ ছিল। বাড়ীতে কোন দিনই কোন গোলমাল বা আওয়াজ ছিলো না, এখনও নেই, তবুও মনে হয় বাড়ীটার নাড়ি যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। বাবার দৈনিক যেমন সকালে বাজার যাওয়া, বিকেলে ব্যাণ্ড এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যাওয়া, পাঁচবার নমাজ পড়া সবই ঠিক আছে। তবুও কেউ এলেই বাবা একবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে রাগে ফেটে পড়েছেন, আবার পরমুহুর্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন নাতিদের কথা ভেবে। বাবার কোমলতা বাড়ীর লোকেরা খুব কমই দেখেছে। বাড়ীতে বাবা বজ্রের মত কঠিন, ভেতরে দুর্বলতা অর্থাৎ কোমলতা কখনও প্রকাশ করতেন না। দিন আর রাত কোথা দিয়ে আসে আর কোথা দিয়ে যায় বোঝা যায় না। সেই সময় আমার শিক্ষা বন্ধ। এই ভাবেই দিন চলছিল। কলেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যাণ্ড যে স্থানে হয়, আগে সেই জায়গাটা বিরাট ধর্মশালা ছিল।

সেই ধর্মশালাতে, মৈহারের মহারাজের সময় থেকেই ব্যাণ্ডের ছাত্রদের বাবা শিক্ষা দিতেন। সম্পূর্ণ বাড়ীটাই পূর্বে বন্ধ থাকত। এক তলায় প্রায় তিরিশটা ঘর। দোতলায় ব্যাণ্ডের ছেলেদের শেখাবার ঘর এবং তার পাশেই বিরাট ছাত। উপস্থিত যে পঁচিশটি ছাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে, একতলায় তাদের প্রত্যেকের জন্য ঘর দেওয়া হয়েছে। সরোদে চারটি, ভায়োলিনে তিনটি, সেতারে আটটি ছাত্র। গানের পাঁচটি এবং তবলার পাঁচটি ছাত্রকে এই বাড়ীতে থাকবার জন্য দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, শিক্ষার সময় বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। উপস্থিত, বাবা ব্যাণ্ডে এক ঘণ্টা থেকে তারপর বিদ্যালয়ে এক ঘণ্টার জন্য যান। আমি প্রথমেই বিদ্যালয়ে চলে যাই। বাবা ব্যাণ্ড থেকে শিখিয়ে বিদ্যালয়ে চারটের সময় আসেন। বাবা এলে, প্রিন্সিপালের ঘরে বসিয়ে বিদ্যালয় সংক্রান্ত সব চিঠি সই করাই। তারপর বাবা সেতার এবং ভায়োলিন ক্লাসে রোজ কিছুক্ষণ শিক্ষা দিয়ে ডেভিড এবং রবীনকে শেখাতে বলেন। তবলার ক্লাসে বাবা বসেন এবং প্রথম শিক্ষা কি করে করাতে হয় শেখান, এবং পরে তবলা বাদককে বলেন দেখতে। গানের ক্লাসে এবং আমার ক্লাসে, বাবা কখনও আসেন না বা বসেন না। বাবা ঠিক পাঁচটার সময় বাড়ী চলে যান। আমি বিদ্যালয় বন্ধ করে প্রায় ছয়টার সময় বাড়ী ফিরি। রবিবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়ের একটি প্রহরী মোতায়েন থাকত এবং বিদ্যালয়ের একটি ছোট ঘরে সে রাত্রে বাস করত। বাবার অফিসের কাজের জন্য একটি বড় ঘর এবং তার পাশেই আমার ঘর ছিল। বাবার ঘরের সামনে, একটি কাঠের উপর লেখা টাঙ্গান থাকত প্রিন্সিপাল এবং আমার ঘরের সামনে লেখা থাকত ভাইস প্রিন্সিপাল। বাবার ঘরের এক পাশে ক্লার্কের ঘর। অফিসের ফাইল এবং যাবতীয় জিনিস আলমারীতে থাকত। বিদ্যালয়ের কাজের জন্য আমাকে প্রায় সাতনা এবং রেওয়া যেতে হয়। কলেজেও বাবার নিয়মানুবর্তিতা ছিল দেখবার মত। বিদ্যালয়ের গেটে একটা টুলের উপর চাপরাসি বসে পাহারা দিত। বাবা যখন আসতেন দেখা যেত। চাপরাশিকে বলা ছিল, বাবাকে দূর থেকে দেখলেই, আমাকে এসে যেন ক্লাসে বলে যায়। আমায় বলে দেওয়ার পরই বাবা এলে অভ্যর্থনা করে কামরায় বসে কিছু না কিছু আলোচনা করতাম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাবা প্রথম এডুকেশন সেক্রেটারীকে লিখেছিলেন যে ভাতখণ্ডে কলেজের মতই আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী হবে। হাতজোড় করে বাবার কাছে একদিন আমার একটা প্রস্তাব রাখি। প্রস্তাবটি হল প্রথমে ছয় মাসের, কোর্স করব। এই ছয় মাসে গানে এবং যন্ত্রে প্রথম দুটি রাগ ভৈরবী এবং ইমন রাগে পালটা সাধনা, সুর চেনা, একটি সরগম এবং যন্ত্রের জন্য বোল, কৃন্তন ইত্যাদি সাধনা করা। যদি ছয় মাসে না হয়, তাহলে অন্ততঃ আরো ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। অন্য কলেজের মত প্রথম বছরেই পাঁচটা রাগ শিক্ষা দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় বছরে দুটি আরো রাগ এবং হাত তৈরি করার সব অঙ্গ শেখান হবে। গায়কদের জন্য স্বরাভ্যাস করাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বাড়বে। থিওরি আলাদা পড়ান হবে। এক বছর পরে পরীক্ষা বাবাই নেবেন। রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় কোন কলেজের অধীনে হবে না এবং পাশ করলে, বাবাই সার্টিফিকেট দেবেন। এ বিদ্যালয়ে গুরু শিষ্য পরম্পরা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হবে যা

ভারতবর্ষের কোন কলেজে নেই। আমার প্রস্তাবে বাবা স্বীকৃতি দেন। বাবার অনুমতি পাবার পরই এডুকেশন সেক্রেটারীর কাছ থেকে অনুমতি নিলাম। তিনটি মাস ভাল ভাবেই বিদ্যালয়ের কাজ চলল। ইতিমধ্যে বাবা অনেকটা সামলিয়ে নিয়েছেন। যে পঁচিশজন শিক্ষার্থী এসেছে, তার মধ্যে কিছু মৈহারের ছেলে এবং বাকী সব গ্রাম থেকে এসেছে যাদের সঙ্গীতে রুচি আছে। প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন প্রার্থীর মধ্য থেকে পঁচিশজনকে মনোনীত করা হয়েছে। এর মধ্যে একদিন আমি ক্লাসে সরোদ শিক্ষা দিচ্ছি। ক্লাসে শেখাতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। শেখাবার সময় মাথা গরম হয়ে যাবার ফলে খুব বকাবকি করি। মাথা গরম হবার কারণ স্বাভাবিক। ছাত্ররা সরকারী টাকা পাবার লোভেই এসেছে, সঙ্গীতকে ভালবেসে নয়। সরোদের মত যন্ত্র শেখান কত কঠিন এই সব ছাত্রদের, তা সহজেই অনুমেয়। একদিন শেখাবার সময় রেগে গিয়ে বকাবকি করছি, ছেলেদের মুখটা কিরকম যেন হয়ে গেল। হঠাৎ যখন দেখলাম চারজন ছাত্রই বাজনা বন্ধ করে দিয়েছে, চিৎকার করে উঠলাম। পরমুহুর্তেই আবার বাজাতে লাগল। প্রায় পনেরো মিনিট পরে ছাত্ররা বলল, 'বাবা ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবাকে দেখেই আমরা বাজনা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা ইশারায় আমাদের বারণ করেছিলেন।' এই কথা শুনে অবাক হলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশিকে ডেকে বললাম, 'বাবার আসা দেখে কেন আমাকে বলো নি।' উত্তরে চাপরাশি বলল, 'বাবা অন্য রাস্তা দিয়ে এসেই বিদ্যালয়ে ঢুকেছেন। আপনাকে বলতে আসার উদ্যোগ করেছি দেখে, বাবা আমাকে নিরস্ত করেন।' ব্যাণ্ড থেকে বিদ্যালয়ে আসতে হলে দুইটি রাস্তা ছিল। বাবা যে রাস্তা দিয়ে আসতেন দূর থেকেই তাঁকে দেখা যেত। অপর একটি রাস্তা বাজারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের কাছেই এসে পড়েছে। মনে হয় এ হোল বাবার পরীক্ষা। বাবা রোজ দেখতেন, বিদ্যালয়ে এলেই আমি অফিসে নিয়ে যেতাম। সেইজন্য বাবা দেখতে চেয়েছিলেন, আমি ক্লাস করি কেমন করে? যাই হোক এরপর শিক্ষা দেওয়া তো আমার মাথায় উঠল। খবর নিয়ে বুঝলাম বাবা অন্য ক্লাসও পরিদর্শন করছেন। বাবার কাছে কিছু কাগজপত্র স্বাক্ষর করার জন্য দিলাম। বাবা পরে চলে গেলেন। আমি যথাসময়ে বাড়ী গেলাম। বাড়ী যাবার পর, মা আমায় বললেন, 'ছেলেদের শেখানর সময় তুমি খুব রাগ কর নাকি?' আমি বললাম, 'এ কথা কেন বলছেন?' মা বললেন, 'তোমার বাবা বাড়ীতে এসে বলল, ওরে বাবা, যতীন তো আমার থেকেও রাগী। তবে এটা ঠিক, এই রকম বকলেই এ সব গ্রাম্য ছেলেরা মানুষ হবে।' মার কথা শুনে সব কিছু সবিস্তারে বললাম। আমার কথা শুনে মা বললেন, 'তোমার বাবার সব দিকে দৃষ্টি থাকে। ছোটবেলায় আলি আকবর, তোমার বাবা বাজারে গেলেই বাজনা না বাজিয়ে ঘোরাঘুরি করত। দূর থেকে তোমার বাবাকে বাজার থেকে আসতে দেখেই, বাজনা বাজাত এবং তোমার বাবা এলেই বাজনা বন্ধ করে দিত, যেন তোমার বাবা ভাবে, এতক্ষণ তো বাজনা বাজিয়েছে। তোমার বাবা সব বুঝতে পারে। কয়েকবার বাজারে গিয়ে বাড়ীর পেছন দিয়ে ফিরে এসে মুহুর্তে দেখেছে আলি আকবর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি মারই না মেরেছে। আশিসকে কিরকম মারে তাতো দেখেছো। আলি আকবরকেও যা মার মেরেছে তুমি ভাবতেই পারবে না। সেই সময় তোমার বাবার রাগ

আরো বেশী ছিল।' মার কথা শুনে ভাবলাম, যে রাগ এসে অবধি দেখচি, তা ধারণা করা যায় না। তাহলে আগে যে রাগ ছিল, তার স্বরূপ তো অকল্পনীয়। বাবা, মার কাছে আমার রাগের কথা বলেছেন কিন্তু আমাকে কিছুই বললেন না।

উপস্থিত আমার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। হোষ্টেলে গিয়ে রোজ একবার ছাত্রদের দেখে আসতে হয় তারা রিয়াজ করছে কি না। এ ছাড়া ডেভিড, দ্যুতিকিশোর, ইন্দ্রনীলকে শেখাতে হয়। এবং কলেজে সময় মত যেতে হয়। কি জানি কেন এই জীবন আমার ভাল লাগছে না। আসলে ভাল না লাগার কারণ, রিয়াজ ঠিক মত হচ্ছে না উপরন্তু শিক্ষাও হচ্ছে না। এই বৈচিত্রহীন জীবন তো আমার কাম্য ছিলো না। অতীতের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না। বর্তমান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। একটি দিন কেমনভাবে কেটে যায় বুঝি না। এখন আমার চিন্তা ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে আছে।

সকালে একদিন রিয়াজ করছি, এমন সময় বুদ্ধা এসে বলল, 'পোষ্ট অফিসের পিয়ন আপনাকে ডাকছে।' পিয়নের কাছে শুনলাম, পোষ্টমাষ্টার তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন, কেননা দিল্লী থেকে আমার নামে টেলিফোন এসেছে। টেলিফোন এসেছে শুনে অবাক হলাম। দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছে? অশুভটাই প্রথমে মনে হল। ছেলেদের নিয়ে জুবেদা বেগম দিল্লী চলে গিয়েছে, কোন বিপদ হয়নি তো? পিয়নের কথা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টঅফিসে যাচ্ছি দেখে বাবা বললেন, 'বাজনা না বাজিয়ে এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?' বললাম, 'পোষ্টমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন। পোষ্টঅফিসে যেতেই পোষ্টমাস্টার বললেন, 'দিল্লী থেকে আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলতে চান। তাড়াতাড়ি একরকম দৌড়ে গেছি, কেননা টেলিফোনের খরচা তো অনেক লাগবে। হাঁফাচ্ছি। টেলিফোন উঠিয়ে 'হ্যালো' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম জুবেদা বেগমের কণ্ঠ। আমার গলা শুনেই তিনি বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন দিল্লী চলে আসুন। এখানে এমন কাণ্ড হয়েছে যে রবিশঙ্কর কাউকে বাড়ীর বাইরে যেতে দিচ্ছে না।' কোন রকমে চামচেদের চোখ বাঁচিয়ে পাশের বাড়ী থেকে টেলিফোন করছি।' একথা শুনে অবাক হলাম। এমন কি হয়েছে যে রবিশঙ্কর কাউকে বাড়ীর বাইরে যেতে দিচ্ছে না। এ ছাড়া, জুবেদা বেগমের গলা শুনে মনে হচ্ছে খুব বিচলিত হয়ে একনাগাড়ে কথাগুলি বললেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এমন কি ব্যাপার হয়েছে যার জন্য কাউকে বাড়ীর বাইরে যেতে দিচ্ছে না?' উত্তরে বললেন, 'রবিশঙ্কর তার চামচেদের দিয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিমান ঘোষকে নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে। একমাত্র আপনি এলেই এর সমাধান হতে পারে, কেননা রবিশঙ্কর আপনার কথা শোনে। আর বেশী দেরি করলে বিপদ হবে তাড়াতাড়ি আসুন।' লাইন কেটে গেল। টেলিফোনে এই সংবাদ শুনে চমকে উঠলাম। অসম্ভব এবং অকল্পনীয় যে সকলে ঘরে বন্দী হয়ে আছে। তার মানে হরিহর, অমিয় আর সব চামচেরা পাহারা দিচ্ছে ঘরের বাইরে। এ আমি ভাবতেই পারছি না। কিন্তু ভাবতে বাধ্য হলাম কেননা টেলিফোন তো মিথ্যা নয়। কিন্তু এ কি কথা শুনলাম? বিমান ঘোষ এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে কি ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে? এ কি অবিশ্বাস্য কথা শুনলাম। কি হতে পারে যার জন্য চামচেদের দিয়ে একরকম সকলকে

রবিশঙ্কর ঘরে বন্দী করে রেখে দিয়েছে। তাই যদি হয়, তার মানে বিরাট একটা চক্রান্ত কিছু করেছে রবিশঙ্কর। রবিশঙ্কর যদি আমার কথা না শোনে? তাহলে তো একটা প্রলয় ঘটে যাবে। তাহলে উপায়? মনে হলো কাশীতে গিয়ে কবিরাজ আশুতোষকে নিয়ে দিল্লী যাব। যতই হোক রবিশঙ্করের সে বাল্যবন্ধু। দুজনে গেলে, যাই হোক না কেন ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে। এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মনে হোল যেন আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দিল্লীতে আশিসের অপারেশনের পরে, রবিশঙ্করের যে ঘৃণ্য মনের পরিচয় পেয়েছিলাম তা মনে পড়ে গেল। সেই সময় দিল্লীতে রবিশঙ্কর বলেছিলো যে অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। মনে পড়ে গেল, দ্যুতি যে সময় জুবেদা বেগম এবং ছেলেদের নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল, সেই সময় আমার সম্বন্ধে রবিশঙ্কর দ্যুতিকে বলেছিলেন, কাশীর পণ্ডিতের কি খবর? আসলে বরাবরই আমি স্পষ্টবক্তা। সকলকেই দেখেছি, রবিশঙ্কর বা আলি আকবর ভুল কথা বললেও প্রতিকার করে না। একমাত্র আমি, দুজনকেই তাদের দোষ দেখাই। বুঝি তাদের ভাল লাগেনা, কেননা এরকম প্রতিবাদ শুনতে তারা অভ্যস্ত নয়। হঠাৎ খেয়াল হল পোষ্টমাষ্টারের কথায়। পোষ্টমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনও অশুভ সংবাদ নাকি?' পোষ্টমাষ্টারকে বললাম, 'বাবা যদি পোষ্টঅফিসে আসেন, তাহলে বলবেন না, দিল্লী থেকে টেলিফোন এসেছিল। বাবাকে বলবেন কাশী থেকে টেলিফোন এসেছিল।'

বাড়ীতে ফিরবার পথে নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। জুবেদা বেগমের কাছে যে সংবাদ শুনেছি, সে কথা যদি বাবাকে বলি তাহলে ঘাবড়ে যাবেন। বাবা স্বপ্নেও এ কথা বিশ্বাস করতে পারবেন না। এ ছাড়া, তার পরম স্নেহের কন্যার সংবাদ শুনে যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, তাহলে আমি লোকের কাছে কি জবাব দেব? সকলেই বলবে আমার এই কথা বলার জন্যই বাবার দুর্ঘটনা হোল। সাতপাঁচ চিন্তা করতে করতে কখন বাড়ি এসে গেছি খেয়াল করিনি। বাড়ীতে আসতেই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোষ্টমাষ্টার কেন ডেকেছিল?' উত্তরে বললাম, 'কাশী থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছে আমার মায়ের শরীর খারাপ। সুতরাং আজই কাশী যাব।' আমার কথা শুনে বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবে, মায়ের চেয়ে বড় আর কে আছে।' নাস্তার সময় হয়ে গিয়েছে। খাবার তো মাথায় উঠেছে। মনে হচ্ছে ঝড় বইছে। নাস্তা করে সময়মত পোষ্টঅফিস গেলাম চিঠি আনতে। দ্যুতিকে দেখলাম পোষ্টঅফিসের কাছে। দ্যুতিকে ঘটনার একটু ইঙ্গিত দিলাম। বিপদে মানুষ চায় আপনজনের সাহচর্য, পরামর্শ। তাই কাশী যাওয়াই স্থির করেছি। কাশীতে গিয়ে আশুতোষকে নিয়ে দিল্লী যাব বললাম। দ্যুতি আমার সঙ্গে স্টেশনে গেল। আমি কাশী গেলাম। কাশী যাবার সময় কি জানতাম, বিধাতা ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি এমনভাবে করেন যে নিয়তির বিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কাশীতে গিয়ে আশুতোষকে সব বললাম। আমার কথা শুনে আশুতোষ বলল, 'আমি একজনের কাছে খবর পেয়েছি, উপস্থিত রবিশঙ্কর বম্বেতে আছে।' উত্তরে বললাম, 'গতকাল টেলিফোনে খবর পেয়েছি রবিশঙ্কর দিল্লীতে আছে।' কবিরাজ আশুতোষ বলল, 'ঠিক আছে, কয়েকজন রোগীর ওষুধের সব ব্যবস্থা করে দুইদিনের মধ্যেই দিল্লী যাব।' যাব যাব করে তিন দিন কাশীতে কেটে গেল। এখন আমার কি কর্তব্য?

কর্তব্যের ব্যাখ্যা এক একজনের কাছে এক এক রকম। একজন আমায় উপদেশ দিল, কিছু একটা করাকেই যে কর্তব্য বলে তা নয়, অনেকসময় কিছু না করাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় কর্তব্য। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। আশুতোষের কাজের জন্য যদি যেতে দেরী হয় তাহলে আমাকেই যেতে হবে। মানুষ ভাবে এক, আর হয় অন্য রকম। নইলে আমিই কি জানতাম, ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ইতিমধ্যে দ্যুতির টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম যে রবিশঙ্কর মৈহারে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে কিছু বলেছে। যার ফলে বাবা আমার প্রতি চটে গেছেন, সুতরাং অবিলম্বে আমি যেন মৈহার ফিরে যাই। দ্যুতির টেলিগ্রাম পেয়ে আশুতোষকে বললাম, 'মৈহার থেকে এসেই যদি আমরা দিল্লীতে যেতাম, তাহলে রবিশঙ্কর মৈহারে আসত না।' দ্যুতির টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বুঝতে পারছি না, রবিশঙ্কর এমন কি কথা বলেছে, যার জন্য বাবা আমার উপর চটে যাবেন। রবিশঙ্কর কি জানতে পেরেছে যে জুবেদা বেগম আমাকে টেলিফোন করেছিলো? যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে মৈহার যাত্রা করলাম। তখন কি জানতাম, একদিনের মধ্যেই বাবার বাড়ীতে ঝড় বয়ে গেছে এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যার সময় মৈহারে পৌঁছতেই দেখি, বাড়ীর গেটের কাছেই লনের মধ্যে বাবা পায়চারি করছেন। বাবা আমাকে দেখেই বললেন, 'তুমি আমার এতবড় সর্বনাশ করেছ?' বাড়ীতে ঢুকবার আগেই, বাবার কথাটা শুনে মনে হল একটা বিরাট আওয়াজ হল, বাজ পড়ার মত। বাবার কাছে কারো কথা বলবার সাহস নেই। সকলেই দেখি ভয় পায় সত্য কথা বলতে। কিন্তু কিসের ভয়? কাকে ভয়? কেন ভয় করবো? ভয়টাই তো মৃত্যু। বাবা যখন আমাকে এত স্নেহ করেন তখন ভয় করব কেন? আমি তো কিছু চুরি করিনি বা প্রতারণাও করি নি। স্পষ্ট সত্য কথা বললে বাবা খুশী হন। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই যে কথা বললেন, সেই কথা শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বললাম, 'আপনি ভাবলেন কি করে যে আপনার সর্বনাশ করতে পারি? এতদিন আপনি আমায় দেখছেন অথচ পরের কথা শুনে আমার প্রতি অবিচার করছেন।' আমার চিৎকারটা বোধ হয় জোরেই হয়ে গিয়েছিল। বাবা এতটা আশা করেন নি। হঠাৎ বাবা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বাবার এই কান্নার মধ্যে সব ব্যক্তিত্ব, সব অহমিকা বিসর্জন দেওয়া আত্মসমর্পনের আকুলতা ফুটে উঠল। বাবার কান্না দেখে বললাম, 'আমি আপনার ছেলে, বলুন কি হয়েছে?' আমার কথা শুনে বাবা যা বললেন, সে কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। মনে হোল এক মুহুর্তের মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। কারও বিরুদ্ধে বিনা কারণে কেউ কি এতবড়ো ষড়যন্ত্র করতে পারে। নিজের জীবনেই কোন কোন ঘটনা এমন আশ্চর্য, এমন অবিশ্বাস্য হয়ে দেখা দেয় যে যার কোন কুলকিনারা দেখা যায় না। তাই জীবনের বহু অনুভূতিই যন্ত্রণা হয়ে থেকে যায়। বাবার কথা শুনে কয়েক সেকেণ্ড আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। বাবাকে বললাম, 'শান্ত হোন, চলুন ঘরে। আপনি দুঃখ পাবেন বলে যে কথা কখনও বলিনি, আজ আপনাকে সেই সব কথা বলব।' হঠাৎ বাড়ীর বাইরে জগদীশ চ্যাটার্জিকে অর্থাৎ জগুকে দেখলাম। বুঝলাম, রবিশঙ্কর জগুকে রেখে গেছে এখানে কি হয় জানবার জন্য। দূর থেকে আমার সঙ্গে

চোখাচুখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই, জগু মুখ ফিরিয়ে পালাল। বাড়ীতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললেন। মা বললেন, 'বাবা এ কি হল আমার মেয়ের?' মাকে শান্ত করে, নিজের ঘরে জিনিষ রেখেই বাবার ঘরে গেলাম। বাবার ঘরে কতবার গিয়েছি, কিন্তু মনে হয়নি জবাবদিহি করতে যাচ্ছি। মনে হয়নি অপরাধের সাফাই গাইতে যাচ্ছি। না আমার মনের মধ্যে কোন কিন্তু নেই। বাবা আমাকে যে কথা বললেন, সে কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। আমার জীবনে এমন আঘাত পাব তা কখনও ভাবিনি। মনে পড়ে গেল আমার কাশীর মাষ্টার মশায়ের কথা। তিনি বলতেন, জীবনে সহযোগীতার যতটা প্রয়োজন, আঘাতের প্রয়োজন ঠিক ততটাই। আঘাতের সময় যন্ত্রণা থাকে বলেই আঘাতের উপকারিতা বুঝতে পারি না। কিন্তু যাকে বড় হতে হবে, মহৎ হতে হবে, যাকে প্রাত্যহিক বিপর্যয়ের ঊর্দ্ধে উঠতে হবে, তার যে এ ছাড়া পথ নেই। তাই লোকে আজ পর্যন্ত যত প্রশ্ন আমাকে করেছে, তার উত্তর আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি সেদিন। কিন্তু আজ তা বলতেই হবে কেননা বাবা আমাকে দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন সব কথা অপ্রিয় হলেও সত্য লিখতে। বাবা আমাকে কবে এবং কেন দিব্যি দিয়েছিলেন সব সত্য কথা লিখতে, সে প্রসঙ্গ পরে আসবে। উপস্থিত বাবার কাছে যে ঘটনা শুনলাম, সেই ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

বাবার কাছে শুনলাম রবিশঙ্কর তার সহচর নন্দু মল্লিক ও জগুকে নিয়ে মৈহারে এসেছিল। মৈহারে এসে যে কথা বাবার দিব্যি দিয়ে বলেছে, সে কথা আজ লিখবার সময় মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার কলম চেপে ধরছে। লিখতে যখন বসেছি, লিখতেই হবে। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।' রবিশঙ্কর এত পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ ধরনের নীচ কর্ম করতে পারে তা কল্পনার বাইরে। মিথ্যাকে যতই সাজিয়ে বলা হোক না কেন, তা একদিন প্রকাশ হয়ই এবং অনেক পরে সেটা প্রকাশ পায়। সে কথায় পরে আসব। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। যেহেতু রবিশঙ্কর জানে যে আমি তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে দিতে পারি বাবাকে, তাই সে একঢিলে দুই পাখী মেরেছে। আমাকেও রবিশঙ্কর ছাড়েনি। আমার নামেও এমন কথা বলেছে, যাতে বাবা আমাকে শিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দেন। বাবার যে দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছে, বুঝলাম বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বাবাকে একঘণ্টা ধরে বোঝালাম এবং মনে হল আমার মনের কথা বুঝেছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাবা রবিশঙ্করকে যে গালি দিয়েছিলেন, সেই কথা মরবার আগেও রবিশঙ্কর ভুলতে পারবে না। রবিশঙ্কর দুঃখ করে পরবর্তীকালে আমাকে কয়েকবার সে কথা বলেছিলো।

আমার কাছে সব কথা শুনে বাবার কথাগুলো বিলাপ বলে মনে হোল। বাবা বললেন, 'অন্নপূর্ণার বিয়ে দিয়ে আমি ভুল করেছি। এই বিয়ের কথা শুনে আমার দেশের লোকেরা এবং আত্মীয়রা বলেছিল, 'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি।' যেমন পচা ভাতে ঘি ঢাললে স্বাদ হয় না, সেইরকম ভাল পাত্র না বুঝে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিৎ নয়। তার মানে, ভাল ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে না দিতে পারো, তাহলে পচা ভাতে ভালো ঘি ঢালার

মতো হবে। আমার দেশের আত্মীয় এবং মহারাজের কথা না শুনে ভুল করেছি। আমি কোন কালেই কাউকে ছোট মনে করি নি। জাত নিয়েই যত গোলমাল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি, যে কোন জাতই নিজের প্রাধান্য নিয়ে গর্ব বোধ করে। কিন্তু সকলে ভুলে যায় যে মানুষের হৃদয়ের কোন জাত নেই। মানুষ হল আসল সত্য, আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে মরে তা যে কত মিথ্যা, এই বোধ কি সকলের আছে? মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিলনটাই আসল। উদয়শঙ্করের কথাতে আমি বিবাহ দিতে রাজী হয়েছিলাম এই কথা ভেবেই, যে রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণার বাজনা শুনে তাকে মাথায় করে রাখবে। যদিও ছোট থেকে রবিশঙ্কর প্রজাপতির ধর্ম পেয়েছিল, অর্থাৎ প্রজাপতির ধর্মই হল নানা ফুল থেকে মধু আহরণ করা, সে কথা জেনেও বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম এই ভেবে যে অন্নপূর্ণার বাজনায় প্রভাবিত হয়ে, রবিশঙ্কর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝছি কত ভুল করেছি।' বাবা চুপ করে গেলেন। কিন্তু চুপ হলে কি মনকে চুপ করানো যায়। বাবার কথা শুনে মনে হল, মিলটন যদি জানতেন যে শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাবেন তা হলে বোধ হয় লেখাপড়া করতেন না। শাজাহান যদি জানতেন শেষ জীবন কারাগারে কাটবে, তাহলে রাজ সিংহাসনে বসতেন না। ভাস্করাচার্য যদি জানতেন তাঁর একমাত্র কন্যা বিধবা হবেন, তবে কখনও বিয়েই করতেন না। নবকুমার বা তার নূতন পত্নী যদি জানতেন তাদের বিয়েতে কি বিষময় ফল ফলবে, তবে কখনও তাদের বিয়ে হ'তো না। বাবা যদি জানতেন তাঁর জামাই মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করবে, তাহলে কখনও এই বিয়ে দিতেন না।

যেমন একটু করে, মেঘ দেখতে দেখতে সমস্ত কিছু ঢেকে দিয়ে একেবারে সারা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করে দেয়, ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটল বাবার জীবনে। হয়ত এমনিই হয় সংসার। যে সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ জীবন আরম্ভ করে, তা কজন শেষ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে? সব মানুষের জীবন সুখের হয় না। সুখ পেতেই হবে তারও কোন অর্থ নাই, কারণ সুখ কথাটা আপেক্ষিক। কিন্তু বিপর্যয়? বিপর্যয়ের তীব্রতারও তো একটা মাত্রা আছে। মানুষের সহ্য করবারও তো একটা সীমা আছে। উত্থান পতনের একটা জ্যামিতিক নিয়ম আছে। কিন্তু বাবার বেলায় কি তা থাকবে না? এমনিই হয়। জীবনে যখন চারদিক থেকে শান্তির বাতাস বইতে থাকে, যখন জয়ের উল্লাসে কেউ উদ্দাম হয়ে ওঠে, তখন কোথা থেকে অজ্ঞাতে কালবৈশাখীর একটা ছেঁড়া টুকরো মেঘ আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দেয়, কাউকে তা বুঝতে দেয় না। সেদিন বাবার তাই হয়েছিলো। বাবার কাছে সব কথা শুনে মনে মনে বলি, যে নিজে চোর, সেই অন্যকে চোর ভাবে। রণে বা প্রেমে নীতির বালাই রাখতে নেই। প্রেমে না হোক, রণে জেতার দুরন্ত যার জেদ, সে সব কিছুই করতে পারে। বিবেক তার কাছে মৃত। যখন তার কাছে চেতনা ফিরে আসে তখন আর করার কিছুই থাকে না। জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। সারাজীবন, তখন জ্বালায় ভুগে ক্ষত বিক্ষত হয়। বিবেকবান হয়ে সুখী জীবন যাপনের চেয়ে নারকীয় কাজে আপাত উল্লাস থাকতে পারে। কিন্তু পরে? আজ মনে পড়ছে এই ঘটনার চৌদ্দ বছর পরে এবং বর্তমানে কি করে সম্ভব হল যা অকল্পনীয়। সম্মান এক জিনিষ, আর অন্যায় এক জিনিষ। সম্মান করতে গিয়ে কি

অন্যায়কে সম্মান করতে হবে। সেই বিমান ঘোষ। যার সঙ্গে রবিশঙ্কর আলাপ করিয়েছিলো আকাশবাণী দিল্লীতে। টাকার জোরে মুখবন্ধ হয়। টাকা কথা কয়। কিন্তু টাকা সব দিতে পারে, আবার অনেক কিছু ছিনিয়ে নেয়। মনে পড়ছে রবিশঙ্করের পঞ্চাশতম জন্মদিনে কোলকাতা থেকে বিমান ঘোষ কাশীতে এল। তারপর কোলকাতার একটি গেষ্ট হাউসে দুজনে এক দোলনায় দুলছে। রবিশঙ্করের প্রোগ্রামে সকলকে অভ্যর্থনা করছে। আগে থেকে সব ঘটনা বলে দিলে গল্পের আগ্রহ কমে যায়। গল্পের গতিও ব্যাহত হয়। তার আগেকার অন্য ঘটনা বলতে হবে। কত লোকই তো দেখলাম। যারা দুনিয়াদারি করে তারা দরকারের সময় পা চাটবে, আবার দরকার ফুরিয়ে গেলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। এদের কাছে সততার কোন দাম নেই। দরকারের সময় মিষ্টি কথা বলবে, আবার পিছন থেকে ছুরি মারতেও তারা পেছপা হবে না। মানুষের জীবনটা বিচিত্র। সোজা পথে চলতে চলতে হঠাৎ বুঝি কখন বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায়। তখন সমস্যা হয় কোনদিকে যাবো। কোন দিকে গেলে শেষের গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছবে। আর পথই কি একটা? পথের যেমন সীমা সংখ্যা নেই, গন্তব্যস্থানেরও কি সীমা পরিসীমা আছে? পরিসীমা থাকলে এ ঘটনা ঘটলো কেন? আসলে, যে মাথা জট পাকাতে জানে, সে মাথা জট পাকানোর ইন্ধনও সংগ্রহ করে দেয়। মানুষ যখন পাগল হয়ে যায়, তখন কি আর যুক্তি তর্কের কথা শোনে। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। এ কথা বইতে পড়ে এসেছি। জীবনেও যে না দেখেছি তাও নয়। কিন্তু তা বলে এত? যাক সে কথাই বলি। রবিশঙ্কর দিল্লি থেকে নদু মল্লিক এবং জগুকে নিয়ে এসে বাবাকে, বলেছে, 'আপনার দিব্যি দিয়ে বলছি যে বৌমা এবং কন্যা যা করেছে সেকথা শুনলে যদিও আঘাত পাবেন, তা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে বলবার জন্য। যদি আপনি, কন্যা এবং পুত্রবধূর কথা শুনে অবিশ্বাস করেন এবং মনে করেন আমি মিথ্যা বানিয়ে বলছি, তাহলে শাস্তিস্বরূপ আপনার চরণে দুটো হাত কেটে সমর্পণ করবো, যার ফলে বাজাতে পারব না।' ভূমিকাটা ভালই হয়েছে। বারে গুরুভক্তি। এ কথা রবিশঙ্করের মনে হোল না, যে কথা সে বলল, তা শুনে বাবার হৃৎ স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে? গুরুর কাছে আলাপচারীর বিস্তার শিখেছে, কিন্তু কথার বিস্তার অর্থাৎ যে দুনিয়াদারীটা ছোট থেকেই শিখেছে, তারই প্রয়োগ করল এইভাবে। এরপর রবিশঙ্কর বাবাকে বলেছে, 'আপনি কি জানেন, আপনার পুত্রবধূ গর্ভবতী ছিল? গর্ভপাত করবার জন্যই আপনার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করে দিল্লীতে গিয়ে গর্ভপাত করিয়েছে? আলি আকবর দীর্ঘদিন মৈহারে আসেনি, সুতরাং জানিনা এর জন্য কে দায়ি? দ্বিতীয় কথা, আমি বম্বে গিয়েছিলাম বাজাতে। বাজনা বাজিয়ে প্লেনে দিল্লীতে এসে দেখি, আমার ছাত্র অমিয়, হরিহর উত্তেজিত হয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা ধাক্কার পর, খুলে দেখি বিমান ঘোষ এবং অন্নপূর্ণাকে। সুতরাং এরপর কি করা উচিত আপনিই বলে দিন।' বাবা কথাগুলো বলে বললেন, 'আমি এ কথা শুনে বলেছি, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।' বাবা একনাগাড়ে সব কথা বলে চুপ করে গেলেন। কথায় আছে অল্প শোকে কাতর, বেশী শোকে পাথর। মনে হলো বাবা বোবা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেদিন থেকেই যেন শনির দৃষ্টি পড়লো বাবার সংসারে, বুঝলাম রবিশঙ্কর মৈহার ছেড়ে

যাবার পরই বাবা এবং মায়ের মনে মেঘ জমেছিলো। বড়বড় ফোটায় থেমে থেমে কয়েকটা পড়ার পরই আমাকে দেখেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এসে গেল। আমি কেমন করে এই পৃথিবীটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেব এটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। অথচ সবাই চাইতো তাদের সঙ্গে আমি খাইয়ে নি। সেখানেই ছিলো যত বিরোধ। সেই বিরোধটাই মোটা আকারে ধরা পড়লো এই ঘটনাগুলো শুনবার পর। একটা আচমকা আঘাতে আমি বজ্রাহত। ঠিক শুনেছি কিনা জানি না। ঠিক দেখছি কি না জানি না, সর্বাঙ্গ ঘৃণায় শিরশির করছে। আমি নির্বাক দ্রষ্টা, বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। বাবার কথা শুনে বুঝলাম, ঘটনার থেকে রটনার শক্তি অনেক বেশী। অবাক হলাম। রবিশঙ্কর বাবার দিব্যি দিয়ে কি করে এ ধরনের কাল্পনিক কথা বলল। আসলে ভিতরে জোরের অভাব হলে দিব্যি দিয়ে কথা বললে সুরটা চড়া হয়। এতদিন যে ভালবাসা, আন্তরিকতা, বিশ্বাস রবিশঙ্করের উপর ছিলো, যাকে এত বিশ্বাস করতাম, বাবার কথা শুনে নিমেষের মধ্যে কি করে সব ভেঙ্গে গেল বুঝতে পারিনি। একটা কথা বাবাকে বলতে শুনেছি, 'যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই মিথ্যা কথা বলে। সত্য বললে সাত খুনও মাফ করা যায়। কিন্তু মিথ্যাবাদীর ক্ষমা নেই।' কিন্তু বাবাকে বরাবরই দেখেছি কানপাতলা। বাবার কথায় বুঝলাম, বাবা রবিশঙ্করের কথা উড়িয়ে দেননি। বাবা সহজ সরল ভাবেই বিশ্বাস করেছেন। আমি মৈহারে থাকলে রবিশঙ্কর এ সব বলতে সাহস পেতো না। কিন্তু বাবার কথায় বুঝলাম, মনে সংশয় হয়েছে। সংশয়ের কাঁটা প্রথমে নিজেকে ক্ষত করে, পরে অন্যকে। সংশয়প্রবণতার কাঁটা কখন পুষ্ট হয় সেটা মনোবিজ্ঞানের বিচারের বিষয়। কিন্তু রবিশঙ্কর এই ধরনের অযৌক্তিক কথা কেন বলল বাবাকে? রবিশঙ্কর দেখতে সুশ্রী, তবুও কেন তাকে বাতিল করেছেন অন্নপূর্ণা দেবী? আসলে তার স্বরূপ যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই তাসের ঘরের মতই সব কিছু এমন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে পারে, এ কে কল্পনা করেছিল? না, যা ঘটে গেল কেউ তার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। তার প্রথম পর্বে আমি শুধু নির্বাক বোবা দ্রষ্টা। পরের অধ্যায়ে অবশ্য ধ্বংসের আগুনই আমার মাথায় জ্বলে উঠল। আর বোবা দ্রষ্টা হলে চলবে না, আমাকে সবাক হতে হবে। আমার কর্তব্য আছে। কর্তব্যের সঙ্গে কোন আপোষ আর করতে চাই না। চাই না বটে, কিন্তু মনের ভেতরে আঘাত লাগে, সেটা অস্বীকার করব কি করে? জল অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এতদিন রবিশঙ্করের প্রতি যে দুর্বলতা ছিল নিমেষে কর্পূরের মত উড়ে গেল বাবার কথা শুনে। সবাক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কেন এমন হোল? হবার বোধ হয় কারণ ছিলো। কয়েকটা কারণের মধ্যে, প্রধান কারণটা জানতে গেলে একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে। যেখানে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সঙ্গীত শিল্পী, সেখানে শিল্পী স্বামীর ঘর, স্ত্রীর কোন দিনই স্বামীর ঘর হয়ে ওঠে না। একটা গ্ল্যামার অপরের শান্তসুন্দর জীবনের গলা টিপে ধরতে শুরু করে পদে পদে, যার ফলে বিক্ষোভ অশান্তি। তারপর? তারপর দুঃসহ এক জীবন যন্ত্রণার একদিন হয় পরিসমাপ্তি। অন্নপূর্ণা দেবী বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন গৃহিণী, সন্তানের জননী হয়ে। কিন্তু তা হলো না, কেননা দুজনেই সঙ্গীতশিল্পী। আর অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীর চেয়ে বড় শিল্পী।

সত্য চিরকালই রূঢ় ও কঠিন। মানুষের জীবনে যখন কোন সত্য অতর্কিতে এমনি করে প্রকট হয়ে দেখা যায়, বিশেষ করে সে সত্যকে আমরা চাই না, সে এমনিই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হয়।

বাবার ঘরে গেলাম। বাবা এবং মা দুজনেই ঘরের মধ্যে বসে। বললাম, 'অন্যায় ও অসত্যকে আমি প্রশ্রয় দিই না। নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায়, কিন্তু বিচার করতে গেলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। কেবল ঘটনা থেকে মানুষকে দোষী করা যুক্তিসংগত নয়।

আপনার মেয়ের সামনে রবিশঙ্কর ব্যাভিচার করতে পারে না বলেই এই মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছে চাতুর্যের দ্বারা। আপনারা নিজের মেয়ে কিংবা বউমাকে চেনেন না? এই কথা বলার পর দিল্লীর থেকে টেলিফোন পেয়ে কেন কাশী গিয়েছিলাম তা বললাম। জানি মিথ্যা কথা বলা অপরাধ, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নীতির প্রশ্নে মিথ্যা কথা বলা অপরাধ নয়। আমার নামে যত অপবাদই থাক, আমি মিথ্যাবাদী, এ আমার চরম শত্রুও কখনও দিতে পারেনি। দয়া করে এই অপবাদ কখনও দেবেন না। আপনি মনে আঘাত পাবেন বলেই আমি মিথ্যা করে বলেছিলাম কাশী থেকে টেলিফোন এসেছিল। আমার অবর্তমানে রবিশঙ্কর এই জন্য আপনার বৌমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে, কারণ জানে যে আমি রবিশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনাকে বলে দিতে পারি। আপনার বৌমা একা হাসপাতালে গিয়ে গর্ভপাত করাতে পারে? দিল্লীর বাড়ীর বাইরে একা কখনও সে যেতে পারে? আশিস, যার বয়স বর্ত্তমানে সতেরো বছর, সে তো ছিলই। উপরন্তু সব নাতিরা, আপনার কন্যা এবং রবিশঙ্করের চোখ বাঁচিয়ে একা কখনও বাড়ীর বাইরে হাসপাতালে যেতে পারে? সময় হলে আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। রবিশঙ্কর যেহেতু জানে যে আপনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আমার কথা শোনেন, সেই জন্য আমার বিষয়ে আপনার কান ভারি করেছে। সে ভালো করেই জানে তার বিপক্ষে বহু কথা আপনাকে বলব। রবিশঙ্করের বহু গোপন কথা আপনাকে কখনও বলি নি। আজ সেই সব কথা বলা দরকার। একটি মেয়ে রবিশঙ্করকে ভয় দেখিয়ে টাকা নিত। সেই মেয়েটি আপনাকে চিঠি লিখত। রবিশঙ্করের অনুরোধে সে সব চিঠি কখনও আপনাকে পড়ে শোনাইনি। রবিশঙ্করকে সর্বদাই তার দোষ দেখিয়েছি। তার অনেক উপকার করেছি বলেই আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এ কথা তো সত্যি, আপনি যার উপকার করবেন সেই আপনার বদনাম করবে। রবিশঙ্কর ব্যতিক্রম নয়। রবিশঙ্করের ঘরে এক তিল জায়গা নেই। আপনার মেয়ে যদি খারাপও হয়, তাহলে সে কি এতই বোকা যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সামনে আলাদা ঘরে দরজা বন্ধ করে বিমান ঘোষের সঙ্গে কথা বলবে। আপনি এতদিনে আপনার মেয়েকে চেনেন নি? আমি যদি এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে নি আপনার মেয়ে খারাপ, তাহলে একটা কথাই বলতে পারি, তার কি কপাল পুড়েছে যে বিমান ঘোষের মত একটি বয়স্ক ব্যক্তি যার চরিত্র সন্দেহাতীত নয়, তার সঙ্গে এই ধরনের কাজ করবে? আপনার কন্যা তো পাগল হয় নি? আসলে দিনের পর দিন রবিশঙ্কর হীনমন্যতায় ভুগছিল। তার মনের একটা দিক স্ত্রীর

ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে ঘর ছাড়তে অর্থাৎ পালাতে শুরু করল। একমাত্র আপনার মুখ চেয়েই আপনার কন্যা সব মুখ বুজে সহ্য করেছে, পাছে আপনি মনে কষ্ট পান। আপনি মনে করে দেখুন যে বিবাহের দুই বছর পরে, প্রথম আপনার মেয়ে রবিশঙ্করের আচরণের জন্য আলি আকবরের কাছে লক্ষ্ণৌ চলে গিয়েছিল। আলি আকবর অনেক কষ্টে আপনার মুখ চেয়ে দুজনের মধ্যে মিটমাট করে দিয়েছিলেন এবং তাই আজ পর্যন্ত বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। রবিশঙ্কর যাতে অন্য মেয়ের সঙ্গে অবাধে সঙ্গ করতে পারে, সেইজন্য বহুদিন থেকে একটা পরিকল্পনা করে একটা নাটক করেছে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা বেজে গেল এই সব কথা বলতে। মা সামনে বসে। বাবা সব কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার মেয়েকে এক জল্লাদের হাতে দিয়েছি। খুদা যা করবার করবেন। নানা কথা শুনেছিলাম আগে। ও হল মানুষেরও অধম। প্রজাপতি। ভেবেছিলাম বদলাবে, কিন্তু যে শুকরশাবক, সে মানুষের বিষ্ঠা না খেয়ে কি থাকতে পারে? কথায় আছে জন্ম, মৃত্যু বিবাহ, না গণিতে পারে বরাহ। একেই বলে ভবিষ্যৎ নইলে কেন ভুল করে মেয়ের বিবাহ দিলাম প্রজাপতির সঙ্গে?' বাবা এই কথা বলে চুপ করে গেলেন। মনে হল বাবা আঘাত সহ্য করেছেন, কেননা বাবা রবিশঙ্করের চরিত্র পূর্বেই অনেকের কাছে শুনেছেন। বাবার সব কথা শুনে মনে হোল তাঁর জীবনের স্বপ্ন সবই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখা যাক কি হয়। এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। রাত্রে বাবা কিছু খেলেন না। বাবা কেবল দুধ খেলেন। আমিও দুধ খেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম। তারপর পৃথিবীর আর সব বাড়ীর মতন এ বাড়ীতেও রাত নেমে এল। এ রাত আগেও এসেছে, কিন্তু মৈহারের বাড়ীতে বুঝি আগে কখনও এমন করে রাত নেমে আসে নি। সে দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার ঘুম এলো না। পরের দিন দ্যুতির কাছে জানলাম যেহেতু বম্বে মেল মৈহারে দাঁড়ায়না, সেইজন্য মৈহারের কাছে এসে গাড়ীর চেন টেনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, টাকা ফাইন দিয়ে রবিশঙ্কর মৈহারে এসেছিল। মৈহার থেকে রবিশঙ্কর যাবার পর বাবা আমার উপর রাগ করেছেন বুঝেই, দ্যুতি আমায় টেলিগ্রাম করেছিল। পোষ্টঅফিসে গিয়ে পরের দিন বিমান ঘোষের একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে আমাকে বিস্তারিতভাবে লিখেছে, 'রবু যে এত নীচে নেমে যেতে পারবে তা আমি কল্পনাও করি নি। বাবাকে যেন বুঝিয়ে বোলো, অন্নপূর্ণাকে আমি বোন ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না।' চার পৃষ্ঠার চিঠি বাবাকে পড়ে শোনালাম। আমার কথার সঙ্গে বিমান ঘোষের মিল শুনে বাবা স্তম্ভিত হলেন। আমি কিন্তু অবাক হলাম না। আমি জানি, যে চিরকাল বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে জানে না, মানুষের জীবনে যেমন অ্যাম্বিশনই সবচেয়ে বড় বস্তু, আবার সেই অ্যাম্বিশনই সবচেয়ে বড় শত্রু। হঠাৎ সন্ধ্যের ট্রেনে দেখি বাবার পুত্রবধূ নিজের ছেলে মেয়ে এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে মৈহারে এসে পৌঁছল। শুনলাম কোলকাতায় আলি আকবরকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে এবং পরের দিনই তারা কোলকাতায় চলে যাবে। এ সব বিষয়ে রবিশঙ্করের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রতিবেশী টিকিট, টেলিগ্রাম সব করে দিয়েছে এবং মৈহারের জন্য গাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সব কথা শুনে বাবা

পাথর হয়ে গেলেন। মনে হল রবিশঙ্কর অবসেশন এবং টেম্পোরারি ইনস্যানিটিতে বহুদিন ধরে নিজের মনে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। জুবেদা বেগমের কাছে একটা কথা শুনে অবাক হলাম। রবিশঙ্কর নাকি অন্নপূর্ণা দেবীকে বলেছে, 'তুমি ভাল বাজাও বলে যে অহংকার আছে, তার জন্য তোমার সব কটা আঙ্গুল ভেঙ্গে দেব।' কিন্তু জুবেদা বেগমের জন্য সব কিছু করতে সাহস পায় নি। পরে জুবেদা বেগম মাকে সব কথা বিস্তারিতভাবে বলেছে, রবিশঙ্কর কিরকম নীচ মনের পরিচয় দিয়েছে। মা সব কথা শুনে বাবাকে বললেন, 'বৌমা বলেছে অন্নপূর্ণাকে নিয়ে আলি আকবরের কাছে আগামীকালই চলে যাবে।' কি করবেন বাবা কিছুই বুঝতে পারছেন না। জুবেদা বেগম আমাকে বললেন, 'যেমন করে হোক বাবাকে বুঝিয়ে রাজী করান।' কথাটা আমার কাছে যুক্তি যুক্তই মনে হোল। বাবাকে বললাম, 'এদের কোলকাতায় যাবার অনুমতি দিন। নূতন পরিবেশে আলি আকবরের কাছে গেলে যে মানসিক অশান্তি হয়েছে, কিছুটা হয়ত লাঘব হবে।' আমার কথা শুনে বাবা রাজি হলেন। বাবাকে দেখে মনে হোল, ভাগ্য তো কারো চিরকাল সমান চলে না। তারও ওঠানামা আছে। বাবারও সুখ সাধ উল্টে গেল। মনে হোল বাবা বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। জীবনটারই যেন কোন মানে রইল না। সব যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে বাবার চোখের সামনে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গিয়েছে মৈহারের বাড়ীতে। জুবেদা বেগমের কাছে আরো অনেক কথা শুনলাম। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গীতের খাতাগুলো আনতে দেয়নি। দিল্লী ছাড়ার আগে কত কষ্ট করে যে মৈহারে আসতে পেরেছে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে কথা কল্পনা করা যায় না। এ যেন কসাইয়ের হাত থেকে মুক্তি। গ্রেট স্কেপ।

অন্নপূর্ণা দেবী চিরকালই চাপা। কখনও রবিশঙ্করের নিন্দা করতে শুনিনি। এ এক বিচিত্র চরিত্র। মুখ বুজে কেবল সহ্য করে গেল। কোন অভিযোগ কারো কাছে করে না। কারোর মুখের উপর কোন কথা বলতে পারে না। যে যা বলে শুনে যায়। কিন্তু এ হল যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রী, বাবার কথা ভেবে আত্মহত্যার চিন্তা উড়িয়ে দেয়। যার মনে পাপ নেই সে কেন আত্মঘাতী হবে? জীবনে কেবল দুইবার প্রতিবাদ করেছিলেন। সে কথা পরে বলবো। আমার জীবনে সে এক মহাসংগ্রামের সময়। সংগ্রাম কি শুধু বাইরের সঙ্গে? কিন্তু ভেতরের সঙ্গে যে সংগ্রামই কঠোর। তাই সেদিন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে আবার রাত নেমে এলো মৈহারে। ঘটনার আয়নায় সর্বদা দুর্যোগ চেনা যায় না, হঠাৎ দুর্যোগ আসে। এই দুর্যোগ, মন দিয়ে শুনে বাবা বললেন, 'কোরাণে সুমার হোসেনকে বধ করেছিলো। সুমার বুকে চুল ছিলো না। এই শুয়ার কে বচ্চের বুকেও চুল নেই। রক্ত মাংসে গঠিত হলেও যে বক্ষ লোমহীন, সে বক্ষ পাষাণ হয়, হোসেনের মাতামহ বলেছিলো সেই লোমশূন্য, বক্ষই, কাতেল হয়ে থাকে।'

বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আরে কাফের, তুমি যে কাজ করেছ সমস্তই আমি জানতে পেরেছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করতাম, ভালবাসতাম, ভালবাসার উপযুক্ত কাজ করেছ। ভালো! সুখে থাক! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি ক্ষমা করলেও ভগবান

তোমাকে ক্ষমা করবেন কি জানি না। বিচারের ভার আমি নেব না। বিচারকের প্রতি বিশ্বাস করে তাকে বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিধর্মী, নারকী, দুষ্ট, খল, শত্রু, কেবল কার্য উদ্ধারের জন্য ভান করে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? মন্দের ভালো যে গণ্ডা বাঁধিনি। এই সব লোককে বিশ্বাস করতে নেই, কিন্তু এত কথা দেখে শুনেও চিনতে পারি নি। তোমাকে দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলে মরার অভিশাপ দেব না। তুমি অনন্তকাল বাঁচো, আর রোজ তুষের আগুনে দগ্ধে দগ্ধে নিজের পাপক্ষয় কোরো।' বাবা কষ্ট পেয়েছিলেন। গুরুকে কষ্ট দিয়ে দুশ্চরিত্রের শেষ পরিণাম সুখদ হয়নি। কেন সুখদ হয়নি সেটা যথাস্থানেই বলব। দেখতে দেখতে কোলকাতায় যাওয়ার সময় এসে গেল। আমি আলি আকবরকে টেলিগ্রাম করে দিলাম, 'বম্বে মেল কলকাতায় পৌঁছালে যেন স্টেশনে থাকে।'

পরের দিন বিদায়ের আগে বাবা এবং মা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সকলেই চলে গেল। তখন বাড়ীতে আবার সেই বাবা, মা এবং আমি। যে জীবনকে কেন্দ্র করে এতগুলো চরিত্র একদিন আবর্তিত হতে শুরু করেছিলো, তারা যে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল নিয়তির নির্মম আঘাতে। কে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেল তা নিয়ে যেন আলি আকবরের ভাবনার কোন দায় নেই। সে যেন শুধু নির্বিকার, নির্বিকল্প, নিরঙ্কুশ হয়ে বাঁচবার জন্য জন্মেছে। অথচ তাকে জড়িয়েই তো বাবার যত সাধনা। অবশ্য আলি আকবর এর একটা সমাধান করেছিলো অনেক পরে।

এরা চলে যাবার পর বাবাকে হাত জোড় করে বললাম, 'বাবা একদিন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এর পর আমার থাকা চলবে না। আমি কাশী চলে যাব।' বাবা হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, 'তুমিই আসল পুত্রের কাজ করেছ। তোমার চোখ, মুখ, দেখে বুঝতে পারি, একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করা চলে। তুমি কেন যাবে? তুমি আমার কাছেই থাকবে। ওই শুয়ার কে বচ্চে, কাফেরের মুখ আমাকে আর যেন দেখতে না হয়।' বাবার এই কথা শোনার পর কথা বাড়াতে আর সাহস হোল না। ছদিন পরেই রবিশঙ্করের চিঠি এল বাবার কাছে। রবিশঙ্কর লিখেছ, 'পূজনীয় বাবা, আপনার মুখ চেয়ে আমি সব ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনার মেয়ে, বৌমা জোর করে চলে গেছে, এর জন্য আমি দায়ী নই। মৈহারে এ নিয়ে যা বলে এসেছিলাম, সে কথা আবার বলছি। আপনি মেয়ে এবং বৌমার কথা শুনে হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, আপনি যদি আমার কথা না বিশ্বাস করেন তাহলে যে কথা আগে বলে এসেছিলাম, সেই কথা আবার বলছি। আমি আমার নিজের সব আঙ্গুল কেটে দিয়ে সেতার ছেড়ে দেব। আমার একান্ত অনুরোধ যতীনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।' বাবা চিঠি পড়ে বললেন, 'শুয়ারের বাচ্চা, কুমিরের চোখে জল।' বাবা আমাকে চিঠি দিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দিও।' বাবা চিঠির উত্তর দিলেন না। অবাক হয়ে ভাবি একই মানুষের মধ্যে কি দুটো বিরুদ্ধ চরিত্র একই সঙ্গে বাস করে? এই রকমই কিছু অনুমান করেছিলাম আমি। দুর্যোগ সম্পর্কে সব সংশয় ঘুচে যেতে আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা সংযত হয়েছি আমি। সত্যকে দেখেও যারা দেখে না, তারা কি

প্রকৃতির মানুষ বুঝিনা। সত্য দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা, কেন এরা বোঝে না তা বুঝি না। এরা অন্য ধাতুতে গড়া। বুদ্ধিজীবি মানুষ, প্রতিভাবান মানুষ বলে এদের অনেক চেষ্টাই দানা বেঁধে ওঠে না। প্রতিভাসম্পন্ন যুবচেতনাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। আসলে স্বার্থের বেলায় সকলেই এক। কিন্তু স্বার্থ থাকলেই কি আগুনে হাত দিতে হবে? হাঁ স্বার্থের জন্য এরা সবই পারে। এক ধরনের মানুষ সকলকে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে, বা সকলের মাঝে জড়িয়ে বেড়ে উঠতে চায়। আবার আর এক ধরনের মানুষ থাকে যারা সকলকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বটাকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাদের কাছে তুমি কেউ নও। আমি কেউ নই। তারা নিজেরাই সব। তারা নিজের প্রয়োজনে সকলকে কাছে ডাকে, আবার কাজ হাসিল হয়ে গেলে তাদের দূরে ঠেলে দেয়। জীবনে সম্মান, অর্থ, যশ, এরা সব কিছুই পায়। কিন্তু যাদের বিবেক আছে তারা কি এরকম করতে পারে? মনে হয় আজকের যুগে এই বিবেকের কোন মূল্য নেই।

এর পর আমি আলি আকবরকে চিঠিতে লিখলাম, 'আপনি নিশ্চয় সব শুনেছেন। আমার চেয়ে রবিশঙ্করকে যথেষ্ট বেশী চেনেন। সুতরাং এর পরও বাবার মুখ চেয়ে যেমন করেই হোক এদের মিল করিয়ে দিন, যেমন তেরো বছর আগে করিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে আলি আকবরের চিঠি পেলাম। আলি আকবর লিখেছে, 'তুমি, বাবা এবং মায়ের কাছে থেকে সান্ত্বনা দিও। রবু এক নম্বরের মিথ্যাবাদী। একথা আমার অজানা নয়। আর জুবেদার কথা? আমি আমার স্ত্রীকে চিনি। তার হাজারো অবগুণ থাকলেও সে ওই ধরণের কাজ করবে না। সুতরাং তার জন্য তোমার চিন্তার কারণ নেই। বাবা এবং মা যেন আসল কথা বুঝতে পারেন। তার জন্য খেয়াল রেখো।' যাক, সত্যের জয় হোল। আমার দুশ্চিন্তা এখন অনেক কম। মনে হোল সত্যিকারের দেখাটা সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়। তার আকস্মিক আবির্ভাবে এবং অন্তর্ধানে।

মাকে আলি আকবরের চিঠিটা শোনালাম। হঠাৎ কি হল জানি না, সোজা বাবার কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি অন্নপূর্ণাকে যাবার অনুমতি দিলে? মেয়ের প্রতি দয়া নেই।' এ কথা শুনে ভাবুক দৃষ্টিতে বাবা বললেন, 'অন্নপূর্ণা আমার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। আমি ধর্মগুরু নই। আমি তত্ত্ব দিয়ে মিথ্যার বিচার করি না। আমার কাছে ঘটনাই একমাত্র সত্য। ঘটনাকে আমি বাধা দিই না। যারা যাবার জন্য তৈরি হয়েছে তাদের যেতে দিয়েছি। যারা সম্মত হয়েছিল তাদের আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি যেমন প্রেরণা দিই না, উপদেশ দিই না, প্ররোচিত করি না, তেমনি বাধাও দিই না।' এই কথা বলে বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি অবাক হয়ে বাবার কথা শুনলাম। মনে মনে ভাবলাম কথাটা কে বলছে, বাবা, না তার আত্মা? বাবার কথা শুনে বিস্মিত হই।

যদিও রবিশঙ্করের প্রতি আমার ঘৃণায় মনটা ঘিন্ ঘিন্ করছে, কিন্তু এককালে যে তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, সে কথা কি করে অস্বীকার করি। মনে মনে বলি, ভালোবাসা ও ঘৃণা যদিও দুটি বিপরীত বস্তু, তাহলেও দেখা যায় ভালোবাসা থেকে যেমন ঘৃণার জন্ম হতে পারে তেমন ঘৃণার পিছনেও অনেক সময় অবচেতন মনে থাকে ঐ ভালবাসাই। ব্যাপারটা

বেশ জটিল। রবিশঙ্করের একটা জিনিষ বারবার দেখে এসেছি এবং পরবর্তীকালেও দেখেছি, টাকা এমনিই জিনিষ, নাকের ডগায় টাকা দেখালে অনেকেই উল্টো রাস্তায় চলে। রবিশঙ্কর চামচেদের প্ররোচনায় যে অপরাধ করেছিল তা দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে উপলব্ধি করেছিলো। যাক এ তো অনেক পরের কথা।

সূর্য রোজ পূর্বদিকে ওঠে কিন্তু মানুষের জীবনটা রোজ একরকম হয় না। মানুষের জীবনটা বিচিত্র, অদ্ভুত। কই এতদিন ধরে পৃথিবী চলছে, তবে আজকের সঙ্গে কালকের তো কোনও মিল থাকে না। আজকের ঘটনাটা তো পরের দিন আর খাটে না। নিজের মনের মধ্যে মনে হোল, আকাশপাতাল তোলপাড় হচ্ছে। বাজনা মাথায় উঠেছে। নামমাত্র বাজাই। এখন কেবল আবোল তাবোল চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। মৈহারে কি বিপর্যয় ঘটে গেল। এক এক সময় মৈহারে থাকতে বিবেকে বাধছে। পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, যাকে একদিন এত ভালবাসতাম, তার বাইরেটাই দেখেছি কিন্তু ভেতরটা দেখতে পাইনি। আমার মতো সকলে বোকা নয়। তারা জানে সংসারে যে আদায় করে নিতে পারে সে জেতে। আজকের যুগে সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা ইত্যাদির কোন দাম নেই। এই যুগের স্বভাবটা তারা আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে। কিন্তু বাবার কাছে থেকে এই শিক্ষা তো পাইনি। মানুষের শুভ অশুভর অপেক্ষা করে, জীবন বসে থাকে না। নিঃশব্দে সে তার নিজের পথেই এগিয়ে চলে। কখনও আশা, কখনও আশঙ্কা, কখনও বা উৎকণ্ঠা নিয়ে সে তার আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যায়। রাত্রে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। সকলেই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমারই ঘুম নেই, কত কথাই মনে হয়। অনেক দিনের অনেক ঘটনা অনেকরকমভাবে আমাকে ভাবায়, কখনও কাঁদায়, আবার কখনও বা নূতন করে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। যখন হতাশায় অসাড় হয়ে পড়ি তখন কোথা থেকে আবার সাহস খুঁজে পাই। মনে বল খুঁজে পাই। বাবা বলতেন, 'যে আঘাতই পাও, নিজের কাছে ছোটো হয়ো না, টাকার দারিদ্র্য একদিন ঘুচলেও ঘুচতে পারে, কিন্তু মনের দারিদ্র্যর কোন ঔষধ নেই। এর কোনও ক্ষমা নেই। আঘাত ভালবাসা অনেক পেলেও নিজেকে কখনও ছোট কোরো না।' কিন্তু আমার জীবনের ট্রাজেডি কাকে বলব? আমি যেখানে যার সঙ্গে মিশতে গেছি, যাকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে গেছি, যারই উপকার করতে গেছি সেখানেই একটা না একটা বাধা এসেছে। একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এ আমার ভাগ্যের দোষ।

ইচ্ছে করছে সেখানে যেতে যে দেশে মৃত্যু নেই, প্রাণ আছে। আঘাত নাই, ভালবাসা আছে। কিন্তু সত্যই কি সে রকম জায়গা আছে। যদি থাকে তাহলে হয়তো কোলকাতার বেদান্ত মঠে আছে। দেখা যাক কি হয়?

মনে মনে বলি এই দুনিয়াটাই মন্দ। এই মন্দর রাজ্যে, মন্দ না হলে লোকে বাঁচবে কি করে? কি করে টিকে থাকবে মানুষ। আবার ভাবি এই সংসারে ভালোও আছে, মন্দও আছে। মন্দই বেশী, সবাইকে নিয়ে যখন ঘর করতে হবে তখন মন খারাপ করলে চলে?

মানুষের জীবনের এক প্রান্তে আছে অস্তি, আর একপ্রান্তে আছে নাস্তি। এই হাঁ আর না-র মধ্যে দিয়ে জীবনের গতি চলছে ঠিক ঘড়ির পেনডুলামের মত। একা লয়ে ডায়ে বাঁয়ে

চলে। একবার বলে আমি সংসারের মধ্যে বাঁচবো, আর একবার বলে সংসারের বাইরে। আমার মত অবস্থায় পড়লে যে কোনও লোক গলায় দড়ি দিত, গঙ্গায় ঝাঁপ দিতো, রেলের চাকার তলায় মাথা দিত, কিন্তু এত সহজে হেরে গেলে তো চলবে না। এত সহজে আমি ছাড়ব না।

মৈহারে আসা অবধি দেখেছি পৃথিবীর অন্য জায়গায় যে নিয়ম, বাবার বাড়ীতে সে নিয়ম নয়। বাবার বাড়ী পৃথিবী থেকে আলাদা। দিনের বেলা এবং রাত্রে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে কোথা থেকে সকাল হয় কোথা দিয়ে রাত হয় টের পাওয়া যায় না। তাই যারা বাড়ীতে থাকে তারা এ পৃথিবীর মানুষ থেকে আলাদা, এখনও সেই নিয়ম চলছে। কিন্তু বাবার জীবনে কেন এমন হোল? কোথাও কোন শান্তি নেই। কোথাও যেন কোনও সান্ত্বনা লাভ নাই। শুধু দেহটাকে কোন রকমে বয়ে বেড়ানো। এমন করে, এত আগ্রহ করে কার ভালো বাবা চেয়েছিলেন? কার মঙ্গল কামনা করেছিলেন? কার ভালোর জন্য বাবা দিনরাত নিজের বিশ্রাম, নিজের স্বাচ্ছন্দকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন?

মৈহারে এসে অবধি দেখছি সবাই সব কথা গোপন করতে বলে। কিন্তু সংসারে সবাই কি সবাইকে অবিশ্বাস করে? দেখি কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এ এক গোলক ধাঁধাঁ। নানা রকম চিন্তা করতে করতে সব রাতই এক সময়ে ভোর হয়, সব দিনই এক সময়ে আবার সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে ঠেকে। তবু দিন রাতটা যেন কাটতে চায় না। শেষ রাতে কখন ঘুম আসে জানি না।

সকালে উঠে বাজাতে ইচ্ছে করে না। একান্তে নানা চিন্তা দিনরাত মাথার মধ্যে ঘোরে। মনে হয় আমরা বেশীর ভাগ লোকই বাইরে একরকম, আর ভেতরে আর একরকম। যা মুখে বলি তা কাজে করি না। এই বাইরের জীবনের সঙ্গে আমাদের ভেতরের জীবনের আকাশপাতাল ফারাক বলে আমরা শেষকালে এত কষ্ট পাই। আসলে জীবনের সমস্তটা দেখে কিংবা পড়ে অনেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে শেখে। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে যায়। তখন মনে হয়, জীবন সম্বন্ধে যদি এটা জানতে পারতাম তাহলে অন্যভাবে জীবন আরম্ভ করতাম।

মৈহারে এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ডাক্তার গোবিন্দ সিং এল। বাবা কোন জিনিষ চেপে রাখতে পারেন না। সব না বললেও, প্রকারান্তরে বাবা রবিশঙ্করের কাছে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছেন বললেন। ডাক্তার বুদ্ধিমান লোক, কি বুঝলেন জানি না। ডাক্তার বললেন, 'আজকাল যাকে আপন ভাবা যায় তারাই ধোঁকা দেয়। মতলবের সময় তাদের একরূপ, কিন্তু মতলব ফুরিয়ে গেলে সব ভুলে যায়। এই কথা বলে উর্দুতে একটি শের শোনালেন,

দুনিয়া কে বনালে বালো নে
দুনিয়া য্যার অজীব বনায়ী হয়
জিসকো হমনে সমঝা অপনা
নিকলা ওহি কসাই হয়।

বাবা কবিতাটা বার বার শুনে নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলেন। ডাক্তারের কথা শুনে বাবার মনটা একটু হাল্কা হল। কিন্তু বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে মন ও শরীর দুটোই ভেঙ্গে পড়েছে। বাবার এই মানসিক অবস্থা দেখে কেবলই ভেবেছি, কেন এমন হোল? বাবা তো সজ্ঞানে কখনও কোন অন্যায় করেন নি। কারো অমঙ্গল চান নি। কোনদিন এতটুকু অসুন্দরের চিন্তাও করেন নি। তবু বাবার ভাগ্যাকাশে এ অশনি সংকেত?

বুঝলাম যে এ সবই বিধির বিধান। এবার ঘটনাবলী এগিয়ে চলল সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার নানা আবর্তনের মধ্য দিয়ে, যার পরিণতি করুণরসাত্মক।

———

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

আমার প্রাক্তন গুরুবর্গ ও বাবা আলাউদ্দিন খাঁ

ড. প্রণব সেন (Violinist)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (রসায়ন বিভাগ)
স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা-৭০০০০৬

"গাণ্ডীবের পরিপূর্ণ ব্যবসায় ব্যস্ত থাকে তুণ,
সারথী নিস্পৃহ যবে সেই ক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।"

—বুদ্ধদেব বসু

গুরু শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল (১৯০৪-৯০)
সুরের গুরু (Moment Musical)

আমার প্রথম গুরু অতীত দিনের প্রখ্যাত বেহালা বাদক শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল মহাশয় (প্রতিবেদকের শিক্ষাকাল ১৯৬৩-৮৩), যিনি তাঁর বাদনশৈলীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ Tonal quality ও মায়াবী Bowing এ আচ্ছন্ন সাড়ে তিন মিনিটের Record-এ ধরা আহির ভৈরব, বাগেশ্রী, আড়ানা, দরবারী কানাড়া ইত্যাদি প্রায়শই আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হত। আজও তা কানে বাজে। তাঁর কাছেই প্রথম উস্তাদ বাবার শিশুসুলভ সারল্যের পরিচয় পেয়েছিলাম। St. Xaviers School-এ বাবার সম্বর্দ্ধনা সভায় বালক পরিতোষের বাজনা শুনে তার মস্তক চুম্বন করে বাবা বলেছিলেন, 'খোকা তোমার বেহালাটাতো বেশ ডাকে—আমারটা ডাকে না কেন?'

প্রতিভা হল শিক্ষা নিরপেক্ষ ঈশ্বরদত্ত শক্তি। অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন কোন হীরকখণ্ড যদি প্রকৃত মনিকারের হাতে পড়ে, তার কৌণিক বিচ্ছুরণ ক্ষমতা ও দ্যুতিময়তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

পরিতোষ বাবুর ক্ষেত্রে প্রথম মণিকারটি ছিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত বেহালাবাদক ড. সানড্রে। তাঁর কাছে দীর্ঘ ১৪ বছর ধ্রুপদী পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিক্ষার পর ম্যাডান কোম্পানিতে বেহালাবাদকের পদে যোগদানের মাধ্যমে পরিতোষ শীলের কর্মজীবন শুরু হয়। সেটা ছিলো ছায়াছবির নির্বাক যুগ। কটক, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর হয়ে ফিরলেন কলকাতায়। কলকাতার 'শো হাউসে' তাঁর পরিচয় হল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। এটা ছিলো মহাকালের নির্বন্ধ। কবি পরিতোষের প্রতিভা চিনে নিতে একটুও সময় নেন নি। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কবি তাঁর নিজের প্রভাব খাটিয়ে এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন কোম্পানিতে পরিতোষের যোগদানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। কালপুরুষের ইচ্ছায় দ্বিতীয় মণিকার আবির্ভূত হলেন পরিতোষ শীলের জীবনে। যিনি এক রহস্যময় শক্তির ইঙ্গিতে পরিতোষ শীলের নির্মিতিতে এক অনন্য স্বাক্ষর রেখে যাবেন।

উস্তাদ জমিরুদ্দিন খান ছিলেন এইচ-এম-ভির প্রশিক্ষক। তৎকালীন কলকাতার উদীয়মান শিল্পীদের প্রায় অনেকেই কোন না কোন সময় উস্তাদ জমিরুদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

যে কোন গান বা বাজনা শুনতে শুনতে সর্টহ্যাণ্ড-এ হুবহু নোটেসন করার অপার্থিব ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে খাঁ সাহেব নিজেই পরিতোষকে তালিম দিতে চাইলেন। তাঁর মত ব্যস্ত ও নামি উস্তাদের দিক থেকে এটি একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে থাকলো।

শিক্ষার বাসনা, শিল্পীসুলভ অতৃপ্তি, থেমে না থাকা, আরো এগিয়ে চলার পিপাসা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। ঈশ্বরের এই আশিস পরিতোষ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। উস্তাদ জমিরুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে নাড়া বেঁধে নতুন পথের সন্ধানী হলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিগন্ত একটু একটু করে মেলে ধরলেন পথের দিশারী জমিরুদ্দিন। একটানা লাগাতার (১৯২৯-১৯৪১) কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী ১৩ বছরের পথ পরিক্রমণের পরেও পরিতোষ শীল মি: মেজের সন্নিধানে আরো ২ বছর উচ্চতর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করুন খনিজ হীরক খণ্ডটির Polishing ও cutting চলেছিলো দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে।

এইচ-এম-ভি কোম্পানির একটা Legacy ছিলো শুধু ব্যবসা নয়, তারা আরো বেশী করে জানতো কি করে প্রকৃত গুণীর মর্যাদা রাখা যায়, কদর করা যায়। অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে কিভাবে তাঁকে ব্যবহার করা হবে সে চিন্তাও থাকতো। একই সঙ্গে সর্টহ্যাণ্ড, স্টাফ নোটেসন ও হিন্দুস্তানী স্বরলিপি করার দক্ষতা তারা একমাত্র পরিতোষ শীলের মধ্যেই দেখেছিলো। তাই তাঁকে নির্দ্বিধায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীত সংগ্রহে নিযুক্ত করা হল। পরিতোষ শীল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্বরলিপি করতে পারতেন সুরটি শোনার সাথে সাথেই।

এইচ-এম-ভি নজর করল পরিতোষ শীলের মধ্যে তারা এক বিরল শ্রেণীর শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছে যাঁকে ধ্রুপদী, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত, ভারতীয় শাস্ত্রীয় উপশাস্ত্রীয়, লোকগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বা ফিল্ম মিউজিকের বেড়াজালে আটকে রাখা যায় না। তিনি গুণমানে অনন্যসাধারণ এবং যাঁর অব্যর্থ স্বরক্ষেপ ও বোইং এর যাদুতে শ্রোতা শিহরিত হয়। কোম্পানি তাঁকে সার্বিক ভাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল।

পরিতোষ শীলের বাজানো রাগসঙ্গীতের সাড়ে তিন মিনিটের রেকর্ড সারা ভারতের জনমানসে সাড়া ফেলেছিলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আলাপ, গত ও ঝালায় ব্যাকরণ ও নান্দনিকতার এমন সুষম প্রয়োগ, ভায়োলিন যন্ত্রে এর আগে বা পরে দেখা যায় নি। এখানে স্মর্তব্য আর কোন উত্তর ভারতীয় বেহালা শিল্পীর সংক্ষিপ্তবাদন সে সময় বা পরে এইচ. এম.ভি. যন্ত্রস্থ করেছে বলে এই প্রতিবেদকের জানা নেই। প্রভাতী রাগ আহির ভৈরব, দ্বিপ্রহরের পিলু, ঋতু পরিচায়ক সুরমল্লার, রাতের বাগেশ্রী, মধ্যরাতের দরবারী বা আড়ানার পূর্ণ আস্বাদে মানুষ মজে গিয়েছিলো। রাগগুলি আকাশবাণী থেকে বারংবার প্রচারিত হয়ে সারা ভারতে তাঁকে অদ্বিতীয় বেহালাবাদকের মর্যাদা দিয়েছিলো। ভায়োলিনে রাগ সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পথিকৃত।

পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের 'আয়গা আনে বালা' গানটি সারা ভারতে আপামর জনসাধারণকে আলোড়িত করলে এইচ-এম-ভি পরিতোষ শীলের বেহালায়

গানটির সুর বাজারে আনলো। ফলশ্রুতি হল এই যে original বা মূল গানটির থেকেও এটি বেশী জনপ্রিয় হল এবং অনেক অনেক বেশী ব্যবসায়িক সাফল্য এনেছিলো। সুধী পাঠক মনে রাখবেন মূল গানটি ছিলো "No other than" লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। এই বিনিয়োগের সাফল্য সম্পর্কে কোম্পানি ১০০ ভাগ স্থির নিশ্চিত ছিলো। তার একটাই কারণ, তা হল শ্রীপরিতোষ শীলের শিল্পসত্তা ও তাঁর অলোকসামান্য যাদুকরী মায়াবী জনমোহিনী নান্দনিক বোইং এর অভিব্যক্তিতে তাদের আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস।

ঠিক এই সময় থেকেই হিংসুক বাদক গোষ্ঠী পরিতোষ শীলকে 'কমার্শিয়ল আর্টিস্ট' তকমা দিলো। তৎকালীন অথবা তৎপরবর্ত্তী যুগের কোন 'বেহালা' বাদককে রেকর্ড কোম্পানি এই প্রস্তাব দিলে তা তৎক্ষণাৎ নামঞ্জুর হত। শুধুমাত্র উন্নাসিকতার আবরণে তাদের অপারগতা ঢাকতে। সঙ্গীতের কোন জাত নেই। "Music is the universal language of mankind" একমাত্র পরিতোষ বাবুই তা প্রমাণ করতে পারতেন। হিংসুকদের কবজীর সে জোর ছিলো না।

Staff notation-এ রবীন্দ্রসংগীতের সুর ধরে রাখার ব্যাপারে পরিতোষবাবু ছিলেন অগ্রণী। তাঁর বাজানো বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। বিশেষত বাঙ্গালী মহলে। "কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে" গানটির একটি কলি হল "ভালোবেসে ছিনু এই ধরণীরে ভালোবেসে ছিনু" এটি পুনরাবৃত্তি করার সময় পরিতোষবাবু একটি Filler ব্যবহার করলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওহে এটা আমার গানে ছিলো নাকি?'

উত্তরে পরিতোষবাবু বলেছিলেন, 'আমায় মাফ করবেন গুরুদেব, এটি হঠাৎ এসে গেছে। Recording-এর সময়ে বাদ দিয়ে দেবো।' প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আরে বাপু, আমি কি বাদ দিতে বলেছি? 'তোমার এই প্রয়োগটি আমার বেশ লেগেছে। এটি Record-এ রাখার অনুমতি দিলাম।' নিজের গানের খুঁটিনাটি বিষয়ে অতি সতর্ক রবীন্দ্রনাথ একমাত্র পরিতোষ বাবু সম্পর্কে এই কোমলতা দেখিয়েছিলেন।

পরিতোষ শীলের পরিশীলিত ছড়ির রহস্যময়তা

Violin যন্ত্রের গতিময়তার প্রকাশভঙ্গী নির্ভর করে বোইং এর কৌশল গত প্রয়োগের উপর। পাশ্চাত্ত্য মতে এই গতিময়তাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করার অধিকারী মাস্টারমশাই এর সবথেকে মেধাবী ছাত্র ডঃ চিন্তামণি রথ। তিনি এখন ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন। তাই এই প্রতিবেদককে দীর্ঘকাল পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির গতিময়তার আলোচনায় প্রথমেই আসে Very Slow (Lento), Slow (Largo), moving at an easy pace (Adagio) moderately slow (Andante), not slow as andante (Andantino), at a moderate speed (Moderato), rather quick (Allegretto), quick (Allegro), very quick (presto) ইত্যাদি।

বেহালা যন্ত্রে আলাপ, জোড়, ঝালা, গত ও তালাধ্যায়ের ক্রমবিন্যাসে উপরোক্ত গতিময়তা বা movement-এর যথাযথ প্রয়োগ সে যুগে একমাত্র পরিতোষ শীলের বাদনেই

অনুভূত হত। উত্তর ভারতের বেহালা বাদকদের যাঁরা ছড়িটিকে তালপাতার হাতপাখার মত ধারণ করেন, তাঁদের প্রায়শই কর্কশ শ্রবণ অযোগ্য শব্দ সৃষ্টি করতে শোনা যায়। পরিতোষ শীলের Bowing ছিলো এতটাই পরিশীলিত, সাবলিল, মার্জিত মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত যে আরোহণ অবরোহণ জনিত অবশ্যম্ভাবী Bowing পরিবর্ত্তন কখনও শ্রবণে ধরা দিতো না। দক্ষিণী বেহালাবাদকদের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ করেও বলছি Violin-এ কৃন্তন ছন্দবৈচিত্র ও বোলের ব্যাপক অনায়াস প্রয়োগ একমাত্র পরিতোষ শীলই করতে পারতেন। সে যুগে তো বটেই আজও ডঃ এল সুব্রহ্মণিয়ম ছাড়া আর কারো বাদনে উপরোক্ত গুণাবলীর প্রকাশ দেখিনা। একমাত্র কারণ শিল্পী পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বাদনে অতীব পারদর্শী, তার সঙ্গে কর্ণাটকী (কর্ণ আট কী!) music তো আছেই। বলে নেওয়া ভাল সামগ্রিকভাবে দক্ষিণী বেহালা বাদকদের Bowing control অতি উচ্চমানের কারণ তাঁরা Bow-এর পূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন।

ঠাকুরবাড়ীর সরলাদেবী চৌধুরাণী যিনি নিজে Violin যন্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন 'দক্ষিণের ঘরে ঘরে বেহালা শিল্পী গড়ে উঠেছিলো পর্তুগীজদের দাক্ষিণ্যে। সেই Tradition আজও চলিয়াছে।' প্রতিবেদক মন্তব্যটিকে আংশিক সত্য বলে মনে করে।

কারো কারো বিশ্বাস অতীতে আমাদের গর্ব করার মত কিছুই ছিলো না। এখন যা কিছু দেখি তা সবই সাহেবদের অবদান। Hindu phobic-রা Jaundice রোগীর মত সবই হলুদ দেখেন। নইলে অন্ধের ভূমিকা নিয়ে চোখ বুজে থাকেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে কি কারণে Violin যন্ত্রটি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দোসা বা ইডলীর মতই ঘরে ঘরে গৃহস্থালী উপকরণ হয়ে বিদ্যমান? কেন দক্ষিণ ভারতীয়রা বেহালাবাদনের Technique ও Bowing পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ মানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাখতে পারলো যা আদৌ ইউরোপীয় বা পশ্চিমী নয় অথচ সম্পূর্ণভাবে তাদের শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত বাজানোর জন্যে উদ্ভুত হয়েছে? পর্তুগীজ আগমনই যদি যন্ত্রটির ঘরে ঘরে প্রসারের মূল কারণ হত তবে তারা সারাবিশ্বে পরিচিত Europian technique-এ Western music-ই বাজাতো। Hindu phobic-রা ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের উদাহরণে ক্ষুধাভরণ করলেও Mythology-তে তাঁদের ঘোরতর Allergy এবং বিদ্বিষ্ট অনিহা। তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই স্বয়ং রামচন্দ্র যুদ্ধান্তে রাবণের মৃত্যুকাল সন্নিকট দেখে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলেছিলেন 'হে লক্ষ্মণ তুমি এই জ্ঞান তাপসের পদপ্রান্তে বসে ওঁর কাছে কিছু উপদেশ নাও। আমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ যদি কিছুটা অন্তত লাঘব হয়।'

রামায়ণ খ্যাত 'রাবণ রাজা' একজন মহাজ্ঞানী রক্ষকুলপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন এক জীবন্ত গ্রন্থাগার। একটি মস্তক তাঁর জ্ঞানকে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না, পর্যাপ্ত ছিলো না। তাই রূপকের আশ্রয় নিয়ে তাঁর দশটি মস্তক কল্পনা করা হয়েছিলো। দশাননে তিনি তাঁর ঈষ্টদেবতা শিবকে তুষ্ট করতে রুদ্র স্তোত্র পাঠ করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে তিনি ছিলেন এক উচ্চকোটির সংগীত সাধক। রুদ্রবীণার সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিলো "বাহুলীন" বাদনে। কারো কারো বিশ্বাস এই "বাহুলীন" থেকেই

Violin যন্ত্রের নামকরণ হয়েছে। উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাবের ফলে "সারেঙ্গী" সর্বতোভাবে আজও কণ্ঠসংগীতকে অনুসরণ করে থাকে। দক্ষিণ ভারতে ব্যবহৃত হয় "বাহুলীন"। এই যন্ত্রে পারঙ্গম শিল্পীর সংখ্যা তাই অগণন। কণ্ঠসঙ্গীতে সহায়ক হিসেবে যন্ত্রটি অত্যাবশ্যকীয়। উত্তর ভারতে এর এক শতাংশ বেহালাবাদক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং তাদের মান শ্রেণীগতভাবে দক্ষিণের অনেক নিম্নে।

শ্রীপরিতোষ শীলের একটিমাত্র ত্রুটি, ব্যর্থতা ও তাঁর ধারার অবলুপ্তি

হিন্দুস্তানী সংগীত শেখানোর সময় বিভিন্ন শিষ্যের খাতায় পরপর বেশ কয়েক আবর্ত্তনের (পাঁচ সাতটি) তান লিখে দিতেন। তানগুলি আসতো অবলীলায় আয়াসহীন ভঙ্গিতে। এর জন্যে বিশেষ সময় তাঁকে ব্যয় করতে দেখিনি। তিনি ছিলেন এতটাই সাবলিল। তানগুলি হত স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, যতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এক একটি নতুন তেহাইএ সমৃদ্ধ। Western music-এর শিক্ষালব্ধ Bowing ও Fingering-এর জ্ঞান থাকায় আমরা তা রিয়াজের মাধ্যমে অধিগত করতাম বেশ নিখুঁত ভাবেই। শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে বলছি আমার নিজের বাদন মনে হত তোতাপাখীর "হরেকৃষ্ণ" বলার মত। তা ছিলো নিতান্তই শেখানো বুলী। কোন নতুন বোধ বা অনুভবের জন্ম দিতো না। আজ বুঝি কেন ভারতীয় সংগীতে পারিবারিক উত্তরাধিকার অত্যাবশ্যকীয় যা আমার ছিলো না। দক্ষিণ ভারতে কেবল মাত্র Composer ধর্মী উচ্চাঙ্গ সংগীতে এই ধরনের শিক্ষার প্রচলন আছে। তবে তা স্মৃতিতে ধরে রেখে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করা অতীব উচ্চশ্রেণীর মেধাবী শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব, সর্বসাধারণের জন্য নয়। তাই এই প্রতিবেদক মনে করে শ্রীপরিতোষ শীলের শিক্ষা পদ্ধতি সাধারণ শিষ্যের সংগীতবোধ ও সৃষ্টিশীলতা উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না।

Horizontal Holding ও Europian Technique-এ বাঁধা যন্ত্রে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে নৈপুণ্য দেখানো একমাত্র পরিতোষবাবুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিলো। তাঁর পুত্রদের মধ্যে শ্রী সমীর শীল তাঁর পিতার ধারার (Horizontal Holding) একমাত্র উদাহরণ হতে পারতেন। পরিতাপের বিষয় এই প্রতিভাবান শিল্পী অকাল প্রয়াত হন। শ্রী পরিতোষ শীলের আর এক পুত্র শ্রী সুধীর শীল Violin ও Piano যন্ত্রে শুধুমাত্র Western music-এর চর্চা ও শিক্ষকতা করে থাকেন।

বেহালা মেরামতির কাজে চিৎপুরস্থিত (Mondal Company) মণ্ডল কোম্পানী আজও দক্ষতার মাপকাঠিতে অদ্বিতীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। সবচেয়ে পুরাতন এই কর্মশালাটির কর্ণধার ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী এন. এন. মণ্ডল। বেহালা যন্ত্রের সংশোধন ও সংস্কারে বিশেষজ্ঞ মানুষটির সাফল্যের মূল ভিত্তি ছিলো তাঁর সহজাত অনুভব। অধীত জ্ঞান ও তার প্রয়োগের নিরিখে তাঁকে বেহালা চিকিৎসার বিধান রায় বলে মনে করা হত।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আমন্ত্রণে সম্ভবত ১৯৫২ সালে Sir Yehudi Menhuin প্রথমবার ভারতে আসেন এবং অগ্রগণ্য ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময় শ্রীপরিতোষ শীলের বাদন তাঁকে সবিশেষ আকৃষ্ট করে এবং তাঁর মুগ্ধতার কথা

শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে জানান। মাস্টারমশাইকে কখনও এসব তথ্যের আলোচনা করতে শুনিনি। প্রসঙ্গত জানাই আমার শিক্ষাকাল শুরু হয়েছিলো ১৯৬৩-৬৪ সালে।

একদিন শ্রদ্ধেয় মি. মণ্ডলকে তাঁর চিৎপুরের কর্মশালায় প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিলাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমন্ত্রিত শিল্পী হয়ে Sir Yehudi Menhuin কলকাতায় এলে তাঁর নিজস্ব যন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে Mr Mandal-এর ডাক পড়ে। রাজভবনে দেখা করতে গেলে Sir Menhuin কথা প্রসঙ্গে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে পরিতোষ বাবুর বাদন শৈলীতে তাঁর সশ্রদ্ধ মুগ্ধতার কথা জানান। সেদিনের সেই আলাপচারীতা আজও প্রতিবেদকের স্পষ্ট মনে পড়ে।

মি. মণ্ডলের প্রধান শিষ্য হলেন শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। ইনি পরবর্ত্তী জীবনে শুধু সংশোধক হিসেবে নয় Violin নির্মাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পাঁচুগোপাল বাবু তাঁর বাটানগরের বাসভবনের বেহালা সংস্কার কক্ষে একটি কাহিনি প্রতিবেদকের গোচরে আনেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যেদিন তাঁর জন্মদিনে আকস্মিকভাবে প্রয়াত হলেন সেদিন আকাশবাণী শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল মহাশয়কে দরবারী কানাড়া বাজাতে অনুরোধ করেছিল। সারাদিন ধরে শব যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে আকাশবাণী দরবারী কানাড়া রাগে বেহালাবাদনটির প্রচার করেছিলো। পরবর্ত্তীকালে কোন একদিন পরিতোষ বাবু চিৎপুরের কর্মশালায় এলে দরবারীর বেদনাকীর্ণ ক্রন্দনের অভিঘাত স্মরণে দীর্ণ হৃদয় নিয়ে মিঃ মণ্ডল শিল্পীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পরিতোষবাবু এ বাজনা বাজালেন কি করে? এত কষ্ট, এত বেদনা যন্ত্রে ফোটানো সম্ভব? পরিতোষ বাবু তাঁর স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'কখনও কখনও হয়ে যায়! সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে'।

মাষ্টারমশাই ছিলেন একান্ত ভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ। তাঁর মনীষা, সাধনা বিকাশ ও উত্তরণের কথা যা জানিয়েছি বা জানাতে চলেছি তার উৎস হিসেবে আমি ভাগ্যক্রমে পেয়েছি বাংলাদেশ অ্যাকাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় মুবারক হোসেন খাঁর 'বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ' পুস্তকটি। প্রসঙ্গত লেখক মুবারক হোসেন খাঁ হলেন আমার গুরু উস্তাদ বাহাদুর খাঁর ভ্রাতা এবং উস্তাদ আয়াত আলি খাঁর পুত্র। উনি শুধু একজন কীর্তিমান সংগীত সাধকই নন, একজন সুলেখক ও গবেষক।

এখানে 'বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ' পুস্তকটির ১৪৮ পৃষ্ঠা থেকে যথাযথভাবে কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরছি। 'পরিতোষ শীল একজন অদ্বিতীয় বেহালাবাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক সুখ্যাত শিল্পীর মত পরিতোষ শীলের জীবনও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে অনেক খেতাবে। জগদ্বিখ্যাত বেহালা বাদক মারিও ডি জর্জিও পরিতোষ শীলের বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বয়ং 'Menhuin of Bengal' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং Sir Yehudi Manhuin করেছিলেন তাঁর বাজনার ভূয়সী প্রশংসা।

পরিতোষবাবু যা করে গেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে হলে একটি জীবন পর্য্যাপ্ত হবে না, যথেষ্ট হবে না। যার মধ্যে বয়ে গেছে • তাঁর শিক্ষার ধার ও ভার • সংগীতের বিভিন্ন ধারায় তাঁর সচ্ছন্দ বিহার। হোক-না তা পাশ্চাত্ত্য ধ্রুপদী সংগীত, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত,

উপশাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত বা অন্যান্য Record সংগীত বা 'আয়গা আনে বালা'র মত ফিল্মি গানের সুর।

- HMV থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রাগের বন্দিশগুলি ছিলো একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। মাধুর্য ও মধুরতায় ভাস্বর। যা নিখুঁতভাবে ব্যাকরণ সম্মত হলেও তা আদৌ বহুল ব্যবহৃত প্রথাগত ছিলো না। বন্দিশগুলি হয়েছিলো নান্দনিকতায় মনোগ্রাহী।
- নির্বাক ছবির আবহ সৃষ্টিতে যাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিলো সবাক যুগের আবহেও তিনি ছিলেন অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।
- যে কোন সুর শুনে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাতখণ্ডে বা Staff notation-এর মাধ্যমে স্বরলিপি করণের অপার্থিব দক্ষতা।
- তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যেত যখন তিনি বিখ্যাত Composer-দের বিখ্যাত সৃষ্টির অনেকটাই স্মৃতি থেকে বাজিয়ে যেতেন।
- তাঁর Indentity ছিলো এতটাই প্রবল যে কয়েক হাজার ভারতীয় বেহালাবাদক মণ্ডলীর থেকে একবার শুনেই এই প্রতিবেদক তাঁকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম।
- Violin, Piano, Harmonium ও Guiter যন্ত্রবাদনে ছিলো অনন্য নৈপুণ্য।

শ্রীযুক্ত শীলের একটি গুণগত উৎকর্ষ যা তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় শিরোপায় ভূষিত করতে পারে তা হল তাঁর '**অব্যর্থ নিখুঁত স্বরক্ষেপ**'।

হয়তো বা তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর জীবনেও কখনও সুরচ্যুতি ঘটেনি। তাঁর প্রায় সমসাময়িক এক তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ বেহালাবাদক যিনি পরিণত বয়সে, Violin যন্ত্রটির আর্তনাদ বাড়াতে তরফের তারের আমদানী করেন (যাঁর এই বিজ্ঞানমনস্কতা শোনা যায় তাবৎ ইস্কুলের দারোয়ানকে তাদের পেটা ঘণ্টায় লাউ লাগাতে অনুপ্রাণিত করেছিলো) তাঁর পরিচিত ঘনিষ্ঠ মহলে বলে ফেলেছিলেন "শীল সাব!!! যাঁহা টিপ উহাঁ সুর।

এই প্রতিবেদকের মতে উক্ত প্রশংসাটি (যা তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলো) পরিতোষবাবু সম্পর্কে Sir Yehudi Menhuin এবং Mario De Georgeo'র প্রশংসাকেও ম্লান করে দেবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলি প্রায় ২০ বছর তাঁর অবিচ্ছেদ্য নৈকট্যে থেকে আলস্য বা ক্লান্তিজনিত কারণেও কখনও তাঁর সুরচ্যুতি দেখিনি। অতীব দক্ষ বেহালাবাদক গমকের যাদুকর পণ্ডিত ডি. কে. দাতারও প্রতিবেদকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন।

All India Radio বা HMV-র মত প্রতিষ্ঠান যতদিন সাহেবদের Legacy ধরে রেখেছিলো ততোদিন শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীলের মত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বরেণ্য শিল্পীরা কাজ করে গেছেন সসম্মানে। পরে যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকলো। শিল্পীর যোগ্যতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো তিনি ধামাধরায় কতটা পটু, মোসায়েবীতে কতটা রপ্ত বা খোসামুদীতে কতটা সিদ্ধ।

বেতার বলদর্পীদের দেখলেই এঁরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানাতেন, (একেবারে আক্ষরিক অর্থে। 'চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে... প্রতিবেদকের চোখে দেখা!) হাত কচলাতেন এবং ইনাম পেতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এঁরা বিভিন্ন সাম্মানিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নামের আগে

ও পরে নানা অক্ষর ও বিদ্যাবত্তা সূচক উপাধি আমদানী করে লোকোত্তর হয়ে উঠলেন। নানা গদ্যে পদ্যে এঁদের ক্ষমতার বীজ থেকে অশুভ মহীরুহ জন্ম নিলো। নিজের ও নিজের অপোগণ্ড শিষ্যকুলের, অক্ষম অনুগত দলীয় ব্যক্তিদের অভিলাষ চরিতার্থ করে তাদের বিভিন্ন উচ্চপদে সংস্থাপন করে;সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন। যেখানে শুধুই গুণীর দমন ও অর্বাচীনের পালন হতে থাকলো। অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছল যে প্রকৃত গুণীকেও এদের অর্ঘ দিয়ে তুষ্ট করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হল। আবার তাঁরাও ক্ষমতায় এলে পূর্বসূরীদের অপকর্মের অপনোদনের থেকে নিজেদের দূরে রাখাই শ্রেয় মনে করলেন।

কথা হচ্ছিলো পরিতোষবাবু ও তাঁর গোত্রের শিল্পীদের নিয়ে। কোনো অজ্ঞাত কারণে আকাশবাণী হঠাৎ তাঁর বাদনের সময় সংক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলো। পুরাতন বেতার জগৎ দেখলেই বোঝা যাবে কিভাবে ৩০ মিনিটের Programme কয়েকটি পাঁচ-দশ মিনিটের অনুষ্ঠানে বিভক্ত করে দেওয়া হল। এই স্বল্পসময়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, শুধু 'ধুন' বাজানো যেতে পারে। পরিতোষবাবুকেই এভাবে "ধুনে দেওয়া হল।" অথচ তৎকালীন দু-একজন প্রভাবশালী বেহালাশিল্পী যাদের বাদনশৈলী ছিলো নিতান্ত অমসৃণ অপরিচ্ছন্ন Bowing-এ সম্পৃক্ত এবং যাঁদের কাউকে কাউকে এই প্রতিবেদক Stage Performance-এ উন্নতমানের তবলিয়ার "উঠানে" প্রায়শই আছাড় খেতে দেখেছে তাঁরা নির্বিবাদে ঘন ঘন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের Programme করে যেতে থাকলেন। সেগুলি আজও আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংগ্রহশালায় "সুরক্ষিত" আছে যার একটি শুনলেই তাঁদের সঙ্গীত কলার প্রকৃত গুণমানের হদিশ মিলবে।

আর পরিতোষ শীল! তাঁর বাজনার সমস্ত অভিজ্ঞান আকাশবাণী বা দূরদর্শনের সংগ্রহ শালা থেকে কর্পূরের মত মিলিয়ে গিয়েছে। উবে গিয়েছে। এইচ.এম.ভি. প্রকাশিত তাঁর Recordগুলির আর একটিও Archive-এ পাওয়া যায় না। যা একদা আকাশবাণী থেকে বহুলভাবে প্রচারিত হত। অসাধারণ জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর Recordগুলি আর এইচ.এম.ভি. পুনর্মুদ্রিত করেনি। এসব ঘটনাবলী আদৌ কাকতালীয় নয়। এ সবের পেছনে পাকামাথার "দাবাড়ু"দের চাল ছিলো। "যাঁদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না" সংগ্রহশালায় 'সুরক্ষিত' তাঁদের বাদন বিপ্লবের নমুনা "**বরে শাপ**" হয়ে এটাই প্রমাণ করবে তাঁরা কোন শ্রেণীর বেহালাবাদক ছিলেন।

এই প্রতিবেদক এখন সত্তরোত্তীর্ণ। সাধনোচিত ধামে গমনের পূর্বে সে তার পিতৃঋণ থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি চায়। সেইসব পরাক্রমশালী দাবাড়ু শিল্পীদের ধ্বনিবর্দ্ধক প্রচারযন্ত্রের ঢক্কানিনাদ আজ প্রায় স্তিমিত। এই তো সুর সাধনার প্রকৃত সময়। তাই উপরোক্ত শিল্পীদের শিষ্য প্রশিষ্যদের কাছে এই অধম প্রতিবেদক সবিনয়ে নিবেদন রাখছে, আসুন না ভাই এক হাত খেলা যাক। আপনারা তো সকলেই সরস্বতীর বরপুত্র, আপনাদের সংখ্যা পঙ্গপালকেও লজ্জা দেয়, আপনারাইতো বিগত ৫০ বছর ধরে চিৎপুরের বেহালা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কথা দিচ্ছি Violin বাদনের সর্ববিভাগে আপনাদের সম্মাননা, সংবর্দ্ধনা, আদর আপ্যায়ন, প্রীতি সম্পাদন, তুষ্টিকরণ, আনন্দবর্দ্ধন এবং আরো যা যা শ্রদ্ধাব্যঞ্জক করণীয় কর্ত্তব্য সমূহ প্রদর্শন করা যেতে পারে তার সার্বিক ত্রুটিশূন্য ব্যবস্থা করে এই প্রতিবেদক

একাই আপনাদের মহড়া নিতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। তার সম্বল শুধুমাত্র গুরুবল।

Violin যন্ত্র বাদনের দিশারী এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা বিশারদ শ্রীপরিতোষ শীল ১৯৯০ সালের ৭ই ডিসেম্বর নিঃশব্দে প্রস্থান করেন।

গুরু উস্তাদ বাহাদুর খাঁ (১৯৩১-৮৯)
স্মৃতি তুমি বেদনা

পরবর্তীকালে সরোদ যন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নান্দনিক রূপকার উস্তাদ বাহাদুর খাঁ-র পাম অ্যাভিনিউ এর বাসভবনে তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিলো (শিক্ষাকাল ১৯৮৩-৮৯)। তাঁর বাদনে ছিলো Folk music-এর জল মাটির গন্ধ। তার সঙ্গে অলোকসাধারণ স্বরনির্মিতি ও ছন্দবৈচিত্র্য। বাহাদুর খাঁ ছিলেন উস্তাদ বাবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়েত আলী খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ শুধু উচ্চমানের যন্ত্রী ছিলেন না, এর সঙ্গে ছিলেন কুশলী যন্ত্র নির্মাতা। তাঁর স্বহস্তে নির্মিত সরোদ উস্তাদ বাবার খুব প্রিয় ছিলো। পরবর্ত্তী সময়ে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের কাছে শুনেছিলাম উস্তাদ বাবা তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রকে নিজে গান শিখিয়েছিলেন। প্রতিবেদকের আজও মনে পড়ে বাহাদুর খাঁ মাইহার কি মাতা সারদা দেবী গানটি শেখানোর সময় আনমনা হয়ে যেতেন। ছোটবেলায় (৬ বছর বয়সে) জ্যাঠামশাই-এর হাত ধরে কয়েকশো সিঁড়ি ভেঙে পাহাড় চূড়ায় সারদা দেবীর মন্দিরে যাওয়ার স্মৃতি তাঁকে মেদুর করে তুলত। বলতেন, 'এই দেখুন এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।' এই প্রসঙ্গে জানাই গ্রীষ্মের দাবদাহে উঁচু সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে যাওয়া এই প্রতিবেদকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সিঁড়ি এতই উত্তপ্ত থাকতো।

যখন বলতাম, আপনার ছেলেবেলার শিক্ষাকালের কথা কিছু বলবেন? উস্তাদজির প্রত্যুত্তর হত, 'ওরে বাবা, কি মার কি মার! এখনও ব্যথা আছে! থাকনা ওসব কথা।' পণ্ডিত অজয় সিংহরায় তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন উস্তাদ আয়াৎ আলী খাঁ সাহেব যখন কুমিল্লায় তাঁদের বাসভবনে এসে থাকতেন তখন ছোট্ট বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তখন তার মাত্র ৭/৮ বছর বয়েস। বড়খাঁসাহেবের বদ রাগের কথা ভেবে ও আমায় সাবধান করে বলেছিলো, 'তুমি কখনও মাইহার যেও না। ভীষণ মারবে।' স্মৃতিচারণটি পড়ে মাতৃসঙ্গ-বঞ্চিত সেই ছোট্ট শিশু যে পরবর্ত্তীকালে আমার বন্দিত গুরু হবে তার জন্যে মায়া মমতায় চোখ ফেটে জল এসেছিলো। আসলে উনি নিজের কথা প্রায় কিছুই বলতে চাইতেন না। একদিন উস্তাদজী বললেন, 'মা এসেছেন। চলুন আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাই।' মনে পড়ে সে দিন এই পাম অ্যাভিনিউ-এর বাড়ীতেই মা মদনমঞ্জরী দেবীর পদস্পর্শ করে ধন্য হয়েছিলাম। উস্তাদজী বললেন, 'মা, একে একটাই আশীর্বাদ করুন ও যেন আজীবন রিয়াজের মধ্যে থাকে।'

উস্তাদবাবা সুলভ তাঁর সহজাত বিনয় বোধের একটি কাহিনী জানাই। ঘটনাটি উস্তাদজীর কাছে শোনা। একদা কতিপয় উৎসাহী আয়োজক বাহাদুর খাঁ ও তাঁর অন্যতম সঙ্গীতগুরু ও

সম্পর্কে জেঠামশাই-এর পুত্র প্রবাদপ্রতিম উস্তাদ আলি আকবর খাঁর যুগলবন্দীর আয়োজন করলেন। একথা শুনেই উস্তাদজী বলেছিলেন, 'আপনারা করেছেন কি? আমি একজন সামান্য সঙ্গীতসেবক, আর উনি হলেন রাজাধিরাজ। আমার নাম শুধুমাত্র সহযোগী বাদক হিসেবে রাখবেন। তাহলেই আমি ধন্য হবো।'

শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক ঘটক ছিলেন বাহাদুর খাঁর শিষ্য ও সুহৃদ। তাঁর প্রায় সমস্ত ছবির আবহ সুর করতেন বাহাদুর খাঁ। যার মধ্যে অনেক ছবিই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত। দুজনে আলোচনা করে কাহিনির বিন্যাস ও সুরারোপে সহমত হলে তবেই চিত্রনাট্য তৈরী হত। এসব অতীতের কথা, আমি শুনেছি উস্তাদজীর কাছে।

একদিন উস্তাদজী সান্ধ্য রাগের চেহারা কেমন হবে তা বোঝাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ভাষায়। গোধূলীর বিনম্র আলো ধীরে ধীরে নিভে আসছে। আকাশ প্রদীপ হয়ে তারারা সবে ফুটি ফুটি। আসন্ন সন্ধ্যা যেন এক মূর্ত্তিমতী বিরহগাথা। লাল পেড়ে শাড়ী পরা একটি শান্ত গৃহবধূ প্রদীপ হাতে ধীর নম্র পদক্ষেপে তুলসী মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে তার মুখাবয়ব কিছুটা অস্ফুট। বাতাবরণকে পবিত্র করে দুরাগত শঙ্খের আওয়াজ ভেসে আসছে। এটি আমায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। রাগের নামটি উহ্যই থাক। স্মৃতি সতত সুখের হয় না।

আমি বুঝলাম ওস্তাদজী আজ একই সঙ্গে আমাকে শিল্পী ও সুরকারের আসনে বসালেন। এই প্রথম আমি সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছি। পুরো ব্যাপারটা মনে মনে এঁকে নিয়ে আমি যন্ত্র হাতে তুলে নিলাম। শুধুমাত্র প্রদীপ ধরে থাকায় মহিলার হাতটি কেমন যেন একটু খালি খালি লাগছিলো। তাই তৎক্ষণাৎ দুটি ধপধপে সাদা শাঁখার ব্যবস্থা করে দিলাম আমার music'এ। পুরো চিত্রকল্প ও আবহ আমার সুরারোপে একই সঙ্গে মূর্ত হতে থাকলো। সাফল্যের অনাবিল আনন্দ নিয়ে আমি উস্তাদজীর দিকে তাকালাম। ওঁর মুখ দেখেই আমার হাড় হিম হয়ে গেলো। দেখলাম এক ভয়ংকর ক্রোধে উস্তাদজীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তীব্র চিৎকারে বললেন, 'গুষ্টির পিণ্ডি বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, বন্ধ করুন। এসব হচ্ছেটা কি? কোথায় সাঁঝের প্রদীপ, কোথায় শাঁখের শব্দ, কোথায় পবিত্রতা? শুনেই মনে হচ্ছে একটা গাউন পরা মেম সাহেব হাই হিল জুতোর খটখট শব্দ তুলে মারমার করে Torch হাতে ধেয়ে আসছে। আপনি এক্ষুনি বিদায় হোন। আমায় একটু একা থাকতে দিন। আমি এখন একা থাকতে চাই।

পরের দিন উস্তাদজী আমায় ডেকে পাঠালেন। আজ অন্য মূর্তি দেখলাম। হাসি হাসি মুখে বললেন, গতকাল সন্ধ্যা থেকে উনি আমায় নিয়ে অনেক ভেবেছেন। কি ভাবে আমার বাজনায় নতুন শৈলী ও পেলব কমনীয় ভাব আনা যায়। আজ থেকে আমায় ভারতীয় পদ্ধতিতে (vertically down) অভ্যস্ত হতে হবে। বাক্য ব্যয় না করে বিগত ২০ বছরের ঘাম ঝরানো অভ্যাস ভুলে Western Music শিকেয় তুলে তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। যা ছিলো এক ডান হাতি Shorthand Writer-কে বাঁ হাতে Dictation নিতে বলার সমতুল। নতুন করে আমার হাতেখড়ি হল। অন্যান্য প্রতিভাবান শিষ্যবর্গের

চোখে নিতান্তই এক নিম্নমানের ছাত্ররূপে (শিষ্য কথাটি ব্যবহার করলাম না) অচিরেই পরিগণিত হলাম। একমাত্র উস্তাদজী গভীর সহনশীলতা ও সহানুভূতিতে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কয়েক বছর বাদে প্রাথমিক ভাবে অতীব শ্রমসাধ্য, সময় সাপেক্ষ প্রায় অসম্ভব এই পদ্ধতিতে পুনরায় Fingering ও Bowing-এর সমন্বয় ফিরে আসলে উস্তাদজীর মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। ধীরে ধীরে এই ভঙ্গীতে অভ্যস্থ হয়ে যাবেন। আর যখন আমি থাকবো না, তখন আমার কথা ভেবে চোখে জল আসবে।' এখানে মনে রাখতে হবে পদ্ধতিগত পরিবর্তন হলেও উস্তাদজী Strictly আমার Violin-এ Europian String Arrangement বজায় রেখেছিলেন (মা সা পা রে) শুধুমাত্র উন্নতমানের Tonal Quality অক্ষুণ্ণ রাখতে। যন্ত্র, যন্ত্রী ও তার যন্ত্রণার সম্যক উপলব্ধি করে, সার্বিক উন্নতির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখে, অসুস্থ শরীর নিয়ে তাঁর শ্রম ও উদ্যমের কথা ভেবে আমি আজও হাউহাউ করে কাঁদি। এই ব্যক্তিগত কথাটি জানালাম তাঁর Orchestra ও অন্য যন্ত্রের উপর কতটা প্রত্যয় ছিলো তা জানাবার জন্যে। তাঁর Orchestration কতটা মনোগ্রাহী আকর্ষক ও Grammatical ছিলো, যন্ত্র সমন্বয় কত উন্নতমানের ছিলো তার একটি উদাহরণ হয়তো আজও দূরদর্শনের Archive-এ পাওয়া যেতে পারে।

সাহেবদের পৃষ্ঠ কণ্ডূয়নের মাত্রা দিয়ে বাহাদুর খাঁর মত সাধক শিল্পীর মূল্যায়ন হয় না। একটি উদাহরণ রসপিপাসুদের ক্ষুধাহরণ করবে। এ প্রসঙ্গে বাহাদুর খাঁর সুরারোপিত একটি বাংলা ছবির কথা মনে পড়ছে 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। ছবিটি কোন তথাকথিত নামজাদা চলচ্চিত্র পরিচালকের দৃষ্টিআকর্ষণী প্রচারের আলোয় আলোকিত ছিলো না। তৎসত্ত্বেও অনন্য সঙ্গীতারোপের জন্য 'কার্লভি ভ্যারি' উৎসবে শ্রেষ্ঠ আবহ সঙ্গীতের পদক-অর্জন করেছিলো। ভগবানও জানেন এই সাধক শিল্পীর পুরস্কারের প্রয়োজন হয় না। তাই Google-এ ও ছবিটির নাম ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক ঘটকের ছবির ইস্তাহারে বা CD-র মলাটে খাঁ সাহেবের নাম নেই অনেক সময়ে। যদিও প্রতিটি ছবির সঙ্গে বাহাদুর খাঁ যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'নতুন পাতা' ছবিটি ভেনিস ফিল্‌ম ফেষ্টিভ্যালে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। অনবদ্য সঙ্গীতারোপের জন্যে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে জানাই Dover Lane Conference-এ তাঁর শেষ অনবদ্য অনুষ্ঠানটির কোন সমালোচনা একটি বিশিষ্ট দৈনিক ও পাক্ষিকে উপেক্ষিত ছিলো। সঙ্গীত সমালোচক জানিয়েছিলেন বিশেষ কারণে শুধু ওই অনুষ্ঠানটিতেই উপস্থিত থাকতে পারেননি। অবশ্য তাঁকেও তো চাকরী রাখতে হবে, 'বস'-এর মনোরঞ্জন করতে হবে, জনমত গঠন করতে হবে, বিশেষ শিল্পীকে তোল্লাই দিতে হবে, তাঁর Programme মঞ্চস্থ হবার অনেক আগেই সাধুবাদে গদ-গদ হয়ে আহা কি শুনিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিবনা, "এ জিনিস আগেও ছিলো না পরেও হবে না" ইত্যাদি লিখে ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই প্রতিবেদক এমনও লক্ষ্য করেছে রবীন্দ্রসদনে Balcony থেকে কিছু Paid উৎশৃঙ্খল শ্রোতা বাদনরত খাঁ সাহেবকে অযথা বিরক্ত করার চেষ্টা করছে। সহশিল্পী পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর ঘোষের ধমকে তাঁরা ক্ষান্ত হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গায়ে নোংরা লাগিয়ে ফেললাম। এই সংগীত জগৎ থেকে ঈশ্বর যেন আমায় দূরে রাখেন, রক্ষা করেন।

আমার জীবন নিয়তি নির্দিষ্ট, নিয়তি তাড়িত কিছুটা পরিমাণে নিয়তি লাঞ্ছিতও বটে। Western Music-এর Technique ছেড়ে পুরাতন বাদনশৈলী ভুলে ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করে খাঁ সাহেবের নির্দেশে নতুন করে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছিলাম। কিন্তু কি কারণে উস্তাদজী আমার অতীত কেড়ে নিলেন জানতে পারিনি। খাঁ সাহেবকে বলতে পারিনি, আমার প্রথম গুরু শ্রীপরিতোষ শীল মহাশয় তো বটেই এমনকি উস্তাদ বাবাও সাহেবের কাছে শিক্ষার সুবাদে সারাজীবন Horizontal Holding এই তো বাজিয়ে গেছেন।

উস্তাদজীর নির্দেশের মর্ম বুঝতে আমার বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিলো। আজ নির্দ্বিধায় বুঝতে পারি তাঁর উপদেশ আমার বাজনার আঙ্গিক, রাগরূপায়ণ, সৃজনধর্মিতা ও মাধুর্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলো।

একদিন উস্তাদজী বললেন, প্রণববাবু আপনারে মাঝখাম্বাজ শিখাবো। জ্যাঠামশাইয়ের নিজের তৈরী রাগ। ভালো করে মনোনিবেশ করবেন। তাড়াহুড়া করবেন না। শান্তমনে বাজাবেন। খানিক বাদে উস্তাদজী বুঝলেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি আমার মর্ম স্পর্শ করছে। আমার অনুভবী অনুসরণ তাঁর চোখ এড়ালো না। দীর্ঘ দীর্ঘক্ষণ শিক্ষা চলতে থাকলো। গ্রহণ যোগ্যতার উন্নতি হওয়ায় উস্তাদজী বুঝলেন আমার শিক্ষার আগ্রহ কতটা প্রবল। আর আমি বুঝলাম আমার সম্মুখে অসীম নীল দিগন্ত, আমি উড়ানের জন্যে প্রস্তুত। উস্তাদজী যেন বললেন, "ওরে থামারে ঝঙ্কার! নীরব হয়ে দেখরে চেয়ে দেখরে চারিধার। তোরই হৃদয় ফুটে আছে মধুর হয়ে ফুলের গাছে—নদীর ধারা ছুটছে ওই তোরই কাছেরে।"

শিক্ষা সেদিনের মত সমাপ্ত হলে চুপ করে বসেছিলাম। উস্তাদজী বললেন "আজ আমার..." কি বললেন তা উহ্যই থাক। আমি সে কথা Diary-তেও লিখে রাখিনি। আমার সংগীত গুরুর কাছে এ আমার পরম প্রাপ্তি। তা আমাদের মধ্যেই থাকুক।

পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের কথা না বললে বাহাদুর খাঁ সম্পর্কে যে কোন রচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিবেদকের কিছু ব্যক্তিগত কথা এসে যাচ্ছে।

একদিন উস্তাদজী জানালেন "প্রণববাবু আমি আপনার নাম কৈছি।" কোথায় উস্তাদজী? আমার নাম বলতে গেলেন কেন?

"British Council-এ আমায় জিগাইল কারে কারে তৈরী করছেন? আমি কইলাম সরোদে ত্যাজেন, আপনারা তার বাজনা শুনেছেন! আর Violin-এ প্রণববাবু উনি মাষ্টারী করেন।"

আমি লজ্জায় সঙ্কোচে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার আজ মৈহার সেনিয়া ঘরানার সুযোগ্য প্রতিনিধি পরে কিংবদন্তী শিল্পী উস্তাদ বাবার পুত্র উস্তাদ আলী আকবর খাঁর প্রিয় শিষ্য। আজ তিনি বিশ্ববন্দিত। আমিও ৭০ অতিক্রান্ত হয়েও মা মদনমঞ্জরীর আর্শিবাদে অন্তত ৬ ঘণ্টা রিয়াজের মধ্যে থাকতে পারছি। এটাই বা কম কি? আমার প্রতিবেশীরা আজও আমায়. পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে দেননি।

পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এক ব্যতিক্রমী শিল্পী। একটি ব্যতিক্রমের কথাই উল্লেখ করছি। যখন তিনি আসরে বাজান তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতই আত্মস্থ ও নিমগ্ন হয়ে

যান। নবীন প্রবীণ অধুনা সব শিল্পীদের দেখি চোখেমুখে একটি মঞ্চ কৌশলী শ্রোতাবিনোদিনী কারুকৃতি তুলে ধরতে। এটি প্রস্তুত করা হয় সৃষ্টি সুখের উল্লাস ও Chronic Dysentery জনিত পৈটিক মোচড়ের সমন্বয়ের রাসায়নিক পরিমাণ হের ফের করে। তেজেন্দ্র এ সবের ঊর্দ্ধে থেকে আত্মশ্রয়ী হয়ে বাজিয়ে যান উস্তাদবাবা, আলীআকবর খাঁ, বাহাদুর খাঁর মতই। তাই জয়জয়ন্তী বাজানোর সময় তিনি নটঅঙ্গ দেখাতে ভুলে যান না।

একটি ঘটনা জানিয়ে উস্তাদ বাহাদুর খাঁ প্রসঙ্গ শেষ করছি। সম্প্রতি নিউটাউনের (কলকাতা) নজরুলতীর্থে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়ের চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সেখানে প্রেক্ষাগৃহে সারাদিন শ্রীযামিনী রায়ের Painting-এর ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছিলো, আবহ-সুরের আকর্ষণে আমি দীর্ঘক্ষণ শুনতে থাকলাম। আমার জানতে ইচ্ছা করছিলো তথ্যচিত্রটির আবহ সুরকার কে। Sycophant উদ্যোক্তারা আমার প্রশ্নের উত্তরে গদ-গদ চিত্তে একটি অতি পরিচিত সুর-সম্রাটের নাম বারবার জপ করেছিলেন। "উনি ছাড়া এ সুর আর কে করবে?" যা আমি মানতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো এ সুর যেন আমার রক্তে, আমার লোহিত কণিকায়, শ্বেত কণিকায়, স্বেদবিন্দুতে, আমার মস্তিষ্কে, আমার অস্তিত্বে, আমার অস্থিতে, আমার মজ্জায় আমার হৃদয়ে। এ সুর আমার আত্মার আত্মীয়, এ সুরে আছে জল মাটির গন্ধ। কোন মস্তিষ্কপ্রসূত বিশ্লেষণী শক্তি নয়, শুধুমাত্র সহজাতবোধ, আমার Instinct আমায় বিভ্রান্ত করেনি। উদ্যোক্তাদের কথা মানতে পারিনি। পরে জানতে পেরেছিলাম তথ্যচিত্রটির আবহ সুর সৃষ্টি করেছেন আমার গুরু বাহাদুর খাঁ স্বয়ং। একটি গো বৎস যেমন লক্ষ লক্ষ গাভীর মধ্যে থেকে নিজের মাকে সহজাত অনুভূতিতে চিনে নিতে পারে তেমনই এই প্রতিবেদক নির্ভুল নিশানায় সুরকারকে চিনতে পেরেছিলো। স্বনামধন্য শ্রী সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুরসৃষ্টির সুবাদে যতদূর মনে পড়ছে তিনজন সুরকার বিশ্বমানের পুরস্কার পেয়েছেন। এক বার করে। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সুরারোপিত ছবিও প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রী ঋত্বিক ঘটককে একাধিক আন্তর্জাতিক খেতাব এনে দিয়েছে। তবুও প্রচারের আলোয় আলোকিত না হওয়ায় বাহাদুর খাঁ ছিলেন নিতান্তই "মেঘে ঢাকা তারা"।

শিক্ষা নিরপেক্ষ জন্মলব্ধ, ভগবৎদত্ত ঐশী শক্তির কথা ভাবলে তাঁকে মৈহার ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল শিল্পী বলে অভিহিত করা যেতে পারে শুধুমাত্র সুরসৃষ্টির অভিঘাতে। বাহাদুর খাঁর সুরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবী করে 'নতুন পাতা', "যে যেখানে দাঁড়িয়ে", গরমহাওয়া (হিন্দী), "তিতাস একটি নদীর নাম" ইত্যাদি। যে ছবিগুলিতে কোন তথাকথিত বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের শিলমোহর ছিলো না।

শুধুমাত্র গুণগ্রাহী শ্রোতার অভাব বা প্রচারযন্ত্রের শত্রুতাই নয় নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতার জন্যে তাঁর বাদনশৈলীর অভিজ্ঞান হয়তো বা ভবিষ্যতে কিছুই থাকবে না। তবু এই প্রতিবেদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তাঁর আবহ সুরে নির্মিত চলচ্চিত্র সমুহের বিশ্লেষণী অনুধ্যান করলে যে কোন ভবিষ্যৎ গবেষক উস্তাদ বাহাদুর খাঁর উচ্চকোটির শিল্প সত্তার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারবেন। (এই প্রতিবেদকের একক প্রয়াসলব্ধ Record যার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।)

পরিশেষে—নিজের সঙ্গীত গুরু বাহাদুর খাঁর মূল্যায়নে এই প্রতিবেদক কতটা নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ও অভ্রান্ত তা জানাতে একটি উদ্ধৃতি উৎকলিত করার সবিশেষ বাসনা থেকে যাচ্ছে। নইলে মূল্যায়নটি তার আত্মশ্লাঘী সংগীত বোধের অপপ্রচার বলে চিহ্নিত হতে পারে। নইলে মনে হতে পারে Sycophancy-র উজ্জ্বলতম চূড়ান্ত উদাহরণ। "স্বয়ং উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর হোসেনকে নিজ পরিবারের সবচেয়ে প্রতিভাবান সম্ভাবনা সম্পন্ন শিল্পী বলে মনে করতেন"। [কালপুরুষের দর্পণে ও পূর্ব বাংলাতে উচ্চাঙ্গ সংগীত (পৃ: ২৭৭) পণ্ডিত অজয় সিংহ রায়]

বাহাদুর খাঁ তাঁর বাদনশৈলীতে সরোদযন্ত্রের চর্মজ ধ্বনি ও ধাতব নিনাদের আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়ে যে অপূর্ব সুরেলা সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন সেই BUZZ আর কারো বাদনে দেখা যায়নি।

গুরু পণ্ডিত অজয় সিংহরায়
রৌদ্রছায়া

উস্তাদ বাহাদুর খাঁ অকালে প্রয়াত হলে (১৯৮৯) ভগ্ন হৃদয়ে সেতার বাদক ও কণ্ঠশিল্পী পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলাম (প্রতিবেদকের শিক্ষাকাল ১৯৮৯-৯৬)। উনি মূলত আয়েত আলী খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। উস্তাদজীর শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে পরে উস্তাদ বাবার সান্নিধ্য লাভ করেন। আমি শুনেছিলাম উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সাহেবের শিক্ষাগুণে মতি মিঞা বা উস্তাদ মতিউর রহমান সে যুগের বিশিষ্ট বেহালাবাদক ও সঙ্গীতকার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তথ্যটি আমায় পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের কাছে যাবার প্রেরণা দেয়।

খুব ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগের পর তাঁর মাতৃদেবীর ব্যক্তিত্ব ব্যাঞ্জক উপস্থিতিতে তাঁর পঠন পাঠনের সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা উপাসনা সঙ্গীতে অনুরক্তির অঙ্কুর বিকশিত হয়। পরবর্ত্তীকালে তিনি কুমিল্লার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান অভয় আশ্রমে যোগ দেন এক আশ্রমিক হিসেবে। অভয় আশ্রমে থাকাকালীন কৃষিকর্মের সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ধান রোপা, ধান রোয়া, গোবর ও মনুষ্য পুরীষ থেকে সার তৈরী, মুলো, বেগুন, কলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ইত্যাদি সব্জীর চাষ আবাদের প্রয়োগ, আখের রস থেকে গুড় তৈরীর হাতে কলমে জ্ঞান তাঁকে একটি সার্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

অজয় সিংহরায়ের পিসীরা ছিলেন আলোকপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা। বিশেষত তাঁর ছোটপিসীমা শ্রীমতী প্রেমলতা সিংহ ছিলেন কানপুরের একটি মহিলা কলেজের Principal। তিনি ছিলেন একাধারে Painist ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞা। কুমিল্লার বাড়ীতে একটি বিশাল Grand Piano ছিলো। ছোটপিসীমা কানপুর থেকে কুমিল্লায় এলে ছোটদের একত্র করে পিয়ানো

বাজিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। অজয় সিংহরায়ের কণ্ঠসম্পদ ছিলো উচ্চমানের। অনেক বছর পরে এই কানপুরে পিসীর কাছে যাতায়াতের সূত্রে তাঁর সামনে সঙ্গীত জগতের দিগন্ত খুলে যায়। তৎকালীন ভারতের বহু খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিয়ে ছিলেন।

এবার অতি প্রাসঙ্গিক কারণে আসছে ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর কথা যিনি ছিলেন পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের মাতুল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনিরোদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর Autobiography of An Unknown Indian গ্রন্থে জানিয়েছেন—

'আমি এই মানুষটির কথা নথিভুক্ত করছি এই বাসনায় যাতে উত্তর প্রজন্ম তাঁকে মনে রাখে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ছিলেন প্রাথমিক ভাবে এক অতি বিখ্যাত চিকিৎসক, যাঁকে ঘিরে বহুজনশ্রুতি ও কিংবদন্তি শোনা যেত। দূর দূরান্ত থেকে নৌকা যোগে মানুষ এমনকি মৃতদেহ নিয়েও 'বাবার' কাছে আসতো এই বিশ্বাসে যে, তাঁর দয়ায় মৃতের আবার প্রাণ ফিরে আসবে। তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রেরণার মধ্যে ছিলো কুটির শিল্পের প্রসার, স্বদেশী জিনিস তৈরীতে উৎসাহ দান, সমবায় সংস্থা স্থাপন, সর্বোপরি উদার ধর্মমত। 'সর্ব ধর্ম সমন্বয় মিশন' প্রতিষ্ঠা করে তিনি সর্বস্তরের মানুষকে একত্র করে প্রার্থনা সভা, কীর্তন ও মিলিতভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দার্শনিক সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাবা আলাউদ্দিন ও আয়াৎ আলী খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়।

বাবা আলাউদ্দিন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর নাতিটিকে অর্থাৎ পণ্ডিত অজয় সিংহরায়কে মাইহারে ডেকেছিলেন সস্নেহে। পণ্ডিত অজয় সিংহরায় তাঁর স্মৃতিকথায় 'কালপুরুষের দর্পণে' (পৃঃ ৫৬) জানিয়েছেন, 'দেশবিভাগজনিত নানা সমস্যায় তখন আমি জর্জরিত, তার উপর নানা পারিবারিক সমস্যা। তাই আমার তাঁর আহ্বানে মাইহার যাওয়া হয়ে উঠেনি।' তাই এই প্রতিবেদক তাঁকে মূলত উস্তাদ আয়াৎ আলী খানের শিষ্য বলেই মনে করে এবং তাঁর অন্যান্য গুরুবর্গের আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছে।

পণ্ডিত অজয় সিংহরায় ছিলেন মূলতঃ Musicologist। কোন একটি রাগের সার্বিক দিক নির্দেশ দিতেন Theoretical জ্ঞানের সমন্বয়ে। যারা মস্তিক দিয়ে গান বাজনা করে তাদের পক্ষে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিক্ষক। কিন্তু আমি গানবাজনা Emotionally নিতে অভ্যস্ত ছিলাম। গুরুজী নিজগুণে সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। আমার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না। উনি আমায় তাঁর সচিব হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি সবিনয়ে সরে এলাম। আমার এ সিদ্ধান্ত যে একে বারে সঠিক ছিল তা বোধগম্য হল ১৯৯৬-এ। উস্তাদবাবার সচিবের কি হাল হয়েছিলো এক 'সুরসম্রাটের' কৃপায় তা জানার পর।

গুরুজী বয়সের ভারে কিছুটা ক্লান্ত থাকতেন। শেখাতে শেখাতে ঘুম এসে যেতো। তানপুরা স্খলিত হতে দেখে আমি ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিতাম। আধঘণ্টা বাদে উনি তরতাজা হয়ে বলে উঠতেন, 'শুনছো, প্রবণবকেও এক কাপ চা দাও।' গুরুমা ছদ্মকোপে বলতেন, 'ছাত্র পেয়েছ বটে। এসেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এখন আবার চা করো।'

ভগবান যাকে নাশ করতে চান প্রথমেই তার বুদ্ধি নাশ করেন। আমার ক্ষেত্রেও তার

ব্যতিক্রম হল না। আমি উস্তাদ বাহাদুর খাঁর নির্দেশ ভুলে দক্ষিণ ভারতীয় বেহালা বাদকদের অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কুকুরের ল্যাজ আবার বেঁকে গেল। দক্ষিণী পদ্ধতির ইতিবৃত্ত জানা না থাকায় আমার সমূহ সর্বনাশ হতে থাকলো। গুরুজী একদিন বললেন, বেশ তো হচ্ছে আপাতত, তবে হবে কিনা জানিনা। তাঁর সংকেত আমি ধরতে পারিনি।

বাহাদুর খাঁ সাহেবের শিক্ষায় বর্তমান গুরুজীর গান আমি হুবহু বাজিয়ে দিতে পারতাম। একটি জার্মান ছাত্র বলল, 'উনি যা শেখাচ্ছেন তা তুমি তুলে নিচ্ছ, এটা ঠিক আছে কিন্তু উনি গলায় যা দেখাচ্ছেন না সে সব তোমার বাজনায় আনছো কেনো?' আমি জানালাম গুরুজীর ব্যক্তিত্ব ও style আমি ৬ বছর ধরে অনুসরণ করে আসছি। এখন বয়স হওয়ায় উনি সব কাজ ফুটিয়ে তুলতে পারেন না যা আগে পারতেন। ওঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমিও পারবে।'

আমার অদ্ভুত ভাগ্য। আমার কোন আত্মীয় পরিজন বন্ধু, সহকর্মী কাউকেই খুশি করে তাদের পছন্দের মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। এক যথেষ্ট নামজাদা মানুষ আমায় শুনিয়েই একদিন বললেন—যদি একটা সাপ এবং বদ্যি ওঁর সামনে এসে পড়ে তাহলে উনি বদ্যিটাকেই আগে মারবেন। উক্তিটিতে 'আমি দুঃখ পেলেও খুশী হলাম জেনে' (সৌজন্য, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) কিন্তু আমার গুরুবর্গের করুণা আমার উপর বর্ষিত হয়েছে অঝোর ধারে।

একদিন তাঁর স্বভাবজ মৃদু স্বরে বললেন, 'প্রণব তুমি একদিন সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে বাজাবে?' আমি খুব অবাক হলাম। যাঁর কাছে শত শত উমেদারকে SRA-তে বাজানোর অন্তত: একটু সুযোগ পাওয়ার জন্যে ঘুর ঘুর করতে দেখি, ক্ষমতা সম্পন্ন সেই মানুষটির এই সস্নেহ অনুরোধ তাও কিনা আমার কাছে! আমি বললাম, 'গুরুজী, আমি এখনও যোগ্য হয়ে উঠিনি দীর্ঘ দিনেও আমার কোন নিজস্ব Style Develop করল না। আমার বাজনা আমায় বিদ্বিষ্ট করে। আমি নিজেকে ঘৃণা করি। আপনি যদি আমার গুরু উস্তাদ শৌকত আলী খানের Recording করে রাখেন তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হবে। ওঁর প্রাপ্য সম্মান ও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষমতাবান মমতাময় স্নেহশীল মানুষটি বললেন, 'ঠিক আছে, দেখবো। তবে তুমি আপাতত: রবীন্দ্রভারতীর এম এ পরীক্ষার paper set করবে। এটা আমার আদেশ। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। কোন অসুবিধে হলে আমিই দেখবো।'

৬ মাসের মধ্যেই উস্তাদ শৌকত আলী খানের দুবার Recording হল SRA-তে। দুবার সম্মান দক্ষিণা পেলেন এবং অচিরেই তা নিকটস্থ মসজিদের কোষাগারে জমা হতে দেখলাম। শুধু তাই নয়, একটি সঙ্গীত সংস্থা শুধুমাত্র গুরুজীর অনুরোধে ওঁকে সম্বর্দ্ধিত করল। দুই হাজার পাঁচ শত টাকা খামে করে তুলে দিলো। পরে উস্তাদজী জানালেন এক হাজার পাঁচ শত টাকা পেয়েছেন। এক খাম-খেয়ালী এক হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিলো। ব্যক্তিটি এতই পরিচিতি ছিলো যে গুরুজীকে তার প্রসঙ্গ আর জানাইনি। আর সে টাকাও তো উস্তাদজীর সংসার পর্যন্ত পৌঁছত না।

একদিন গুরুজী জানালেন, 'প্রণব! খাঁ সাহেবকে যাতে আলাউদ্দিন পুরস্কার দেওয়া যায়

তার চেষ্টা করেছি।' অনেকদিন পরে দু:খিত চিত্তে বললেন, 'হল না প্রণব, ওরা শৌকত আলী খানকে না দিয়ে কলকাতার এক বেহালা শিল্পীর জন্য উমেদারি করছে। আমার কথা শুনলো না।'

একদিন গুরুজীকে জানালাম, 'আমার গুরু শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীলের কোন Record আর HMV বার করল না। তাঁর বাজানো আহীর ভৈরব, বাগেশ্রী, আড়ানা, দরবারী কানাড়া, সুরমল্লার সারা ভারতে আলোড়ন ফেলেছিলো। আকাশবাণীর মাধ্যমে এগুলি শুনে আমরা বড় হয়েছি। Radio-তেও আজকাল ওঁর বড় Programme রাখে না। ১০/১৫ মিনিটের অনুষ্ঠান রাখে। ওঁর Record যাতে আর HMV বার না করে তার পেছনেও বড় মাথা কাজ করছে। আর এই অসূয়াপরায়ণ অক্ষম বেহালা-বাদকদের ততোধিক অযোগ্য শিষ্যরা, যাদের বাজনায় Music-এর থেকে Noise বেশী তারা "আয়লো আলি কুসুমকলি" শেখার পর অন্তত আধঘণ্টা শীল মশাইএর নিন্দে করে তবেই গুরুগৃহ ত্যাগ করে। এই সব নিন্দাবাচক জনশ্রুতি তাদের তবলিয়ারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিতরণ করে একেবারে বিনামূল্যে। এসব কানে এলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি দেখবেন খুব শিগ্গির ওদের একটা আমার হাতে খুন হবে। গুরুজী ক্ষমাসুন্দর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'না, না প্রণব তুমি কারো ওপরে রাগ রেখো না। তাতে তোমারই বাজনার ক্ষতি হবে, মনে রাখবে উহারা জানে না উহারা কি করিতেছে।'

আমাদের ছেলেবেলায় গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো অগ্রগণ্য। প্রতিটি বিভাগেই একাধিক Nobel Laureate শিক্ষক থাকতেন। একদিন বললাম গুরুজী একটা কথা শুনেছি, গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের Campus-এ যদি কেউ চোখ বুজে একটা ইঁটপাটকেল ছোড়ে, তাহলে সেটা হয় কোন N. Laureate-এর গায়ে লাগবে নইলে একটি কুকুর আহত হবে। আর একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি কলকাতায় অলিতে গলিতে অমুক তমুকদের অপোগণ্ড শিষ্যের সংখ্যা এতই বেড়েছে যে পাটকেল ছুঁড়লে একটাও কুকুরের গায়ে লাগবে না। গুরুজী বললেন, 'তুমি দক্ষিণী বাদকদের এত প্রশংসা করো অথচ এখানকার Violonist-দের সম্পর্কে প্রায়ই Violent হয়ে যাও দেখি। মনের মধ্যে এত রাগ দ্বেষ পুষে রেখো না। কখনও কটু কথা বলবে না।' আমি কাঁচুমাচু হয়ে জানালাম ঠিক আছে গুরুজী আপনি যখন বলছেন আমি আজ থেকে আর 'রাগ' দেস বাজাবোই না।

মনে পড়ে গুরুজী সেদিন বেশ সহাস্য Mood-এ ছিলেন, বললেন, 'তুমি গুমখুন করে জেলে গেলে আমি বুড়ো বয়সে জেলখানায় তোমায় শেখাতে যেতে পারবো না। সেটা ভালো করে মনে রাখবে।' আমার উত্তর ছিলো..."এখনও আমার উচিৎ শিক্ষা হয়নি গুরুজী, আমায় ধরতে এলে পুলিশদের কাকুতি মিনতি করে বলব, 'সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও'।" গুরুজী বললেন, তুমি খুনী হবে না গুণী হবে। সেদিনের আলোচনায় আমার গুণী হওয়াই স্থিরকৃত হল। শুধু 'গমকের' এমন উন্নতি করতে হবে যে তার দাপটে হাওড়া ব্রিজ পর্য্যন্ত থরথর করে কাঁপবে, মনুমেন্টে ফাটল ধরবে। আর সে গমক কর্ণগোচর হওয়া মাত্র পথচারীরা বুকে হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে ডাক্তার-ডাক্তার ...জল জল!

গুরুজী আমায় কটুকথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। শুধু এটুকু জানাতে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু উক্ত ছোট্ট বাক্যবন্ধনীটির পৃষ্ঠভূমিতে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের এক অজানা রূপ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিলো, যখন তাঁর লেখা "কালপুরুষের দর্পণে ও পূর্ব বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত" এর পাণ্ডুলিপি ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে Original বইটি আমার হাতে আসে। কবিগুরুর ভাষায় তাঁর সেইরূপ "না দেখাই ছিলো যে ভালো।"

আমি গুরুজী পণ্ডিত অজয় সিংহ রায়কে প্রচুর বই উপহার দিতাম তাঁর পঠনস্পৃহা দেখে। উনি সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমীর গ্রন্থাগারিকও ছিলেন। বলেছিলেন আমি সব বই পড়ে দেখার চেষ্টা করি। সম্ভব না হলে গন্ধটা অন্ততঃ শুঁকে দেখি। কোন বই ভালো না খারাপ তা লোকের কথা শুনে বিচার করি না।

১৯৯৬ এ পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পড়ে মুগ্ধ হয়ে একদিন প্রথম খণ্ডটি গুরুজীর জন্যে নিয়ে এলাম। সেদিন ওঁর এক প্রিয়ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন। বইটি গুরুজীকে দেওয়া মাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় শিষ্যের হাতে তুলে দিলেন।

উপহৃত বইটি সম্পর্কে তাঁর নিদারুণ অনীহা অবহেলা অবজ্ঞা বিশেষতঃ নিরৌৎসুক্য আমায় স্পষ্টত আহত করল। পড়াতো দূরের কথা বইটির গন্ধ নেওয়ার কথাও তাঁর মনে পড়ল না। এসবের জন্যে তাঁর শিষ্যটিই সেদিন যথেষ্ট ছিলেন। দু'-চার পাতা উল্টেই জানিয়ে দিলেন "বইটিতে বাবা আলাউদ্দিনের থেকে লেখক নিজের কথা বলতেই বেশী ব্যস্ত দেখলাম। কেবল হামবড়াই। আপনি লিখলে কতো ভালো হত!" গুরুজী মৃদু হেসে তাকে অনুমোদন করলেন। দ্রোণাচার্য-অর্জুনের ভাব বিনিময়ে আমার রক্তচাপ বাড়তে থাকলো।

কৈতববাদ বাঙালীর রক্তে। এই মোসাহেবীর জন্যেই শাসক ব্রিটিশরা বিশেষতঃ বাঙালীদেরই 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করত। তৈল নিষেক পর্বটি কতটা নিখুঁত হতে পারে, তা দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক ছন্দবন্ধন দেখে মালুম হল। সত্যিকথা বলতে কি পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের আত্মজীবনী পড়ে যতদূর জেনেছি তা হল বাবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিলো কালেভদ্রে, সর্বসাকুল্যে হয়তো বা ৩/৪ বার। তাও আবার অপরিণত বয়সে। তিনি বাবার শিষ্যও ছিলেন না। এই সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাবার জীবনী লেখার অধিকার তাঁর কতটুকু ছিল তা এই অমেরুদণ্ডী তোষামুদেটিকে কে বোঝাবে?

শিষ্য অর্জুনকে বললাম বাবা সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে আমি খুবই আগ্রহী । আপনার কাছে পূর্বপঠিত বহু তথ্য আছে বলে মনে হচ্ছে। তার কিছু যদি দয়া করে জানান বাধিত হবো। অর্জুন দ্রোণাচার্যের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে তাঁর সমর্থন খুঁজতে থাকলো।

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললাম, থাক-থাক, আমিই বলছি। বাবা ছিলেন এক ভয়ঙ্কর ক্রোধী মানুষ, সম্পূর্ণভাবে নিরামিশাষী, ১৪ শাক দিয়ে একথালা ভাত খেতেন। আর সকাল হলেই রাস্তায় বেরিয়ে যাকে সামনে পেতেন তাকে ধরে বেঁধে বাড়ীতে এনে

আশ্রয় দিয়ে প্রত্যহ আকণ্ঠ ভুরিভোজের ব্যবস্থা করে বেধড়ক পিটিয়ে সংগীত গন্ধর্ব করে "Made in Mihar" ছাপ দিয়ে একেবারে বাজারে ছেড়ে দিতেন। তাঁর এই সার্বিক সকর্মক ক্রিয়ার জন্য কোন দক্ষিণা পর্যন্ত নিতে চাইতেন না। আমার কণ্ঠস্বর ছাত্রটির কানে রেল কম্পার্টমেন্টে বিষহরী বা তালমিছরী বিক্রেতার মত শোনালেও ব্যঙ্গের হুল দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করতে ছাড়লো না।

গুরুজীর দিকে চেয়ে বললাম পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের বইটি শুধু একটি অসাধারণ সাহিত্যকর্মই নয় একটি সৎ-সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিক দলিল যা সেদিনের সংগীত সমাজের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। কোন কান্তিবর্দ্ধক অঙ্গরাগের সাহায্য নেওয়া হয়নি। হয়তো এই বই বাঙালী উল্টে পাল্টেও দেখবে না। তাদের রুচির কথা মাথায় রেখেই এক ক্ষমতাধর সংগীতবেত্তা দুটি সংগীত সম্পর্কিত "গুল্প সমগ্র" বাজারে ছেড়েছিলেন। তারা আকারে-প্রকারে এক-একটি থান ইট। দুটি বইই পুরস্কৃত হয়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে পাঁজীর মতই শোভা পাচ্ছে কেবলমাত্র প্রচারের গুণে।

আমি যে বইদুটির ইঙ্গিত করলাম সে বইদুটি সম্পর্কে গুরুজী যথেষ্ট অবহিত। শুধু তাই নয় লেখকের সঙ্গে তাঁর হরিহর আত্মার সম্পর্ক। রাজহংস যেমন জলে মিশ্রিত দুগ্ধ থেকে জল বাদ দিয়ে শুধুই দুগ্ধ গ্রহণ করে গুরুজী তেমনই আমার সামগ্রিক ভাষণ থেকে অঙ্গ রাগ, কান্তিবর্দ্ধক গুল্প সমগ্র ইত্যাদি শব্দ চয়ন করে ক্রোধিত হতে থাকলেন। আর অর্জুন কি বুঝল কে জানে, সে ব্যক্তিগত আক্রমণের রাস্তা ধরল।

অর্জুন সরাসরি বলল, 'প্রণববাবু আপনি তো কোন এক মিশনারী কলেজে রসায়ন পড়ান! সাহিত্য কি আপনার বিষয়? আপনাকে জানাই আমার পঠনের বিষয় ছিল বাংলা। তাই সাহিত্যের গুণমান নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার অন্ততঃ আপনার চেয়ে আমারই বেশী।'

ওকে রাগানোর জন্যে প্রশ্ন করলাম আপনার অঙ্কের আতঙ্ক আপনাকে সাহিত্য নিতে প্রাণিত করেনি তো? পরক্ষণে হেসে বললাম কিছু মনে করবেন না ভাই নিতান্ত রসিকতা করলাম। অঙ্কশাস্ত্রে আপনার পারঙ্গমতায় আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। আমার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে বলেই বলছি। সাহিত্য আমায় আকর্ষণ করত এটা ঘটনা, কিন্তু আমি ইংরাজীতে যাকে বলে Ever Green (চির কাঁচা)। তাই বাধ্য হয়ে বিজ্ঞান পড়তে শুরু করি। সম্ভবত সংবিধানই হয়তো বা আমাদের অঙ্কে কাঁচা হলে সাহিত্য আর ইংরাজীতে কাঁচাদের বিজ্ঞান পড়ার অধিকার স্থির করে দিয়েছে।

আসল কথা হল আমার পরিচিত অসংখ্য সুধী সংবেদনশীল পাঠক যাঁদের আমি বই দুটি পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁরা একবাক্যে জানিয়েছেন পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য লিখিত 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' একটি অনন্যসাধারণ সাহিত্য কর্ম। এই পাঠক বর্গ বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু তাঁদের মন্তব্যই তুলে ধরেছি। আপনি যথার্থই বলেছেন সাহিত্যের মান ও গুণগত উৎকর্ষ নির্দ্ধারণের যোগ্যতা আমার চেয়ে আপনারই বেশী। বইটি হাতে নেবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তা আপনি প্রমাণও করেছেন। আমি নিতান্তই একটি নিম্ব বৃক্ষ। যে সৌভাগ্যবশতঃ চন্দন বনে বড় হয়েছে। এখন যেমন আমি গুরুজীর ছায়ায়

নিজেকে পরিশীলিত করার চেষ্টা করে চলেছি মাত্র। আমার কোন অনিচ্ছাকৃত অহংকার প্রকট হলে মার্জনা করবেন।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের লেখা "কালপুরুষের দর্পণে ও পূর্ববাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত" পুস্তকটি পড়াই আমার কাল হল। দেখলাম এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে আবার গুরু-শিষ্য সংবাদে ফিরে আসবো।

বইটি পড়ে বুঝলাম উনি আদৌ নিরপেক্ষ নন। বরং এক সার্বভৌম শিল্পীর একনিষ্ঠ পূজক। বহুসময় তিনি দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫ ঘণ্টা এই বন্ধু শিল্পীর সঙ্গে কাটিয়েছেন বলে দাবী করেছেন (পৃ. ৭৪)। ব্যক্তিগত কারণে তাঁর প্রতি লেখকের অপরিমেয় আনুগত্য। সেই শিল্পীটিকে সর্বকালের সর্বোত্তম প্রমাণ করতেই তাঁর লেখনী ধারণ। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কিছু সত্য, অর্দ্ধ সত্য স্বকপোল কল্পিত মিথ্যার সঙ্গে কিংবদন্তী, রূপকাশ্রয়ী জনশ্রুতির মিশেলে অদ্বিতীয় এক শিল্প সত্তার উন্মেষ ঘটতে থাকে যাঁর অঙ্গুলী সঞ্চালনে ভরতের নাট্য শাস্ত্রের যাবতীয় গুণাবলী বিকশিত হয়ে ওঠে মোহিনী মায়ায়। (পৃ. ৭৯)

লেখকের আরাধ্য শিল্পীটি সর্বগুণান্বিত হতেই পারেন কিন্তু পাঠকের মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হতে থাকে যখন দেখা যায় একই নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ অকারণে সমকালীন এক মহান প্রতিস্পর্ধী শিল্পীর সমালোচনায় শ্রীসিংহরায়ের লেখনী কতটা কটু, হিংস্র, উগ্র, নিষ্ঠুর অকরুণ, অনুদার ও কেবলি যাতনাময় হয়ে উঠতে পারে।

লেখক তাঁর অপছন্দের শিল্পীর ত্রুটি বিচ্যুতি সীমিত ক্ষমতা, কলাবন্ত বাজের অলঙ্করণের অভাব (পৃ. ৭৮) তালাধ্যায়ের দুর্বলতা ইত্যাদি (পৃ. ৮১) যা যা জানিয়েছেন শিল্পীকে ছোট করার পক্ষে তা কি যথেষ্ট ছিল না?

জানতে ইচ্ছে করে এর পরেও কোন বেদব্যাসের প্ররোচনায় ও তথ্য সরবরাহে শ্রীবিনায়কের লিখন পঙ্কিলতার স্রোতস্বিনী হয়ে উঠলো? সম্পূর্ণ অকারণে এই মহান শিল্পীর পিতা ও পিতামহকে হতমান করতে তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতি পারিবারিক অবস্থান এমনকি বংশ পরিচয় পর্য্যন্ত টেনে আনতে দ্বিধা করলেন না। এবং মুক্ত কণ্ঠে জানালেন "....."। (পৃ.৭৬) কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি পংক্তি 'বলব বৎস সভ্যতা যেন থাকে বজায়'—আমায় থামতে বাধ্য করল।

এই রুচিতে উস্তাদ বাবার জীবনপঞ্জীর প্রতি তাঁর অনীহা, নিরৌৎসুক্য অবহেলাই তো স্বাভাবিক।

দ্রোণাচার্যকে সাক্ষী রেখেই এবার অর্জুনের প্রতি যত্নবান হলাম। পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য লিখিত 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম। এ শুধুই আমার বিশ্লেষণ ধর্মী মতামত নয় এ হল আমার সহজাত প্রেরণা প্রসূত অনুভব। প্রাণীদের ক্ষেত্রে যাকে বলে Animal Instincts আপনি হয়তো জানেন ওরা বুদ্ধিজীবী হয় না। অন্যের মতামত রোমন্থন বা গিলীত চর্বন করে না। প্রায় ওদেরই মত আমার সহজাত অনুভব কতটা নির্ভুল হয় তার প্রমাণ পেলে হয়তো আমার সাহিত্য বিষয়ক মতামতকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবেন।

বলতে থাকলাম সাংগীতিক প্রতিভা, সংগীতের ব্যকরণ কৌমুদীর অনুশাসন মেনে চলে না। কষ্টার্জিত শ্রমসাপেক্ষ, অধ্যাবসায় ও অনুশীলন লব্ধ বাদনশৈলী, দ্বাদশ অঙ্গের (!) আলাপ, মন্দ্রে বীণ ও রবাবের অনুরণন, মোহিনীআট্যম থেকে কত্থক নৃত্যের পারদর্শিতাজনিত ছান্দসিকতা, ভগ্নাংশ তালের অবাধ প্রয়োগ এসব আমার বিচার্য বিষয় নয়, আমার একমাত্র বিবেচ্য হল সহজাত সৃষ্টিশীলতা। দ্রোণাচার্য বুঝলেন কাকাতুয়াটি এসব কৃষ্ণনাম তাঁর পুস্তক থেকে রপ্ত করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো নয় গঙ্গাদূষণ করছে। আর অর্জুন অবাক হয়ে ভাবতে থাকলো আমার লক্ষ্যের পক্ষীটি কে? দু'জনের কেউ জানেন না পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধুই কি পুস্তককেন্দ্রিক না আরো ব্যাপক!

নির্দ্বিয়ার আমি জানালাম শুধুমাত্র সহজাত সৃষ্টিশীলতার নিরিখে আমাদের ঘরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষটি হলেন বাহাদুর খান।

আমি সেই প্রতিভার কথা বলছি যা শিক্ষা নিরপেক্ষ, ঈশ্বর দত্ত জন্মগত ঐশী শক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা হল ল্যাজের মত। যার আছে তার আছে। না থাকলে টেনে বের করা যায় না।

আশির দশকে দূরদর্শনের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি একটি Orchestra করেন। যা শ্রোতাদের একটি মর্মস্পর্শী কল্পলোকে উত্তরিত করেছিলো। প্রচারের আলোয় থাকা শিল্পীদের তুলনায় তাঁর Orchestra গুণমানে কত যোজন এগিয়ে তা একটি উদাহরণেই প্রতীয়মান হবে যদি তা Archive-এ সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রাথমিক জীবনে Western Music-এর ছাত্র হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা বলছে প্রতিটি যন্ত্রের আত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি জানতেন কার কতটুকু সমন্বয় করলে ঐকতানটি স্বার্থক হবে। একাধিক যন্ত্রের আত্ম অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে অভিন্ন একরূপতা জন্ম নেবে। Violonist না হয়েও আমার যন্ত্রটির সম্ভাবনা, সীমা ও পরিধি অতিক্রমণের বোধ ছিল তাঁর তীব্র। সবিনয়ে স্বীকার করি আমার বাদনের ব্যক্তিত্ব উস্তাদজীর দান। এই Identity-টুকুই সকলের থেকে আমায় আলাদা করে রাখবে।

কবি রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর যামিনী রায়, ভাস্কর অনন্ত মালাকারের জীবন কেন্দ্রিক তথ্যচিত্রে তাঁর আবহ সুর আমাদের স্নিগ্ধ করে সুস্নাত করে। শ্রোতার মনমাঝি যেন খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে কাছি টুকরো করে এগিয়ে চলে স্বপন পারের দিকে। বাহাদুর খাঁ সুরে ছবি এঁকে চলেন। মায়ের আঁচলের সুবাস ঘেরা হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতিমেদুরতা ফিরে এসে আমাদের উদাস করে বার বার পশ্চিম আকাশে অস্তরাগ রাঙা গোধূলীর আলো গায়ে মেখে সাদা বকের ঝাঁক উড়ে যায়। আঁধার নামে। নক্ষত্ররা একে একে জেগে ওঠে শিশিরের শব্দের মতন। বাহাদুর খাঁ সুরে সুরে ছবি এঁকে চলেন। সুরের তুলির টানে নিশার মত নীরব হয়ে আমাদের ক্লান্ত চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমে আসে অতি ধীরে। ভিজে মাটির গন্ধে প্রগাঢ় প্রশান্তির আশ্বাসে কবোষ্ণ নীড়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

তাঁর সুর নদীর পথ চলার মতই সুললিত, মলয় বাতাসের প্রবাহের মতই মসৃণ, ঘাসের বেড়ে ওঠার মতই স্বতঃস্ফূর্ত, লোকগানের মতই বিশ্বজনীন সর্বজনবোধ্য। তাই একান্তভাবে

বাঙালীর জন্যে নির্মিত আটপৌরে বাংলা ছবি 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' বা 'নতুন পাতা' তাঁর আবহসুরে আন্তর্জাতিক খেতাব জয় ক'রে যথাক্রমে ভেনিস ফেস্টিভ্যাল ও কার্লভিভ্যারি ফেস্টিভ্যালে, কোন তথাকথিত বরেণ্য পরিচালকের নাম মাহাত্ম্য ছাড়াই।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের স্কন্ধারূঢ় হয়ে কেউ কেউ বিশ্বমানের খেতাব অবশ্যই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোল থেকে নামার পর?

অর্জুন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন আপনি কি পণ্ডিতজীর দিকে ইঙ্গিত করছেন? আমি বললাম কদাপি নয় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমার আলোচ্য বিষয় নন। আমার বক্তব্য বাহাদুর খাঁ এক মেঘে ঢাকা তারা। ভবিষ্যৎ গবেষকদের নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান হয়তো বা একদিন শিল্পী হিসেবে বাহাদুর খাঁ'র প্রকৃত অবস্থান নিরূপিত করবে।

এসব কথায় অর্জুন আদৌ আলোড়িত হলেন না। তাঁকে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে দেখে বললাম, আপনি দয়া করে এক Dwarf-এর ভাষণ দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনেছেন। গুরু সম্পর্কে শিষ্যের সহজাত instinct কি বলে তাও জেনেছেন। কোন ভবিষ্যৎ গবেষকের নয়, এবার এক সমকালীন বিদগ্ধ শ্রদ্ধেয় এক সংগীত কোবিদ যাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মূল্যায়নে অনেকেই আস্থা রাখেন, সর্বোপরি যিনি আপনার সম্মুখে স্বশরীরে উপস্থিত তাঁর মতামত শুনতে কি আপনার মহামূল্যবান সময়ের কিছুটা অংশ দিতে পারবেন? 'স্বশরীরে উপস্থিত' কথাটি জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করতেই গুরুজীর চোখেমুখে রীতিমত দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। অর্জুন একেবারে স্তব্ধ। প্রকাশ্যে বললাম গুরুজী আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার লেখা 'কালপুরুষের দর্পণে পূব বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত' এর ২৭৭ পৃষ্ঠা থেকে একটি অমোঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তা হল "স্বয়ং উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর হোসেনকে নিজ পরিবারের সবচেয়ে প্রতিভাবান সম্ভাবনাময় শিল্পী বলে মনে করতেন"।

আমার বক্তৃতার শ্রোতাদের বিহ্বল দেখে এক আত্মহারা আতিশয্যে একেবারে ঝুলির বেড়াল বের করে বসলাম। এবার আর প্রতিভা নয়। আলোচ্য বিষয় শিক্ষাগত যোগ্যতা। একটুও দ্বিধা না রেখেই বললাম আমার সহজাত অনুভূতি এক্ষেত্রে জানাচ্ছে আমাদের ঘরের সর্বোত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষটি হলেন পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য।

যতীন ভট্টাচার্য হলেন বাবার একমাত্র শিষ্য যাঁকে বাবা বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অন্যেরা কাছে পিঠে বাড়ী ভাড়া করে থেকে শিক্ষা নিতেন। উস্তাদ বাবা ছিলেন উত্তেজনাপ্রবণ মানুষ। তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে যতীন ভট্টাচার্য সব ব্যাপারেই এগিয়ে আসতেন। একটা সামান্য Post Card Drop করা থেকে বাবার হাত-পা Massage করা, বাবার নাতি-নাতনী আশিস, বেবিদের পড়াশোনার ব্যাপার সামলে, সংসারের খুঁটিনাটি দেখে, একাদিক্রমে সাত বছর সচিব হয়ে বাবার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা প্রশমিত করতেন। বাবাও কারো কাছে কোন ঋণ রাখতেন না। শিক্ষার মাধ্যমে শোধ করতে চাইতেন। তাই এই কৃপাধন্য মানুষটির জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে উঠেছিল মণিমুক্তা রাজিতে। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন তালে আধারিত প্রতিটি রাগের অসংখ্য-বন্দিশ, মধ্যলয়ের অগণন গত, প্রায় প্রত্যেকটি রাগের উজীরখানি গত যা আজ অবলুপ্তির পথে। এর সঙ্গে ছিল উস্তাদবাবা

সৃষ্ট অসংখ্য রাগের সম্ভার। উস্তাদ বাবার শিক্ষা তিনি শুধু অঞ্জলীবদ্ধ করে সংরক্ষণই করেননি সাগ্রহে বিতরণ করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখনীয় আড়া চৌতালে আধারিত কাফী, বিহারী সিন্ধুরার মত রাগ ও তার বিস্তার করার অনবদ্য পদ্ধতি, যা আজ প্রায় অস্তমিত।

এ পর্য্যন্ত ঠিকই চলছিলো হঠাৎ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রাণোচ্ছল হয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করতে গেলাম, বললাম কোন বিশ্লেষণী দক্ষতা নয়, ধরুন just animal instinct! একটি বাছুর যেভাবে অসংখ্য গাভীর মধ্যে তার মা-কে খুঁজে নেয় কোন গুরুর কি quality, কি গুণ তা আমি নির্দ্ধারণ করে থাকি নির্ভুল নিশানায়। এই গুরু গুরু গরজনের মধ্যে, লঘু ও গুরু দুজনের শাসনেই আমার নির্মোক গেল খসে। বাক্য এবং বাণ অথবা বাক্যবাণ একবার বেরলে আর ফেরৎ নেওয়া যায় না, অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গুরু দত্ত ঘোষণা করে ফেলাম।

ঠিক এই ব্রাহ্ম মুহূর্তের জন্যেই যেন অর্জুন অপেক্ষা করছিল। সেই পাশুপাত প্রয়োগ করল একেবারে অভ্রান্ত লক্ষ্যে। নিরীহ মুখ করে বলল, বাছুরেও ভুল করে, কিন্তু আপনি করেন না। তা আপনি ক'বছর যেন বেনারস যাতায়াত করছেন? দুটি শিক্ষাধারা দুই গুরুর সন্নিধানে একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে যথেষ্ট এলেমের দরকার। তাও আবার গোপনে। আমার এতক্ষণের স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের একঘায়ে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। আর গুরুজীও অর্জুনের পাশুপতে ওঠা হলাহলে কিছুটা আচ্ছন্ন ভাবে বসে রইলেন বিভ্রান্ত হয়ে।

গুরুজী কানাঘুষায় আগেই শুনেছিলেন। আজ তাঁর সাধের গোশালার আহ্লাদের গোবৎসটিকে তিড়িং-তিড়িং করে ঢুঁ মারতে দেখে বুঝে ছিলেন এটি আর বাছুর নেই। এটি একটি বলদর্পী বলীবদ হয়ে উঠতে চলেছে। এখন তাঁর আর বুঝতে বাকী রইলো না ষণ্ডটি যতীন ভট্টাচার্যের জাব আর খোল খেয়ে প্রতিপালিত হয়ে বেনারসের গলিগুঁজি অতিবাহন করে মণিকর্ণিকায় কলাপাতা চাটছে।

গুরুজীকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখে আমি প্রমাদ গুণলাম। শান্ত মানুষ রেগে গেলে ভীষণ রূপ ধারণ করতে পারেন। স্বস্তস্ত্র হয়ে ভাবতে থাকলাম এই বুঝি কোন শুদ্ধ সুশীল কৃষ্টিজাত পদাঘাত বলীবর্দটির পুষ্ট নিতম্বে না নেমে আসে। বুঝলাম অদ্যই শেষ রজনী। আমার কথাটি ফুরলো। এতদিনের শিক্ষার নোটেগাছটিও মুড়োতে দেখলাম।

এখানে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের প্রসঙ্গ শেষ করলে তাঁর প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হত। আগেই লিখেছি—জানতে ইচ্ছে করে, কোন বেদব্যাসের প্ররোচনায় ও তথ্য সরবরাহে শ্রীবিনায়কের লিখন 'পঙ্কিলতার স্রোতস্বিনী' হয়ে উঠেছিল।

এখানে স্মর্তব্য 'কালপুরুষের দর্পণে ও পূব বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত' পুস্তকটিতে প্রায় সহস্রাধিক সংগীত গুণীর কথা তিনি শুধু স্মৃতি থেকে আমাদের শুনিয়েছেন। তা কেবলই প্রশংসার। তাঁদের সম্পর্কে একটিও নিন্দাবাচক উক্তি উনি ভুলেও করেননি। অর্থাৎ কারো ত্রুটি দেখা বা কুসমালোচনা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না।

এই প্রতিবেদক নির্দ্বিধায় জানাচ্ছে শ্রীসিংহরায়ের প্রতিটি ত্রুটি, প্রতিটি স্খলন, তাঁর বিকার

কু-শব্দচয়ন, তাঁর লেখনীর নিম্নগামীতা কুরুচিকর তথ্যসম্ভার, তাঁর সার্বিক অবনমন এসব কিছুর পেছনে কাজ করেছে একটি ঋণাত্মক অনুঘটকের সঙ্গ দোষ। পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের জন্ম থেকে তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর সাংগিতীক নির্মিতি, আশ্রমিক শিক্ষালাভ, আদর্শগত অনুপ্রেরণার পশ্চাতে সাধক চিকিৎসক ডঃ মহেশচন্দ্র নন্দীর অবদান, বিখ্যাত সংগীত সাহিত্য নাট্যগুণীদের মূল্যবান সাহচর্য, এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানাতেই তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিবেদক তুলে ধরেছে। তা এটাই প্রমাণ করে যে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের মত সদাশিব, সদাশয় সুভদ্র সুশীল মানুষটির এই সাময়িক রুচিবিকার ও লেখনীর নিম্নগামীতার সব দায় সেই ঋণাত্মক অনুঘটকটির ওপর বর্ত্তায়। তাঁকে অবজ্ঞা করাই শ্রেয়।

পিতা দ্রোণাচার্যের মত কৌরবপক্ষ সমর্থন করা বা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোন দায়বদ্ধতা অশ্বত্থামার ছিল না। একই গুরুকূলে শিক্ষালাভের কারণে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাও ছিল অমলিন। এতৎসত্বেও শুধুমাত্র 'দুর্যোধন'কে খুশী করতে গিয়ে তিনি অকারণে পাণ্ডবদের পাঁচটি নিষ্পাপ নাবালক পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। এতেও ক্ষান্ত হলেন না। অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভস্থ পাণ্ডব বংশের শেষ কূলপ্রদীপটিকে নিভিয়ে দিতে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। অথচ পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর কোন ব্যক্তিগত অসূয়া ছিল না।

কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিলেন, তোমার শরীরে ব্রহ্মাস্ত্রজনিত ক্ষতের কখনও নিরাময় হবে না। এর জ্বালা যন্ত্রণা বহন করতে তুমি অমরত্ব লাভ করবে। শ্রীঅজয় সিংহরায় তেমনই তাঁর লেখনীর অশালীনতার দায়ে চিরকাল সংবেদনশীল পাঠককুলের ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গুরুজীর প্রতি পূর্বতন আস্থা ও শ্রদ্ধা ফিরে এলে গভীর প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম। শ্রীসিংহরায়ের আনুকূল্যেই আমার প্রথম গুরু শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীলের Violin বাদনের সাংগীতিক ধ্বনি ধারণ করে রাখা হয় রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমীর পক্ষ থেকে। Recordingটি হয় শ্রীযুক্ত শীলের প্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে। Recordingটি হবার পর গুরুজী বলেছিলেন এই বয়সে (৮৬ বৎসর) পরিতোষবাবুর Tonal quality ও বাদনের মান যা শুনলাম তা তথাকথিত দিকপালদের লজ্জা দেবে।

গুরু উস্তাদ শৌকৎ আলি খান
সংসারে এক সন্ন্যাসী

(A monk among musicians)

(প্রতিবেদকের শিক্ষাকাল ১৯৮৭-৯৭)

আমার তালাধ্যায়ের গুরু ওস্তাদ শৌকত আলী খানের তবলা পরিবেশনের Recording SRA-তে দু'বার সংরক্ষিত হয়। মাত্র এ দুটি অভিজ্ঞানই খাঁ সাহেবকে উত্তর প্রজন্মের কাছে

পরিচিত করবে এটিও ঘটেছিলো পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের পোষকতায়। আমার দুই গুরুর অভিমানের ক্ষতে কিঞ্চিৎ প্রলেপ দিয়ে গুরুজী আমায় চিরঋণী করে গেলেন।

পরিশেষে এই প্রতিবেদক সাশ্রুনয়নে জানাতে চায় সে তার অন্যতম গুরুর প্রতি আমৃত্যু শ্রদ্ধাশীল থাকবে। আজও সে তার প্রয়াত গুরুর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তর্পণ করে থাকে।

উস্তাদ শৌকত আলি খান সম্পর্কে পণ্ডিত অজয় সিংহরায়ের প্রতিবেদনটি হুবহু বিবৃত করলাম। (প্রতিবেদক)

Ajoy Sinha Roy

"Nimalya"
373/2 N S Avenue
Calcutta 700053

'Taladhyaya' is supposed to be one of the most important and an essential chapter of Indian music. Unlike the western time keeping it is based sometimes on the most intricate mathematical divisions like the Fraction and the calculus. The time cycle or the talas are divided into such fractional parts that it becomes very difficult to keep its counts properly. A few very rare personalities are there who can keep the entire things at their fingertips. Talacharya Ustad Saukat Alikhan Sahib is certainly such a rare person.

Ustad Saukat Ali Khan Kabri was born in U.P. in 1917. He was educated through the medium of Urdu and Persian. He started learning the art and science of playings the Tabla from Ajjan Khan Sahib in 1935. After learning for three years he became desciple of Ustad Masit Khan. Then after 4 years he became a deciple of Ustad Ahmadjan Therakua - the then accreditably the greatest exponent of Tabla.

In 1954 he came over to Calcutta to take part in the Tansen music conference. He played Laharas in Tintal and a tal consisting of 11½ matras of his own creation. The performance was so very pedantic that Ustad Ahmadjan Therakua one of the many renowned Tablia listners present there burst out in tears and .....p/2.

2

embraced Saukat Ali saying "Tone mereka Sab Chura lia" (You have stolen all of my specialities). Then Saukat Ali became a Gandabandh Sagrid of Ustad Ahmadjan Therakga. The writer was present at this historic music conference and a witness to this performance. He has seen for himself how eminent tabla players like Ustad Karamatullah Khan, Ustad Allarakha Khan, Pandit Kishen maharaj, Pandit Shantapresad, Pandit Kanai Dutta, Pandit Jnanprokash Ghosh, Pandit Birju maharaj and many others going up the stage and shaking hands with Ustad Shaukat Alikhan.

Since then Ustad Saukat Ali has created Talas of 5½, 8½, 11½, 18½ matras and music Bandish to cover them in instruments. One of these Talas was presented to the listners by the A.I.R., Bombay and he was awarded a prize for that by Ustad Azim Hussain Khan a great Tabla Player of the yesteryears.

He has invented a rhythm cycle backed by a Gat on that which consists of 20 matras and which can be played in a way when the Sams can be placed on each from the 4 matras to 20 matras. After a dazzling demonstration of this Ustad Allarakha Khan has said of him as he is the "last of the mohiccans".

Ustad Vilayet Khan the great Sitaria and his younger brother Ustad Imrat Khan were indebted to him for their conception of Laya and Tala attainments. At times Khan Sahib was their constant companion. He accompanied them on the Tabla at many mahfils and music conferences. One of his performances was shown live on the famous Film 'Jalsaghar' directed by the World famous Indian movie director, Late Satyajit Roy with the music direction by Ustad Vilayet Khan himself.

contd..p/3.

3

As my own observation of him as a person and as a performer I may say that I have seen him from the days when he was regarded and revered as "Fakir Sahab", all the time busy with his 'Tasby' concentrating his mind on the Allah the Lord of the Universe. I have found him a devout muslim but never at cross with other religionists, a thoroughly honest and selfrespecting man always sympathetic and helpful to other's ailments and afflictions. The lure of money making could never touch him. I wish this great Tablia and humanist a long life in the service of Indian music.

AJOY SINGHRY 9.2.95

উপসংহারে জানাই খাঁ সাহেবের আনুকূল্যে মিলাদ-উন-নবী উৎসবে ২ বার বাজানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালে। গুরুজী শৌকৎ আলি খান দুবারই পরম করুণায় আমার সহায় হয়েছিলেন। তাঁর এই কৃপার কথা আমি আজীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে লালন করব।

গুরু পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য্য (১৯২৬-২০১৬) নুনের পুতুল সাগরে

১৯৯৬-এ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে আমার জীবনের শেষ সঙ্গীতগুরু (শিক্ষাকাল ১৯৯৬-২০১৬) পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি বেনারস নিবাসী হলেও সে সময় যাদবপুরে সঙ্গীতপ্রেমী রুনু বসুর বাসভবনে আতিথ্য নিয়েছিলেন। পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের বাজনার সঙ্গে আমার পরিচিতি হয় ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত কৌশি ভৈরবী ও তাঁর নিজসৃষ্ট রাগ সম্পূর্ণ কানাড়ার মাধ্যমে। বাবার অন্যতম প্রধান শিষ্যের বাদন শৈলী এ ঘরের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী উস্তাদ আলী আকবর খাঁ বা উস্তাদ বাহাদুর খাঁর বাদনের রূপরেখা থেকে লক্ষ্যণীয় ভাবে আলাদা বলে মনে হয়েছিলো। কৌশি ভৈরবী রাগটি এর পূর্বে বা পরেও শোনার সৌভাগ্য হয় নি। পণ্ডিতজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লালিত্য ও আভিজাত্য আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিলো। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো এই আকাশবাণীর মাধ্যমে শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল, উস্তাদ বাহাদুর খাঁ এবং পণ্ডিতজীর বাজনা শুনে এঁদের মনে মনে গুরুর আসনে বরণ করেছিলাম এবং ঈশ্বরের নির্বন্ধে কোন এক রহস্যময় মহাজাগতিক অলৌকিক শক্তির অনুমোদনে আমার সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছিলো।

আমার আগ্রহাতিশয্যে ও শ্রীমতী রুনু বসুর আনুকূল্যে একদিন পণ্ডিতজীর পদপ্রান্তে

উপস্থিত হলাম। রুনুদি জানালেন ছেলেটির ভীষণ ইচ্ছে আপনার কাছে শেখে। আপনিতো আপাতত কলকাতায় আছেন, একটু সময় দিলে ভালো হয়। ও একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে উনি আমার দিকে তাকালেন, বললেন 'যা শিখেছো তাই ভালো করে রিয়াজ করো—নতুন করে শেখার কি বা প্রয়োজন? আর আমি কলকাতায় বেশী আসিও না—তুমি এবার আসতে পারো।' আমার মনের কোণে লালিত দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এ ভাবে ভঙ্গ হওয়ায় আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, যা আদৌ বয়সোচিত বা সময়োচিত ছিল না। উনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বললেন 'মানুষ দুঃখে কষ্টে শোকে বেদনায় কাঁদে, খেতে না পেয়ে কাঁদে—কিন্তু শেখার জন্য কাঁদে এমন তো দেখিনি! তোমার যখন এতই শেখার ইচ্ছে, ঠিক আছে—তুমি আসতে পারো।'

কয়েক মিনিটের ব্যবধানে 'তুমি এবার আসতে পারা' থেকে 'ঠিক আছে—তুমি আসতে পারো' এই প্রায় সমোচ্চারিত বাক্যবন্ধ আমার জীবনের পরবর্তী ২০ বছরের অবশ্যম্ভাবী অমোঘ উত্তরণের দিকনির্দেশ হয়ে থাকলো। আমার অবাক হবার আরো কিছু বাকি ছিলো, যখন জানলাম শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উনি কোন দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। উস্তাদ বাবাও শিষ্যের কাছে দক্ষিণা গ্রহণ করতেন না; কিন্তু মনে রাখতে হবে মাইহার মহারাজের আনুকূল্যে তাঁর সংসারের ব্যয় নির্বাহ হত।

আমার শিক্ষা শুরু হল। গুরুজী নির্দেশ দিলেন নতুন করে তিনটি রাগ নিয়ে সাধনা করো। ইমন, কাফী ও ভৈরবী (শুদ্ধ ও সিন্ধু ভৈরবী)। সময় পেলেই চলে আসবে। আমার পাশের ঘরে বসে বাজাবে। দরকার মতো ডেকে নেবো। গুরুজী বললেন চুম্বকের মতো তুলে নিতে হবে। আমার Western Music-এর শিক্ষা ও স্বরলিপি করার প্রবণতা থাকায় আমি আলাপ, জোড়, ঝালা, বিস্তার ও গত সম্পূর্ণভাবে Notation করে রাখতাম এবং নিখুঁত রূপায়ণের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখতাম না। সবকিছু Notation-এ ধরে রাখার প্রবণতা আমি পেয়েছিলাম আমার প্রথম গুরু শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল মহাশয়ের প্রেরণায়। আমি গুরুজীর প্রথম এবং একমাত্র শিষ্য যাকে Record করতে অনুমতি দিয়েছিলেন অনেক মিনতি করায়। কারণ আমার চৌম্বকত্ব ছিলো না। এটা গুরুজী বুঝেছিলেন। অশ্বের শ্রমশীলতা, সারমেয়ের কৃতজ্ঞতা ও আরুণির আকুতি দিয়ে নিজের অপূর্ণতা পূর্ণ করতাম। সাহসের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবদারের আতিশয্য এতই বাড়াবাড়ির পর্যায় পৌঁছল যে গুরুজী অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠলেন 'বাজিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, গেয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, Notation লিখে দিতে হবে, মাথায় গজাল মেরে তাল ঢুকিয়ে দিতে হবে,—আমার বাবা এসেছেন।' অনেক দিন বাদে বুঝেছিলাম এ তাঁর ছদ্ম কোপ। আমার প্রতি তাঁর করুণার অবধি ছিলো না। উপরোক্ত তিনটি রাগে অন্তত ২০টি করে বন্দিশ পেয়েছিলাম।

গুরুজী বলতেন রাগ ভেদ, রাগ বিচারের দিকে দৃষ্টি দিলে তবেই রাগ বোধ আসবে। আমরা সাধারণতঃ একটি বন্দিশে রাগের ঠাট, স্থায়ী-অন্তরা, আরোহী-অবরোহী, বাদী সম্বাদী অনুবাদী স্বর সমূহ, বক্রস্বর বর্জস্বর লক্ষ্য করে থাকি। একটি খানদানী বন্দিশ পর্যালোচনা

করলে দেখা যাবে কিভাবে এর মধ্যে রাগরূপ লুকিয়ে আছে। নির্দিষ্ট রাগটির বন্দিশে সোম কোন স্বরে পড়বে জানতে হলে বাদী, সম্বাদী ন্যাস স্বরতো বটেই তার সঙ্গে রাগটি কোন প্রহরের তাও অগ্রগণ্য বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে। ঠাট শব্দটি এখানে অনুল্লিখিত থাকলেই ভালো হত। কারণ সব রাগকে ১০টি ঠাটের মধ্যে বর্গীকরণ করা যায় না। যেমন মারু বেহাগ।

মাড়োয়া রাগে বাদী কোমলে ঋষভ ও সম্বাদী স্বর ধৈবত। রাগটি বৈকালের হওয়ায় কোমল ঋষভে সোম পড়াই বাঞ্ছনীয়। আবার গোরক্ষ্ কল্যাণে (স, ম) ও নারায়ণী (র, প) রাগের কাঠামো ও গঠন প্রণালী সমাকৃতি হওয়ায় একট বন্দিশেই দুটি রাগকে আধারিত করা কোন অন্যায় হবে না। শুধু মনে রাখতে হবে গোরক্ষ্ কল্যাণে মধ্যম স্বরে, ও নারায়নী রাগে শুদ্ধ ঋষভে সোম পড়াই ব্যাকরণ সম্মত। আমার মত সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ধারণাই যথেষ্ট। কিন্তু যাঁরা জ্ঞান মার্গ থেকে ব্রহ্মলোকের যাত্রী (knowledge to wisdom) তাদের দায়িত্ব আরো বেশী। টৌড়ীর কোমল গান্ধার ও মালকোষের কোমল গান্ধারের পার্থক্য নির্ণয় করা আরো উচ্চতর বোধ ও চিন্তার বিষয়।

গুরুজীর প্রতিটি বন্দিশ ছিলো শিক্ষামূলক, মনস্কশিষ্য তাকে analysis-এর মাধ্যমে ছোট ছোট idea-তে বিভক্ত করতে পারতো। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে সেই তথ্যাবলীর সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে নতুন synthesis করতে পারলে রাগ হতো আরও প্রাণবন্ত। আয়াসহীন ভঙ্গিতে উঠে আসতো বৈচিত্রপূর্ণ তান। আলাপ বিস্তার ব্যাকরণসম্মত হয়েও হতো মনোহারী। যে যতবেশি বন্দিশ আয়ত্ব করেছে, আত্মীকরণ করেছে সে ততই "তোড়না ও জোড়না", অর্থাৎ analysis and synthesis-এ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতো।

গুরুজী ছিলেন বন্দিশের সম্রাট। তাঁর অনন্য স্মৃতি শক্তিতে ধরা ছিলো উস্তাদ বাবার কাছে পাওয়া বিভিন্ন তালে আরোপিত অগণন বন্দিশ। শিক্ষার সময় প্রতিটি রাগের উপর পেতাম একাধিক মধ্য বিলম্বিত গত। সঙ্গে থাকতো সোম বিষম অতীত ও অনাঘাতের সুষম প্রয়োগ। এ সবই ছিল উস্তাদ বাবার বৈশিষ্ট্য যা গুরুজী আন্তরিকতার সঙ্গে ধরে রেখেছিলেন। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হল অধুনালুপ্ত উজীরখানি গত। এখানে উল্লেখনীয় মিঞা তানসেনের পুত্র বংশের শেষ বংশধর উস্তাদ বড়ে আলি খান ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ আলী খাঁর মৃত্যুর পরই পুত্রবংশ লোপ পায়। উস্তাদ উজীর খাঁ ছিলেন মিঞা তান সেনের কন্যা বংশীয়। এই গতে আধারিত হলে রাগ বিলাবলের গান্ধার ধৈবত স্বরসঙ্গতী কত প্রাণবন্ত হতে পারে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম শিক্ষার সময়ে। গুরুজীর কাছে প্রায় প্রত্যেকটি রাগের উজীর খানি গত প্রত্যক্ষ্য করেছি এবং কিছু কিছু শিখে ধন্য হয়েছি। শেখার সময় অনুভব করেছি পাহাড়ী ঝিঁঝিঁট, তিলক কামোদ, পিলুর মতো তথাকথিত ঠুংরি-অঙ্গের রাগও উজীরখানি গতের প্রসাদগুণে কি ভাবে শান্ত সমাহিত ধ্রুপদী হয়ে উঠে। গুরুজী ছাড়া কোন শিল্পীকে কখনও উজীরখানি গত বাজাতে শুনিনি। দূরদর্শনের সাঙ্গীতিক আলোচনায় এই গতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হলে উস্তাদ বাবার একটি পুরাতন জীর্ণ রেকর্ড নমুনা হিসাবে পেশ করা হয়। এছাড়া গুরুজী ধরে রেখেছিলেন উস্তাদ বাবা সৃষ্ট অগণিত রাগের

সম্ভার। যা আজ উজীরখানি গতের মতোই অস্তাচলের যাবার প্রহর গুণছে। হেমন্ত মাঝ খাম্বাজ হেমবেহাগের মত অতিপরিচিত রাগের সঙ্গে হৈমন্তী, ভগবতী, শুভাবতী, সুরসতীর মত কিছু রাগের রস আস্বাদনের সুযোগ হয়েছিলো গুরুজীর আনুকূল্যে। উস্তাদ বাবা সৃষ্ট অসংখ্য রাগের ওপর বিস্তারিত বিশদ আলোচনা গুরুজী তাঁর ইংরাজী বইটিতে করেছেন।

আমায় শেখানোর সময় গুরুজীর কোন ক্লান্তি দেখিনি। শিক্ষা চলত দীর্ঘ সময় ধরে। যা অন্যদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। উনি যা দেখাতেন তা হাতে না উঠিয়ে ছাড়তেন না। সন্ধ্যায় যে প্রদীপ জ্বলবে তার সলতে পাকানোর কাজ শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীল ও উঃ বাহাদুর খাঁ করে রেখে ছিলেন। আমার প্রাক্তন দুই গুরুর কৃপায় আমি ছন্দ বোল ও কৃন্তনের দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে অসুস্থ শরীর নিয়েও বাহাদুর খাঁ সাহেব আমার জন্য কি পরিশ্রমই না করতেন। ঝর্ণা ধারার মতই নেমে আসতো ছন্দ কৃত্তন বোল যা বর্ণে বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। যা পেয়েছি তাতে আমি চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পারবো না।

কয়েকটি বর্ষণ বিধৌত দিনের কথা আজও মনে পড়ে, যখন গুরুজী প্রচলিত ও অপ্রচলিত মল্লার শিখিয়েছিলেন। মেঘ, মিঞামল্লার, সুরমল্লার, দেশমল্লার, গৌড়মল্লার শেখার পর পরিচিত হয়েছিলাম কয়েকটি অপ্রচলিত মল্লারের সঙ্গে। সেগুলির মধ্যে ছিলো রূপমঞ্জরী মল্লার, চঞ্চলসম মল্লার, চরজু কী মল্লার, মীরাবাঈ কী মল্লার। রূপমঞ্জরী মল্লার শেখার সময় অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করেছিলাম, রাগটি যেন দোলনায় দুলতে দুলতে তার রূপ পরিগ্রহ করছে।

গুরুজী বলেছিলেন মিঞামল্লার ভালো করে শিখলে রামদাসী মল্লার নিজেই বাজাতে পারবে। কারণ এ রাগে আমাদের ঘরে কেবলমাত্র শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ হয়। এর পরে গুরুজী শুদ্ধ মল্লার ও মল্লার কানাড়ার পরিচিতি দিয়েছিলেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কানাড়া শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। যার মধ্যে সূহা, সুঘরাই এর মত অপ্রচলিত রাগও ছিলো।

শিক্ষার সময় গুরুজী রাগরূপ পরিস্ফুট করতে অনন্য মন্ত্রগুপ্তি দিয়ে দিতেন। একটি উদাহরণই রসিকের ক্ষুধাভরণ করবে। 'চঞ্চল সস মলহার' একটি অতি অপ্রচলিত রাগ, যা সচরাচর শোনা যায় না। গুরুজী বললেন অরোহী, অবরোহী ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝবে রাগটি সারং ও কানাড়ার মিশ্রণ।

আরোহী

স র ম প ন্ প	মপ সন ঃ স
বৃন্দাবনী সারং অঙ্গ	শুদ্ধ সারং অঙ্গ

অবরোহী

স ন্ প মপ	মগ্ম রস
	দরবারী কানাড়া অঙ্গ

এখানে মনে রাখতে হবে • ঋষভ ও গান্ধার হবে আন্দোলিত • "রমপনপ মপ সন ঃ স" অঙ্গটি বারবার ফিরে ফিরে আসবে এতে রাগটির অস্থিরতাও প্রকাশ পাবে। • শুদ্ধ নিষাদ হবে অন্তরার 'সা'-এর আশ্রিত। • মেঘ রাগের ছায়া আসে এমন স্বরসংহতি পরিহার করতে হবে যথা "প র স"।

কিভাবে একজন সাধারণ শিষ্যও কঠিন তালে দীর্ঘ বিস্তার করতে পারে তার সরল পদ্ধতি জানতে পেরেছিলাম আড়াচৌতালে কাফী, সিন্ধুরা বিহারী ইত্যাদি রাগের শিক্ষার সময়। এসব মুক্তাবলী গুরুজী সেই মহাসমুদ্র থেকে অঞ্জলীবদ্ধ করে ছিলেন আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে।

পরবর্ত্তী সময়ে বছরের পর বছর আমার ভুল ও ভ্রান্তি আমায় বিপথে চালিত করেছিলো। অধিগত বিদ্যা ভুলে আমি অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হয়েছিলাম। আমি বুঝিনি Europian System অনুসরণ করে G, D, A, E অর্থাৎ মা, সা, পা, রে, সঙ্গতিতে বাঁধা যন্ত্রে দক্ষিণ ভারতীয় কারুকৃতি আদৌ সম্ভব নয়। তবে আজ দীর্ঘদিন বাদে বুঝি এর ফলে একটা বিশেষ আঙ্গিক আমার বাজনায় "ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা" হয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলো।

শিক্ষার সঙ্গে শাসনের অবধি ছিলো না। যা বলব চুম্বকের মত তা তুলে নিতে হবে। তোমার এই Tape করা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো। শিক্ষায় মন নেই, কেবল Record হচ্ছে কিনা সেই চিন্তা।

বেদের সময় থেকেই (৪,০০০ বছর ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সর্ব বিষয়েই ছিলো শ্রুতি নির্ভর। ২০০০ বছর হল মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা শুরু হবার পর শ্রবণের সঙ্গে দর্শনও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। তবুও গুরুমুখী বিদ্যায় স্বরলিপির প্রয়োগ মেনে নেওয়া হয়নি। তবে একমাত্র আমিই উস্তাদ বাহাদুর খাঁর কাছেও এই দাক্ষিণ্য ও অনুমতি পেয়েছিলাম। বাহাদুর খাঁ সাহেব কার কাছে খবর পেলেন প্রণব একেবারে ভেঙে পড়েছে। গত দিন শুদ্ধ ভৈরবী শেখার সময় যান্ত্রিক কারণে Record হয়নি। "ঠিক আছে আগামী কাল ওকে আসতে বলে দিও আর একবার Record করে দেবো।" পরবর্তীকালে বেনারসে প্রায় ২০টি বন্দিশ পেয়েছিলাম গুরুজীর কাছে এই রাগের ওপর।

Western Music আমাদের চোখ দিয়ে শোনার অভ্যাস তৈরী করে দেয়। Notation বারবার দেখে বিশ্লেষণ করলে ঘর্ম থেকে মর্মে আসে। মস্তিষ্কে থেকে যায় রাগের গঠন, ব্যাকরণ, অবয়ব প্রয়োগ কৌশল আর হৃদয়ে বাস করে তার রূপ, রস, বর্ণ, মাধুর্য, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আর আবেগের অনুভূতি আর তখনই রাগ হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী। Notation পড়তে পড়তে শুনতে পেতাম গুরুজী যেন আর একবার শিক্ষা দিচ্ছেন। সবই স্মৃতিপটে ভেসে উঠতো। বারবার স্বরলিপি বিক্ষণ মানে বারবার শোনা বারবার শেখা।

শ্রবণ চিন্তন ও দর্শনের সমন্বয় লব্ধ জ্ঞান দিয়ে গুরুকে সহজেই অনুকরণ অনুসরণ ও অনুগমন করা যায় তার পরে সবকিছু স্বীয়করণ করলে রাগের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

আত্মকৃত রাগটির সঙ্গে অফুরান আলাপ করা সম্ভব হয়। স্বরলিপির দর্পনে রাগরূপ বীক্ষণ সম্পর্কে দুই একটি কথা জানানো আবশ্যক বলে মনে করি।

রাগ রথী হলে Notation হল তার সারথী। রাগ যদি আত্মা হয় স্বরলিপি হল তার শরীর। শাস্ত্র বলছে আত্মার কোন অনুভূতি নেই। নেই কোন ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা বাসনা। নিজেকে জানতে তাই সে শরীর ধারণ করে।

এই স্বরলিপির পংক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে গুরুর কল্পনা, উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনধর্মিতা, রাগের গঠন বৈচিত্র্য ও গুরুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা Style। নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক ছোট ছোট স্বর সমষ্টি একত্রিত হয়ে কি ভাবে বৈশষ্ট্যপূর্ণ সুরেলা ধবনি তৈরী করছে তা বারবার শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিতে (Staff Notation) দেখতে থাকলে শিষ্যের সৃজনধর্মিতার উত্তরণ ঘটতে থাকে গুরুর অভ্যন্তরীণ আবেগ, রাগের ব্যাখ্যা বা Interpretation বিশ্লেষণ (Analysis) করতে পারলে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ধরা ছোঁয়ার মধ্যে চলে আসে। তারফলে শিষ্যের গ্রহণ যোগ্যতার বিকাশ হয়। মেধার উর্বরতা বাড়ে। মস্তিষ্কে বয়ে যায় রাগের গঠন, ব্যাকরণ, প্রয়োগ কৌশল আর হৃদয়ে থেকে যায় রাগের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, মাধুর্য, নান্দনিকতা। একথা আগেই বলেছি।

শ্রবণ ও চিন্তনের সঙ্গে দর্শন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বারবার Notation দেখলে প্রত্যক্ষ করা যায় স্বর সমন্বয়ের মাধ্যমে কি ভাবে একটা নকশা (Pattern) তৈরি হচ্ছে। একাধিক অর্থবহ বাক বৈশিষ্ট্য যেমন সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনি রূপায়িত করে এখানে ঠিক সে ভাবেই রাগ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে রাগরূপ গঠন করা হয় স্বরের মাধ্যমে। একটু একটু করে স্বর আলাপ রাগ আলাপে পরিণতি পাচ্ছে। দেখতে হবে মন্দ্র সপ্তক, মধ্য সপ্তক হয়ে অন্তরায় উত্তরণের কোন গাণিতিক তাৎপর্য আছে কিনা! গুরু মহাজ্ঞানী হলে এক একটি রাগের রূপায়ণ পদ্ধতি এক এক রকম হয়। এই রূপায়ণ পদ্ধতিও পরিবর্ত্তনশীল হয়ে থাকে। তবে তার মধ্যেও নির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োগ কৌশল (Technical know how) লুকিয়ে আছে কিনা তা অনুসন্ধিৎসু শিষ্যকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। Mindless Listening-কে স্বরলিপি বীক্ষণ বা দর্শন Mindful করে তোলে। প্রাথমিকভাবে গুরুকে শুধুমাত্র অনুকরণ, অনুসরণ, অনুগমন করতে হয়। তার পর শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে স্বীয় করণ বা স্বকীয় করে নিতে হবে। ক্রমে ক্রমে রাগটির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠবে। এই আপন করে নেওয়া বা আত্মিকরণ হল একমাত্র লক্ষ্য আর সবই উপলক্ষ্য। আর আত্মার আত্মীয় হল স্বজন। আত্মকৃত রাগটির সঙ্গে সখাবৎ আলাপ করা যায়। বলা যায় 'ধীরে বন্ধু ধীরে এসো আমরা আলাপ করি।' এ আলাপ অফুরান, অনন্ত, অসীম, নিরবধি চলতে থাকবে। কারণ মিত্র সখা বা বন্ধুর মত রাগটি তখন আত্মকৃত। আর স্বর খুঁজে বেড়াতে হবে না ঈশ্বর আপনিই ধরা দেবেন রাগ রূপে। বিদ্যা রূপেন, জ্ঞান রূপেন সংস্থিতা হয়ে। স্বরলিপি নির্ভরতা কবে কখন অস্তমিত অপসৃত হয়ে গেছে শিষ্য-তা জানতেও পারবে না। ততদিনে শিষ্য গুরুর style, form, concept, content, emotional aspect সবকিছু আত্মসাৎ করে ফেলেছে নিজের

অজান্তেই। ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে অব্যবহিত পরেই সে অনুভব করবে তার Finger Print Style, identity সবার থেকে আলাদা। অর্থাৎ নিজের অজান্তে সে তার বাদনশৈলী খুঁজে পেয়েছে, যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব।

Western Music আমাদের চোখ দিয়ে শুনতে শেখায়। চোখ দিয়ে শোনার তাৎপর্য বোঝা যায় সম্পূর্ণ বধির অবস্থায় করা বিটোফেনের Composition শুনলে। শ্রবণেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে গেলেও তাঁর সৃষ্টিশীলতায় ততটা থাবা বসাতে পারেনি, কারণ তিনি দর্শনের মাধ্যমে শ্রবণ করতে সক্ষম ছিলেন। শ্রীসত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে শিক্ষা নেবার সময় এক সাহেব অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচিত হন যিনি ছিলেন Pianist। তিনি শ্রী রায়কে অনুরোধ করেছিলেন যখন তিনি Piano Practice করবেন তখন যেন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সত্যজিৎবাবু তাঁর Manuscript-এর পাতাটি উল্টে দেন যাতে তিনি Uninterrupted বাজনা বাজিয়ে যেতে পারেন। এই ভাবেই সত্যজিৎ রায় Staff Notation-এ অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং শ্রবণ ও বীক্ষণের মাধ্যমে অধ্যাপকের অনুরোধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনাটির মধ্যেই ভবিষ্যতে সত্যজিৎবাবুর নিজের ছবির সুর নিজে করার প্রেরণা লুকিয়ে রয়েছে।

Homeopathy পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা হয় না। হয় রোগীর চিকিৎসা। সে রকম নির্দিষ্ট Recorded music কখনই সর্বসাধারণের জন্য নয়। কোন বিশেষ গুরুর তত্ত্বাবধানে থাকা কোন বিশেষ শিষ্যই সেই রেকর্ডটি অনুধাবনে সমর্থ হয়ে থাকে।

Voice Recorder থেকে স্বরলিপি করণের কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত আছে। আমার গুরু শ্রীপরিতোষ শীল কোন গান বাজনা শুনতে শুনতে Shorthand-এ Notation নিতে পারতেন কিন্তু এটা বিরল প্রতিভার উদাহরণ। আমার মত সাধারণ মানের ছাত্রের খুব সাবধানী হওয়া জরুরী। স্বরলিপি হতে হবে হুবহু, ত্রুটিমুক্ত এবং কখনই যেন তা খাপছাড়া না হয়। নৈব নৈব চ। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কাকে যেন বলেছিলেন তুমিতো দেখছি মাথার গহনা পায়ে আর পায়ের গহনা মাথায় তুলেছো! প্রমাদ জনিত কারণে, 'এবার পূজায় তাঁতের কাপড় কিনুন' বাক্য বন্ধটি 'এবার পূজায় ৩৩ কাপ নুন'-এ পরিণত হতে পারে (সৌজন্য পরিমল গোস্বামী) অনবধানতা ও ভ্রান্তি রাগটির সপিণ্ডকরণ করে তার পরকাল ঝরঝরে করে দিতে পারে। ছন্দ যতিতে শুধু জ্ঞান থাকলেই চলবে না ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। তা নাহলে, Notation করা শুধু বিপজ্জনক হবে না, প্রতি পদক্ষেপে বিপত্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। 'হস্তী নিনাদিল' বাস্তবে হয়ে যাবে হস্তিনী নাদিল' (সৌজন্য শিবরাম চক্রবর্ত্তী)। এ নাদ অবশ্যই নাদ ব্রহ্ম নয়। এর সঙ্গে রাগ রূপের সম্যক পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। সাবধান না হলে ছোট খাটো বিপদ প্রতি পদক্ষেপে! হর্ষধ্বনি আর হ্রেষাধ্বনি কখনও এক নয়। Horse-এর যতই হর্ষ হোকনা কেন। ওদের Herculis আর আমাদের 'হরিকুল ইশ'-এর মধ্যে যোজন ব্যবধান। কুমারী মনোরমাকে চট করে মনোর মা বলে শনাক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। মহিলাটি বল্লেন "সামনে বিশাল জনতা দেখেই আমি দাড়ি কামাতে বাধ্য হয়েছিলাম।" বাক্য বন্ধটির শুদ্ধিকরণ করলে দাঁড়াবে "গাড়ি থামাতে বাধ্য

হয়েছিলাম।" মহিলাটিকে কেউই দাড়ি কামাতে বাধ্য করেনি।

এরকম হাস্যকর খাপছাড়া ত্রুটীপূর্ণ স্বরলিপি করার চেয়ে না করাই ভালো। সেই সব নিবেদিত প্রাণ প্রকৃত শিক্ষার্থী যারা নিজের মানোন্নয়নে ব্যাকুল, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ বিস্তার করতে আগ্রহী তত্ত্বজ্ঞানকামী, পরিশ্রমী, জিজ্ঞাসু একমাত্র তারাই নির্ভুল স্বরলিপি করার যোগ্য। সঙ্গে থাকবে অনলস সাধনা আর ঐকান্তিক শেখার ইচ্ছে। সর্বোপরি প্রকৃত গুণী ও জ্ঞানীর সঙ্গ, যিনি অন্ধকার থেকে আলোকিত মার্গের দিক নির্দেশ করবেন। অন্যেরা যারা কস্তুরী মৃগের মত "আপন গন্ধে আপনি আত্মহারা" তারা উদ্যোক্তাদের দেওয়া লুচি বোঁদে গলাধঃকরণ করে এখানে ওখানে কিরবানী বাজিয়ে বেড়াক। কেউ তাদের বারণ করছে না।

ইদানিং CD এবং Voice Recorder দৌলতে স্বশিক্ষিত শিল্পীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাঁরা একটি বিশেষ রাগের ওপর বিভিন্ন পণ্ডিত, উস্তাদ বা সংগীত কোবিদদের রচনা থেকে Plagiarism করেন যাকে কুম্ভীলক বৃত্তি বলা হয়। বোঝাতে গিয়ে হয়তো ব্যাঘ্র শার্দুল হয়ে গেলো। সোজা কথায় চৌর্য বৃত্তি করেন। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন একটি উদাহরণ শত উপদেশের সমতুল। একটি পারম্পর্য রোহিত স্বরলিপি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা দেখার চেষ্টা করা যাক।

আমরা শুনতে পাই "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি!" আমরা সভয়ে লক্ষ করি শৈশবের নিশ্চিন্ত কল্পলোক কি ভাবে এক লহমায় জাগতিক সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। শিল্পীকে আরও জানার আরও বোঝার কৌতুহল উদগ্র হয়ে ওঠে। শিল্পীও থেমে থাকেন না। অনতি বিলম্বে তিনি বীর রসের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মাতৃস্নেহের মেল বন্ধন ঘটিয়ে এক নবরসের জন্ম লগ্ন ঘোষণা করেন "কহিলা বাসন্তী সখী লঙ্কাপুরে আজি আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" আমাদের জানতে ইচ্ছে করে বাসন্তীর এই প্রার্থনা রক্ষিত হবে তো? আমাদের তা জানার অবসর না দিয়েই শিল্পী অতি সত্বর গুরুবন্দনায় রত হন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন বাস্তবে Hero হলেও তাঁর কাছে "ননী"র তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তিন সপ্তক জুড়ে গাইতে থাকেন "একা ননী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়"। আনকোরা শ্রোতারা এবম্বিধ "তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম" পেয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। ভালো ভালো কথায় সমন্বিত কল্প কাব্য দ্রুম, পাতন প্রক্রিয়ায় একসাথে উঠে আসায় মুগ্ধ হয়ে হাততালির পায়রা ওড়াতে থাকেন। বিদেশে Classical Music বোঝার জন্যে 'Appreciation for Western Music' জাতীয় Course করতে হয়। আমাদের দেশে এসব বালাই নেই। গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী থাকলেই চলবে। শুনেছি ভুটানের "দোরজী" বংশ বিখ্যাত। ওরাই বোধহয় পাঞ্জাবীর Maker ও Designer।

বিদেশে Music Critic-রা সকলেই Musicologist। Theory ও Practical-এর জ্ঞান তাঁদের নখদর্পণে। তাই তাঁরা শিল্পীর গুণগত উৎকর্ষ ও মানের নিখুঁত নিরূপণ করতে

পারেন। প্রায় ১০০ বছরের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই আইস্যাক স্টার্ন, রোজারিও রিসি, ডেভিড ওয়েস্ট্রাক, ইগর ওয়েস্ট্রাক থেকে স্যার ইয়েহুদী মেনহুইন একে একে আসেন মোহিত করেন আবার নতুন কেউ-সিংহাসনে আসীন হয়। সবটাই ঘটে Performance-এর ভিত্তিতে।

মগডালে বসে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একমাত্র ভারতেই সম্ভব। শুধু শিল্পী ও তাঁর শিল্প নয় বাণিজ্যও মাণদণ্ড হয়ে ওঠে। একমাত্র ভারতবর্ষেই সব লোককে চিরকালের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা যায়। এদেশে Musicologist নয় বাজারী সাংবাদিক আর Selfstyled critic-রাই ঠিক করে দেন কে বড় আর কে ছোট। তথাকথিত গুরু গৃহগুলি অন্ধ সমালোচনা, মিথ্যের Myth-এর সূতিকাগার। বাঙালীরা এ স্বভাব দীর্ঘ দিন আত্মকৃত করেছে। পরনিন্দা, পরচর্চা, দলবাজী, আত্মপ্রচার, আত্মকথন, পদলেহী না হলেই তাঁর প্রতি অশোভন অসৌজন্য অশালীন মন্তব্য, পোষ্য সাংবাদিকদের দিয়ে জনমত গঠন শুধু তাই নয় ঋষিকল্প সংগীত গুণী আচার্যকে আদালতের শমন ধরিয়ে ভীতিপ্রদর্শন এবং আত্মজীবনীতে কয়েক পাতা লিখে তাকে ইতিহাস বলে প্রতিপন্ন করে জ্ঞান তপস্বীর চরিত্র হনন (তাঁর ইহলোক ত্যাগের পরও) একমাত্র বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। এক কথায় ভারতীয় সংগীতের গভীর গভীরতর এই অসুখ আজকের নয়, দীর্ঘকালের অসুখের Manifestation মাত্র। CHAMBER MUSIC এসব নীচতার উর্দ্ধে ছিলো আছে এবং থাকবে।

গুরুজী একদিন শিক্ষার মধ্যে স্বাধীন ভাবে বাজানোর অনুমতি দিলেন। এ সব পারো তো করনা কেন? করবে। আমি তোমায় জলসায় বাজানোর জন্যে তৈরী করছি। 'রূপমঞ্জরী' মল্লারের ওপর নিবদ্ধ মসিদখানি গতটি ছিলো অত্যন্ত দুরূহ। অসম্ভব রকমের পরিশ্রম সাপেক্ষ। গতটি বাজাতে পেরেছিলাম। একটি Bowing-এ অনেকগুলি স্বরসমষ্টি প্রয়োগ করতে দেখেই গুরুজী বল্লেন "আরে গতটা Violin-এ খুব সহজ দেখছি। দেখো প্রণব একেবারেই বাজিয়ে দিলো।" ওঁকে কে বোঝাবে আমার প্রথম গুরু শ্রী পরিতোষ শীল। উনি তাঁর বাজনাই শোনেন নি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমার গুরুর কৃতিত্বের ভাগ আমি নিই কেমন করে?

আমি শুনেছিলাম প্রতি বছর শ্রীহনুমানজীর জয়ন্তীতে বারানসীর শ্রীসঙ্কটমোচন মন্দিরে পাঁচদিন ব্যাপী বার্ষিক সঙ্গীত সমারোহের আয়োজন করা হয়। ভারতের এমন কোন শিল্পী নেই যিনি শ্রীসংকটমোচন সমারোহে অংশ গ্রহণ করেননি। ২০০২-এ অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বেহালা বাদক ডঃ এল সুব্রাহ্মানিয়ম। গুরুজী বললেন এবার শিবুর বাজনা আছে। আমি চাই তোমরা Duet করো, সরোদ ও Voilin-এ। শিবু হলেন শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী। আকাশবাণীর প্রথম শ্রেণীর সরোদ বাদক গুরুজীর দীর্ঘদিনের শিষ্য। মনে পড়ল আমার তালাধ্যায়ের গুরু উস্তাদ শৌকত আলী খান আমাকে ২০ বছর পূর্বে জোর করে মঞ্চে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অতবড় শিল্পী আমার মত এক তুচ্ছ শিষ্যের সঙ্গে তবলা নিয়ে বসে ভব নদী পার করিয়ে ছিলেন সম্মানের সঙ্গে। তাঁর যুক্তি ছিলো

"বেটা দীক্ষা হুয়া শিক্ষা হুয়া, পরীক্ষা ভি তো হোনা চাহিয়ে।" উস্তাদজীর পদপ্রান্তে বসে যা শিক্ষা করেছিলাম তা নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছিলাম তাঁরই আশ্বাসে "আমি তো সঙ্গে আছি।"

উস্তাদজীর মত গুরুজীও যেন শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তীকে আমার পরিত্রাণের সঙ্গী করে যুগলবন্দীর ব্যবস্থা করলেন। কোন একক অনুষ্ঠান নয়।

আমাদের যুগলবন্দীর দিন নির্দ্দিষ্ট হল ২০০২ সালের ২রা মের রাত্রে। ঠিক হল আমরা ঝিঁঝিট বাজিয়ে শেষে পাহাড়ী বাজাবো। গুরুজী আমাদের প্রয়োজনীয় তালিম দিলেন।

আমি শিবদাসবাবুকে একান্তভাবে অনুসরণ করেছিলাম। আলাপ জোড় বিস্তার গত ও ঝালা বাজানোর সময় তাঁকে অতিক্রম করার কোন চেষ্টাই করিনি। শুধু আমার যন্ত্রের অঙ্গ অক্ষুণ্ণ রেখে আমার তালিম অনুযায়ী বাজিয়ে ছিলাম। এর মধ্যে অবশ্যই ছিলো উস্তাদ শৌকত আলী খাঁ নির্দেশিত লয়কারী ও তেহাই যা ছিলো প্রচলিত ধারণার থেকে একেবারেই আলাদা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি গুরুজী শ্রীসংকটমোচন মন্দিরের একটি ঘরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে Closed Circuit TV-তে দেখেছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে আমরা দু'জনে গুরুজীকে প্রণাম করতে গেলাম। উনি আমার দিকে স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন শুধু তাই নয়, সেই স্বল্পবাক আত্মস্থ মানুষটি সেদিন যা বলেছিলেন তার উল্লেখ এখানে সযত্নে পরিহার করছি। ব্যাপারটিতে আমি প্রাথমিক ভাবে বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ প্রশংসা তো শিবদাসবাবুর প্রাপ্য। তাঁর গুণমানের সঙ্গে আমি শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণ যন্ত্রানুসঙ্গ বজায় রেখেছিলাম। যাতে শিবদাসবাবুর বাদনের প্রসাদগুণ আদৌ ক্ষুণ্ণ না হয়। বহুকাল পরে আজ আমি অনুধাবন করতে পারি কর্ণের কবচ কুণ্ডল সেদিন তাকে রক্ষা করেছিলো। তার রথচক্র মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে যায়নি। শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীলের Bowing-এর পরিচ্ছন্ন সুরেলা মসৃণ মায়াবী টান ও উঃ বাহাদুর খাঁর আকুতির আর্ত্তি ও মরমী বাদন শৈলীর সামান্য কিছু নিদর্শন হয়তো বা আমার বাজনায় প্রতিফলিত হয়ে থাকবে যা গুরুজীর অভিজ্ঞ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। আমার এই অসামান্য সম্বলটুকুই আজও রত্নরাজি হয়ে আমার সত্তাকে অনুরণিত করে। এটুকুই আমার অহঙ্কার। অকিঞ্চনের কাঞ্চন। এর সঙ্গে উঃ শৌকত আলী খাঁর কাছে শেখা অনুপম অদ্বিতীয় তালাধ্যায়ের প্রয়োগ। পরদিন বেনারসে প্রতিটি Local News Paper-এ আমাদের যুগলবন্দী প্রশংসিত হয়। Violin সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য উল্লিখিত না হওয়ায় আশ্বস্ত হয়েছিলাম। Conference-এ বাজানো, খবরের কাগজে ছবি, পরিচিতি এসবের চেয়ে অনেক বেশী প্রশান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছিলাম যখন আমাদের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ঘোষিকা আমার শ্রদ্ধেয় গুরুবর্গের পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

অসি ঘাটের কাছে একটি মোটামুটি আরামদায়ক পরিচ্ছন্ন হোটেলে আমায় রাখা হয়েছিলো। আয়োজকরা বলেছিলেন আপনার কলকাতা ফেরার দিন পর্য্যন্ত এখানে থাকতে পারেন। গুরুজী নির্দেশ দিলেন বাজনা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে হোটেল খালি করে অন্যত্র

চলে যাও। শিবদাসবাবু বেনারসের বাসিন্দা। তাই তাঁর এ সমস্যা ছিলো না। আমি তৎক্ষণাৎ লোটা-কম্বল গুটিয়ে নিলাম।

এরপর ত্রিপুরা হাউসে শিবদাসবাবুর সঙ্গে আরও একবার বাজানোর সুযোগ ঘটেছিলো গুরুজীর আনুকূল্যে। এই অভিজ্ঞতাও আমার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বলে মনে হয়েছিলো।

আমার কবজ কুণ্ডলের প্রতি গুরুজীর আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা অন্তত আরও একবার রাখতে পেরেছিলাম। কলকাতার এক বিশিষ্ট শিল্পী গুরুজীর Lecture Demonstration-এর আয়োজন করেছিলেন। একেবারে শেষ সময় গুরুজী নির্দেশ দিলেন প্রণব যন্ত্রে তুমি Demonstrate করবে। শুনে আতঙ্কিত হবার সময়ও আমার হাতে ছিলো না। এভাবেই বোধহয় পাখীর মা তার ছানাদের উড়তে শেখায়।

মনে পড়ে সেদিন গুরুজী তাঁর বক্তব্য রাখার সময় উস্তাদ বাবার বহু বন্দিশ গেয়ে দেখালেন। প্রথমে ইমন, তারপর হেমন্ত, শেষে তিলক কামোদ ইত্যাদি। আমার বাজনা সম্পর্কে তাঁর কোন তাপ উত্তাপ দেখলাম না। শুধু বললেন প্রশংসা শুনে মাথা খারাপ করবে না।

রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমী একবার Archive-এ রাখার জন্যে গুরুজীর Recording করল। গুরুজী আমার ও শিবদাসবাবুর বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্ভবত বাবা আলাউদ্দিন খাঁর প্রশিষ্যবর্গের উদাহরণ রাখতে। মনে আছে আমরা ইমন বাজিয়েছিলাম। আমার মত সামান্য শিষ্যকে তুলে ধরতে তাঁর করুণার অন্ত ছিলো না।

বেনারসে শিক্ষা নেবার সময় একদিন গুরুজী বললেন তুমি রাগ "অমরাবতী" শিখে নাও। আমি শুনেছিলাম ধ্রুপদ সমারোহে শিবদাস চক্রবর্ত্তী গুরুজীর সৃষ্টি এই রাগটি এবার পেশ করতে চলেছেন। গুরুজীর প্রধান শিষ্য গুরুজীর নির্দেশে বারবার আমার সঙ্গে বসছেন Duet করছেন এটা আমার ভালো লাগছিলো না। আমি চাইলাম না আমাকে কেন্দ্র করে গুরুজী ও তাঁর প্রিয় শিষ্যের মধ্যে কোন মালিন্য আসুক। আমি আকাশবাণীর শিল্পী নই, এই বাস্তবতা শুধু আমারই জানা। গুরুজীর নির্দেশে শিবদাসবাবু বারবার আমার সঙ্গে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। এবার ধ্রুপদ সমারোহে আমি আর তাঁর কৃতিত্বে ভাগ বসাতে চাইলাম না। আমি গুরুজীকে বল্লাম আমি পরিচিত রাগ শিখে তারপর কঠিন রাগে মনোনিবেশ করব। সব বুঝে গুরুজী আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

শেখানোর সময় কিছু জনশ্রুতি কিংবদন্তী জানতে পারতাম হয়তো বা ইতিহাসও। সম্রাট আকবরের দরবারে দুই উস্তাদ এসে দু-তিন মাস ধরে গান গেয়ে সম্রাটের মনোরঞ্জন করলেন। উস্তাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন হলেন সুরজ খান অপর জন চাঁদ খান। তাঁদের নামের মধ্যেই সঙ্গীতের ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শীতার অহমিকা প্রকট ছিলো। শুধু আকবর নয় সবাই জানলেন সুরজ খাঁ দিনের রাগে এবং চাঁদ খাঁ রাত্রের রাগে সর্বজ্ঞ বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনকি সম্রাটের মনেও মিঞা তানসেনের পারঙ্গমতায় সন্দেহ হল। মিঞা তানসেন যিনি সম্রাটের আনুকূল্যে থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে দরবারী কানাড়া, মিঞা কি চৌড়ী, দরবারী টোড়ী,

মিঞা কি সারং ইত্যাদি রাগ সৃষ্টি করে এক এবং অদ্বিতীয় সভাগায়ক হয়ে সম্মানিত হচ্ছিলেন তিনি নিজেই বললেন, "হুজুর এরা অমার সব রাগই জানেন দেখছি। দয়া করে আমায় তিন দিন সময় দিন।"

তিন দিন বাদে মিঞা তানসেন যখন সভায় এলেন তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল কৌশি, কৌশি কানাড়া, কৌশি ভৈরব ও কৌশি ভৈরবী। উস্তাদ চাঁদ খাঁ ও উস্তাদ সুরজ খাঁ অবনত মস্তকে তানসেনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন।

এ কাহিনী বলার পর গুরুজী আমায় পর পর রাগগুলি শিখিয়ে দিলেন। এর মধ্যে একমাত্র কৌশি কানাড়াই বহুশ্রুত ও প্রচলিত।

তখনকার আমলে উস্তাদের বিবাহে যৌতুক হিসাবে ২০টি, ৩০টি, ৫০টি রাগের গত দেওয়ার প্রচলন ছিলো। এটি অর্থ বা অলঙ্কারের বিকল্প বলে মনে করাও হত। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ যখন শিক্ষার ছেদ টেনে উস্তাদ উজীর খানের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন সে সময় গুরুমা বললেন বেটা এবার আমার কাছে কিছু শিখে নাও। তিনি রাগ বিহারী শেখালেন এই রাগ যৌতুক দিয়ে তিনি উস্তাদ উজীর খানের ঘরনী হন। বিহারে রাগটির জন্ম তাই নাম বিহারী। রাগটি তিলক কামোদ, পাহাড়ী ও পিলুর মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিলো। গুরুজী এই রাগটিও আমায় শিখিয়েছিলেন।

গুরুজীর কাছে কত গবেষককে আসতে দেখেছি উস্তাদ বাবা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। উনি সকলকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আবার কত স্বার্থসন্ধানীদের অনুরোধে উস্তাদ বাবার ব্যক্তিগত চিঠি মূল্যবান দলিল, নিজের হাতে লেখা গান, Notation ও দুর্মূল্য ছবি দিয়ে দিতেন। সব বুঝে বারণ করতাম। "গুরুজী ওরা নিজেরা এ সবের বিনিময়ে সুনাম করবে। আপনার কথায় সেখানে উল্লেখও থাকবে না।" গুরুজী বলতেন 'করুক না তাতে তো বাবারই প্রচার হবে।' হ্যাঁ অবশ্যই বাবার প্রচার হয়েছে। তার থেকেও প্রচার হয়েছে সেই ব্যক্তির। বাবার লেখা চিঠি ও বিরল ছবির দৌলতে। উস্তাদ বাবা রামকৃষ্ণ হলে সেই ব্যক্তিটি আজ বিবেকানন্দ হয়ে গেছেন। জ্ঞানী গুণীরা দুরভাষে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ধন্য হন।

গুরুজী চাইতেন বাবার শিক্ষার প্রচার হোক, সকলের কাছে থাকুক, সকলে শিখুক জানুক সকলে বাজাগ। কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ তাকে দিয়ে দিতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ চিত্ত। একবার আমায় বললেন অমুক তোমার কাছে যাবে ওকে একটু দেখো। সে আসামাত্র জানলাম ইতিমধ্যেই সংগীতে ডক্টরেট হাসিল করেছে। বুঝলাম একে আমার কিছু দেখানোর নেই। ওই আমাকে দেখে নেবে। এ শেখার ছেলেই নয়, শেখানোর জ্যাঠামশাই। Elder Brother of his Father। গুরুজীর বক্তব্য ছিলো কলকাতা থেকে বেনারসে এত দূরে কষ্ট করে আসবে। তোমার কাছে যা আছে ওকে দিও। আমি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিনি। আমার ২০ বছরের পরিশ্রম (সাধনা কথাটি ইচ্ছে করে পরিহার করলাম) তাকে দিয়ে দিলাম। পরপর কয়েকদিন এসে ছেলেটি আমার সমস্ত রত্নরাজি রেকর্ড নিয়ে যেতে থাকলো এবং

উপদেশ দিলো আর কাউকে এসব দেবেন না। ওর কাছে আমি জানতে পারলাম উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর দুর্বলতা কোথায়, কেন উনি সেরকম মানে পৌঁছননি, আমার গুরু বাহাদুর খাঁর স্মৃতিশক্তি এতই দুর্বল ছিলো যে কিছুই মনে রাখতে পারতেন না। অজয় সিংহরায় বিশেষ কিছু জানতেন না। নাম ডাকের তুলনায়। পরে জানালো Violin যন্ত্রের Limitation আছে। এ তথ্যটি আমার নতুন আনকোরা বলে মনে হল। ৮৮ পর্দার পিয়ানোর সঙ্গে যে যন্ত্রটি "মাতৃক্রোড় শিশুর" মতই লেপ্টে থাকে তার Limitation! তাও কিনা ১৮-১৯ পর্দার লাউ বিশিষ্ট সেতার যন্ত্রটির তুলনায়? অবশ্য সেতার যন্ত্রটি বড় হয়ে "উপার্জনক্ষম" হয়ে উঠেছে। বস্তা বস্তা ডলার আনছে বিদেশ থেকে। আর Violin নিয়ে বিদেশ যাওয়া Carrying Coal to New Castle হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য উত্তর ভারতের সারেঙ্গীর মতই বেহালা যন্ত্রটি দক্ষিণ ভারতের কণ্ঠসঙ্গীতের এক অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গে পরিণত হয়েছে। তার স্বচ্ছন্দ বিহরণ সাপেক্ষতার কারণেই। এরপর একদিন সে জানালো আপনার শেখা ঝিঁঝিট রাগটি তেমন ভালো লাগছে না। সুর সম্রাটের শৈলীর সঙ্গে ঠিক মিলছে না। আমি বললাম ইচ্ছা হলে সেটাই বাজিও নতুন করে এসব শেখার কি দরকার? ঝিঁঝিটের পরই গুরুজী আমায় পাহাড়ী রাগ শিখিয়েছিলেন। বললাম আমি পাহাড়ী রাগের কথা বলছি। ঠুংরী অঙ্গে নয়। সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়েছিলেন পাহাড়ী ঝিঁঝিট ও সবশেষে মিশ্র পাহাড়ী। তাই ভুলেও ঝিঁঝিট-কে মিষ্টি করার জন্যে পাহাড়ীর মিশেল দিতে পারি না। এটা শিক্ষার কুফল বলতে পারো তবে স্যাকরারা তো সোনায় খাদ মেশান। তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিও থাকে। তুমিই ঠিক করবে তোমার বিশল্যকরণী চাই না গন্ধমাদন। একদিন আলোচনা করতে আমার বাড়ীতেও এসেছিলো। কিন্তু আমার বাজনা শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় দূষিত করেনি।

যাইহোক ছেলেটি আমার ২০ বছরের জ্ঞান গঙ্গা জহ্নু মুনির মত স্যাঁৎ করে গিলে ফেললো। একেবারে রাতারাতি। গুরুজী অচিরেই জানালেন প্রণব কি করি বলত? ও "খট" শিখতে চাইছে! শুধু খট শিখতে ও অতগুলো পয়সা নষ্ট করে বেনারস আসবে? তুমি কি বলো? আমি বললাম ছোটবেলায় ট্রেনের কামরায় বিষহরি বলে একটা ওষুধ বিক্রী হতে দেখতাম। বিক্রেতা জানাতেন এটি সর্বরোগ হর। কুত্তার কামড় থেকে ক্যানসার সবকিছু নিরাময় করে। জায়গায় বসে পরখ করুন।

আপনি আমায় যা যা দিয়েছেন ও সবকিছুই জায়গায় বসে পরখ করেছে। তাই বেনারস যেতে চাইছে। এরপর নট খট, খট যোগ, সিন্ধু খটক (আরোহে সিন্ধু ভৈরবী অবরোহে খট) খট মোটকী শিখতে চাইবে। এ নিজেই একটি সঙ্গীতগুরু। দক্ষিণার বিনিময়ে শিষ্যমেধ যজ্ঞের অগ্নিহোত্রী। আপনি যদি কল্পবৃক্ষ রূপ নিয়ে থাকেন এসব শিক্ষার ইচ্ছে উত্তোরোত্তর বাড়তেই থাকবে। আপনি দয়া করে একটা দক্ষিণা ধার্য করুন। জানতাম গুরুজীর শিক্ষা ছেলেটাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। কারণ গুরুজীর শিক্ষা তুলে নেওয়া পরিশ্রম সাপেক্ষ। "শুনেই তুলে ফেলব" এই মানসিকতা এখানে চলবে না। Perfect Notation করতে হবে। কে এত হ্যাপা পোয়াবে? আপাতত যখের ধন নিয়ে বসে থাকুক। হে ঈশ্বর ইহাদের মনে

বিলাবল শেখার ইচ্ছা জাগ্রত করো। ছেলেটি ভারি সরল প্রকৃতির, কস্তুরীমৃগের মত। আপন গন্ধে আপনি আত্মহারা, ওর কাছেই শুনেছি শ্রোতারা নাকি প্রশংসায় পঞ্চানন ও হাততালিতে ষড়ভূজ হয়ে যান। তবে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমায় কয়েকটি CD করে দেবার জন্য। CD গুলি সবই—আমার গুরুবর্গের।

পরবর্ত্তীকালে গুরুজী বললেন তোমার কাছে একটি ছেলে যাবে বাবার ওপর লেখা দুটি বই ওর হাতে দিয়ে দিও। বাবার জীবনী সকলের জানা উচিত। গুরুজী জানতেন আমার সংগ্রহে বেশ কিছু বই ছিলো। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে পড়িয়ে তাঁদের মতামত নিয়েছি। সুধী পাঠককুল নির্বিশেষে জানিয়েছিলেন এটি একটি আসাধারণ জীবনপঞ্জী। আমি গুরুজীকে কেন জানি না বলেছিলাম এসব সুযোগসন্ধানীদের দুটি কেন একটি বইও দেবো না আপনি বললেও না!" আমার গুরুবাক্য লঙ্ঘনের তিক্ত কষায় কটু মন্তব্যটি হয়তো নিয়তি নির্দেশিত ছিলো। যে কটি বই আমার কাছে ছিলো কালের প্রবাহে আজ তা জীর্ণ ও মলিন। গুরুজীর কথায় তাকে বইগুলি দিয়ে দিলে আজ "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পুনমুদ্রর্ণের আলো দেখত না।

কলকাতায় বসে মোবাইল ফোনে দীর্ঘকাল শিক্ষা নিয়েছি। গুরুজীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিল্প ভাবনা, Style, বন্দিশ ও বিস্তারের নির্মিতি, গঠন ইত্যাদি বুঝতে পারার পর সবকিছু অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলো। ১০ই মে ২০০৯-এ আমি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তালিম পেতে শুরু করি। দুর্গা রাগে বিলম্বিত রূপক এর ($২^১/_২+৪^১/_২$) একটা বন্দিশ পেয়েছিলাম। গুরুজী বললেন তিন দিন বাদে সন্ধ্যা সাতটায় আমায় ফোন করবে। গুরুজী ছিলেন অতীব সময়নিষ্ঠ। আমারও কখনও একমিনিট দেরী হত না। রাগ দুর্গার পর বললেন নারায়ণীর একটা বন্দিশ নিজে তৈরী করে শোনাবে। গুরুজী তাঁর ইচ্ছে মত, সময় মত আমায় শিক্ষা দিতে থাকলেন। বলতেন আজকাল তো তুমি বেশ তুলে নিতে পারছো। Tape করতে চাওনা। গুরুজীর জানা ছিলো আমি আলাপ বিস্তার পর্য্যন্ত Notation-এ ধরে রাখতাম। ২০১৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোবাইল-এ তালিম পেয়েছি যা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

একদিন গুরুজী আমায় পরীক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন রাগের বন্দিশ গাইতে বললে আমি মোবাইলে পরপর গেয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলাম। গুরুজী অবাক! তুমি যে বলো তোমার স্মৃতিশক্তি খারাপ! তাহলে? আমি বললাম গুরুজী তঞ্চকতা মাফ করবেন। আমি সবকটা খাতা চোখের সামনে খুলে রেখেছি। Western Music-এ চোখ দিয়ে শোনার শিক্ষা দেওয়া হয়। Notation দেখলেই সব মনে পড়ে। গুরুজী খুব হাসলেন। তবে এই পদ্ধতিতেই আমি প্রাপ্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আত্মিকরণ করতে পেরেছি বলে মনে করি।

এরপর গুরুজী আমার প্রতি আরো স্নেহার্দ্র হয়ে উঠেছিলেন কারণ তিনি বুঝে ছিলেন প্রণবের Notation শুষ্কং কাষ্ঠং নয় বা স্বাদহীন নটে শাকও নয়, এ হল "সরস তরুবর", ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় ও শান্তিপ্রদ।

পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা পাওয়া আমার জীবনে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশিস

বলে মনে আমি মনে করি। পণ্ডিতজী রাগ ভেদ ও রাগ বিচার ধারার উৎকৃষ্টতম সংগীত মস্তিষ্ক বলে বিবেচিত হতে পারেন।

ক্ষুদ্রকে বৃহৎ বা নাতিবৃহৎকে বৃহত্তর করার অনেক ছেলে-ভোলানো গল্প বাজারে ছড়িয়ে আছে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ছড়ানো হয়েছে। যেমন, এক বিজ্ঞানী একটি মৃত ইঁদুরকে 'বেলজারে' ঢাকা দিয়ে রাখলেন। তারপর কোন এক বিশেষ শিল্পীর সেতার শোনাতেই 'ইঁদুরটি বাঁচিয়া উঠিলো'।

এর থেকেও উত্তেজক ও রোমহর্ষক কাহিনিটি নিম্নরূপ। এক বেতারী সেতারী তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক তাঁর নিজের চোখে দেখা একট নিরীক্ষা একদিন অতীব উৎসাহের সঙ্গে বিবৃত করলেন। একটি সজীব সতেজ পল্লবিনী চারাগাছকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মোৎসার্টের এক composition শোনাতেই সেটি শুকিয়ে প্রায় আমসি হয়ে গেল। এরপরেই ঘটতে দেখা গিয়েছিলো সেই অলৌকিক ঘটনা। পূর্বোল্লিখিত সুরসম্রাটের সেতার বাদন শোনানো মাত্রই মৃতপ্রায় চারাগাছটিতে ফিরে এলো প্রাণের স্পন্দন। এক জৈবিক বিজিগীষায় সে যেন বলে উঠলো "দাদা আমি বাঁচতে চাই!".... আর প্রায় তৎক্ষণাৎ গুচ্ছে গুচ্ছে মুকুলিত হতে থাকলো পত্র, পর্ণ, নবাঙ্কুর ও কিশলয়ের দল, থোকায় থোকায় উঠে এলো রঙবেরঙের কলিকা, যারা কিনা অচিরেই ফুল্লকুসুমিত হতে থাকলো স্তবকে স্তবকে.... দূরারোগ্য খোসপাচড়ার সংক্রমণের মতই।

কাহিনি শেষ হওয়া মাত্রই বলতে হল 'সাধু-সাধু'। এখানেই থামতে পারলাম না। বলে উঠলাম 'সাধু সাবধান'। কখনও ভুলক্রমেও নারকেলনাড়ু খেতে খেতে এই বাজনা শুনতে যাবেন না। তাহলেই অনিবার্য বিপদ! নাড়ুটি তৎক্ষণাৎ ঝুনো নারকেলে রূপান্তরিত হতে একটুও দ্বিধা করবে না। অচিরেই সেটি নারকেল বনস্পতি হয়ে আপনার অট্টালিকার ছাদ ভেদ করে গগনচুম্বী হবে। আর সদ্যোজাত অধঃপতিত বৃহৎ আকারের নারকেলনিচয় আপনার প্রতিবেশীর মস্তকচূর্ণ করে তাদের প্রাণ সংশয়ের কারণ হয়ে উঠবে। সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার প্রতিবেশী নই!.... এই নির্লজ্জ বেহায়া চাটুকারটির নিরীক্ষার কাহিনি তার অবোধ শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা প্রচারিত হতে থাকবে বংশানুক্রমে, সম্রাটের সিংহাসনটি নিরঙ্কুশ এবং চিরকালীন করতে।

এসব বাজারী গুজব ভুলে মুক্তমনা হয়ে বিচার করলে প্রমাণ করা যায় (অবশ্যই তথ্যের ভিত্তিতে.... যার সামান্য কিছু আমার কাছেও আছে) পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য বাবার সর্বোত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য। একটি উদাহরণই যথেষ্ঠ হবে বলে প্রতিবেদক মনে করে। তা হল বিলুপ্তপ্রায় উজীরখানি গত ও মধ্যলয়ের অগণন রচনা সম্ভার।

প্রায় প্রতিটি রাগের উজীরখানি গত গুরুজীর ভাণ্ডারে দেখেছি, যার একটিও কখনও কাউকে বাজাতে শুনিনি। এই গতে আধারিত পিলু রাগের একটি বন্দিশে কোমল ধৈবত বর্জিত করায় কিভাবে রাগটির চরিত্রগত লঘুতা অপসৃত হয়ে 'পিলু'কে গম্ভীর ও ধ্রুপদী করে তুলেছে তার নমুনা এই প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে। পাহাড়ী ঝিঁঝিটের উজীরখানি

গতটিও রসমাধুর্যের এক অনুপম উদাহরণ।

শুধুমাত্র ঝিঁঝিট, পাহাড়ী, পাহাড়ী ঝিঁঝিট নয়, এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মাড়োয়া, পুরিয়া সোহিনীর মত রাগের নিজস্ব গঠন বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং এক মহামণ্ড বা খিচুড়ী প্রস্তুত না করে কিভাবে শুদ্ধ রাগ রূপায়ণ সম্ভব সে শিক্ষাও এই প্রতিবেদক গুরুজীর কাছেই পেয়েছে।

বিলাবল রাগটি যন্ত্রে কাউকে বাজাতে শুনি না। উজীরখানি গতে আধারিত হলে রাগটির গান্ধার ধৈবত স্বরসঙ্গতী কত মহতী হতে পারে তার ধারণাও গুরুজীর কাছেই পাওয়া। বাবার শিক্ষা পরম্পরা যাতে দীর্ঘজীবি হয় তার প্রচেষ্টা গুরুজী আজীবন করে গেলেন। পরিশেষে আবার জানাই একটি শৃঙ্খল কতটা ঘাতসহ তা নির্ভর করে শৃঙ্খলটির দুর্বলতম গ্রন্থিটির ওপর। প্রয়োজনে এই প্রতিবেদক তার গুরুর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে বাধ্য থাকবে।

রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে। (সৌজন্য উপেন্দ্রকিশোর)। কোন অহমিকা শূন্য প্রকৃত শিক্ষার্থী তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পেতে চাইলে তা দিতে এই প্রতিবেদক কার্পণ্য করবে না। শর্ত একটাই শিক্ষার্থীকে তা আয়ত্ব করে দেখিয়ে যেতে হবে, যে শিক্ষার প্রতি তার অনুরক্তি বা আগ্রহে কোন অপমিশ্রণ (ভেজাল) নেই। তার গুরুর মত এই প্রতিবেদকও চায় বাবার শিক্ষার স্রোতস্বিনী যেন 'সরস্বতী' নদী না হয়ে কলকল্লোলিনী জাহ্নবীর ধারা হয়ে যুগ যুগ প্রবাহিত হয়।

৫ই জানুয়ারী ২০১৬ দিনটা ছিলো মঙ্গলবার, বেনারসে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে ৪ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রি। সন্ধ্যা ৬টায় আমার তালিম হবার কথা। ঠিক করলাম এই ঠাণ্ডায় গুরুজীকে এখন বিছানা থেকে তুলব না। ৭টার সময় ফোন করব। বাজাতে বসে গেলাম। ৭টার সময় মোবাইল খুলে দেখি গুরুজীর ৪-টে Missed Call। এই প্রথম ও শেষবার আমি সময়ানুগ ছিলাম না। ফোন করতেই গুরুজী উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "প্রণব ভালো আছো তো?" বললাম গুরুজী আজতো আমার শেখার কথা। "মান্ড" আরো ভালো করে শিখতে চাই। "তিলং"-এর বন্দিশ দিতে হবে কিন্তু। আমার শেষ শিক্ষা হয়েছিলো ২৯-১-১৬ তারিখ পর্য্যন্ত। গুরুজী বলেছিলেন "এখন আমি ব্যস্ত থাকবো সামনের মাসে তুমি ফোন-এ যোগাযোগ করবে।" ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই আমার স্ত্রী বললেন এবার গুরুজীর একটা খবর নাও। আমি বলেছিলাম গুরুজী Rest-এর মধ্যে আছেন হয়তো। আমার ফোন পেয়েই বলে উঠবেন "এই প্রণবের হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।" গুরুজীকে আমার আর ফোন করা হয়নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী গুরুজীর এক শিষ্য জানালেন গুরুজী আর নেই। শেষ সময় আচ্ছন্ন অবস্থায় শূল তালে ইমনের একটি বন্দিশ গাইছিলেন। ডাঃ বলেন শরীরের সব Vital Organ কাজ করার একেবারে শেষ সীমায়। এখনও মস্তিষ্ক কি করে এত সক্রিয়! Highly Unusual!

আমার জীবন দেবতা যেন সুমুখে একটি দর্পণ তুলে ধরেন। আমি জীবনে প্রথমবার

নিজেকে নিজে দেখতে থাকি চলমান জীবনের পৃষ্ঠভূমির প্রেক্ষিতে। সংসাররূপ ক্ষীর সাগর সতত মথিত হচ্ছে। উঠে আসছে ধর্ম অর্থ সম্ভোগের বৈজয়ন্তীমালা। উঠে আসছে অমরত্বের অমৃত, হলাহলের বিষকুম্ভ। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা আর তুমি তোমার কাপুরুষতা অপারগতা ভীতিজনিত অনিহা ও পলায়নী মনোবৃত্তির শিকার হয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখে চলেছো। উৎকণ্ঠ উট পাখীর মত বালুতে মুখ গুঁজে সংসার সাহারার মরু ঝড় এড়াতে চেয়েছো। কারণ এর মুখোমুখি হবার সঙ্গতি তোমার ছিলো না।

সংগীত শিক্ষার প্রতি তীব্র আসক্তি, অতীব অনুরক্তি, অপরিমেয় আগ্রহ, দুর্নিবার তত্ত্বজ্ঞান, কামনা, অনলস অধ্যাবসায়, অভিষ্ট সিদ্ধিতে মগ্ন অভিনিবেশ, তোমার তথাকথিত গুণাবলী তাঁরা কোন মানসিকভাবে সুস্থ স্বাভাবিক, জ্ঞান বোধ ও প্রতীতি সম্পন্ন উচ্চমার্গের শিষ্যের মধ্যেও প্রকাশিত হতে দেখেন নি। তোমার অসুস্থতাকে জিঘৃক্ষা বলে ভুল করেছেন। ওঁরা আদৌ বোঝেন নি তোমার চিন্তা ভাবনা, অনুভূতি, বোধ এবং কার্যের মধ্যে কোন সঙ্গতি বা যোগসূত্র ছিল না। চিরকাল গুরুসঙ্গের নিরাপত্তার সুরক্ষা বলয়ে পরম নির্ভরতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজেছিলে। তোমার শোক সন্তাপ শুধু মাত্র প্রয়াত গুরুবর্গের জন্য নয়। অশ্রয়হীন হওয়ার আশঙ্কা তাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। তাই তোমার শোক সন্তাপ কাল প্রশমিত করতে পারে না। এ শোক তোমার নিজের জন্যে। স্বামী বিবেকানন্দর মত পরম তেজস্বী, গুরু বলে বলীয়ান ধর্ম, সমাজ ও জীবন যুদ্ধের মহারথীও সাময়িকভাবে মহাগুরুর প্রয়াণের পর পওহারি বাবার কাছে আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। তুমি তো ভীরু কাপুরুষ নির্জীব আত্মসর্বস্য স্বার্থপর এক নিয়তি তাড়িত, দানপুষ্ট পরাশ্রয়ী প্রাণী। কখনও ভেবেছো তোমার গুরুবর্গ তোমার কাছে কি আশা করেছিলেন? তুমি তাঁদের কি দিতে পেরেছো? কি দিতে পারতে? শুধুই অশ্বের শ্রমশীলতা, সারমেয়র কৃতজ্ঞতা আরুণির আকুতি? জানতে না গুরু বেঁচে থাকেন তাঁর কৃতী শিষ্যের মধ্যে!

একাকী অতীত চারিতার সময় কিছু ছবি মনের Canvas উঠে এসে আমায় প্রশ্ন করে।

শ্রীপরিতোষ শীল কেন আমার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র দেখে গুম হয়ে যান! বিয়ে করলে পুত্র কন্যা আসে যে প্রবল বন্যা! তোমার শিক্ষার ইতি হয়ে গেল প্রণব! আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি ওসব বন্যা জলোচ্ছ্বাস কিছুই হবে না। মাষ্টারমশাই আমি শিখতে চাই।

কেন উঃ শৌকৎ আলি খান যিনি কিনা উস্তাদ বিলায়েৎ খানের রিয়াজের নিত্য সঙ্গী তাঁর মত মানুষ আমার মত তুচ্ছ শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গত করতে মঞ্চে ওঠেন! তাঁর প্রতিটি কাজের নির্ভুল জবাব আমার থেকে আদায় করে নেন। সাহস দিয়ে বলেন চিন্তা মৎ করো বেটা আচ্ছাসে বাজাও। মায় হুঁ-না। আজ ভাবি সেদিন ওঁর যে কোন শিষ্যই তো আমার সঙ্গে বসতে পারতো! তা হলে?

কেন বাহাদুর খাঁ সাহেব তাঁর প্রতিভাবান শিষ্যদের ছেড়ে আমাকেই বলেন "একদিন আমার জন্যে হাউ হাউ করে কাঁদতে হবে।" গুরুজী সপ্তাহে একদিন মৌন হয়ে থাকতেন তাহল রবিবার। ঐদিন কোন কাজ রাখতেন না। কিন্তু প্রয়োজনে আমার শিক্ষা রবিবারেও

কখনও বন্ধ হয়নি। কারণ গুরুজী জানতেন আমার মত শিষ্যকে কিভাবে শুধু ইশারা ইঙ্গিতে শায়েস্তা করা যেতে পারে।

মনে পড়ে গুরুজী বেনারসে গণেশ উৎসবে আমার বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। জঙ্গম বাড়ীর অতিথিশালায় রেখেছিলেন যাতে শান্ত নিঃস্তব্ধ পরিবেশে রিয়াজ করতে পারি। বললেন "প্রণব একজন cameraman-কে পাঠিয়ে দেবো যে তোমার বাজনার ছবি তুলে রাখবে। ওর সঙ্গে কথা বলে নিও। কলকাতায় ছবি পাঠিয়ে দেবে। বাজানোর দিন এক শিষ্যের কাছে ফোন করে বার বার জানতে চাইলেন প্রণব কি বাজালো? কেমন বাজালো? সুরে ছিলো তো? সব অঙ্গ দেখাতে পেরেছে? শ্রোতারা কি বলল? আমার মত সামান্য শিষ্যের প্রতি তাঁর ব্যাকুলতার উৎস কি? আমি কি সত্যিই এত স্নেহ মায়া মমতা উদ্বেগের যোগ্য? এ সব প্রশ্ন আজও আমায় স্মৃতিমেদুর করে তোলে। গুরু শিষ্য সম্পর্ক কি পূর্ব জন্মের? অন্তত আমার ক্ষেত্রে আমার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। একটা তীব্র হাহাকারে মন আলোড়িত হয়। ওঁরা আমার কাছে কি চেয়েছিলেন? হয়তো Cardinal Newman-এর বাণীতেই এর উত্তর রয়ে গেছে। If a man wants to do something so well that no one would find any fault with what he has done, he would do nothing।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।